বৈশাখ । ১৩৮৫ ষষ্ঠ বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

স্তম্ভ ও স্থানচ্যুত কলস, পাকবিড়রা

জৈন ধর্ম ও মূর্তি শিল্পে লোকায়ত ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব

শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী

প্রাচ্য ভারতে জৈন তীর্থংকর মহাবীর ও তাঁর শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে এবং এই সঙ্গে আর্যসভ্যতা ও ধ্যান-ধারণা ক্রমশঃ এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে পূর্ব ভারতে জৈন ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হলেও বাংলা তথা প্রাচ্য ভারত থেকে এই ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং পশ্চিম ভারতের বর্তমান রাজস্থান, গুজরাত অঞ্চলে এই ধর্ম সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান কালে ভারতের জৈনধর্মাবলম্বী জনগণের অধিকাংশই পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। ভারতের এই দুই অঞ্চলে জৈন ধর্মের বিকাশ ও বিস্তারলাভ ভারতীয় সংস্কৃতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ—পশ্চিম ভারতের সিন্ধু-সরস্বতী অববাহিকায় ভারতের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার নিদর্শন হড়প্পা সংস্কৃতির আদিমতম উন্মেষ হয়—আর পূর্বভারতের গহন বনানীর শ্যামলছায়ায় ভারতের প্রাচীনতম নরগোষ্ঠীর অন্যতম অরণ্যচারী অস্ট্রিক ভাষাভাষী সাঁওতাল ও কোলদের বাসস্থান। অন্ততঃ খৃষ্টপূর্বঃ ৬ষ্ঠ শতকে মহাবীরের পথহীন লাঢ় দেশ (রাঢ়), বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমি (মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ়) পরিভ্রমণ কালে এই সমস্ত অঞ্চল যে অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল প্রবোধ বাগচী এবং নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতের প্রচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর দুই বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার প্রভাব অপরিসীম এবং জৈনধর্ম ও তার পৌরাণিক কাহিনীও (mythology) এই সমস্ত প্রাক-আর্য বা অনার্য সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বরঞ্চ এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সাংকালিয়া মহাপুরাণ রচয়িতা পুষ্পদন্তের কাহিনী উল্লেখপূর্বক এক প্রাচীন জৈন কিম্বদন্তীর অবতারণা করেছেন। কল্পসূত্রের আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, কথিত আছে, নাভি নামক পৌরাণিক রাজার রাজত্বকালের পূর্বে কল্পবৃক্ষ থেকে অভিষ্ট বস্তু আহরণ করে মানবজাতি সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মানবজাতির কৃষিকর্ম বা শস্য আহরণের পদ্ধতি অজানা থাকার জন্য তাদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নাভি মানবজাতিকে মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে

শিক্ষা দিলেন। মুষলের সাহায্যে শস্য চূর্ণ করবার পদ্ধতি, অগ্নি প্রজ্জ্বালন এবং পরিশেষে রন্ধন কার্যের প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা দিলেন। কালক্রমে তুলা থেকে সূতা কাটা ও কাপড় বুনবার পদ্ধতিও শিক্ষা দিলেন। এইরূপে নাভি এবং তাঁর পুত্র ঋষভদেব কেবলমাত্র জৈনধর্মের প্রবর্তকই ছিলেন না, মানব সভ্যতার বাহক ধারক হিসাবেও পরিগণিত হয়েছেন (Cf. 'Rsabha or Adinatha', H. D. Sankalia, *Jain Antiquary*, 1957)। এই কিম্বদন্তী থেকে মোটামুটি জৈনধর্মের সবিশেষ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এবং মনে হয় এই জন্যই ভারতের প্রাচীনতম বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার এক বিশেষ প্রভাব জৈন ধর্মের উপর পড়ে যায়।

চতুর্বিংশতিতম জৈন তীর্থংকর মহাবীর যে বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন তা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত এবং তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শ্বনাথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে। দ্বিবিংশতিতম তীর্থংকর নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা হিসাবে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং যাদবগণের প্রভাব প্রতিপত্তি পশ্চিম ভারত এবং মধ্য ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধরা হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে পরবর্তীকালে তাম্রাস্মীয় সভ্যতার বিস্তার এই যাদবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনগণের দ্বারা সাধিত হয় অন্ততঃ ডাঃ সাংকালিয়া প্রমুখ পণ্ডিতগণের সেই মত। এছাড়া পূর্ববর্তী জৈন তীর্থংকরদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে জৈন ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয় খৃষ্ট জন্মের হাজার হাজার বৎসর পূর্বে।

আপাততঃ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন 'হড়প্পা সংস্কৃতি'র প্রত্ন বস্তুগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে লিঙ্গপূজার প্রচলন ঐ সময় ছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'শিশ্নদেব' শব্দের অর্থ আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে লিঙ্গ উপাসনাকারী জনগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন এবং এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা যে শতাব্দী পরবর্তীযুগের জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ পদ্ধতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—এমতও প্রকাশ করেছেন। মহেন-জো-দড়ো থেকে পাওয়া একটি সীল এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে (Seal No. 430, Plate No. XCIV, *Further Excavations at Mohenjodaro*, Vols I, II, E. Mackay ; also notes at pp. 337-338 and enlarged Plate No. XCIX(A))। এই সীলে বৃক্ষতলে কায়োৎসর্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান এক দিগম্বর মূর্তি নাগলাঞ্ছন শোভিত এক ভক্ত কর্তৃক পূজিত হতে দেখা যায় এবং সীলের প্রত্যন্তে সপ্ত মূর্তি সারিবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং এই মূর্তিগুলির মস্তকে নাগচিহ্ন শোভিত আছে। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বৃক্ষতলে কায়োৎসর্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান মূর্তিটির মধ্যে কোনও এক জৈন তীর্থংকরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লিখিত জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবনী ও তার কার্যাবলী

আলোচনাকালে জানা যায় যে একসময় নাগরাজ ধরণেন্দ্র তাঁকে সম্বর নামে এক দানবের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং এই ঘটনাকে স্মরণ করে রাখার জন্য পরবর্তীকালে নাগছত্র পার্শ্বনাথের লাঞ্ছনরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। দণ্ডায়মান সপ্ত-মূর্তির মধ্যে অমরা পরবর্তীকালের বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সপ্তমাতৃকার আভাস পাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জৈন মূর্তি শিল্পে তীর্থংকরদের মূর্তি মোটামুটি একই ধরণের। সর্বত্রই প্রায় তাঁরা কায়োৎসর্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান বা যোগাসনে উপবিষ্ট, কেবলমাত্র তাঁদের বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছনের দ্বারাই তাঁদের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ যে এই সমস্ত লাঞ্ছনের অধিকাংশই জীব-জন্তুর মধ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রথম তীর্থংকর আদিনাথ বা ঋষভনাথ আদিবুদ্ধের মতই পরিগণিত, সৃষ্টির আদি উৎস তাঁর থেকেই। প্রজনন শক্তির মূর্ত প্রতীক বৃষ এ'র লাঞ্ছন হিসাবে পরিগণিত··· ব্রাহ্মণ্য শিবের সঙ্গে এ'র অনেক সাদৃশ্য আছে। হড়প্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক নিদর্শনের মধ্যে বৃষের পোড়ামাটির মূর্তি এবং সীলের গায়ে উৎকীর্ণ বৃষের মূর্তির অনেক সাক্ষাৎ পাই। মনে হয় এই Bull-cult বা বৃষপূজা পরবর্তীকালে জৈন ধ্যান-ধারণা ও পৌরাণিক কাহিনীকে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্য যে সমস্ত প্রতীক তীর্থংকরদের লাঞ্ছন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হয়ত কোন আদিম উপজাতিদের মধ্যে টোটেম বা গোষ্ঠীপ্রতীক রূপে ব্যবহৃত হত এবং সমন্বয়ের ফলে কালক্রমে এই সমস্ত প্রতীক চিহ্ন বা লাঞ্ছন জৈন তীর্থংকরদের লাঞ্ছন হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মহেন-জো-দড়ো থেকে প্রাপ্ত প্রিজ্‌মাকৃতি একটি সীলমোহরের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সীলমোহরের দুই পার্শ্বে যেন প্রাণী জগতের পক্ষ থেকে সারিবদ্ধভাবে বনদেবতাকে অভিবাদনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এই সীলমোহরের উপর হস্তী, গণ্ডার, চিতাবাঘ (?), ব্যাঘ্র, বাইসন, ছাগল, এক অদ্ভুত ও অস্পষ্ট চতুষ্পদ প্রাণী, মুখবিবরের মধ্যে মৎস সহ কুম্ভীর, কূর্ম ও মৎস্য প্রভৃতি প্রাণী খোদিত আছে (Plate No. CXVI, 14, *Mohenjodaro and the Indus Valley Civilisation*, Vol III, Sir John Marshall)। জৈন তীর্থংকরদের লাঞ্ছন হিসাবে এই ধরণের প্রাণীর মধ্য থেকে চয়ন সত্যই ইঙ্গিতপূর্ণ। জৈনদের মধ্যে মাঙ্গলিক চিহ্ন বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত অষ্টমঙ্গল চিহ্নের মধ্যে অন্যতম স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহারও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার সীল বা সীলমোহরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে—হড়প্পার ৩৮৭ নম্বর সীলের পশ্চাদ্দেশে বেষ্টনীর মধ্যে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায় এবং মহেন-জো-দড়োর একটি পোড়ামাটির সীল মোহরের উপরিভাগে বৃক্ষের চিহ্নের পার্শ্বে অনুরূপ স্বস্তিকা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় (Plate No. CXVI. 20, *Mohenjo-daro and Indus ValleY Civilisation*, Vol III, Sir John

Marshall)। এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে এবং এই কারণে অষ্টমাঙ্গলিক প্রতীক হিসাবে জৈন শিল্পকলার মাধ্যমে এই চিহ্নের প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে জৈন তীর্থংকর মূর্তিসমূহের পাদপীঠে এই সমস্ত লাঞ্ছন উৎকীর্ণ করা থাকত না এবং মথুরা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন জৈন মূর্তিসমূহের পাদপীঠে ধর্মচক্রই প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত দেখে ধারণা হয় যে বিভিন্ন প্রতীক বা লাঞ্ছনের প্রয়োগ প্রথমে না হলেও কালক্রমে লোকায়তধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রভাবে পরবর্তীকালে এই সমস্ত চিহ্ন বা লাঞ্ছনের মাধ্যমেই তীর্থংকরদের পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

ভূমধ্য সাগরীয় সভ্যতা, পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার ছোঁয়াচ কিছু কিছু জৈন শিল্পকলার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফার তোরণদ্বারের সম্মুখে উৎকীর্ণ এক ভাস্কর্য শৈলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে (Plate XIVA, *Udayagiri and Khandagiri*, Dabala Mitra, P. 48)। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উৎকীর্ণ এক panel-এর মধ্যে বৃষ ও সিংহের সহিত ক্রীড়া বা সংগ্রামরত মনুষ্যের মূর্তি মহেন-জো-দড়ো থেকে প্রাপ্ত দুইটি ব্যাঘ্রের সঙ্গে সংগ্রামরত মনুষ্যের প্রতীকচিহ্ন খোদিত সীল ও বৃষের সহিত উল্লম্ফনোদ্যত মনুষ্যের মূর্তিখচিত সীলগুলির প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্রীট দ্বীপে মাতৃকা মূর্তির সম্মুখে Bull-Baiting উৎসবের কথা স্মরণ করে Macky এই বিষয় বস্তুর প্রভাব উত্তর কাম্বোডিয়ার আঙ্কোর-এর রাজ-প্রাসাদ-গাত্রে উৎকীর্ণ Bas-relief এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন—তবে ওখানে বন্য মহিষের সহিত ক্রীড়া ও উল্লম্ফন আনন্দোৎসব হিসাবে গণ্য হয়েছে (*Further Excavations at Mohenjodaro*, F. Mackay, p. 657-60)। সুমেরীয় গীলগামেশের (Gilgamesh) সহিত জড়িত অলৌকিক ঘটনাবলী ও কিম্বদন্তীর প্রভাব হড়প্পা সভ্যতার মাধ্যমে ভারতের পূর্ব উপকূলে ভুবনেশ্বর গিরিগাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ভারতীয় ও পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদান প্রদানেরই সাক্ষ্য দেয়; Gebel-el-Arak-এ প্রাপ্ত হস্তীদন্ত নির্মিত ছুরিকার হাতলে খচিত এক মনুষ্যের সিংহের সহিত যুদ্ধের দৃশ্য এবং মিশরের Hierakonpolis-এর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ প্রায় একই ধাঁচের চিত্রাবলী প্রাগৈতিহাসিক মানবের ধ্যান-ধারণা ও লৌকিক কিম্বদন্তীর সমন্বয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিকটবর্তী রাণীগুম্ফার উপরের তলের ভাস্কর্য শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ইউ. পি. সা মহাশয়ের মত বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য: "Of considerable interest however are figures of yavana warrior and two burly individuals on ponderous

animals, the bull-rider being strangely Assyrian in modelling and conception as a whole."

হড়প্পা সভ্যতার বাস্তব নিদর্শনের সঙ্গে জৈন ধর্ম বা মূর্তি শিল্পের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ইঙ্গিত বা আভাস থাকলেও পণ্ডিত গণের মতে এ পর্যন্ত প্রাচীনতম জৈন তীর্থংকরের মূর্তি বিহারের পাটনার নিকটবর্তী লোহানীপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুডৌল ও মসৃণ অবয়ব দেখে এটিকে মৌর্যযুগের নিদর্শন বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিটির আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ইউ. পি. সা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এটি সম্ভবতঃ কোন যক্ষমূর্তির আদর্শে বা নকলে উৎকীর্ণ হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যক্ষপূজা জৈন উপাসনা ও আচারানুষ্ঠানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতে যক্ষপূজার প্রাচীনত্ব এবং যক্ষায়তনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। ভারহুতের বেদিকাগাত্রে নামোল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন যক্ষ আখ্যাধারী লৌকিক দেবতাগণ উৎকীর্ণ থাকতে দেখা যায়। জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ ও আগম শাস্ত্রে ইন্দ্র, রুদ্র, স্কন্দ, বাসুদেব, যক্ষ, ভূত, নাগ এবং বিভিন্ন বৃক্ষ দেবতার উপাসনার উল্লেখ আছে এবং কথিত আছে জৈন তীর্থংকর মহাবীর 'যক্ষায়তনে'র মধ্যে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থান করতেন। বিভিন্ন পর্যায় এবং শ্রেণীর জন সাধারণের বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে এই সমস্ত যক্ষায়তনে আগমন হত এবং স্বভাবতই এই সমস্ত লৌকিক দেবতার সহিত জড়িত আচারানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রভাব জৈন ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপর এসে পড়ে। চৈত্যবৃক্ষতলে আধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে যক্ষপূজা বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে এর উৎপত্তি এবং কালক্রমে লোকায়ত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মূর্তিপূজার মধ্যে এর আশ্রয় হয়েছে। হড়প্পা ও মহেন-জো-দাড়ার সীলগুলির বিভিন্ন motif-গুলি আলোচনা করলে আমাদের এই ধারণা জন্মে (Cf. *New light on the Indus Civilisation*, vol. I [Religion and Chronology], K.N. Shastri) এই সমস্ত লৌকিক ও প্রাকৃতিক বস্তু (Nature Spirits) সমূহের পূজা সম্ভবতঃ দ্রাবিড় সভ্যতা থেকে উদ্ভূত প্রথমে কোন প্রতীক পূজা থেকে কালক্রমে ভক্তিমার্গের মাধ্যমে মূর্তিপূজার কল্পনা আর্য সংস্কৃতির উপর পড়ে। "In particular, the popular Dravidian element must have played the major part in all that concerns the development and offices of image worship that is *puja* as distinct from *yajnas*." জৈন 'উপপাতিক' সূত্রে চম্পানগরীর প্রান্তে পূর্ণভদ্র চৈত্য নামে এক 'পোরাণ' (প্রাচীন) ও চিরাতীত যক্ষায়তনের উল্লেখ আছে। মহাবীর একদা এইস্থানে অবস্থান করেছিলন, কিন্তু

এই স্থানে কোন যক্ষের প্রতিমূর্তি ছিল কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। অবশ্য 'অন্তগডদসাও' নামক জৈন গ্রন্থে মোদ্‌গরপাণি যক্ষায়তনের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ এই স্থানে লৌহমুদ্‌গর হস্তে মুদ্‌গরপাণি যক্ষের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল মনে হয়। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফায় সূর্যের এক প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। সূর্যদেবের রথের নিকটে বাম হস্তে প্রবাহ-নালি যুক্ত জলপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে পতাকা (?) সহ এক লম্বোদর বামনাকৃতি দৈত্যের মূর্তি খোদিত দেখা যায় (Plate XVA, *Udayagiri and Khandagiri,* Debala Mitra, p. 48)। আপাততঃ এই মূর্তিটির কোনও সনাক্তকরণ হয় নাই, মনে হয় এই মূর্তিটিতে কোন যক্ষ প্রতিফলিত হয়েছে এবং হেমাদ্রির যক্ষগণের বর্ণনার সহিত বহুলাংশে এর সাদৃশ্য আছে (তুন্দিলা দ্বিভুজাঃ কার্যা নিধিহস্তাঃ মদোৎকটাঃ)। কালক্রমে এই যক্ষ দেবতা অষ্ট দিকপাল গণের অন্যতম যক্ষ কুবেররূপে পরিগণিত হন। গুপ্তোত্তর যুগে এবং মধ্য যুগের প্রারম্ভে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও উপাসনার প্রভাবে জৈন ধর্মে চতুর্বিংশতি যক্ষ ও যক্ষিণীর কল্পনা প্রতিফলিত হয়। সময় সময় এদের 'উপাসক' বা 'শাসনদেবী' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যযুগের জৈন মন্দির সমূহে এদের নিদর্শন মেলে এবং কালক্রমে এদের মূর্তি কল্পনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথেষ্ট প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির নবমুনি গুম্ফার এদের মূর্তিগুলি সপ্তমাতৃকার মূর্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। আবার স্মরণাতীত কালের শক্তি মন্ত্রের প্রভাবও এই সমস্ত যক্ষ যক্ষিণী ও জিন মূর্তিগুলির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে (Cf. 'Sasanadevis in the Khandagiri Caves', Debla Mitra, *J A.S. Vol I, No. 2., 1956*)। জৈনদের মধ্যে যক্ষপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে বৃক্ষ পূজার কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে হয় কারণ যক্ষ বা অন্য ব্যন্তর দেবতাগণকে কোন কোন বিশেষ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার বাস্তব নিদর্শনগুলি, বিশেষ করে তৎকালীন যুগের সীল, সীলমোহরগুলি অবলোকন করে মনে হয় যে বৃক্ষপূজার উপর সে সময় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত এবং আরও বিশ্বাস হয় যে সময় সময় এই সমস্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের মূর্তিও এই সমস্ত সীলগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে সে যুগের ধর্ম বিশ্বাসকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করেছে। আরও পরবর্তী যুগে মথুরার জৈন শিল্পের মাধ্যমে আমরা রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরা বা বৃক্ষকার পরিচয় পাই। তবে ডাঃ কুমারস্বামীর মতে জৈন সাহিত্যে ও ধর্মগ্রন্থে 'যক্ষ চেতিয়'-এর উল্লেখ সাধারণতঃ বৃক্ষ চৈত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ডাঃ ইউ. পি. সা 'বাসুদেব হিণ্ডি' নামক এক গ্রন্থের মধ্যে অশোক বৃক্ষতলে সুমনো নামক যক্ষের প্রস্তর নির্মিত বেদীর ('সুমনা সলা') উল্লেখ করেছেন, এবং এই শিলা প্রাকারকেই যক্ষস্থানে পূজা করা হত

মনে হয়। পূর্বে পূর্ণভদ্র চৈত্যের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্ভবতঃ ওখানেও কোন যক্ষের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই পূর্ণভদ্র চৈত্যের প্রধান অশোকবৃক্ষটি অষ্ট মাঙ্গলিক, কেতন এবং নানা বর্ণের পতাকা, ঘন্টা, চামর ও পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা শোভিত ছিল এবং এই বৃক্ষটিকেই পবিত্রজ্ঞানে পূজা করা হত। কালক্রমে এই চৈত্য বৃক্ষ থেকেই চৌমুখ বা চতুর্মুখ মন্দিরাকৃতি জৈনদের ছোট ছোট মন্দিরের উৎপত্তি। চৈত্যবৃক্ষের মূলে চারিদিকে চারিটি জিনমূর্তি স্থাপনার উল্লেখ জিনসেনের 'আদিপুরাণ' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই বৃক্ষপূজা আবহমান কাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে এবং এখনও আমাদের গ্রামদেবতাদের স্থান এই বৃক্ষতলেই। জৈন তীর্থংকরগণ বৃক্ষতলেই 'কেবল জ্ঞান' লাভ করেন এবং এই কারণে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের দ্বারা এঁদের প্রত্যেকের পার্থক্য সূচনা করা হয়েছে। জৈন ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে যখনই কোন জৈন তীর্থংকর মূর্তি খোদিত করা হয়েছে সাধারণতঃ তাঁদের মস্তকের উপরিভাগে তাঁদের নিজ নিজ চৈত্যবৃক্ষগুলিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং লোকায়ত ধর্মের প্রভাব এই বৃক্ষপূজার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং জৈন ধর্ম ও ধ্যান ধারণা এর থেকে মুক্ত হতে পারে নি। উড়িষ্যার খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফার তোরণদ্বারের সম্মুখে বৃক্ষপূজার এক দৃশ্য প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে (Plate XIVBK, *Udayagiri and Khandagiri*, Debala Mitra, pp. 48-49)। চতুর্দিকে বেদিকা পরিবেষ্টিত চৈত্যবৃক্ষটী একটী নর ও নারীর দ্বারা পূজিত হতে দেখা যায়। এই motif এর উপরিভাগে উৎকীর্ণ দুইটি সর্পমূর্তি থেকে ধারণা হয় যে দৃশ্যটি তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবনের কোন ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে নাগরাজ ধরণেন্দ্র ও তাঁর মহিষী কর্তৃক জিন পার্শ্বনাথকে রক্ষা করার ঘটনা এই ভাস্কর্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সমকালীন শিল্পরীতি অনুযায়ী জিনমূর্তি খোদিত না করে তার প্রতিভূরূপে চৈত্যবৃক্ষকে পূজা করা হচ্ছে। আম্রবৃক্ষতলে জৈন যক্ষিণী বা শাসনদেবী অম্বিকা বা আম্রার কল্পনা ও ধ্যান বৃক্ষ পূজারই প্রাধান্য প্রকাশ করে।

নাগপূজার প্রভাব জৈনধর্মের মধ্যে তীর্থংকর পার্শ্বনাথের ও পদ্মাবতীর মূর্তি কল্পনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। পূর্বেই জৈন ভাস্কর্যের মাধ্যমে নাগরাজের উপস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গন্ধর্ব, কিন্নর. বিদ্যাধরাদি লৌকিক দেবতাসমূহ জৈন ধর্ম গ্রন্থে ব্যন্তর দেবতা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, বৃক্ষ পূজার সঙ্গে এঁরাও জড়িত আছেন এবং এঁদের কিরীটের উপর বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ শ্রেণীর দ্বারা চিহ্নিত থাকায় মনে হয় এঁরাও বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে পরিগণিত। এই সব লৌকিক দেবতাগণের প্রতিমূর্তি জৈন ভাস্কর্য

শিল্পের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে—খণ্ডগিরির গুহাগাত্রে এদের মাল্য ও পুষ্পপাত্র হস্তে নভোমণ্ডলের মধ্যে সঞ্চরণের দৃশ্যটি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে।

সুখ ও শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রহদেবতাগণের পূজা অর্চনার বিধান 'যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রে' নির্দেশিত আছে এবং প্রাচ্যভারতেই গ্রহ পূজার প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। লোকায়ত ধ্যান-ধারণার প্রভাবে জৈন মূর্তি শিল্পে তীর্থংকরগণের মূর্তিকল্পনার মধ্যে এঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে—প্রথমে অষ্টগ্রহ থেকে নবগ্রহে রূপায়ণ এবং তীর্থংকর মূর্তিসমূহের প্রভামণ্ডলীর মধ্যে গ্রহ দেবতাগণের স্থান প্রাচ্যভারতে গ্রহপূজার প্রাধান্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুখস্বপ্নের উপর বিশ্বাস ভারতে বেশ প্রাচীনকাল থেকেই আছে। স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার জন্য 'নিমিত্ত-পাঠক' নামে এক শ্রেণীর লোক ছিল। এঁরা স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরুদ্ধ হতেন। আজীবিকগণের মধ্যেও 'নিমিত্তশাস্ত্র' বেশ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জৈন তীর্থংকরগণ এবং শলাকা পুরুষগণের জন্মকালীন সময়ে তাঁদের মাতৃগণ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বিবরণী জৈনধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধের জন্মকালীন সময়ে শ্বেত হস্তীর আগমনের স্বপ্নের সঙ্গে জৈন ধর্মে শ্বেতহস্তীর স্বপ্নের অনেক সাদৃশ্য আছে। গজলক্ষ্মী motifটিও ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পবিত্র আসন করে নিয়েছে। প্রাচীন কুসংস্কার ও লোকায়ত ধারণার প্রভাব মহাপুরুষগণের জন্মকালীন স্বপ্ন দেখার ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ভাস্কর্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।

বিভিন্ন উৎসবাদি ও আচার অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রথা পালন করা হত। লোকাচারের এই সমস্ত প্রথার উল্লেখ সম্রাট অশোকের অনুশাসনের মধ্যে উল্লিখিত আছে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা এই সমস্ত লোকাচারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং বিভিন্ন চিহ্নকে মাঙ্গলিক হিসাবে মনোনীত করেন। জৈন 'আয়াগপট' এবং ভাস্কর্যের মাধ্যমে এই সমস্ত শুভচিহ্ন (অষ্ট মঙ্গল) রূপায়িত হয়েছে। প্রাচীন ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। স্বস্তিকাচিহ্নের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। যুগ্ম-মৎস্য চিহ্ন সম্ভবতঃ কন্দর্প-দেবতা পূজা অর্চনার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ণ বা মঙ্গল কলস জীবনের পরিপূর্ণতা, প্রাচুর্য ও অমরত্বের বাণী বহন করে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা (Punch-marked coins) এবং tribal ও local coins-এর উপর এই ধরণের অনেক চিহ্ন অঙ্কিত আছে দেখা যায়। ভারতের লোকায়ত ভাব ধারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ কর্তৃক অনুসৃত হয় এবং তার প্রতিফলন এই সমস্ত মুদ্রা এবং অন্যান্য শিল্প কলার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়।

জৈন 'সমবসরণ' উৎসব প্রাচীন লোকায়ত উৎসব ও আচারানুষ্ঠান দেখে গৃহীত হয়েছে মনে হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেবতা, নর নারী, শ্রাবক শ্রাবকী ও প্রাণী জগতের সমাগম হত এবং নাট্যশালায় নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল। লৌকিক যাত্রানুষ্ঠানের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য আছে এবং মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে জৈন ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারে এইজন্য তীর্থংকর গণের 'কেবল জ্ঞানে'র পরে এই উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়।

প্রাগৈতিহাসিক মানবমনের ধ্যানকল্পনা, লৌকিক দেবদেবীর পূজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব নানা লৌকিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ক্রমে ক্রমে জৈন ধর্ম এবং মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হল তা আমাদের অল্পপরিসর আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হল। পরিব্রাজক বা শ্রাবকগণের আবেদনের মাধ্যমে জন সমক্ষে জৈন ধর্মমত উপস্থাপিত হয়, জনসাধারণের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপনের ফলে লোকায়ত ধ্যান-ধারণা ও আচারানুষ্ঠানের প্রভাব অন্য ধর্ম অপেক্ষা জৈন ধর্মের মধ্যে বেশী প্রতিফলিত হয় বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. Banerjea, J. N.

(a) *The Development of Iconography*, Calcutta, 1956.

(b) 'Jaina Icons'—*History and Culture of the Indian People*, Vol. II. (The Age of Imperial Unity), Bombay, 1960.

(c) 'Jainism—Iconography', *Ibid*. Vol. IV. (The Age of Imperial Kanauj), Bombay, 1955.

2. Bhattacharya, B.C. : *The Jaina Iconography*. Lahore, 1955.

3. Bhattacharya, H.D. : (a) 'Minor Religious Sects'—*History and Culture of the Indian People*, Vol. II.
   (b) 'Religious Syncretism', *Ibid.*, Vol. IV.

4. Chakravarty, D.K. : 'A Survey of Jaina Antiquarian Remains in West Bengal', Brochure on *Jaina Art*, published by the Bharat Jain Mahamandal, Calcutta, 1965.

5. Chanda, R.P. : (a) 'Jaina Antiquities at Rajgir', *Annual Report, Archaeological Survey of India*, 1925-26.
   (b) *Mediaeval Indian Sculptures in the British Museum.*

6. Dasgupta, P.C. : 'Archaeological Discoveries in West Bengal', *Bulletin of the Directorate of Archaeology West Bengal*, No. 1

7. Ghatage, A.M. : 'Jainism'—*History and Culture of the Indian People*, Vol. II.

8. Mazumdar, N.G. : *A Guide to the Sculptures in the Indian Museum*, Part I—'Early Indian Schools,' Delhi, 1937.

9. Mazumdar, R.C. : 'Religion and Philosophy—General Introduction', *History and Culture of the Indian People*, Vol. IV.

10.. Mitra, Debala : *Udayagiri and Khandagiri*, New Delhi, 1960.

11. Pusalkar, A.D. 'Jainism', *History and Culture of the Indian People*, Vol. IV.

12. Ramachandran, T.N. and Jain, Chhotelal : *Khandagiri-Udayagiri Caves*, Calcutta, 1951.

13. Zimmer, H. *The Art of Indian Asia, its Mythology and Transformations*, New York, 1955, Vol. I & II.

14. Coomarswamy, A.K. *History of Indian and Indonesian Art*.

15. ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।

16. Shah, U.P. : *Studies in Jain Art*, Banaras, 1955.

চতুষ্কোণ, মাঘ ১৩৭৬

জৈন তীর্থ পাক্‌বিড়রা

শ্রীদিলীপ রায়

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে, জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলার চরম উৎকর্ষতা শুধুমাত্র পশ্চিম ভারতের এক্তিয়ার ভুক্ত নহে। পূর্ব ভারতীয় শিল্প শৈলীর আদর্শে অনুপ্রাণিত পাক্‌বিড়রার জৈনস্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন আজ এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর জৈনতীর্থ পাক্‌বিড়রার ধ্বংসপ্রাপ্ত অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের অমূল্য সম্পদ। পুরুলিয়া শহরের পূর্বদিকে মাত্র ৪৫ কিঃ মিঃ দূরে সাধারণের পরিচিত পাক্‌বিড়রা গ্রামের 'ভৈরব স্থানে' তান্ত্রিক দেবতা ভৈরবের পরিবর্তে জৈন ধর্মের তীর্থংকর মূর্তি (৮'২"), হিন্দু দেবতা রূপে পূজীত হইতেছেন। জৈন ধর্মের ব্যাপক প্লাবনে প্লাবিত বৃহৎবঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্র পাক্‌বিড়রার ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শনগুলি উন্মোচিত করিবে।

ভৈরব স্থানের নাগর স্থাপত্য শিল্পরীতির তিনটী রেখ দেবদেউল খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর জৈন ধর্মের চরম উৎকর্ষতার পরিচায়ক। ত্রিরথ ভূমি নক্সায় তৈরী দেবদেউলের মস্তক অংশ অর্থাৎ ধ্বজা, কলস, বেঁকি, আমলক শীলা, খুপরি ও ভূমি অংশ নিশ্চিহ্ন। গণ্ডির অভ্যন্তর সহ চতুস্পার্শ্বের প্রাচীর গাত্র ধাপে ধাপে উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। গণ্ডির বাহ্যিক গঠন বাঢ় অংশের বরন্দ হইতে উপরি জঙ্ঘার মধ্যবর্তী অংশের অলংকরণ কালের কবলে নিমজ্জিত। নিম্নজঙ্ঘা হইতে পৃষ্টের মধ্যবর্তী অংশে খুব, উল্টাখুব, কুম্ভ, রহপাগ, কনকপাগ প্রভৃতি অলংকরণ দর্শনীয়। গর্ভগৃহের বেদী, গর্ভমুদার অবশিষ্টাংশ ও বহিস্থ প্রদক্ষিণপথ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাংশের উত্তরমুখী দেবদেউল দুইটির সম্মুখ ভাগে পৃষ্ট স্তরে কর্কটহস্তের ন্যায় ভূমি নক্সার পরিচয় লক্ষনীয়। পশ্চিমাংশের পূর্বমুখী দেবদেউলের উদ্ধার কার্য চলিতেছে। উত্তরমুখী দেবদেউলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি অনাচ্ছাদিত গৃহ এবং সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ উত্তরাংশে প্রস্তর নির্মিত অঙ্গনের চতুষ্কোণে নিরেট প্রস্তর নির্মিত ঘট-পল্লব ও মধ্যভাগে একটি প্রতিষ্ঠিত গোলাকৃতি স্তম্ভ লক্ষণীয়।

পাক্‌বিড়রার উদ্ধার প্রাপ্ত মূর্তিগুলি যথাক্রমে তীর্থংকর ঋষভদেবের দশটি, চন্দ্রপ্রভর দুইটি, শান্তিনাথের একটি, পার্শ্বনাথের একটি, মহাবীরের একটি, লাঞ্ছন বিহীন তীর্থংকরের বারটি, ৩৬৫ জন তীর্থংকর সহ ফলক একটি, জৈন দেবী একটি, দেবী অম্বিকার একটি, জৈন শাসন দেব ও দেবীর চারিটি, ক্ষুদ্রকায় জৈন মন্দির ছয়টি এবং অগণিত ভগ্ন জৈন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ।

অবৈদিক ধারার প্রধান শাখা জৈন ধর্মের ২৪ জন তীর্থংকরের সকলেই রাজকুলোদ্ভূত এবং দুই জন ব্যতীত সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ২০ জন তীর্থংকরই পশ্চিমবঙ্গের (বৃহৎবঙ্গের) নিকটবর্তী বর্তমান বিহার প্রদেশের হাজারীবাগ জেলার পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেৎ শিখরে) নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

জৈন ধর্মের আদি প্রবর্তক ঋষভদেব বা আদিনাথ। অষ্টাপদ পাহাড়ে তাঁহার তিরোধান হয়। তাঁহার লাঞ্ছন বৃষ। ভাগবতে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

অষ্টম তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভ রাজা মহাসেন ও রাজ্ঞী লক্ষ্মণার পুত্র। তাঁহার বর্ণ শ্বেত এবং লাঞ্ছন চন্দ্র। তিনি সমেৎ শিখরে তিরোধান করিয়া ছিলেন।

ষোড়শতম তীর্থংকর শান্তিনাথ রাজা বিশ্বসেন ও রাজ্ঞী অচিরার পুত্র। তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল এবং লাঞ্ছন মৃগ। তিনি সমেৎ শিখরে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্বিংশতিতম তীর্থংকর মহাবীর বা বর্দ্ধমান রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র। তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল এবং লাঞ্ছন সিংহ। তিনি ৫৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আবির্ভূত হইয়া ৪৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিহারের পাবা পুরীতে নির্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে মূর্তিগুলির আংশিক বর্ণনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে। নির্দিষ্ট লাঞ্ছন ভিন্ন সকল তীর্থংকর মূর্তির রূপ একই প্রকার।

নগ্ন তীর্থংকর কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে ত্রিরথ বেদীর উপরিস্থিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। মস্তক বৃক্ষের (আম্রবৃক্ষ বা অশোক বৃক্ষ) ছত্র ছায়ায় আচ্ছাদিত। মুখাবয়বে আনন্দ-সুন্দর মৌন অভিব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত। কেশবিন্যাস জটা-জুটাকারে স্কন্ধে অবলুণ্ঠিত (অথবা পশমবৎ কুঞ্চিত কেশরাশি উষ্ণীষ দ্বারা অলংকৃত)। তীর্থংকরের দুই পার্শ্বের চামর আন্দোলন রত চামরধারীর বেশ ও অলংকার বিগত যুগের ঐতিহাসিক উপাদান। বেদীর মধ্যাংশে লাঞ্ছনের দুই পার্শ্বে দুই অনুগত সিংহ। বেদীর নিম্নাংশে ভক্তবৃন্দ অঞ্জলি মুদ্রায় উপাসনা রত। আয়তাকার প্রস্তর ফলকের (তীক্ষ্ণাগ্র ফলকের) উর্দ্ধাংশে মাল্য (রত্ন বা কিরীট) বাহক দুই উদয়োন্মুখ বিদ্যাধর (বিদ্যাধরী বা যুগল মূর্তি)। ফলকের মধ্যাংশে মূলমূর্তির দুই পার্শ্বে ২৪টি (৮টি বা ৪টি) যুগল নগ্ন তীর্থংকর সারিবদ্ধ ভাবে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথ রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাদেবীর পুত্র। ৮৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সমেৎশিখরে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ নীল এবং লাঞ্ছন সর্প।

তীর্থংকর পার্শ্বনাথ পদ্মের উপর ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট এবং সাতটি সর্পের ছত্র ছায়ায় আচ্ছাদিত। দুই চামর ধারী তাঁহার দুই পার্শ্বে চামর আন্দোলন রত। আয়তাকার

ফলকের উর্দ্ধাংশে দুই উদয়োন্মুখ বিদ্যাধর মাল্য বাহক। বেদীর মধ্যাংশের সর্পলাঞ্ছনের দুই পার্শ্বে দুই অনুগত সিংহ।

একটি বৃহৎ আয়তাকার ফলকের অবশিষ্টাংশে ৩৬৪ জন নগ্ন তীর্থংকর সান্নিবদ্ধ ভাবে উর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশ পর্যন্ত কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। একটি মাত্র তীর্থংকর ফলকের উর্দ্ধাংশে ধ্যান মুদ্রায় উপবিষ্ট।

জৈন দেবী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। দক্ষিণ হস্তের আয়ুধ নিরূপণ অসম্ভব। দেবী বামহস্তে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করিতেছেন। দেবীর বেশ ও অলংকার দশম বা একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক উপাদান। আয়তাকার ফলকটির উর্দ্ধাংশে পঞ্চ-তীর্থংকর ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট। বেদীর নিম্নাংশে দুই ভক্তবৃন্দ অঞ্জলি হস্তে উপাসনারত।

নেমিনাথের যক্ষী দেবী অম্বিকা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে আম্রবৃক্ষের ছত্র ছায়ায় দণ্ডায়মান। দেবীর কেশ বিন্যাস করন্দমুকুট দ্বারা আবদ্ধ। দেবীর বেশ ও অলংকার দশম শতাব্দীর সাক্ষীরূপ। তীর্থংকর নেমিনাথ দেবীর সিঁথিতে ধ্যানমগ্ন। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষ মূর্তি দণ্ডায়মান। আয়তাকার ফলকের উর্দ্ধাংশে দুই মাল্য বাহক বিদ্যাধর। বেদীর নিম্নাংশে দুই আনত সিংহ।

জৈন শাসনদেব ও দেবী অর্দ্ধ পর্যংকাসনে অশোক বৃক্ষের ছত্র ছায়ায় উপবিষ্ট, পুরুষ মূর্তির দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রায় এবং বামহস্ত ঊরুর উপর স্থাপিত। দেবীমূর্তির বাম অংকে সন্তান উপবিষ্ট। দেবীমূর্তির কেশ বিন্যাস ধাম্মিল্লা গঠন প্রণালীতে নিবদ্ধ। দেবীর উব্বসূত্র, কর্ণকুণ্ডলী, মণিবন্ধ, বাজুবন্ধ এবং পুরুষ মূর্তির কিরীট ও বেশ বিগত শতাব্দীর পরিচায়ক। আয়তাকার ফলকের উর্দ্ধাংশে দুই উদয়োন্মুখ বিদ্যাধর। বেদীর নিম্নাংশে সন্তান সহ উপবিষ্ট সপ্ত মাতৃ মূর্তি।

ক্ষুদ্রাকার জৈন দেবদেউলের কলস, বেঁকী, আমলক, খুপরি, ভূমি, এবং বাঢ় অংশের বরন্দ, জন্মা, পৃষ্টর স্থাপত্যরীতি দর্শনীয়। গম্ভীর রহপাগরে সকল কুলুঙ্গীর মধ্যে তীর্থংকরের আসন ও স্থানক—এক বা ততোধিক মূর্তির সমাবেশ। বাঢ় অংশের চারটি কুলুঙ্গীতে একটি করিয়া তীর্থংকরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনরাজ

[গুজরাত কাহিনী]

সে অনেক কাল আগের কথা। গুজরাত যখন গুজরাত রূপে পরিচিত হয় নি, যখন তা কান্যকুব্জের আর দশটি পরগণার মত একটি পরগণা মাত্র ছিল সেদিন গুজরাতের বাঢ়িয়ার জেলার পঞ্চশর গ্রামে চাপোৎকট বংশের এক দুখিনী বিধবা বাস করত। ছ'মাসের ছোট্ট একটি ছেলে ছাড়া সংসারে আপন বলতে তার আর কেউ ছিল না। ছেলেটির জন্মের কিছুদিন পরেই তার স্বামী মারা যায়। সেদিন সে হয়ত তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেত কিন্তু ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে তা সে পারে নি। তাকে বড় করে তুলবার দায়িত্ব যে এখন তারই। নিজের জন্য যেমন তেমন কিন্তু ছেলেটির জন্য এখন তাকে বনে কাঠ কুড়োতে যেতে হয়। সামান্য কাঠ। সেই কাঠ কুড়িয়ে এনে ফিরি করে গ্রামে সে বিক্রী করে। তাতে যে দু' পয়সা পায় তাই দিয়ে সংসার চালায়।

সকাল হতে না হতেই সে বনে কাঠ কুড়োতে যায়। সেখানে কত রকমের গাছ, কত রকমের লতা, গুল্ম। সকালের হিমেল বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ ভাসে। না, ঘরের তার কোনো আকর্ষণ নেই। ছেলেটিকে পিঠে করে বেঁধে নিয়ে আসে। বনে এসে সেই কাপড় ঝোলার মত করে গাছের ডালে বেঁধে দেয়। তারপর ছেলেটিকে তাতে শুইয়ে দিয়ে সারাদিন কাঠ কুড়োয়। ছেলেটি কেঁদে উঠলে বুকের দুধ খাওয়ায়, নিজের খিদে পেলে বাজরার শুকনো রুটি যা সে সঙ্গে নিয়ে আসে ঝরণার জলে তা ভিজিয়ে খায়। ঘুম পেলে গাছের তলায় আঁচল পেতে একটুখানি ঘুমিয়ে নেয়। তারপর সন্ধ্যা হতে সেই ছেলেটিকে পিঠে বেঁধে কাঠের বোঝা মাথায় করে গ্রামে ফিরে আসে। যেসব ঘরে কাঠের যোগান দেবার থাকে সে সব ঘরে যোগান দেয়। যে দু'চার পয়সা পায় তাই দিয়ে বাজরা কিনে আনে। তারপর চাকিতে তা পিসে চারখানা মোটা মোটা রুটি তৈরী করে। দু'খানা রুটি একটুখানি 'শক্কর' বা লবণ দিয়ে খায়। বাকি দু'খানা সকালের জন্য তুলে রাখে। এমনি করে তার দিন যায়।

এমনি একদিন ছেলেটিকে যখন সে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে কাঠ কুড়াচ্ছিল, সেদিন সেই বনের পথ দিয়ে এলেন এক জৈন আচার্য। নাম শীলগুণ সূরি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সেই গাছের উপর পড়লো যার ডালে ঝোলা ঝুলছিল। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। তাই গাছের ছায়া তীর্যক হয়ে পড়বার কথা কিন্তু যখন আর আর

গাছের ছায়া তীর্যক হয়ে পড়েছে তখন সেই গাছের ছায়া স্থির হয়ে আছে। দেখেই তিনি বুঝলেন ঝোলায় যে ছেলেটি শুয়ে রয়েছে এ তারই পুণ্যে—যাতে তার চোখে মুখে রোদ না লাগে। শীলগুণ সূরী তখন ভাবলেন ছেলেটি কালে একজন প্রভাব শালী ব্যক্তি হবে। তাই যদি একে আমি এখন উপাশ্রয়ে নিয়ে যাই ও সেখানে বড় করে তুলি তবে একে নিয়ে জৈন ধর্ম প্রচারের অনেক সুবিধে হবে—কে জানে কালে ও একজন বড় আচার্যওত হতে পারে।

শীলগুণ সূরী তাই ছেলেটির মা'র কাছে গিয়ে ছেলেটিকে নিজের জন্য চাইলেন। কিন্তু মা তাঁর ছেলেটিকে প্রথমে তাঁকে দিতে চাইলে না কিন্তু যখন দেখলে তাইতে ছেলের ভালো তখন তাকে তাঁর হাতে তুলে দিলে। শীলগুণ সূরি ছেলেটিকে সাধ্বী বীরমতীর হাতে তুলে দিলেন। যাবার আগে গ্রামের লোকদের বলে তার মায়ের একটা বৃত্তির ব্যবস্থাও করে দিয়ে গেলেন যাতে তার কোনো কষ্ট না হয়। আর বন গাছের ডালে সেই ছেলেটিকে প্রথম দেখেছিলেন বলে তার নাম দিলেন বনরাজ।

বনরাজ সেই হতে সাধ্বী বীরমতীর কাছে বড় হতে লাগল।

বনরাজের যখন লেখাপড়া শেখার বয়স হল তখন বীরমতী তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন কিন্তু বনরাজের লেখাপড়া শেখার চাইতে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই বেশী পছন্দ। তাই ফাঁক পেলেই সে উপাশ্রয় হতে পালিয়ে আসে। তারপর বন বাদাড়ে ফড়িং প্রজাপতির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, পাখীর বাসায় হাত দেয়, গাছের ডালে দোল খায়। ঝিলের জলে গা ভাসিয়ে স্নান করে। বীরমতী সে সবের কিছু কিছু জানতে পারেন, কিছু কিছু জানতে পারেন না।

ক্রমে সে আরো বড় হয়। বীরমতী তাকে আচার বিচারের শিক্ষা দেন কিন্তু সে কিছু যে শেখে তা মনে হয় না। যতক্ষণ তিনি সামনে থাকেন ততক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকে কিন্তু যেই তিনি একটু অন্য দিকে যান অমনি সে ছুটে পলায়। শাসন করেন কিন্তু সে শাসনে কাজ হয় না।

এর মধ্যে দেখা দিয়েছে আর এক নূতন উপসর্গ। বনে বনে ঘুরবার সময় তার এক ভীল বালকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার হাতে কী সুন্দর তীর ধনুক। তারও ওই রকম তীর ধনুক চাই। একদিন সে সেকথা বলল বীরমতীকে। বীরমতী শুনে কানে আঙুল দিলেন। বললেন, তুই না সাধু। তুই তীর ধনুক নিয়ে কি করবি ?

কিন্তু বনরাজ তাতে দমিত হল না। সারাদিন গাছের তলায় বসে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ধনুক তৈরী করল। কিন্তু তীর ? বাঁশের কঞ্চিতে তীরের কাজ হয় না। কঞ্চির মুখে লোহার ফলা চাই। লোহার ফলা এখন সে কোথায় পায় ?

সেই ভীল বালকই যখন বনরাজের সেই ধনুক দেখল তখন লোহার ফলাই নয়, সত্যিকার তীর ধনুক এনে দিল। সত্যিকার তীর ধনুক পেয়ে বনরাজের সে কি

আনন্দ। তারপর তীর ধনুক নিয়ে দুই বন্ধুতে শিকার করতে বেরুল।

কিছুদিন যেতে না যেতে বনরাজের শিকারে বেশ পাকা হাত হল। সেও এখন এক তীরে ভীল বালকের মত হরিণ, বরা কি পাখী মারতে পারে। কিন্তু সেসব কিছু সে উপাশ্রয়ে আনতে পারে না। ভীল বালককে দিয়ে দেয়। তীর ধনুক গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখে।

বীরমতী বনরাজের উপাশ্রয়ের বাইরে যাওয়া এবারে পুরোপুরি বন্ধ করতে চাইলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, লেখাপড়া না করিস না কর, উপাশ্রয়ে দেবপূজার জন্য কত শষ্য আসে ইঁদুরের হাত হতে তা রক্ষা কর।

বনরাজ সেকথা শুনে তখুনি বাইরে ছুটে গেল ও গাছের কোটরে লুকোনো তীর ধনুক এনে ইঁদুর মারতে আরম্ভ করল। তাই দেখে বীরমতী হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কি করিস তুই? কি করিস তুই?

বনরাজ বলল, দণ্ড ছাড়া এদের আর কোনো উপায়ে নিবৃত্ত করা যাবে না।

বীরমতী এবার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ ছেলেকে নিয়ে তিনি কী করবেন? তাই তিনি সমস্ত কথা গিয়ে আচার্যকে নিবেদন করলেন। আচার্য যখন দেখলেন যে সে প্রভাবক আচার্য হবে না, রাজা হবে, তখন তাকে নিয়ে গিয়ে তার মা'র কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়ে এলেন।

মা তখন সেই গ্রাম ছেড়ে এক পল্লীতে গিয়ে তার ভায়ের কাছে বাস করছিল। বনরাজ এখন তাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

বনরাজ কিছুদিন যেতে না যেতে তার মামার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবার কারণ ছিল। কারণ তার মামা ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করত। বনরাজ এখন তার সাকরেদ হল। তার মামা এখন যেখানে ডাকাতি করতে যায় বনরাজকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। বনরাজেরও এসব কাজে খুব উৎসাহ। কত সোনাদানা কত ধনরত্ন তারা লুট করে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ঘোড়ায় চড়াও সে অভ্যেস করে নিয়েছে। সঙ্গীও জুটে গেছে তার কয়েক জন। বনরাজের সাহসে বীরত্বে মামাও খুব খুসী। এখন বনরাজকেই সে একা একা ডাকাতি করতে পাঠিয়ে দেয়।

বনরাজ ডাকাতি করে। লোকজন খুন জখমও করে কিন্তু সব সময় তার মনে একটা ইচ্ছা জেগে থাকে—সে রাজা হবে। কারণ সেই কথাই তাকে ফিরিয়ে দেবার সময় শীলগুণ সূরি বলেছিলেন। তাই সে ছোট কাজ করে না—ডাকাতি করা কি ছোট কাজ? না। এতো সাহসের কাজ। তাছাড়া ছোটখাট রাজাও ত সে হয়ে পড়েছে। তার অনুচরেরা তাকে যে রাজা বলে ডাকে।

বনরাজ ডাকাতি করে কিন্তু রাজা হবার স্বপ্ন দেখে।

একবারের কথা। কাকর গ্রামে সে ডাকাতি করতে গেছে। বণিকের ঘরে

সিঁধ দিয়ে সে অনেক ধনরত্ন লুট করেছে। রাতের অন্ধকারে হাঁড়িতে কুঁড়িতে হাত দিতে গিয়ে সে সহসা দইয়ের হাঁড়িতে হাত দিয়ে ফেলেছে। বনরাজ এমন বেকায়দায় আর কখনো পড়েনি। সে হাত ধুয়ে তখন তখনি তার দল বল নিয়ে চলে গেল। সেই বাড়ীর একটী পয়সাও ছুঁল না।

দরজার ফাঁক দিয়ে এর সমস্ত কিছু দেখল বণিকের বোন শ্রীদেবী। তার কেমন যেন খটকা লাগল। এত যেমন তেমন ডাকাত নয়। তাছাড়া বনরাজের সুন্দর চেহারা দেখে তার মনে হয়ত একটু মায়াও হয়েছিল। তাই সে তার সন্ধান নিয়ে পরদিন রাত্রে গোপনে তাকে ডেকে পাঠাল। বনরাজ এলে ভাইয়ের মত তার আদর করে তাকে কাছে বসিয়ে জিগ্যেস করল, ভাই কাল তুমি সমস্ত ধন লুটে নিয়েও কিছু না নিয়ে চলে গেলে কেন ?

বনরাজ প্রত্যুত্তর দিল, যার ঘরে হাত ধুয়েছি তার ঘরে ডাকাতি করতে পারি না। হাত ধোওয়া অর্থ খাওয়া।

শুনে শ্রীদেবীর চোখে জল এল। বলল, বনরাজ, আজ হতে তুমি আমার ভাই। বলে সে তাকে আদর করে খাওয়ালো, পরবার কাপড় দিল। বনরাজের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। সে তাকে বলল, বোন, আমার কোনো বোন ছিল না, আজ হতে তুমি আমার বোন। আমি যখন রাজা হব তুমি তখন আমার কপালে রাজটীকা এঁকে দেবে।

আর একদিনের কথা। বনরাজ ডাকাতি করতে যাচ্ছে। সঙ্গে তিনজন সঙ্গী। তার সঙ্গীরা পথের মধ্যে এক বণিককে ঘিরে ফেলেছে। নাম তার জাম্বা।

জাম্বার কাছে পাঁচটি তীর ছিল। তিনজন ডাকাতকে তাকে ঘিরতে দেখে তার পাঁচটি তীরের দুটী তীর সে ভেঙ্গে ফেলল। তাই দেখে ডাকাতেরা তাকে দুটী তীর ভেঙে ফেলার কারণ জিগ্যেস করল।

জাম্বা বলল, তোমরা মাত্র তিনজন তাই পাঁচ তীরের কি প্রয়োজন আমার তিনটি তীরই যথেষ্ট বলে সে তীর ছুঁড়ে উড়ন্ত এক পাখীকে মাটিতে ফেলে দিল। তাই দেখে খুসী হয়ে তারা তাকে বনরাজের কাছে নিয়ে গেল। বনরাজ সমস্ত শুনে তাকে ছেড়ে দিল। বলল, ভাই তুমি খুব ভাল তীরন্দাজ। আমি যখন রাজা হব তখন তোমাকে আমার মন্ত্রী করে নেব।

তারপর বনরাজের রাজা হবার স্বপ্ন সত্যি একদিন সফল হল।

আগেই বলেছি গুজরাত রাজ্য তখন কান্যকুব্জের অধীন ছিল। কান্যকুব্জের রাজা তাঁর এক মেয়ের বিয়েতে সেই রাজ্য তাঁর জামাতা পঞ্চকুলের রাজপুত্রকে যৌতুক দিলেন। পঞ্চকুলের রাজপুত্র কর আদায় করতে গুজরাত রাজ্যে এলেন। সেখানে এসে বনরাজের নাম ডাক শুনে তাকে নিজের রক্ষীবাহিনীর সেনানায়ক করে নিলেন।

তারপর যখন ছমাস পরে কর আদায় করে ২৪ লক্ষ চাঁদির টাকা ও ৪ হাজার তেজী ভালো ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন বনরাজ সৌরাষ্ট্রের কাছে তাঁকে নিহত করে তাঁর সমস্ত ধন রত্ন ঘোড়া হাতী অধিকার করে নিল। পঞ্চকুল বা কান্যকুব্জ হতে সৈন্য আসে এই ভয়ে সে এক বছর জঙ্গলে জঙ্গলে লুকিয়ে রইল। তারপর রাজ্যপত্তন করে রাজধানী স্থাপনের জন্য ভালো জায়গার সন্ধানে চারদিকে লোক পাঠাল।

পীপলুলা সরোবরের তীরে নিম গাছের নীচে বসে ভারুয়াড় সখেড়ার ছেলে অণহিল্ল মেঠো সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল বনরাজের লোকের ওপর যারা উপযুক্ত মাটির সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে তাদের কাছে গিয়ে বলল, এখানে তোমরা কি খুঁজছ? তারা বলল, আমরা নগর বসানোর উপযুক্ত জমির সন্ধান করছি। সে বলল, সেরকম জমির সন্ধান আমি দিতে পারি যদি আমার নামে সেই নগরের নাম রাখ। বলে সে তাদের জালি গাছের নিকট নিয়ে গিয়ে যে জমিতে খরগোস দেখে কুকুরেরা ভয়ে পালিয়ে যেত সেই জমি দেখিয়ে দিল।

সেই জমি পছন্দ হওয়ায় বনরাজ সেইখানে নূতন নগর পত্তন করল ও তার নাম রাখল অণহিল্ল পুর।

দেখতে দেখতে যেখানে শুধু মাঠ পড়েছিল সেখানে এক বিরাট সহর গড়ে উঠল। সেই জালি গাছের কাছে নূতন রাজবাড়ী হল। তার পর এক শুভ দিন দেখে বনরাজ সিংহাসনে বসল। ৮০২ বিক্রমাব্দের বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়ায় তার রাজ্যাভিষেক হল। রাজ্যাভিষেকের সময় সে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। কাকর গ্রাম হতে সে শ্রীদেবীকে ডাকিয়ে আনাল। সে বনরাজের কপালে তিলক এঁকে দিল। জাংবা বণিকও এল। সে প্রধানমন্ত্রী হল। আর এলেন শীলগুণসূরি। বনরাজ শীলগুণসূরিকে সিংহাসনে বসিয়ে সমস্ত গুজরাত রাজ্য তাঁকে দান করে দিল। শীলগুণসূরিত রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন না তাই সেই রাজ্য তিনি বনরাজকেই আবার ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর হয়ে ন্যায়ের জন্য ধর্মের জন্য সেইরাজ্য পরিচালনা করতে বললেন। বনরাজ নিজের গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পঞ্চসর গ্রামে পঞ্চসর চৈত্য নির্মাণ করিয়ে সেখানে পার্শ্বনাথ প্রতিমা স্থাপিত করল। গুজরাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সেই হল শুরু।

মেরুতুঙ্গাচার্যের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' অবলম্বনে

প্রজ্ঞাচক্ষু পণ্ডিত সুখলাল সাংঘবী

বিগত ২ মার্চ জৈন ও ভারতীয় দর্শনের প্রখ্যাত বিদ্বান পণ্ডিত সুখলালজী ৮৮ বছর বয়সে আহমদাবাদে পরলোক গমন করেছেন। যদিও তাঁর মৃত্যু পরিণত বয়সেই হয়েছে তবু তাঁকে হারিয়ে জৈন বাঙ্ময় তার এক অনন্য সেবককে হারাল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর সৌরাষ্ট্রের লিমলি নামে এক ছোট্ট গ্রামে সুখলালজীর জন্ম হয়। যখন তাঁর বয়স মাত্র সাত, যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় পারিবারিক কারণে লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁকে দোকানে বসতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু যে জীবন বিধাতা তাঁর জন্য প্রস্তুত করেননি সে জীবন তাঁর অধিক দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ষোল বছর বয়সে এক দুঃখদ ঘটনায় তাঁর সেই জীবন শেষ হয়ে যায় ও সুরু হয় তাঁর আপন জীবন। সেই দুঃখদ ঘটনা হল বসন্ত রোগে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সে আঘাত তাঁর নিজের পক্ষেও যেমন গুরুতর ছিল তেমনি গুরুতর ছিল তাঁর পরিবারের পক্ষেও। তবু তা তরুণ সুখলালকে দমিত করে নি। বাইরের আলো নিভে গেলেও তাঁর অন্তরের আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় খুঁজে পেলেন তিনি তাঁর আপন জীবন। জাগ্রত হল তাঁর মনে জ্ঞানের পিপাসা—সে জ্ঞান যেখান হতে আসুক না কেন যেমন করেই আসুক না কেন তাঁকে পেতে হবে। তিনি জৈন ছিলেন। তাই উপাশ্রয়ে গিয়ে জৈন সাধুদের নিকট হতে জৈন ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে গ্রামের সংকীর্ণ সীমায় যতটুকু জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিল ততটুকু জ্ঞান আহরণ করে তিনি আরো জ্ঞান লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বুঝলেন যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পূর্ণজ্ঞানের জন্য চাই তাঁর সংস্কৃতের ওপর পূর্ণ অধিকার। এবং সেই জ্ঞান চর্চার তখন প্রধান কেন্দ্র ছিল বারাণসী। জ্ঞানান্বেষী সুখলাল তাই নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও চলে এলেন বারাণসী। দৃষ্টিশক্তিহীন সুখলালের সেই জ্ঞান পিপাসা সকলকে আকৃষ্ট করল, মুগ্ধ করল তাঁর মেধা ও একাগ্র অভিনিবেশ। বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করে ন্যায়, দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভের জন্য সুখলাল এলেন মিথিলায়। মিথিলায় তিনি কয়েক বছর কাটিয়ে দিলেন। এভাবে জীবনের ষোল বছর জ্ঞানের আহরণে তিনি নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে দিলেন। এই নিঃশেষ দেওয়ায় মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি জৈন

তথা ভারতীয় ন্যায়, ধর্ম ও দর্শনের প্রমুখ বিদ্বানরূপে বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট পরিচিত হলেন।

অধ্যয়নকে তপস্যা রূপে গ্রহণ করলেও সুখলালজী দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে একেবারে চিন্তা করতেন না তা নয়। সেই সময় ছিল গান্ধীজীর যুগ। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তাধারা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি মহাবীর কথিত সর্বোদয় ও অহিংসার নূতন রূপ দেখতে পেলেন। তাই তিনি গান্ধীজীর অনন্য অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে গেলেন। মিথিলা হতে তিনি সবরমতী আশ্রমে এসে আশ্রমিক জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন। আশ্রমজীবন ও গান্ধীজীর সাহচর্য তাঁর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে দিল যে দর্শনের উদ্দেশ্যই হল সমাজকে দর্শনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারা পুনর্গঠিত করা। ধর্মের পরিপূর্ণতার জন্য চাই সর্বোদয়।

জাতীয় শিক্ষা দিবার জন্য যখন গুজরাট বিদ্যাপীঠের স্থাপনা হয় তখন তিনি গান্ধীজীর আহ্বানে এই বিদ্যাপীঠে একজন অধ্যাপক রূপে যোগ দিলেন। এই বিদ্যাপীঠে তখন তাঁর সহকর্মী ছিলেন সর্বশ্রী কাকা কালেলকর, আচার্য জে. বি. কৃপালনী, কিশোরলাল ঘনশ্যাম মশরুবালা, নানাভাই ভাট, পণ্ডিত বেচরদাসজী ও মুনি জিন বিজয়জী। গুজরাট বিদ্যাপীঠে অবস্থান কালেই তিনি পণ্ডিত বেচরদাসজীর সহযোগিতায় সিদ্ধসেন দিবাকরের প্রখ্যাত ন্যায় গ্রন্থ 'সন্মতি তর্কে'র সম্পাদন করতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Dr. Jacobi ও Prof. Leumann এই গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহের ডাক দেন তখন তাতে যোগ দেবার জন্য সুখলালজী উৎসুক হয়ে ওঠেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীনতার জন্য সেই আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে পারেন নি। তা হতে তাঁকে বিরত থাকতে হয়। সেই অবসরের তিনি সুব্যবহার করেন ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করে যাতে পাশ্চাত্য দর্শনের গ্রন্থ তিনি সরাসরি বুঝতে পারেন।

১৯৩৩ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈন দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও দশ বছর সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নূতন গবেষণার্থীদের মনে যে কেবল অনুপ্রেরণাই জাগাতেন তাই নয়, তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিতও করতেন যার ফলে তাঁদের অবদানে প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আহমদাবাদে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন তবু তিনি তখনও তরুণ গবেষণার্থীদের সক্রিয়ভাবে গবেষণায় সাহায্য করতেন। সত্যি বলতে কি তিনি

যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই বইত জ্ঞানের আবহাওয়া। ডাঃ উপাধ্যের ভাষায়, 'সুখলালজী ছিলেন জৈন দর্শনের একজন মর্মজ্ঞ পণ্ডিত। সেই জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন ভারতীয় বিদ্যা ও চিন্তাধারার উদার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্র ছিল ধর্ম জাতি দেশ ও সম্প্রদায় দ্বারা অস্পৃষ্ট। তাঁর চিন্তাপ্রণালী ছিল দেশ কাল পরিচ্ছন্ন, অখণ্ড ও অবিভাজ্য। তিনি ছিলেন জ্ঞানের আলোক বর্তিকা যা অন্যের প্রাণে জ্ঞানের পিপাসা প্রজ্বলিত করত। যেখানেই তিনি অবস্থান করতেন সেইখানেই জ্ঞানের অবাধ আবহাওয়া প্রবাহিত হত।' পণ্ডিতজী দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন আমাদের অনেকের চেয়ে বেশী চক্ষুষ্মান। কারণ তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা-চক্ষু। এবং এই প্রজ্ঞাচক্ষুত্বের জন্যই তিনি তাঁর কালকে প্রভাবিত করে গেছেন। টি. আর. ভি. মূর্তি ঠিকই বলেছেন, 'বিগত ৪০ বছরেরও ওপর পণ্ডিতজী তাঁর গভীর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য করে গেছেন।'

১৯৫৭ সালে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য বম্বেতে এক সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়। সেই সভায় পৌরহিত্য করেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। কেবল জৈন ন্যায় ও দর্শনই নয়, ভারতীয় ষড়দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের ওপর পণ্ডিতজীর অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন। সেই বছরই গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানীয় ডাঃ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানীয় ডি. লিট্ উপাধি প্রদান করে।

এদিকে কিছুদিন যাবৎ তাঁর স্বাস্থ্য ভাল চলছিল না তবুও তিনি মানষিক ভাবে ছিলেন সদা সজাগ। যাঁরাই তাঁর সম্পর্কে এসেছেন তাঁরাই তাঁর চিন্তাশক্তির ক্ষুর-ধারতা ও ব্যাপকতায় সেই সময়ও বিস্মিত হয়েছেন।

তিনি প্রায় ২৫ খানি বই-এর অনুবাদ, সম্পাদন বা রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধসেন দিবাকরের 'সন্মতি তর্ক', হেমচন্দ্রাচার্যের 'প্রমাণ মীমাংসা' ও উমাস্বাতীর 'তত্বার্থসূত্র'। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা হিন্দী ও গুজরাতী রচনার সংগ্রহ 'দর্শন ও চিন্তন' ৩ খণ্ডে প্রকাশিত করা হয়েছে।

তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা দেবার সময় তাঁকে যে এক লক্ষ টাকার অনুদান দেন সেই একলক্ষ টাকার তিনি একটি স্বতন্ত্র ট্রাস্ট করে দেন। মুখ্যতঃ সেই ট্রাস্টের টাকায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম প্রগতিমূলক একটি জৈন গবেষণা কেন্দ্র যেখানে বহু তরুণ বিদ্যার্থী গবেষণার সুযোগ পান এবং যেখান হতে তাঁদের গবেষিত গ্রন্থ প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

পণ্ডিত সুখলালজীর মত মানুষ একালে কেন সর্বকালেই দুর্লভ।

পণ্ডিতজী কর্তৃক অনুদিত, সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থের তালিকা

১। আত্মানুশাস্তিকুলক, মূল প্রাকৃত, গুজরাতী অনুবাদ ও টিপ্পণ সহ, ১৯১৪-১৫।

২-৫। কর্মগ্রন্থ ৪ ভাগ, মূল প্রাকৃত দেবেন্দ্র সূরিকৃত, হিন্দী অনুবাদ, বিবেচন, প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা, ১৯১৫-২০।

৬। দণ্ডক, মূল প্রাকৃত, হিন্দী সংক্ষিপ্ত সার সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা ১৯২১।

৭। পঞ্চপ্রতিক্রমণ, জৈন আচার বিষয়ক গ্রন্থ, মূল প্রাকৃত, হিন্দী অনুবাদ, বিবেচন ও প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা, ১৯২১।

৮। যোগদর্শন, মূল পাতঞ্জল যোগসূত্র, বৃত্তি উপাধ্যায় যশোবিজয়কৃত ও হরিভদ্র সূরিকৃত প্রাকৃত যোগ বিংশিকা, সংস্কৃত টীকা উপাধ্যায় যশোবিজয়, হিন্দী সংক্ষিপ্তসার, বিবেচন ও প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা, ১৯২২।

৯। সন্মতি তর্ক, মূল প্রাকৃত সিদ্ধসেন দিবাকরকৃত, সংস্কৃত টীকা অভয়দেব সূরি কৃত, পণ্ডিত বেচরদাসজীর সহযোগিতায় টিপ্পণি ও পরিশিষ্ট সহ সম্পাদন। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, আহমদাবাদ হতে ১৯২৫-৩২ এর মধ্যে পাঁচ ভাগে প্রকাশিত। সন্মতিতর্ক (প্রাকৃত) নামক ষষ্ঠ ভাগ গুজরাত বিদ্যাপীঠ দ্বারা গুজরাতী অনুবাদ, বিবেচন তথা প্রস্তাবনা সহ প্রকাশিত। ষষ্ঠভাগের ইংরেজী অনুবাদ শ্বেতাম্বর জৈন কনফারেন্স কর্তৃক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

১০। জৈন দৃষ্টিএ ব্রহ্মচর্য বিচার, গুজরাতী, পণ্ডিত বেচরদাসজীর সহযোগিতায়। প্রকাশক গুজরাত বিদ্যাপীঠ, আহমদাবাদ।

১১। তত্ত্বার্থসূত্র, উমাস্বাতীকৃত, গুজরাতী ও হিন্দীতে বিশদ বিবেচন ও বিস্তৃত প্রস্তাবনা সহ, ১৯৩০। গুজরাতী সংস্করণ গুজরাত বিদ্যাপীঠ কর্তৃক প্রকাশিত। চার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী সংস্করণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত করেন শ্রীআত্মানন্দ জন্ম শতাব্দী স্মারক সমিতি, বম্বে। দ্বিতীয় সংস্করণ জৈন সংস্কৃতি সংশোধন মণ্ডল, বারাণসী, ভারত জৈন মহামণ্ডল, ওয়ার্ধা'র সহযোগিতায় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন।

ডাঃ কে. কে. দীক্ষিত কৃত এর ইংরেজী অনুবাদ এল. ডি. ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, আহমদাবাদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হিন্দী সংস্করণ পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম শোধ সংস্থান বারাণসী কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১২। ন্যায়াবতার, সিদ্ধসেন দিবাকরকৃত। জৈন ন্যায় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, অনুবাদ, বিবেচন এবং প্রস্তাবনা সহ। 'জৈন সাহিত্য সংশোধক'-এ প্রকাশিত, ১৯২৫।

১৩। প্রমাণ মীমাংসা, আচার্য হেমচন্দ্রকৃত জৈন ন্যায় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, হিন্দী প্রস্তাবনা ও টিপ্পণ সহ। প্রকাশক সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বম্বে, ১৯৩৯। এর প্রস্তাবনা ও টিপ্পণের ইংরেজী অনুবাদ 'এডবান্স স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান লজিক এ্যাণ্ড মেটাফিজিক্স' নামে ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ, পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট, কলিকাতা দ্বারা ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪। জৈন তর্ক ভাষা, উপাধ্যায় যশোবিজয়কৃত, জৈন ন্যায় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, হিন্দী প্রস্তাবনা এবং সংস্কৃত টিপ্পণ সহ। প্রকাশক সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বম্বে, ১৯৪০।

১৫। জ্ঞান বিন্দু, উপাধ্যায় যশোবিজয়কৃত, মূল সংস্কৃত, হিন্দী প্রস্তাবনা এবং সংস্কৃত টিপ্পণ সহ। প্রকাশক সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বম্বে, ১৯৪৯।

১৬। তত্ত্বোপপ্লবসিংহ—জয়রাশিভট্ট কৃত চার্বাক পরম্পরার সংস্কৃত গ্রন্থ। ইংরেজী প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, বরোদা, ১৯৪০।

১৭। হেতুবিন্দু, ধর্মকীর্তিকৃত, বৌদ্ধন্যায়ের সংস্কৃত গ্রন্থ। অর্চটের টীকা, দুর্বেক মিশ্রের অনুটীকা ও ইংরেজী প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, বরোদা, ১৯৪৯।

১৮। বেদবাদদ্বাত্রিংশিকা, সিদ্ধসেন দিবাকর কৃত, মূল সংস্কৃত, গুজরাতী সার, বিবেচন ও প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক ভারতীয় বিদ্যাভবন, বম্বে ১৯৪৬। এর হিন্দি অনুবাদ এই প্রতিষ্ঠানের 'ভারতীয় বিদ্যা'য় প্রকাশিত হয়।

১৯। আধ্যাত্মিক বিকাশক্রম, গুজরাতীতে। এই গ্রন্থে 'গুণস্থানে'র বিবেচন করা হয়েছে। প্রকাশক শম্ভুলাল জে. সাহ, আহমদাবাদ, ১৯২৭।

২০। নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়, হিন্দীতে। মহত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের নিরূপণ। প্রকাশক জৈন সংস্কৃতি সংশোধন মণ্ডল, বারাণসী, ১৯৪৭।

২১। চার তীর্থংকর, হিন্দীতে। ঋষভদেব, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর

সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রকাশক জৈন সংস্কৃতি সংশোধন মণ্ডল, বারাণসী, ১৯৫৪। এর গুজরাতী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২২। ধর্ম ঔর সমাজ, হিন্দীতে লিখিত প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রকাশক হিন্দী গ্রন্থরত্নাকর কার্যালয়, বম্বে, ১৯৫১।

২৩। অধ্যাত্ম বিচারণা, গুজরাত বিদ্যাসভা, আহমদাবাদ এর তত্বাবধানে পোপট-লাল হেমচন্দ্র অধ্যাত্মব্যাখ্যান মালায় প্রদত্ত গুজরাতীতে তিন ব্যাখ্যান। প্রকাশক গুজরাত বিদ্যাসভা, অহমদাবাদ, ১৯৫৬। এর হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২৪। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা, মহারাজা সয়াজীরাও ইউনিভার্সিটি, বরোদার তত্বাবধানে স্যর সয়াজীরাও অনরেরিয়াম ব্যাখ্যান মালায় প্রদত্ত গুজরাতীতে তিন ব্যাখ্যান। ডাঃ কে. কে. দীক্ষিতকৃত এর ইংরেজী অনুবাদ এল. ডি, ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির আহমদাবাদ কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান ফিলোসফী' নামে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২৫। দর্শন অনে চিন্তন, দুই ভাগ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধিত পণ্ডিতজীর গুজরাতী প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রকাশক পণ্ডিত সুখলালজী সম্মান সমিতি, আহমদাবাদ, ১৯৫৭।

২৬। দর্শন ঔর চিন্তন, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধিত পণ্ডিতজীর হিন্দীপ্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রকাশক পণ্ডিত সুখলালজী সম্মান সমিতি, আহমদাবাদ, ১৯৫৭।

২৭। সমদর্শী আচার্য হরিভদ্র, বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে ঠক্কর বসনজী মাধবজী ব্যাখ্যানমালায় গুজরাতীতে প্রদত্ত ব্যাখ্যান। প্রকাশক বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১। এর হিন্দী অনুবাদ রাজস্থান প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, যোধপুর কর্তৃক ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত।

২৮। জৈন ধর্মনো প্রাণ; গুজরাতীতে, দর্শন অনে চিন্তন ও দর্শন ঔর চিন্তন হতে মনোনীত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রকাশক জগমোহনদাস কোরা স্মারক পুস্তকমালা, ১৯৬২। এর হিন্দী অনুবাদ সস্তা সাহিত্যমণ্ডল, নূতন দিল্লী হতে শ্রীবল্লভ স্মৃতি গ্রন্থমালায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

অভয়রুচি

[একাঙ্কিকা]

প্রথম দৃশ্য

[রাজা মারিদত্তের প্রমদোদ্যান। রাজা, বিচক্ষণাসহ রাণী ও বিদূষকের প্রবেশ। সময় : প্রভাত]

মারিদত্ত : দেবী, তোমায় আজ এক শুভ সংবাদ দি। ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। ষোড়শী বালিকারা ওষ্ঠে মদন বিলেপন করে না। সুরভিত তৈলে বেণী বন্ধন করে না। গাত্রে অল্পবাস পরিধান করে। এখন কংকুমে মুখ মার্জনও করে না।

দেবী : আর্যপুত্র, আমিও আপনাকে এক সুসংবাদ দি। চন্দন সৌরভে সুবাসিত মলয় পবন এখন প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। ভ্রমর গুণগুণ করে কলিরূপ তরুণীদের মুখ মধু পান করছে।

বৈতালিক : [ভেতর হতে] পূর্ব দেশাধিপতির জয় হোক্। রাজপুর নগরের ভূষণ স্বরূপ মহারাজ মারিদত্তের জয় হোক যিনি ভুজবলে রাঢ়দেশ জয় করেছেন, যাঁর বর্ণ সুবর্ণের চাইতেও আরো বেশী সুন্দর, নববসন্তের আবির্ভাব তাঁর প্রিয় হোক, সুখকর হোক।

মারিদত্ত : দেবী, তুমি আমার প্রিয় এবং আমি তোমার প্রিয় এতদিন এই কথাই জানতাম। কিন্তু আজ দেখছি যে বৈতালিকদ্বয় কাঞ্চনচণ্ড ও রত্নচণ্ডও আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করছে। সহকার সংলগ্ন লতা নর্তকী বাতাসে আন্দোলিত হয়ে নৃত্য করছে। বসন্তপ্রিয়া কলকণ্ঠী কোকিলা পঞ্চম স্বরে গান গাচ্ছে। পৃথিবীর প্রিয় বয়স্য বসন্ত আজ সমাগত। প্রিয়ে, এই বসন্তোৎসবকে তুমি তোমার সহযোগিতায় সফল কর।

কপিঞ্জল : দেখো, তোমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র পণ্ডিত। কারণ আমার শ্বশুরের শ্বশুর এক পণ্ডিতের ঘরে পুস্তক বহন করত।

বিচক্ষণা : [হেসে] ও:। ...মনে হচ্ছে তোমার পাণ্ডিত্য কুল পরম্পরা গত।

: (ক্রুদ্ধ হয়ে] তুইত মাত্র দাসীই। তুই কি বুঝবি আমার পাণ্ডিত্য ? আমি এত মূর্খ নই যে তোর মত মানুষ আমায় উপহাস করে।

বিচক্ষণা তাই যদি হয় তবে হাতের কঙ্কণের আরসির কি প্রয়োজন? যদি বাস্তবে পণ্ডিত হও তবে শোনাও বসন্ত ঋতুর ওপর এক কবিতা।

কপিঞ্জল হয়েছে হয়েছে এখন চুপ কর। খাঁচার পাখীর মত চাঁ চাঁ করিস না। তুই কবিতার কি জানিস? আমি ত আমার কবিতা শোনাব প্রিয়-বয়স্য ও মহাদেবীকে। মৃগনাভি কুগ্রামে কখনো বিক্রয় হয় না। কষ্টি পাথর ছাড়া সোনার পরীক্ষা হয় না।

মারিদত্ত প্রিয় বয়স্য, এখন শোনাও দেখি তোমার একটি কবিতা।

কপিঞ্জল তবে শুনুন মহারাজ—

কলমা তন্দুল সম
শ্বেত সিন্ধুবার
তা আমার প্রিয়
তা আমার প্রিয়···

বিচক্ষণা এই কবিতা তোমার গৃহিণীকেই শুনিও।

কপিঞ্জল ওরে ও মধুর-ভাষিণী, তবে শোনা দেখি তোর কবিতা।

দেবী [হেসে] বিচক্ষণা, তুই তো সব সময় আমাকে তোর কবিতা শোনাস, আজ মহারাজকেও এক কবিতা শুনিয়ে দে।

বিচক্ষণা যে আজ্ঞা। শোনাচ্ছি—

বসন্ত এল দ্বারে
পত্রে পল্লবে। বরণ করেনে উহারে।
মুখ মণ্ডল
মার্জিত কর পরাগে,
চরণ
রঞ্জিত কর কিংশুক রাগে,
সুরভিত কর
শিথিল শ্লথ কবরী ভারে।
বসন্ত এল দ্বারে।
সখি, ফুল ডোরে বাঁধ ঝুলনা,
নাই নাই নাই এ মধু মাসের তুলনা,
কর কজ্জলিত অঞ্জনে
অলস নয়ন সারে।
বসন্ত এল দ্বারে।

মারিদত্ত : বিচক্ষণা ত সত্যিই বিচক্ষণা। কবিদেরো। কবি।

দেবী : বিচক্ষণা ত কবি চুড়ামণি।

কপিঞ্জল : দেবীর একথা বলার তাৎপর্য কি এই যে বিচক্ষণা মহাকবি আর এই ব্রাহ্মণ অধম কবি।

দেবী : রাগ করো না ব্রাহ্মণ। কবির গুণাগুণ ত কবিতার দ্বারাই নির্ণীত হয়।

কপিঞ্জল : তবে কি আমি কবি নই। আমার মধ্যে কবিত্ব নেই? আমি তবে যাচ্ছি।

মারিদত্ত : বয়স্য, তুমি না হয় কবি নাই হলে—

কপিঞ্জল : এত অপমান! না না আমি আর এখানে থাকব না। [বাইরে যাচ্ছে]

দেবী : মহারাজ! ওকে ডাকিয়ে আনান। কপিঞ্জল ছাড়া রাজসভা কি? নয়নাঞ্জন ছাড়া প্রসাধন কি?

বিচক্ষণা : দেবী! ওকে এত আদর দেবেন না। কপিঞ্জল নরম হলে গরম, গরম হলে নরম হয়। ও যাবে কোথায়? এখুনি আসবে।

[কপিঞ্জলের প্রবেশ]

কপিঞ্জল : আসন দে। আসন দে।

মারিদত্ত : আসন দিয়ে কি হবে?

কপিঞ্জল : বীর ভৈরব আসছেন।

দেবী : তিনিই কি যাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

কপিঞ্জল : হাঁ তিনিই।

মারিদত্ত : ওঁকে সাদরে এখানে নিয়ে এসো।

[কপিঞ্জল বাইরে যাচ্ছে ও বীর ভৈরবকে সঙ্গে নিয়ে আবার ভিতরে আসছে। সকলে ঈষৎ আনত হয়ে তাঁকে প্রণাম করছে। রাজা আসন দিচ্ছেন। বীর ভৈরব আসনে বসে মদিরা পান করছেন। সকলে বসে যাচ্ছে]

বীরভৈরব : রাজন্, ধ্যান জপ তপ আদি সাধনার যত পথ রয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই কৌল ধর্ম। গুরু কৃপায় মোক্ষ বল, অপবর্গ বল তা আমার মুঠোয়। ইচ্ছা মত আমি মদিরা পান করি, ইচ্ছা মত স্ত্রী সঙ্গ। সধবা হোক বিধবা, কুমারী হোক বা যুবতী, যে দীক্ষিত সেই আমার পত্নী। মাংস আমার খাদ্য। এরূপ কৌল ধর্ম কার না প্রিয়? আর, আর সকলে যখন বলে, ধ্যান, জপ, কৃচ্ছ্র-সাধনায় মুক্তি তখন উমাপতি বলেন রতি রভসে মুক্তি।

মারিদত্ত : আপনি যা বলছেন তা ঠিকই।

বীরভৈরব : বৎস, তুমি পরাক্রমী-ই নও পরম কৌলও। দেবীচণ্ডমারীর তুমি যে ভাবে পূজো করছ তা আমি জানি। আমি তাতে তোমার ওপর প্রসন্ন এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসা। বল, এখন আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ?

মারিদত্ত : আপনার অলৌকিক সিদ্ধির কথা শুনেছি। এখন কিছু প্রত্যক্ষ দেখতে চাই।

বীরভৈরব : সে স্ববত আমার মুঠোয়। আমি সূর্যকে স্তব্ধ করতে পারি। চাঁদকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে পারি। যক্ষ রক্ষ ও সিদ্ধাঙ্গনাদের উড়িয়ে আনতে পারি। আমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

মারিদত্ত : [কপিঞ্জলের প্রতি] বয়স্য, বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি কোনো রমণী রত্নকে তুমি দেখেছ ?

কপিঞ্জল : দেখিনি। তবে শুনেছি।

মারিদত্ত : সে কে ?

কপিঞ্জল : বিদ্যাধর রাজকন্যা জম্ভালা।

বীরভৈরব : তবে নাও, তাকেই আমি এখন নিয়ে আসি।

মারিদত্ত : হাঁ সেই পূর্ণচন্দ্রকেই তবে পৃথিবীতে নামিয়ে আনান।

[বীর ভৈরব ধ্যান করছেন। ধীরে ধীরে জম্ভালা নেমে আসছে]

: আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

মারিদত্ত : এ কি দেখছি ! স্বপ্নত নয় ? আমার হৃদয় মথিত হচ্ছে।

বীরভৈরব : স্বপ্ন নয় রাজন্। এ বিদ্যাধর রাজকন্যা জম্ভালা। তুমি একে পেতে পার —

[মারিদত্ত জম্ভালার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকছেন। জম্ভালা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে]

যদি আমার নির্দেশানুসারে কার্য কর।

মারিদত্ত : আমি করবার জন্য প্রস্তুত।

বীরভৈরব : তবে শোনো। চৈত্র অমাবস্যায় এক লক্ষ বিভিন্ন প্রকার যুগল প্রাণী দিয়ে দেবী চণ্ডমারীর পূজো কর, শেষে সর্বসুলক্ষণযুক্ত সুন্দর এবং নীরোগ কুমার কুমারীর বলিদান। এর ফল স্বরূপ সূর্যহাস নামে এক খড়্গ উৎপন্ন হবে। তার প্রভাবে জম্ভালা সহ বিদ্যাধর রাজ্য তুমি লাভ করবে।

কপিঞ্জল : একাজ অবশ্যই করণীয়।

দেবী : কিন্তু মহারাজ ! একাজে কত জীব হত্যা হবে। কত পাপ।

বীরভৈরব : দেবী, এক্ষেত্রে তুমি ভ্রান্ত। এতে পাপ কোথায়? যাদের বলি হবে তাদের তো অহোভাগ্য। তারা সবাই স্বর্গে যাবে। [মারিদত্তের দিকে চেয়ে] রাজন্, তোমার একাজ করাই উচিত। এতে বিদ্যাধর রাজ্য তুমি প্রাপ্ত হবে তাই নয়, তোমার রাজ্যেও সর্বত্র সুখশান্তি প্রসারিত হবে। তোমার কল্যাণ হবে।

মারিদত্ত : অবশ্যই করব মহাকৌল ! [কপিঞ্জলকে] বয়স্য, তুমি মন্ত্রীকে একথা সূচিত কর যে জলচর, নভচর, স্থলচর সমস্ত প্রাণীর এক এক মিথুন যেন সংগ্রহ করা হয় ও সর্বসুলক্ষণযুক্ত সুন্দর ও নীরোগ কুমার কুমারীকে নগরে প্রাপ্ত হলে নগরে, নইলে গ্রাম জনপদ যেখানে পাওয়া যায় সেখান হতে যেন শীঘ্র সংগ্রহ করে।

দেবী : আমি তাহলে যাচ্ছি। এ অনর্থ আমার প্রিয় নয়।
[বিচক্ষণা সহ দেবীর প্রস্থান]

বীরভৈরব : যেতে দাও। অনর্থ নয়, ঈর্ষ্যা। দেবী ঈর্ষ্যা বশে চলে গেলেন। জম্ভালার প্রতি ঈর্ষ্যা। [মদিরাপান। মারিদত্তের দিকে মদের পাত্র এগিয়ে দিয়ে] নাও, তুমিও পান কর। এ দেবীর মহাপ্রসাদ।
[মারিদত্তও মদিরা পান করছেন]

[ক্রমশঃ

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120 .

Vol. VI No. 1 Sraman May 1978

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

এক বর্ণ ও রঙীন চিত্রে সমৃদ্ধ

জৈন ধর্ম দর্শন সাহিত্য শিল্প ও কলা সম্পর্কিত একমাত্র ইংরেজী ত্রৈমাসিক

জৈন জার্নাল

ভালো লেখা ভালো ছাপা ভালো কাগজ

ভারতে ও ভারতের বাহিরে

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত ও সমাদৃত

আজই এর গ্রাহক হোন

বার্ষিক চাঁদা : পাঁচ টাকা

তিন বছরের জন্য মাত্র বারো টাকা

সম্পাদনা : শ্রীগণেশ লালওয়ানী

প্রাপ্তিস্থান :

জৈন ভব[illegible] ২৫ কলাকার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

শ্রমণ

বৈশাখ । ১৩৮৫ ষষ্ঠ বর্ষ । প্রথম সং

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

স্তম্ভ ও স্থানচ্যুত কলস, পাকবিড়রা

জৈন ধর্ম ও মূর্তি শিল্পে লোকায়ত ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব

শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী

প্রাচ্য ভারতে জৈন তীর্থংকর মহাবীর ও তাঁর শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে এবং এই সঙ্গে আর্যসভ্যতা ও ধ্যান-ধারণা ক্রমশঃ এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে পূর্ব ভারতে জৈন ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হলেও বাংলা তথা প্রাচ্য ভারত থেকে এই ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং পশ্চিম ভারতের বর্তমান রাজস্থান, গুজরাত অঞ্চলে এই ধর্ম সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান কালে ভারতের জৈনধর্মাবলম্বী জনগণের অধিকাংশই পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। ভারতের এই দুই অঞ্চলে জৈন ধর্মের বিকাশ ও বিস্তারলাভ ভারতীয় সংস্কৃতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ—পশ্চিম ভারতের সিন্ধু-সরস্বতী অববাহিকায় ভারতের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার নিদর্শন হড়প্পা সংস্কৃতির আদিমতম উন্মেষ হয়—আর পূর্বভারতের গহন বনানীর শ্যামলছায়ায় ভারতের প্রাচীনতম নরগোষ্ঠীর অন্যতম অরণ্যচারী অস্ট্রিক ভাষাভাষী সাঁওতাল ও কোলদের বাসস্থান। অন্ততঃ খৃষ্টপূর্বঃ ৬ষ্ঠ শতকে মহাবীরের পথহীন লাঢ় দেশ (রাঢ়), বজ্জভূমি ও সুব্‌ভভূমি (মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ়) পরিভ্রমণ কালে এই সমস্ত অঞ্চল যে অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল প্রবোধ বাগচী এবং নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতের প্রচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর দুই বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার প্রভাব অপরিসীম এবং জৈনধর্ম ও তার পৌরাণিক কাহিনীও (mythology) এই সমস্ত প্রাক-আর্য বা অনার্য সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বরঞ্চ এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সাংকালিয়া মহাপুরাণ রচয়িতা পুষ্পদন্তের কাহিনী উল্লেখপূর্বক এক প্রাচীন জৈন কিম্বদন্তীর অবতারণা করেছেন। কল্পসূত্রের আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, কথিত আছে, নাভি নামক পৌরাণিক রাজার রাজত্বকালের পূর্বে কল্পবৃক্ষ থেকে অভিষ্ট বস্তু আহরণ করে মানবজাতি সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মানবজাতির কৃষিকর্ম বা শস্য আহরণের পদ্ধতি অজানা থাকার জন্য তাদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নাভি মানবজাতিকে মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে

শিক্ষা দিলেন। মুষলের সাহায্যে শস্য চূর্ণ করবার পদ্ধতি, অগ্নি প্রজ্জালন এবং পরিশেষে রন্ধন কার্যের প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা দিলেন। কালক্রমে তুলা থেকে সূতা কাটা ও কাপড় বুনবার পদ্ধতিও শিক্ষা দিলেন। এইরূপে নাভি এবং তাঁর পুত্র ঋষভদেব কেবলমাত্র জৈনধর্মের প্রবর্তকই ছিলেন না, মানব সভ্যতার বাহক ধারক হিসাবেও পরিগণিত হয়েছেন (Cf. 'Rsabha or Adinatha', H. D. Sankalia, *Jain Antiquary*, 1957)। এই কিম্বদন্তী থেকে মোটামুটি জৈনধর্মের সবিশেষ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এবং মনে হয় এই জন্যই ভারতের প্রাচীনতম বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার এক বিশেষ প্রভাব জৈন ধর্মের উপর পড়ে যায়।

চতুর্বিংশতিতম জৈন তীর্থংকর মহাবীর যে বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন তা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত এবং তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শ্বনাথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে। দ্বাবিংশতিতম তীর্থংকর নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা হিসাবে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং যাদবগণের প্রভাব প্রতিপত্তি পশ্চিম ভারত এবং মধ্য ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধরা হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে পরবর্তীকালে তাম্রাস্মীয় সভ্যতার বিস্তার এই যাদবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনগণের দ্বারা সাধিত হয় অন্ততঃ ডাঃ সাংকালিয়া প্রমুখ পণ্ডিতগণের সেই মত। এছাড়া পূর্ববর্তী জৈন তীর্থংকরদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে জৈন ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয় খৃষ্ট জন্মের হাজার হাজার বৎসর পূর্বে।

আপাততঃ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন 'হড়প্পা সংস্কৃতি'র প্রত্ন বস্তুগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে লিঙ্গপূজার প্রচলন ঐ সময় ছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'শিশ্নদেব' শব্দের অর্থ আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে লিঙ্গ উপাসনাকারী জনগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন এবং এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা যে শতাব্দী পরবর্তীযুগের জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ পদ্ধতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—এমতও প্রকাশ করেছেন। মহেন-জো-দড়ো থেকে পাওয়া একটি সীল এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে (Seal No. 430, Plate No. XCIV, *Further Excavations at Mohenjodaro*, Vols I, II, E. Mackay ; also notes at pp. 337-338 and enlarged Plate No. XCIX(A))। এই সীলে বৃক্ষতলে কায়োৎসর্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান এক দিগম্বর মূর্তি নাগলাঞ্ছন শোভিত এক ভক্ত কর্তৃক পূজিত হতে দেখা যায় এবং সীলের প্রত্যন্তে সপ্ত মূর্তি সারিবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং এই মূর্তিগুলির মস্তকে নাগচিহ্ন শোভিত আছে। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বৃক্ষতলে কায়োৎসর্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান মূর্তিটির মধ্যে কোনও এক জৈন তীর্থংকরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লিখিত জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবনী ও তার কার্যাবলী

আলোচনাকালে জানা যায় যে একসময় নাগরাজ ধরণেন্দ্র তাঁকে সম্বর নামে এক দানবের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং এই ঘটনাকে স্মরণ করে রাখার জন্য পরবর্তীকালে নাগছত্র পার্শ্বনাথের লাঞ্ছনরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। দণ্ডায়মান সপ্ত-মূর্তির মধ্যে অমরা পরবর্তীকালের বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সপ্তমাতৃকার আভাস পাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জৈন মূর্তি শিল্পে তীর্থংকরদের মূর্তি মোটামুটি একই ধরণের। সর্বত্রই প্রায় তাঁরা কায়োৎসর্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান বা যোগাসনে উপবিষ্ট, কেবলমাত্র তাঁদের বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছনের দ্বারাই তাঁদের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ যে এই সমস্ত লাঞ্ছনের অধিকাংশই জীব-জন্তুর মধ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রথম তীর্থংকর আদিনাথ বা ঋষভনাথ আদিবুদ্ধের মতই পরিগণিত, সৃষ্টির আদি উৎস তাঁর থেকেই। প্রজনন শক্তির মূর্ত প্রতীক বৃষ এ'র লাঞ্ছন হিসাবে পরিগণিত··· ব্রাহ্মণ্য শিবের সঙ্গে এ'র অনেক সাদৃশ্য আছে। হড়প্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক নিদর্শনের মধ্যে বৃষের পোড়ামাটির মূর্তি এবং সীলের গায়ে উৎকীর্ণ বৃষের মূর্তির অনেক সাক্ষাৎ পাই। মনে হয় এই Bull-cult বা বৃষপূজা পরবর্তীকালে জৈন ধ্যান-ধারণা ও পৌরাণিক কাহিনীকে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্য যে সমস্ত প্রতীক তীর্থংকরদের লাঞ্ছন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হয়ত কোন আদিম উপজাতিদের মধ্যে টোটেম বা গোষ্ঠীপ্রতীক রূপে ব্যবহৃত হত এবং সমন্বয়ের ফলে কালক্রমে এই সমস্ত প্রতীক চিহ্ন বা লাঞ্ছন জৈন তীর্থংকরদের লাঞ্ছন হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মহেন-জো-দড়ো থেকে প্রাপ্ত প্রিজ্‌মাকৃতি একটি সীলমোহরের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সীলমোহরের দুই পার্শ্বে যেন প্রাণী জগতের পক্ষ থেকে সারিবদ্ধভাবে বনদেবতাকে অভিবাদনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এই সীলমোহরের উপর হস্তী, গণ্ডার, চিতাবাঘ (?), ব্যাঘ্র, বাইসন, ছাগল, এক অদ্ভুত ও অস্পষ্ট চতুষ্পদ প্রাণী, মুখবিবরের মধ্যে মৎস সহ কুম্ভীর, কূর্ম ও মৎস্য প্রভৃতি প্রাণী খোদিত আছে (Plate No. CXVI, 14, *Mohenjodaro and the Indus Valley Civilisation*, Vol III, Sir John Marshall)। জৈন তীর্থংকরদের লাঞ্ছন হিসাবে এই ধরণের প্রাণীর মধ্য থেকে চয়ন সত্যই ইঙ্গিতপূর্ণ। জৈনদের মধ্যে মাঙ্গলিক চিহ্ন বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত অষ্টমঙ্গল চিহ্নের মধ্যে অন্যতম স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহারও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার সীল বা সীলমোহরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে—হড়প্পার ৩৮৭ নম্বর সীলের পশ্চাদ্দেশে বেষ্টনীর মধ্যে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায় এবং মহেন-জো-দড়োর একটি পোড়ামাটির সীল মোহরের উপরিভাগে বৃক্ষের চিহ্নের পার্শ্বে অনুরূপ স্বস্তিকা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় (Plate No. CXVI. 20, *Mohenjo-daro and Indus ValleY Civilisation,* Vol III, Sir John

Marshall)। এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে এবং এই কারণে অষ্টমাঙ্গলিক প্রতীক হিসাবে জৈন শিল্পকলার মাধ্যমে এই চিহ্নের প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে জৈন তীর্থংকর মূর্তিসমূহের পাদপীঠে এই সমস্ত লাঞ্ছন উৎকীর্ণ করা থাকত না এবং মথুরা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন জৈন মূর্তিসমূহের পাদপীঠে ধর্মচক্রই প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত দেখে ধারণা হয় যে বিভিন্ন প্রতীক বা লাঞ্ছনের প্রয়োগ প্রথমে না হলেও কালক্রমে লোকায়তধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রভাবে পরবর্তীকালে এই সমস্ত চিহ্ন বা লাঞ্ছনের মাধ্যমেই তীর্থংকরদের পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

ভূমধ্য সাগরীয় সভ্যতা, পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার ছোঁয়াচ কিছু কিছু জৈন শিল্পকলার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির অনন্তগুম্‌ফার তোরণদ্বারের সম্মুখে উৎকীর্ণ এক ভাস্কর্য শৈলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে (Plate XIVA, *Udayagiri and Khandagiri*, Dabala Mitra, P. 48)। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উৎকীর্ণ এক panel-এর মধ্যে বৃষ ও সিংহের সহিত ক্রীড়া বা সংগ্রামরত মনুষ্যের মূর্তি মহেন-জো-দড়ো থেকে প্রাপ্ত দুইটি ব্যাঘ্রের সঙ্গে সংগ্রামরত মনুষ্যের প্রতীকচিহ্ন খোদিত সীল ও বৃষের সহিত উল্লম্ফনোদ্যত মনুষ্যের মূর্তিখচিত সীলগুলির প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্রীট দ্বীপে মাতৃকা মূর্তির সম্মুখে Bull-Baiting উৎসবের কথা স্মরণ করে Macky এই বিষয় বস্তুর প্রভাব উত্তর কাম্বোডিয়ার আঙ্কোর-এর রাজ-প্রাসাদ-গাত্রে উৎকীর্ণ Bas-relief এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন—তবে ওখানে বন্য মহিষের সহিত ক্রীড়া ও উল্লম্ফন আনন্দোৎসব হিসাবে গণ্য হয়েছে (*Further Excavations at Mohenjodaro*, F. Mackay, p. 657-50)। সুমেরীয় গীলগামেশের (Gilgamesh) সহিত জড়িত অলৌকিক ঘটনাবলী ও কিম্বদন্তীর প্রভাব হড়প্পা সভ্যতার মাধ্যমে ভারতের পূর্ব উপকূলে ভুবনেশ্বর গিরিগাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ভারতীয় ও পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদান প্রদানেরই সাক্ষ্য দেয়; Gebel-el-Arak-এ প্রাপ্ত হস্তীদন্ত নির্মিত ছুরিকার হাতলে খচিত এক মনুষ্যের সিংহের সহিত যুদ্ধের দৃশ্য এবং মিশরের Hierakonpolis-এর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ প্রায় একই ধাঁচের চিত্রাবলী প্রাগৈতিহাসিক মানবের ধ্যান-ধারণা ও লৌকিক কিম্বদন্তীর সমন্বয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিকটবর্তী রাণীগুম্ফার উপরের তলের ভাস্কর্য শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ইউ. পি. সা মহাশয়ের মত বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য: "Of considerable interest however are figures of yavana warrior and two burly individuals on ponderous

animals, the bull-rider being strangely Assyrian in modelling and conception as a whole."

হড়প্পা সভ্যতার বাস্তব নিদর্শনের সঙ্গে জৈন ধর্ম বা মূর্তি শিল্পের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ইঙ্গিত বা আভাস থাকলেও পণ্ডিত গণের মতে এ পর্যন্ত প্রাচীনতম জৈন তীর্থংকরের মূর্তি বিহারের পাটনার নিকটবর্তী লোহানীপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুডৌল ও মসৃণ অবয়ব দেখে এটিকে মৌর্যযুগের নিদর্শন বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিটির আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ইউ. পি. সা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এটি সম্ভবতঃ কোন যক্ষমূর্তির আদর্শে বা নকলে উৎকীর্ণ হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যক্ষপূজা জৈন উপাসনা ও আচারানুষ্ঠানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতে যক্ষপূজার প্রাচীনত্ব এবং যক্ষায়তনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। ভারহুতের বেদিকাগাত্রে নামোল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন যক্ষ আখ্যাধারী লৌকিক দেবতাগণ উৎকীর্ণ থাকতে দেখা যায়। জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ ও আগম শাস্ত্রে ইন্দ্র, রুদ্র, স্কন্দ, বাসুদেব, যক্ষ, ভূত, নাগ এবং বিভিন্ন বৃক্ষ দেবতার উপাসনার উল্লেখ আছে এবং কথিত আছে জৈন তীর্থংকর মহাবীর 'যক্ষায়তনে'র মধ্যে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থান করতেন। বিভিন্ন পর্যায় এবং শ্রেণীর জন সাধারণের বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে এই সমস্ত যক্ষায়তনে আগমন হত এবং স্বভাবতই এই সমস্ত লৌকিক দেবতার সহিত জড়িত আচারানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রভাব জৈন ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপর এসে পড়ে। চৈত্যবৃক্ষতলে আধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে যক্ষপূজা বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে এর উৎপত্তি এবং কালক্রমে লোকায়ত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মূর্তিপূজার মধ্যে এর আশ্রয় হয়েছে। হড়প্পা ও মহেন-জো-দাড়ার সীলগুলির বিভিন্ন motif-গুলি আলোচনা করলে আমাদের এই ধারণা জন্মে (Cf. *New light on the Indus Civilisation*, vol. I [Religion and Chronology], K.N. Shastri) এই সমস্ত লৌকিক ও প্রাকৃতিক বস্তু (Nature Spirits) সমূহের পূজা সম্ভবতঃ দ্রাবিড় সভ্যতা থেকে উদ্ভূত প্রথমে কোন প্রতীক পূজা থেকে কালক্রমে ভক্তিমার্গের মাধ্যমে মূর্তিপূজার কল্পনা আর্য সংস্কৃতির উপর পড়ে। **"In particular, the popular Dravidian element must have played the major part in all that concerns the development and offices of image worship that is *puja* as distinct from *yajnas*."** জৈন 'উপপাতিক' সূত্রে চম্পানগরীর প্রান্তে পূর্ণভদ্র চৈত্য নামে এক 'পোরাণ' (প্রাচীন) ও চিরাতীত যক্ষায়তনের উল্লেখ আছে। মহাবীর একদা এইস্থানে অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু

এই স্থানে কোন যক্ষের প্রতিমূর্তি ছিল কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। অবশ্য 'অন্তগডদসাও' নামক জৈন গ্রন্থে মৌদ্গরপাণি যক্ষায়তনের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ এই স্থানে লৌহমুদ্গর হস্তে মুদ্গরপাণি যক্ষের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল মনে হয়। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফায় সূর্যের এক প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। সূর্যদেবের রথের নিকটে বাম হস্তে প্রবাহ-নালি যুক্ত জলপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে পতাকা (?) সহ এক লম্বোদর বামনাকৃতি দৈত্যের মূর্তি খোদিত দেখা যায় (Plate XVA, *Udayagiri and Khandagiri,* Debala Mitra, p. 48)। আপাততঃ এই মূর্তিটির কোনও সনাক্তকরণ হয় নাই, মনে হয় এই মূর্তিটিতে কোন যক্ষ প্রতিফলিত হয়েছে এবং হেমাদ্রির যক্ষগণের বর্ণনার সহিত বহুলাংশে এর সাদৃশ্য আছে (তুন্দিলা দ্বিভূজাঃ কার্যা নিধিহস্তাঃ মদোৎকটাঃ)। কালক্রমে এই যক্ষ দেবতা অষ্ট দিকপাল গণের অন্যতম যক্ষ কুবেররূপে পরিগণিত হন। গুপ্তোত্তর যুগে এবং মধ্য যুগের প্রারম্ভে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও উপাসনার প্রভাবে জৈন ধর্মে চতুর্বিংশতি যক্ষ ও যক্ষিণীর কল্পনা প্রতিফলিত হয়। সময় সময় এদের 'উপাসক' বা 'শাসনদেবী' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যযুগের জৈন মন্দির সমূহে এদের নিদর্শন মেলে এবং কালক্রমে এদের মূর্তি কল্পনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথেষ্ট প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির নবমুনি গুম্ফার এদের মূর্তিগুলি সপ্তমাতৃকার মূর্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। আবার স্মরণাতীত কালের শক্তি মন্ত্রের প্রভাবও এই সমস্ত যক্ষ যক্ষিণী ও জিন মূর্তিগুলির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে (Cf. 'Sasanadevis in the Khandagiri Caves', Debla Mitra, *J A.S.* Vol I, No. *2*, *1956*)। জৈনদের মধ্যে যক্ষপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে বৃক্ষ পূজার কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে হয় কারণ যক্ষ বা অন্য ব্যন্তর দেবতাগণকে কোন কোন বিশেষ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার বাস্তব নিদর্শনগুলি, বিশেষ করে তৎকালীন যুগের সীল, সীলমোহরগুলি অবলোকন করে মনে হয় যে বৃক্ষপূজার উপর সে সময় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত এবং আরও বিশ্বাস হয় যে সময় সময় এই সমস্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের মূর্তিও এই সমস্ত সীলগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে সে যুগের ধর্ম বিশ্বাসকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করেছে। আরও পরবর্তী যুগে মথুরার জৈন শিল্পের মাধ্যমে আমরা রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরা বা বৃক্ষকার পরিচয় পাই। তবে ডাঃ কুমারস্বামীর মতে জৈন সাহিত্যে ও ধর্মগ্রন্থে 'যক্ষ চৈতিয়'-এর উল্লেখ সাধারণতঃ বৃক্ষ চৈত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ডাঃ ইউ. পি. সা 'বাসুদেব হিণ্ডি' নামক এক গ্রন্থের মধ্যে অশোক বৃক্ষতলে সুমনো নামক যক্ষের প্রস্তর নির্মিত বেদীর ('সুমনা সলা') উল্লেখ করেছেন, এবং এই শিলা প্রাকারকেই যক্ষজ্ঞানে পূজা করা হত

মনে হয়। পূর্বে পূর্ণভদ্র চৈত্যের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্ভবতঃ ওখানেও কোন যক্ষের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই পূর্ণভদ্র চৈত্যের প্রধান অশোকবৃক্ষটি অষ্ট মাঙ্গলিক, কেতন এবং নানা বর্ণের পতাকা, ঘণ্টা, চামর ও পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা শোভিত ছিল এবং এই বৃক্ষটিকেই পবিত্রজ্ঞানে পূজা করা হত। কালক্রমে এই চৈত্য বৃক্ষ থেকেই চৌমুখ বা চতুর্মুখ মন্দিরাকৃতি জৈনদের ছোট ছোট মন্দিরের উৎপত্তি। চৈত্যবৃক্ষের মূলে চারিদিকে চারিটি জিনমূর্তি স্থাপনার উল্লেখ জিনসেনের 'আদিপুরাণ' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই বৃক্ষপূজা আবহমান কাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে এবং এখনও আমাদের গ্রামদেবতাদের স্থান এই বৃক্ষতলেই। জৈন তীর্থংকরগণ বৃক্ষতলেই 'কেবল জ্ঞান' লাভ করেন এবং এই কারণে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের দ্বারা এঁদের প্রত্যেকের পার্থক্য সূচনা করা হয়েছে। জৈন ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে যখনই কোন জৈন তীর্থংকর মূর্তি খোদিত করা হয়েছে সাধারণতঃ তাঁদের মস্তকের উপরিভাগে তাঁদের নিজ নিজ চৈত্যবৃক্ষগুলিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং লোকায়ত ধর্মের প্রভাব এই বৃক্ষপূজার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং জৈন ধর্ম ও ধ্যান ধারণা এর থেকে মুক্ত হতে পারে নি। উড়িষ্যার খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফার তোরণদ্বারের সম্মুখে বৃক্ষপূজার এক দৃশ্য প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে (Plate XIVBK, *Udayagiri and Khandagiri*, Debala Mitra, pp. 48-49)। চতুর্দিকে বেদিকা পরিবেষ্টিত চৈত্যবৃক্ষটী একটী নর ও নারীর দ্বারা পূজিত হতে দেখা যায়। এই motif এর উপরিভাগে উৎকীর্ণ দুইটি সর্পমূর্তি থেকে ধারণা হয় যে দৃশ্যটি তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবনের কোন ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে নাগরাজ ধরণেন্দ্র ও তাঁর মহিষী কর্তৃক জিন পার্শ্বনাথকে রক্ষা করার ঘটনা এই ভাস্কর্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সমকালীন শিল্পরীতি অনুযায়ী জিনমূর্তি খোদিত না করে তার প্রতিভূরূপে চৈত্যবৃক্ষকে পূজা করা হচ্ছে। আম্রবৃক্ষতলে জৈন যক্ষিণী বা শাসনদেবী অম্বিকা বা আম্রার কল্পনা ও ধ্যান বৃক্ষ পূজারই প্রাধান্য প্রকাশ করে।

নাগপূজার প্রভাব জৈনধর্মের মধ্যে তীর্থংকর পার্শ্বনাথের ও পদ্মাবতীর মূর্তি কল্পনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। পূর্বেই জৈন ভাস্কর্যের মাধ্যমে নাগরাজের উপস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গন্ধর্ব, কিন্নর. বিদ্যাধরাদি লৌকিক দেবতাসমূহ জৈন ধর্ম গ্রন্থে ব্যন্তর দেবতা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, বৃক্ষ পূজার সঙ্গে এঁরাও জড়িত আছেন এবং এঁদের কিরীটের উপর বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ শ্রেণীর দ্বারা চিহ্নিত থাকায় মনে হয় এঁরাও বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে পরিগণিত। এই সব লৌকিক দেবতাগণের প্রতিমূর্তি জৈন ভাস্কর্য

শিল্পের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে—খণ্ডগিরির গুহাগাত্রে এদের মাল্য ও পুষ্পপাত্র হস্তে নভোমণ্ডলের মধ্যে সঞ্চরণের দৃশ্যটি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে।

সুখ ও শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রহদেবতাগণের পূজা অর্চনার বিধান 'যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রে' নির্দেশিত আছে এবং প্রাচ্যভারতেই গ্রহ পূজার প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। লোকায়ত ধ্যান-ধারণার প্রভাবে জৈন মূর্তি শিল্পে তীর্থংকরগণের মূর্তিকল্পনার মধ্যে এঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে—প্রথমে অষ্টগ্রহ থেকে নবগ্রহে রূপায়ণ এবং তীর্থংকর মূর্তিসমূহের প্রভামণ্ডলীর মধ্যে গ্রহ দেবতাগণের স্থান প্রাচ্যভারতে গ্রহপূজার প্রাধান্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুখস্বপ্নের উপর বিশ্বাস ভারতে বেশ প্রাচীনকাল থেকেই আছে। স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার জন্য 'নিমিত্ত-পাঠক' নামে এক শ্রেণীর লোক ছিল। এঁরা স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরুদ্ধ হতেন। আজীবিকগণের মধ্যেও 'নিমিত্তশাস্ত্র' বেশ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জৈন তীর্থংকরগণ এবং শলাকা পুরুষগণের জন্মকালীন সময়ে তাঁদের মাতৃগণ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বিবরণী জৈনধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধের জন্মকালীন সময়ে শ্বেত হস্তীর আগমনের স্বপ্নের সঙ্গে জৈন ধর্মে শ্বেতহস্তীর স্বপ্নের অনেক সাদৃশ্য আছে। গজলক্ষ্মী motifটিও ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পবিত্র আসন করে নিয়েছে। প্রাচীন কুসংস্কার ও লোকায়ত ধারণার প্রভাব মহাপুরুষগণের জন্মকালীন স্বপ্ন দেখার ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ভাস্কর্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।

বিভিন্ন উৎসবাদি ও আচার অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রথা পালন করা হত। লোকাচারের এই সমস্ত প্রথার উল্লেখ সম্রাট অশোকের অনুশাসনের মধ্যে উল্লিখিত আছে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা এই সমস্ত লোকাচারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং বিভিন্ন চিহ্নকে মাঙ্গলিক হিসাবে মনোনীত করেন। জৈন 'আয়াগপট' এবং ভাস্কর্যের মাধ্যমে এই সমস্ত শুভচিহ্ন (অষ্ট মঙ্গল) রূপায়িত হয়েছে। প্রাচীন ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। স্বস্তিকাচিহ্নের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। যুগ্ম-মৎস্য চিহ্ন সম্ভবতঃ কন্দর্প-দেবতা পূজা অর্চনার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ণ বা মঙ্গল কলস জীবনের পরিপূর্ণতা, প্রাচুর্য ও অমরত্বের বাণী বহন করে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা (Punch-marked coins) এবং tribal ও local coins-এর উপর এই ধরণের অনেক চিহ্ন অঙ্কিত আছে দেখা যায়। ভারতের লোকায়ত ভাব ধারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ কর্তৃক অনুসৃত হয় এবং তার প্রতিফলন এই সমস্ত মুদ্রা এবং অন্যান্য শিল্প কলার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়।

জৈন 'সমবসরণ' উৎসব প্রাচীন লোকায়ত উৎসব ও আচারানুষ্ঠান দেখে গৃহীত হয়েছে মনে হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেবতা, নর নারী, শ্রাবক শ্রাবকী ও প্রাণী জগতের সমাগম হত এবং নাট্যশালায় নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল। লৌকিক যাত্রানুষ্ঠানের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য আছে এবং মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে জৈন ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারে এইজন্য তীর্থংকর গণের 'কেবল জ্ঞানে'র পরে এই উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়।

প্রাগৈতিহাসিক মানবমনের ধ্যানকল্পনা, লৌকিক দেবদেবীর পূজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব নানা লৌকিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ক্রমে ক্রমে জৈন ধর্ম এবং মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হল তা আমাদের অল্পপরিসর আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হল। পরিব্রাজক বা শ্রাবকগণের আবেদনের মাধ্যমে জন সমক্ষে জৈন ধর্মমত উপস্থাপিত হয়, জনসাধারণের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপনের ফলে লোকায়ত ধ্যান-ধারণা ও আচারানুষ্ঠানের প্রভাব অন্য ধর্ম অপেক্ষা জৈন ধর্মের মধ্যে বেশী প্রতিফলিত হয় বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. **Banerjea, J. N.** : (a) *The Development of Iconography*, Calcutta, 1956.
   (b) 'Jaina Icons'—*History and Culture of the Indian People*, Vol. II. (The Age of Imperial Unity), Bombay, 1960.
   (c) 'Jainism—Iconography', *Ibid*. Vol. IV. (The Age of Imperial Kanauj), Bombay, 1955.

2. Bhattacharya, B.C. : *The Jaina Iconography*. Lahore, 1955.

3. Bhattacharya, H.D. : (a) 'Minor Religious Sects'—*History and Culture of the Indian People*, Vol. II.

(b) 'Religious Syncretism', *Ibid.*, Vol. IV.

4. Chakravarty. D.K. : 'A Survey of Jaina Antiquarian Remains in West Bengal', Brochure on *Jaina Art,* published by the Bharat Jain Mahamandal, Calcutta, 1965.

5. Chanda, R.P. : (a) 'Jaina Antiquities at Rajgir', *Annual Report, Archaeological Survey of India,* 1925-26.

(b) *Mediaeval Indian Sculptures in the British Museum.*

6. Dasgupta, P.C. : 'Archaeological Discoveries in West Bengal', *Bulletin of the Directorate of Archaeology West Bengal,* No. 1

7. Ghatage, A.M. : 'Jainism'—*History and Culture of the Indian People,* Vol. II.

8. Mazumdar, N.G. : *A Guide to the Sculptures in the Indian Museum,* Part I—'Early Indian Schools,' Delhi, 1937.

9. Mazumdar, R.C. : 'Religion and Philosophy—General Introduction', *History and Culture of the Indian People,* Vol. IV.

10.. Mitra, Debala : *Udayagiri and Khandagiri,* New Delhi, 1960.

11. Pusalkar, A.D. 'Jainism', *History and Culture of the Indian People*, Vol. IV.

12. Ramachandran, T.N. and Jain, Chhotelal : *Khandagiri-Udayagiri Caves*, Calcutta, 1951.

13. Zimmer, H. *The Art of Indian Asia, its Mythology and Transformations*, New York, 1955, Vol. I & II.

14. Coomarswamy, A.K. *History of Indian and Indonesian Art*.

15. ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।

16. Shah, U.P. : *Studies in Jain Art*, Banaras, 1955.

চতুষ্কোণ, মাঘ ১৩৭৬

জৈন তীর্থ পাক্‌বিড়রা

শ্রীদিলীপ রায়

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে, জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলার চরম উৎকর্ষতা শুধুমাত্র পশ্চিম ভারতের এক্তিয়ার ভুক্ত নহে। পূর্ব ভারতীয় শিল্প শৈলীর আদর্শে অনুপ্রাণিত পাক্‌বিড়রার জৈনস্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন আজ এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর জৈনতীর্থ পাক্‌বিড়রার ধ্বংসপ্রাপ্ত অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের অমূল্য সম্পদ। পুরুলিয়া শহরের পূর্বদিকে মাত্র ৪৫ কিঃ মিঃ দূরে সাধারণের পরিচিত পাক্‌বিড়রা গ্রামের 'ভৈরব স্থানে' তান্ত্রিক দেবতা ভৈরবের পরিবর্তে জৈন ধর্মের তীর্থংকর মূর্তি (৮'২"), হিন্দু দেবতা রূপে পূজীত হইতেছেন। জৈন ধর্মের ব্যাপক প্লাবনে প্লাবিত বৃহৎবঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্র পাক্‌বিড়রার ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শনগুলি উন্মোচিত করিবে।

ভৈরব স্থানের নাগর স্থাপত্য শিল্পরীতির তিনটী রেখ দেবদেউল খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর জৈন ধর্মের চরম উৎকর্ষতার পরিচায়ক। ত্রিরথ ভূমি নক্সায় তৈরী দেবদেউলের মস্তক অংশ অর্থাৎ ধ্বজা, কলস, বেঁকি, আমলক শীলা, খুপরি ও ভূমি অংশ নিশ্চিহ্ন। গণ্ডির অভ্যন্তর সহ চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর গাত্র ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। গণ্ডির বাহ্যিক গঠন বাঢ় অংশের বরন্দ হইতে উপরি জঙ্ঘার মধ্যবর্তী অংশের অলংকরণ কালের কবলে নিমজ্জিত। নিম্নজঙ্ঘা হইতে পৃষ্টর মধ্যবর্তী অংশে খুর, উল্টাখুর, কুম্ভ, রহপাগ, কনকপাগ প্রভৃতি অলংকরণ দর্শনীয়। গর্ভগৃহের বেদী, গর্ভমুদার অবশিস্টাংশ ও বহিস্থ প্রদক্ষিণপথ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাংশের উত্তরমুখী দেবদেউল দুইটির সম্মুখ ভাগে পৃষ্ট স্তরে কর্কটহস্তের ন্যায় ভূমি নক্সার পরিচয় লক্ষনীয়। পশ্চিমাংশের পূর্বমুখী দেবদেউলের উদ্ধার কার্য চলিতেছে। উত্তরমুখী দেবদেউলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি অনাচ্ছাদিত গৃহ এবং সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ উত্তরাংশে প্রস্তর নির্মিত অঙ্গনের চতুষ্কোণে নিরেট প্রস্তর নির্মিত ঘট-পল্লব ও মধ্যভাগে একটি প্রতিষ্ঠিত গোলাকৃতি স্তম্ভ লক্ষণীয়।

পাক্‌বিড়রার উদ্ধার প্রাপ্ত মূর্তিগুলি যথাক্রমে তীর্থংকর ঋষভদেবের দশটি, চন্দ্রপ্রভর দুইটি, শান্তিনাথের একটি, পার্শ্বনাথের একটি, মহাবীরের একটি, লাঞ্ছন বিহীন তীর্থংকরের বারটি, ৩৬৫ জন তীর্থংকর সহ ফলক একটি, জৈন দেবী একটি, দেবী অম্বিকার একটি, জৈন শাসন দেব ও দেবীর চারিটি, ক্ষুদ্রকায় জৈন মন্দির ছয়টি এবং অগণিত ভগ্ন জৈন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ।

অবৈদিক ধারার প্রধান শাখা জৈন ধর্মের ২৪ জন তীর্থংকরের সকলেই রাজকুলোদ্ভুত এবং দুই জন ব্যতীত সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ২০ জন তীর্থংকরই পশ্চিমবঙ্গের (বৃহৎবঙ্গের) নিকটবর্তী বর্তমান বিহার প্রদেশের হাজারীবাগ জেলার পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেৎ শিখরে) নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

জৈন ধর্মের আদি প্রবর্তক ঋষভদেব বা আদিনাথ। অষ্টাপদ পাহাড়ে তাঁহার তিরোধান হয়। তাঁহার লাঞ্ছন বৃষ। ভাগবতে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

অষ্টম তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভ রাজা মহাসেন ও রাজ্ঞী লক্ষ্মণার পুত্র। তাঁহার বর্ণ শ্বেত এবং লাঞ্ছন চন্দ্র। তিনি সমেৎ শিখরে তিরোধান করিয়া ছিলেন।

ষোড়শতম তীর্থংকর শান্তিনাথ রাজা বিশ্বসেন ও রাজ্ঞী অচিরার পুত্র। তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল এবং লাঞ্ছন মৃগ। তিনি সমেৎ শিখরে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্বিংশতিতম তীর্থংকর মহাবীর বা বর্দ্ধমান রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র। তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল এবং লাঞ্ছন সিংহ। তিনি ৫৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আবির্ভূত হইয়া ৪৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিহারের পাবা পুরীতে নির্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে মূর্তিগুলির আংশিক বর্ণনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে। নির্দিষ্ট লাঞ্ছন ভিন্ন সকল তীর্থংকর মূর্তির রূপ একই প্রকার।

নগ্ন তীর্থংকর কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে ত্রিরথ বেদীর উপরিস্থিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। মস্তক বৃক্ষের (আম্রবৃক্ষ বা অশোক বৃক্ষ) ছত্র ছায়ায় আচ্ছাদিত। মুখাবয়বে আনন্দ-সুন্দর মৌন অভিব্যঞ্জনা প্রস্ফূটিত। কেশবিন্যাস জটা-জুটাকারে স্কন্ধে অবলুণ্ঠিত (অথবা পশমবৎ কুঞ্চিত কেশরাশি উষ্ণীষ দ্বারা অলংকৃত)। তীর্থংকরের দুই পার্শ্বের চামর আন্দোলন রত চামরধারীর বেশ ও অলংকার বিগত যুগের ঐতিহাসিক উপাদান। বেদীর মধ্যংশে লাঞ্ছনের দুই পার্শ্বে দুই অনুগত সিংহ। বেদীর নিম্নাংশে ভক্তবৃন্দ অঞ্জলি মুদ্রায় উপাসনা রত। আয়তাকার প্রস্তর ফলকের (তীক্ষ্ণাগ্র ফলকের) উর্দ্ধাংশে মাল্য (রত্ন বা কিরীট) বাহক দুই উদয়োন্মুখ বিদ্যাধর (বিদ্যাধরী বা যুগল মূর্তি)। ফলকের মধ্যাংশে মূলমূর্তির দুই পার্শ্বে ২৪টি (৮টি বা ৪টি) যুগল নগ্ন তীর্থংকর সারিবদ্ধ ভাবে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথ রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাদেবীর পুত্র। ৮৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সমেৎশিখরে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ নীল এবং লাঞ্ছন সর্প।

তীর্থংকর পার্শ্বনাথ পদ্মের উপর ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট এবং সাতটি সর্পের ছত্র ছায়ায় আচ্ছাদিত। দুই চামর ধারী তাঁহার দুই পার্শ্বে চামর আন্দোলন রত। আয়তাকার

ফলকের উদ্ধ'াংশে দুই উদরোন্মুখ বিদ্যাধর মাল্য বাহক। বেদীর মধ্যাংশের সর্পাঞ্চলের দুই পার্শ্বে দুই অনুগত সিংহ।

একটি বৃহৎ আয়তাকার ফলকের অবশিষ্টাংশে ৩৬৪ জন নগ্ন তীর্থংকর সারিবদ্ধ ভাবে উদ্ধ'াংশ হইতে নিম্নাংশ পর্যন্ত কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। একটি মাত্র তীর্থংকর ফলকের উদ্ধ'াংশে ধ্যান মুদ্রায় উপবিষ্ট।

জৈন দেবী দ্বিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। দক্ষিণ হস্তের আয়ুধ নিরূপণ অসম্ভব। দেবী বামহস্তে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করিতেছেন। দেবীর বেশ ও অলংকার দশম বা একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক উপাদান। আয়তাকার ফলকটির উদ্ধ'াংশে পঞ্চ-তীর্থংকর ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট। বেদীর নিম্নাংশে দুই ভক্তবৃন্দ অঞ্জলি হস্তে উপাসনারত।

নেমিনাথের যক্ষী দেবী অম্বিকা দ্বিভঙ্গ ভঙ্গীতে আম্রবৃক্ষের ছত্র ছায়ায় দণ্ডায়মান। দেবীর কেশ বিন্যাস করন্দমুকুট দ্বারা আবদ্ধ। দেবীর বেশ ও অলংকার দশম শতাব্দীর সাক্ষীরূপ। তীর্থংকর নেমিনাথ দেবীর সিঁথিতে ধ্যানমগ্ন। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষ মূর্তি দণ্ডায়মান। আয়তাকার ফলকের উদ্ধ'াংশে দুই মাল্য বাহক বিদ্যাধর। বেদীর নিম্নাংশে দুই আনত সিংহ।

জৈন শাসনদেব ও দেবী অর্দ্ধ' পর্যংকাসনে অশোক বৃক্ষের ছত্র ছায়ায় উপবিষ্ট, পুরুষ মূর্তির দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রায় এবং বামহস্ত উরুর উপর স্থাপিত। দেবীমূর্তির বাম অংকে সন্তান উপবিষ্ট। দেবীমূর্তির কেশ বিন্যাস ধামিল্লা গঠন প্রণালীতে নিবদ্ধ। দেবীর উব্বসূত্র, কর্ণকুণ্ডলী, মণিবন্ধ, বাজুবন্ধ এবং পুরুষ মূর্তির কিরীট ও বেশ বিগত শতাব্দীর পরিচায়ক। আয়তাকার ফলকের উদ্ধ'াংশে দুই উদরোন্মুখ বিদ্যাধর। বেদীর নিম্নাংশে সন্তান সহ উপবিষ্ট সপ্ত মাতৃ মূর্তি।

ক্ষুদ্রাকয় জৈন দেবদেউলের কলস, বেঁকী, আমলক, খুপরি, ভূমি, এবং বাঢ় অংশের বরন্দ, জম্মা, পৃষ্টর স্থাপত্যরীতি দর্শনীয়। গর্ভীর রহপাগরে সকল কুলুঙ্গীর মধ্যে তীর্থংকরের আসন ও স্থানক—এক বা ততোধিক মূর্তির সমাবেশ। বাঢ় অংশের চারটি কুলুঙ্গীতে একটি করিয়া তীর্থংকরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনরাজ

[গুজরাত কাহিনী]

সে অনেক কাল আগের কথা। গুজরাত যখন গুজরাত রূপে পরিচিত হয় নি, যখন তা কান্যকুব্জের আর দশটি পরগণার মত একটি পরগণা মাত্র ছিল সেদিন গুজরাতের বাঢ়িয়ার জেলার পঞ্চশর গ্রামে চাপোৎকট বংশের এক দুখিনী বিধবা বাস করত। ছ'মাসের ছোট্ট একটি ছেলে ছাড়া সংসারে আপন বলতে তার আর কেউ ছিল না। ছেলেটির জন্মের কিছুদিন পরেই তার স্বামী মারা যায়। সেদিন সে হয়ত তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেত কিন্তু ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে তা সে পারে নি। তাকে বড় করে তুলবার দায়িত্ব যে এখন তারই। নিজের জন্য যেমন তেমন কিন্তু ছেলেটির জন্য এখন তাকে বনে কাঠ কুড়োতে যেতে হয়। সামান্য কাঠ। সেই কাঠ কুড়িয়ে এনে ফিরি করে গ্রামে সে বিক্রী করে। তাতে যে দু' পয়সা পায় তাই দিয়ে সংসার চালায়।

সকাল হতে না হতেই সে বনে কাঠ কুড়োতে যায়। সেখানে কত রকমের গাছ, কত রকমের লতা, গুল্ম। সকালের হিমেল বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ ভাসে। না, ঘরের তার কোনো আকর্ষণ নেই। ছেলেটিকে পিঠে করে বেঁধে নিয়ে আসে। বনে এসে সেই কাপড় ঝোলার মত করে গাছের ডালে বেঁধে দেয়। তারপর ছেলেটিকে তাতে শুইয়ে দিয়ে সারাদিন কাঠ কুড়োয়। ছেলেটি কেঁদে উঠলে বুকের দুধ খাওয়ায়, নিজের খিদে পেলে বাজরার শুকনো রুটি যা সে সঙ্গে নিয়ে আসে ঝরণার জলে তা ভিজিয়ে খায়। ঘুম পেলে গাছের তলায় আঁচল পেতে একটুখানি ঘুমিয়ে নেয়। তারপর সন্ধ্যা হতে সেই ছেলেটিকে পিঠে বেঁধে কাঠের বোঝা মাথায় করে গ্রামে ফিরে আসে। যেসব ঘরে কাঠের যোগান দেবার থাকে সে সব ঘরে যোগান দেয়। যে দু'চার পয়সা পায় তাই দিয়ে বাজরা কিনে আনে। তারপর চাকিতে তা পিসে চারখানা মোটা মোটা রুটি তৈরী করে। দু'খানা রুটি একটুখানি 'শক্কর' বা লবণ দিয়ে খায়। বাকি দু'খানা সকালের জন্য তুলে রাখে। এমনি করে তার দিন যায়।

এমনি একদিন ছেলেটিকে যখন সে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে কাঠ কুড়াচ্ছিল, সেদিন সেই বনের পথ দিয়ে এলেন এক জৈন আচার্য। নাম শীলগুণ সূরি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সেই গাছের উপর পড়লো যার ডালে ঝোলা ঝুলছিল। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। তাই গাছের ছায়া তীর্যক হয়ে পড়বার কথা কিন্তু যখন আর আর

গাছের ছায়া তীর্যক হয়ে পড়েছে তখন সেই গাছের ছায়া স্থির হয়ে আছে। দেখেই তিনি বুঝলেন ঝোলায় যে ছেলেটি শুয়ে রয়েছে এ তারই পুণ্যে—যাতে তার চোখে মুখে রোদ না লাগে। শীলগুণ সূরী তখন ভাবলেন ছেলেটি কালে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবে। তাই যদি একে আমি এখন উপাশ্রয়ে নিয়ে যাই ও সেখানে বড় করে তুলি তবে একে নিয়ে জৈন ধর্ম প্রচারের অনেক সুবিধে হবে—কে জানে কালে ও একজন বড় আচার্যওত হতে পারে।

শীলগুণ সূরী তাই ছেলেটির মা'র কাছে গিয়ে ছেলেটিকে নিজের জন্য চাইলেন। কিন্তু মা তাঁর ছেলেটিকে প্রথমে তাঁকে দিতে চাইলে না। কিন্তু যখন দেখলে তাইতে ছেলের ভালো তখন তাকে তাঁর হাতে তুলে দিলে। শীলগুণ সূরি ছেলেটিকে সাধ্বী বীরমতীর হাতে তুলে দিলেন। যাবার আগে গ্রামের লোকদের বলে তার মায়ের একটা বৃত্তির ব্যবস্থাও করে দিয়ে গেলেন যাতে তার কোনো কষ্ট না হয়। আর বন গাছের ডালে সেই ছেলেটিকে প্রথম দেখেছিলেন বলে তার নাম দিলেন বনরাজ।

বনরাজ সেই হতে সাধ্বী বীরমতীর কাছে বড় হতে লাগল।

বনরাজের যখন লেখাপড়া শেখার বয়স হল তখন বীরমতী তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন কিন্তু বনরাজের লেখাপড়া শেখার চাইতে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই বেশী পছন্দ। তাই ফাঁক পেলেই সে উপাশ্রয় হতে পালিয়ে আসে। তারপর বন বাদাড়ে ফড়িং প্রজাপতির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, পাখীর বাসায় হাত দেয়, গাছের ডালে দোল খায়। ঝিলের জলে গা ভাসিয়ে স্নান করে। বীরমতী সে সবের কিছু কিছু জানতে পারেন, কিছু কিছু জানতে পারেন না।

ক্রমে সে আরো বড় হয়। বীরমতী তাকে আচার বিচারের শিক্ষা দেন কিন্তু সে কিছু যে শেখে তা মনে হয় না। যতক্ষণ তিনি সামনে থাকেন ততক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকে কিন্তু যেই তিনি একটু অন্য দিকে যান অমনি সে ছুটে পলায়। শাসন করেন কিন্তু সে শাসনে কাজ হয় না।

এর মধ্যে দেখা দিয়েছে আর এক নূতন উপসর্গ। বনে বনে ঘুরবার সময় তার এক ভীল বালকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার হাতে কী সুন্দর তীর ধনুক। তারও ওই রকম তীর ধনুক চাই। একদিন সে সেকথা বলল বীরমতীকে। বীরমতী শুনে কানে আঙুল দিলেন। বললেন, তুই না সাধু। তুই তীর ধনুক নিয়ে কি করবি?

কিন্তু বনরাজ তাতে দমিত হল না। সারাদিন গাছের তলায় বসে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ধনুক তৈরী করল। কিন্তু তীর? বাঁশের কঞ্চিতে তীরের কাজ হয় না। কঞ্চির মুখে লোহার ফলা চাই। লোহার ফলা এখন সে কোথায় পায়?

সেই ভীল বালকই যখন বনরাজের সেই ধনুক দেখল তখন লোহার ফলাই নয়, সত্যিকার তীর ধনুক এনে দিল। সত্যিকার তীর ধনুক পেয়ে বনরাজের সে কি

আনন্দ। তারপর তীর ধনুক নিয়ে দুই বন্ধুতে শিকার করতে বেরুল।

কিছুদিন যেতে না যেতে বনরাজের শিকারে বেশ পাকা হাত হল। সেও এখন এক তীরে ভীল বালকের মত হরিণ, বরা কি পাখী মারতে পারে। কিন্তু সেসব কিছু সে উপাশ্রয়ে আনতে পারে না। ভীল বালককে দিয়ে দেয়। তীর ধনুক গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখে।

বীরমতী বনরাজের উপাশ্রয়ের বাইরে যাওয়া এবারে পুরোপুরি বন্ধ করতে চাইলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, লেখাপড়া না করিস না কর, উপাশ্রয়ে দেবপূজার জন্য কত শষ্য আসে ইঁদুরের হাত হতে তা রক্ষা কর।

বনরাজ সেকথা শুনে তখুনি বাইরে ছুটে গেল ও গাছের কোটরে লুকোনো তীর ধনুক এনে ইঁদুর মারতে আরম্ভ করল। তাই দেখে বীরমতী হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কি করিস তুই ? কি করিস তুই ?

বনরাজ বলল, দণ্ড ছাড়া এদের আর কোনো উপায়ে নিবৃত্ত করা যাবে না।

বীরমতী এবার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ ছেলেকে নিয়ে তিনি কী করবেন ? তাই তিনি সমস্ত কথা গিয়ে আচার্যকে নিবেদন করলেন। আচার্য যখন দেখলেন যে সে প্রভাবক আচার্য হবে না, রাজা হবে, তখন তাকে নিয়ে গিয়ে তার মা'র কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়ে এলেন।

মা তখন সেই গ্রাম ছেড়ে এক পল্লীতে গিয়ে তার ভায়ের কাছে বাস করছিল। বনরাজ এখন তাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

বনরাজ কিছুদিন যেতে না যেতে তার মামার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবার কারণ ছিল। কারণ তার মামা ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করত। বনরাজ এখন তার সাকরেদ হল। তার মামা এখন যেখানে ডাকাতি করতে যায় বনরাজকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। বনরাজেরও এসব কাজে খুব উৎসাহ। কত সোনাদানা কত ধনরত্ন তারা লুট করে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ঘোড়ায় চড়াও সে অভ্যেস করে নিয়েছে। সঙ্গীও জুটে গেছে তার কয়েক জন। বনরাজের সাহসে বীরত্বে মামাও খুব খুসী। এখন বনরাজকেই সে একা একা ডাকাতি করতে পাঠিয়ে দেয়।

বনরাজ ডাকাতি করে। লোকজন খুন জখমও করে কিন্তু সব সময় তার মনে একটা ইচ্ছা জেগে থাকে—সে রাজা হবে। কারণ সেই কথাই তাকে ফিরিয়ে দেবার সময় শীলগুণ সূরি বলেছিলেন। তাই সে ছোট কাজ করে না—ডাকাতি করা কি ছোট কাজ ? না। এতো সাহসের কাজ। তাছাড়া ছোটখাট রাজাও ত সে হয়ে পড়েছে। তার অনুচরেরা তাকে যে রাজা বলে ডাকে।

বনরাজ ডাকাতি করে কিন্তু রাজা হবার স্বপ্ন দেখে।

একবারের কথা। কাকর গ্রামে সে ডাকাতি করতে গেছে। বণিকের ঘরে

সিঁধ দিয়ে সে অনেক ধনরত্ন লুট করেছে। রাতের অন্ধকারে হাঁড়িতে কুঁড়িতে হাত দিতে গিয়ে সে সহসা দইয়ের হাঁড়িতে হাত দিয়ে ফেলেছে। বনরাজ এমন বেকায়দায় আর কখনো পড়েনি। সে হাত ধুয়ে তখন তখনি তার দল বল নিয়ে চলে গেল। সেই বাড়ীর একটী পয়সাও ছুঁল না।

দরজার ফাঁক দিয়ে এর সমস্ত কিছু দেখল বণিকের বোন শ্রীদেবী। তার কেমন যেন খটকা লাগল। এত যেমন তেমন ডাকাত নয়। তাছাড়া বনরাজের সুন্দর চেহারা দেখে তার মনে হয়ত একটু মায়াও হয়েছিল। তাই সে তার সন্ধান নিয়ে পরদিন রাত্রে গোপনে তাকে ডেকে পাঠাল। বনরাজ এলে ভাইয়ের মত তার আদর করে তাকে কাছে বসিয়ে জিগ্যেস করল, ভাই কাল তুমি সমস্ত ধন লুটে নিয়েও কিছু না নিয়ে চলে গেলে কেন ?

বনরাজ প্রত্যুত্তর দিল, যার ঘরে হাত ধুয়েছি তার ঘরে ডাকাতি করতে পারি না। হাত ধোওয়া অর্থ খাওয়া।

শুনে শ্রীদেবীর চোখে জল এল। বলল, বনরাজ, আজ হতে তুমি আমার ভাই। বলে সে তাকে আদর করে খাওয়ালো, পরবার কাপড় দিল। বনরাজের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। সে তাকে বলল, বোন, আমার কোনো বোন ছিল না, আজ হতে তুমি আমার বোন। আমি যখন রাজা হব তুমি তখন আমার কপালে রাজটীকা এঁকে দেবে।

আর একদিনের কথা। বনরাজ ডাকাতি করতে যাচ্ছে। সঙ্গে তিনজন সঙ্গী। তার সঙ্গীরা পথের মধ্যে এক বণিককে ঘিরে ফেলেছে। নাম তার জাম্বা।

জাম্বার কাছে পাঁচটি তীর ছিল। তিনজন ডাকাতকে তাকে ঘিরতে দেখে তার পাঁচটি তীরের দুটী তীর সে ভেঙ্গে ফেলল। তাই দেখে ডাকাতেরা তাকে দুটী তীর ভেঙে ফেলার কারণ জিগ্যেস করল।

জাম্বা বলল, তোমরা মাত্র তিনজন তাই পাঁচ তীরের কি প্রয়োজন আমার তিনটি তীরই যথেষ্ট বলে সে তীর ছুঁড়ে উড়ন্ত এক পাখীকে মাটিতে ফেলে দিল। তাই দেখে খুসী হয়ে তারা তাকে বনরাজের কাছে নিয়ে গেল। বনরাজ সমস্ত শুনে তাকে ছেড়ে দিল। বলল, ভাই তুমি খুব ভাল তীরন্দাজ। আমি যখন রাজা হব তখন তোমাকে আমার মন্ত্রী করে নেব।

তারপর বনরাজের রাজা হবার স্বপ্ন সত্যি একদিন সফল হল।

আগেই বলেছি গুজরাত রাজ্য তখন কান্যকুব্জের অধীন ছিল। কান্যকুব্জের রাজা তাঁর এক মেয়ের বিয়েতে সেই রাজ্য তাঁর জামাতা পঞ্চকুলের রাজপুত্রকে যৌতুক দিলেন। পঞ্চকুলের রাজপুত্র কর আদায় করতে গুজরাত রাজ্যে এলেন। সেখানে এসে বনরাজের নাম ডাক শুনে তাকে নিজের রক্ষীবাহিনীর সেনানায়ক করে নিলেন।

তারপর যখন ছমাস পরে কর আদায় করে ২৪ লক্ষ চাঁদির টাকা ও ৪ হাজার তেজী ভালো ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন বনরাজ সৌরাষ্ট্রের কাছে তাঁকে নিহত করে তাঁর সমস্ত ধন রত্ন ঘোড়া হাতী অধিকার করে নিল। পঞ্চকুল বা কান্যকুব্জ হতে সৈন্য আসে এই ভয়ে সে এক বছর জঙ্গলে জঙ্গলে লুকিয়ে রইল। তারপর রাজ্যপত্তন করে রাজধানী স্থাপনের জন্য ভালো জায়গার সন্ধানে চারদিকে লোক পাঠাল।

পীপলুলা সরোবরের তীরে নিম গাছের নীচে বসে ভারুয়াড় সখেড়ার ছেলে অণহিল্ল মেঠো সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল বনরাজের লোকের ওপর যারা উপযুক্ত মাটির সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে তাদের কাছে গিয়ে বলল, এখানে তোমরা কি খুঁজছ? তারা বলল, আমরা নগর বসানোর উপযুক্ত জমির সন্ধান করছি। সে বলল, সেরকম জমির সন্ধান আমি দিতে পারি যদি আমার নামে সেই নগরের নাম রাখ। বলে সে তাদের জালি গাছের নিকট নিয়ে গিয়ে যে জমিতে খরগোস দেখে কুকুরেরা ভয়ে পালিয়ে যেত সেই জমি দেখিয়ে দিল।

সেই জমি পছন্দ হওয়ায় বনরাজ সেইখানে নূতন নগর পত্তন করল ও তার নাম রাখল অণহিল্ল পুর।

দেখতে দেখতে যেখানে শুধু মাঠ পড়েছিল সেখানে এক বিরাট সহর গড়ে উঠল। সেই জালি গাছের কাছে নূতন রাজবাড়ী হল। তার পর এক শুভ দিন দেখে বনরাজ সিংহাসনে বসল। ৮০২ বিক্রমাব্দের বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়ায় তার রাজ্যাভিষেক হল। রাজ্যাভিষেকের সময় সে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। কাকর গ্রাম হতে সে শ্রীদেবীকে ডাকিয়ে আনাল। সে বনরাজের কপালে তিলক এঁকে দিল। জাংবা বণিকও এল। সে প্রধানমন্ত্রী হল। আর এলেন শীলগুণসূরি। বনরাজ শীলগুণসূরিকে সিংহাসনে বসিয়ে সমস্ত গুজরাত রাজ্য তাঁকে দান করে দিল। শীলগুণসূরিত রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন না তাই সেই রাজ্য তিনি বনরাজকেই আবার ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর হয়ে ন্যায়ের জন্য ধর্মের জন্য সেইরাজ্য পরিচালনা করতে বললেন। বনরাজ নিজের গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পঞ্চসর গ্রামে পঞ্চসর চৈত্য নির্মাণ করিয়ে সেখানে পার্শ্বনাথ প্রতিমা স্থাপিত করল। গুজরাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সেই হল শুরু।

মেরুতুঙ্গাচার্যের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' অবলম্বনে

প্রজ্ঞাচক্ষু পণ্ডিত সুখলাল সাংঘবী

বিগত ২ মার্চ জৈন ও ভারতীয় দর্শনের প্রখ্যাত বিদ্বান পণ্ডিত সুখলালজী ৮৮ বছর বয়সে আহমদাবাদে পরলোক গমন করেছেন। যদিও তাঁর মৃত্যু পরিণত বয়সেই হয়েছে তবু তাঁকে হারিয়ে জৈন বাঙ্ময় তার এক অনন্য সেবককে হারাল।

১৮৮০ খৃস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর সৌরাষ্ট্রের লিমলি নামে এক ছোট্ট গ্রামে সুখলালজীর জন্ম হয়। যখন তাঁর বয়স মাত্র সাত, যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় পারিবারিক কারণে লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁকে দোকানে বসতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু যে জীবন বিধাতা তাঁর জন্য প্রস্তুত করেননি সে জীবন তাঁর অধিক দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ষোল বছর বয়সে এক দুঃখদ ঘটনায় তাঁর সেই জীবন শেষ হয়ে যায় ও সুরু হয় তাঁর আপন জীবন। সেই দুঃখদ ঘটনা হল বসন্ত রোগে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সে আঘাত তাঁর নিজের পক্ষেও যেমন গুরুতর ছিল তেমনি গুরুতর ছিল তাঁর পরিবারের পক্ষেও। তবু তা তরুণ সুখলালকে দমিত করে নি। বাইরের আলো নিভে গেলেও তাঁর অন্তরের আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় খুঁজে পেলেন তিনি তাঁর আপন জীবন। জাগ্রত হল তাঁর মনে জ্ঞানের পিপাসা—সে জ্ঞান যেখান হতে আসুক না কেন যেমন করেই আসুক না কেন তাঁকে পেতে হবে। তিনি জৈন ছিলেন। তাই উপাশ্রয়ে গিয়ে জৈন সাধুদের নিকট হতে জৈন ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে গ্রামের সংকীর্ণ সীমায় যতটুকু জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিল ততটুকু জ্ঞান আহরণ করে তিনি আরো জ্ঞান লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বুঝলেন যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পূর্ণজ্ঞানের জন্য চাই তাঁর সংস্কৃতের ওপর পূর্ণ অধিকার। এবং সেই জ্ঞান চর্চার তখন প্রধান কেন্দ্র ছিল বারাণসী। জ্ঞানান্বেষী সুখলাল তাই নানা বাধা বিপত্তি সত্বেও চলে এলেন বারাণসী। দৃষ্টিশক্তিহীন সুখলালের সেই জ্ঞান পিপাসা সকলকে আকৃষ্ট করল, মুগ্ধ করল তাঁর মেধা ও একাগ্র অভিনিবেশ। বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করে ন্যায়, দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভের জন্য সুখলাল এলেন মিথিলায়। মিথিলায় তিনি কয়েক বছর কাটিয়ে দিলেন। এভাবে জীবনের ষোল বছর জ্ঞানের আহরণে তিনি নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে দিলেন। এই নিঃশেষ দেওয়ায় মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি জৈন

তথা ভারতীয় ন্যায়, ধর্ম ও দর্শনের প্রমুখ বিদ্বানরূপে বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট পরিচিত হলেন।

অধ্যয়নকে তপস্যা রূপে গ্রহণ করলেও সুখলালজী দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে একেবারে চিন্তা করতেন না তা নয়। সেই সময় ছিল গান্ধীজীর যুগ। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তাধারা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি মহাবীর কথিত সর্বোদয় ও অহিংসার নূতন রূপ দেখতে পেলেন। তাই তিনি গান্ধীজীর অনন্য অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে গেলেন। মিথিলা হতে তিনি সবরমতী আশ্রমে এসে আশ্রমিক জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন। আশ্রমজীবন ও গান্ধীজীর সাহচর্য তাঁর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে দিল যে দর্শনের উদ্দেশ্যই হল সমাজকে দর্শনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারা পুনর্গঠিত করা। ধর্মের পরিপূর্ণতার জন্য চাই সর্বোদয়।

জাতীয় শিক্ষা দিবার জন্য যখন গুজরাট বিদ্যাপীঠের স্থাপনা হয় তখন তিনি গান্ধীজীর আহ্বানে এই বিদ্যাপীঠে একজন অধ্যাপক রূপে যোগ দিলেন। এই বিদ্যাপীঠে তখন তাঁর সহকর্মী ছিলেন সর্বশ্রী কাকা কালেলকর, আচার্য জে. বি. কৃপালনী, কিশোরলাল ঘনশ্যাম মশরুবালা, নানাভাই ভাট, পণ্ডিত বেচরদাসজী ও মুনি জিন বিজয়জী। গুজরাট বিদ্যাপীঠে অবস্থান কালেই তিনি পণ্ডিত বেচরদাসজীর সহযোগিতায় সিদ্ধসেন দিবাকরের প্রখ্যাত ন্যায় গ্রন্থ 'সন্মতি তর্কে'র সম্পাদন করতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Dr. Jacobi ও Prof. Leumann এই গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহের ডাক দেন তখন তাতে যোগ দেবার জন্য সুখলালজী উৎসুক হয়ে ওঠেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীনতার জন্য সেই আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে পারেন নি। তা হতে তাঁকে বিরত থাকতে হয়। সেই অবসরের তিনি সুব্যবহার করেন ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করে যাতে পাশ্চাত্য দর্শনের গ্রন্থ তিনি সরাসরি বুঝতে পারেন।

১৯৩৩ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈন দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও দশ বছর সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নূতন গবেষণার্থীদের মনে যে কেবল অনুপ্রেরণাই জাগাতেন তাই নয়, তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিতও করতেন যার ফলে তাঁদের অবদানে প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আহমদাবাদে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন তবু তিনি তখনও তরুণ গবেষণার্থীদের সক্রিয়ভাবে গবেষণায় সাহায্য করতেন। সত্যি বলতে কি তিনি

যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই বইত জ্ঞানের আবহাওয়া। ডাঃ উপাধ্যের ভাষায়, 'সুখলালজী ছিলেন জৈন দর্শনের একজন মর্মজ্ঞ পণ্ডিত। সেই জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন ভারতীয় বিদ্যা ও চিন্তাধারার উদার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্র ছিল ধর্ম জাতি দেশ ও সম্প্রদায় দ্বারা অস্পৃষ্ট। তাঁর চিন্তাপ্রণালী ছিল দেশ কাল পরিচ্ছন্ন, অখণ্ড ও অবিভাজ্য। তিনি ছিলেন জ্ঞানের আলোক বর্তিকা যা অন্যের প্রাণে জ্ঞানের পিপাসা প্রজ্বলিত করত। যেখানেই তিনি অবস্থান করতেন সেইখানেই জ্ঞানের অবাধ আবহাওয়া প্রবাহিত হত।' পণ্ডিতজী দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন আমাদের অনেকের চেয়ে বেশী চক্ষুষ্মান। কারণ তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা-চক্ষু। এবং এই প্রজ্ঞাচক্ষুত্বের জন্যই তিনি তাঁর কালকে প্রভাবিত করে গেছেন। টি. আর. ভি. মূর্তি ঠিকই বলেছেন, 'বিগত ৪০ বছরেরও ওপর পণ্ডিতজী তাঁর গভীর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য করে গেছেন।'

১৯৫৭ সালে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য বম্বেতে এক সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়। সেই সভায় পৌরহিত্য করেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। কেবল জৈন ন্যায় ও দর্শনই নয়, ভারতীয় ষড়দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের ওপর পণ্ডিতজীর অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন। সেই বছরই গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানীয় ডাঃ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানীয় ডি. লিট্ উপাধি প্রদান করে।

এদিকে কিছুদিন যাবৎ তাঁর স্বাস্থ্য ভাল চলছিল না তবুও তিনি মানসিক ভাবে ছিলেন সদা সজাগ। যাঁরাই তাঁর সম্পর্কে এসেছেন তাঁরাই তাঁর চিন্তাশক্তির ক্ষুর-ধারতা ও ব্যাপকতায় সেই সময়ও বিস্মিত হয়েছেন।

তিনি প্রায় ২৫ খানি বই-এর অনুবাদ, সম্পাদন বা রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধসেন দিবাকরের 'সম্মতি তর্ক', হেমচন্দ্রাচার্যের 'প্রমাণ মীমাংসা' ও উমাস্বাতীর 'তত্ত্বার্থসূত্র'। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা হিন্দী ও গুজরাতী রচনার সংগ্রহ 'দর্শন ও চিন্তন' ৩ খণ্ডে প্রকাশিত করা হয়েছে।

তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা দেবার সময় তাঁকে যে এক লক্ষ টাকার অনুদান দেন সেই একলক্ষ টাকার তিনি একটি স্বতন্ত্র ট্রাষ্ট করে দেন। মুখ্যতঃ সেই ট্রাষ্টের টাকায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম প্রগতিমূলক একটি জৈন গবেষণা কেন্দ্র যেখানে বহু তরুণ বিদ্যার্থী গবেষণার সুযোগ পান এবং যেখান হতে তাঁদের গবেষিত গ্রন্থ প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

পণ্ডিত সুখলালজীর মত মানুষ একালে কেন সর্বকালেই দুর্লভ।

পণ্ডিতজী কর্তৃক অনূদিত, সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থের তালিকা

১। আত্মানুশাস্তিকুলক, মূল প্রাকৃত, গুজরাতী অনুবাদ ও টিপ্পণ সহ, ১৯১৪-১৫।

২-৫। কর্মগ্রন্থ ৪ ভাগ, মূল প্রাকৃত দেবেন্দ্র সূরিকৃত, হিন্দী অনুবাদ, বিবেচন, প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা, ১৯১৫-২০।

৬। দণ্ডক, মূল প্রাকৃত, হিন্দী সংক্ষিপ্ত সার সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা ১৯২১।

৭। পঞ্চপ্রতিক্রমণ, জৈন আচার বিষয়ক গ্রন্থ, মূল প্রাকৃত, হিন্দী অনুবাদ, বিবেচন ও প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা, ১৯২১।

৮। যোগদর্শন, মূল পাতঞ্জল যোগসূত্র, বৃত্তি উপাধ্যায় যশোবিজয়কৃত ও হরিভদ্র সূরিকৃত প্রাকৃত যোগ বিংশিকা, সংস্কৃত টীকা উপাধ্যায় যশোবিজয়, হিন্দী সংক্ষিপ্তসার, বিবেচন ও প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক আত্মানন্দ জৈন পুস্তক প্রচারক মণ্ডল, আগ্‌রা, ১৯২২।

৯। সন্মতি তর্ক, মূল প্রাকৃত সিদ্ধসেন দিবাকরকৃত, সংস্কৃত টীকা অভয়দেব সূরি কৃত, পণ্ডিত বেচরদাসজীর সহযোগিতায় টিপ্পণি ও পরিশিষ্ট সহ সম্পাদন। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, আহমদাবাদ হতে ১৯২৫-৩২ এর মধ্যে পাঁচ ভাগে প্রকাশিত। সন্মতিতর্ক (প্রাকৃত) নামক ষষ্ঠ ভাগ গুজরাত বিদ্যাপীঠ দ্বারা গুজরাতী অনুবাদ, বিবেচন তথা প্রস্তাবনা সহ প্রকাশিত। ষষ্ঠভাগের ইংরেজী অনুবাদ শ্বেতাম্বর জৈন কনফারেন্স কর্তৃক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

১০। জৈন দৃষ্টিএ ব্রহ্মচর্য বিচার, গুজরাতী, পণ্ডিত বেচরদাসজীর সহযোগিতায়। প্রকাশক গুজরাত বিদ্যাপীঠ, আহমদাবাদ।

১১। তত্ত্বার্থসূত্র, উমাস্বাতীকৃত, গুজরাতী ও হিন্দীতে বিশদ বিবেচন ও বিস্তৃত প্রস্তাবনা সহ, ১৯৩০। গুজরাতী সংস্করণ গুজরাত বিদ্যাপীঠ কর্তৃক প্রকাশিত। চার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী সংস্করণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত করেন শ্রীআত্মানন্দ জন্ম শতাব্দী স্মারক সমিতি, বম্বে। দ্বিতীয় সংস্করণ জৈন সংস্কৃতি সংশোধন মণ্ডল, বারাণসী, ভারত জৈন মহামণ্ডল, ওয়ার্ধার সহযোগিতায় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন।

ডাঃ কে. কে. দীক্ষিত কৃত এর ইংরেজী অনুবাদ এল. ডি. ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, আহমদাবাদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হিন্দী সংস্করণ পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম শোধ সংস্থান বারাণসী কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১২। ন্যায়াবতার, সিদ্ধসেন দিবাকরকৃত। জৈন ন্যায় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, অনুবাদ, বিবেচন এবং প্রস্তাবনা সহ। 'জৈন সাহিত্য সংশোধক'-এ প্রকাশিত, ১৯২৫।

১৩। প্রমাণ মীমাংসা, আচার্য হেমচন্দ্রকৃত জৈন ন্যায় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, হিন্দী প্রস্তাবনা ও টিপ্পণ সহ। প্রকাশক সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বম্বে, ১৯৩৯। এর প্রস্তাবনা ও টিপ্পণের ইংরেজী অনুবাদ 'এডবান্স ষ্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান লজিক এ্যাণ্ড মেটাফিজিক্স' নামে ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ, পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট, কলিকাতা দ্বারা ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪। জৈন তর্ক ভাষা, উপাধ্যায় যশোবিজয়কৃত, জৈন ন্যায় বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, হিন্দী প্রস্তাবনা এবং সংস্কৃত টিপ্পণ সহ। প্রকাশক সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বম্বে, ১৯৪০।

১৫। জ্ঞান বিন্দু, উপাধ্যায় যশোবিজয়কৃত, মূল সংস্কৃত, হিন্দী প্রস্তাবনা এবং সংস্কৃত টিপ্পণ সহ। প্রকাশক সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বম্বে, ১৯৪৯।

১৬। তত্ত্বোপপ্লবসিংহ—জয়রাশিভট্ট কৃত চার্বাক পরম্পরার সংস্কৃত গ্রন্থ। ইংরেজী প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, বরোদা, ১৯৪০।

১৭। হেতুবিন্দু, ধর্মকীর্তিকৃত, বৌদ্ধন্যায়ের সংস্কৃত গ্রন্থ। অর্চটের টীকা, দুর্বেক মিশ্রের অনুটীকা ও ইংরেজী প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, বরোদা, ১৯৪৯।

১৮। বেদবাদদ্বাত্রিংশিকা, সিদ্ধসেন দিবাকর কৃত, মূল সংস্কৃত, গুজরাতী সার, বিবেচন ও প্রস্তাবনা সহ। প্রকাশক ভারতীয় বিদ্যাভবন, বম্বে ১৯৪৬। এর হিন্দি অনুবাদ এই প্রতিষ্ঠানের 'ভারতীয় বিদ্যা'য় প্রকাশিত হয়।

১৯। আধ্যাত্মিক বিকাশক্রম, গুজরাতীতে। এই গ্রন্থে 'গুণস্থানে'র বিবেচন করা হয়েছে। প্রকাশক শম্ভুলাল জে. সাহ, আহমদাবাদ, ১৯২৭।

২০। নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়, হিন্দীতে। মহত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের নিরূপণ। প্রকাশক জৈন সংস্কৃতি সংশোধন মণ্ডল, বারাণসী, ১৯৪৭।

২১। চার তীর্থংকর, হিন্দীতে। ঋষভদেব, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর

সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রকাশক জৈন সংস্কৃতি সংশোধন মণ্ডল, বারাণসী, ১৯৫৪। এর গুজরাতী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২২। ধর্ম ঔর সমাজ, হিন্দীতে লিখিত প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রকাশক হিন্দী গ্রন্থরত্নাকর কার্যালয়, বম্বে, ১৯৫১।

২৩। অধ্যাত্ম বিচারণা, গুজরাত বিদ্যাসভা, আহমদাবাদ এর তত্ত্বাবধানে পোপট-লাল হেমচন্দ্র অধ্যাত্মব্যাখ্যান মালায় প্রদত্ত গুজরাতীতে তিন ব্যাখ্যান। প্রকাশক গুজরাত বিদ্যাসভা, অহমদাবাদ, ১৯৫৬। এর হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২৪। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা, মহারাজা সয়াজীরাও ইউনিভার্সিটি, বরোদার তত্ত্বাবধানে স্যার সয়াজীরাও অনরেরিয়াম ব্যাখ্যান মালায় প্রদত্ত গুজরাতীতে তিন ব্যাখ্যান। ডাঃ কে. কে. দীক্ষিতকৃত এর ইংরেজী অনুবাদ এল. ডি. ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির আহমদাবাদ কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান ফিলোসফী' নামে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২৫। দর্শন অনে চিন্তন, দুই ভাগ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধিত পণ্ডিতজীর গুজরাতী প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রকাশক পণ্ডিত সুখলালজী সন্মান সমিতি, আহমদাবাদ, ১৯৫৭।

২৬। দর্শন ঔর চিন্তন, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধিত পণ্ডিতজীর হিন্দীপ্রবন্ধেব সংগ্রহ। প্রকাশক পণ্ডিত সুখলালজী সন্মান সমিতি, আহমদাবাদ, ১৯৫৭।

২৭। সমদর্শী আচার্য হরিভদ্র, বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ঠক্কর বসনজী মাধবজী ব্যাখ্যানমালায় গুজরাতীতে প্রদত্ত ব্যাখ্যান। প্রকাশক বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১। এর হিন্দী অনুবাদ রাজস্থান প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, যোধপুর কর্তৃক ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত।

২৮। জৈন ধর্মনো প্রাণ, গুজরাতীতে, দর্শন অনে চিন্তন ও দর্শন ঔর চিন্তন হতে মনোনীত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রকাশক জগমোহনদাস কোরা স্মারক পুস্তকমালা, ১৯৬২। এর হিন্দী অনুবাদ সস্তা সাহিত্যমণ্ডল, নূতন দিল্লী হতে শ্রীবল্লভ স্মৃতি গ্রন্থমালায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

অভয়রুচি

[একাঙ্কিকা]

প্রথম দৃশ্য

[রাজা মারিদত্তের প্রমদোদ্যান। রাজা, বিচক্ষণাসহ রাণী ও বিদূষকের প্রবেশ। সময় ঃ প্রভাত]

মারিদত্ত ঃ দেবী, তোমায় আজ এক শুভ সংবাদ দি। ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। ষোড়শী বালিকারা ওষ্ঠে মদন বিলেপন করে না। সুরভিত তৈলে বেণী বন্ধন করে না। গাত্রে অল্পবাস পরিধান করে। এখন কংকুমে মুখ মার্জনও করে না।

দেবী ঃ আর্যপুত্র, আমিও আপনাকে এক সুসংবাদ দি। চন্দন সৌরভে সুবাসিত মলয় পবন এখন প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। ভ্রমর গুণগুণ করে কলিরূপ তরুণীদের মুখ মধু পান করছে।

বৈতালিক ঃ [ভেতর হতে] পূর্ব দেশাধিপতির জয় হোক্। রাজপুর নগরের ভূষণ স্বরূপ মহারাজ মারিদত্তের জয় হোক যিনি ভুজবলে রাঢ়দেশ জয় করেছেন, যাঁর বর্ণ সুবর্ণের চাইতেও আরো বেশী সুন্দর, নববসন্তের আবির্ভাব তাঁর প্রিয় হোক, সুখকর হোক।

মারিদত্ত ঃ দেবী, তুমি আমার প্রিয় এবং আমি তোমার প্রিয় এতদিন এই কথাই জানতাম। কিন্তু আজ দেখছি যে বৈতালিকদ্বয় কাঞ্চনচণ্ড ও রত্নচণ্ডও আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করছে। সহকার সংলগ্ন লতা নর্তকী বাতাসে আন্দোলিত হয়ে নৃত্য করছে। বসন্তপ্রিয়া কলকণ্ঠী কোকিলা পঞ্চম স্বরে গান গাচ্ছে। পৃথিবীর প্রিয় বয়স্য বসন্ত আজ সমাগত। প্রিয়ে, এই বসন্তোৎসবকে তুমি তোমার সহযোগিতায় সফল কর।

কপিঞ্জল ঃ দেখো, তোমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র পণ্ডিত। কারণ আমার শ্বশুরের শ্বশুর এক পণ্ডিতের ঘরে পুস্তক বহন করত।

বিচক্ষণা ঃ [হেসে] ওঃ। ...মনে হচ্ছে তোমার পাণ্ডিত্য কুল পরম্পরা গত।

কপিঞ্জল ঃ (ক্রুদ্ধ হয়ে] তুইত মাত্র দাসীই। তুই কি বুঝবি আমার পাণ্ডিত্য ? আমি এত মূর্খ নই যে তোর মত মানুষ আমায় উপহাস করে।

বিচক্ষণা : তাই যদি হয় তবে হাতের কঙ্কণের আরসির কি প্রয়োজন? যদি বাস্তবে পণ্ডিত হও তবে শোনাও বসন্ত ঋতুর ওপর এক কবিতা।

কপিঞ্জল : হয়েছে হয়েছে এখন চুপ কর। খাঁচার পাখীর মত চী চী করিস না। তুই কবিতার কি জানিস? আমি ত আমার কবিতা শোনাব প্রিয়-বয়স্য ও মহাদেবীকে। মৃগনাভি কুগ্রামে কখনো বিক্রয় হয় না। কষ্টি পাথর ছাড়া সোনার পরীক্ষা হয় না।

মারিদত্ত : প্রিয় বয়স্য, এখন শোনাও দেখি তোমার একটি কবিতা।

কপিঞ্জল : তবে শুনুন মহারাজ—

কলমা তন্দুল সম
শ্বেত সিন্ধুবার
তা আমার প্রিয়
তা আমার প্রিয়···

বিচক্ষণা : এই কবিতা তোমার গৃহিণীকেই শুনিও।

কপিঞ্জল : ওরে ও মধুর-ভাষিণী, তবে শোনা দেখি তোর কবিতা।

দেবী : [হেসে] বিচক্ষণা, তুই তো সব সময় আমাকে তোর কবিতা শোনাস, আজ মহারাজকেও এক কবিতা শুনিয়ে দে।

বিচক্ষণা : যে আজ্ঞা। শোনাচ্ছি—

বসন্ত এল দ্বারে
পত্রে পল্লবে। বরণ করেনে উহারে।
মুখ মণ্ডল
মার্জিত কর পরাগে,
চরণ
রঞ্জিত কর কিংশুক রাগে,
সুরভিত কর
শিথিল শ্লথ কবরী ভারে।
বসন্ত এল দ্বারে।
সখি, ফুল ডোরে বাঁধ ঝুলনা,
নাই নাই নাই এ মধু মাসের তুলনা,
কর কজ্জলিত অঞ্জনে
অলস নয়ন সারে।
বসন্ত এল দ্বারে।

মারিদত্ত : বিচক্ষণা ত সত্যিই বিচক্ষণা। কবিদেরো। কবি।

দেবী : বিচক্ষণা ত কবি চূড়ামণি।

কপিঞ্জল : দেবীর একথা বলার তাৎপর্য কি এই যে বিচক্ষণা মহাকবি আর এই ব্রাহ্মণ অধম কবি।

দেবী : রাগ করো না ব্রাহ্মণ। কবির গুণাগুণ ত কবিতার দ্বারাই নির্ণীত হয়।

কপিঞ্জল : তবে কি আমি কবি নই। আমার মধ্যে কবিত্ব নেই? আমি তবে যাচ্ছি।

মারিদত্ত : বয়স্য, তুমি না হয় কবি নাই হলে—

কপিঞ্জল : এত অপমান! না না আমি আর এখানে থাকব না। [বাইরে যাচ্ছে]

দেবী : মহারাজ! ওকে ডাকিয়ে আনান। কপিঞ্জল ছাড়া রাজসভা কি? নয়নাঞ্জন ছাড়া প্রসাধন কি?

বিচক্ষণা : দেবী! ওকে এত আদর দেবেন না। কপিঞ্জল নরম হলে গরম, গরম হলে নরম হয়। ও যাবে কোথায়? এখুনি আসবে।

[কপিঞ্জলের প্রবেশ]

কপিঞ্জল : আসন দে। আসন দে।

মারিদত্ত : আসন দিয়ে কি হবে?

কপিঞ্জল : বীর ভৈরব আসছেন।

দেবী : তিনিই কি যাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

কপিঞ্জল : হাঁ তিনিই।

মারিদত্ত : ওঁকে সাদরে এখানে নিয়ে এসো।

[কপিঞ্জল বাইরে যাচ্ছে ও বীর ভৈরবকে সঙ্গে নিয়ে আবার ভিতরে আসছে। সকলে ঈষৎ আনত হয়ে তাঁকে প্রণাম করছে। রাজা আসন দিচ্ছেন। বীর ভৈরব আসনে বসে মদিরা পান করছেন। সকলে বসে যাচ্ছে]

বীরভৈরব : রাজন্, ধ্যান জপ তপ আদি সাধনার যত পথ রয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই কৌল ধর্ম। গুরু কৃপায় মোক্ষ বল, অপবর্গ বল তা আমার মুঠোয়। ইচ্ছা মত আমি মদিরা পান করি, ইচ্ছা মত স্ত্রী সঙ্গ। সধবা হোক বিধবা, কুমারী হোক বা যুবতী, যে দীক্ষিত সেই আমার পত্নী। মাংস আমার খাদ্য। এরূপ কৌল ধর্ম কার না প্রিয়? আর, আর সকলে যখন বলে, ধ্যান, জপ, কৃচ্ছ্র-সাধনায় মুক্তি তখন উমাপতি বলেন রতি রভসে মুক্ত।

মারিদত্ত : আপনি যা বলছেন তা ঠিকই।

বীরভৈরব : বৎস, তুমি পরাক্রমী-ই নও পরম কৌলও। দেবীচণ্ডমারীর তুমি যে ভাবে পূজো করছ তা আমি জানি। আমি তাতে তোমার ওপর প্রসন্ন এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসা। বল, এখন আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ?

মারিদত্ত : আপনার অলৌকিক সিদ্ধির কথা শুনেছি। এখন কিছু প্রত্যক্ষ দেখতে চাই।

বীরভৈরব : সে সবত আমার মুঠোয়। আমি সূর্যকে স্তব্ধ করতে পারি। চাঁদকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে পারি। যক্ষ রক্ষ ও সিদ্ধাঙ্গনাদের উড়িয়ে আনতে পারি। আমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

মারিদত্ত : [কপিঞ্জলের প্রতি] বয়সা, বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি কোনো রমণী রত্নকে তুমি দেখেছ ?

কপিঞ্জল : দেখিনি। তবে শুনেছি।

মারিদত্ত : সে কে ?

কপিঞ্জল : বিদ্যাধর রাজকন্যা জম্ভালা।

বীরভৈরব : তবে নাও, তাকেই আমি এখন নিয়ে আসি।

মারিদত্ত : হাঁ সেই পূর্ণচন্দ্রকেই তবে পৃথিবীতে নামিয়ে আনান।

[বীর ভৈরব ধ্যান করছেন। ধীরে ধীরে জম্ভালা নেমে আসছে]

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

মারিদত্ত এ কি দেখছি! স্বপ্নত নয় ? আমার হৃদয় মথিত হচ্ছে।

বীরভৈরব স্বপ্ন নয় রাজন্। এ বিদ্যাধর রাজকন্যা জম্ভালা। তুমি একে পেতে পার —

[মারিদত্ত জম্ভালার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকছেন। জম্ভালা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে]

যদি আমার নির্দেশানুসারে কার্য কর।

মারিদত্ত : আমি করবার জন্য প্রস্তুত।

বীরভৈরব : তবে শোনো। চৈত্র অমাবস্যায় এক লক্ষ বিভিন্ন প্রকার যুগল প্রাণী দিয়ে দেবী চণ্ডমারীর পূজো কর, শেষে সর্বসুলক্ষণযুক্ত সুন্দর এবং নীরোগ কুমার কুমারীর বলিদান। এর ফল স্বরূপ সূর্যহাস নামে এক খড়্গ উৎপন্ন হবে। তার প্রভাবে জম্ভালা সহ বিদ্যাধর রাজ্য তুমি লাভ করবে।

কপিঞ্জল : একাজ অবশ্যই করণীয়।

দেবী : কিন্তু মহারাজ! একাজে কত জীব হত্যা হবে। কত পাপ।

বীরভৈরব : দেবী, এক্ষেত্রে তুমি ভ্রান্ত। এতে পাপ কোথায়? যাদের বলি হবে তাদের তো অহোভাগ্য। তারা সবাই স্বর্গে যাবে। [মারিদত্তের দিকে চেয়ে] রাজন্, তোমার একাজ করাই উচিত। এতে বিদ্যাধর রাজ্য তুমি প্রাপ্ত হবে তাই নয়, তোমার রাজ্যেও সর্বত্র সুখশান্তি প্রসারিত হবে। তোমার কল্যাণ হবে।

মারিদত্ত : অবশ্যই করব মহাকৌল! [কপিঞ্জলকে] বয়স্য, তুমি মন্ত্রীকে একথা সূচিত কর যে জলচর, নভচর, স্থলচর সমস্ত প্রাণীর এক এক মিথুন যেন সংগ্রহ কর হয় ও সর্বসুলক্ষণযুক্ত সুন্দর ও নীরোগ কুমার কুমারীকে নগরে প্রাপ্ত হলে নগরে, নইলে গ্রাম জনপদ যেখানে পাওয়া যায় সেখান হতে যেন শীঘ্র সংগ্রহ করে।

দেবী : আমি তাহলে যাচ্ছি। এ অনর্থ আমার প্রিয় নয়।
[বিচক্ষণা সহ দেবীর প্রস্থান]

বীরভৈরব : যেতে দাও। অনর্থ নয়, ঈর্ষা। দেবী ঈর্ষা বশে চলে গেলেন। জন্তালার প্রতি ঈর্ষা। [মদিরাপান। মারিদত্তের দিকে মদের পাত্র এগিয়ে দিয়ে] নাও, তুমিও পান কর। এ দেবীর মহাপ্রসাদ।
[মারিদত্তও মদিরা পান করছেন]

[ক্রমশঃ

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120 .

Vol. VI No. 1 Sraman May 1978

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ ষষ্ঠ বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সম্ভবনাথ মন্দির, জিয়াগঞ্জ

মুর্শিদাবাদ জৈন সমাজের বৈশিষ্ট্য

শ্রীজয়ন্ত কোঠারী

জৈন ধর্মের সঙ্গে বাংলা দেশের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। ভগবান মহাবীর স্বয়ং ধর্ম প্রচারে বাংলা দেশে এসেছিলেন—আচারাঙ্গ সূত্রে এর উল্লেখ আছে। ভগবান মহাবীরের নাম বর্ধমান। তাঁরই নামানুসারে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার নামকরণ হয়েছে। এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। দশম শতক পর্যন্ত জৈন ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব শুধু পশ্চিম বঙ্গেই নয় উত্তর বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গেও বিস্তৃত ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণও বিদ্যমান।

কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ দশম হতে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস অস্পষ্ট হলেও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে (বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার) যে সরাক জাতি বসবাস করে তারা জৈন শ্রাবকদেরই (মহাবীরের সঙ্ঘ ব্যবস্থায় সাংসারিকদের শ্রাবক বলা হয় এবং সরাক শব্দটী শ্রাবক শব্দের অপভ্রংশ) বংশধর।

অষ্টাদশ শতাব্দী হতে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে। সে যুগের মুর্শিদাবাদ নগরী (বর্তমান কাসিম বাজার হতে দস্তুরহাট গ্রাম পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীর বিস্তৃত ছিল) তদানীন্তন লণ্ডন শহরের মতই বিস্তৃত, সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল ছিল। (Clive described Murshidabad in Bengal, in 1757, the very year of Plassey as a city as extensive, populous and rich as the city of London with the difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last.—Jawaharlal Nehru, *Discovery of India*) মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ এই ভাবধারার প্রবর্তক ও বাহক।

এঁদের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে বসবাস আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর উভয় তীরে আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে এঁদের বসতি কেন্দ্রীভূত হয়। এঁরাই কালক্রমে ভারতের বৃহত্তর জৈন সমাজে 'মকসুদাবাদী' বা মুর্শিদাবাদী জৈন নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজ সমগ্র ভারতের জৈন সমাজের সভায় এক বিশিষ্ট স্থান সসম্মানে অধিকার করে আছেন। বরং মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ সমগ্র ভারতের জৈন সমাজের মণিহারে মধ্যমণি বললে বোধকরি অত্যুক্তি হয়না। অর্থবল

কিংবা লোকবলের জন্য এ'রা এই সম্মান পাননি এই গৌরব তাঁদের ধর্মপ্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের বা স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

আমার দৃষ্টিতে প্রথম বৈশিষ্ট্য—বেশভূষা। আমরা জানি রাজস্থান ছোট বড় শতাধিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ী ছিল। মানুষ যে ভূমিকে আপন জন্মভূমি বলে পূজা করে তার বেশভূষা স্বভাবতঃই সেই দেশীয় হয়ে থাকে। পুরুষের বেশভূষায় পাগড়ীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। তেমনি নারীর বেশভূষায় প্রাধান্য পেয়েছে তার সোহাগ চিহ্ন। বাংলা দেশের নারী সমাজ সিঁথির সিঁদুরকেই এই মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা দেখি মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজের প্রতিষ্ঠাতারা পুরুষের শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ী হিসাবে তৎকালীন বাংলা দেশের পাগড়ী আর নারীর সোহাগ চিহ্ন হিসাবে সিঁথির সিঁদুরকেই গ্রহণ করেন। মুসলমান প্রভাবের ফলে 'নথ'কেও পরিপূরক সোহাগ চিহ্ন হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেন (রাজস্থানের নারীসমাজে এই দুয়েরই প্রচলন নেই)। আর সাধারণ পোষাক হিসাবে ধুতি, পাঞ্জাবী এবং সাড়ী ও 'লহঙ্গা-ওড়না' (মুসলমান প্রভাব) গ্রহণ করেন। যে কোন প্রবাসী সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে শতাধিক বৎসর কেটে গেলেও বেশভূষার পার্থক্য বিদ্যমান থেকে গেছে। অথচ এ'দের পূর্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদে বসবাস প্রারম্ভের সময় হতে বাংলা দেশকেই আপন মাতৃভূমি রূপে এবং এদেশীয় বেশভূষাকে আপন বেশভূষা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের বেশভূষায় স্বকীয় ধার্মিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট রাখেন। ধার্মিক ক্রিয়া, আচার-অনুষ্ঠান, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গোষ্ঠীগত। সুতরাং আমরা দেখছি মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজ একাধারে সমন্বয় সাধন করেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এ'দের খাদ্যাভ্যাস। বাংলা দেশে মাত্র কয়েকটি জৈন পরিবার মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। অহিংসা জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র। স্বভাবতঃই জৈনরা ভরণ-পোষণের জন্য জীব হত্যা মহাপাপ জ্ঞান করেন। অথচ তৎকালীন বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী জনসমুদ্র প্রধানতঃ আমিষভোজী ছিলেন। এ'দের তুলনায় মুর্শিদাবাদী জৈনদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। আবার জলবায়ু এবং উৎপন্ন শাকসব্জী ও ফলমূল কোন কিছুরই এ'দের আদি ভূমির সঙ্গে মিল ছিল না। ধার্মিক বিধি নিষেধ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে এ'রা এদেশীয় খাদ্যবস্তুও গ্রহণ করলেন। শুধু খাদ্যবস্তুই নয় পাকপ্রণালীও রপ্ত করলেন। গ্রহণযোগ্য মুসলমান খানার শ্রেষ্ঠ খাদ্যবস্তু ও পাকপ্রণালী এবং হিন্দু খাদ্যসামগ্রী ও পাক প্রণালী গ্রহণ করে তার সঙ্গে রাজস্থানী ধারার এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করলেন। ফল স্বরূপ আমরা দেখি এ'দের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান এবং রাজস্থানী খাদ্যদ্রব্যের এক

আশ্চর্য সমন্বয় ও স্বাতন্ত্র্যের সমাবেশ। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য খাদ্য তালিকার গ্রহণযোগ্য খাদ্যবস্তুও গ্রহণ করেছেন। হয়ত অনেকেই এই উক্তিতে শঙ্কিত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু salad এবং boiled vegetable পাশ্চাত্য প্রভাবেই গ্রহণ করেছেন এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার জন্য। এই মৌলিক সমন্বয় মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মুসলমান খানার 'পরোঠা'র অনুকরণে এঁদের 'টিকড়া' হলেও এর স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তেমনি মুসলমানী 'পোলাও' এর অনুকরণে এঁদের 'মেওয়া'র খিচুড়ী রান্না হয়ে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রেও এঁদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। দই-এর মাধ্যমে এঁদের যে খিচুড়ী (সলোনী) এবং দই ও শশার মাধ্যমে যে কচুড়ী রান্না হয় তেমনটি অন্য কোন সমাজে হয় বলে তো জানা নেই। শাক-সব্জীর পাকপ্রণালীতে হিন্দু (বাঙালী) প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও বৈচিত্র এবং রন্ধন পদ্ধতি এঁদের একান্তই আপন। দই-এর মাধ্যমে এক রকম তরকারি হয়ে থাকে যাকে 'রায়তা' বলে অভিহিত করেন—পুরোপুরী রাজস্থানী প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বাংলার সব চেয়ে বেশী প্রভাব দেখি এঁদের মিষ্টান্নের তালিকায় কিন্তু মিষ্টান্নের তালিকায় রাজস্থানী প্রভাবও সমভাবে স্থানাধিকার করে আছে। আর কিছুটা মুসলমান প্রভাবও রয়েছে। আবার কয়েকটি মিষ্টান্ন মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের মৌলিক অবদান—যেমন এঁদের বিশেষ ধরণের চালকুমড়োর মোরব্বা। পদ্মের চাকি দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু—খিচুড়ী হতে সিঙ্গাড়া, কচুড়ী, পকোড়া এবং বিভিন্ন তরকারী—এঁদের নিজস্ব মৌলিক অবদান। এই ধরণের ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেওয়া যায়।

সব ফলমূল সরাসরি খাওয়া যায় না। খোসা ছাড়িয়ে আঁটি বাদ দিয়ে তবেই পরিবেশন করা যায়। এ বিষয়েও মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও মৌলিকতার পরিচয় পাই। যেমন আম কেটে পরিবেশনের উপযুক্ত করার মধ্যে, কাঁচা তালশাঁসের খোসা ছাড়ানোয়, নেবু কাটার পদ্ধতিতে। পদ্মের চাকির দানা (বীজ) বের করা এবং পরিবেশনের উপযুক্ত করা—এক সূক্ষ্ম কলার সমতুল্য—মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের মৌলিক অবদান। আবার খাদ্যবস্তু পরিবেশনের পদ্ধতি সুরুচি ও বিনম্রতার স্বাক্ষর বহন করে। এঁদের পরিবেশন পদ্ধতি দেখলে যে কোনও লোক বিস্ময়ের সঙ্গে পার্থক্য অনুভব করবেন। সামগ্রিকভাবে মিষ্টান্ন, পাক করা খাদ্যসম্ভার, ফলমূল পরিবেশনের উপযুক্ত করা এবং পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন, স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতা এবং সূক্ষ্ম রুচি ও রসবোধ মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য।

জৈনরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্। হিন্দুর 'ঈশ্বর' এবং মুসলমানের 'আল্লা' এক না হলেও সম পর্যায় ভুক্ত। মুর্শিদাবাদী জৈনের সংখ্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান

মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় মহাসমুদ্রে গোষ্পদের সমান। স্বভাবতঃই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিরাট জনসমষ্টির প্রভাব অপরিহার্য কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ সগর্বে বলতে পারেন তাঁদের ধার্মিক বিশ্বাস ও ধার্মিক ক্রিয়া, আচার ও অনুষ্ঠানে তাঁরা জৈন শাস্ত্রের নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুতি হন নি। সমগ্র ভারতের জৈন সমাজ তাই পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে এ'দের ধার্মিক আচরণের প্রশংসা করে থাকেন। এ'দের ধর্মানুরাগ শুধু ক্রিয়াকাণ্ড ও ধার্মিক অনুশাসনের স্বীকৃতি ও প্রতিপালনেই সীমিত ছিল না। পূর্ব ভারত অধিকাংশ জৈন তীর্থংকরদের বিচরণ ভূমি এবং বাইশ জন তীর্থংকরের নির্বাণ ভূমি। কিন্তু কালের স্রোতে পূর্ব ভারতের জৈন পুণ্যভূমিগুলো বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদী জৈনেরা সেই সব পুণ্যভূমির উদ্ধার করে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রীর আবাসের জন্য ধর্মশালা, আহারের 'রসোড়া' ইত্যাদি নির্মাণ এবং পরিচালনের ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত ও ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য জমিদারী এবং বিষয়সম্পদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এক কথায়, তীর্থক্ষেত্রের এমন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ব্যবস্থার নজীর আগে কোথাও দেখতে পাওয়া গেছে কিনা সন্দেহ। শুধু পূর্ব ভারতেই নয় উত্তর ভারতেরও কয়েকটি তীর্থস্থানের উদ্ধার, সংস্কার এবং পরিচালনার সুবন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের প্রত্যেকটি তীর্থক্ষেত্রে এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে সমগ্র ভারতের জৈন সমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়েছেন। শাস্ত্রোদ্ধার ও প্রচারের এ'রা অগ্রণী ছিলেন। শুধু তাই নয়, জৈন শাস্ত্র ও ইতিহাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও (research) ভারতের সমগ্র জৈন সমাজের মধ্যে মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের এক সুসন্তানই পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন স্থান হতে শাস্ত্রীয় পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে জ্ঞানী আচার্যদের দ্বারা অশুদ্ধি সংশোধন করিয়ে সর্বপ্রথম মুদ্রণ (৪৫ আগমের মুদ্রণ ও প্রকাশন) ও ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে জৈনদের মধ্যে বিতরণ এই সমাজেরই বিশিষ্ট এক ব্যক্তির কীর্তি। তাই সমগ্র জৈন সমাজ এ'দের কাছে চির ঋণী। অতএব আমরা দেখি যে মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের ধর্মানুরাগ শুধু ধার্মিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তীর্থ ভ্রমণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ধার্মিক আচার অনুষ্ঠনের সঙ্গে জ্ঞানাহরণ এবং শাস্ত্রচর্চা ও প্রচার সমভাবে এ'দেরকে আকর্ষণ করেছিল। তদানীন্তন ভারতের সমগ্র জৈন সমাজের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়নি।

বৃটিশ রাজত্বের সঙ্গে এলো পাশ্চাত্য শিক্ষা। দেশে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে শিক্ষা স্রোত প্রবাহিত হল। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে থাকেন নি। এই সমাজেরই এক সুসন্তান বোধকরি সমগ্র জৈন সমাজের সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং হাইকোর্টে'র vakil। কিন্তু সঠিক কোন প্রমাণ পঞ্জী না পাওয়ায় তাঁকে অন্যতম প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও vakil এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী বলেই অভিহিত করব। পাশ্চাত্য

আধিপত্যের সাথে সাথে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা নগরী মুর্শিদাবাদের স্থানাধিকার করে নিল। মুর্শিদাবাদের দুর্দিন নেমে এল। আগেই বলেছি মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের অধিকাংশ পরিবারই ভাগীরথীর দুই তীরে জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন। জিয়াগঞ্জ এবং আজিমগঞ্জের প্রায় সব কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এ'দের একক অবদান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ'দের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনের শিক্ষার মাধ্যম বাঙ্‌লা ভাষা। তাঁরা নিজেদেরকে বাংলা দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে না করলে এমনটি কিছুতেই সম্ভব হত না। বিভিন্ন প্রবাসী সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যম তাঁদের আদি ভাষাই রয়েছে। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ'দের তিলমাত্র সঙ্কীর্ণতা পরিলক্ষিত হয়নি। জৈনধর্মাবলম্বী হওয়া সত্বেও অনেকে বিভিন্ন স্থানে আধুনিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক টোল মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করেছেন। তাছাড়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি দিয়ে এমন কি ছাত্রদের এ ং ক্ষেত্রবিশেষে সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে অনেক গরীব হিন্দু-মুসলমান ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষিত হতে এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। মূলতঃ মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ বণিক সমাজ পর্যায়ভুক্ত। সে যুগে (৭০।৮০ বছর আগে) ভারতের কোন প্রান্তেই বণিক সমাজ শিক্ষার প্রতি, শিক্ষার প্রচারের প্রতি এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা বোধহয় প্রদর্শন করেন নি। তাঁদের শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতা প্রেম ও অনুরাগ স্বভাবতঃই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই এই সমাজে দেশবিদেশে সম্মানিত পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ (ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন), অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক (শান্তিস্বরূপ ভটনাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত), বিশিষ্ট আইনজ্ঞ (সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট বিচারক), শিল্পী (বিভিন্ন দেশে খ্যাতিপ্রাপ্ত) প্রভৃতি বিদ্যমান। সঙ্গীত-কলার প্রতি এ'দের অনুরাগ সুবিদিত। বাংলা দেশের সঙ্গীত মজলিসের সঙ্গে (All Bengal Music Conference) এই সমাজেরই দুই তিন জন সুসন্তান প্রত্যক্ষভাবে শুধু জড়িতই ছিলেন না বরং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টাই এই মজলিসকে ভারতের সঙ্গীত বিষারদ ও সঙ্গীত প্রেমীদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলে। বরং যদি বলি সে সময়ে এই মজলিসই সারা ভারতের এই ধরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল তা হলেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্যই এ'দের প্রভাব প্রতিপত্তির ও সমৃদ্ধির মূল ছিল। কিন্তু তথাকথিত বণিক সমাজের মত এ'রা শিক্ষা, কলা, সঙ্গীত সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। এই সব বিষয়ের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, প্রেম ও শ্রদ্ধা মুর্শিদাবাদ জৈন সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, এমন কি জাতীয় জীবনেও স্বাস্থ্যই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে বণিক সমাজ অর্থকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ মূলতঃ বণিক সমাজ হলেও স্বাস্থ্যচর্চা ও খেলাধূলার প্রতি কোন দিনই উদাসীন ছিলেন না। এ'দের মধ্যে কুস্তিগীর, জ্যুজ্যুৎসুবিদ, স'াতারু, খেলোয়াড় প্রভৃতি সমভাবে দেখতে পাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক Sports & Games এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। সে যুগে কলকাতায় বসবাসকারী এই সমাজের দু' একটি পরিবার খেলাধূলার আসরে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ'দের ক্রীড়ানুরাগ ও খেলোয়াড়োচিত মনোভাবে কলকাতার তদানীন্তন কর্মকর্তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ'দের বসতবাড়ীই ছিল তখনকার ক্রীড়াজগতের প্রধানদের প্রধান আড্ডাস্থল। সে যুগের বিখ্যাত 'রায়' ও 'বসু' পরিবার এ'দের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের এই পরিবারের কলকাতার ক্রীড়া জগতে প্রভাব ও প্রতিপত্তির একটিমাত্র ঘটনাই পর্যাপ্ত প্রমাণ। ১৯১১সালে আই, এফ্, এ শীল্ড জয় করে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে মোহন বাগান এ্যাথলেটিক ক্লাব এক ইতিহাস রচনা করে। এই শীল্ড বিজয়ের নানা কাহিনী আজ রূপকথায় পর্যবসিত। শীল্ড বিজয়ের পরের দিন শ্যামবাজারের ক্লাবঘরে অসংখ্য নরনারী শীল্ড দর্শন করলেন। তারপর এই শীল্ড তিন দিনের জন্য এ'দেরই বৈঠকখানায় এনে রাখা হল। এতবড় সম্মান এ'দের আন্তরিক ক্রীড়ানুরাগের শুধু স্বীকৃতিই নয়, তৎকালীন কলকাতার ক্রীড়াজগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কর্মকর্তাদের অসীম স্নেহ ভালবাসা ও প্রীতির জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর। এ'দেরই একজন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের Athelatics-এর বিভিন্ন শাখায় Record স্থাপন করেন। এই Record বহুদিন অম্লান ছিল। (আজকের মত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল না।) বিদ্যার্থী জীবনে ইনিই পরপর তিনবার তদানীন্তন School Sports Association-এর (পরবর্তীকালে এই সংস্থাই All India School Sports Association নামে পরিচিত) Champion হয়ে যে Record করেছেন তা আজও সম্ভবত: অম্লান আছে। খেলাধূলার আসরেও সে যুগে (৪০।৪৫ বছর আগে) তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল তারকা। এই সমাজেরই আর এক জন শুধু কলকাতার খেলাধূলার আসরেই খ্যাতি অর্জন করেন নি; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করে আপন ক্রীড়া কৌশলের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। Sports & Games ছাড়া Acquatics-এও এ'দেরই একজন বিশ্ববিখ্যাত প্রফুল্ল ঘোষ এবং রবীন ঘোষের সহযোগী ছিলেন। এ'দের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করার সময় তিনি একাধিক রাত্রি স'াতার কেটে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন। কলকাতার একটি বিখ্যাত Swiming Club প্রতিষ্ঠিত করতে এ'দেরই একটি পরিবারের অবদান বিশেষ

প্রশংসার দাবী রাখে। এই পরিবারেরই এক যুবক Aquatics-এ খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন আগে এঁরা এঁদের এক যুবককে Waterpolo-র বিশিষ্ট (১০ বছর ধরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন) হিসাবে এবং Roller Skating-এর Endurance Skating-এ রেকর্ড করার (Junior's Unofficial World Record) জন্য এক কিশোর ও কিশোরীকে আপ্যায়িত করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা এ্যাথলেটিকস্ চ্যাম্পিয়ানশিপ-এ এঁদের কয়েকজন যুবক যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনেকেই জানেন। আজিমগঞ্জের বিশিষ্ট একটি পরিবারের নামানুসারে প্রচলিত Foot-ball Shield Tournament শুধু বাংলার ক্রীড়া মহলেই নয় বাংলার বাইরেও যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে তা সর্বজন বিদিত। আজও কলকাতার খেলা ধূলার আসরে এঁদের বেশ কয়েকজন তরুণ ও যুবককে দেখতে পাই। এঁদের একজন ছিলেন (প্রায় ৫০।৬০ বছর আগে) সৌখীন কুস্তিগীর। Amateur হলেও তিনি এতদূর উচ্চমানের কুস্তিগীর ছিলেন যে বিশ্ববিখ্যাত গামা প্রমুখ প্রায় সব সেরা কুস্তিগীর তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়তেন। কলকাতার একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যায়ামবিদের ব্যায়াম চর্চার হাতে খড়ি এঁদেরই এক পারিবারিক আখড়ায় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বাইরে খাবার কড়াকড়ি ও গোঁড়ামি না থাকলে দুচারজন বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করতে এমন কি বিশ্ববিখ্যাতও হতে পারতেন। সর্বোপরি এঁদের এক যুবকের হিমালয়ে ত্রিশূলী আরোহণের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই চূড়া 'ঘাতক চূড়া' নামেও পরিচিত এবং আজ পর্যন্ত এই চূড়ায় আরোহণের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নিরামিষ ভোজী এই দুঃসাহসী যুবক সমগ্র জৈন সমাজে সর্বপ্রথম পর্বতারোহী।

সে যুগে (৫০, ৬০, ৭০ বছর আগে) ভারতের কোন প্রান্তের বণিক সমাজ, বিশেষতঃ জৈন সমাজে খেলাধূলার প্রতি এহেন অনুরাগ কল্পনাতীত।

সাধারণতঃ বণিক সম্প্রদায় সমাজ কল্যাণের কাজে বিশেষ উদাসীন থাকতেন; বিশেষতঃ প্রাক্-মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। এঁরা সচরাচর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সম্ভবতঃ এগুলো অর্থকরী পেশা বা নেশা না হওয়ায় এই ঔদাসীন্য দেখাতেন। সে যুগে জমিদার শ্রেণীও প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের জড়াতেন না এসব কাজে। একই গ্রামে একাধিক জমিদার থাকলে তাঁদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা বরং বলতে পারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন কি কলহ প্রকটভাবে দেখা দিত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কলহের ফল স্বরূপ তাঁদের নিজ এলাকায় কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সন্দেহ নাই কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির সব কয়টি যে নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের প্রেরণা প্রণোদিত তা বলা যায় না। তবে এতেও যে জন সাধারণের কল্যাণ হয়েছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এর ঠিক বিপরীত ছবি

দেখি। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে দশ বারোটি বড় বড় জমিদার পরিবার বসবাস করতেন। নিজেদের সামাজিক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও বৃহত্তর জনসাধারণের ক্ষেত্রে এর কোন প্রতিফলন দেখিনা। আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জের দুই জমিদার ও বণিক পরিবারের সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম হয়। শুধু তাই নয় অজৈন সংখ্যাধিক্য থাকলেও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন এ'দেরই একজন। পৌর এলাকায় সাধারণ্যে মাছধরা, জীবহত্যা, মাংস বিক্রী করা নিষিদ্ধা ছল। এই নিষেধাজ্ঞা আইনের বলে হয়নি, জনসাধারণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এটা মেনে নিয়েছিলেন। আমিষভোজী জনসাধারণ কি ক্রেতা কি বিক্রেতা কেউই খোলাখুলি ভাবে জৈনদের বসবাসের এলাকা দিয়ে মাছ মাংস নিয়ে যেতেন না। এই ব্যবস্থা মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের সঙ্গে অজৈন বৃহত্তর সমাজের সম্প্রীতি, সদ্ভাব, সহযোগিতা এবং পরস্পরের ধার্মিক বিশ্বাসের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার উজ্জল স্বাক্ষর।

এই পৌর এলাকায় প্রথম হাসপাতালও এই সমাজের এক জমিদার ও বণিক পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এই সমাজভুক্ত বিভিন্ন পরিবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ডিস্পেনসারী, প্রসূতিগৃহ প্রভৃতি স্থাপন করে বৃহত্তর জন সাধারণের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন। ধর্মশালা, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ-পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়েছেন, সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করেছেন—এবং তার জন্য প্রজাসাধারণকে কোন বাড়তি খাজনা দিতে হত না—পথঘাট নির্মাণ করেছেন, জন সাধারণের কল্যাণের একক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এইসব জনহিতকর কাজে তাঁরা ব্রতী হতেন। এমন কি আজিমগঞ্জের প্রথম রেললাইন (আজিমগঞ্জ হতে নলহাটী পর্যন্ত) মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের এক বিশিষ্ট পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। এই রেল পথ আজিমগঞ্জ হতে নলহাটীর মধ্যবর্তী এলাকায় অসংখ্য নরনারীর Life Line ছিল। ধুলিয়ানের কাছাকাছি লুপ লাইনের ভাঙ্গনের পর এই রেল লাইনই এ অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ভারত ও কলকাতার একমাত্র সংযোগ পথ। তাছাড়া দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও বন্যাপীড়িত জন সাধারণের কল্যাণের জন্য এ'দের দানও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষতঃ আজকের দিনে যখন দেশের বিত্তবানেরা নিজেদের সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রচারে সবিশেষ যত্নবান তখন এ ধরণের উদাহরণ তাঁহাদিগকে নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের কাজে প্রবৃত্ত করতেও পারে।

আজ হতে প্রায় ৮০ বছর আগে আসামের কামরূপে প্রকট দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ধানের দর মণকরা ৬।।০-৭ টাকা হয়ে গেল (সাধারণতঃ তখন মণকরা ২-২।।০ টাকার বেশী দর উঠতনা)। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের একটি পরিবারের প্রচুর ধান, প্রায় ৮৫,০০০ মণ গুদামজাত ছিল। আসামের গভর্ণর এই পরিবারের কর্তাকে

সম্পূর্ণ মজুত ধান বাজার দরে সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। এই মহানুভব কামরূপের জনগণের দুর্ভাগ্যে সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল পরোপকারীর মতই নিজস্ব লাভের (প্রায় ৩,৫০,০০০ টাকা) প্রতি উদাসীন হয়ে সম্পূর্ণ মজুত ধান সরকারের হাতে দুঃখী জনসাধারণের মধ্যে সুবণ্টনের জন্য লগ্নীমূল্যে (Cost-price) ছেড়ে দিলেন। এঁদের আর এক পরিবার প্রায় ৫০।৬০ বছর আগে ময়মনসিংহ জেলার প্রকট দুর্ভিক্ষের সময় বর্মা হতে চাল আমদানী করে মণকরা ২।৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই সেদিনও ১৯৪৩ সালে এই সমাজের এক পরিবার জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ এলাকার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে মণকরা ৩।৪ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও ৫ টাকা মণ দরে চাল বিতরণ করেন। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের সময়ে এদেরই একজন একদল স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে উত্তর বিহারের ত্রাণ কার্যে গিয়েছিলেন। ইনিই ভারত বিভাগের পর শরণার্থীদের সেবার জন্য একটি শিবির খুলে ছিলেন এবং এই শিবির ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত শরণার্থীদের সেবায় উন্মুক্ত ছিল। বন্যা, ভূমিকম্প ও মহামারীতে ত্রাণ, সাহায্য ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের আরও অনেক উদাহরণ আছে। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের লোকবল বোধকরি দু'হাজারের মত আর অর্থবলও অন্যান্য সমাজের তুলনায় নগণ্য কিন্তু জনকল্যাণকর কাজে এঁরা সব সময়েই ব্রতী। আজও এই ধারা অব্যাহত আছে। তাই এঁদেরই একজন আজ তাঁর দানের জন্য সমগ্র জৈন সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কিন্তু সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে এঁরা আর্তের সেবা করে গেছেন।

বিত্তবান এবং ধনী সম্প্রদায় সচরাচর সৌখীন ও বিলাসী হয়ে থাকেন। বিলাসিতার আধিক্য ক্রমে এঁদের সুরুচি ও মানবিকতাকে গ্রাস করে বসে। ব্যভিচার এবং পানদোষ মজ্জাগত হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজে ধনী ও বিত্তবানের সংখ্যাধিক্য থাকলেও ব্যভিচারী এবং পানাসক্ত হতে দেখা যায়নি। এঁদের বিলাসিতার মধ্যে সব সময়েই একটা মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ছাপ দেখতে পাই। তাই এঁদের বিলাসিতা ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এঁদের অনেকে শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। কেউ কেউ বা কারুশিল্প, প্রাচীন হস্তাঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। কেউ কেউ আবার প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহও এঁদের মধ্যে দেখতে পাই। ডাকটিকিট ও প্রাচীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বরলিপিরও অনন্যসাধারণ সমাবেশ করেছিলেন দু-একজন। অনেকে আবার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অর্থব্যয়ের বিলাসিতা চরিতার্থ করেছেন। এই সব সংগ্রহের মধ্যে অনেক শিল্প সামগ্রী, চারুশিল্প প্রভৃতি এত উচ্চমানের যা শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশেই খ্যাতি লাভ করেছে। বিশেষতঃ প্রাচীন মুদ্রা ও মুঘল চিত্রের সংগ্রহ সমগ্র

বিশ্বে এই ধরণের ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। তাই অনেক বিদেশী এগুলি দেখতে আসেন। দু'একজন নিজেদের সংগৃহীত বহু মূল্য শিল্প সামগ্রী জাতীয় সংগ্রহশালা এবং আশুতোষ সংগ্রহশালায় দানও করেছেন। গৌড়ের পাল বংশের রাজত্বকালের ঐতিহ্যপূর্ণ ধ্বংসাবশিষ্ট কতকগুলি কষ্টিপাথর ও সিংহাসন মুর্শিদকুলি খাঁ এঁদেরই এক পরিবারকে দিয়েছিলেন। তাঁরা সেই সব পাথর দিয়ে একটি রম্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ভাগীরথীর গর্ভে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করে মহিমাপুরে এঁরা আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কষ্টি পাথরের এধরণের মন্দির বোধহয় আর কোথাও নেই। বাংলার অতীত শিল্প গৌরব ও ঐতিহ্য-বহনকারী এই মন্দিরের ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

এই সমজের কোন কোন পরিবার বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ বাগানবাড়ী বলতে আমরা যা বুঝি এই সব বাগানবাড়ী ছিল ঠিক তার বিপরীতধর্মী। তাই নাচগান হৈ-হল্লার পরিবর্তে মন্দির ও উপাসনাগৃহ দেখতে পাই এঁদের বাগান বাড়ীতে। ফলফুলের সুন্দর সমাবেশের সঙ্গে সৌখীন সাজসজ্জার বস্তু এবং শিল্পসামগ্রী সমাবিষ্ট হয়েছিল এইসব বাগানবাড়ীতে। জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে কাঠগোলার বাগানবাড়ীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নানান সৌখীন ও শিল্প সামগ্রী দিয়ে সাজান ছিল আর বাগানে প্রচুর সুস্বাদু ফল ও মনোরম ফুলের সংগ্রহ ছিল। সব দিক দিয়ে তখনকার দিনে (প্রায় ১০০ বছর আগে) সারা ভারতে এমন সুন্দর বাগানবাড়ী আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। তাই তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল এই বাগানবাড়ী দেখে শুধু বিস্ময়ান্বিতই হননি বরং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগান বলে অভিহিত করেন। এই বাগান বাড়ীতে একটি জৈন মন্দিরও আছে এবং এই বাগানের সমস্ত সম্পত্তি এই মন্দিরের নামে উৎসর্গীকৃত। আজিমগঞ্জের রোজভিলা বাগানটিও মনোরম করে সাজান ছিল। নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল এবং বিশেষ করে রকমারি গোলাপ ফুলের এক আশ্চর্য সমাবেশ ছিল এই বাগানে। এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫।৩০ বছর আগে পর্যন্ত বাংলার সুন্দরতম বাগানগুলির অন্যতম ছিল। এই সমাজেরই একটি পরিবারের বাসগৃহ সংলগ্ন বাগানটি কলকাতার বিশিষ্ট বাগানগুলির একটি। অতএব, মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজে অনেক ধনী ও বিত্তবান পরিবার থাকা সত্বেও তৎকালীন ধারা অনুযায়ী তাঁরা বিলাসিতায় এবং পান মত্ততায় মেতে ওঠেন নি বরং তাঁদের বিলাসিতায় সুরুচি ও সুবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। তৎকালীন জমিদারশ্রেণী স্বভাবতঃ আপন স্বার্থেই ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজভুক্ত জমিদারদের অনেকেই স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

জড়িয়ে ছিলেন। এ'দের একজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গীয় শাখায় নেতাজী সুভাষ বসুর সহকর্মী ছিলেন। আর একজনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় গান্ধীজী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা আজিমগঞ্জে পদার্পণ করে রোজভিলা বাগানে এ'রই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষ বসুরও পদধূলি এখানে পড়েছে। এ'দেরই এক বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে আশ্রয় দিয়ে এবং সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে অনেক বিপ্লবী পরিবারকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের হাত হতে রক্ষা করেন। প্রয়োজন মত ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে চরম দুর্দশার হাত হতেও বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর এই সব কাজের জন্য ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার এবং বাংলা ও বিহারের নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও বন্ধুত্ব দুই-ই লাভ করেন। পরে Interim Govt-এর মন্ত্রীমণ্ডলীতে না থেকেও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু তাঁকে সেই সময়ের সর্বাধিক সক্রিয় সংসদ সদস্য বলে অভিহিত করেন। বৃটিশ ভাইসরয় বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে এ'র পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন 'Most active member of my Council'। আজ বহুমুখী পরিকল্পনা প্রত্যেক দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই সমাজ গর্বিত যে এই বহুমুখী পরিকল্পনার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন এ'দেরই একজন। ইনিই সংসদে বহুমুখী পরিকল্পনার প্রথম খসড়া 'কোশী পরিকল্পনা' আকারে ১৯৪৫-৪৬ সালে উত্থাপিত করেন। ভাগীরথী ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত ভুক্তির পিছনেও এ'র অবদান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম কলিকাতা পোতাশ্রয়ের স্বার্থে এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে কলিকাতার নদীপথে সংযোগ রক্ষার্থে ভাগীরথীর ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। সর্বোপরি জিয়াগঞ্জের এক মধ্য বিত্ত পরিবারের একজন স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে কারাবরণও করেছিলেন। নিজের বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে দান করেন। পরে এই স্থানই স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এই স্থানেই বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অমৃতবাণী শোনার সুযোগ পান স্থানীয় জনসাধারণ। এ'দের আর একজন জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদকের পদে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। তিনি আন্দোলনের যুগে ভারতের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ কারাগার—দুয়েরই সান্নিধ্য সমভাবে পেয়েছিলেন। এ'দেরই একজন ৮।১০ বছর ধরে রাজ্যসভার Dy. Chief Whip আছেন। এ'দের একটি বিশিষ্ট পরিবারের দান 'কুমার সিংহ হল' কলকাতার সাংস্কৃতিক এবং বিশেষতঃ রাজনৈতিক ভাবধারায় বিশিষ্ট ভূমিকায় গৌরবে গৌরবান্বিত।

গত ৪০।৫০ বছরে ভারতের প্রায় সব বিশিষ্ট নেতাই এখানে নানা উপলক্ষে সম্মিলিত হন।

মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজে বিত্তবান জমিদার পরিবারগুলির অধিকাংশের জমিদারী বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত ছিল। সাধারণভাবে জমিদার পরিবারগুলিকে আমরা স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বলেই জানতাম। কিন্তু এঁদের জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমটাই দেখতে পাই। এঁদের একটি পরিবারও অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বরং তাঁরা হিতৈষী হওয়ায় প্রজা সাধারণ এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিই পোষণ করতেন। তাই এঁদের কারও জমিদারীতে কখনও প্রজাদের অসন্তোষ দেখা দেয়নি। অন্য কোন সমাজের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এমন নজীর আছে কিনা সন্দেহ।

আর্থিক অসামঞ্জস্য থাকা সত্বেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সমতা মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য। নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চায়েতের নির্দেশ শিরোধার্য ছিল। পঞ্চায়েতে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের সমান অধিকার এবং বহু মতের ভিত্তিতে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হত। পঞ্চায়েতের প্রধানদের সর্দার নামে অভিহিত করা হত। সময়ে সময়ে সর্দার মনোনীত হতেন। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জের পৃথক পৃথক পঞ্চায়েত ছিল। আর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ছিলেন এই দুই পঞ্চায়েতের একমাত্র সর্দার। এ সম্মান কোন ধনী বিত্তবান পান নি।

বাংলাদেশের মতই রাজস্থানের বিভিন্ন সমাজ পণপ্রথা এবং যৌতুক প্রথার অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসে বাংলাদেশে বসবাস আরম্ভ করলেও মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ এই অভিশাপ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করে রাখতে সফল হয়েছিলেন। সামাজিক স্তরে দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এঁরা এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে এই সমাজের সর্বাধিক গরীব পরিবারও সমান মর্যাদার সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারতেন। এমন কি ধনীরাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে সাহসী হতেন না। ধনী বা বিত্তবানের মেয়ের বিয়েতেও যৌতুকের আধিক্য থাকত না। এই সব নিয়মের জন্য বৃহত্তম জৈন সমাজ এদেরকে তখন বিদ্রূপ করলেও এখন এঁদের দূরদর্শিতা এবং এই নিয়মের উপকারিতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ধনী গরীবের মর্যাদায়, আদর-যত্নে কোন তারতম্য ছিল না। বারোয়ারী সব অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ উৎসবাদিতে সকলের সমান অধিকার ছিল। এমন ঘটনারও নজীর আছে যখন সামান্য চাকুরে সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে তাঁরই বিরাট ধনী মনিবের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরেছেন এবং সেই মনিব তাঁরই সামান্য কর্মচারীর কাছে সমস্ত সমাজের সামনে করজোড়ে

ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু মনিব-গোমস্তার পারস্পরিক সম্পর্কে তিলমাত্র আঁচড় পড়ে নি। তাঁরা প্রাত্যকে প্রত্যেকের প্রাপ্য মর্যাদা দিতেন। এঁদের অতিথি বাৎসল্য সমগ্র জৈন সমাজে সর্বজন বিদিত। কয়েকটি পরিবারত এমন নিয়ম করেছিলেন যে, যে কোন জৈন তীর্থযাত্রী, পর্যটক প্রভৃতিকে অন্ততঃ একবার তাঁদের নিজ নিজ গৃহে অতি অবশ্য ভোজন করাবেন। বিশেষতঃ একটি পরিবারের অতিথি পরায়ণতার এই প্রথা প্রায় আইনের রূপ নিয়েছিল। এঁরা একসঙ্গে হাজার তীর্থযাত্রীকে ভোজনে আপ্যায়িত করেছেন। এঁদের আতিথেয়তার কথা প্রবাদবাক্যের মত ভারতের বৃহত্তর জৈন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এই অঞ্চলে অনেকগুলি মন্দির থাকায় পশ্চিম ভারতের জৈনরা এ ভূমিকেও তীর্থভূমি জ্ঞান করতেন। তাই ভগবান মহাবীরের নির্বাণ তিথি পাবাপুরীতে উদ্‌যাপিত করে কলিকাতায় কার্তিক মহোৎসবের (পরেশনাথ মিছিল নামে সুপরিচিত) সময়ে কলিকাতা আসার পথে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এঁদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। অতিথিপরায়ণ মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের আতিথেয়তার দ্বার অজৈনদের প্রতিও সমভাবে উন্মুক্ত ছিল। আর একথা football tournament চলাকালীন বহিরাগত শত শত বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রীড়ামোদীরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, প্রশংসা করেছেন। সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রেও বৃহত্তর অজৈন সমাজ এঁদের বিনম্র ও মধুর ব্যবহারে বিস্মিত হন। যাঁরাই এঁদের সঙ্গে পরিচিত হন এঁদের মধুর ব্যবহারের স্মৃতি বিশেষতঃ অভ্যর্থনার বিশেষ পদ্ধতি তাঁদের মনে অম্লান থেকে যায়। অন্যূন দুহাজার লোকের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন সত্যিই বিরল।

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনন্য সাধারণ গুণ বা স্বাতন্ত্র্য বুঝে থাকি। এই গুণ বা স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতঃই আপেক্ষিক। সুতরাং সেই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েই তার বিচার করতে হবে। যুদ্ধোত্তর কালে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। এখন জীবনের এবং জীবিকার প্রতিটি সোপানে আন্তর্জাতিক না হলেও জাতীয় ভাবধারায় আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করি। তাই আজ আর কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। কারণ মানুষের মেলামেশার পরিধি আজ অনেক বেশী ব্যাপ্ত। সুতরাং যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বা স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছি তা অতি অবশ্যই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভের (২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত) পূর্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষীতে বিচার্য।

মুর্শিদাবাদ সংঘ স্মারিকা, ১৯৬৬

পাথর হতে হীরে

শ্রীপ্রদীপ চোপরা

রাত্রির ঘণ্টা বাজে
টং টং টং
তবু পলক পড়ে না
সাধনার
ধ্যান ভূমি হতে
দিন যায় রাত্রি আসে
রাত্রি গেল—দিন এল
ধ্যানে যেন অন্তর্ধ্যান
শ্রমণ।

শেষে দিনও নেই
রাত্রিও পলায়িত
কেবল জ্ঞান আর দর্শনের
সমুদ্র
সমুদ্রেও ডুব দেয়
সাধক।

ঘড়ির কাঁটা
স্থান পরিবর্তন করতে থাকে
তবু ঘুম নেই
কাল আসছে
তারই স্বপ্ন
স্বপ্নের পরশে
ছদ্মস্থ মুনি
যায়
তীর্থংকর হতে।

যোগরাজ

[গুজরাত কাহিনী]

৫৯ বছর ২ মাস ২১ দিন রাজত্ব করে বনরাজ স্বর্গে গমন করলে তাঁর পুত্র যোগরাজ গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

শীলগুণ সূরি বনরাজকে ন্যায়ের জন্য ধর্মের জন্য রাজ্য পরিচালনা করতে বলেছিলেন, সেই ন্যায়ের জন্য ধর্মের জন্য যোগরাজ একদিন প্রয়োপবেশনে চিতানলে প্রবেশ করে নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন।

যোগরাজের তখন অনেক বয়েস হয়েছে। তাঁর তিন ছেলে তারাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। রাজ্যে সবখানে শান্তি সবখানে সমৃদ্ধি। রাজ্য সীমারও বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সময় একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেমরাজ পিতাকে এসে নিবেদন করলেন, বাবা কান্যকুব্জের এক সামন্তের কয়েকখানি জাহাজ ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সোমেশ্বর পাটনে এসে লেগেছে। শুনলাম তাতে ১০,০০০ তেজী ঘোড়া, ১৮০০ হাতী ও এক কোটী টাকার পণ্য রয়েছে। এসব তারা গুজরাত রাজ্যের মধ্যে গিয়ে কান্যকুব্জে নিয়ে যাবে। এসমস্তই আমাদের হতে পারে, যদি তুমি আদেশ দাও ত···

সেকথা শুনে যোগরাজ খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না বাবা, এ অন্যায়, এ তুমি করোনা।

ক্ষেমরাজ তখনকার মত আর কিছু বললেন না। সেখান হতে চুপকরে চলে গেলেন। কিন্তু মনে মনে মনে পিতার আদেশও মেনে নিতে পারলেন না। ভাবলেন, বাবার বয়স হয়েছে, তাই বুদ্ধি ভ্রংশ। তা নইলে কি কেউ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেয়। যে ধন অনায়াসে তাঁদের হতে পারে তিনি তা কেন ছেড়ে দেবেন। তিনি তাই তাঁর ছোট ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই হাতী ঘোড়া ও ধন নিয়ে যে পথ দিয়ে তারা যাবে সেই পথের ধারে বনের অন্ধকারে লুকিয়ে রইলেন তারপর তারা নিকটে আসতে বাঘ যেমন হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কান্যকুব্জের লোকেরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলনা তাই প্রতিরোধ করতে পারলনা। তাদের অনেকেই নিহত হল কিছু বন্দী। কিছু পালিয়ে গেল। ক্ষেমরাজ সেই হাতী ঘোড়া ও ধন নিয়ে বিজয়গর্বে অণহিল্লপুরে ফিরে এলেন।

যোগরাজ সমস্তই শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না তারপর যখন ক্ষেমরাজ এসে তাঁকে প্রণাম করলেন তখনো কিছু বললেন না। তারপর যখন পারিষদেরা তাঁকে

জিজ্ঞাসা করল, ক্ষেমরাজ ভালো করেছে না মন্দ তখনো তিনি চুপ করে রইলেন। শেষে যখন তারা তাঁকে কিছু বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন বললেন, আমি এখন আর কি বলব। যদি বলি কুমার ভালো করেছে তবে অন্যায় ও চুরীর পাপ আমাকেও স্পর্শ করে। আর যদি মন্দ তবে তা তোমাদের কারু ভালো লাগবেনা। তারপর একটু থেমে বললেন। দূতমুখে যখন গুজরাত রাজ্যের নিন্দা শুনি তখন কষ্ট হয়। তারা বলে গুজরাত চোরের রাজ্য। আমার পিতা পঞ্চকুলের যে ধন লুণ্ঠন করে গুজরাত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লোকে তা এখনো ভোলে নি। কুমার ক্ষেমরাজ সেই স্মৃতিকেই আরো তাজা করে দিল কিন্তু আমি চেয়েছিলাম গুজরাত শীলগুণ সূরির কথামত ধর্মের ওপর ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তা যখন হলনা—এই বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর তাঁর অঙ্গ রক্ষককে ডেকে বললেন, যাও আয়ুধশালা হতে আমার ধনুকখানা নিয়ে এস।

সভাসদদের কারু মুখে কথা নেই। সবাই মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধনুক আসতে যোগরাজ তাদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে বীর আছে যে আমার এই ধনুকে জ্যা পরাতে পারে?

সেকথা শুনে ধনুকে জ্যা পরাতে একে একে সকলেই এগিয়ে এল। কিন্তু কেউ জ্যা পরাতে পারল না, এমনকি কুমার ক্ষেমরাজও না। তখন যোগরাজ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি তবু তোমাদের চাইতে এখনো বেশী শক্তি রাখি বলে সেই ধনুকে জ্যা পরিয়ে দিলেন।

রাজসভা চিত্রার্পিত স্থির। যোগরাজ তখন বলে উঠলেন, স্ত্রীকে এক শয্যায় শুতে না দেওয়া, চাকরের বেতন কেটে নেওয়া ও রাজার আদেশ অমান্য করা তাদের হত্যারই সামিল। ক্ষেমরাজ সেই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আমি তাকে কি সাজা দেব। সেই সাজা আমি নিজে নিজের ওপর গ্রহণ করছি বলে অনুচরদের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে বললেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হলে তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করে প্রয়োপবেশনে সেই আগুনে প্রবেশ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু তাঁর স্মৃতি গুজরাতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

যোগরাজের পর তাঁর পুত্র ক্ষেমরাজ গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তারপর তাঁর পুত্র ভূয়ড়। এই ভূয়ড় শ্রীপত্তনে ভূয়ড়েশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। ভূয়ড়ের পর বৈর সিংহ। বৈর সিংহের পর রত্নাদিত্য। রত্নাদিত্যের পর সামন্ত সিংহ। এই সামন্ত সিংহই বনরাজ যে চাপোৎকট বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার শেষ রাজা। তাঁকে নিহত করে তাঁর ভগিনীপুত্র মূলরাজ কিভাবে সিংহাসন আরোহণ করে ছিলেন ও চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা সেও এক গল্প।

কান্যকুব্জের কল্যাণ কটক নগরে চালুক্যবংশীয় ভূয়রাজ নামে এক রাজা রাজত্ব

করতেন। তাঁর বংশে মুংজালদেবের তিন পুত্র হয় যাঁদের নাম রাজ, বিজ ও দণ্ডক।

সামন্ত সিংহ যখন গুজরাতের রাজা সেই সময় একবার এই তিন ভাই ছদ্মবেশে সোমেশ্বরের তীর্থযাত্রায় যান। তীর্থযাত্রা শেষ করে অর্ণহিল্লপুর দেখবার জন্য তাঁরা অর্ণহিল্লপুরে আসেন। সেদিন সামন্তসিংহ রাজবাড়ীর সামনের চকমেলানো চত্বরে ঘোড়ার নূতন নূতন চাল দেখাচ্ছিলেন ও লোকে চারদিকে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। তাই দেখে তাঁরাও সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রাজ নিজেও ঘোড়ার বিভিন্ন চাল দেখাতে পারতেন তাই যখন মগ্ন হয়ে সেই খেলা দেখছেন তখন এক ঘোড়ার এক নূতন চালের ওপর সামন্ত সিংহকে হঠাৎ কশাঘাত করতে দেখে হায় হায় করে চীৎকার করে উঠলেন। সেই চীৎকার সামন্ত সিংহের কানে যেতে সামন্ত সিংহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন ও কেন তিনি হায় হায় করে উঠলেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজ তখন বললেন, মহারাজ, সেই সময় ঘোড়া একটা বিশেষরকম চাল দেখাচ্ছিল। কোথায় আপনি তাকে সাবাস দেবেন না উল্টে কশাঘাত করলেন। তাই দেখে আমার মনে হল সেই কশাঘাত ঘোড়ার গায়ে নয় যেন আমার মর্মে এসে লাগল। আমি তাই হায় হায় করে উঠলাম।

সামন্ত সিংহ রাজের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি তখুনি সেই ঘোড়া তাঁকে দিয়ে ঘোড়ার বিভিন্ন চাল দেখাতে বললেন। রাজ তাতে সমর্থ হলে তিনি সেই ঘোড়াটিকেই যে তাঁকে দান করলেন তাই নয় তাঁর ব্যবহারে কথায়বার্তায় তিনি যে উচ্চকুলজাত তা বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে নিজের বোন লীলাবতীর বিয়ে দিলেন। সেই হতে রাজ অর্ণহিল্লপুরে বাস করতে লাগলেন।

কালক্রমে লীলাবতীর সন্তান সম্ভাবনা হল, কিন্তু সন্তানকে জন্ম দেবার পূর্বেই গর্ভধারণের বেদনায় লীলাবতী মারা গেল। লীলাবতীর মৃত্যুতে গর্ভস্থ শিশুর যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য লীলাবতীর উদর বিদারণ করে গর্ভস্থ শিশুকে বার করা হল। সেই সময় আকাশে মূলা নক্ষত্র উদিত হয়েছিল। তাই নবজাতকের নাম রাখা হল মূলরাজ।

মূলরাজ ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি পরাক্রম। তিনি তাই সকলের প্রিয় হলেন। এমন কি সামন্ত সিংহেরও।

সামন্ত সিংহের একটু পান দোষ ছিল। পান করে তাঁর মন যখন উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যখন তাঁর বোন লীলাবতীর কথা মনে পড়ত তখন তিনি মূলরাজের দিকে চেয়ে ভাবতেন, আজ যদি লীলাবতী বেঁচে থাকত তবে তার কি আনন্দ হত। তারপর না জানি কি ভেবে তিনি মূলরাজকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে দিতেন আর বলতেন এখন হতে তুমিই আমাদের রাজা। কিন্তু নেশা যেই কেটে যেত, তিনি যেই বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসতেন তখন তিনি তাকে সিংহাসন হতে নামিয়ে দিতেন, নিজে

আবার রাজা হয়ে বসতেন। এমনি এক আধবার নয় বহুবার।

কিন্তু মূলরাজের এই রাজা রাজা খেলা আর ভাল লাগে না; ভাবেন তিনি যে এখন সামন্ত সিংহের হয়ে রাজ্য শাসন করেন তাই নয়, গুজরাতের সীমাও বিস্তারিত করেছেন। তবে কেন তিনি পাকাপাকিভাবে গুজরাতের রাজা হবেন না। তাই একদিন যখন সামন্তসিংহ তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা রাজা বলে নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর আদেশে তাঁর এক অনুচর তাঁকে হত্যা করল। মূলরাজের আর রাজ্যচ্যুত হবার ভয় রইল না। সেই থেকে গুজরাতের তিনি পাকাপাকিভাবে রাজা হয়ে বসলেন।

[ক্রমশঃ

মহাবীরের আবস্তগাম

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পত্রপত্রিকায় বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে লেখা তাঁর নানা প্রবন্ধে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের রাঢ় চারিকার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছেন। বৈশালীতে গৃহত্যাগের পরে নায়ষণ্ডবন থেকে, অস্থিকগ্রাম-বর্ধমানের জৃম্ভক গ্রামে বা জৌগ্রামে কেবল-দর্শন লাভ পর্যন্ত, সার্ধ-দ্বাদশ বৎসর পর্যায়ক্রমে রাঢ়দেশে মহাবীরের পাদপূত প্রাচীন গ্রামগুলির অধুনি নামাবলী তিনি নির্দেশ করেছেন। ডঃ মণ্ডলের ইঙ্গিতজ্ঞাপক গ্রামসমূহে তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহুবার আমি তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছি এবং দেখতে পেয়েছি তাঁর অনুমান প্রায়শঃই অমূলক নয়।

'মহাবীরের রাঢ় চারিকায় বর্ধমান' প্রবন্ধে ডঃ মণ্ডল পঞ্চম বৎসরের পঞ্চম সংখ্যায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কুনুর নদীর তীরে অবস্থিত আবস্তগাম (আস্তগ্রাম) টিকে মহাবীরের পাদপূত গ্রাম স্বরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই গ্রামের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্যে এই গ্রামে উপস্থিত হই; এবং ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক্ দিয়ে বিশ্লেষণ মূলক অনুসন্ধান চালাই।

মহাবীরের আগমনের পূর্বে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অস্থিকগ্রাম 'বর্ধমান' নগরের আন্দাজ চব্বিশ/পঁচিশ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আস্তগ্রামের জে. এল. নং ৪৮, মৌজা আস্তগ্রাম, থানা মঙ্গলকোট। গ্রামের প্রবীণ লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে জানতে পারি, পূর্বে নাকি এই গ্রামের নাম ছিল 'আবস্তগ্রাম'। বহু পূর্বের এই ধরণের নামবিশিষ্ট কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ তাঁদের ঘরে ছিল; কিন্তু কুনুর ও বৃদ্ধনদীর প্লাবনের ফলে এই সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। ডঃ মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে ১২৮২ সালে এই বুনিয়াদি গ্রামটির অধিবাসী শ্রীরাধিকা প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের একটি বিশেষ পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটি তুলে ধরছি।

আন্তগ্রাম
২২।১২৮২ শাল

শ্রীচরণ কমলেষু—

অশংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়এর শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাশের প্রণগতীক মঙ্গল বিশেষঃ নিবেদন আমাদের বাটীতে কএকজন শ্রীশ্রীঅষ্টমীর ব্রেতর অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহাদের মানষ জে ব্রেতকথা ও ভোগআদী দিতে হইবেক তাহা আপুনী আশীয়া দেন একারণ নিবেদন কৃপা করিয়া মমালএ শুভাগমনে আজ্ঞা হইবেক এবং আশীবার সময় দিক্ষা করিবার গ্রেন্থ বুর্দ্ধা আনিতে আজ্ঞা হইবেক শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—শেবক শ্রীরাধিকা প্রসাদ শীংহ।

[চি. প. স. চি. [২য় খণ্ড] পৃঃ ১২৯]

বর্তমানে এই গ্রামে গোস্বামী, সদ্গোপ, পল্লবগোপ, কোটাল, কৈবর্ত, কর্মকার ও কুম্ভকারদের বসবাস রয়েছে। পদ্ধান-উপাধিক কোটালদের পূজিত দেবতা হলেন 'নবগ্রহ'। পৌষ মাসে মকর-সংক্রান্তির দিন দেবতার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বন্দাঘটি গাঁই-বিশিষ্ট গোস্বামী পদবীধারী ব্যক্তিদের উপাস্যদেবতা হলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গৌরাঙ্গ ও গদাধর। এই পাঁচজন বৈষ্ণব চূড়ামণি গ্রামীণ অধিবাসীদেব নিকট 'পঞ্চমহাপ্রভু' নামে খ্যাত। পাঁচজন মহাপ্রভুর বিশেষ অঙ্কিত প্রতিকৃতিতে নিত্যসেবা হয়ে থাকে। প্রবাদ, সাড়ে তিনশ বছর পূর্বে এই প্রতিকৃতিগুলি জয়পুর থেকে আনানো হয়েছিল। 'বলদেব' হলেন এঁদের বংশানুক্রমিক কুলদেবতা। বর্তমানে দেবতা গোস্বামীগণের অংশীদার কৈচড় স্টেশনের অনতি দূরে কানাই ডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করার ফলে, তাঁর আবাসে রয়েছেন। ৩'' × ১০'' নিমকাঠের নির্মিত দেবতাই হলেন বলদেব। কবে যে এই দেবতার মূর্তি নির্মিত হয়েছিল তা এঁরা বলতে পারেন না।

'বলদেব' হলেন আসলে জৈন দেবতা। ইনি হলেন মহাবীরেরও পূর্বেকার একজন অর্হৎ।[১] শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে একথা বলেছেন ডাঃ জগদীশচন্দ্র জৈন মহাশয়।

১ 'বলদেব' কোন জৈন দেবতা বা অর্হৎ নন্। মহাবীর সাধারণতঃ চৈত্য বা যক্ষায়তনে অবস্থান করতেন। বলদেব মন্দিরের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা পরবর্তী কালের। বলদেব তাই মনে হয় হিন্দু বা লৌকিক দেবতা। জৈন সাহিত্যে যে বলদেবের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা শলাকা পুরুষ মাত্র। জৈন শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীতে যেমন ২৪ জন তীর্থংকর উৎপন্ন হন, সেই রকম ১২ জন চক্রবর্তী, ৯ জন বাসুদেব, ৯ জন বলদেব ও ৯ জন প্রতি বাসুদেব উৎপন্ন হন। জৈন সাহিত্যে এঁদের শলাকাপুরুষ বলা হয়। ভরত ক্ষেত্রকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যিনি ভুজবলে ৬ খণ্ডের ওপর নিজের অধিকার স্থাপন করেন তিনি চক্রবর্তী। বাসুদেব ভরত ক্ষেত্রের ৩টী ভাগের ওপর আধিপত্য করেন। প্রতিবাসুদেব প্রথমতঃ এই ৩ ভাগের ওপর আধিপত্য করতে সমর্থ হন কিন্তু পরে বাসুদেব উৎপন্ন হয়ে তাঁকে নিহত করে

"These countries were called Aryan becauae, it is said that the Titthayars, the Ckkavattis, the Baladevas and the Vasudevas were born here. These greatmen are said to have attained omniscience in these countries and by attending to their preaching a number of people were enlightened and taken to ascetic life" [J. C. J., pp., 250-51]। এই বলদেব ঠাকুরের মন্দির রয়েছে গ্রামের মধ্যস্থলে। সামনে বিরাট বকুলগাছ।

গ্রামের গ্রাম-দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর ও মনসা। সিদ্ধান্ত উপাধিক ব্রাহ্মণেরা হলেন

৩ খণ্ডের অধিপতি হন। চক্রবর্তীর যেমন চক্র থাকে তেমনি প্রতিবাসুদেব ও বাসুদেবেরও চক্র থাকে। প্রতিবাসুদেব বাসুদেবকে নিহত করবার জন্য চক্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু সেই চক্র বাসুদেবকে নিহত করতে সমর্থ হয় না। বরং সেই চক্র ধরে নিয়ে সেই চক্র দিয়ে বাসুদেব প্রতিবাসুদেবকে নিহত করেন। বাসুদেবের চক্রের নাম সুদর্শন ও শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। বলদেব বাসুদেবের বড় ভাই। বলদেব ও বাসুদেবের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতি থাকে। প্রত্যেক বলদেবই সেই জীবনে মুক্তি প্রাপ্ত হন কিন্তু কোনো ধর্ম প্রচার করেন না। বাসুদেব যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্রূর কর্মের জন্য নরকগামী হন। বর্তমান অবসর্পিনীর ২৪ জন তীর্থংকরের নাম সকলেরই জানা আছে। তাই কেবল চক্রবর্তী, বাসুদেব, বলদেব ও প্রতিবাসুদেবের নাম নীচে দেওয়া হল:

	চক্রবর্তী		বাসুদেব		বলদেব		প্রতিবাসুদেব
১	ভরত	১	ত্রিপৃষ্ঠ	১	অচল	১	অশ্বগ্রীব
২	সগর	২	দ্বিপৃষ্ঠ	২	বিজয়	২	তারক
৩	মঘব	৩	স্বয়ম্ভু	৩	ভদ্র	৩	মেরক
৪	সনৎকুমার	৪	পুরুষোত্তম	৪	সুপ্রভ	৪	মধু
৫	শান্তিনাথ	৫	পুরুষসিংহ	৫	সুদর্শন	৫	নিশুম্ভ
৬	কুন্থুনাথ	৬	পুণ্ডরীক	৬	আনন্দ	৬	বলি
৭	অরনাথ	৭	দত্ত	৭	নন্দন	৭	প্রহ্লাদ
৮	সুভূম	৮	লক্ষ্মণ	৮	রাম	৮	দশগ্রীব বা রাবণ
৯	মহাপদ্ম	৯	কৃষ্ণ	৯	বলভদ্র	৯	জরাসন্ধ
১০	হরিষেণ						
১১	জয়						
১২	ব্রহ্মদত্ত						

উপরোক্ত তালিকার ৫, ৬ ও ৭ চক্রবর্তী রাজ্য ভোগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ও ১৬, ১৭ ও ১৮ সংখ্যক তীর্থংকর হন। এই ৬৩ জন শলাকা পুরুষের জীবন চরিত্র হেমচন্দ্রাচার্যের 'ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষ চরিত্রে' বর্ণিত আছে।—সম্পাদক

'খেলারায়' ধর্মঠাকুরের সেবাইত। ৭"×৩" পাথরের নির্মিত কূর্মের উপরে শঙ্খ ও পদচিহ্নই হ'ল ধর্মঠাকুরের আসল মূর্তি। মহাজ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন দেবতার বার্ষিক গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঠাকুরের অনতিদূরে রয়েছেন 'পঞ্চানন ক্ষ্যাপা'। ৫"×২" পাথরের নির্মিত নগ্ন জিন মহাবীরের মূর্তিই দেবতা পঞ্চানন ক্ষ্যাপার প্রতিমূর্তি। ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজানুষ্ঠানে ইনি পুষ্পমাল্য পেয়ে থাকেন। এর কারণ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের কাছে জানা যায়, ইনি হচ্ছেন ধর্মঠাকুরের বাহন 'উল্‌কমুনি'। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে নগ্ন মহাবীর উল্‌ক মুনির বিশেষ সম্পর্ক সাধন সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের জের বলেই মনে হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'বারমতি', 'বারভক্ত্যা' ইত্যাদি বিষয়ে বারো শব্দায় মহাবীরের ছদ্মস্থ জীবনের দ্বাদশ বৎসর রাঢ়চারিকার বিশেষ প্রতিফলন বলে মনে করি। মহাবীর বারো বৎসরের বেশি সময় লাঢ়দেশের বজ্জ ও সুব্ভ ভূমিতে চারিকা করেছিলেন। হিন্দু দেবদেবীদের সমাজে 'ভৈরব', 'পঞ্চানন ক্ষ্যাপা', 'উল্‌কমুনি' নামে এই সকল দেবতার অবস্থান ও তার ঐতিহ্যের জের বহু পুরাতন। হিন্দু-দেবদেবীর পার্শ্বস্থিত সহচর দেবতা নগ্ন জিন মহাবীরের অবস্থানের পরম্পরা সুনিশ্চিতভাবে জৈন-ধর্ম থেকে আগত।

কূর্ম ও শঙ্খ-প্রতীকজাত ধর্মঠাকুরের বিশেষ মূর্তিটি বিশেষভাবে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলকাব্যে 'শঙ্খাসুর' নামে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাই। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের পল্লীশ্রী-সংগ্রহে নকুণ্ডার পুঁথিতে কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীকজাত শিলাখণ্ডকে 'শঙ্খাসুর' নামে চিহ্নিত করার নির্দেশ পাওয়া যায়। অথচ গ্রামবাসীরা বংশ পরম্পরায় কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীকজাত ধর্মঠাকুরকে 'শঙ্খাসুর' নামে আখ্যায়িত না করে 'খেলারায়' নামে অভিহিত করায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীধর্মপুরাণে খেলারায়ের আকৃতিটি এই ধরণের—

> "খেলারায় ধর্ম হয় কূর্মের আকার।
> পৃষ্ঠে চক্র গদাপদ্ম আছয়ে তাহার॥
> অষ্টদল পদ্মোপর যার কলেবর।
> দক্ষিণেতে ধনুর্ব্বাণ দেখিবে সুন্দর॥"

গ্রামবাসীদের ধারণা, দেবতা নাকি সরাসরি এই মূর্তিতে গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্মঠাকুরের কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীক দুটি জৈন তীর্থংকরদের প্রতীকের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। জৈনকল্প সূত্র গ্রন্থে চব্বিশজন তীর্থংকরের চব্বিশার্থ প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীক দুটি যথাক্রমে মুনিসুব্রত ও নেমিনাথের। মুনিসুব্রত হলেন কুশাগ্রপুরী বা রাজগৃহের রাজা সুমিত্র ও রানী পদ্মাবতীর পুত্র। চম্পক বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ, চিহ্ন কচ্ছপ। নেমিনাথ হলেন সূর্যপুর বা সৌরিপুরের হরিবংশোদ্ভূত রাজা সমুদ্রবিজয় ও রাজ্ঞী শিবার পুত্র, মেষশৃঙ্গামূলে সিদ্ধি, চিহ্ন শঙ্খ।

প্রতীকজাত এই ধর্মঠাকুরের পাশে নগ্ন মহাবীরকে ধর্মঠাকুরের বাহন উলূক মুনি স্বরূপে বংশ পরম্পরায় চিহ্নিত করে আসা, মহাবীরের পূর্বেকার দুজন 'অহ'ৎ'-এর বিশেষ স্মৃতিছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি বিশেষ মাঠের নাম 'জিনকের মাঠ'। সরকারী রেকর্ডে এই নামের উল্লেখ আছে। এই মাঠের নামটি বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'কের' বিভক্তি যোগে কারক গঠিত হতে আমরা দেখতে পাই। 'কের' এবং 'র' বিভক্তি আসলে প্রাচীন বাঙ্গালায় ষষ্ঠীর বিশেষ প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'নারীর যৌবন কাহ্ন নদীকের পাণী।' নারীর যৌবনকে নদীর জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সূত্রে 'জিনকের মাঠ' নামে 'কের' শব্দটি ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'জিন' শব্দটিকে বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করতে চেয়েছে। আমার ধারণা 'জিন' শব্দটি কোনো জৈন শ্রমণের সঙ্গে জড়িত। এই গ্রামের প্রবীণ ভদ্রলোক শ্রীহরিমোহন সিদ্ধান্ত মহাশয় আমাকে দেখিয়ে দিলেন বর্তমানের 'জিনকের' মাঠটি। সিদ্ধান্ত মহাশয় বললেন এক সময় এখানে বিরাট ডাঙ্গা ছিল। ডাঙ্গার আয়তন ছিল আনুমানিক কুড়ি পঁচিশ বিঘার মত। ডাঙ্গা কাটিয়ে স্থানটিকে বর্তমানে জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ডাঙ্গা কাটবার সময় প্রচুর পরিমাণে বিরাটকায় ইট ও অন্যান্য ভগ্নমাটির তৈজসপত্র পাওয়া যায়। বহুপূর্বে শোনা যায় নাকি এখানে যুগী তাঁতিদের বসবাস ছিল।

'অর্ধপুকুরের ডাঙ্গা' নামে আর একটি ডাঙ্গা দেখা যায়। বারো বিঘা আন্দাজ স্থানের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন মাটির তৈজস-পত্র দেখে সহজে অনুমান করা যায়, মূল গ্রামটি একদা হয়তো এইখানেই অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে কুনুর ও বৃদ্ধনদীর প্লাবনের ফলে গ্রামটি মূলডাঙ্গা থেকে দক্ষিণদিকে সরে এসেছে। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা, দুটি-নদী গ্রামটিকে উত্তরে এবং দক্ষিণে আবেষ্টন করে থাকার জন্যে এই 'আবত্ত' গ্রাম নাম হয়েছে এবং পরবর্তীকালে অপভ্রংশে লোকমুখে 'আত্তগ্রামে' পর্যবসিত হয়েছে। গ্রামে যোগাযোগের অদ্যাবধি কোনো ব্যবস্থা নাই।

আসানসোল মহকুমার কাঁকসা থানার অরণ্যভূমি কুনুরের উৎসস্থল। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান আত্তগ্রামকে পাশে রেখে উজানি বা প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরে অজয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ডক্টর মণ্ডল বলেন, 'কনওয়ার' শব্দটি হ'ল কুনুরের আসল নাম। নামটি ইন্দো-মোঙ্গল শব্দ ভাণ্ডার থেকে এসেছে। অপর দিকে বৃদ্ধনদী বর্তমান ওড়গ্রামের সন্নিকটে ডাঙ্গা থেকে বের হয়ে মাহাতা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, গ্রামের পূর্বদিকে ডোরলের কাছে কুনুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তবে, এই পুরাতন প্রবাহিণীটিকে তার মরা সোঁতা দেখে আজ সবাই চিনতে পারবেন না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দে যুগন্ধর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই

'বুড়া' নদীটিকে ভালভাবেই চিনতেন। তখনও এর প্রবল প্রতাপ ছিল।

ষষ্ঠ খৃষ্টপূর্বাব্দে শ্রমণ ভগবান মহাবীর এই গ্রামে আগমন করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আমি কোনোরূপ মন্তব্য করতে ইচ্ছা করি না। তবে তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাঢ়দেশ আর্যদেশ ছিল। রাজধানী ছিল কোডিবরিস। ডঃ মণ্ডল বলেছেন, অংগ, বংগ, পাণ্ড্য বা লাঢ়, লাড় বা রাঢ় সম্ভবতঃ ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্ভুক্ত। এবং সারা দেশটি ছিল জৈন সম্প্রদায়ের এলাকা। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছেন, অংগের সীমানা হ'ল,

"In the South-east of Bhagalpur district, there is a place on the border of Bihar and West Bengal, called Teliagarhi, which was very important from the srategical point of view. In former days, armies would march from west to east through this pass of the Rajmahal hills" [*H. B.*, Vol. II, pp. 5-6]। ডক্টর মণ্ডলের মতে, অংগের শেষ সীমানা ছিল দামোদর নদ বরাবর চম্পাইনগরী পর্যন্ত। টলেমির ভূগোলে উড়ুম্বর (নাগবংশীর) জাতির 'তেলিয়াগড়ি' অধিকার করার কথা পাই। 'উড়ুম্বর পরিবেশে ওড় গ্রামে দেবী উড়ুম্বরী' প্রবন্ধে তেলেঝি ও উড়ুম্বর জাতির তেলিয়াগড়ি অধিকারের প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করেছি। এই জাতির আধিপত্য বিস্তারের পরে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে রাঢ়দেশের বজ্জ ও সূহ্ম ভূমিতে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের আগমন হয়।

আত্তগ্রামে ধর্মঠাকুরের ভূত ডাঙ্গাতে বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষে, পরিত্যক্ত বলদেব মন্দিরে সাময়িক অবস্থান, নগ্ন মহাবীরের সঙ্গে পঞ্চানন ঠাকুরের এবং উলুক মুনির পরিচিতি, কোনো জিন সম্পর্কিত জিনকের ডাঙ্গা ও ধর্মঠাকুরের ইঙ্গিতজ্ঞাপক মূর্তি যে কোনো ছদ্মস্থ শ্রমণের বিশেষ ইতিহাসের স্মৃতি চারণা করছে, এ কথা অনস্বীকার্য।

ডাঃ জগদীশচন্দ্র জৈন মহাশয় তাঁর ভৌগোলিক অভিধানে বলেছেন—

"Avattagama—a village. Mahavira is stated to have journeyed to this place from Nangala and proceeded to Coraya Sannivesa from here. Its exact situation is not known."

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারছি আবত্তগ্রাম (আত্তগ্রাম) টি বর্তমানে বীরভূম জেলার, মোরনদীর তীরে অবস্থিত নান্দুলিয়া (নঙ্গল) এবং বর্ধমান জেলার, অজয় ও কুনুরনদীর উপত্যকায় অবস্থিত ছোরা [চোরাগ-সন্নিবেশ] গ্রাম দুটির মধ্যস্থলে নব্বই ডিগ্রি সমকোণে অবস্থিত।

অভয়রুচি

[একাঙ্কিকা]

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান ঃ শ্মশান। জিনপালিত ক্লান্ত হয়ে এক গাছের ছায়ায় এসে বসছে। জিনদাস সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে]

জিনপালিত ঃ [হাঁপাতে হাঁপাতে] ঃ আমিত আর এক পাও হাঁটতে পারব না। এইখানেই বসে পড়লাম।

জিনদাস ঃ সে কি ?

জিনপালিত ঃ এই মোটা শরীর নিয়ে আর কত হাঁটব। সকাল হতে ঘোড়ার মত দৌড়োচ্ছি। বোধ হয় দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি।

জিনদাস ঃ না না। দু' তিন ক্রোশমাত্র। গ্রামের লোক বলছিল ···

জিনপালিত ঃ ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা ওই রকমই বলে। বলে দশ পা গেলেই পেয়ে যাবে, পাওয়া যায়না হাজার পা হে'টে এলেও। যখনি জিজ্ঞেস করো—বলবে মাত্র দশ পা।

জিনদাস ঃ তা যদি না বলত তবে কি তুমি এতদূর হে'টে আসতে পারতে ? সেইখানেই বসে পড়তে।

জিনপালিত ঃ বসে পড়তাম তো বসে পড়তাম। তাতে কার কি ক্ষতি হত ? আমি কি জানি যে আচার্য সুদত্ত আজকে···সাধুদের শরীরে ত মেদ থাকে না—তাদের শরীর রুক্ষ, শুকনো, পাতলা। তাছাড়া হে'টে হে'টে তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ?

জিনদাস ঃ হ'াটবার অভ্যেস করলে তুমিও জোরে হ'াটতে পারবে।

জনপালিত ঃ ইহ জীবনে নয়। এমনিতে হয়নি এই শরীর। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হয়েছে। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পারছ আচার্য সুদত্তের মতলব ?

জিনদাস ঃ কোন মতলব ?

জিনপালিত ঃ এই দৌড়োদৌড়ীর ? পাশেইত রাজপুর নগর রয়েছে যার রাজা প্রভূত প্রতাপশালী মারিদত্ত। তবে কেন সেখানে না গিয়ে এই বন বাদাড়ে ঘুরে মরা ?

জিনদাস ঃ তুমি ত বললে রাজপুরে গেলেই হত কিন্তু কি হচ্ছে সেখানে জান ?

জিনপালিত ঃ কেন, কি হচ্ছে সেখানে ?

জিনদাস ঃ বলব ? সেখানকার রাজা মারিদত্ত—

জিনপালিত ঃ কি সাধুসন্তদের নগর প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছেন ?

জিনদাস ঃ না, তা নয়। তুমি ত জান উনি কৌল।

জিনপালিত : তা জানি।

জিনদাস : তিনি মহাকৌল বীর ভৈরবের আগ্রহে এক পশুমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন।

জিনপালিত : কি বললে—যজ্ঞ ?

জিনদাস : না যজ্ঞ ঠিক নয়, পশুদের রক্তে দেবীর পূজা। চণ্ডমারীর সামনে ব্যাঙ্ হতে মানুষ পর্যন্ত জোড়ায় জোড়ায় এক লক্ষ জীবের বলি হবে। রাজার আদেশে তাঁর অনুচরেরা তাই সবখান হতে জীব জানোয়ার ধরে আনছে। তাদের করুণ চিৎকারে রাজপুরের আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে। হাতী ঘোড়া, হরিণ, মোষ, ছাগল, খরগোস একত্রিত করা হয়েছে। রাজকর্মচারীরা এখন সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত এক জোড়া কুমার কুমারীর অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

জিনপালিত : কি বলছ তুমি ?

জিনদাস : ঠিকই বলছি। তাইত আচার্য সুদত্ত রাজপুরে গেলেন না।

জিনপালিত : কত নৃশংস ও অধর্মী এই রাজা।

জিনদাস : নৃশংস ও অধর্মী ? আর কৌলরা কি বলে জান—পরম ভক্ত। প্রতিদিন এক শ' এক মোষ ও এক শ' এক ছাগলের বলি হয়। মন্দিরের সামনে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। সেই নদীতে ক্রীড়া করে আনন্দোন্মত্ত হয়ে ভূত ও পিশাচ। এখন তুমিই বল সেই নগরে আচার্য সুদত্ত কি করে যেতেন ?

জিনপালিত : তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু শ্রীবন উদ্যানে কেন থাকলেন না ?

জিনদাস : কি করে থাকবেন ? চোখ বন্ধ করে হ*াটছিলে বুঝি ? শ্রীবন কামীদের বিহার ভূমি। এক লতামণ্ডপের আড়ালে আমিই স্বচক্ষে দেখলাম···থাক ওসব কথা। ও জায়গা সংযমীদের উপযুক্ত নয়। তাই বাধ্য হয়েই আচার্য সুদত্তকে এগিয়ে যাবার আদেশ দিতে হল।

জিনপালিত : তবে এই শ্মশানে কেন থাকলেন না ?

জিনদাস : তুমিও পাগলের মত কথা বলছ ? দেখছ না কত বিভৎস ও ভয়ানক এই জায়গা। চারদিকে নরকপাল ও হাড় ছড়িয়ে রয়েছে, মরা পচছে, শিয়াল-কুকুর চিৎকার করছে। কি করে এখানে থাকতেন আচার্য ?—তাই ও*কে এগিয়ে যেতে হল।

জিনপালিত : কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ তুমি ? আচার্য রাজপুরে প্রবেশ না করলেও, রাজপুর ছেড়ে এগিয়েও ত যাচ্ছেন না।

জিনদাস : তুমি ঠিকই বলছ।

জিনপালিত : এর কারণ কি তুমি জান ?

জিনদাস : না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে তিনি রাজপুরে প্রবেশ করছেন না।
[জিনরক্ষিতের প্রবেশ]

জিনরক্ষিত : আরে, এখানে বসে তোমরা গল্প করছ আর ওদিকে আচার্য তোমাদের ডাকছেন।

জিনপালিত : ওদিকে কোথায় ?

জিনরক্ষিত : ওই যেদিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরি নীচে। আজ আমরা ওখানেই থাকব।

জিনদাস : তা হলে জিনপালিত, ওঠ।

জিনপালিত : কি করে উঠব, পা আর আমার বশ নয়। খিদেও পেয়েছে তেমনি।

জিনরক্ষিত : এখনো পুরো সকালই হয় নি আর তুমি খিদেয় মরছ। অভয়মতি ও অভয়রুচির দিকে চেয়ে দেখত। বাল-তপস্বী আর আটদিনের উপবাস। তবুও আচার্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। এখন-এখুনি আচার্যের আজ্ঞা নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভিক্ষাচর্যায় গেছেন।

জিনপালিত : ওদের সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়। কোথায় মুমুক্ষু প্রাণী আর কোথায় সংসারী এই জিনপালিত। [উঠবার প্রয়াস করছে, পা কাঁপছে] জিনদাস, একটু ধরত আমায়।

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজপুরের উপকণ্ঠ। রাজপথ। অভয়মতি ও অভয়রুচি]

অভয়রুচি : এ কোথায় এসে গেছি আমরা। গোপ পল্লীতে ভিক্ষে না পাওয়ায় একটু এগিয়ে এলাম। কিন্তু এত দেখছি নগরপ্রান্ত। অনেক মানুষ একত্রিত দেখছি। তবে কি এ কুখ্যাত রাজপুর নগরের উপান্ত ?
[দু'জন প্রহরীর প্রবেশ]

১ম প্রহরী : দাঁড়াও।

অভয়রুচি : কে তোমরা ?

১ম প্রহরী : দেখছ না, রাজপুরুষ।

অভয়রুচি : রাজপুরুষ ? আমাদের সঙ্গে তোমাদের কি প্রয়োজন ?

১ম প্রহরী : প্রয়োজন ? তোমাদের সঙ্গে কি প্রয়োজন ? এ রাজাজ্ঞা। তোমাদের দু'জনকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে। [২য় প্রহরীকে] এদের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দে।

: না, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কেউই পালাব না।

১ম প্রহরী : তার বিশ্বাস কি?
[হাতকড়ি পরাচ্ছে]

অভয়রুচি : আমরা চোর ডাকাত নই যে পালিয়ে যাব, না গুপ্তচর। কিন্তু আমরা কি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন এই রাজ্যাদেশ?

১ম প্রহরী : বলবার কথা নয়, তবু বলছি। দেবী চণ্ডমারীর পূজোর জন্য এক জোড়া মানুষ চাই। তারি সন্ধানে ছিলাম আমরা—আর তোমরা আমাদের সম্মুখে এসে গেলে। তোমাদের সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত মনে হচ্ছে।

অভয়রুচি : তবে তোমরা আমাদের বলি দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছ?

১ম প্রহরী : ঠিক তাই।

অভয়মতি : ভাই, তবে আমাদের কী হবে? [কাঁদছে]

অভয়রুচি : বোন, তুমি সাধ্বী হয়ে কাঁদছ? তপস্বীদের ত সব রকম বিপদ আপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ভগবান মহাবীরকে ত না জানি কত উপসর্গ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এও ভালো হল যে এখনো আমরা পারণ করিনি। আজ আট দিনের উপোশ—এই অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় ত নিশ্চয়ই সদগতি লাভ করব।

অভয়মতি : কিন্তু ভাই, মৃত্যুর কথা শুনে খুব ভয় করছে।

অভয়রুচি পাগল! মৃত্যুকে কী ভয়? মৃত্যু ত এমনি হঠাৎই আসে। তার জন্য ত সর্বদা তৈরী থাকতে হয়। সে রকম মানুষ খুব কমই দেখা যায় যাঁরা মৃত্যুর কথা আগে জানতে পারেন। কিন্তু দুঃখ ত এই যে একথা গুরুদেবকে জানাতে পারলাম না। উনি খুব কষ্ট পাবেন যখন এসব শুনবেন। কিন্তু…ও'র কিসের কষ্ট? ও'র না আছে রাগ না বিরাগ। উনি ত সর্বজ্ঞ। উনি কি আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা বলেন নি? উনি ত এ সব দেখতেই পাচ্ছেন।

অভয়মতি : তুমি ঠিক বলছ ভাই। গুরুদেবের মত জ্ঞানী নেই। তিনি অবশ্যই এসব দেখতে পাচ্ছেন। হয়ত এ ঘটবে তিনি জানতেন, তবে কেন আমাদের আটকে রাখলেন না?

অভয়রুচি : বোন, ভবিতব্যকে কে আটকাতে পারে? এতে গুরুদেবের কি দোষ। একে ত নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে কর যে এভাবে এই দেহ ছাড়বার সুঅবসর আমরা প্রাপ্ত হলাম।

১ম প্রহরী : এখন একটু তাড়াতাড়ি চল। [নিয়ে যাচ্ছে]

অভয়মতি : ভাই, এরা কি পাপী যে আমাদের হাতে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ত এমনি যাচ্ছিলাম।

অভয়রুচি : বোন, নিরপরাধকে যে কষ্ট দেয় তার ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে সাধু হয়ে রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করেছে তার ক্রোধ হওয়া উচিত নয়। না তার উচিত কটু শব্দ বলা। শ্রেয়ঃত এই যে এই মহান কষ্টকে আমরা সহ্য করি ও এদের ক্ষমা করি।

অভয়মতি : ভাই, তোমার উপদেশ আমায় শান্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার মন বড় দুর্বল। আর দুর্বলতা আমায় পরিত্যাগ করছে না।

অভয়রুচি : বোন, না তুমি আমার, না আমি তোমার। মৃত্যুপথ যাত্রীর রাস্তা পৃথক পৃথক। তাই তুমি অর্হৎদের স্মরণ কর, গুরুদেবের শরণ গ্রহণ কর। সেই শ্রেয়।

১ম প্রহরী : কথা না বলে এখন তাড়াতাড়ি একটু হাঁটত।
[প্রহরীরা তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে যাচ্ছে সামনে হতে কয়েকজন নাগরিক আসছে]

১ম নাগরিক : কোথায় নিয়ে যাচ্ছ এই সাধু সাধ্বিদের? হাতে কেন হাতকড়ি দিয়েছ?

১ম প্রহরী : দেবী চণ্ডমারীর মন্দিরে যেখানে ওদের বলি হবে।

১ম নাগরিক : বলি? মানুষের বলি? অন্য দিন ওখানে পশুদের হত্যা করা হয়, আজ মানুষের?

৩য় নাগরিক : এতো ঘোর অন্যায়।

১ম প্রহরী : ঘোর অন্যায় ত রাজার কাছে যাও। পথ ছাড়। [প্রহরী ওদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে]

২য় নাগরিক : যদি এই নিরপরাধ সাধুদের হত্যা করা হয় ত না জানি কোন বিপত্তি এসে পড়বে। আরে এ কি হচ্ছে?

৩য় নাগরিক : ভূমিকম্প।

২য় নাগরিক : চলো আমরা রাজার কাছে যাই।

১ম নাগরিক : কোন লাভ নেই সেখানে গিয়ে।

২য় নাগরিক : তবে কোথায় যাওয়া যায়?

১ম নাগরিক : আমরা যদি সবাই মিলে মহাদেবীর কাছে যাই।

২য় নাগরিক : তবে চল, শীঘ্র চল। [সকলে চলে যাচ্ছে]

[ক্রমশঃ

নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VI No. 2 Sraman June 1978
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জ্যৈষ্ঠ । ১৩৮৫ ষষ্ঠ বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

সম্ভবনাথ মন্দির, জিয়াগঞ্জ

মুর্শিদাবাদ জৈন সমাজের বৈশিষ্ট্য

শ্রীজয়ন্ত কোঠারী

জৈন ধর্মের সঙ্গে বাংলা দেশের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। ভগবান মহাবীর স্বয়ং ধর্ম প্রচারে বাংলা দেশে এসেছিলেন—আচারাঙ্গ সূত্রে এর উল্লেখ আছে। ভগবান মহাবীরের নাম বর্ধমান। তাঁরই নামানুসারে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার নামকরণ হয়েছে।. এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। দশম শতক পর্যন্ত জৈন ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব শুধু পশ্চিম বঙ্গেই নয় উত্তর বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গেও বিস্তৃত ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণও বিদ্যমান।

কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ দশম হতে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস অস্পষ্ট হলেও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে (বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার) যে সরাক জাতি বসবাস করে তারা জৈন শ্রাবকদেরই (মহাবীরের সঙ্ঘ ব্যবস্থায় সাংসারিকদের শ্রাবক বলা হয় এবং সরাক শব্দটী শ্রাবক শব্দের অপভ্রংশ) বংশধর।

অষ্টাদশ শতাব্দী হতে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে। সে যুগের মুর্শিদাবাদ নগরী (বর্তমান কাসিম বাজার হতে দস্তুরহাট গ্রাম পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীর বিস্তৃত ছিল) তদানীন্তন লণ্ডন শহরের মতই বিস্তৃত, সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল ছিল। (Clive described Murshidabad in Bengal, in 1757, the very year of Plassey as a city as extensive, populous and rich as the city of London with the difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last.—Jawaharlal Nehru, *Discovery of India*) মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ এই ভাবধারার প্রবর্তক ও বাহক।

এ'দের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে বসবাস আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর উভয় তীরে আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে এ'দের বসতি কেন্দ্রীভূত হয়। এ'রাই কালক্রমে ভারতের বৃহত্তর জৈন সমাজে 'মক্সুদাবাদী' বা মুর্শিদাবাদী জৈন নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজ সমগ্র ভারতের জৈন সমাজের সভায় এক বিশিষ্ট স্থান সসম্মানে অধিকার করে আছেন। বরং মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ সমগ্র ভারতের জৈন সমাজের মণিহারে মধ্যমণি বললে বোধকরি অত্যুক্তি হয়না। অর্থবল

কিংবা লোকবলের জন্য এ'রা এই সম্মান পাননি এই গৌরব তাঁদের ধর্মপ্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের বা স্বাতন্ত্র্যের উজ্জল স্বীকৃতি।

আমার দৃষ্টিতে প্রথম বৈশিষ্ট্য—বেশভূষা। আমরা জানি রাজস্থান ছোট বড় শতাধিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ী ছিল। মানুষ যে ভূমিকে আপন জন্মভূমি বলে পূজা করে তার বেশভূষা স্বভাবতঃই সেই দেশীয় হয়ে থাকে। পুরুষের বেশভূষায় পাগড়ীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। তেমনি নারীর বেশভূষায় প্রাধান্য পেয়েছে তার সোহাগ চিহ্ন। বাংলা দেশের নারী সমাজ সিঁথির সিঁদুরকেই এই মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা দেখি মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজের প্রতিষ্ঠাতারা পুরুষের শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ী হিসাবে তৎকালীন বাংলা দেশের পাগড়ী আর নারীর সোহাগ চিহ্ন হিসাবে সিঁথির সিঁদুরকেই গ্রহণ করেন। মুসলমান প্রভাবের ফলে 'নথ'কেও পরিপূরক সোহাগ চিহ্ন হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেন (রাজস্থানের নারীসমাজে এই দুয়েরই প্রচলন নেই)। আর সাধারণ পোষাক হিসাবে ধুতি, পাঞ্জাবী এবং সাড়ী ও 'লহঙ্গা-ওড়না' (মুসলমান প্রভাব) গ্রহণ করেন। যে কোন প্রবাসী সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে শতাধিক বৎসর কেটে গেলেও বেশভূষার পার্থক্য বিদ্যমান থেকে গেছে। অথচ এ'দের পূর্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদে বসবাস প্রারম্ভের সময় হতে বাংলা দেশকেই আপন মাতৃভূমি রূপে এবং এদেশীয় বেশভূষাকে আপন বেশভূষা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের বেশভূষায় স্বকীয় ধার্মিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট রাখেন। ধার্মিক ক্রিয়া, আচার-অনুষ্ঠান, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গোষ্ঠীগত। সুতরাং আমরা দেখছি মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজ একাধারে সমন্বয় সাধন করেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এ'দের খাদ্যাভ্যাস। বাংলা দেশে মাত্র কয়েকটি জৈন পরিবার মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। অহিংসা জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র। স্বভাবতঃই জৈনরা ভরণ-পোষণের জন্য জীব হত্যা মহাপাপ জ্ঞান করেন। অথচ তৎকালীন বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী জনসমুদ্র প্রধানতঃ আমিষভোজী ছিলেন। এ'দের তুলনায় মুর্শিদাবাদী জৈনদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। আবার জলবায়ু এবং উৎপন্ন শাকসব্জী ও ফলমূল কোন কিছুরই এ'দের আদি ভূমির সঙ্গে মিল ছিল না। ধার্মিক বিধি নিষেধ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে এ'রা এদেশীয় খাদ্যবস্তুও গ্রহণ করলেন। শুধু খাদ্যবস্তুই নয় পাকপ্রণালীও রপ্ত করলেন। গ্রহণযোগ্য মুসলমান খানার শ্রেষ্ঠ খাদ্যবস্তু ও পাকপ্রণালী এবং হিন্দু খাদ্যসামগ্রী ও পাক প্রণালী গ্রহণ করে তার সঙ্গে রাজস্থানী ধারার এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করলেন। ফল স্বরূপ আমরা দেখি এ'দের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান এবং রাজস্থানী খাদ্যদ্রব্যের এক

আশ্চর্য সমন্বয় ও স্বাতন্ত্র্যের সমাবেশ। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য খাদ্য তালিকার গ্রহণযোগ্য খাদ্যবস্তুও গ্রহণ করেছেন। হয়ত অনেকেই এই উক্তিতে শঙ্কিত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু salad এবং boiled vegetable পাশ্চাত্য প্রভাবেই গ্রহণ করেছেন এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার জন্য। এই মৌলিক সমন্বয় মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মুসলমান খানার 'পরোঠা'র অনুকরণে এ'দের 'টিকড়া' হলেও এর স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তেমনি মুসলমানী 'পোলাও' এর অনুকরণে এ'দের 'মেওয়া'র খিচুড়ী রান্না হয়ে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রেও এ'দের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। দই-এর মাধ্যমে এ'দের যে খিচুড়ী (সলোনী) এবং দই ও শশার মাধ্যমে যে কচুড়ী রান্না হয় তেমনটি অন্য কোন সমাজে হয় বলে তো জানা নেই। শাক-সব্জীর পাকপ্রণালীতে হিন্দু (বাঙালী) প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও বৈচিত্র এবং রন্ধন পদ্ধতি এ'দের একান্তই আপন। দই-এর মাধ্যমে এক রকম তরকারি হয়ে থাকে যাকে 'রায়তা' বলে অভিহিত করেন—পুরোপুরী রাজস্থানী প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বাংলার সব চেয়ে বেশী প্রভাব দেখি এ'দের মিষ্টান্নের তালিকায় কিন্তু মিষ্টান্নের তালিকায় রাজস্থানী প্রভাবও সমভাবে স্থানাধিকার করে আছে। আর কিছুটা মুসলমান প্রভাবও রয়েছে। আবার কয়েকটি মিষ্টান্ন মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের মৌলিক অবদান—যেমন এ'দের বিশেষ ধরণের চালকুমড়োর মোরব্বা। পদ্মের চাকি দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু—খিচুড়ী হতে সিঙ্গাড়া, কচুড়ী, পকোড়া এবং বিভিন্ন তরকারী—এ'দের নিজস্ব মৌলিক অবদান। এই ধরণের ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেওয়া যায়।

সব ফলমূল সরাসরি খাওয়া যায় না। খোসা ছাড়িয়ে আঁ'টি বাদ দিয়ে তবেই পরিবেশন করা যায়। এ বিষয়েও মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও মৌলিকতার পরিচয় পাই। যেমন আম কেটে পরিবেশনের উপযুক্ত করার মধ্যে, কাঁচা তালশাঁসের খোসা ছাড়ানোয়, নেবু কাটার পদ্ধতিতে। পদ্মের চাকির দানা (বীজ) বের করা এবং পরিবেশনের উপযুক্ত করা—এক সূক্ষ্ম কলার সমতুল্য—মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের মৌলিক অবদান। আবার খাদ্যবস্তু পরিবেশনের পদ্ধতি সুরুচি ও বিনম্রতার স্বাক্ষর বহন করে। এ'দের পরিবেশন পদ্ধতি দেখলে যে কোনও লোক বিস্ময়ের সঙ্গে পার্থক্য অনুভব করবেন। সামগ্রিকভাবে মিষ্টান্ন, পাক করা খাদ্যসম্ভার, ফলমূল পরিবেশনের উপযুক্ত করা এবং পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন, স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতা এবং সূক্ষ্ম রুচি ও রসবোধ মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য।

জৈনরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্। হিন্দুর 'ঈশ্বর' এবং মুসলমানের 'আল্লা' এক না হলেও সম পর্যায় ভুক্ত। মুর্শিদাবাদী জৈনের সংখ্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান

মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় মহাসমুদ্রে গোষ্পদের সমান। স্বভাবতঃই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিরাট জনসমষ্টির প্রভাব অপরিহার্য কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ সগর্বে বলতে পারেন তাঁদের ধার্মিক বিশ্বাস ও ধার্মিক ক্রিয়া, আচার ও অনুষ্ঠানে তাঁরা জৈন শাস্ত্রের নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুতি হন নি। সমগ্র ভারতের জৈন সমাজ তাই পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে এঁদের ধার্মিক আচরণের প্রশংসা করে থাকেন। এঁদের ধর্মানুরাগ শুধু ক্রিয়াকাণ্ড ও ধার্মিক অনুশাসনের স্বীকৃতি ও প্রতিপালনেই সীমিত ছিল না। পূর্ব ভারত অধিকাংশ জৈন তীর্থংকরদের বিচরণ ভূমি এবং বাইশ জন তীর্থংকরের নির্বাণ ভূমি। কিন্তু কালের স্রোতে পূর্ব ভারতের জৈন পুণ্যভূমিগুলো বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদী জৈনেরা সেই সব পুণ্যভূমির উদ্ধার করে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রীর আবাসের জন্য ধর্মশালা, আহারের 'রসোড়া' ইত্যাদি নির্মাণ এবং পরিচালনের ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত ও ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য জমিদারী এবং বিষয়সম্পদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এক কথায়, তীর্থক্ষেত্রের এমন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ব্যবস্থার নজীর আগে কোথাও দেখতে পাওয়া গেছে কিনা সন্দেহ। শুধু পূর্ব ভারতেই নয় উত্তর ভারতেরও কয়েকটি তীর্থস্থানের উদ্ধার, সংস্কার এবং পরিচালনার সুবন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের প্রত্যেকটি তীর্থক্ষেত্রে এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে সমগ্র ভারতের জৈন সমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়েছেন। শাস্ত্রোদ্ধার ও প্রচারের এঁরা অগ্রণী ছিলেন। শুধু তাই নয়, জৈন শাস্ত্র ও ইতিহাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও (research) ভারতের সমগ্র জৈন সমাজের মধ্যে মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের এক সুসন্তানই পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন স্থান হতে শাস্ত্রীয় পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে জ্ঞানী আচার্যদের দ্বারা অশুদ্ধি সংশোধন করিয়ে সর্বপ্রথম মুদ্রণ (৪৫ আগমের মুদ্রণ ও প্রকাশন) ও ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে জৈনদের মধ্যে বিতরণ এই সমাজেরই বিশিষ্ট এক ব্যক্তির কীর্তি। তাই সমগ্র জৈন সমাজ এঁদের কাছে চির ঋণী। অতএব আমরা দেখি যে মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের ধর্মানুরাগ শুধু ধার্মিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তীর্থ ভ্রমণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ধার্মিক আচার অনুষ্ঠনের সঙ্গে জ্ঞানাহরণ এবং শাস্ত্রচর্চা ও প্রচার সমভাবে এঁদেরকে আকর্ষণ করেছিল। তদানীন্তন ভারতের সমগ্র জৈন সমাজের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়নি।

বৃটিশ রাজত্বের সঙ্গে এলো পাশ্চাত্য শিক্ষা। দেশে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে শিক্ষা স্রোত প্রবাহিত হল। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে থাকেন নি। এই সমাজেরই এক সুসন্তান বোধকরি সমগ্র জৈন সমাজের সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং হাইকোর্টের vakil। কিন্তু সঠিক কোন প্রমাণ পঞ্জী না পাওয়ায় তাঁকে অন্যতম প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও vakil এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী বলেই অভিহিত করব। পাশ্চাত্য

আধিপত্যের সাথে সাথে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা নগরী মুর্শিদাবাদের স্থানাধিকার করে নিল। মুর্শিদাবাদের দুর্দিন নেমে এল। আগেই বলেছি মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের অধিকাংশ পরিবারই ভাগীরথীর দুই তীরে জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন। জিয়াগঞ্জ এবং আজিমগঞ্জের প্রায় সব কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এ'দের একক অবদান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ'দের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনের শিক্ষার মাধ্যম বাঙ্‌লা ভাষা। তাঁরা নিজেদেরকে বাংলা দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে না করলে এমনটি কিছুতেই সম্ভব হত না। বিভিন্ন প্রবাসী সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যম তাঁদের আদি ভাষাই রয়েছে। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ'দের তিলমাত্র সঙ্কীর্ণতা পরিলক্ষিত হয়নি। জৈনধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে বিভিন্ন স্থানে আধুনিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক টোল মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করেছেন। তাছাড়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি দিয়ে এমন কি ছাত্রদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে অনেক গরীব হিন্দু-মুসলমান ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষিত হতে এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। মূলতঃ মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ বণিক সমাজ পর্যায়ভুক্ত। সে যুগে (৭০।৮০ বছর আগে) ভারতের কোন প্রান্তেই বণিক সমাজ শিক্ষার প্রতি, শিক্ষার প্রচারের প্রতি এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা বোধহয় প্রদর্শন করেন নি। তাঁদের শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতা প্রেম ও অনুরাগ স্বভাবতঃই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই এই সমাজে দেশবিদেশে সম্মানিত পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ (ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন), অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক (শান্তিস্বরূপ ভটনাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত), বিশিষ্ট আইনজ্ঞ (সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট বিচারক), শিল্পী (বিভিন্ন দেশে খ্যাতিপ্রাপ্ত) প্রভৃতি বিদ্যমান। সঙ্গীত-কলার প্রতি এ'দের অনুরাগ সুবিদিত। বাংলা দেশের সঙ্গীত মজলিসের সঙ্গে (All Bengal Music Conference) এই সমাজেরই দুই তিন জন সুসন্তান প্রত্যক্ষভাবে শুধু জড়িতই ছিলেন না বরং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টাই এই মজলিসকে ভারতের সঙ্গীত বিষারদ ও সঙ্গীত প্রেমীদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলে। বরং যদি বলি সে সময়ে এই মজলিসই সারা ভারতের এই ধরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল তা হলেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্যই এ'দের প্রভাব প্রতিপত্তির ও সমৃদ্ধির মূল ছিল। কিন্তু তথাকথিত বণিক সমাজের মত এ'রা শিক্ষা, কলা, সঙ্গীত সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। এই সব বিষয়ের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, প্রেম ও শ্রদ্ধা মুর্শিদাবাদ জৈন সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, এমন কি জাতীয় জীবনেও স্বাস্থ্যই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে বণিক সমাজ অর্থকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ মূলতঃ বণিক সমাজ হলেও স্বাস্থ্যচর্চা ও খেলাধূলার প্রতি কোন দিনই উদাসীন ছিলেন না। এ'দের মধ্যে কুস্তিগীর, জ্যুজুৎসুবিদ, স'াতারু, খেলোয়াড় প্রভৃতি সমভাবে দেখতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক Sports & Games এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। সে যুগে কলকাতায় বসবাসকারী এই সমাজের দু' একটি পরিবার খেলাধূলার আসরে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ'দের ক্রীড়ানুরাগ ও খেলোয়াড়োচিত মনোভাবে কলকাতার তদানীন্তন কর্মকর্তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ'দের বসতবাড়ীই ছিল তখনকার ক্রীড়াজগতের প্রধানদের প্রধান আড্ডাস্থল। সে যুগের বিখ্যাত 'রায়' ও 'বসু' পরিবার এ'দের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের এই পরিবারের কলকাতার ক্রীড়া জগতে প্রভাব ও প্রতিপত্তির একটিমাত্র ঘটনাই পর্যাপ্ত প্রমাণ। ১৯১১সালে আই, এফ্, এ শীল্ড জয় করে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে মোহন বাগান এ্যাথলেটিক ক্লাব এক ইতিহাস রচনা করে। এই শীল্ড বিজয়ের নানা কাহিনী আজ রূপকথায় পর্যবসিত। শীল্ড বিজয়ের পরের দিন শ্যামবাজারের ক্লাবঘরে অসংখ্য নরনারী শীল্ড দর্শন করলেন। তারপর এই শীল্ড তিন দিনের জন্য এ'দেরই বৈঠকখানায় এনে রাখা হল। এতবড় সম্মান এ'দের আন্তরিক ক্রীড়ানুরাগের শুধু স্বীকৃতিই নয়, তৎকালীন কলকাতার ক্রীড়াজগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কর্মকর্তাদের অসীম স্নেহ ভালবাসা ও প্রীতির জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর। এ'দেরই একজন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের Athelatics-এর বিভিন্ন শাখায় Record স্থাপন করেন। এই Record বহুদিন অম্লান ছিল। (আজকের মত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল না।) বিদ্যার্থী জীবনে ইনিই পরপর তিনবার তদানীন্তন School Sports Association-এর (পরবর্তীকালে এই সংস্থাই All India School Sports Association নামে পরিচিত) Champion হয়ে যে Record করেছেন তা আজও সম্ভবত: অম্লান আছে। খেলাধূলার আসরেও সে যুগে (৪০।৪৫ বছর আগে) তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল তারকা। এই সমাজেরই আর এক জন শুধু কলকাতার খেলাধূলার আসরেই খ্যাতি অর্জন করেন নি; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করে আপন ক্রীড়া কৌশলের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। Sports & Games ছাড়া Acquatics-এও এ'দেরই একজন বিশ্ববিখ্যাত প্রফুল্ল ঘোষ এবং রবীন ঘোষের সহযোগী ছিলেন। এ'দের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করার সময় তিনি একাধিক রাত্রি স'াতার কেটে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন। কলকাতার একটি বিখ্যাত Swiming Club প্রতিষ্ঠিত করতে এ'দেরই একটি পরিবারের অবদান বিশেষ

প্রশংসার দাবী রাখে। এই পরিবারেরই এক যুবক Aquatics-এ খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন আগে এ'রা এ'দের এক যুবককে Waterpolo-র বিশিষ্ট (১০ বছর ধরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন) হিসাবে এবং Roller Skating-এর Endurance Skating-এ রেকর্ড করার (Junior's Unofficial World Record) জন্য এক কিশোর ও কিশোরীকে আপ্যায়িত করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা এ্যাথলেটিকস্ চ্যাম্পিয়ানশিপ-এ এ'দের কয়েকজন যুবক যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনেকেই জানেন। আজিমগঞ্জের বিশিষ্ট একটি পরিবারের নামানুসারে প্রচলিত Foot-ball Shield Tournament শুধু বাংলার ক্রীড়া মহলেই নয় বাংলার বাইরেও যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে তা সর্বজন বিদিত। আজও কলকাতার খেলা ধূলার আসরে এ'দের বেশ কয়েকজন তরুণ ও যুবককে দেখতে পাই। এ'দের একজন ছিলেন (প্রায় ৫০।৬০ বছর আগে) সৌখীন কুস্তিগীর। Amateur হলেও তিনি এতদূর উচ্চমানের কুস্তিগীর ছিলেন যে বিশ্ববিখ্যাত গামা প্রমুখ প্রায় সব সেরা কুস্তিগীর তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়তেন। কলকাতার একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যায়ামবিদের ব্যায়াম চর্চার হাতে খড়ি এ'দেরই এক পারিবারিক আখড়ায় হয়েছিল। এ'দের মধ্যে বাইরে খাবার কড়াকড়ি ও গোঁড়ামি না থাকলে দুচারজন বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করতে এমন কি বিশ্ববিখ্যাতও হতে পারতেন। সর্বোপরি এ'দের এক যুবকের হিমালয়ে ত্রিশূলী আরোহণের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই চূড়া 'ঘাতক চূড়া' নামেও পরিচিত এবং আজ পর্যন্ত এই চূড়ায় আরোহণের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নিরামিষ ভোজী এই দুঃসাহসী যুবক সমগ্র জৈন সমাজে সর্বপ্রথম পর্বতারোহী।

সে যুগে (৫০, ৬০, ৭০ বছর আগে) ভারতের কোন প্রান্তের বণিক সমাজ, বিশেষতঃ জৈন সমাজে খেলাধূলার প্রতি এহেন অনুরাগ কল্পনাতীত।

সাধারণতঃ বণিক সম্প্রদায় সমাজ কল্যাণের কাজে বিশেষ উদাসীন থাকতেন ; বিশেষতঃ প্রাক্-মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। এ'রা সচরাচর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সম্ভবতঃ এগুলো অর্থকরী পেশা বা নেশা না হওয়ায় এই ঔদাসীন্য দেখাতেন। সে যুগে জমিদার শ্রেণীও প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের জড়াতেন না এসব কাজে। একই গ্রামে একাধিক জমিদার থাকলে তাঁদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা বরং বলতে পারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন কি কলহ প্রকটভাবে দেখা দিত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কলহের ফল স্বরূপ তাঁদের নিজ এলাকায় কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সন্দেহ নাই কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির সব কয়টি যে নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের প্রেরণা প্রণোদিত তা বলা যায় না। তবে এতেও যে জন সাধারণের কল্যাণ হয়েছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এর ঠিক বিপরীত ছবি

দেখি। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে দশ বারোটি বড় বড় জমিদার পরিবার বসবাস করতেন। নিজেদের সামাজিক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও বৃহত্তর জনসাধাণের ক্ষেত্রে এর কোন প্রতিফলন দেখিনা। আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জের দুই জমিদার ও বণিক পরিবারের সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম হয়। শুধু তাই নয় অজৈন সংখ্যাধিক্য থাকলেও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন এঁদেরই একজন। পৌর এলাকায় সাধারণ্যে মাছধরা, জীবহত্যা, মাংস বিক্রী করা নিষিদ্ধা ছল। এই নিষেধাজ্ঞা আইনের বলে হয়নি, জনসাধারণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এটা মেনে নিয়েছিলেন। আমিষভোজী জনসাধারণ কি ক্রেতা কি বিক্রেতা কেউই খোলাখুলি ভাবে জৈনদের বসবাসের এলাকা দিয়ে মাছ মাংস নিয়ে যেতেন না। এই ব্যবস্থা মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের সঙ্গে অজৈন বৃহত্তর সমাজের সম্প্রীতি, সদ্ভাব, সহযোগিতা এবং পরস্পরের ধার্মিক বিশ্বাসের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার উজ্জল স্বাক্ষর।

এই পৌর এলাকায় প্রথম হাসপাতালও এই সমাজের এক জমিদার ও বণিক পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এই সমাজভুক্ত বিভিন্ন পরিবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ডিস্পেনসারী, প্রসূতিগৃহ প্রভৃতি স্থাপন করে বৃহত্তর জন সাধারণের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন। ধর্মশালা, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ-পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়েছেন, সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করেছেন—এবং তার জন্য প্রজাসাধারণকে কোন বাড়তি খাজনা দিতে হত না—পথঘাট নির্মাণ করেছেন, জন সাধারণের কল্যাণের একক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এইসব জনহিতকর কাজে তাঁরা ব্রতী হতেন। এমন কি আজিমগঞ্জের প্রথম রেললাইন (আজিমগঞ্জ হতে নলহাটী পর্যন্ত) মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের এক বিশিষ্ট পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। এই রেল পথ আজিমগঞ্জ হতে নলহাটীর মধ্যবর্তী এলাকায় অসংখ্য নরনারীর Life Line ছিল। ধুলিয়ানের কাছাকাছি লুপ লাইনের ভাঙ্গনের পর এই রেল লাইনই এ অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ভারত ও কলকাতার একমাত্র সংযোগ পথ। তাছাড়া দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও বন্যাপীড়িত জন সাধারণের কল্যাণের জন্য এঁদের দানও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষতঃ আজকের দিনে যখন দেশের বিত্তবানেরা নিজেদের সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রচারে সবিশেষ যত্নবান তখন এ ধরণের উদাহরণ তাঁহাদিগকে নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের কাজে প্রবৃত্ত করতেও পারে।

আজ হতে প্রায় ৮০ বছর আগে আসামের কামরূপে প্রকট দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ধানের দর মণকরা ৬৷৷০-৭ টাকা হয়ে গেল (সাধারণতঃ তখন মণকরা ২-২৷৷০ টাকার বেশী দর উঠতনা)। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের একটি পরিবারের প্রচুর ধান, প্রায় ৮৫,০০০ মণ গুদামজাত ছিল। আসামের গভর্ণর এই পরিবারের কর্তাকে

সম্পূর্ণ মজুত ধান বাজার দরে সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। এই মহানুভব কামরূপের জনগণের দুর্ভাগ্যে সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল পরোপকারীর মতই নিজস্ব লাভের (প্রায় ৩,৫০,০০০ টাকা) প্রতি উদাসীন হয়ে সম্পূর্ণ মজুত ধান সরকারের হাতে দুঃখী জনসাধারণের মধ্যে সুবণ্টনের জন্য লগ্নীমূল্যে (Cost-price) ছেড়ে দিলেন। এ'দের আর এক পরিবার প্রায় ৫০।৬০ বছর আগে ময়মনসিংহ জেলার প্রকট দুর্ভিক্ষের সময় বর্মা হতে চাল আমদানী করে মণকরা ২।৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে দুর্ভিক্ষ ক্লিস্ট জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই সেদিনও ১৯৪৩ সালে এই সমাজের এক পরিবার জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ এলাকার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে মণকরা ৩।৪ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও ৫ টাকা মণ দরে চাল বিতরণ করেন। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের সময়ে এদেরই একজন একদল স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে উত্তর বিহারের ত্রাণ কার্যে গিয়েছিলেন। ইনিই ভারত বিভাগের পর শরণার্থীদের সেবার জন্য একটি শিবির খুলে ছিলেন এবং এই শিবির ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত শরণার্থীদের সেবায় উন্মুক্ত ছিল। বন্যা, ভূমিকম্প ও মহামারীতে ত্রাণ, সাহায্য ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের আরও অনেক উদাহরণ আছে। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের লোকবল বোধকরি দু'হাজারের মত আর অর্থবলও অন্যান্য সমাজের তুলনায় নগণ্য কিন্তু জনকল্যাণকর কাজে এ'রা সব সময়েই ব্রতী। আজও এই ধারা অব্যাহত আছে। তাই এ'দেরই একজন আজ তাঁর দানের জন্য সমগ্র জৈন সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কিন্তু সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে এ'রা আর্তের সেবা করে গেছেন।

বিত্তবান এবং ধনী সম্প্রদায় সচরাচর সৌখীন ও বিলাসী হয়ে থাকেন। বিলাসিতার আধিক্য ক্রমে এ'দের সুরুচি ও মানবিকতাকে গ্রাস করে বসে। ব্যভিচার এবং পানদোষ মজ্জাগত হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজে ধনী ও বিত্তবানের সংখ্যাধিক্য থাকলেও ব্যভিচারী এবং পানাসক্ত হতে দেখা যায়নি। এ'দের বিলাসিতার মধ্যে সব সময়েই একটা মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ছাপ দেখতে পাই। তাই এ'দের বিলাসিতা ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এ'দের অনেকে শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। কেউ কেউ বা কারুশিল্প, প্রাচীন হস্তাঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। কেউ কেউ আবার প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহও এ'দের মধ্যে দেখতে পাই। ডাকটিকিট ও প্রাচীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বরলিপিরও অনন্যসাধারণ সমাবেশ করেছিলেন দু-একজন। অনেকে আবার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অর্থব্যয়ের বিলাসিতা চরিতার্থ করেছেন। এই সব সংগ্রহের মধ্যে অনেক শিল্প সামগ্রী, চারুশিল্প প্রভৃতি এত উচ্চমানের যা শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশেই খ্যাতি লাভ করেছে। বিশেষতঃ প্রাচীন মুদ্রা ও মুঘল চিত্রের সংগ্রহ সমগ্র

বিশ্বে এই ধরণের ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। তাই অনেক বিদেশী এগুলি দেখতে আসেন। দু'একজন নিজেদের সংগৃহীত বহু মূল্য শিল্প সামগ্রী জাতীয় সংগ্রহশালা এবং আশুতোষ সংগ্রহশালায় দানও করেছেন। গৌড়ের পাল বংশের রাজত্বকালের ঐতিহ্যপূর্ণ ধ্বংসাবশিষ্ট কতকগুলি কষ্টিপাথর ও সিংহাসন মুর্শিদকুলি খাঁ এঁদেরই এক পরিবারকে দিয়েছিলেন। তাঁরা সেই সব পাথর দিয়ে একটি রম্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ভাগীরথীর গর্ভে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করে মহিমাপুরে এঁরা আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কষ্টি পাথরের এধরণের মন্দির বোধহয় আর কোথাও নেই। বাংলার অতীত শিল্প গৌরব ও ঐতিহ্য-বহনকারী এই মন্দিরের ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

এই সমজের কোন কোন পরিবার বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ বাগানবাড়ী বলতে আমরা যা বুঝি এই সব বাগানবাড়ী ছিল ঠিক তার বিপরীতধর্মী। তাই নাচগান হৈ-হল্লার পরিবর্তে মন্দির ও উপাসনাগৃহ দেখতে পাই এঁদের বাগান বাড়ীতে। ফলফুলের সুন্দর সমাবেশের সঙ্গে সৌখীন সাজসজ্জার বস্তু এবং শিল্পসামগ্রী সমাবিষ্ট হয়েছিল এইসব বাগানবাড়ীতে। জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে কাঠগোলার বাগানবাড়ীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নানান সৌখীন ও শিল্প সামগ্রী দিয়ে সাজান ছিল আর বাগানে প্রচুর সুস্বাদু ফল ও মনোরম ফুলের সংগ্রহ ছিল। সব দিক দিয়ে তখনকার দিনে (প্রায় ১০০ বছর আগে) সারা ভারতে এমন সুন্দর বাগানবাড়ী আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। তাই তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল এই বাগানবাড়ী দেখে শুধু বিস্ময়ান্বিতই হননি বরং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগান বলে অভিহিত করেন। এই বাগান বাড়ীতে একটি জৈন মন্দিরও আছে এবং এই বাগানের সমস্ত সম্পত্তি এই মন্দিরের নামে উৎসর্গীকৃত। আজিমগঞ্জের রোজভিলা বাগানটিও মনোরম করে সাজান ছিল। নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল এবং বিশেষ করে রকমারি গোলাপ ফুলের এক আশ্চর্য সমাবেশ ছিল এই বাগানে। এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫।৩০ বছর আগে পর্যন্ত বাংলার সুন্দরতম বাগানগুলির অন্যতম ছিল। এই সমাজেরই একটি পরিবারের বাসগৃহ সংলগ্ন বাগানটি কলকাতার বিশিষ্ট বাগানগুলির একটি। অতএব, মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজে অনেক ধনী ও বিত্তবান পরিবার থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন ধারা অনুযায়ী তাঁরা বিলাসিতায় এবং পান মত্ততায় মেতে ওঠেন নি বরং তাঁদের বিলাসিতায় সুরুচি ও সুবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। তৎকালীন জমিদারশ্রেণী স্বভাবতঃ আপন স্বার্থেই ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। কিন্তু মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজভুক্ত জমিদারদের অনেকেই স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

জড়িয়ে ছিলেন। এঁদের একজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গীয় শাখায় নেতাজী সুভাষ বসুর সহকর্মী ছিলেন। আর একজনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় গান্ধীজী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা আজিমগঞ্জে পদার্পণ করে রোজভিলা বাগানে এঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষ বসুরও পদধূলি এখানে পড়েছে। এঁদেরই এক বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে আশ্রয় দিয়ে এবং সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে অনেক বিপ্লবী পরিবারকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের হাত হতে রক্ষা করেন। প্রয়োজন মত ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে চরম দুর্দশার হাত হতেও বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর এই সব কাজের জন্য ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার এবং বাংলা ও বিহারের নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও বন্ধুত্ব দুই-ই লাভ করেন। পরে Interim Govt-এর মন্ত্রীমণ্ডলীতে না থেকেও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু তাঁকে সেই সময়ের সর্বাধিক সক্রিয় সংসদ সদস্য বলে অভিহিত করেন। বৃটিশ ভাইসরয় বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন 'Most active member of my Council'। আজ বহুমুখী পরিকল্পনা প্রত্যেক দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই সমাজ গর্বিত যে এই বহুমুখী পরিকল্পনার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন এঁদেরই একজন। ইনিই সংসদে বহুমুখী পরিকল্পনার প্রথম খসড়া 'কোশী পরিকল্পনা' আকারে ১৯৪৫-৪৬ সালে উত্থাপিত করেন। ভাগীরথী ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত ভুক্তির পিছনেও এঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম কলিকাতা পোতাশ্রয়ের স্বার্থে এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে কলিকাতার নদীপথে সংযোগ রক্ষার্থে ভাগীরথীর ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। সর্বোপরি জিয়াগঞ্জের এক মধ্য বিত্ত পরিবারের একজন স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে কারাবরণও করেছিলেন। নিজের বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে দান করেন। পরে এই স্থানই স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এই স্থানেই বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অমৃতবাণী শোনার সুযোগ পান স্থানীয় জনসাধারণ। এঁদের আর একজন জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদকের পদে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। তিনি আন্দোলনের যুগে ভারতের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ কারাগার—দুয়েরই সান্নিধ্য সমভাবে পেয়েছিলেন। এঁদেরই একজন ৮।১০ বছর ধরে রাজ্যসভার Dy. Chief Whip আছেন। এঁদের একটি বিশিষ্ট পরিবারের দান 'কুমার সিংহ হল' কলকাতায় সাংস্কৃতিক এবং বিশেষতঃ রাজনৈতিক ভাবধারায় বিশিষ্ট ভূমিকার গৌরবে গৌরবান্বিত।

গত ৪০।৫০ বছরে ভারতের প্রায় সব বিশিষ্ট নেতাই এখানে নানা উপলক্ষে সম্মিলিত হন।

মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজে বিত্তবান জমিদার পরিবারগুলির অধিকাংশের জমিদারী বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত ছিল। সাধারণভাবে জমিদার পরিবারগুলিকে আমরা স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বলেই জানতাম। কিন্তু এ'দের জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমটাই দেখতে পাই। এ'দের একটি পরিবারও অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বরং তাঁরা হিতৈষী হওয়ায় প্রজা সাধারণ এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিই পোষণ করতেন। তাই এ'দের কারও জমিদারীতে কখনও প্রজাদের অসন্তোষ দেখা দেয়নি। অন্য কোন সমাজের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এমন নজীর আছে কিনা সন্দেহ।

আর্থিক অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সমতা মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য। নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চায়েতের নির্দেশ শিরোধার্য ছিল। পঞ্চায়েতে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের সমান অধিকার এবং বহু মতের ভিত্তিতে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হত। পঞ্চায়েতের প্রধানদের সর্দার নামে অভিহিত করা হত। সময়ে সময়ে সর্দার মনোনীত হতেন। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জের পৃথক পৃথক পঞ্চায়েত ছিল। আর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ছিলেন এই দুই পঞ্চায়েতের একমাত্র সর্দার। এ সম্মান কোন ধনী বিত্তবান পান নি।

বাংলাদেশের মতই রাজস্থানের বিভিন্ন সমাজ পণপ্রথা এবং যৌতুক প্রথার অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসে বাংলাদেশে বসবাস আরম্ভ করলেও মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজ এই অভিশাপ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করে রাখতে সফল হয়েছিলেন। সামাজিক স্তরে দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এ'রা এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে এই সমাজের সর্বাধিক গরীব পরিবারও সমান মর্যাদার সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারতেন। এমন কি ধনীরাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে সাহসী হতেন না। ধনী বা বিত্তবানের মেয়ের বিয়েতেও যৌতুকের আধিক্য থাকত না। এই সব নিয়মের জন্য বৃহত্তম জৈন সমাজ এদেরকে তখন বিদ্রূপ করলেও এখন এ'দের দূরদর্শিতা এবং এই নিয়মের উপকারিতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ধনী গরীবের মর্যাদায়, আদর-যত্নে কোন তারতম্য ছিল না। বারোয়ারী সব অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ উৎসবাদিতে সকলের সমান অধিকার ছিল। এমন ঘটনারও নজীর আছে যখন সামান্য চাকুরে সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে তাঁরই বিরাট ধনী মনিবের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরেছেন এবং সেই মনিব তাঁরই সামান্য কর্মচারীর কাছে সমস্ত সমাজের সামনে করজোড়ে

ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু মনিব-গোমস্তার পারস্পরিক সম্পর্কে তিলমাত্র অাঁচড় পড়ে নি। তাঁরা প্রাত্যকে প্রত্যেকের প্রাপ্য মর্যাদা দিতেন। এঁদের অতিথি বাৎসল্য সমগ্র জৈন সমাজে সর্বজন বিদিত। কয়েকটি পরিবারত এমন নিয়ম করেছিলেন যে, যে কোন জৈন তীর্থযাত্রী, পর্যটক প্রভৃতিকে অন্ততঃ একবার তাঁদের নিজ নিজ গৃহে অতি অবশ্য ভোজন করাবেন। বিশেষতঃ একটি পরিবারের অতিথি পরায়ণতার এই প্রথা প্রায় আইনের রূপ নিয়েছিল। এঁরা একসঙ্গে হাজার তীর্থযাত্রীকে ভোজনে আপ্যায়িত করেছেন। এঁদের আতিথেয়তার কথা প্রবাদবাক্যের মত ভারতের বৃহত্তর জৈন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এই অঞ্চলে অনেকগুলি মন্দির থাকায় পশ্চিম ভারতের জৈনরা এ ভূমিকেও তীর্থভূমি জ্ঞান করতেন। তাই ভগবান মহাবীরের নির্বাণ তিথি পাবাপুরীতে উদ্‌যাপিত করে কলিকাতায় কার্তিক মহোৎসবের (পরেশনাথ মিছিল নামে সুপরিচিত) সময়ে কলিকাতা আসার পথে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এঁদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। অতিথিপরায়ণ মুর্শিদাবাদী জৈন সমাজের আতিথেয়তার দ্বার অজৈনদের প্রতিও সমভাবে উন্মুক্ত ছিল। আর একথা football tournament চলাকালীন বহিরাগত শত শত বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রীড়ামোদীরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, প্রশংসা করেছেন। সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রেও বৃহত্তর অজৈন সমাজ এঁদের বিনম্র ও মধুর ব্যবহারে বিস্মিত হন। যাঁরাই এঁদের সঙ্গে পরিচিত হন এঁদের মধুর ব্যবহারের স্মৃতি বিশেষতঃ অভ্যর্থনার বিশেষ পদ্ধতি তাঁদের মনে অম্লান থেকে যায়। অন্যূন দুহাজার লোকের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন সত্যিই বিরল।

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনন্য সাধারণ গুণ বা স্বাতন্ত্র্য বুঝে থাকি। এই গুণ বা স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতঃই আপেক্ষিক। সুতরাং সেই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েই তার বিচার করতে হবে। যুদ্ধোত্তর কালে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। এখন জীবনের এবং জীবিকার প্রতিটি সোপানে আন্তর্জাতিক না হলেও জাতীয় ভাবধারায় আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করি। তাই আজ আর কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। কারণ মানুষের মেলামেশার পরিধি আজ অনেক বেশী ব্যাপ্ত। সুতরাং যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বা স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছি তা অতি অবশ্যই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভের (২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত) পূর্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষীতে বিচার্য।

মুর্শিদাবাদ সংঘ স্মারিকা, ১৯৬৬

পাথর হতে হীরে

শ্রীপ্রদীপ চোপরা

রাত্রির ঘণ্টা বাজে
টং টং টং
তবু পলক পড়ে না
সাধনার
ধ্যান ভূমি হতে
দিন যায় রাত্রি আসে
রাত্রি গেল—দিন এল
ধ্যানে যেন অন্তর্ধ্যান
শ্রমণ।

শেষে দিনও নেই
রাত্রিও পলায়িত
কেবল জ্ঞান আর দর্শনের
সমুদ্র
সমুদ্রেও ডুব দেয়
সাধক।

ঘড়ির কাঁটা
স্থান পরিবর্তন করতে থাকে
তবু ঘুম নেই
কাল আসছে
তারই স্বপ্ন
স্বপ্নের পরশে
ছদ্মস্থ মুনি
যায়
তীর্থংকর হতে।

যোগরাজ

[গুজরাত কাহিনী]

৫৯ বছর ২ মাস ২১ দিন রাজত্ব করে বনরাজ স্বর্গে গমন করলে তাঁর পুত্র যোগরাজ গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

শীলগুণ সূরি বনরাজকে ন্যায়ের জন্য ধর্মের জন্য রাজ্য পরিচালনা করতে বলেছিলেন; সেই ন্যায়ের জন্য ধর্মের জন্য যোগরাজ একদিন প্রয়োপবেশনে চিতানলে প্রবেশ করে নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন।

যোগরাজের তখন অনেক বয়েস হয়েছে। তাঁর তিন ছেলে তারাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। রাজ্যে সবখানে শান্তি সবখানে সমৃদ্ধি। রাজ্য সীমারও বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সময় একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেমরাজ পিতাকে এসে নিবেদন করলেন, বাবা কান্যকুব্জের এক সামন্তের কয়েকখানি জাহাজ ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সোমেশ্বর পাটনে এসে লেগেছে। শুনলাম তাতে ১০,০০০ তেজী ঘোড়া, ১৮০০ হাতী ও এক কোটী টাকার পণ্য রয়েছে। এসব তারা গুজরাত রাজ্যের মধ্যে গিয়ে কান্যকুব্জে নিয়ে যাবে। এসমস্তই আমাদের হতে পারে, যদি তুমি আদেশ দাও ত···

সেকথা শুনে যোগরাজ খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না বাবা, এ অন্যায়, এ তুমি করোনা।

ক্ষেমরাজ তখনকার মত আর কিছু বললেন না। সেখান হতে চুপকরে চলে গেলেন। কিন্তু মনে মনে মনে পিতার আদেশও মেনে নিতে পারলেন না। ভাবলেন, বাবার বয়স হয়েছে, তাই বুদ্ধি ভ্রংশ। তা নইলে কি কেউ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেয়। যে ধন অনায়াসে তাঁদের হতে পারে তিনি তা কেন ছেড়ে দেবেন। তিনি তাই তাঁর ছোট ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই হাতী ঘোড়া ও ধন নিয়ে যে পথ দিয়ে তারা যাবে সেই পথের ধারে বনের অন্ধকারে লুকিয়ে রইলেন তারপর তারা নিকটে আসতে বাঘ যেমন হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কান্যকুব্জের লোকেরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলনা তাই প্রতিরোধ করতে পারলনা। তাদের অনেকেই নিহত হল কিছু বন্দী। কিছু পালিয়ে গেল। ক্ষেমরাজ সেই হাতী ঘোড়া ও ধন নিয়ে বিজয়গর্বে অণহিল্লপুরে ফিরে এলেন।

যোগরাজ সমস্তই শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না তারপর যখন ক্ষেমরাজ এসে তাঁকে প্রণাম করলেন তখনো কিছু বললেন না। তারপর যখন পারিষদেরা তাঁকে

জিজ্ঞাসা করল, ক্ষেমরাজ ভালো করেছে না মন্দ তখনো তিনি চুপ করে রইলেন। শেষে যখন তারা তাঁকে কিছু বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন বললেন, আমি এখন আর কি বলব। যদি বলি কুমার ভালো করেছে তবে অন্যায় ও চুরীর পাপ আমাকেও স্পর্শ করে। আর যদি মন্দ তবে তা তোমাদের কারু ভালো লাগবেনা। তারপর একটু থেমে বললেন। দূতমুখে যখন গুজরাত রাজ্যের নিন্দা শুনি তখন কষ্ট হয়। তারা বলে গুজরাত চোরের রাজ্য। আমার পিতা পঞ্চকুলের যে ধন লুণ্ঠন করে গুজরাত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লোকে তা এখনো ভোলে নি। কুমার ক্ষেমরাজ সেই স্মৃতিকেই আরো তাজা করে দিল কিন্তু আমি চেয়েছিলাম গুজরাত শীলগুণ সূরির কথামত ধর্মের ওপর ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তা যখন হলনা—এই বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর তাঁর অঙ্গ রক্ষককে ডেকে বললেন, যাও আয়ুধশালা হতে আমার ধনুকখানা নিয়ে এস।

সভাসদদের কারু মুখে কথা নেই। সবাই মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধনুক আসতে যোগরাজ তাদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে বীর আছে যে আমার এই ধনুকে জ্যা পরাতে পারে?

সেকথা শুনে ধনুকে জ্যা পরাতে একে একে সকলেই এগিয়ে এল। কিন্তু কেউ জ্যা পরাতে পারল না, এমনকি কুমার ক্ষেমরাজও না। তখন যোগরাজ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি তবু তোমাদের চাইতে এখনো বেশী শক্তি রাখি বলে সেই ধনুকে জ্যা পরিয়ে দিলেন।

রাজসভা চিত্রার্পিত স্থির। যোগরাজ তখন বলে উঠলেন, স্ত্রীকে এক শয্যায় শুতে না দেওয়া, চাকরের বেতন কেটে নেওয়া ও রাজার আদেশ অমান্য করা তাদের হত্যারই সামিল। ক্ষেমরাজ সেই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আমি তাকে কি সাজা দেব। সেই সাজা আমি নিজে নিজের ওপর গ্রহণ করছি বলে অনুচরদের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে বললেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হলে তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করে প্রয়োপবেশনে সেই আগুনে প্রবেশ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু তাঁর স্মৃতি গুজরাতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

যোগরাজের পর তাঁর পুত্র ক্ষেমরাজ গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তারপর তাঁর পুত্র ভূয়ড়। এই ভূয়ড় শ্রীপত্তনে ভূয়ড়েশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। ভূয়ড়ের পর বৈর সিংহ। বৈর সিংহের পর রত্নাদিত্য। রত্নাদিত্যের পর সামন্ত সিংহ। এই সামন্ত সিংহই বনরাজ যে চাপোৎকট বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার শেষ রাজা। তাঁকে নিহত করে তাঁর ভাগিনীপুত্র মূলরাজ কিভাবে সিংহাসন আরোহণ করে ছিলেন ও চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা সেও এক গল্প।

কান্যকুব্জের কল্যাণ কটক নগরে চালুক্যবংশীয় ভূয়রাজ নামে এক রাজা রাজত্ব

করতেন। তাঁর বংশে মুংজালদেবের তিন পুত্র হয় যাঁদের নাম রাজ, বিজ ও দণ্ডক।

সামন্ত সিংহ যখন গুজরাতের রাজা সেই সময় একবার এই তিন ভাই ছদ্মবেশে সোমেশ্বরের তীর্থযাত্রায় যান। তীর্থযাত্রা শেষ করে অণহিল্লপুর দেখবার জন্য তাঁরা অণহিল্লপুরে আসেন। সেদিন সামন্তসিংহ রাজবাড়ীর সামনের চকমেলানো চত্বরে ঘোড়ার নূতন নূতন চাল দেখাচ্ছিলেন ও লোকে চারদিকে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। তাই দেখে তাঁরাও সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রাজ নিজেও ঘোড়ার বিভিন্ন চাল দেখাতে পারতেন তাই যখন মগ্ন হয়ে সেই খেলা দেখছেন তখন এক ঘোড়ার এক নূতন চালের ওপর সামন্ত সিংহকে হঠাৎ কশাঘাত করতে দেখে হায় হায় করে চীৎকার করে উঠলেন। সেই চীৎকার সামন্ত সিংহের কানে যেতে সামন্ত সিংহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন ও কেন তিনি হায় হায় করে উঠলেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজ তখন বললেন, মহারাজ, সেই সময় ঘোড়া একটা বিশেষরকম চাল দেখাচ্ছিল। কোথায় আপনি তাকে সাবাস দেবেন না উল্টে কশাঘাত করলেন। তাই দেখে আমার মনে হল সেই কশাঘাত ঘোড়ার গায়ে নয় যেন আমার মর্মে এসে লাগল। আমি তাই হায় হায় করে উঠলাম।

সামন্ত সিংহ রাজের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি তখুনি সেই ঘোড়া তাঁকে দিয়ে ঘোড়ার বিভিন্ন চাল দেখাতে বললেন। রাজ তাতে সমর্থ হলে তিনি সেই ঘোড়াটিকেই যে তাঁকে দান করলেন তাই নয় তাঁর ব্যবহারে কথায়বার্তায় তিনি যে উচ্চকূলজাত তা বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে নিজের বোন লীলাবতীর বিয়ে দিলেন। সেই হতে রাজ অণহিল্লপুরে বাস করতে লাগলেন।

কালক্রমে লীলাবতীর সন্তান সম্ভাবনা হল, কিন্তু সন্তানকে জন্ম দেবার পূর্বেই গর্ভধারণের বেদনায় লীলাবতী মারা গেল। লীলাবতীর মৃত্যুতে গর্ভস্থ শিশুর যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য লীলাবতীর উদর বিদারণ করে গর্ভস্থ শিশুকে বার করা হল। সেই সময় আকাশে মূলা নক্ষত্র উদিত হয়েছিল। তাই নবজাতকের নাম রাখা হল মূলরাজ।

মূলরাজ ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি পরাক্রম। তিনি তাই সকলের প্রিয় হলেন। এমন কি সামন্ত সিংহেরও।

সামন্ত সিংহের একটু পান দোষ ছিল। পান করে তাঁর মন যখন উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যখন তাঁর বোন লীলাবতীর কথা মনে পড়ত তখন তিনি মূলরাজের দিকে চেয়ে ভাবতেন, আজ যদি লীলাবতী বেঁচে থাকত তবে তার কি আনন্দ হত। তারপর না জানি কি ভেবে তিনি মূলরাজকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে দিতেন আর বলতেন এখন হতে তুমিই আমাদের রাজা। কিন্তু নেশা যেই কেটে যেত, তিনি যেই বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসতেন তখন তিনি তাকে সিংহাসন হতে নামিয়ে দিতেন, নিজে

আবার রাজা হয়ে বসতেন। এমনি এক আধবার নয় বহুবার।

কিন্তু মূলরাজের এই রাজা রাজা খেলা আর ভাল লাগে না; ভাবেন তিনি যে এখন সামন্ত সিংহের হয়ে রাজ্য শাসন করেন তাই নয়, গুজরাতের সীমাও বিস্তারিত করেছেন। তবে কেন তিনি পাকাপাকিভাবে গুজরাতের রাজা হবেন না। তাই একদিন যখন সামন্তসিংহ তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা রাজা বলে নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর আদেশে তাঁর এক অনুচর তাঁকে হত্যা করল। মূলরাজের আর রাজ্যচ্যুত হবার ভয় রইল না। সেই থেকে গুজরাতের তিনি পাকাপাকিভাবে রাজা হয়ে বসলেন।

[ক্রমশঃ

মহাবীরের আবত্তগাম

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পত্রপত্রিকায় বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে লেখা তাঁর নানা প্রবন্ধে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের রাঢ় চারিকার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছেন। বৈশালীতে গৃহত্যাগের পরে নায়ষণ্ডবন থেকে, অস্থিকগ্রাম-বর্ধমানের জৃম্ভক গ্রামে বা জোগ্রামে কেবল-দর্শন লাভ পর্যন্ত, সার্ধ-দ্বাদশ বৎসর পর্যায়ক্রমে রাঢ়দেশে মহাবীরের পাদপূত প্রাচীন গ্রামগুলির অধুনি নামাবলী তিনি নির্দেশ করেছেন। ডঃ মণ্ডলের ইঙ্গিতজ্ঞাপক গ্রামসমূহে তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহুবার আমি তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছি এবং দেখতে পেয়েছি তাঁর অনুমান প্রায়শঃই অমূলক নয়।

'মহাবীরের রাঢ় চারিকায় বর্ধমান' প্রবন্ধে ডঃ মণ্ডল পঞ্চম বৎসরের পঞ্চম সংখ্যায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কুনুর নদীর তীরে অবস্থিত আবত্তগাম (আত্তগ্রাম) টিকে মহাবীরের পাদপূত গ্রাম স্বরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই গ্রামের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে এই গ্রামে উপস্থিত হই; এবং ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৃতাত্বিক দিক্ দিয়ে বিশ্লেষণ মূলক অনুসন্ধান চালাই।

মহাবীরের আগমনের পূর্বে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অস্থিকগ্রাম 'বর্ধমান' নগরের আন্দাজ চব্বিশ/পঁচিশ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আত্তগ্রামের জে. এল. নং ৪৮, মৌজা আত্তগ্রাম, থানা মঙ্গলকোট। গ্রামের প্রবীণ লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে জানতে পারি, পূর্বে নাকি এই গ্রামের নাম ছিল 'আবত্তগ্রাম'। বহু পূর্বের এই ধরণের নামবিশিষ্ট কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ তাঁদের ঘরে ছিল; কিন্তু কুনুর ও বৃদ্ধনদীর প্লাবনের ফলে এই সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। ডঃ মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে ১২৮২ সালে এই বুনিয়াদি গ্রামটির অধিবাসী শ্রীরাধিকা প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের একটি বিশেষ পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটি তুলে ধরছি।

আত্তগ্রাম
২২।১২৮২ শাল

শ্রীচরণ কমলেষু—

অশঙ্খ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়এর শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাশের প্রণগতীক মঙ্গল বিশেষঃ নিবেদন আমাদের বাটীতে কএকজন শ্রীশ্রীঅষ্টমীর ব্রেতর অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহাদের মানষ জে ব্রেতকথা ও ভোগআদী দিতে হইবেক তাহা আপুনী আশীয়া দেন একারণ নিবেদন কৃপা করিয়া মমালএ ষুভাগমনে আজ্ঞা হইবেক এবং আশীবার সময় দিক্ষা করিবার গ্রেন্থ ষুর্দ্ধা আনিতে আজ্ঞা হইবেক শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—শেবক শ্রীরাধিকা প্রসাদ শীংহ।

[চি. প. স. চি. [২য় খণ্ড] পৃঃ ১২৯]

বর্তমানে এই গ্রামে গোস্বামী, সদ্‌গোপ, পল্লবগোপ, কোটাল, কৈবর্ত, কর্মকার ও কুম্ভকারদের বসবাস রয়েছে। পদ্ধান-উপাধিক কোটালদের পূজিত দেবতা হলেন 'নবগ্রহ'। পৌষ মাসে মকর-সংক্রান্তির দিন দেবতার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বন্দ্যঘটি গাঁই-বিশিষ্ট গোস্বামী পদবীধারী ব্যক্তিদের উপাস্যদেবতা হলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গৌরাঙ্গ ও গদাধর। এই পাঁচজন বৈষ্ণব চূড়ামণি গ্রামীণ অধিবাসীদের নিকট 'পঞ্চমহাপ্রভু' নামে খ্যাত। পাঁচজন মহাপ্রভুর বিশেষ অঙ্কিত প্রতিকৃতিতে নিত্যসেবা হয়ে থাকে। প্রবাদ, সাড়ে তিনশ বছর পূর্বে এই প্রতিকৃতিগুলি জয়পুর থেকে আনানো হয়েছিল। 'বলদেব' হলেন এঁদের বংশানুক্রমিক কুলদেবতা। বর্তমানে দেবতা গোস্বামীগণের অংশীদার কৈচড় ষ্টেশনের অনতি দূরে কানাই ডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করার ফলে, তাঁর আবাসে রয়েছেন। ৩'' × ১০'' নিমকাঠের নির্মিত দেবতাই হলেন বলদেব। কবে যে এই দেবতার মূর্তি নির্মিত হয়েছিল তা এঁরা বলতে পারেন না।

'বলদেব' হলেন আসলে জৈন দেবতা। ইনি হলেন মহাবীরেরও পূর্বেকার একজন অর্হৎ।[১] শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে একথা বলেছেন ডাঃ জগদীশচন্দ্র জৈন মহাশয়।

১ 'বলদেব' কোন জৈন দেবতা বা অর্হৎ নন্। মহাবীর সাধারণতঃ চৈত্য বা যক্ষায়তনে অবস্থান করতেন। বলদেব মন্দিরের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা পরবর্তী কালের। বলদেব তাই মনে হয় হিন্দু বা লৌকিক দেবতা। জৈন সাহিত্যে যে বলদেবের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা শলাকা পুরুষ মাত্র। জৈন শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক উৎসর্পিনী ও অবসর্পিনীতে যেমন ২৪ জন তীর্থংকর উৎপন্ন হন, সেই রকম ১২ জন চক্রবর্তী, ৯ জন বাসুদেব, ৯ জন বলদেব ও ৯ জন প্রতি বাসুদেব উৎপন্ন হন। জৈন সাহিত্যে এঁদের শলাকাপুরুষ বলা হয়। ভরত ক্ষেত্রকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যিনি ভুজবলে ৬ খণ্ডের ওপর নিজের অধিকার স্থাপন করেন তিনি চক্রবর্তী। বাসুদেব ভরত ক্ষেত্রের ৩টী ভাগের ওপর আধিপত্য করেন। প্রতিবাসুদেব প্রথমতঃ এই ৩ ভাগের ওপর আধিপত্য করতে সমর্থ হন কিন্তু পরে বাসুদেব উৎপন্ন হয়ে তাঁকে নিহত করে

"These countries were called Aryan becauae, it is said that the Titthayars, the Ckkavattis, the Baladevas and the Vasudevas were born here. These greatmen are said to have attained omniscience in these countries and by attending to their preaching a number of people were enlightened and taken to ascetic life" [J. C. J., pp., 250-51]। এই বলদেব ঠাকুরের মন্দির রয়েছে গ্রামের মধ্যস্থলে। সামনে বিরাট বকুলগাছ।

গ্রামের গ্রাম-দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর ও মনসা। সিদ্ধান্ত উপাধিক ব্রাহ্মণেরা হলেন

৩ খণ্ডের অধিপতি হন। চক্রবর্তীর যেমন চক্র থাকে তেমনি প্রতিবাসুদেব ও বাসুদেবেরও চক্র থাকে। প্রতিবাসুদেব বাসুদেবকে নিহত করবার জন্য চক্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু সেই চক্র বাসুদেবকে নিহত করতে সমর্থ হয় না। বরং সেই চক্র ধরে নিয়ে সেই চক্র দিয়ে বাসুদেব প্রতিবাসুদেবকে নিহত করেন। বাসুদেবের চক্রের নাম সুদর্শন ও শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। বলদেব বাসুদেবের বড় ভাই। বলদেব ও বাসুদেবের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতি থাকে। প্রত্যেক বলদেবই সেই জীবনে মুক্তি প্রাপ্ত হন কিন্তু কোনো ধর্ম প্রচার করেন না। বাসুদেব যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্রূর কর্মের জন্য নরকগামী হন। বর্তমান অবসর্পিনীর ২৪ জন তীর্থংকরের নাম সকলেরই জানা আছে। তাই কেবল চক্রবর্তী, বাসুদেব, বলদেব ও প্রতিবাসুদেবের নাম নীচে দেওয়া হল:

	চক্রবর্তী		বাসুদেব		বলদেব		প্রতিবাসুদেব
১	ভরত	১	ত্রিপৃষ্ঠ		অচল		অশ্বগ্রীব
২	সগর	২	দ্বিপৃষ্ঠ		বিজয়		তারক
৩	মঘব	৩			ভদ্র		মেরক
৪	সনৎকুমার		পুরুষোত্তম		স্বপ্রভ	৪	মধু
৫	শান্তিনাথ	৫	পুরুষসিংহ		সুদর্শন	৫	নিশুম্ভ
৬	কুন্থুনাথ	৬	পুণ্ডরীক	৬	আনন্দ	৬	বলি
৭	অরনাথ	৭	দত্ত	৭	নন্দন	৭	প্রহ্লাদ
৮		৮	লক্ষ্মণ	৮	রাম		দশগ্রীব বা রাবণ
৯	মহাপদ্ম	৯			বলভদ্র		জরাসন্ধ
১০	হরিষেণ						
১১	জয়						
১২	ব্রহ্মদত্ত						

উপরোক্ত তালিকার ৫, ৬ ও ৭ চক্রবর্তী রাজ্য ভোগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ও ১৬, ১৭ ও ১৮ সংখ্যক তীর্থংকর হন। এই ৬৩ জন শলাকা পুরুষের জীবন চরিত্র হেমচন্দ্রাচার্যের 'ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষ চরিত্রে' বর্ণিত আছে।—সম্পাদক

'খেলারায়' ধর্মঠাকুরের সেবাইত। ৭''×৩'' পাথরের নির্মিত কূর্মের উপরে শঙ্খ ও পদচিহ্নই হ'ল ধর্মঠাকুরের আসল মূর্তি। মহাজ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন দেবতার বার্ষিক গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঠাকুরের অনতিদূরে রয়েছেন 'পঞ্চানন ক্ষ্যাপা'। ৫''×২'' পাথরের নির্মিত নগ্ন জিন মহাবীরের মূর্তিই দেবতা পঞ্চানন ক্ষ্যাপার প্রতিমূর্তি। ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজানুষ্ঠানে ইনি পুষ্পমাল্য পেয়ে থাকেন। এর কারণ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের কাছে জানা যায়, ইনি হচ্ছেন ধর্মঠাকুরের বাহন 'উলূকমুনি'। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে নগ্ন মহাবীর উলূক মুনির বিশেষ সম্পর্ক সাধন সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের জের বলেই মনে হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'বারমতি', 'বারভক্ত্যা' ইত্যাদি বিষয়ে বারো শব্দায় মহাবীরের ছদ্মস্থ জীবনের দ্বাদশ বৎসর রাঢ়চারিকার বিশেষ প্রতিফলন বলে মনে করি। মহাবীর বারো বৎসরের বেশি সময় লাঢ়দেশের বজ্জ ও সুহ্ম ভূমিতে চারিকা করেছিলেন। হিন্দু দেবদেবীদের সমাজে 'ভৈরব', 'পঞ্চানন ক্ষ্যাপা', 'উলূকমুনি' নামে এই সকল দেবতার অবস্থান ও তার ঐতিহ্যের জের বহু পুরাতন। হিন্দু-দেবদেবীর পার্শ্বস্থিত সহচর দেবতা নগ্ন জিন মহাবীরের অবস্থানের পরম্পরা সুনিশ্চিতভাবে জৈন-ধর্ম থেকে আগত।

কূর্ম ও শঙ্খ-প্রতীকজাত ধর্মঠাকুরের বিশেষ মূর্তিটি বিশেষভাবে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলকাব্যে 'শঙ্খাসুর' নামে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাই। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের পল্লীশ্রী-সংগ্রহে নকুণ্ডার পুঁথিতে কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীকজাত শিলাখণ্ডকে 'শঙ্খাসুর' নামে চিহ্নিত করার নির্দেশ পাওয় যায়। অথচ গ্রামবাসীরা বংশ পরম্পরায় কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীকজাত ধর্মঠাকুরকে 'শঙ্খাসুর' নামে আখ্যায়িত না করে 'খেলারায়' নামে অভিহিত করায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীধর্মপুরাণে খেলারায়ের আকৃতিটি এই ধরণের—

"খেলারায় ধর্ম হয় কূর্মের আকার।
পৃষ্ঠে চক্র গদাপদ্ম আছয়ে তাহার ॥
অষ্টদল পদ্মোপর যার কলেবর।
দক্ষিণেতে ধনুর্ব্বাণ দেখিবে সুন্দর ॥"

গ্রামবাসীদের ধারণা, দেবতা নাকি সরাসরি এই মূর্তিতে গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্মঠাকুরের কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীক দুটি জৈন তীর্থংকরদের প্রতীকের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। জৈনকল্প সূত্র গ্রন্থে চব্বিশজন তীর্থংকরের চব্বিশার্থ প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে কূর্ম ও শঙ্খ প্রতীক দুটি যথাক্রমে মুনিসুব্রত ও নেমিনাথের। মুনিসুব্রত হলেন কুশাগ্রপুরী বা রাজগৃহের রাজা সুমিত্র ও রানী পদ্মাবতীর পুত্র। চম্পক বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ, চিহ্ন কচ্ছপ। নেমিনাথ হলেন সূর্যপুর বা সৌরিপুরের হরিবংশোদ্ভূত রাজা সমুদ্রবিজয় ও রাজ্ঞী শিবার পুত্র, মেষশৃঙ্গামূলে সিদ্ধি, চিহ্ন শঙ্খ।

প্রতীকজাত এই ধর্মঠাকুরের পাশে নগ্ন মহাবীরকে ধর্মঠাকুরের বাহন উলূক মুনি স্বরূপে বংশ পরম্পরায় চিহ্নিত করে আসা, মহাবীরের পূর্বেকার দুজন 'অর্হৎ'-এর বিশেষ স্মৃতিছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি বিশেষ মাঠের নাম 'জিনকের মাঠ'। সরকারী রেকর্ডে এই নামের উল্লেখ আছে। এই মাঠের নামটি বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'কের' বিভক্তি যোগে কারক গঠিত হতে আমরা দেখতে পাই। 'কের' এবং 'র' বিভক্তি আসলে প্রাচীন বাঙ্গালায় ষষ্ঠীর বিশেষ প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'নারীর যৌবন কাহ্ন নদীকের পাণী।' নারীর যৌবনকে নদীর জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সূত্রে 'জিনকের মাঠ' নামে 'কের' শব্দটি ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'জিন' শব্দটিকে বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করতে চেয়েছে। আমার ধারণা 'জিন' শব্দটি কোনো জৈন শ্রমণের সঙ্গে জড়িত। এই গ্রামের প্রবীণ ভদ্রলোক শ্রীহরিমোহন সিদ্ধান্ত মহাশয় আমাকে দেখিয়ে দিলেন বর্তমানের 'জিনকের' মাঠটি। সিদ্ধান্ত মহাশয় বললেন এক সময় এখানে বিরাট ডাঙ্গা ছিল। ডাঙ্গার আয়তন ছিল আনুমানিক কুড়ি পঁচিশ বিঘার মত। ডাঙ্গা কাটিয়ে স্থানটিকে বর্তমানে জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ডাঙ্গা কাটবার সময় প্রচুর পরিমাণে বিরাটকায় ইট ও অন্যান্য ভগ্নমাটির তৈজসপত্র পাওয়া যায়। বহুপূর্বে শোনা যায় নাকি এখানে যুগী তাঁতিদের বসবাস ছিল।

'অর্ধপুকুরের ডাঙ্গা' নামে আর একটি ডাঙ্গা দেখা যায়। বারো বিঘা আন্দাজ স্থানের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন মাটির তৈজস-পত্র দেখে সহজে অনুমান করা যায়, মূল গ্রামটি একদা হয়তো এইখানেই অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে কুনুর ও বৃদ্ধনদীর প্লাবনের ফলে গ্রামটি মূলডাঙ্গা থেকে দক্ষিণদিকে সরে এসেছে। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা, দুটি-নদী গ্রামটিকে উত্তরে এবং দক্ষিণে আবেষ্টন করে থাকার জন্যে এই 'আবত্ত' গ্রাম নাম হয়েছে এবং পরবর্তীকালে অপভ্রংশে লোকমুখে 'আত্তগ্রামে' পর্যবসিত হয়েছে। গ্রামে যোগাযোগের অদ্যাবধি কোনো ব্যবস্থা নাই।

আসানসোল মহকুমার কাঁকসা থানার অরণ্যভূমি কুনুরের উৎসস্থল। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান আত্তগ্রামকে পাশে রেখে উজানি বা প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরে অজয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ডক্টর মণ্ডল বলেন, 'কনওয়ার' শব্দটি হ'ল কুনুরের আসল নাম। নামটি ইন্দো-মোঙ্গল শব্দ ভাণ্ডার থেকে এসেছে। অপর দিকে বৃদ্ধনদী বর্তমান ওড়গ্রামের সন্নিকটে ডাঙ্গা থেকে বের হয়ে মাহাতা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, গ্রামের পূর্বদিকে ডোরলের কাছে কুনুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তবে, এই পুরাতন প্রবাহিণীটিকে তার মরা সোঁতা দেখে আজ সবাই চিনতে পারবেন না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দে যুগন্ধর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই

'বুড়া' নদীটিকে ভালভাবেই চিনতেন। তখনও এর প্রবল প্রতাপ ছিল।

ষষ্ঠ খৃষ্টপূর্বাব্দে শ্রমণ ভগবান মহাবীর এই গ্রামে আগমন করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আমি কোনোরূপ মন্তব্য করতে ইচ্ছা করি না। তবে তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাঢ়দেশ আর্যদেশ ছিল। রাজধানী ছিল কোডিবরিস। ডঃ মণ্ডল বলেছেন, অংগ, বংগ, পাণ্ড্য বা লাঢ়, লাড় বা রাঢ় সম্ভবতঃ ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্ভুক্ত। এবং সারা দেশটি ছিল জৈন সম্প্রদায়ের এলাকা। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছেন, অংগের সীমানা হ'ল,

"In the South-east of Bhagalpur district, there is a place on the border of Bihar and West Bengal, called Teliagarhi, which was very important from the srategical point of view. In former days, armies would march from west to east through this pass of the Rajmahal hills" [*H. B.*, Vol. II, pp. 5-6]। ডক্টর মণ্ডলের মতে, অংগের শেষ সীমানা ছিল দামোদর নদ বরাবর চম্পাইনগরী পর্যন্ত। টলেমির ভূগোলে উড়ুম্বর (নাগবংশীর) জাতির 'তেলিয়াগড়ি' অধিকার করার কথা পাই। 'উড়ুম্বর পরিবেশে ওড় গ্রামে দেবী উড়ুম্বরী' প্রবন্ধে তেলেঝি ও উড়ুম্বর জাতির তেলিয়াগড়ি অধিকারের প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করেছি। এই জাতির আধিপত্য বিস্তারের পরে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে রাঢ়দেশের বজ্জ ও সূহ্ম ভূমিতে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের আগমন হয়।

আত্তগ্রামে ধর্মঠাকুরের ভূত ডাঙ্গাতে বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষে, পরিত্যক্ত বলদেব মন্দিরে সাময়িক অবস্থান, নগ্ন মহাবীরের সঙ্গে পঞ্চানন ঠাকুরের এবং উলুক মুনির পরিচিতি, কোনো জিন সম্পর্কিত জিনকের ডাঙ্গা ও ধর্মঠাকুরের ইঙ্গিতজ্ঞাপক মূর্তি যে কোনো ছদ্মস্থ শ্রমণের বিশেষ ইতিহাসের স্মৃতি চারণা করছে, এ কথা অনস্বীকার্য।

ডাঃ জগদীশচন্দ্র জৈন মহাশয় তাঁর ভৌগোলিক অভিধানে বলেছেন—

"Avāttagama—a village. Mahavira is stated to have journeyed to this place from Nangala and proceeded to Coraya Sannivesa from here. Its exact situation is not known."

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারছি আবত্তগ্রাম (আত্তগ্রাম) টি বর্তমানে বীরভূম জেলার, মোরনদীর তীরে অবস্থিত নান্দুলিয়া (নঙ্গল) এবং বর্ধমান জেলার, অজয় ও কুনুরনদীর উপত্যকায় অবস্থিত ছোরা [চোরাগ-সন্নিবেশ] গ্রাম দুটির মধ্যস্থলে নব্বই ডিগ্রি সমকোণে অবস্থিত।

অভয়রুচি

[একাঙ্কিকা]

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান ঃ শ্মশান। জিনপালিত ক্লান্ত হয়ে এক গাছের ছায়ায় এসে বসছে। জিনদাস সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে]

জিনপালিত ঃ [হাঁপাতে হাঁপাতে] ঃ আমিত আর এক পাও হাঁটতে পারব না। এইখানেই বসে পড়লাম।

জিনদাস ঃ সে কি ?

জিনপালিত ঃ এই মোটা শরীর নিয়ে আর কত হাঁটব। সকাল হতে ঘোড়ার মত দৌড়োচ্ছি। বোধ হয় দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি।

জিনদাস ঃ না না। দু' তিন ক্রোশমাত্র। গ্রামের লোক বলছিল ···

জিনপালিত ঃ ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা ওই রকমই বলে। বলে দশ পা গেলেই পেয়ে যাবে, পাওয়া যায়না হাজার পা হেঁটে এলেও। যখনি জিজ্ঞেস করো—বলবে মাত্র দশ পা।

জিনদাস ঃ তা যদি না বলত তবে কি তুমি এতদূর হেঁটে আসতে পারতে ? সেইখানেই বসে পড়তে।

জিনপালিত ঃ বসে পড়তাম তো বসে পড়তাম। তাতে কার কি ক্ষতি হত ? আমি কি জানি যে আচার্য সুদত্ত আজকে···সাধুদের শরীরে ত মেদ থাকে না—তাদের শরীর রুক্ষ, শুকনো, পাতলা। তাছাড়া হেঁটে হেঁটে তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ?

জিনদাস ঃ হাঁটবার অভ্যেস করলে তুমিও জোরে হাঁটতে পারবে।

জনপালিত ঃ ইহ জীবনে নয়। এমনিতে হয়নি এই শরীর। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হয়েছে। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পারছ আচার্য সুদত্তের মতলব ?

জিনদাস ঃ কোন মতলব ?

জিনপালিত ঃ এই দৌড়োদৌড়ীর ? পাশেইত রাজপুর নগর রয়েছে যার রাজা প্রভূত প্রতাপশালী মারিদত্ত। তবে কেন সেখানে না গিয়ে এই বন বাদাড়ে ঘুরে মরা ?

জিনদাস ঃ তুমি ত বললে রাজপুরে গেলেই হত কিন্তু কি হচ্ছে সেখানে জান ?

জিনপালিত ঃ কেন, কি হচ্ছে সেখানে ?

জিনদাস ঃ বলব ? সেখানকার রাজা মারিদত্ত—

জিনপালিত ঃ কি সাধুসন্তদের নগর প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছেন ?

জিনদাস ঃ না, তা নয়। তুমি ত জান উনি কৌল।

জিনপালিত ঃ তা জানি।

জিনদাস ঃ তিনি মহাকৌল বীর ভৈরবের আগ্রহে এক পশুমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন।

জিনপালিত ঃ কি বললে—যজ্ঞ?

জিনদাস ঃ না যজ্ঞ ঠিক নয়, পশুদের রক্তে দেবীর পূজা। চণ্ডমারীর সামনে ব্যাঙ্ হতে মানুষ পর্যন্ত জোড়ায় জোড়ায় এক লক্ষ জীবের বলি হবে। রাজার আদেশে তাঁর অনুচরেরা তাই সবখান হতে জীব জানোয়ার ধরে আনছে। তাদের করুণ চিৎকারে রাজপুরের আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে। হাতী ঘোড়া, হরিণ, মোষ, ছাগল, খরগোস একত্রিত করা হয়েছে। রাজকর্মচারীরা এখন সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত এক জোড়া কুমার কুমারীর অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

জিনপালিত ঃ কি বলছ তুমি?

জিনদাস ঃ ঠিকই বলছি। তাইত আচার্য সুদত্ত রাজপুরে গেলেন না।

জিনপালিত ঃ কত নৃশংস ও অধর্মী এই রাজা।

জিনদাস ঃ নৃশংস ও অধর্মী? আর কৌলরা কি বলে জান—পরম ভক্ত। প্রতিদিন এক শ' এক মোষ ও এক শ' এক ছাগলের বলি হয়। মন্দিরের সামনে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। সেই নদীতে ক্রীড়া করে আনন্দোন্মত্ত হয়ে ভূত ও পিশাচ। এখন তুমিই বল সেই নগরে আচার্য সুদত্ত কি করে যেতেন?

জিনপালিত ঃ তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু শ্রীবন উদ্যানে কেন থাকলেন না?

জিনদাস ঃ কি করে থাকবেন? চোখ বন্ধ করে হ'াটছিলে বুঝি? শ্রীবন কামীদের বিহার ভূমি। এক লতামণ্ডপের আড়ালে আমিই স্বচক্ষে দেখলাম…থাক ওসব কথা। ও জায়গা সংযমীদের উপযুক্ত নয়। তাই বাধ্য হয়েই আচার্য সুদত্তকে এগিয়ে যাবার আদেশ দিতে হল।

জিনপালিত ঃ তবে এই শ্মশানে কেন থাকলেন না?

জিনদাস ঃ তুমিও পাগলের মত কথা বলছ? দেখছ না কত বিভৎস ও ভয়ানক এই জায়গা। চারদিকে নরকপাল ও হাড় ছড়িয়ে রয়েছে, মরা পচছে, শিয়াল-কুকুর চিৎকার করছে। কি করে এখানে থাকতেন আচার্য?—তাই ও'কে এগিয়ে যেতে হল।

জিনপালিত ঃ কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ তুমি? আচার্য রাজপুরে প্রবেশ না করলেও, রাজপুর ছেড়ে এগিয়েও ত যাচ্ছেন না।

জিনদাস ঃ তুমি ঠিকই বলছ।

জিনপালিত : এর কারণ কি তুমি জান ?

জিনদাস : না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে তিনি রাজপুরে প্রবেশ করছেন না।
[জিনরক্ষিতের প্রবেশ]

জিনরক্ষিত : আরে, এখানে বসে তোমরা গল্প করছ আর ওদিকে আচার্য তোমাদের ডাকছেন।

জিনপালিত : ওদিকে কোথায় ?

জিনরক্ষিত : ওই যেদিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরি নীচে। আজ আমরা ওখানেই থাকব।

জিনদাস : তা হলে জিনপালিত, ওঠ।

জিনপালিত : কি করে উঠব, পা আর আমার বশ নয়। খিদেও পেয়েছে তেমনি।

জিনরক্ষিত : এখনো পুরো সকালই হয় নি আর তুমি খিদেয় মরছ। অভয়মতি ও অভয়রুচির দিকে চেয়ে দেখত। বাল-তপস্বী আর আটদিনের উপবাস। তবুও আচার্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। এখন-এখুনি আচার্যের আজ্ঞা নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভিক্ষাচর্যায় গেছেন।

জিনপালিত : ওদের সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়। কোথায় মুমুক্ষু প্রাণী আর কোথায় সংসারী এই জিনপালিত ! [উঠবার প্রয়াস করছে, পা কাঁপছে] জিনদাস, একটু ধরত আমায়।

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজপুরের উপকণ্ঠ। রাজপথ। অভয়মতি ও অভয়রুচি]

অভয়রুচি : এ কোথায় এসে গেছি আমরা ! গোপ পল্লীতে ভিক্ষে না পাওয়ায় একটু এগিয়ে এলাম। কিন্তু এত দেখছি নগরপ্রান্ত। অনেক মানুষ একত্রিত দেখছি। তবে কি এ কুখ্যাত রাজপুর নগরের উপান্ত ?

[দু'জন প্রহরীর প্রবেশ]

১ম প্রহরী : দাঁড়াও।

অভয়রুচি : কে তোমরা ?

১ম প্রহরী : দেখছ না, রাজপুরুষ।

অভয়রুচি : রাজপুরুষ ? আমাদের সঙ্গে তোমাদের কি প্রয়োজন ?

১ম প্রহরী : প্রয়োজন ? তোমাদের সঙ্গে কি প্রয়োজন ? এ রাজাজ্ঞা। তোমাদের দু'জনকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে। [২য় প্রহরীকে] এদের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দে।

অভয়রুচি : না, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কেউই পালাব না।

১ম প্রহরী : তার বিশ্বাস কি ?

[হাতকড়ি পরাচ্ছে]

অভয়রুচি : আমরা চোর ডাকাত নই যে পালিয়ে যাব, না গুপ্তচর। কিন্তু আমরা কি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন এই রাজ্যাদেশ ?

১ম প্রহরী : বলবার কথা নয়, তবু বলছি। দেবী চণ্ডমারীর পূজোর জন্য এক জোড়া মানুষ চাই। তারি সন্ধানে ছিলাম আমরা—আর তোমরা আমাদের সম্মুখে এসে গেলে। তোমাদের সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত মনে হচ্ছে।

অভয়রুচি : তবে তোমরা আমাদের বলি দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছ ?

১ম প্রহরী : ঠিক তাই।

অভয়মতি : ভাই, তবে আমাদের কী হবে ? [কাঁদছে]

অভয়রুচি : বোন, তুমি সাধ্বী হয়ে কাঁদছ ? তপস্বীদের ত সব রকম বিপদ আপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ভগবান মহাবীরকে ত না জানি কত উপসর্গ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এও ভালো হল যে এখনো আমরা পারণ করিনি। আজ আট দিনের উপোশ—এই অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় ত নিশ্চয়ই সদগতি লাভ করব।

অভয়মতি : কিন্তু ভাই, মৃত্যুর কথা শুনে খুব ভয় করছে।

অভয়রুচি : পাগল ! মৃত্যুকে কী ভয় ? মৃত্যু ত এমনি হঠাৎই আসে। তার জন্য ত সর্বদা তৈরী থাকতে হয়। সে রকম মানুষ খুব কমই দেখা যায় যাঁরা মৃত্যুর কথা আগে জানতে পারেন। কিন্তু দুঃখ ত এই যে একথা গুরুদেবকে জানাতে পারলাম না। উনি খুব কষ্ট পাবেন যখন এসব শুনবেন। কিন্তু…ও'র কিসের কষ্ট ? ও'র না আছে রাগ না বিরাগ। উনি ত সর্বজ্ঞ। উনি কি আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা বলেন নি ? উনি ত এ সব দেখতেই পাচ্ছেন।

অভয়মতি : তুমি ঠিক বলছ ভাই। গুরুদেবের মত জ্ঞানী নেই। তিনি অবশ্যই এসব দেখতে পাচ্ছেন। হয়ত এ ঘটবে তিনি জানতেন, তবে কেন আমাদের আটকে রাখলেন না ?

অভয়রুচি : বোন, ভবিতব্যকে কে আটকাতে পারে ? এতে গুরুদেবের কি দোষ। একে ত নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে কর যে এভাবে এই দেহ ছাড়বার সুঅবসর আমরা প্রাপ্ত হলাম।

১ম প্রহরী : এখন একটু তাড়াতাড়ি চল। [নিয়ে যাচ্ছে]

অভয়মতি : ভাই, এরা কি পাপী যে আমাদের হাতে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ত এমনি যাচ্ছিলাম।

অভয়রুচি : বোন, নিরপরাধকে যে কষ্ট দেয় তার ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে সাধু হয়ে রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করেছে তার ক্রোধ হওয়া উচিত নয়। না তার উচিত কটু শব্দ বলা। শ্রেয়ঃত এই যে এই মহান কষ্টকে আমরা সহ্য করি ও এদের ক্ষমা করি।

অভয়মতি : ভাই, তোমার উপদেশ আমায় শান্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার মন বড় দুর্বল। আর দুর্বলতা আমায় পরিত্যাগ করছে না।

অভয়রুচি : বোন, না তুমি আমার, না আমি তোমার। মৃত্যুপথ যাত্রীর রাস্তা পৃথক পৃথক। তাই তুমি অর্হৎদের স্মরণ কর, গুরুদেবের শরণ গ্রহণ কর। সেই শ্রেয়।

১ম প্রহরী : কথা না বলে এখন তাড়াতাড়ি একটু হাঁটত।

[প্রহরীরা তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে যাচ্ছে সামনে হতে কয়েকজন নাগরিক আসছে]

১ম নাগরিক : কোথায় নিয়ে যাচ্ছ এই সাধু সাধ্বিদের? হাতে কেন হাতকড়ি দিয়েছ?

১ম প্রহরী : দেবী চণ্ডমারীর মন্দিরে যেখানে ওদের বলি হবে।

১ম নাগরিক : বলি? মানুষের বলি? অন্য দিন ওখানে পশুদের হত্যা করা হয়, আজ মানুষের?

৩য় নাগরিক : এতো ঘোর অন্যায়।

১ম প্রহরী : ঘোর অন্যায় ত রাজার কাছে যাও। পথ ছাড়। [প্রহরী ওদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে]

২য় নাগরিক : যদি এই নিরপরাধ সাধুদের হত্যা করা হয় ত না জানি কোন বিপত্তি এসে পড়বে। আরে এ কি হচ্ছে?

৩য় নাগরিক : ভূমিকম্প।

২য় নাগরিক : চলো আমরা রাজার কাছে যাই।

১ম নাগরিক : কোন লাভ নেই সেখানে গিয়ে।

২য় নাগরিক : তবে কোথায় যাওয়া যায়?

১ম নাগরিক : আমরা যদি সবাই মিলে মহাদেবীর কাছে যাই।

২য় নাগরিক : তবে চল, শীঘ্র চল। [সকলে চলে যাচ্ছে]

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০ ।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. VI No. 2 Sraman June 1978
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

পুরুলিয়া অবস্থিত পাকবিড়্রার জৈন ধ্বংসাবশেষে পাওয়া চামরধারিণী সুরসুন্দরী।
সবুজাভ ক্লোরাইট পাথর। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী।

তীর্থঙ্কর। সবুজাভ ক্লোরাইট পাথর। আনুমানিক
খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী। দেউলভিড়্যা, বাঁকুড়া জেলা।

পাষাণের ফুল

শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রাচীন ভারত প্রতিটি শতাব্দীর অনুক্রমেই যে সংস্কৃতি ও শিল্পের লীলাভূমি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এক একটি পর্বে এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে সভ্যতা যে শীল ও অনুভূতিতে এক বৃহত্তর জনসমাজকে আকর্ষণ করেছে তা সর্বজন বিদিত। এই ইতিবৃত্ত মানসিকতা, রুচি, উপলব্ধি ও পরাক্রমের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এই ভাবেই অতিবাহিত শতাব্দীগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে নবীন প্রতিভা ও মননশীলতা

যা গোচরীভূত হবে শিল্পে, সাহিত্যে ও ধর্মানুরাগে। এক একটি পর্বে এই ভাবেই রচিত হয়েছে জাতীয় সংহতি কিংবা ব্যাপ্তির পরম্পরাগত ইতিহাস। গান্ধার কিংবা মথুরা, ভারহুত কিংবা অমরাবতী, শিল্প ও সৌন্দর্য ভাবনা তার আপন উৎকর্ষ ও রম্যতায় উপনীত হয়েছে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেখানে উপলব্ধির শতদল হৃদয়ের নিভৃত সরোবরে প্রস্ফূটিত। এই সব সৃজন শীলতায় কখনও দেখা যায় লাবণ্য ও অনুরাগের স্বর্ণলেখ এবং কখনও এখানে ভাস্বর হয়েছে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দীপশিখা। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যশিল্পে ও চিত্রকলায়ও মূর্ত হয়েছে এমন এক একটি ভাবসত্তা যাদের শাশ্বত প্রকৃতিতে নিহিত আছে চিন্তা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য। এখানে বার বার প্রতিভাত হয়েছে অন্তরঙ্গতার অনির্বচনীয় সুষমা এবং রূপতত্ত্বের অবিষ্ট রহস্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পালশিল্পের উত্তরণ তার নিজস্ব কমনীয়তা ও অনুভূতির মর্যাদায় ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অভিষিক্ত হয়েছে এক বিশিষ্ট আসনে। এমনিভাবেই বিচার্য বাংলার পোড়ামাটির শিল্প যার উত্তরণ লক্ষ্য করা যাবে আদি ঐতিহাসিক কালে এবং পরবর্তী নানা শতাব্দীতে, স্থপস্থাপত্যের অঙ্গে ও দেবায়তন সমূহের প্রাচীরে শোভিত অগণিত ফলকের সমারোহে ও কারুকর্মে। পালযুগের রীতিতে খোদিত ভাস্কর্য সমূহের এক অন্যতম উপস্থিতি দেখা যায় উত্তরবঙ্গে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির পরিমণ্ডলে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে সন্ধ্যাকরনন্দী কর্তৃক রচিত 'রামচরিত'-এর টীকায় বরেন্দ্রীকে সম্রাট রামপালদেবের 'জনকভূঃ' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহী কৈবর্তদের পরাভূত করে রামপাল তাঁর 'জনকভূঃ' পুনরুদ্ধার করেন। বৈদ্যদেব-এর কমৌলি অনুশাসনেও উত্তরবঙ্গকে রামপালের 'জনকভূঃ' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'জনকভূঃ'র অর্থ 'পিতৃভূমি' অথবা 'পিতৃকুলশাসিত ভূমি' এই দু'য়ের যে কোন একটি হতে পারে। তবে এই উল্লেখ বিশেষভাবে আলোকপাত করে পাল সম্রাটদের সঙ্গে উত্তর বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর। রাজমহল গিরিশিরার কৃষ্ণবর্ণের ব্যাসল্ট প্রস্তর সহজ লভ্য ছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিতে। সে যুগের বাঙালী শিল্পীর হাতে এই পাথরে যে সব প্রতিমা নির্মিত হয়েছে তাদের কমনীয়তা, অন্তর্লীন সৌন্দর্য ও শাস্ত্রীয় সুসমঞ্জস্যতার তুলনা নেই। এই একই পর্বে আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিমা শিল্পে যে নবীন অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পাল শিল্পের সৌন্দর্য কল্পনা সমান্তরাল হলেও পালরীতিতে রূপায়িত পেলব সৌন্দর্য নিঃসংশয়ে আপন বৈশিষ্ট্য ধন্য একটি পরিপূর্ণ সভ্যতার অভিজ্ঞান স্বরূপ। এই বিশেষ কারণেই ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় জনরুচির পরিপ্রেক্ষিতে পালশিল্পের উত্তরণ হিমালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার ভাস্কর্যশৈলী তথা চারুকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শিল্প তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ দিকে একটি পরম অনুভূতি ও রূপভাবনাকে যেন শুধুমাত্র সুস্পষ্ট রেখাতেই আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে। ফলতঃ পাল সেন পর্বের মূর্তিকলা প্রকাশধর্মী হয়েছে কিন্তু অন্তরালে চলে গেছে পূর্বের দীপ্ত অনুরাগ ও ভাবসত্তা যার অনির্বচনীয় মাধুর্য ও গৌরব প্রকাশিত হয়েছে গুপ্ত চালুক্য পর্বের শিল্পকৃতিতে। এককথায় তার স্বকীয় সৌন্দর্য গুণেই পালশিল্প বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়রূপে বিরাজিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গুপ্তোত্তর ও আদি মধ্যযুগে পশ্চিমবঙ্গে সৃজিত আরেক শ্রেণীর ভাস্কর্যের সমারোহ। শিল্প জগতের এই অমূল্য রত্নাবলীকে যেন আমরা দীপহারা গৃহ কোণে হারিয়ে ফেলেছি। এই মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল প্রাচীন মানভূম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের পটভূমিকায়। পশ্চিমবঙ্গের পরিমণ্ডলে জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমা শিল্পের নয়নাভিরাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মূর্তিগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে মূলতঃ পুরুলিয়া জেলায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ে। সাধারণতঃ সবুজাভ 'ক্লোরাইট' পাথরে বিনির্মিত এই মূর্তি সমূহের পরিকল্পনায় স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে দেহলাবণ্যের এমন এক সম্মিলন প্রতিভাত হয় যা এক অনন্য উপলব্ধির প্রতীক। এই শিল্পে রূপায়িত তীর্থঙ্করদের মুখমণ্ডলে ও অবয়বে যে সীমাহীন রহস্য ও কৈবল্যজ্ঞানলব্ধ উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তার গৌরব সভ্যতার এক শাশ্বত অভিজ্ঞানস্বরূপ। অপরপক্ষে, উল্লিখিত সমারোহের অন্তর্গত জৈন শাসনদেবী, যক্ষ, দেবতা ইত্যাদির রূপায়ণে অনুভূত হবে গুপ্তোত্তর যুগের সৌন্দর্য বোধের এক নবীন অভিজ্ঞতা যা পূর্ববর্তী আত্মনিমগ্নতা থেকে ক্রমশঃ অগ্রসরমান মধ্যযুগীয় শৈলীর কাব্যময় মাধুর্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য লালিত্যের প্রতি। সেই সময়ের একই ভাস্করদের চারুকল্পনায় সৃজিত হয়েছে সুরকন্যাদের মোহিনী রূপ। এই সব ভাস্কর্যগুলির প্রাচীনত্বকে আঙ্গিকগত বিচারে খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে নির্দেশ করা যায়। গুপ্তরীতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এই ভাস্কর্যশিল্পের গতি যেন হারিয়ে গেল পালশিল্পের ব্যাপ্তির পটভূমিকায়। পালসম্রাটদের প্রাধান্যের ফলে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় সামাজিক কারণেই কি এই শিল্পের আশ্চর্য স্রোতস্বতীটি মানভূম-এর মরু উপত্যকায় হারিয়ে গেল? স্বভাবতই, ধারণা করা যায়, আলোচ্য শিল্প সমারোহের মূল প্রেরণা নিগ্রন্থ ধর্মের প্রতিমাধ্যান এবং অর্হৎদের শাশ্বত প্রকৃতি ও কৈবল্যজ্ঞান। জৈন ধর্ম ও দর্শনের ভাবসত্তাকে যেন পুষ্পের নীরব স্নিগ্ধতায় ও মাধুর্যে নিবেদন করেছে বাংলার এই প্রাচীন ভাস্কর্যশ্রেণী। স্থিতপ্রতিজ্ঞ তীর্থঙ্করদের আত্মনিমগ্নতায়ও এই শান্তশ্রী উদ্ভাসিত। আলোচ্য প্রতিমা শিল্প যথাযোগ্য ক্ষেত্রে

ওড়িশার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জে অবস্থিত খিচিং এর ভাস্কর্য সমূহের সৌন্দর্যকে কিছুটা স্মরণ করিয়ে দিলেও স্পষ্টতই ভিন্নতর রেখা ও সুষমার অধিকারী। মূলতঃ মানভূম-এ বিকশিত এই প্রতিমা শিল্পের একটি বিশিস্ট সমাবেশ দেখা যায় পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত পাকবিড়্রার ধ্বংসাবশেষে। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর এক বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক শিল্পের কেন্দ্রস্থল যে ছিল পাকবিড়্রা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গুপ্তোত্তর পর্বের রুচিবোধ যে এখানে জনমানসকে বহুকাল উদ্বুদ্ধ করেছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় তক্ষণ শিল্পে অনুসৃত শৈলী। এখানকার ভাস্কর্যে ও মণ্ডনশিল্পে প্রতিভাত রূপভাবনা মানভূম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে হয়ত স্থায়িত্ব লাভ করেছে আরও কিছু কাল। নবীন আবিষ্কারের ভিত্তিতেই বিষয়টি আরও স্পষ্টীকৃত হতে পারে।

পাকবিড়্রায় 'কায়োৎসর্গ' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভর বিপুলায়তন মূর্তি, অন্যান্য জিনমূর্তির সমারোহ এবং দেবতাদের প্রায়-নিমীলিত নয়ন ও অপার্থিব সৌন্দর্য সবই যেন এক শৈলাঞ্চলের স্বতন্ত্র উপলব্ধির প্রতীক। তবে এখানেও অন্তর্লীন লাবণ্যের অনুভূতি ও সূক্ষ্ম মাধুর্য বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। এখানে উল্লেখ্য, একই ভাস্কর্যশৈলীকে পর্যবেক্ষণ করা গেছে আরও পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় তালডাংড়া থানায় অবস্থিত দেউলভিড়্যার ধ্বংসাবশেষে। এই ধ্বংসাবশেষ নিহিত ছিল আদি-মধ্যযুগের এক 'রেখ' বর্গীয় মন্দিরের ভিত্তিস্থলে। সাম্প্রতিককালে রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকারের উদ্যোগে যখন এই মন্দিরের সংস্কারকার্য সম্পন্ন হতে থাকে তখন এখানকার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত হয় জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ-এর এক অনন্য ভাস্কর্য ও অন্যান্য জৈনমূর্তির ভগ্ন নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত 'ক্লোরাইট' পাথরের এই ভাস্কর্যগুলিকে আঙ্গিকগত বিবেচনায় খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে নির্দেশ করা যায়। বিভিন্ন কারণ দৃষ্টে মনে করা যেতে পারে দেউলভিড়্যার প্রাচীন দেবায়তন প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব-এর পূজোপলক্ষ্যে বিনির্মিত হয়েছিল। এখানে প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর ও অন্যান্য দেবতা কিংবা শাসনদেবীর মূর্তি সমুদয়ে অনুসৃত শিল্পশৈলীতেও প্রতিফলিত হয়েছে মানভূম-এর সেই অনুপম স্নিগ্ধতা ও রূপমাধুর্য। ঋষভদেব-এর বৃহদায়তন মূর্তিতে যেমন প্রকাশিত হয়েছে কৈবল্য-জ্ঞানলব্ধ প্রাণের পরম প্রশান্তি ও পূর্ণতা তেমন ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিগুলির আয়ত নয়ন, সামান্য-সীত কোমল অধরোষ্ঠ এবং আত্মনিমগ্ন ভাবসত্তা পূর্বযুগের আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিলেও ভাস্করের প্রেরণা এখন এক পৃথক শৈলীর ক্রমঃপ্রকাশকে আভাসিত করে। দেহ সৌন্দর্যে ও মুখাবয়বে প্রকাশিত দিব্য অনুভূতির লাবণিতে মধ্যযুগের কাব্যময় রূপতত্ত্ব সূচিত হলেও শিল্পী এখনও গুপ্তযুগের ইন্দ্রিয়াতীত প্রেরণার মধ্যেই

সার্থকতার স্বর্গকে খুঁজে পেয়েছে। সমসাময়িক পর্বে পালশিল্পের ক্রমঃবিবর্তনের মধ্যে গুপ্তরীতির ক্রমঃবিলীয়মান চিহ্নগুলি উপস্থিত থাকলেও মানভূম ও তার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে নির্মিত বিভিন্ন ভাস্কর্যের সেই প্রস্তরের অনুভূতি এবং পার্বত্য পরিবেশে লালিত সৌন্দর্যবোধ ও ঋজুত্বব্যঞ্জক অঙ্গমাধুর্য একটি স্বতন্ত্র উন্মেষ, উত্তরণ ও বিবর্তনের পরিচায়ক। অতীতের যথাযথ অধ্যায়ে এই ভিন্ন প্রবাহকে দেখা যাবে নানা ক্ষেত্রে। বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত অম্বিকানগরে প্রাপ্ত এক গোধিকাবাহনা পার্বতীর সঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরে সংগৃহীত একটি প্রতিমায় প্রদর্শিত একই দেবীরূপকে তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। অম্বিকানগরের মূর্তিতে যেমন সুঠাম মনোহারিত্ব প্রকাশিত পশ্চিম দিনাজপুর-এর ভাস্কর্যে তেমন সর্বাধিক আকর্ষণীয় দেবীর পেলব সৌন্দর্য যা বিকীর্ণ করে গৃহবধূর নম্রতা ও করুণার মাধুর্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত দুইটি মূর্তিই এখন সংরক্ষিত আছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ব সংগ্রহালয়ে। পালশৈলীতে খোদিত একটি অনন্য গোধিকাবাহনা পার্বতীর তথা চণ্ডীর মূর্তি প্রদর্শিত আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায়। এই পার্বতীমূর্তির সঙ্গে কিংবা পালশৈলীতে খোদিত গোধিকাবাহনার অন্যান্য ভাস্কর্যের সঙ্গেও অম্বিকানগরের দেবী প্রতিমাকে তুলনা করা যেতে পারে।

মানভূমের আঞ্চলিক শিল্পের যে সব প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয় তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে পুরুলিয়া জেলায় কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত দেউলঘাটা (বরাম)-র বিভিন্ন ভাস্কর্য। দেউলঘাটায় পূজিত মহিষমর্দিনী দুর্গার অসাধারণ সৌন্দর্য রূপায়িত হয়েছে তনুর সুঠাম সৌন্দর্যে ও আবেগশীলতায়। রণরঙ্গিনীর মোহিনী ভঙ্গি এক সীমাহীন শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক। নারীসৌন্দর্যের আরেক কাব্যময় প্রকাশ ও নিবিড়তা পর্যবেক্ষিত হয়েছে পাকবিড়রায়, তীর্থঙ্কর নেমিনাথ-এর যক্ষিণী দেবী অম্বিকার অনুপম তনুশ্রীতে এবং অন্যান্য যক্ষিণী অথবা তীর্থঙ্কর মাতার পরিপূর্ণ নারীত্বে ও জিনমূর্তিসমূহের পার্শ্বচরীদের যৌবনভারে। এখানে সংগৃহীত ও বর্তমানে রাজ্য প্রত্নতত্ব সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত 'ক্লোরাইট' পাথরের এক রূপসী চামরধারিণীর ক্ষুদ্র মূর্তি বাংলার প্রাচীন শিল্পে তার নিজস্ব স্থান করে নেবে তার লাবণ্যময় শিল্পশ্রীর জন্য। নানা কারণে অনুভব করা যায়, গুপ্তোত্তর যুগে ও আদি-মধ্যযুগের প্রারম্ভে রাঢ় ও মানভূম-এর এই স্থানীয় শিল্প মূলতঃ ও প্রধানতঃ নিগ্রন্থ ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত আরসা, ছড়রা ও অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন এই শিল্প একদা তার আপন প্রভায় উজ্জ্বল ছিল তেমন এরই কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকাশ ঘটেছিল মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলে। এই জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অবস্থিত পরিহাটিতে আবিষ্কৃত হয়েছে

জৈন ভাস্কর্যের এমন কয়েকটি অমূল্য নিদর্শন যাদের গুরুত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হাল্কা সবুজ রং-এর 'ক্লোরাইট' পাথরে খোদিত একটি তীর্থঙ্করমূর্তির মুখ এবং 'কায়োৎসর্গ' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এই তীর্থঙ্করেরই কিংবা অপর কোন তুলনীয় মূর্তির দেহকাণ্ড। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংগৃহীত এই দুইটি নিদর্শনের ও একটি 'চৌমুখ'-এর শৈলী পার্শ্ববর্তী ওড়িশার শিল্পরীতির সঙ্গে কিছুটা সমান্তরাল হলেও এগুলির সৌন্দর্য ও রমণীয় ভাবসত্তায় প্রতিফলিত হয়েছে গুপ্তোত্তর পর্বের নবীন সৃজনশীলতা ও অনুভূতি। এই সৌন্দর্যও বাংলার শিল্পকৃতিগুলিতে বিভিন্ন শতাব্দীতে প্রতিফলিত সেই স্বতন্ত্র মাধুরী ও অনুভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ রাঢ়-এর পশ্চিমাঞ্চলে ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক রীতি পুষ্পিত হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতেও লক্ষ্য করা যাবে শিল্পের রমণীয় অভিব্যক্তি বিভিন্ন তুলনীয় পর্বের সীমিত দিগন্তে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাঢ়-এর পশ্চিমাঞ্চলে একদা সমাদৃত মূর্তিকলা হয়ত অনিশ্চয়তার মধ্যে এগিয়ে চলেছিল তার পরিণতির দিকে। এই প্রসঙ্গে একটি অনন্য জৈন ভাস্কর্যের উল্লেখ প্রয়োজন। কলকাতায় ১৩৯ নং কটন স্ট্রীট-এ অবস্থিত শ্বেতাম্বর পঞ্চায়েতী মন্দিরে রক্ষিত আছে বালুকাময় প্রস্তরে খোদিত ঋষভনাথ-এর একটি মূর্তি। পদ্মাসনে উপবিষ্ট এই তীর্থঙ্করের সামগ্রিক রূপায়ণে গুপ্তযুগের গভীরতা, নির্দিষ্ট সুসমঞ্জসতা ও প্রশান্তি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমন মুখমণ্ডলের গঠনে নিরীক্ষিত হবে এক নবীন শিল্পানুভূতি। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে খোদিত এই ভাস্কর্যের প্রাপ্তিস্থল সম্ভবতঃ এই রাজ্যেরই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কোন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। কখনও অনুমান করা হয়, অতীতে এই অমূল্য ভাস্কর্যটি বর্ধমান জেলায় আসানসোল-এর অদূরে অবস্থিত পুঁচড়ার জৈন কীর্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

উপরে উদ্ধৃত বিষয় সমূহ আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কখনও পারম্পরিকভাবে সম্পূর্ণ সমান্তরাল না হলেও রাঢ়-এর পশ্চিমাঞ্চলে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম-এর এক নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে একদা গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে তথা আদি মধ্যযুগে জৈন শিল্পের যে অভ্যুদয় ঘটেছিল তার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন এক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় যা পাল শিল্পের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। জৈন তীর্থযাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার প্রেক্ষাপটে পুষ্পিত এই শিল্পের শতদলে যে বর্ণালী শোভিত তা বাংলার পশ্চিমে প্রসারিত পার্বত্যভূমি ও

শাল-মহুয়া সমন্বিত প্রান্তর ভূমিতে একদা লালিত সংস্কৃতির দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে রামধনুর সৌন্দর্যে। পশ্চিমে খাজুরাহো এবং দিলওয়াড়ার জৈন ভাস্কর্যের বিভিন্ন প্রকাশে যে মধুর শুচিত্ব ও আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে এখানে যেন সেই একই প্রেরণা ভিন্নতর কুশলতায় মূর্তিশিল্পকে তার শাশ্বত আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লেখক জানিয়েছেন যে সম্প্রতি পরিভ্রমণকালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখা দ্বারা পরিচালিত বিষ্ণুপুরস্থিত আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রাঢ়ের এই স্বতন্ত্র শৈলীর বা এই শৈলীর অনুকরণজাত ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন দেখতে পান। এই পুরাকৃতি ভবনের অধ্যক্ষ প্রত্নবিদ্ শ্রীমাণিকলাল সিংহ এই নিদর্শনগুলির স্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই সংগ্রহে জৈন ও ব্রাহ্মণ্য উভয় শ্রেণীর ভাস্কর্যই রয়েছে। —সম্পাদক

আলোক চিত্র তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের আলোক চিত্র শিল্পী শ্রীরঞ্জিত সেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সৌজন্যে।

রত্নমুকুট শোভিত দেবতা। ক্লোরাইট পাথর। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী। দেউলভিড়্যা, বাঁকুড়া জেলা।

অমৃত ধারায় চন্দন সুবাসে

[মহাবীর আমার চোখে যে ভাবে ভাসছেন]

শ্রীশঙ্কর মিত্র

কথা ঃ

ভোরের বাতাসে একটি তারা কথা বলে,
পথ দেখায় ঃ সময় হলো, এসো ঐতো পথ !
গভীর অরণ্য হিংস্রতায় ভরা, সরল পথ নয়।
ভালোবাসার আগুন জ্বেলে খুঁজে নাও পরশমণি
ভষ্ম হলেও পবিত্র মন্ত্রের মত গেঁথে নিয়ে
সোণালী ঝর্ণার পবিত্র ধারায় স্নান করে
চন্দন সুবাস ভরিয়ে নাও নিঃশ্বাসে।

মন ঃ

আর কতদিন খাঁচা বন্দী বিহঙ্গের মত
আকাশ পাব না খুঁজে—আর কতদিন পৃথিবীর
সৌন্দর্য, কীট পতঙ্গ থেকে মানুষ, জড় থেকে অজড়
নানা রঙ্গে ছড়িয়ে থাকা এদের পাবো না বুকে নিতে ?
আর কতদিন ? সময় যে বয়ে যায় কাল বেলায়
নদীর কূলে কূলে গানের সুরে সুর পাল্টায়।

উত্তর ঃ

এবার খুলে নিই খাঁচা নিবিড় নিলীমায় উড়ে যাই
পবিত্র সুষমায়—জীবন মন্ত্রের অন্বেষায়।

সুবর্ণভূমিতে কালকাচার্য

ডাঃ ইউ. পি. শাহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এখানে আমরা প্রথমে তিথোগ্‌গালী পইন্নয়-র উল্লেখ উদ্ধৃত করি :

জং রয়ণিং সিদ্ধিগও অরহা তিত্থংকরো মহাবীরো।
তং রয়ণিমবংতীএ অভিসিত্তো পালও রায়া ॥ ৬২০
পালগরন্নো সঠ্‌ঠী পুণ পন্নসয়ং বিয়াণি ণংদাণম্‌।
মুরিয়াণং সঠ্‌ঠিসয়ং পণতীসা পূসমিত্তাণম্‌ (তস্‌স) ॥ ৬২১
বলমিত্ত ভাণুমিত্তা সঠ্‌ঠী চত্তায় হোংতি নহসেণে।
গদ্দভসয়মেগং পুণ পাডিবন্নো তো সগো রায়া ॥ ৬২২
পংচ য মাসা পংচ য বাসা ছচ্চেব হোংতি বাসসয়া।
পরিনিব্বুঅস্‌সঽরিহতো তো উপ্পন্নো (পাডিবন্নো) সগো রায়া ॥ ৬২৩[১৬]

এভাবে ৭৮ খৃঃ পূর্বাব্দে যে শক সংবত প্রবর্তিত হয় সেই প্রবর্তনকারী শক রাজার পূর্বে ১০০ বছর গর্দভিল্লের, ৪০ বছর নভঃসেনের ও ৬০ বছর বলমিত্রের বলা হয়েছে।

দিগম্বর তিলোয়পন্নত্তিতে এই প্রকারের কালগণনা পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে :

১৬ বীর নির্বাণ সম্বৎ ঔর জৈন কাল গণনা, পৃঃ ৩০ ৩ এ মুনিশ্রী গাথা উদ্ধৃত করেছেন। তিথোগ্‌গালীর যে পুঁথি পাওয়া যায় তা অশুদ্ধ।
ঐ পৃঃ ৩১ এর পাদটীকায় মুনিশ্রী দুঃষমগণ্ডিকা ও যুগপ্রধানগণ্ডিকার সার দিয়েছেন। অন্য গণনার সঙ্গে এর সংগতি বসানো মুস্কিল। কোনও মতে শক সম্বৎকে বীরাব্দ ৬০৫ পর্যন্ত নিয়ে আসতাম কিন্তু মধ্যবর্তী রাজাদের কালগণনায় গোলমাল হয়ে যায়। এই বিষয়ে অনেক বিদ্বান আলোচনা করেছেন। এখানে আমি যদি সংক্ষেপে সে সব বিবৃত করি তাহলে বক্তব্যের কলেবর বড় হয়ে যাবে। তাছাড়া এ সব আলোচনা বিদ্বানদের সুপরিচিত।

জক্কালে বীরজিণো নিঃসেসসংপয়ং সমাবণ্ণো।
তক্কালে অভিসিত্তো পালয়ণাম অবংতিসুদো॥ ১৫০৫
পালকরজ্জং সঠ্ঠিং ইগিসয়পণবণ্ণা বিজয়বংসভবা।
চালং মুরুদযবংসা তীসং বস্সা সুপুস্সমিত্তম্মি॥ ১৫০৬
বসুমিত্ত অগ্গিমিত্তা সঠ্ঠী গংধব্বয়া বি সয়মেক্কং।
ণরবাহণা য চালং তত্তো ভত্থঠ্ঠণা জাদা॥ ১৫০৭
ভত্থঠ্ঠণাণ কালো দোণ্ণি সয়াইং বংতি বাদালা।[৭৭]

জিনসেনাচার্যের হরিবংশপুরাণেও[৭৮] এই গণনা পাওয়া যায় যার অনুসারে পালকের ৬০ বর্ষ, বিজয়বংশ বা নন্দবংশের ১৫৫ বর্ষ, মুরুদয় বা মৌর্যদের ৪০ বর্ষ, পুষ্যমিত্রের ৩০ বর্ষ, বসুমিত্র-অগ্নিমিত্রের ৬০ বর্ষ, গন্ধর্ব বা রাসভদের ১০০ বর্ষ ও নরবাহনের ৪০ বর্ষ বলা যায়। এর পর ভত্থাঠ্ঠাণ (ভৃত্যান্ধ্র) রাজা হন যাঁর সময় ২৪২ বছর বলা হয়েছে।

দিগম্বর পরম্পরাকে এখানে নেওয়া হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে যে তাঁদের কালগণনায়ও কিছু গোলমাল আছে। কারণ মৌর্যদের যে ৪০ বছর লেখা হয়েছে তা ঠিক নয়। শ্রীকাশী প্রসাদ জয়েসবালজী শ্বেতাম্বর কালগণনার সমীক্ষা করতে গিয়ে বলেছেন যে যে কয় বছর মৌর্যদের কমানো হয়েছে সে কয় বছর রাসভের (গর্দভিল্লোদের) বাড়ানো হয়েছে। এই কালগণনা বিষয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তা হতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আজো উপনীত হওয়া যায়নি।[৭৯] সম্ভব যে শকদের ভারতে প্রথম আগমন ও উজ্জয়িনীতে রাজ্য করা, তদনন্তর পরাজয়ের পরে খৃঃ পূঃ ৭৮ অব্দে

---

৭৭ তিলোয়পণ্ণত্তি, পৃঃ ৩৪২, কসায়পাহুড়, ভাগ ১, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৫০-৫১তে উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু পরস্পর বিরোধী কালগণনার এখনো সন্তোষজনক সমাধান হয়নি।

৭৮ ডাঃ জয়েসবাল, জার্ণাল অফ দি বিহার ওড়িষ্যা রিসর্চ সোসাইটী, ভাগ ১৬, পৃঃ ২৩৪-৩৫। ঐ কল্পনা মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জীও করেন।

৭৯ মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ-এ মোট ৭ গর্দভিল্ল রাজার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গর্দভিল্লদের রাজ্যকাল মাত্র ৭২ বছর। তিথোগালী পইন্নয়তে গর্দভিল্ল বংশীয় রাজাদের সংখ্যা দেওয়া হয়নি কিন্তু তাদের রাজ্যকাল ১০০ বছর বলা হয়েছে। যে গর্দভিল্লকে কালকসূরি শকদের সাহায্যে রাজ্যচ্যুত করেন তিনি কি এই বংশের? তিনি কি গর্দভিল্ল বংশের শেষ রাজা? এগুলি বিচারণীয়। ডাঃ শান্তিলাল শাহ দি ট্র্যাডিশনাল ক্রনোলজি অব দি জৈনিস্ম গ্রন্থে লিখছেন যে, যে গর্দভরাজকে কালক উচ্ছেদ করেন তিনি মথুরার একটী শিলালেখে উল্লিখিত Kha'Jaa নামক রাজা। গর্দভিল্ল পৃথক বংশীয় পল্হব পার্থিয়ান ছিলেন। এ সব নিশ্চিত রূপে স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু গর্দভ রাজার গ্রীক হওয়া অধিক সম্ভব।

পুনরায় রাজ্য করা এই দুই পৃথক পৃথক অবস্থা পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ঠিক ঠিক জানতে বা বুঝতে পারেননি। তিলোয়পন্নত্তি নিজে মহাবীর নির্বাণ ও শক সম্বতের মধ্যের পার্থক্যের দুইটী পরম্পরা দিচ্ছে যার একটী অনুসারে নির্বাণের পরে ৪৬১ বছর ব্যতীত হলে শক রাজা উৎপন্ন হন (তিলোয়পন্নত্তি, অধিকার ৪, গাথা ১৪৯৬, পৃঃ ৩৪০)। দ্বিতীয়টী অনুসারে নির্বাণের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে শক রাজার উদ্ভব হয়। (ঐ, গাথা ১৪৯৯, পৃঃ ৩৪১)। যে করেই হোক এতো স্পষ্ট যে শ্বেতাম্বর পরম্পরার বলমিত্র ভানুমিত্র দিগম্বর সম্প্রদায়ে বসুমিত্র অগ্নিমিত্র নামে অভিহিত হতে লাগলেন। তাঁরা শুঙ্গদের মধ্য ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যপাল (Governors) ছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গকুলোদ্ভূতও হতে পারেন। বিদিশায় যুবরাজ অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের রাজ্যপাল ছিলেন তা মহাকবি কালিদাস কৃত মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। পাঞ্চালে মিত্রনামান্ত অন্য রাজাদের মোহর পাওয়া গেছে। এভাবে বলমিত্র-ভানুমিত্রের উজ্জয়িনী বা লাট দেশের শাসক হবার কথা সম্ভাব্য বলেই মনে হয়।

পুষ্যমিত্রের সময় পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয় বলে বলা হয়। মহাভাষ্যের সূত্র ৩।২।১১ তে কাত্যায়ন বার্তিক 'পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞানে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে'র ওপর দুটি অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' ও 'অরুণদ্ যবনঃ মাধ্যমিকাম্।' বিদ্বানেরা এ বিষয়ে একমত যে এখানে যবন রাজা মীনাণ্ডারের ভারতীয় অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছে। বাসুদেব শরণ অগ্রওয়াল লিখছেন—'মীনাণ্ডার শাকল (স্যালকোট) অধিকার করে এক অভিযান সিন্ধু রাজপুতানার দিকে মাধ্যমিকা (চিতোড় এর সন্নিকটস্থ এক নগরী) লক্ষ্য করে করেছিলেন। ও'র দ্বিতীয় অভিযান পূবের দিকে ছিল। সেই অভিযানে তিনি মথুরা সাকেত। (অযোধ্যা) অধিকার করে পুষ্পপুর (পাটলীপুত্র) পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন গার্গী সংহিতার যুগ পুরাণ নামক অধ্যায়ে এই পূর্ব অভিযানের বিবরণাত্মক উল্লেখ আছে। এর এক নূতন প্রমাণ জৈনেন্দ্র ব্যাকারণ সূত্রে ২।২।৯২ র ওপরের অভয়নন্দীর মহাবৃত্তিতে কোনো প্রকারে সুরক্ষিত রয়ে গেছে—'পরোক্ষে লোকবিজ্ঞানে প্রযোক্তুঃ শক্যদর্শনত্বেন দর্শন বিষয়ত্বে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণন্মহেন্দ্রো মথুরাম্। অরুণদ্যবনঃ সাকেতম্।' 'মহেন্দ্র' আমার মতে ভুলপাঠ। শুদ্ধপাঠ 'মেনন্দ্র' হওয়া উচিত। অবশ্য এইটী মূল পাঠ ছিল যার অর্থ না জেনে পরবর্তী লেখকেরা 'মহেন্দ্র' করে দিয়েছে। বস্তুতঃ মীনাণ্ডারের লোক প্রসিদ্ধ নাম ছিল 'মেনন্দ্র'। ও'র অনেক মোহর পাওয়া গেছে যার একদিকে যবন লিপিতে ও'র নাম ও অন্য দিকে খরোষ্ঠী লিপিতে 'মেনন্দ্র' এই নাম লেখা রয়েছে।'[৮০]

৮০ ডাঃ বাসুদেব শরণ অগ্রওয়াল, 'মিলিন্দকে পূর্ব ভারত মেঁ অভিযান কা নয়া উল্লেখ', রাজস্থান ভারতী, ভাগ ৩, সংখ্যা ৩-৪ (জুলাই ১৯৫৩), পৃঃ ৭১-৭২।

এ হতে এ স্পষ্ট যে গ্রীকেরা মধ্য ভারত অধিকার করেছিল। বলমিত্র ভানুমিত্র সমকালীন গ্রীক রাজকর্তা হতে পারেন। বৃহৎকল্প চূর্ণিতে উল্লেখ আছে যে উজ্জয়িনী নগরীতে অনিলসুত জব (যব ? যবন ?) নামক রাজা ছিলেন। ও'র পুত্র গর্দভ যুবরাজ ছিলেন। তিনি নিজের বোন 'অডোলিয়া'র রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে সহবাস করতে লাগলেন। রাজা এতে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে প্রব্রজিত হয়ে গেলেন। এই উল্লেখে 'অনিলসুতো নাম যবনো রাজা' এরূপ পাঠের কল্পনা শ্রীশান্তিলাল শাহর উপরোক্ত গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। 'অডোলিয়া' বিদেশী নাম। হতে পারে এই কামান্ধ গর্দভ সাধ্বী সরস্বতীর অপহরণ করেছিলেন। তিনি গ্রীক রাজকর্তা হতে পারেন, কিন্তু ও'র মুল নাম কি ছিল তা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। কহাবলীতে গর্দভ রাজার নাম দপ্পন—দর্পণ দেওয়া হয়েছে।

মথুরা মীনাণ্ডার কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চকল্পভাষ্য ও পঞ্চকল্পচূর্ণিতে আগের দেওয়া উল্লেখে আমরা দেখেছি যে সাতবাহন নরেশ আর্যকালককে জিজ্ঞাসা করছেন—মথুরার পতন হবে কিনা ? এবং হলে কবে হবে ? এর অর্থ এই যে মথুরা কারু দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল এবং এই অবরোধের পরিণাম সম্পর্কে সাতবাহন রাজার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিকই। এও হতে পারে যে সাতবাহন রাজা নিজে মথুরা অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন বা অবরুদ্ধ করতে চাইছিলেন কারণ বৃহৎকল্পভাষ্য ও চূর্ণিতে প্রতিষ্ঠানের সাতবাহন রাজার দণ্ডনায়ক উত্তর মথুরা ও দক্ষিণ মথুরা জয় করে নিয়ে ছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে। (বৃহৎকল্পসূত্র, বিভাগ ৬, গাথা ৬২৪৪-৪৯, পৃঃ ১৬৪৭-৪৯)। উজ্জয়িনী হতে গ্রীক (বিদেশী) রাজা যাকে গর্দভ বলা হত তাকে সরান হল। পরে মথুরা হতে গ্রীক অধিকার সরাবার জন্য কি সাতবাহন রাজা প্রযত্ন করলেন ? বা এখানে সাতবাহনের প্রশ্নে খারবেলর হাথীগুম্ফা লেখের উদ্দিষ্ট মথুরা অভিযানের উল্লেখ কি করা হয়েছে ?[৮১]

৮১ দ্রষ্টব্য ডাঃ বি. এম বড়ুয়া, 'হাথীগুম্ফা ইন্সক্রিপশন অব খারবেল', ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কুয়াটারলী, ভাগ ১৪, পৃঃ ৪৭। এই লেখ হতে জানা যায় যে খারবেল কোন সাতকর্ণ (সাতবাহন বংশ) রাজার সমকালীন ছিলেন। খারবেলর সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় বা প্রথম শতক। এ বিষয়ে ডাঃ বড়ুয়া পূর্ববর্তী সমস্ত বিদ্বানদের মতের এই নিবন্ধে ও গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁর গ্রন্থ পলিটিক্যাল হিষ্ট্রী অব এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ায় (খৃঃ ১৯৫৩-র সংস্করণ) ডাঃ বড়ুয়ার মতের আলোচনা করেছেন। আরো দ্রষ্টব্য 'দি ডেট অব খারবেল', জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটী (কলিকাতা), লেটার্স, ভাগ ১৯ (খৃঃ ১৯৫৩) নং ১, পৃঃ ২৫-৩২।

আমরা দেখেছি কালক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। ও'র সম্বন্ধ শকদের প্রথম আগমনের সঙ্গে। তিনি কোন সাতবাহন রাজার সমকালীন ছিলেন। বৃহদকল্পচূর্ণির উল্লেখে গর্দভের যবন হওয়া সম্ভব। যদিও জব শব্দ যবন—যব-জব এভাবে রূপান্তরিত হয়েছে বা যব জব হয়েছে ইত্যাদি অনিশ্চিত তবুও 'ওডোলিয়া' কোনো গ্রীক নামের রূপান্তর হওয়া সম্ভব। গর্দভরাজ (বা গর্দোভিল্লো) কি ভারতে গ্রীক রাজকর্তাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে ?

আমার মনে হয় এইটাই বেশী সম্ভব। গর্দভ ও গর্দভিল্ল অবশ্যই বিদেশী রাজকর্তা হবেন। এদের সরানো ভারতীয়দের নিকট কঠিন বলে মনে হয়েছিল। যবন গ্রীকদের ক্রূর স্বভাবের নির্দেশ আমরা গার্গী সংহিতার যুগপুরাণে পাই। এদের সরাবার জন্য আর্যকালক শকদের নিয়ে আসেন। যদি ভারতীয় রাজকর্তাকে সরাবার জন্য বিদেশী শকদের আনতেন তবে আর্যকালক দেশদ্রোহী হতেন। কালকের মত সমর্থ পণ্ডিত ও প্রভাবিক আচার্য তা হতে পারেন না। তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে গ্রীক রাজকর্তাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন ভারতীয় রাজাদের দ্বারা কিছু করানো সম্ভব নয়।

প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও বলা হয়নি যে শক পরাজিতকারী বিক্রমাদিত্য নিজে গর্দভ রাজার পুত্র ছিলেন। এই মান্যতা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। যখন কাল গণনায় গোলমাল দেখা গেল সেই সময়ে এই মান্যতা প্রচলিত হয়। কালকাচার্য কথানকেও যা প্রাচীন তাতে তা নেই। পূর্ববর্তী ৭২ পাদটীকায় আমি যে সব সাক্ষী উপস্থিত করেছি সেখানেও বিক্রমকে গর্দভের পুত্র বলা হয়নি। এ ভাবে গর্দভিল্লোচ্ছেদ ও বিক্রমের মধ্যে কম ব্যবধান ছিল বলা বা স্বীকার করার প্রয়োজন করে না। বাস্তবে ডাঃ জয়েসবালজীও সে কথা বলেন। তিনি গর্দোভিল্লোচ্ছেদ ঘটনার নির্দেশ করে লিখছেন :

'This event is placed before the Vikrama era but no time is specified as to how long after the occupation of Ujjain and Malava the first Saka dynasty came to an end. The Kathanaka expressly keeps it unspecified, as it says *kalantarena kenai.* (*ZDMG.*, 1880, p. 267 ; Konow, CII. II. p. xxvii)[৮২]

জয়েসবালজী এই গর্দোভিল্লোচ্ছেদের ঘটনাকে খৃঃ পূঃ ১০০-০১ এর বলেন।[৮৩]

---

৮২ ডাঃ জয়েসবাল, 'প্রবলেম্‌স অব শক –সাতবাহন হিস্ট্রী', জার্নাল অব বিহার এণ্ড ওড়িষ্যা রিসর্চ সোসাইটী, ভাগ ১৬ (খৃঃ ১৯৩০), পৃঃ ২৩৪।

৮৩ ঐ, পৃঃ ২৩৪ হতে।

রাজাদের কালগণনায় জৈন গ্রন্থেও কিছু গোলমাল ও অস্পষ্টতা রয়েছে। মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী (যাঁর মতে গর্দভিল্লোচ্ছেদক আর্যকালক দ্বিতীয় আর্যকালক ও যাঁর সময় বীরাব্দ ৪৫৩) এই ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন : 'ঘটনার কালক্রমে আমি গর্দভিল্লচ্ছেদক ঘটনা নির্বাণ সম্বৎ ৪৫৩ বলেছি। কিন্তু তাতে শঙ্কা হতে পারে যে এই ঘটনার সময়ে যদি বলমিত্র-ভানুমিত্র বিদ্যমান ছিলেন যেমন কহাবলী আদি গ্রন্থ হতে জ্ঞাত হওয়া যায় তবে এই ঘটনার ঐ সময় কিভাবে নির্দেশ হতে পারে? কারণ মেরুতুঙ্গ সূরির বিচার শ্রেণী আদি প্রচলিত জৈন গণনা অনুসারে বলমিত্র ভানুমিত্রের শাসনকাল বীর নির্বাণের ৩৫৪-১১৩ পর্যন্ত। এই অবস্থায় এ কথা বলা উচিত যে গর্দভিল্লোচ্ছেদের ঘটনার ঐ সময় (৪৫৩) ঠিক নয়, আর যদি ঠিক হয় তবে বলতে হয় বলমিত্র-ভানুমিত্রের উক্ত সময় ভুল। আর যদি উপরোক্ত দুই সময়ই ঠিক স্বীকার করা যায় তাহলে শেষে একথা স্বীকার করতে হয় যে গর্দভিল্ল ঘটনার সময় বলমিত্র-ভানুমিত্র বিদ্যমান ছিলেন না।'

মুনিজী আগে লিখছেন : 'গর্দভিল্লো ঘটনার সময় ভুল বলার আমি কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। বলমিত্র ভানুমিত্র আর্যকালকের ভাগনে ছিলেন তা সুপ্রসিদ্ধ। তাই কালকের সময়ে এদের বর্তমানতা স্বীকার করাও অনিবার্য। এখন বলমিত্র ভানুমিত্রের সময়ের কথা—তা আমার মতে তাঁদের সময় ৩৫৪-৪১৩ নয় ৪১৪ হতে ৪৭৩ পর্যন্ত। মৌর্যকাল হতে ৫২ বছর বাদ পড়ায় ১৬০ এর স্থানে কেবল ১০৮ বছরই প্রচলিত গণনায় নেওয়া হয়েছে। তাই একসঙ্গে ৫২ বছর কম হওয়ায় বলমিত্র আদির সময় অসঙ্গত হয়ে গেছে। আমি মৌর্য রাজ্যকাল ১৬০ বছর স্বীকার করে এই পদ্ধতিতে যে সংশোধন করেছি[৮৪] সে অনুসারে কালকাচার্য ও বলমিত্রর সময়ে কোন বিরোধ আর থাকে না।[৮৫] মুনিশ্রীর এই সমীক্ষা শঙ্কার আরো বৃদ্ধি করে কারণ গর্দভিল্লোচ্ছেদের ঘটনাকে যখন হতে বীরাব্দ ৪৫৩ স্বীকার করা হয় তখন হতে কালগণনায় গোলমাল সুরু হয়। ডাঃ ব্রাউন দ্বিতীয় কালক সম্বন্ধে লিখছেন :

৮৪ এর জন্য দ্রষ্টব্য মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী কৃত বীর নির্বাণ সম্বৎ ঔর জৈন কাল গণনা।

৮৫ মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী, 'আর্য কালক', দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ১১৬। মুনিশ্রীর কথনানুসারে নি. স, ৪৫৩ তে গর্দভিল্লকে সরিয়ে (খৃঃ পূঃ ৭৪) শকরাজা উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও চার বছর পর নি. স. ৪৫৭ তে (খৃঃ পূঃ ৭০) বলমিত্র তাকে সরিয়ে উজ্জয়িনী অধিকার করে নেন। বলমিত্র ভানুমিত্রের রাজ্যের অবসান নি. স. ৪৬৫ (খৃঃ পূঃ ৬২) তে হয়। ঐ, পৃঃ ১১৭ পাদটীকা ১।

'Most versions make him the disciple or Gunakara (=the Sthavira Gunasundara), but this must be an error; for on chronological grounds it must have been Kalaka I who was Gunakara's disciple.'[৮৬]

এ হতে ত এ কথা স্বীকার করাই অধিক ঠিক হবে যে কথানকের কালক প্রথম আর্যকালক। ডাঃ ব্রাউন আগে লিখছেন:

'The *Kalpadruma* and Samayasundara add an alternative tradition stating that Kalaka II was the maternal uncle of the Kings Balamitra and Bhanumitra of Jain tradition, thus agreeing with a few versions of the Kalakacaryakatha, althouh most of them identify the Kalaka who was the uncle of those kings with the Kalaka who changed the date of the *paryusana*......The year of Kalaka II is by all authorities said to be 453 of the Vira era, in which year it is specifically stated in a stanza appended to three Mss. of Dharmaprabha's version that he took Sarasvati. Possibly the statement is slightly inaccurate and the date refers to his accession to the position of Suri, just in other stanzas appended to Mss. of the same version the year 335, which is the date of accession to the position of Suri, is mentioned as that of Kalaka I. Dharmasagara Ganin assigns the deeds of Kalak II to Kalaka I.[৮৭]

আগেই বলেছি যে কথানকে কালকের সময় নির্দেশ করা নাই। কোনো ভাষ্য বা চূর্ণীতেও নয়। বলমিত্র ভানুমিত্র ও পর্যুষণ তিথি সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মপ্রভর রচনা সং ১৩৯৮তে হয়। মূল রচনায় গর্দভিল্লোচ্ছেদক কালক বীরাব্দ ৪৫৩তে হন তা নেই। মূলে:

৮৬। ব্রাউন, দি ষ্টোরী অব কালক, পৃঃ ৬।

৮৭। ঐ, পৃঃ ৬, ৭-১২।

জৈন ভাস্কর্যের এমন কয়েকটি অমূল্য নিদর্শন যাদের গুরুত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হাল্‌কা সবুজ রং-এর 'ক্লোরাইট' পাথরে খোদিত একটি তীর্থঙ্করমূর্তির মুখ এবং 'কায়োৎসর্গ' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এই তীর্থঙ্করেরই কিংবা অপর কোন তুলনীয় মূর্তির দেহকাণ্ড। রাজ্য প্রত্নতত্ব অধিকার কর্তৃক সংগৃহীত এই দুইটি নিদর্শনের ও একটি 'চৌমুখ'-এর শৈলী পার্শ্ববর্তী, ওড়িশার শিল্পরীতির সঙ্গে কিছুটা সমান্তরাল হলেও এগুলির সৌন্দর্য ও রমণীয় ভাবসত্তায় প্রতিফলিত হয়েছে গুপ্তোত্তর পর্বের নবীন সৃজনশীলতা ও অনুভূতি। এই সৌন্দর্যেও বাংলার শিল্পকৃতিগুলিতে বিভিন্ন শতাব্দীতে প্রতিফলিত সেই স্বতন্ত্র মাধুরী ও অনুভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ রাঢ়-এর পশ্চিমাঞ্চলে ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক রীতি পুষ্পিত হয়েছিল। পাশ্ববর্তী বিহার রাজ্যের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতেও লক্ষ্য করা যাবে শিল্পের রমণীয় অভিব্যক্তি বিভিন্ন তুলনীয় পর্বের সীমিত দিগন্তে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাঢ়-এর পশ্চিমাঞ্চলে একদা সমাদৃত মূর্তিকলা হয়ত অনিশ্চয়তার মধ্যে এগিয়ে চলেছিল তার পরিণতির দিকে। এই প্রসঙ্গে একটি অনন্য জৈন ভাস্কর্যের উল্লেখ প্রয়োজন। কলকাতায় ১৩৯ নং কটন স্ট্রীট-এ অবস্থিত শ্বেতাম্বর পঞ্চায়েতী মন্দিরে রক্ষিত আছে বালুকাময় প্রস্তরে খোদিত ঋষভনাথ-এর একটি মূর্তি। পদ্মাসনে উপবিষ্ট এই তীর্থঙ্করের সামগ্রিক রূপায়ণে গুপ্তযুগের গভীরতা, নির্দিষ্ট সুসমঞ্জসতা ও প্রশান্তি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমন মুখমণ্ডলের গঠনে নিরীক্ষিত হবে এক নবীন শিল্পানুভূতি। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে খোদিত এই ভাস্কর্যের প্রাপ্তিস্থল সম্ভবতঃ এই রাজ্যেরই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কোন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। কখনও অনুমান করা হয়, অতীতে এই অমূল্য ভাস্কর্যটি বর্ধমান জেলায় আসানসোল-এর অদূরে অবস্থিত পুঁচড়ার জৈন কীর্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

উপরে উদ্ধৃত বিষয় সমূহ আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কখনও পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণ সমান্তরাল না হলেও রাঢ়-এর পশ্চিমাঞ্চলে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম-এর এক নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে একদা গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে তথা আদি মধ্যযুগে জৈন শিল্পের যে অভ্যুদয় ঘটেছিল তার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন এক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় যা পাল শিল্পের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। জৈন তীর্থযাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার প্রেক্ষাপটে পুষ্পিত এই শিল্পের শতদলে যে বর্ণালী শোভিত তা বাংলার পশ্চিমে প্রসারিত পার্বত্যভূমি ও

শাল-মহুয়া সমন্বিত প্রান্তর ভূমিতে একদা লালিত সংস্কৃতির দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে রামধনুর সৌন্দর্যে। পশ্চিমে খাজুরাহো এবং দিলওয়াড়ার জৈন ভাস্কর্যের বিভিন্ন প্রকাশে যে মধুর শুচিত্ব ও আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে এখানে যেন সেই একই প্রেরণা ভিন্নতর কুশলতায় মূর্তিশিল্পকে তার শাশ্বত আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লেখক জানিয়েছেন যে সম্প্রতি পবিত্রমণকালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখা দ্বারা পরিচালিত বিষ্ণুপুরস্থিত আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রাঢ়ের এই স্বতন্ত্র শৈলীর বা এই শৈলীর অনুকরণজাত ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন দেখতে পান। এই পুরাকৃতি ভবনের অধ্যক্ষ প্রত্নবিদ্ শ্রীমাণিকলাল সিংহ এই নিদর্শনগুলির স্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই সংগ্রহে জৈন ও ব্রাহ্মণ্য উভয় শ্রেণীর ভাস্কর্যই রয়েছে। —সম্পাদক

আলোক চিত্র তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের আলোক চিত্র শিল্পী শ্রীরঞ্জিত সেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সৌজন্যে।

রত্নমুকুট শোভিত দেবতা। ক্লোরাইট পাথর। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী। দেউলভিড়্যা, বাঁকুড়া জেলা।

অমৃত ধারায় চন্দন সুবাসে

[মহাবীর আমার চোখে যে ভাবে ভাসছেন]

শ্রীশঙ্কর মিত্র

কথা ঃ

ভোরের বাতাসে একটি তারা কথা বলে,
পথ দেখায় ঃ সময় হলো, এসো ঐতো পথ !
গভীর অরণ্য হিংস্রতায় ভরা, সরল পথ নয় ।
ভালোবাসার আগুন জ্বেলে খুঁজে নাও পরশমণি
ভষ্ম হলেও পবিত্র মন্ত্রের মত গেঁথে নিয়ে
সোণালী ঝর্ণার পবিত্র ধারায় স্নান করে
চন্দন সুবাস ভরিয়ে নাও নিঃশ্বাসে ।

মন ঃ

আর কতদিন খাঁচা বন্দী বিহঙ্গের মত
আকাশ পাব না খুঁজে—আর কতদিন পৃথিবীর
সৌন্দর্য, কীট পতঙ্গ থেকে মানুষ, জড় থেকে অজড়
নানা রঙ্গে ছড়িয়ে থাকা এদের পাবো না বুকে নিতে ?
আর কতদিন ? সময় যে বয়ে যায় কাল বেলায়
নদীর কূলে কূলে গানের সুরে সুর পাল্টায় ।

উত্তর ঃ

এবার খুলে নিই খাঁচা নিবিড় নিলীমায় উড়ে যাই
পবিত্র সুষমায়—জীবন মন্ত্রের অন্বেষায় ।

সুবর্ণভূমিতে কালকাচার্য

ডাঃ ইউ. পি. শাহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এখানে আমরা প্রথমে তিত্থোগালী পইন্নয়-র উল্লেখ উদ্ধৃত করি :

জং রয়ণিং সিদ্ধিগও অরহা তিত্থংকরো মহাবীরো ।
তং রয়ণিমবংতীএ অভিসিত্তো পালও রায়া ॥ ৬২০
পালগরন্নো সঠ্ঠী পুণ পন্নসয়ং বিয়াণি ণংদাণম্ ।
মুরিয়াণং সঠ্ঠিসয়ং পণতীসা পূসমিত্তাণম্ (তস্স) ॥ ৬২১
বলমিত্ত ভাণুমিত্তা সঠ্ঠী চত্তায় হোংতি নহসেণে ।
গদ্দভসয়মেগং পুণ পাডিবন্নো তো সগো রায়া ॥ ৬২২
পংচ য মাসা পংচ য বাসা ছচ্চেব হোংতি বাসসয়া ।
পরিনিব্বুঅস্সহংরিহতো তো উপ্পন্নো (পাডিবন্নো) সগো রায়া ॥ ৬২৩[৭৬]

এভাবে ৭৮ খৃঃ পূর্বাব্দে যে শক সংবত প্রবর্তিত হয় সেই প্রবর্তনকারী শক রাজার পূর্বে ১০০ বছর গর্দভিল্লের, ৪০ বছর নভঃসেনের ও ৬০ বছর বলমিত্রের বলা হয়েছে।

দিগম্বর তিলোয়পন্নত্তিতে এই প্রকারের কালগণনা পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে :

৭৬ বীর নির্বাণ সম্বৎ ঔর জৈন কাল গণনা, পৃঃ ৩০ ৩১ এ মুনিশ্রী গাথা উদ্ধৃত করেছেন। তিত্থোগালীর যে পুঁথি পাওয়া যায় তা অশুদ্ধ।
ঐ পৃঃ ৩১ এর পাদটীকায় মুনিশ্রী দুঃষমগণ্ডিকা ও যুগপ্রধানগণ্ডিকার সার দিয়েছেন। অন্য গণনার সঙ্গে এর সংগতি বসানো মুস্কিল। কোনও মতে শক সম্বৎকে বীরাব্দ ৬০৫ পর্যন্ত নিয়ে আসতাম কিন্তু মধ্যবর্তী রাজাদের কালগণনার গোলমাল হয়ে যায়। এই বিষয়ে অনেক বিদ্বান আলোচনা করেছেন। এখানে আমি যদি সংক্ষেপে সে সব বিবৃত করি তাহলে বক্তব্যের কলেবর বড় হয়ে যাবে। তাছাড়া এ সব আলোচনা বিদ্বানদের সুপরিচিত।

জক্কালে বীরজিণো নিঃসেসসংপয়ং সমাবন্নো।
তক্কালে অভিসিত্তো পালয়ণাম অবংতিসুদো॥ ১৫০৫
পালকরজ্জং সঠ্ঠিং ইগিসয়পণবন্না বিজয়বংসভবা।
চালং মুরুদযবংসা তীসং বস্সা সুপুস্সমিত্তম্মি॥ ১৫০৬
বসুমিত্ত অগ্গিমিত্তা সঠ্ঠী গংধব্বয়া বি সয়মেক্কং।
ণরবাহণা য চালং তত্তো ভত্থঠ্ঠণা জাদা॥ ১৫০৭
ভত্থঠ্ঠণাণ কালো দোণ্ণি সয়াইং বংতি বাদালা।[৭৭]

জিনসেনাচার্যের হরিবংশপুরাণেও[৭৮] এই গণনা পাওয়া যায় যার অনুসারে পালকের ৬০ বর্ষ, বিজয়বংশ বা নন্দবংশের ১৫৫ বর্ষ, মুরুদয় বা মৌর্যদের ৪০ বর্ষ, পুষ্যমিত্রের ৩০ বর্ষ, বসুমিত্র-অগ্নিমিত্রের ৬০ বর্ষ, গন্ধর্ব বা রাসভদের ১০০ বর্ষ ও নরবাহনের ৪০ বর্ষ বলা যায়। এর পর ভত্থাঠ্ঠাণ (ভৃত্যান্ধ্র) রাজা হন যাঁর সময় ২৪২ বছর বলা হয়েছে।

দিগম্বর পরম্পরাকে এখানে নেওয়া হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে যে তাঁদের কালগণনায়ও কিছু গোলমাল আছে। কারণ মৌর্যদের যে ৪০ বছর লেখা হয়েছে তা ঠিক নয়। শ্রীকাশী প্রসাদ জয়েসবালজী শ্বেতাম্বর কালগণনার সমীক্ষা করতে গিয়ে বলেছেন যে যে কয় বছর মৌর্যদের কমানো হয়েছে সে কয় বছর রাসভের (গর্দভিল্লোদের) বাড়ানো হয়েছে। এই কালগণনা বিষয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তা হতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আজো উপনীত হওয়া যায়নি।[৭৯] সম্ভব যে শকদের ভারতে প্রথম আগমন ও উজ্জয়িনীতে রাজ্য করা, তদনন্তর পরাজয়ের পরে খৃঃ পৃঃ ৭৮ অব্দে

৭৭ তিলোয়পণ্ণত্তি, পৃঃ ৩৪২, কসায়পাহুড়, ভাগ ১, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৫০-৫১তে উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু পরস্পর বিরোধী কালগণনার এখনো সন্তোষজনক সমাধান হয়নি।

৭৮ ডাঃ জয়েসবাল, জার্ণাল অফ দি বিহার ওড়িষ্যা রিসর্চ সোসাইটী, ভাগ ১৬, পৃঃ ২৩৪-৩৫। ঐ কল্পনা মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জীও করেন।

৭৯ মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ-এ মোট ৭ গর্দভিল্ল রাজার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গর্দভিল্লদের রাজ্যকাল মাত্র ৭২ বছর। তিথোগ্গালী পইন্নয়তে গর্দভিল্ল বংশীয় রাজাদের সংখ্যা দেওয়া হয়নি কিন্তু তাদের রাজ্যকাল ১০০ বছর বলা হয়েছে। যে গর্দভিল্লকে কালকসূরি শকদের সাহায্যে রাজ্যচ্যুত করেন তিনি কি এই বংশের? তিনি কি গর্দভিল্ল বংশের শেষ রাজা? এগুলি বিচারণীয়। ডাঃ শান্তিলাল শাহ দি ট্র্যাডিশনাল ক্রনোলজি অব দি জৈনিস্ম গ্রন্থে লিখছেন যে, যে গর্দভরাজকে কালক উচ্ছেদ করেন তিনি মথুরার একটী শিলালেখে উল্লিখিত Kha'daa নামক রাজা। গর্দভিল্ল পৃথক বংশীয় পহ্লব পার্থিয়ান ছিলেন। এ সব নিশ্চিত রূপে স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু গর্দভ রাজার গ্রীক হওয়া অধিক সম্ভব।

পুনরায় রাজ্য করা এই দুই পৃথক পৃথক অবস্থা পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ঠিক ঠিক জানতে বা বুঝতে পারেননি। তিলোয়পন্নত্তি নিজে মহাবীর নির্বাণ ও শক সম্বতের মধ্যের পার্থক্যের দুইটী পরম্পরা দিচ্ছে যার একটী অনুসারে নির্বাণের পরে ৪৬১ বছর ব্যতীত হলে শক রাজা উৎপন্ন হন (তিলোয়পন্নত্তি, অধিকার ৪, গাথা ১৪৯৬, পৃঃ ৩৪০)। দ্বিতীয়টী অনুসারে নির্বাণের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে শক রাজার উদ্ভব হয়। (ঐ, গাথা ১৪৯৯, পৃঃ ৩৪১)। যে করেই হোক এতো স্পষ্ট যে শ্বেতাম্বর পরম্পরার বলমিত্র ভানুমিত্র দিগম্বর সম্প্রদায়ে বসুমিত্র অগ্নিমিত্র নামে অভিহিত হতে লাগলেন। তাঁরা শুঙ্গদের মধ্য ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যপাল (Governors) ছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গকুলোদ্ভূতও হতে পারেন। বিদিশায় যুবরাজ অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের রাজ্যপাল ছিলেন তা মহাকবি কালিদাস কৃত মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। পাঞ্চালে মিত্রনামান্ত অন্য রাজাদের মোহর পাওয়া গেছে। এভাবে বলমিত্র-ভানুমিত্রের উজ্জয়িনী বা লাট দেশের শাসক হবার কথা সম্ভাব্য বলেই মনে হয়।

পুষ্যমিত্রের সময় পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয় বলে বলা হয়। মহাভাষ্যের সূত্র ৩।২।১১ তে কাত্যায়ন বার্তিক 'পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞানে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে'র ওপর দুটি অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' ও 'অরুণদ্ যবনঃ মাধ্যমিকাম্।' বিদ্বানেরা এ বিষয়ে একমত যে এখানে যবন রাজা মীনাণ্ডারের ভারতীয় অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছে। বাসুদেব শরণ অগ্রওয়াল লিখছেন—'মীনাণ্ডার শাকল (স্যালকোট) অধিকার করে এক অভিযান সিন্ধু রাজপুতানার দিকে মাধ্যমিকা (চিতোড় এর সন্নিকটস্থ এক নগরী) লক্ষ্য করে করেছিলেন। ও'র দ্বিতীয় অভিযান পূবের দিকে ছিল। সেই অভিযানে তিনি মথুরা সাকেত৷ (অযোধ্যা) অধিকার করে পুষ্পপুর (পাটলীপুত্র) পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন গার্গী সংহিতার যুগ পুরাণ নামক অধ্যায়ে এই পূর্ব অভিযানের বিবরণাত্মক উল্লেখ আছে। এর এক নূতন প্রমাণ জৈনেন্দ্র ব্যাকারণ সূত্রে ২।২।৯২ র ওপরের অভয়নন্দীর মহাবৃত্তিতে কোনো প্রকারে সুরক্ষিত রয়ে গেছে—'পরোক্ষে লোকবিজ্ঞানে প্রযোক্তুঃ শক্যদর্শনত্বেন দর্শন বিষয়ত্বে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণন্মহেন্দ্রো মথুরাম্। অরুণদ্যবনঃ সাকেতম্।' 'মহেন্দ্র' আমার মতে ভুলপাঠ। শুদ্ধপাঠ 'মেনন্দ্র' হওয়া উচিত। অবশ্য এইটী মূল পাঠ ছিল যার অর্থ না জেনে পরবর্তী লেখকেরা 'মহেন্দ্র' করে দিয়েছে। বস্তুতঃ মীনাণ্ডারের লোক প্রসিদ্ধ নাম ছিল 'মেনন্দ্র'। ও'র অনেক মোহর পাওয়া গেছে যার একদিকে যবন লিপিতে ও'র নাম ও অন্য দিকে খরোষ্টী লিপিতে 'মেনন্দ্র' এই নাম লেখা রয়েছে।'[৮০]

---

৮০ ডাঃ বাসুদেব শরণ অগ্রওয়াল, 'মিলিন্দকে পূর্ব ভারত মেঁ অভিযান কা নয়া উল্লেখ'; রাজস্থান ভারতী, ভাগ ৩, সংখ্যা ৩-৪ (জুলাই ১৯৫৩), পৃঃ ৭১-৭২।

এ হতে এ স্পষ্ট যে গ্রীকেরা মধ্য ভারত অধিকার করেছিল। বলমিত্র ভানুমিত্র সমকালীন গ্রীক রাজকর্তা হতে পারেন। বৃহৎকল্প চূর্ণিতে উল্লেখ আছে যে উজ্জয়িনী নগরীতে অনিলসুত জব (যব? যবন?) নামক রাজা ছিলেন। ও'র পুত্র গর্দভ যুবরাজ ছিলেন। তিনি নিজের বোন 'অডোলিয়া'র রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে সহবাস করতে লাগলেন। রাজা এতে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে প্রব্রজিত হয়ে গেলেন। এই উল্লেখে 'অনিলসুতো নাম যবনো রাজা' এরূপ পাঠের কল্পনা শ্রীশান্তিলাল শাহর উপরোক্ত গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। 'অডোলিয়া' বিদেশী নাম। হতে পারে এই কামান্ধ গর্দভ সাধ্বী সরস্বতীর অপহরণ করেছিলেন। তিনি গ্রীক রাজকর্তা হতে পারেন, কিন্তু ও'র মুল নাম কি ছিল তা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। কহাবলীতে গর্দভ রাজার নাম দপ্পন—দর্পণ দেওয়া হয়েছে।

মথুরা মীনাণ্ডার কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চকল্পভাষ্য ও পঞ্চকল্পচূর্ণিতে আগের দেওয়া উল্লেখে আমরা দেখেছি যে সাতবাহন নরেশ আর্যকালককে জিজ্ঞাসা করছেন—মথুরার পতন হবে কিনা? এবং হলে কবে হবে? এর অর্থ এই যে মথুরা কারু দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল এবং এই অবরোধের পরিণাম সম্পর্কে সাতবাহন রাজার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিকই। এও হতে পারে যে সাতবাহন রাজা নিজে মথুরা অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন বা অবরুদ্ধ করতে চাইছিলেন কারণ বৃহৎকল্পভাষ্য ও চূর্ণিতে প্রতিষ্ঠানের সাতবাহন রাজার দণ্ডনায়ক উত্তর মথুরা ও দক্ষিণ মথুরা জয় করে নিয়ে ছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে। (বৃহৎকল্পসূত্র, বিভাগ ৬, গাথা ৬২৪৪-৪৯, পৃঃ ১৬৪৭-৪৯)। উজ্জয়িনী হতে গ্রীক (বিদেশী) রাজা যাকে গর্দভ বলা হত তাকে সরান হল। পরে মথুরা হতে গ্রীক অধিকার সরাবার জন্য কি সাতবাহন রাজা প্রযত্ন করলেন? বা এখানে সাতবাহনের প্রশ্নে খারবেলর হাথীগুম্ফা লেখের উদ্দিষ্ট মথুরা অভিযানের উল্লেখ কি করা হয়েছে?[৮১]

৮১ দ্রষ্টব্য ডাঃ বি. এম বড়ুয়া, 'হাথীগুম্ফা ইন্সক্রিপশন অব খারবেল', ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কুয়াটারলী, ভাগ ১৪, পৃঃ ৪৭। এই লেখ হতে জানা যায় যে খারবেল কোন সাতকর্ণ (সাতবাহন বংশ) রাজার সমকালীন ছিলেন। খারবেলর সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় বা প্রথম শতক। এ বিষয়ে ডাঃ বড়ুয়া পূর্ববর্তী সমস্ত বিদ্বানদের মতের এই নিবন্ধে ও গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁর গ্রন্থ পলিটিক্যাল হিষ্ট্রী অব এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ায় (খৃঃ ১৯৫৩-র সংস্করণ) ডাঃ বড়ুয়ার মতের আলোচনা করেছেন। আরো দ্রষ্টব্য 'দি ডেট অব খারবেল', জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটী (কলিকাতা), লেটার্স, ভাগ ১৯ (খৃঃ ১৯৫৩) নং ১, পৃঃ ২৫-৩২।

আমরা দেখেছি কালক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। ও'র সম্বন্ধ শকদের প্রথম আগমনের সঙ্গে। তিনি কোন সাতবাহন রাজার সমকালীন ছিলেন। বৃহদকল্পচূর্ণির উল্লেখে গর্দভের যবন হওয়া সম্ভব। যদিও জব শব্দ যবন—যব-জব এভাবে রূপান্তরিত হয়েছে বা যব জব হয়েছে ইত্যাদি অনিশ্চিত তবুও 'ওডোলিয়া' কোনো গ্রীক নামের রূপান্তর হওয়া সম্ভব। গর্দভরাজ (বা গর্দোভিল্লো) কি ভারতে গ্রীক রাজকর্তাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে ?

আমার মনে হয় এইটীই বেশী সম্ভব। গর্দভ ও গর্দভিল্ল অবশ্যই বিদেশী রাজকর্তা হবেন। এদের সরানো ভারতীয়দের নিকট কঠিন বলে মনে হয়েছিল। যবন গ্রীকদের ক্রূর স্বভাবের নির্দেশ আমরা গার্গী সংহিতার যুগপুরাণে পাই। এদের সরাবার জন্য আর্যকালক শকদের নিয়ে আসেন। যদি ভারতীয় রাজকর্তাকে সরাবার জন্য বিদেশী শকদের আনতেন তবে আর্যকালক দেশদ্রোহী হতেন। কালকের মত সমর্থ পণ্ডিত ও প্রভাবিক আচার্য তা হতে পারেন না। তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে গ্রীক রাজকর্তাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন ভারতীয় রাজাদের দ্বারা কিছু করানো সম্ভব নয়।

প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও বলা হয়নি যে শক পরাজিতকারী বিক্রমাদিত্য নিজে গর্দভ রাজার পুত্র ছিলেন। এই মান্যতা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। যখন কাল গণনায় গোলমাল দেখা গেল সেই সময়ে এই মান্যতা প্রচলিত হয়। কালকাচার্য কথানকেও যা প্রাচীন তাতে তা নেই। পূর্ববর্তী ৭২ পাদটীকায় আমি যে সব সাক্ষী উপস্থিত করেছি সেখানেও বিক্রমকে গর্দভের পুত্র বলা হয়নি। এ ভাবে গর্দভিল্লোচ্ছেদ ও বিক্রমের মধ্যে কম ব্যবধান ছিল বলা বা স্বীকার করার প্রয়োজন করে না। বাস্তবে ডাঃ জয়েসবালজীও সে কথা বলেন। তিনি গর্দোভিল্লোচ্ছেদ ঘটনার নির্দেশ করে লিখছেন :

'This event is placed before the Vikrama era but no time is specified as to how long after the occupation of Ujjain and Malava the first Saka dynasty came to an end. The Kathanaka expressly keeps it unspecified, as it says *kalantarena kenai.* (*ZDMG.*, 1880, p. 267 ; Konow, CII. II. p. xxvii)[৮২]

জয়েসবালজী এই গর্দোভিল্লোচ্ছেদের ঘটনাকে খৃঃ পূঃ ১০০-০১ এর বলেন।[৮৩]

---

৮২ ডাঃ জয়েসবাল, 'প্রবলেম্‌স অব শক –সাতবাহন হিস্ট্রী', জার্নাল অব বিহার এণ্ড ওড়িষ্যা রিসর্চ সোসাইটী, ভাগ ১৬ (খৃঃ ১৯৩০), পৃঃ ২৩৪।

৮৩ ঐ, পৃঃ ২৩৪ হতে।

রাজাদের কালগণনায় জৈন গ্রন্থেও কিছু গোলমাল ও অস্পষ্টতা রয়েছে। মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী (যাঁর মতে গর্দভিল্লোচ্ছেদক আর্যকালক দ্বিতীয় আর্যকালক ও যাঁর সময় বীরাব্দ ৪৫৩) এই ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন : 'ঘটনার কালক্রমে আমি গর্দভিল্লচ্ছেদক ঘটনা নির্বাণ সম্বৎ ৪৫৩ বলেছি। কিন্তু তাতে শঙ্কা হতে পারে যে এই ঘটনার সময়ে যদি বলমিত্র-ভানুমিত্র বিদ্যমান ছিলেন যেমন কহাবলী আদি গ্রন্থ হতে জ্ঞাত হওয়া যায় তবে এই ঘটনার ঐ সময় কিভাবে নির্দেশ হতে পারে ? কারণ মেরুতুঙ্গ সূরির বিচার শ্রেণী আদি প্রচলিত জৈন গণনা অনুসারে বলমিত্র ভানুমিত্রের শাসনকাল বীর নির্বাণের ৩৫৪-৯১৩ পর্যন্ত। এই অবস্থায় এ কথা বলা উচিত যে গর্দভিল্লোচ্ছেদের ঘটনার ঐ সময় (৪৫৩) ঠিক নয়, আর যদি ঠিক হয় তবে বলতে হয় বলমিত্র-ভানুমিত্রের উক্ত সময় ভুল। আর যদি উপরোক্ত দুই সময়ই ঠিক স্বীকার করা যায় তাহলে শেষে একথা স্বীকার করতে হয় যে গর্দভিল্ল ঘটনার সময় বলমিত্র-ভানুমিত্র বিদ্যমান ছিলেন না।'

মুনিজী আগে লিখছেন : 'গর্দভিল্লো ঘটনার সময় ভুল বলার আমি কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। বলমিত্র ভানুমিত্র আর্যকালকের ভাগনে ছিলেন তা সুপ্রসিদ্ধ। তাই কালকের সময়ে এদের বর্তমানতা স্বীকার করাও অনিবার্য। এখন বলমিত্র ভানুমিত্রের সময়ের কথা—তা আমার মতে তাঁদের সময় ৩৫৪-৪১৩ নয় ৪১৪ হতে ৪৭৩ পর্যন্ত। মৌর্যকাল হতে ৫২ বছর বাদ পড়ায় ১৬০ এর স্থানে কেবল ১০৮ বছরই প্রচলিত গণনায় নেওয়া হয়েছে। তাই একসঙ্গে ৫২ বছর কম হওয়ায় বলমিত্র আদির সময় অসঙ্গত হয়ে গেছে। আমি মৌর্য রাজ্যকাল ১৬০ বছর স্বীকার করে এই পদ্ধতিতে যে সংশোধন করেছি[৮৪] সে অনুসারে কালকাচার্য ও বলমিত্রর সময়ে কোন বিরোধ আর থাকে না।[৮৫] মুনিশ্রীর এই সমীক্ষা শঙ্কার আরো বৃদ্ধি করে কারণ গর্দভিল্লোচ্ছেদের ঘটনাকে যখন হতে বীরাব্দ ৪৫৩ স্বীকার করা হয় তখন হতে কালগণনায় গোলমাল সুরু হয়। ডাঃ ব্রাউন দ্বিতীয় কালক সম্বন্ধে লিখছেন :

৮৪ এর জন্য দ্রষ্টব্য মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী কৃত বীর নির্বাণ সম্বৎ ঔর জৈন কাল গণনা।

৮৫ মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী, 'আর্য কালক', দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ১১৬। মুনিশ্রীর কথনানুসারে নি. স, ৪৫৩ তে গর্দভিল্লকে সরিয়ে (খৃঃ পূঃ ৭৪) শকরাজা উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও চার বছর পর নি. স. ৪৫৭ তে (খৃঃ পূঃ ৭০) বলমিত্র তাকে সরিয়ে উজ্জয়িনী অধিকার করে নেন। বলমিত্র ভানুমিত্রের রাজ্যের অবসান নি. স. ৪৬৫ (খৃঃ পূঃ ৬২) তে হয়। ঐ, পৃঃ ১১৭ পাদটীকা ১।

'Most versions make him the disciple or Gunakara (=the Sthavira Gunasundara), but this must be an error; for on chronological grounds if must have been Kalaka I who was Gunakara's disciple.'[৮৬]

এ হতে ত এ কথা স্বীকার করাই অধিক ঠিক হবে যে কথানকের কালক প্রথম আর্যকালক। ডাঃ ব্রাউন আগে লিখছেন ঃ

'The *Kalpadruma* and Samayasundara add an alternative tradition stating that Kalaka II was the maternal uncle of the Kings Balamitra and Bhanumitra of Jain tradition, thus agreeing with a few versions of the Kalakacaryakatha, althouh most of them identify the Kalaka who was the uncle of those kings with the Kalaka who changed the date of the *paryusana*......The year of Kalaka II is by all authorities said to be 453 of the Vira era, in which year it is specifically stated in a stanza appended to three Mss. of Dharmaprabha's version that he took Sarasvati. Possibly the statement is slightly inaccurate and the date refers to his accession to the position of Suri, just in other stanzas appended to Mss. of the same version the year 335, which is the date of accession to the position of Suri, is mentioned as that of Kalaka I. Dharmasagara Ganin assigns the deeds of Kalak II to Kalaka I.[৮৭]

আগেই বলেছি যে কথানকে কালকের সময় নির্দেশ করা নাই। কোনো ভাষ্য বা চূর্ণীতেও নয়। বলমিত্র ভানুমিত্র ও পর্যুষণ তিথি সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মপ্রভর রচনা সং ১৩৯৮তে হয়। মূল রচনায় গর্দভিল্লোচ্ছেদক কালক বীরাব্দ ৪৫৩তে হন তা নেই। মূলে ঃ

৮৬। ব্রাউন, দি ষ্টোরী অব কালক, পৃঃ ৬।

৮৭। ঐ, পৃঃ ৬, ৭-১২।

অহ তে সগ ত্তি খায়া তব্বংসং ছংদিউণ পুণ কালে ।
জাও বিক্কমরাও পুহবী জেণুরণী বিহিয়া ॥ ৩১

মাত্র এটুকু থাকায় বিক্রম ও কালকের মধ্যের ব্যবধান কাল অস্পষ্ট। ডাঃ ব্রাউনের তৃতীয় কালকের কল্পনা ঠিক নয়। মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী তৃতীয় কালক বিষয়ে যথোচিত অভিমত দিয়েছেন। বিস্তার ভয়ে আমি সে আলোচনা পরিত্যাগ করছি।

[ক্রমশঃ

ভক্তামর স্তোত্র

মানতুঙ্গ স্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

বক্তং ক্ব তে সুরনরোরগনেত্রহারি
নিঃশেষ নির্জিতজগৎত্রিতয়োপমানম্ ।
বিম্ব কলংকমলিনং ক্ব নিশাকরস্য
যদ্বাসরে ভবতি পাণ্ডুপলাশকল্পম্ ॥ ১৩

কোথায় সুরনরউরগনেত্রহারী ও ত্রিজগতের সমস্ত উপমাকে পরাভূতকারী তোমার মুখমণ্ডল আর কোথায় কলঙ্কমলিন চন্দ্রবিম্ব যা সূর্যের প্রকাশে পলাশপত্রের মত পাণ্ডুর হয়ে যায় । ১৩

সম্পূর্ণমণ্ডলশশাংককলাকলাপ
শুভ্রা গুণাস্ত্রিভুবনং তব লংঘয়ংন্তি ।
যে সংশ্রিতাস্ত্রিজগদীশ্বরনাথমেকং
কস্তান্নিবারয়তি সংচরতো যথেষ্টম্ ॥ ১৪

হে ত্রিলোকেশ্বর, পূর্ণকলা পূর্ণিমার চন্দ্রকৌমুদীর মত তোমার উজ্বল গুণরাশি ত্রিজগতকে ছাপিয়ে যাচ্ছে । যে গুণ এক এবং অদ্বিতীয় তোমাকে আশ্রয় করে আছে তাদের ইচ্ছামত বিচরণ হতে কে নিবারণ করতে পারে ? ১৪

চিত্রং কিমত্র যদি তে ত্রিদশাংগ নাভির্নীতং
মনাগপি মনোং ন বিকারমার্গম্ ।
কল্পান্তকালমরুতা চলিতাচলেন
কিং মংদরাদ্রিশিখরং চলিতং কদাচিৎ ॥ ১৫

হে দেব, দেবাঙ্গনাদের দেখেও তোমার মন যদি কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত না হয়ে থাকে তবে তাতেই বা আশ্চর্যের কি আছে ! কারণ প্রলয়কালীন ঝাতা অন্যান্য পর্বত শিখরকে চালিত করতে সমর্থ হলেও কি মেরু শিখরকে চালিত করতে সমর্থ হয় ? ১৫

নির্ধূমবর্তিরপবর্জিত তৈলপূরঃ
কৃৎস্নং জগৎত্রয়মিদং প্রকটীকরোষি ।
গম্যো ন জাতু মরুতাং চলিতাচলানাং
দীপোঽপরস্ত্বমসি নাথ জগৎপ্রকাশঃ ॥ ১৬

হে নাথ ! তুমি ত্রিজগৎ প্রকাশক এমন একটী দীপ যা নির্ধূম—যাতে না বর্তিকা আছে, না তৈল ও যাকে পর্বত চালিত কারী পবনও একটুও বিচলিত করতে পারে না। ১৬

নাস্তং কদাচিদুপয়াসি ন রাহুগম্যঃ
স্পষ্টীকরোষি সহসা যুগপজ্জগংতি।
নাংভোধরোদরনিরুদ্ধমহাপ্রভাবঃ
সূর্যাতিশায়িমহিমাসি মুনীন্দ্র লোকে॥ ১৭

তুমি কখনো অস্তগত হও না, না তোমাকে রাহু গ্রাস করতে পারে, না তোমার প্রভাব মেঘেই আচ্ছাদিত হয়। তুমি এক সময়ে ত্রিজগৎকে সহজেই প্রকাশিত কর। এভাবে হে মুনীন্দ্র, তুমি লোকে সূর্যমহিমাকে ম্লানকারী মহিমা ধারণ কর। ১৭

নিত্যোদয়ং দলিতমোহমহান্ধকারং
গম্যং ন রাহুবদনস্য ন বারিদানাং।
বিভ্রাজতে তব মুখাব্জমনল্পকান্তি
বিদ্যোতয়জ্জগদপূর্বশশাংকবিম্ব॥ ১৮

যেহেতু অস্ত নাই সেইজন্য নিত্য উদিত, মোহরূপ মহান্ধকারকে নষ্টকারী, রাহু যাকে গ্রাস করতে পারে না বা মেঘ আবৃত এবং যা জগৎকে প্রকাশিত করে হে ভগবন্, এরূপ যে তোমার মুখারবিন্দ তা অপূর্ব চন্দ্রবিম্বের মত শোভিত। ১৮

কিং শর্বরীষু শশিনাহ্নি বিবস্বতা বা
যুষ্মন্মুখেন্দুদলিতেষু তমঃসু নাথ।
নিষ্পন্ন শালি বনশালিনী জীবলোকে
কার্যং কিয়জ্জলধরৈর্জলভার নম্রৈঃ॥ ১৯

হে নাথ, তোমার মুখরূপ চন্দ্রমায় যখন অন্ধকার দূর হয়ে যায় তখন রাত্রে চন্দ্রমার কি প্রয়োজন বা দিবসে সূর্যের ? কারণ যখন জীব লোকে ধানের শীষ পরিপক্কতা লাভ করে তখন জলভার নম্র মেঘের আর প্রয়োজন থাকে না। ১৯

জ্ঞানং যথা ত্বয়ি বিভাতি কৃতাবকাশং
নৈব তথা হরিহরাদিষু নায়কেষু।
তেজঃ স্ফুরন্মণিষু যাতি যথা মহত্বং
নৈবংতু কাচ শকলে কিরণা কুলেঽপি॥ ২০

হে নাথ, অনন্ত পর্যায়াত্মক পদার্থের প্রকাশকারী কেবলজ্ঞান তোমাতে যেমন শোভা দেয়, হরিহরাদিরূপ দেবতায় তা দেয় না। স্ফুরিত মণি দীপ্তিতে যে মহিমা প্রকটিত হয়, সেই মহিমা কি চকমক করা সত্বেও কাঁচের টুকরোয় প্রকটিত হয় ? ২০

মন্যে বরং হরিহরাদয় এব দৃষ্টা
দৃষ্টেষু যেষু হৃদয়ং ত্বয়ি তোষমেতি ।
কিং বীক্ষিতেন ভবতা ভুবিযেন নান্যঃ
কশ্চিন্মনো হরতি নাথ ভবান্তরেঽপি ॥ ২১

হরিহরাদির দর্শনও আমি ভাল মনে করি কারণ তাঁদের দেখেছি বলেই না তোমাতে মন সন্তোষ লাভ করেছে। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আর অন্য কোনো দেবতাই জন্মান্তরেও মন হরণ করতে সমর্থ নয়। ২১

স্ত্রীণাং শতানি শতশো জনয়ন্তি পুত্রান্
নান্যা সুতং ত্বদুপমং জননী প্রসূতা ।
সর্বা দিশো দধতি ভানি সহস্ররশ্মিং
প্রাচ্যেব দিগ্‌জনয়তি স্ফুরদংশুজালম্ ॥ ২২

হাজার হাজার জননী হাজার হাজার পুত্রের জন্ম দেয়, কিন্তু অন্য জননীর পক্ষে সম্ভব ছিল না তোমার মত পুত্র প্রসব করা। কারণ সমস্ত দিক নক্ষত্রকে ধারণ করে কিন্তু দেদীপ্যমান সহস্ররশ্মিকে প্রসব করতে পারে একমাত্র পূর্ব দিকই। ২২

ত্বামামনন্তি মুনয়ঃ পরমং পুমাংস-
মাদিত্যবর্ণমমলং তমসঃ পুরস্তাৎ ।
ত্বামেব সম্যগুপলভ্য জয়ন্তি মৃত্যুং
নান্যঃ শিবঃ শিবপদস্য মুনীন্দ্র পন্থাঃ ॥ ২৩

হে মুনীন্দ্র, মুনিগণ তোমাকে পরম পুরুষ, তিমির বিদার আদিত্যরূপ ও নির্মল বলেন। তাঁরা তোমাকেই উত্তমরূপে প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুকে জয় করেন। এজন্য তোমার অতিরিক্ত মোক্ষপদপ্রাপ্তির অন্য কোনো কল্যাণকারী পথ আর নেই। ২৩

ত্বামব্যয়ং বিভুমচিন্ত্যমসংখ্যমাদ্যং
ব্রহ্মাণমীশ্বরমনন্তমনঙ্গকেতুম্ ।
যোগীশ্বরং বিদিতযোগমনেকমেকং
জ্ঞানস্বরূপমমলং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ২৪

হে প্রভু, সন্তগণ তোমাকে অব্যয়, বিভু, অচিন্ত্য, অসংখ্য, আদি, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, অনন্ত, অনংগকেতু, যোগীশ্বর, যোগবেত্তা, অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ও অমল বলে অভিহিত করেন। ২৪

[ক্রমশঃ

কুমার পাল দেব

[গুজরাত কাহিনী]

[পূর্বানুবৃত্তি]

যাঁরা তাঁর দুর্দিনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন কুমার পাল তাঁদের কথা বিস্মৃত হন নি। তাই তিনি তাঁর স্ত্রী ভোপালদেকে প্রধানা মহিষী করলেন। চাষী ভীম সিংহকে নিজের অঙ্গ রক্ষকের প্রধান। গ্রাম্য বধূ শ্রীদেবীর হাতে রাজ্যাভিষেকের তিলক পরলেন ও তাকে ঢোলক গ্রাম পুরস্কার দিলেন। সজ্জনকে সাত গ্রামের সুবেদার নিযুক্ত করলেন। উদায়নকে বৃদ্ধ প্রধান ও উদায়ন পুত্র বাগভট্টকে মহামাত্যের পদ দিলেন। হেমচন্দ্রাচার্য কুমার পালের গুরু হলেন।

কুমার পাল সহজেই রাজ্য লাভ করলেও প্রথম হতেই তাঁকে বিরুদ্ধাচারীদেরও সম্মুখীন হতে হয়। পৌঢ়াবস্থায় রাজ্য লাভ করার জন্য হোক বা বিদেশ পর্যটন জাত অভিজ্ঞতার জন্য তিনি অন্যের ওপর নির্ভর না করে স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন। রাজ কর্মচারীদের তা ভালো লাগল না। তারা কুমার পালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল ও এক ঘাতককে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। ভাগ্য ক্রমে কুমার পাল ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন ও ষড়যন্ত্রকারীদের সকলকে হত্যা করেন।

ভগ্নীপতি কাহ্নড় দেবের সহায়তায় কুমার পাল গুজরাতের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। কাহ্নড় দেব তাই কুমার পালকে অনুকম্পার চোখে দেখতেন ও তাঁর পূর্ব জীবনের দুর্দশার গল্প ফলিয়ে ফলিয়ে সর্বত্র বলে বেড়াতেন। এতে সকলের উপহাসের পাত্র হচ্ছেন দেখে তাঁর পূর্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করে কুমার পাল তাঁকে ডেকে এরূপ করা হতে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু কাহ্নড় দেব নিবৃত্ত হওয়াত দূরের, পামর অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলে জনসমক্ষে তাঁর কুৎসা করতে আরম্ভ করলেন। কুমার পাল তখন বাধ্য হয়ে মল্লদের দিয়ে তাঁর অঙ্গভঙ্গ ও চক্ষু উৎপাটিত করে স্ব আবাসে পাঠিয়ে দিলেন।

কুমার পালের কিন্তু এইখানেই বিপত্তির শেষ হল না। যে উদায়ন পুত্র বাহড়কে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ মৃত্যু শয্যায় দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করেছিলেন সে গুজরাত পরিত্যাগ করে সপাদলক্ষীয় রাজার নিকট চলে গেল ও সপাদলক্ষীয় রাজাকে বুঝিয়ে প্রচুর অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সৈন্য বাহিনী

নিয়ে গুজরাত রাজ্য আক্রমণ করল। বাধ্য হয়ে কুমার পালকেও যুদ্ধযাত্রা করতে হল।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে আক্রমণের সময় যখন কুমার পাল দেখলেন যে তাঁর সামন্তেরা তাঁর আদেশ পালন করছে না তখন বুঝতে পারলেন যে এ যুদ্ধ তাঁকে একাকীই করতে হবে। তিনি তখন তাঁর মাহুতকে তাঁর হাতীকে সপাদলক্ষীয় রাজার হাতীর নিকট নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু মাহুতও যখন তাঁর আজ্ঞার প্রতিপালন করল না তখন তিনি বললেন, তুমিও কি বাহড়ের উৎকোচ গ্রহণ করেছ? মাহুত বলল, না মহারাজ, কলহ পঞ্চানন হাতী ও সামল মাহুত কল্পান্তেও উৎকোচ গ্রহণ করবে না। কিন্তু সপাদলক্ষীয় রাজার নিকটবর্তী বাহড় এমন চীৎকার করছে যে হাতী সেদিকে যেতে চাইছে না। সে কথা শুনে কুমার পাল নিজের গায়ের চাদর দিয়ে হাতীর কান আচ্ছাদিত করে দিলেন। সামল তখন কলহ পঞ্চানন হাতীকে সপাদলক্ষীয় রাজার হাতীর নিকটবর্তী করল। বাহড় চউলিগ নামক যে রাজ মাহুতকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছিল সেই মাহুতই এই হাতীকে নিয়ে এসেছে ভেবে নিজের হাতীর পিঠ হতে লাফ দিয়ে এই হাতীর পিঠে আসবার উপক্রম করতেই সামল হাতীকে একটু পিছিয়ে নিতেই বাহড় মাটিতে পড়ে গেল ও কুমার পালের দেহরক্ষী সৈন্যদের দ্বারা ধৃত হল। কুমার পালও তখন সহসা সপাদলক্ষীয় রাজার সম্মুখবর্তী হয়ে হাতীরার তোলো বলে তাঁর ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। কুমার পালের বাণে আহত হয়ে সপাদলক্ষীয় রাজা হাতীর পিঠে ঢলে পড়লেন। কুমারপাল তখন জিতে নিয়েছি জিতে নিয়েছি বলে তাঁর হাতীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদিক হতে ওদিকে ঘোরাতে লাগলেন। নেতৃবিহীন সপাদলক্ষীয় সৈন্যরা পলায়ন করল।

সামন্তরা যখন দেখল যে কুমার পালের সঙ্গে কেউই পেরে উঠছে না তখন তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। কুমার পাল নিজেও খুব সাহসী ছিলেন। যুদ্ধে আজমীড়ের অর্ণোরাজকে তিনি পরাস্ত করেন। মালবের বল্লালদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। কঙ্কণের মল্লিকার্জুনকে পরাস্ত করেন। সোরঠের সমর সিংহও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। এ ভাবে ১৮টী দেশের ওপর তিনি তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজ্য সীমা উত্তরে পাঞ্জাব, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূবে গঙ্গা ও পশ্চিমে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বলতে কি গুজরাতের রাজ্য সীমা আর কোন রাজার সময়ই এতদূর বিস্তৃত হয়নি।

কুমার পালের সঙ্গে হেমচন্দ্রাচার্যের সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। হেমচন্দ্রের জন্য কুমার পালের প্রাসাদ অবারিত দ্বার। কুমার পালও তাঁর কথার সম্মান করেন। কোন বিষয়ে পরামর্শ করার থাকলে তিনি রাজপুরোহিতের সঙ্গে না করে হেমচন্দ্রাচার্যের সঙ্গে করেন। এতটা বাড়াবাড়ি রাজপুরোহিত আকিযাগের ভাল

লাগে না। একবার তিনি হেমচন্দ্রাচার্যের সামনেই কুমার পালকে বলে ফেললেন, মহারাজ একবার এ'র দম্ভত দেখুন—শাস্ত্রে আছে বিশ্বামিত্র পরাশর আদি ঋষিরা য'ারা ফল পাতা খেয়ে থাকতেন তাঁরাও সুন্দরী স্ত্রী দেখলে কামের বশীভূত হতেন আর এ'রা ঘী দুধ দই খেয়ে কী করে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করবেন ?

হেমচন্দ্রাচার্য সে কথা শুনে বললেন, এতে আশ্চর্যে'র কী আছে ? যে সিংহ মাংসাদি ভক্ষণ করে শোনা যায় সে বছরে একবার মাত্র কাম পরবশ হয় কিন্তু কর্কশ শিলাকন ভোজি পারাবাত প্রতিনিয়ত কামী হয়ে থাকে।

পুরোহিত নিরুত্তর হওয়ায়, অন্য একজন বলে উঠল, মহারাজ, এ'রা সূর্যকে মানেন না।

হেমচন্দ্রাচার্য সে কথা শুনে তার প্রত্যুত্তব দিলেন, লোকধারণকারী সূর্যকে মহারাজ, আমরাই হৃদয়ে ধারণ করি কারণ তিনি অস্ত গমন রূপ সংকটের সম্মুখীন হলে আমরাই একমাত্র অন্ন জল পরিত্যাগ করি।

অন্য একদিনের ঘটনা। তাঁর আসন পাতবার আগে হেমচন্দ্রাচার্য সেই স্থানটীকে রজোহরণ দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। তা দেখে কুমার পাল তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হেমচন্দ্র বললেন, যদি এখানে কোনো জীব থেকে থাকে তাই স্থানটীকে পরিষ্কার করে নিলাম। কুমারপাল বললেন যদি প্রত্যক্ষ কোনো জীব দেখা যায় তবে তা উচিতই কিন্তু অন্যথা বৃথা প্রয়াস মাত্র। প্রত্যুত্তরে আচার্য বললেন, মহারাজ আপনি যে চতুরঙ্গিনী সেনা প্রস্তুত করেন তা শত্রু দৃষ্ট হলে না তার পূর্বে। তা যেমন রাজ ব্যবহার এও সেই রকম ধর্ম ব্যবহার।

একবার কুমার পাল আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি এমন কিছু করে যেতে চান যাতে তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়। হেমচন্দ্রাচার্য প্রত্যুত্তর দিলেন, তা সম্ভব যদি আপনি বিক্রমাদিত্যের মত সংসারকে অঋণী করে যান বা সোমেশ্বরের কাষ্ঠময় মন্দির যা সমুদ্রের জলে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে আছে তার স্থানে প্রস্তরময় প্রাসাদ নির্মাণ করান।

কুমার পাল হেমচন্দ্রাচার্যে'র কথা মত সোমেশ্বরের প্রস্তরময় প্রাসাদ নির্মাণ করানোই স্থির করলেন ও বললেন এ কাজ কি ভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। হেমচন্দ্রাচার্য একটু ভেবে প্রত্যুত্তর দিলেন, মহারাজ, একাজ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার জন্য আপনাকে এ দুটীর যে কোনো একটী নিয়ম পালন করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না মন্দিরের নির্মাণ হয় ততদিন হয় আপনি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করুন, নয়ত মদ্য মাংস পরিহার করুন। কুমার পাল মদ্যমাংস পরিহার করার ব্রত গ্রহণ করলেন। দু'বছর পর যখন মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হল তখন কুমার পাল গুরুর নিকট ব্রত মুক্তির প্রার্থনা করলেন। হেমচন্দ্রাচার্য তখন বললেন, আপনি যদি ভগবান চন্দ্রচূড়ের দর্শন করতে চান তবে সোমেশ্বরের যাত্রা করবার পরই সে ব্রত ভঙ্গ করবেন।

আগেই বলেছি কুমারপালের রাজসভায় রাজ পুরোহিত সহ হেমচন্দ্রাচার্যের বিরোধীও কম ছিলনা। হেমচন্দ্রাচার্যের অভ্যুদয়ে ঈর্ষ্যাবশতঃ তারা কুমারপালকে গিয়ে বলল, মহারাজ, এই জৈন যতি বড্‌ড চালাক। কেবল আপনার হাঁতে হাঁ দেন, তা যদি না হয় তবে কাল সকালে যখন তিনি আসবেন তখন তাঁকে আপনার সঙ্গে সোমেশ্বর যাত্রার জন্য বলবেন। পরধর্মতীর্থ পরিহার করবার জন্য তিনি কখনো আপনার সঙ্গে যাবেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে হেমচন্দ্রাচার্য এলে কুমারপাল সেকথাই নিবেদন করলেন। হেমচন্দ্রাচার্য সে কথা শুনে বললেন, বুভুক্ষিতের জন্য নিমন্ত্রণের যেমন প্রয়োজন করেনা তেমনি তপস্বীদের তীর্থযাত্রা করার জন্য রাজার আগ্রহের প্রয়োজন করেনা। এভাবে হেমচন্দ্রাচার্য সোমেশ্বরের তীর্থযাত্রা করতে সম্মত হলে কুমারপাল বললেন, আপনার জন্য পালকী আদির বন্দোবস্ত করি। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্রাচার্য বললেন, মহারাজ আমরা পেয়ে হেঁটে পুণ্যার্জন করি। তাই অল্পঅল্প দূর হেঁটে শত্রুঞ্জয়, উজ্জয়ন্ত (গির্ণার) আদি তীর্থের দর্শন করতে করতে আপনার সঙ্গে পত্তনে গিয়ে মিলিত হব। এইবলে হেমচন্দ্রাচার্য অণহিল্লপুর হতে বিহার করলেন ও তীর্থাদি দর্শন করতে করতে ঠিক সময়ে পত্তনে কুমারপালের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বিরুদ্ধবাদীরা তখন রাজাকে বললেন, হেমচন্দ্রাচার্য পত্তনে এলেও নিশ্চয়ই সোমেশ্বরের পূজা করবেন না। তাই আপনি তাঁকে পূজোর জন্য বলুন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রাচার্যকে সেকথা বললে, তিনি তা স্বীকার করে নিয়ে শিবপুরাণোক্ত দীক্ষা-বিধি অনুসারে আহ্বান অবগুণ্ঠন, মুদ্রা, মন্ত্রন্যাস, বিসর্জন আদি পঞ্চোপচার বিধিতে শিবপূজা করে এই স্তোত্রপাঠ করলেন ঃ

যে কোন ধর্মমতে, যে কোন নামে তুমি যে কেউ হও না কেন, কিন্তু দোষ ও পাপ রহিত তুমি একই। এজন্য হে ভগবন্ আমি তোমাকে নমস্কার করি।

পুনর্জন্মরূপ অঙ্কুর উৎপাদনকারী রাগ আদি যাঁর নষ্ট হয়ে গেছে তিনি ব্রহ্মাই হন, বিষ্ণু বা শিব তাঁকে আমি নমস্কার করি।

হেমচন্দ্রাচার্য কেবল পূজা ও স্তব পাঠ করলেন তাই নয় সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে সোমেশ্বরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

হেমচন্দ্রাচার্যের পর কুমারপাল সোমেশ্বরের পূজা করলেন। তারপর ধর্মশীলায় বসে তুলাপুরুষদান গজদান আদি মহাদান দিয়ে কর্পূর দিয়ে শিবের আরতি করলেন। তারপর সকলকে সরিয়ে দিয়ে তিনি হেমচন্দ্রাচার্যকে নিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন। তারপর আচার্যকে বললেন, মহাদেবের সমান দেবতা নেই। আমার সমান রাজা ও আপনার সমান মহর্ষি। ভাগ্যবশে এ তিনের সংযোগ হয়েছে। তাই নানা

দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণে যে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে চিত্ত সংদিগ্ধ সেই মুক্তি দায়ক সত্য দেবতার বাস্তবিক স্বরূপ কি এই তীর্থ ক্ষেত্রে তা আপনি আমাকে বলুন। সেকথা শুনে হেমচন্দ্রাচার্য খানিক ভেবে বললেন, মহারাজ দর্শনের পুরুনো কথা ছাড়ুন আমি শ্রীসোমেশ্বর দেবকে আপনার প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছি। ওঁর মুখেই মুক্তিমার্গ কী তা শুনুন। শুনে কুমারপাল বললেন, তাও কি সম্ভব? হেমচন্দ্রাচার্য বললেন, নিশ্চয়ই সম্ভব কারণ অপ্রত্যক্ষভাবে এখানে যখন দেবতা বর্তমান তখন তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হবেন। আমি ধ্যান করি আর আপনি এই কৃষ্ণ অগরু আগুণে নিক্ষেপ করতে থাকুন যতক্ষণ না শ্রীসোমেশ্বরদেব আবির্ভূত হন। কুমারপাল আচার্যের আদেশমত কৃষ্ণ অগরু আগুনে নিক্ষেপ করতে থাকলেন। এবং যখন ধূপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল ঘীয়ের প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিভে গেল তখন কুমারপাল দ্বাদশ সূর্যের তেজ প্রসারিত হতে দেখলেন। তারপর তিনি শ্রেষ্ঠ সুবর্ণের মত দ্যুতিময় চক্ষুর দ্বারা দুরালোক্য অপরূপ রূপ সম্পন্ন জটাজুটধারী এক তপস্বীকে দেখতে পেলেন। কুমারপাল মাটীতে লুটিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। বললেন, ভগবন্, আপনার দর্শন করে চোখ কৃতার্থ হয়েছে। এখন আদেশ দিয়ে কর্ণ যুগল কৃতার্থ করুন। তখন সেই দ্যুতিমান তপস্বীর মুখ হতে এই বাণী নির্গত হল—রাজন্, এই মহর্ষি সমস্ত দেবতার অবতার। পূর্ণ পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়ায় ত্রিকালের স্বরূপ ইনি জানেন। এঁর কথিত মুক্তিমার্গ অসন্দিগ্ধরূপে মুক্তিমার্গ। এই বলে সেই দিব্য তপস্বী অন্তর্হিত হলেন। হেমচন্দ্রাচার্যও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে যেই রাজন্ বলে কুমারপালকে সম্বোধন করলেন ওমনি তিনি রাজ্যাভিমান পরিত্যাগ করে, গুরুদেব আদেশ করুন বলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। সেইসময় হেমচন্দ্রাচার্য কুমারপালক যাবজ্জীবন মদ্যমাংস পরিত্যাগের নিয়ম দিলেন। তারপর তাঁরা দুজনে অণহিল্লপুরে ফিরে এলেন।

কুমারপাল এখন হেমচন্দ্রাচার্যের শিষ্য হয়ে পরম আর্হত হলেন। তিনি নিজে মদ্যমাংস পরিত্যাগ করলেন তাই নয়, তাঁর শাসিত ১৮টী রাজ্যে জীব হত্যা না করার আদেশ দিলেন। যারা পুত্রহীন অবস্থায় মারা যেত তাদের সম্পত্তি রাজা গ্রহণ করতেন। হেমচন্দ্রাচার্যের আদেশে কুমারপাল বিধবার সম্পত্তি গ্রহণ বন্ধ করে দিলেন। বলা হয় তিনি ১৪০০ জৈনমন্দির নির্মাণ করান ও ১৬০০ জৈন মন্দিরের জীর্ণদ্ধার। ২১টী জ্ঞানভাণ্ডারের স্থাপনা করেন ও ৭ বার তীর্থযাত্রা। বস্তুতঃ তাঁর শাসনে দেশে সমৃদ্ধির অন্ত ছিলনা। তাঁর জীবনও ছিল পবিত্র। তাই তিনি লোকে রাজর্ষি বলে অভিহিত হতে লাগলেন।

তিরিশ বছর কুমারপাল রাজ্য করেন। হেমচন্দ্রাচার্যের মৃত্যু তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে হয়। সেই শোক কুমারপালের সহ্য হয়না তাই আচার্যের মৃত্যুর কিছু পরেই ৮১ বছর বয়সে তিনিও পরলোক গমন করেন।

আচার্য হেমচন্দ্র সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দ্বারা সম্মানিত হয়ে ছিলেন। সিদ্ধরাজের অনুরোধে তিনি সিদ্ধহেম ব্যাকরণ রচনা করেন। কুমারপালের তিনি গুরু ছিলেন। কুমারপালের জন্য তিনি যোগশাস্ত্র রচনা করেন। এছাড়া তিনি কাব্য, পুরাণ, অভিধান, অলঙ্কার, ন্যায় ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে কত যে গ্রন্থ রচনা করেন তার ইয়ত্তা নাই। এ জন্য তাঁকে কলিকাল সর্বজ্ঞ বলে অভিহিত করা হত। বাস্তবেও তিনি তাই ছিলেন।

জৈন কথা

হরিসত্য ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

লব্ধি—কোনও বস্তুকে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনও বিষয়ের সাহায্যে নির্দেশ করার নাম লব্ধি।

ভাবনা—কোনও বিষয়কে পূর্বাবধারিত কোন বিষয়ের স্বরূপ, প্রকৃতি বা ক্রিয়ার সাহায্যে নির্দেশ করিবার প্রয়াস করার নাম ভাবনা। ভাবনা বিষয় ব্যাখ্যানের উচ্চতর প্রণালী। ইহা পদার্থ ও তৎ সম্বন্ধে পঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিচার করিয়া নির্ণেয় পদার্থ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হয়।

উপযোগ—ভাবনা প্রয়োগের দ্বারা পদার্থের স্বরূপ নির্দেশ উপযোগ।

নয়—ভারতীয় দর্শন সমূহের মধ্যে নয়-বিচার জৈন দর্শনের একটি বিশিষ্টত্ব। পদার্থের সম্পূর্ণতার দিকে ততটা মনঃ সংযোগ না করিয়া কোনও একটা বিশিষ্ট ভাবের দিক দিয়া বিষয়ের প্রকৃতি নিরূপণ করাই 'নয়'। দ্রব্যার্থিক পর্যায়ার্থিক ভেদে নয় প্রথমতঃ দুই প্রকার। দ্রব্য দ্রব্যার্থিকনয়ের ও পর্যায় পর্যায়ার্থিক নয়ের বিষয়। দ্রব্যার্থিক নয় নৈগম, সংগ্রহ ও ব্যবহার ভেদে তিন প্রকার এবং ঋজুসূত্র, শব্দ, সমভিরূঢ় ও এবংভূত ভেদে পর্যায়ার্থক নয় চারি প্রকার।

নৈগম—বস্তুকে স্বরূপতঃ বিবেচনা না করিয়া কোনও বাহ্য বিষয়ের সম্পর্কে বিচার করাই নৈগম। কাষ্ঠ, জল, অগ্নি ও অন্যান্য উপকরণবাহী কোনও মনুষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে 'তুমি কি করিতেছ?' তাহা হইলে সে উত্তর করে 'অন্ন রন্ধন করিতেছি।' এই উত্তর নৈগম নয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এস্থলে বাহিত কাষ্ঠ, জল, অগ্নি ও অন্যান্য উপকরণাদি স্বরূপতঃ নির্দিষ্ট না হইয়া তাহারা যে উদ্দেশ্যে বাহিত হইতেছে, সেই উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে।

সংগ্রহ—বস্তুর বিশেষ ভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে ভাব সম্বন্ধে ঐ বস্তু তজ্জাতীয় অপরাপর বস্তুর সদৃশ বা সমান হয়, সেই সামান্যভাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নামই সংগ্রহ নয়। সংগ্রহ নয়ের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের **classification**-এর তুলনা করা যাইতে পারে।

ব্যবহার—ইহা পূর্ব কথিত [illegible]। বস্তু [illegible]

বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই ব্যবহার নয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহা specification বা individuation বলিয়া কথিত হয়।

ঋজুসূত্র—বস্তুর পরিধি আরও স্বল্পপরিসর করিয়া তাহার বর্তমান অবস্থা দ্বারা তাহাকে নিরূপণ করার নাম ঋজুসূত্র।

শব্দ—এই নয় ও পরবর্তী দুইটী নয় শব্দের অর্থ বিচার করিয়া থাকে। কোনও শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তিনটী নয় এই প্রশ্নের ত্রিবিধ উত্তর দেয় এবং প্রত্যেক পরবর্তী নয় পূর্ববর্তী নয় অপেক্ষা শব্দের অর্থ আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে। শব্দ-নয় শব্দে বিস্তৃততম অর্থের আরোপ করে। একার্থবাচক শব্দ সকল লিঙ্গ বচনাদিক্রমে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একই অর্থ প্রকাশ করে ইহাই শব্দ নয়ের অভিমত।

সমভিরূঢ়—সমভিরূঢ় প্রত্যেক শব্দের মূলধাতু নির্দেশ করিয়া—একার্থ বাচক শব্দ সকল যে প্রকৃত পক্ষে ভিন্নার্থবাচক, তাহা সপ্রমাণ করে। শক্র ও পুরন্দর শব্দ শব্দ নয় অনুসারে একার্থ বাচক, কিন্তু সমভিরূঢ় নয়ের মতে শক্তিশালী পুরুষই শক্র এবং পুরবিদারণকারীই পুরন্দর। অতএব শক্র ও পুরন্দর ভিন্নার্থবাচক।

এবংভূত—যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও পদার্থ নির্দিষ্টরূপে ক্রিয়াশীল থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পদার্থ তৎক্রিয়াবাচক শব্দের বাচ্য, পরক্ষণে নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ শক্তিশালী ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শক্র, শক্তিহীন হইলে তিনি আর শক্রপদবাচ্য নহেন। ইহাই এবংভূত নয়ের অভিপ্রায়।

নয় পদার্থ একদেশদর্শী। পদার্থের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে জৈনাগমের অঙ্গীভূত স্যাদ্বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই স্যাদ্বাদ বা সপ্তভঙ্গী ন্যায় জৈন দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্যাদ্বাদ—পদার্থ অগণ্য গুণের আশ্রয়, পদার্থে সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন গুণের একাদি ক্রমে আরোপ করার নাম স্যাদ্বাদ নহে। এক এবং অদ্বিতীয় গুণ পদার্থে আরোপিত হইলে পদার্থ যে সপ্ত প্রকারে নিরূপিত এবং কথিত হইতে পারে সেই সপ্ত প্রকারের বর্ণনার নাম স্যাদ্বাদ বা সপ্তভঙ্গী ন্যায়। উদাহরণস্বরূপ অস্তিত্ব নামক গুণটি ঘট নামক পদার্থে আরোপিত হউক। দেখা যাইবে যে নিম্ন কথিত সপ্তধা বর্ণনা সম্ভবপর হইবে।

(১) 'স্যাদস্তি ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট আছে এ কথা বলা যাইতে পারে। ঘট আছে—এ কথার অর্থ কি? ঘট একটা নিত্য, সত্য, অনন্ত, অনাদি, অপরিবর্তনীয় পদার্থরূপে বিদ্যমান, ইহা অর্থ নহে। ঘট আছে, ইহার অর্থ এই যে স্ব-রূপ হিসাবে অর্থাৎ ঘটরূপে, স্ব-দ্রব্য হিসাবে অর্থাৎ মৃত্তিকা নির্মিত এই হিসাবে, স্ব-ক্ষেত্রে অর্থাৎ (ধর) পাটলিপুত্র নগরে এবং স্বকালে অর্থাৎ (ধর) বসন্তকালে, ঘট

বর্তমান আছে। (২) 'স্যান্নাস্তি ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট নাই। পররূপ অর্থাৎ পটরূপে, পরদ্রব্য হিসাবে অর্থাৎ সুবর্ণময় দ্রব্য এই হিসাবে পরক্ষেত্র অর্থাৎ (ধর) গান্ধার নগরে এবং পরকালে অর্থাৎ (ধর) শীত ঋতুতে ঐ ঘট নাই; এ কথা বলা যাইতে পারে। (৩) 'স্যাদস্তি নাস্তি চ ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট আছে এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঘট নাই। স্বদ্রব্য-স্বক্ষেত্রাদি, হিসাবে ঘট আছে এবং পরদ্রব্য পরক্ষেত্রাদি হিসাবে ঘট নাই, ইহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। (৪) 'স্যাদবক্তব্যঃ ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট অবক্তব্য। যদি একই সময়ে মনে করা যায় যে ঘট আছে এবং ঘট নাই, তাহা হইলে ঘট অবক্তব্য হইয়া উঠে কারণ ভাষায় এমন কোনও শব্দ থাকিতে পারে না যদ্বারা যুগপৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব নির্দেশ করা যাইতে পারে। তৃতীয় ভঙ্গে যে ঘটকে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বযুক্ত বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে যে ক্ষণে ঘটকে অস্তিত্ববান মনে করা হইয়াছে সেই ক্ষণেই তাহাকে নাস্তিত্ববানও মনে করা হইয়াছে। (৫) 'স্যাদস্তি চ অবক্তব্যঃ ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট আছে এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঘট অবক্তব্য। এই পঞ্চম ভঙ্গ প্রথম ও চতুর্থ ভঙ্গের মিলনের ফল। (৬) 'স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট নাই এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঘট অবক্তব্য। ষষ্ঠ ভঙ্গ দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের সঙ্কলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৭) 'স্যাদস্তি নাস্তি চ অবক্তব্য ঘটঃ'—অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে ঘট আছে, কিয়ৎ পরিমাণে ঘট নাই এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঘট অবক্তব্য। বলা বাহুল্য সপ্ত ভঙ্গীর সপ্ত ভঙ্গ তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গ মিলাইয়া গঠন করা হইয়াছে। জৈন দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, বস্তু বিচার এইরূপ সপ্ত ভঙ্গী ন্যায় বা স্যাদ্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ঘট আছে—একথা বলিলে ঘটের প্রকৃত তত্ত্ব বা সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ঘট নাই—এ কথা বলিলেও সব বলা হইল না। ঘট আছেও বটে নাইও বটে—একথাও যথেষ্ট নহে। ঘট অবক্তব্য—এ বিবরণও পর্যাপ্ত নয়। এই রূপে জৈনগণ নির্দেশ করেন যে সপ্ত ভঙ্গের যে কোনও একটী বা দুইটী ভঙ্গের সাহায্যে বস্তুর সম্পূর্ণ স্বভাব অবগত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মতে প্রতি ভঙ্গের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। পূর্বোক্ত সাতটী ভঙ্গ উল্লেখ করিলে তবে সম্পূর্ণ সত্য ও তথ্য উপলব্ধ হয়। অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সপ্ত ভঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, নিত্যত্বাদি যে কোনও গুণ সম্বন্ধেও সেই রূপ সপ্তভঙ্গী বর্ণিত হয়। অর্থাৎ 'পদার্থ নিত্য না অনিত্য?'—এ প্রশ্নের উত্তরেও জৈনগণ একে একে পূর্বোক্ত সাতটি ভঙ্গের উল্লেখ করেন। জৈন মতে স্যাদ্বাদই পদার্থতত্ত্ব নিরূপণের একমাত্র উপায়।

দ্রব্য—দ্রব্যের উৎপত্তি আছে ও বিনাশ আছে ইহা সর্বজন বিদিত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ ও গ্রীসে Heralitus-এর শিষ্যগণ এই নিমিত্ত দ্রব্যকে অনিত্য বলিয়া স্থির

করিয়া ছিলেন। কিন্তু আপাততঃ প্রতীয়মান উৎপত্তি বিনাশাদি পরিবর্তনের মূলে এমন একটা তত্ত্ব (যেমন কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কারাদির মূলে সুবর্ণ) থাকিয়া যায় যেটা সর্বদা অবিকৃত। এই জন্য ভারতবর্ষে বৈদান্তিকগণ ও গ্রীসে Parmenides-এর অনুগামীগণ পরিবর্তনবাদ উড়াইয়া দিয়া দ্রব্যের নিত্য সত্তা ও অবিকৃতি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্যাদ্বাদবাদী জৈনগণ এ উভয় মতই কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সত্তাও আছে ও পরিবর্তনও আছে। সেই জন্য তাঁহারা দ্রব্যকে উৎপাদ ব্যয় ধ্রৌব্যযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করেন। যথা—(১) দ্রব্যের উৎপত্তি আছে। (২) দ্রব্যের বিনাশ আছে। (৩) দ্রব্যের মধ্যে এমন একটি তত্ত্ব আছে যেটা অনন্ত উৎপত্তি বিনাশরূপ পরিবর্তনের মধ্যে অবিকৃত, অপরিবর্তিত ও অটুট অবস্থায় থাকিয়া যায়।

[ক্রমশঃ

নিয়মাবলী

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০ ।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. VII No. 2 Sraman June 1979
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

[ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক জৈন কথা সংগ্রহ]

"বইটী পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল মনটাকে আবার সংসারের নিত্য কাজে ফিরিয়ে আনতে।"

—শ্রীজয়দেব রায়

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

"জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে আলোকবর্ষী আখ্যানমূলক তথ্য বিদ্যমান, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক বাংলা কবিতা···অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবানুগ দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।"

—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮০

পরিবেশক :

অভিজিৎ প্রকাশনী

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

আষাঢ় । ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮৬ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

চক্রেশ্বরী, অম্বিকা ও পদ্মাবতী, খাজুরাহো

আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য এবং পশুবলি

হরিদাস হালদার

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষকে ফলমূল শস্যভোজী বানর ও বনমানুষ জাতীয় (Anthropoid) জীব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মাছ মাংস মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য হইতে পারে না। যে জীবের যাহা স্বাভাবিক খাদ্য সেই জীবের মুখের নিকট সেই খাদ্য ধরিলে তাহার জিভে জল আসিবে। রক্ত মাংস মুখের নিকটে রাখিলে বিড়াল কুকুরের জিভ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে থাকে, কারণ উহা তাহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। রক্তাক্ত কাঁচা মাছ মাংস মানুষের মুখের কাছে আনিলে তাহার জিভে জল আসে না; কিন্তু আম, লিচু ও তেঁতুল প্রভৃতি ফল ছাড়াইয়া তাহার মুখের কাছে আনিলে তাহার জিভে নিশ্চয়ই জল আসে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, মাছ মাংস মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নহে; তাহার স্বাভাবিক খাদ্য হইতেছে ফলমূল শস্য। রাঁধা মাংসের গন্ধে যে আমিষ ভোজী মানুষের মুখে জল আসে তাহা মাংসের জন্য নহে; কিন্তু পেঁয়াজ, রশুণ, তেজপাত, ছোট এলাচ, দারচিনি প্রভৃতি যে সকল মশলা দিয়া মাংস রাঁধা হয় তাহাদেরই গন্ধে। এই সকল মশলা আসে উদ্ভিদ জগত হইতে—ইহাদের প্রত্যেকটি নিরামিষ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া মাংস রাঁধিলে তাহা মানুষের অখাদ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সমস্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাহাদিগকে দশ ভাগ করিলে তাহার নয় ভাগ মানুষ নিরামিষ ভোজী, যে সকল লোক সমুদ্র ও নদ নদীর তীরে বা জলাভূমিতে বাস করে তাহারাই সাধারণতঃ আমিষ ভোজী হয়।

মাছ মাংস পচিলে তাহাতে এক প্রকার ভয়ানক বিষ জন্মে; সেই বিষের নাম টোমেন্ (Ptomaine)। যে সকল অসভ্যজাতি এখনও তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ ও শিকার করে তাহারা তীরের ফলা বা অগ্রভাগকে পচা মাংসের রসে ডুবাইয়া শুখাইয়া রাখে, ঐ বিষাক্ত তীরের সামান্য আঘাতে যাহার দেহ হইতে বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইবে তাহার আর রক্ষা নাই, তাহাকে blood poisoning বা রক্তদুষ্টিজনিত রোগে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। মাছ মাংস পচিলে যে কি তীব্র বিষের উৎপত্তি হয় তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। পচা মাছ মাংস খাইয়া কোন কোন লোক মারা গিয়াছে এরূপ কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ফলমূল পচিলে তাহাতে ঐরূপ কোনও মারাত্মক বিষ জন্মে না। এ কারণ পচা ফল মূল খাইলে মানুষের সেই সময়ের জন্য

কিছু পেটের অসুখ হইতে পারে সত্য কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পচা মাছকে ফুটন্ত তেলে বা জলে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া কিছুক্ষণ রন্ধন করিলে ঐ টোমেন বিষ সেই সময়ের জন্য নষ্ট হয় বটে ; কিন্তু ঐ রঁাধা মাছ একটি পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিলে পনের ষোল ঘণ্টা পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে আবার টোমেন জন্মিয়াছে। এই কারণে মাছের তরকারী গ্রীষ্মকালে বাসী করিয়া রাখিলে বিষাক্ত হইয়া ওঠে এবং তাহা আর খাওয়া চলে না ; খাইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। নিরামিষ তরকারী বাসী হইয়া একটু পচিলেও তাহা আহার করিয়া কেহ মারা যাইবে না।

বিড়াল জাতীয় মাংসাশী জীবদিগের উদরস্থ নাড়ী দৈর্ঘে তাহাদের দেহের তিনগুণ কিন্তু অ্যান্থ্রোপেয়েড্ বা মানব জাতীয় জীবদিগের নাড়ী লম্বায় তাহাদের দেহের দ্বাদশগুণ। আমরা যে সকল বস্তু আহার করি তাহাদের কিছু অংশ হজম হইয়া দেহের রক্তমাংসে পরিণত হয় ; বাকী অংশ আমাদের ঐ সুদীর্ঘ নাড়ী পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে মলরূপে বাহির হইয়া যায়। ভুক্ত মাছ মাংসের যে অংশ হজম না হয় তাহাও ঐভাবে বিশ চব্বিশ ঘণ্টা পরে মলরূপে উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দীর্ঘকাল নাড়ীর মধ্যে অবস্থান কালে ভুক্ত আমিষ পদার্থে একটু আধটু টোমেন্ ও টক্সিন বিষের সঞ্চার যে না হয় তাহা নহে। তবে আফিং ও মর্ফিয়া খোর মানুষ যেমন নিত্য ঐ দুই বিষ হজম করিতে অভ্যস্ত হয়, আমিষ ভোজী মানুষও সেইরূপ অভ্যাসের গুণে নিত্য সামান্য মাত্রায় টোমেন টক্সিন হজম করিতে শিখে। আফিং ও মর্ফিয়া খোরের ন্যায় টোমেন টক্সিন খোর আমিষাশীদের রক্ত ও যন্ত্র সকলের ক্রিয়া যে বিকৃত হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশুদ্ধ রক্তের একটি প্রধান কাজ হইতেছে শরীরের মধ্যে যে সকল রোগের বীজ বা কীটাণু নিঃশ্বাসে ও খাদ্যাদির সঙ্গে প্রতি নিয়ত প্রবেশলাভ করিতেছে তাহাদিগকে বিনষ্ট করা। এই কারণে যাহার রক্তের জোর অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার শরীরের মধ্যে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করিলেও সে সহজে ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না, অথবা ঈষৎ আক্রান্ত হইলেও অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় সহজে রোগমুক্ত হয়। আমিষ আহারে মানুষকে ক্রমে ক্রমে টোমেন ও টক্সিন খোর করিয়া তোলে এবং তাহাতে তাহার শোণিতের বিশুদ্ধতা ও রোগজয়কারী শক্তিকে কমাইয়া দেয়। এই হেতু আমিষভোজিগণ যত সহজে রোগাক্রান্ত হয়, নিরামিষভোজিগণ তত সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। আবার নিরামিষভোজী ব্যক্তি কদাচ রোগাক্রান্ত হইলেও যত সহজে আরোগ্য লাভ করে, আমিষ ভোজীর পক্ষে তত সহজে আরোগ্যলাভ করা সম্ভব নহে।

খাদ্যের মধ্যে ছানা জাতীয় বস্তুকে বলে 'প্রোটীন'। মাছ মাংসে শতকরা ১৩ ভাগ প্রোটীন থাকে। গম হইতে যে আটা ময়দা সুজি জন্মে তাহাতে শতকরা ১১ ভাগ

প্রোটীন থাকে। চাউলে শতকরা ২॥ ভাগ ও ডালে শতকরা ২৩ ভাগ প্রোটীন থাকে প্রোটীনের দ্বারা আমাদের দেহের বাড় বৃদ্ধি হয়। আর শ্বেতসার বা 'ষ্টার্চ' এবং চিনি ও ঘৃত দ্বারা আমাদের পরিশ্রম ও দৌড় ঝাঁপ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভাত আলু ও তরিতরকারিতে শ্বেতসার বা ষ্টার্চ অধিক থাকে। যাহারা মাছ মাংস অধিক পরিমাণে আহার করে তাহাদের দেহ দেখিতে লম্বায় ও চওড়ায় বড় হইলেও তাহা সুস্থ ও নীরোগ নহে। অত্যধিক আমিষভোজী সাহেবেরা দেখিতে বলবান হইলেও হাম, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ও রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইলে তাহারা যত সহজে মারা পড়ে, নিরামিষভোজী ভারতবাসী ঐ সকল রোগে তত সহজে মারা পড়ে না। এই কারণেই আমিষভোজী সাহেবেরা ছোঁয়াচে রোগগুলিকে বিষম ভয় করে।

আমিষভোজীদিগের মধ্যে এই সকল রোগ খুব বেশী সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়—দুঃসাধ্য কৃমি, অসাধ্য বাত, যক্ষ্মা, কোষ্ঠ বদ্ধতা ও উদরাময়, নানাবিধ জ্বর, কঠিন টাইফয়েড, দন্তরোগ, রক্ত দুষ্টি (blood-poisoning), মূত্র কৃচ্ছ্র, বহু মূত্র, শিরঃপীড়া, মৃগী, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, পৃষ্ঠব্রণ, অসাধ্য ক্ষত (cancer)।

নিরামিষভোজিগণ আমিষ ভোজীদিগের মত কোন রোগে বড় একটা সহজে হঠাৎ মারা যায় না—ইহা একটি বহু পরীক্ষিত সত্য। এই জন্য অনেক জীবনবীমা অফিসে নিরামিষভোজিদিগের জীবনবীমা করাইবার জন্য সুবিধা দরের প্রলোভনের ব্যবস্থা আছে। সাত্বিক নিরামিষ আহারে যে স্বাস্থ্য ও আয়ু বৃদ্ধি করে একথা মিথ্যা নহে। খ্যাতনামা অনেক ডাক্তারের মতে আমিষ আহার মানবের অকালমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।

শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র করিবার পূর্বে ডাক্তারগণ রোগীকে ক্লোরোফরম্ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করেন। ক্লোরোফরম তত্ত্বে জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার লডার ব্রাণ্টন বলেন যে যাহারা অধিক আমিষভোজী তাহাদিগকে ক্লোরোফরম দেওয়া বড়ই বিপদজনক, এবং এই কারণে বিলেতে ক্লোরোফরম দিবার সময়েই অনেক রোগীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। ভারতবর্ষের অধিকলোকই নিরামিষ ভোজী—এদেশে যাহারা আমিষ ভোজী তাহারাও অল্পমাত্রায় মাছ মাংস আহার করে। এজন্য ডাক্তার লডার ব্রাণ্টনের মতে ভারতবর্ষীয় রোগীদিগকে নির্বিঘ্নে ক্লোরোফরম দেওয়া চলে; কিন্তু বিলেতে আমিষ আহার বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সে দেশে ক্লোরোফরম দেওয়া ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আমেরিকায় মেক্সিকো ও লাইবেরিয়ার অনেক স্থানে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ দৃষ্ট হয়। আমিষ ভোজী মিশনারী সাহেবগণ ধর্ম প্রচারের জন্য ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া অচিরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইতেন। পরে

তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে নিরামিষ ভোজিদিগকে সহজে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। তাই এখন তাঁহারা মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়া পুষ্টিকর নিরামিষ আহার অভ্যাস করিয়া ঐ সকল স্থানে স্বচ্ছন্দে বাস ও কার্য করিতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট পল্লীগুলিতে যাহারা বাস করে তাহারা যদি মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া ভাত ডাল তরিতরকারি গুড় ও ঝুনা নারিকেল খাওয়া অভ্যাস করে তাহা হইলে তাহারা ভীষণ ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইতে পারে। বঙ্গদেশের লোক সাধারণের পক্ষে চাল ডাল কিছু তরকারী ও নারিকেল গুড়ই যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। কেবল উদ্ভিদ জগতের ফলমূল শস্যাদি হইতেই যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য সুলভে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এ জন্য মাছ মাংসের আবশ্যক হয় না। কিছুদিন নিরামিষ আহার করিতে করিতে মাছ মাংসের প্রতি ক্রমে অরুচি আসিয়া পড়ে।

[ক্রমশঃ

সুবর্ণভূমিতে কালকাচার্য

ডাঃ ইউ. পি. শাহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কথানক ছেড়ে দিয়ে যখন পট্টাবলী আদি দেখি তখন কল্পসূত্র স্থবিরাবলীতে দু'জন কালকের কোনো উল্লেখ দেখিনা। না আছে এতে স্থবিরদের সময়। নন্দী স্থবিরাবলী যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে শঙ্কা নেই সেখানে গর্দভিল্লোচ্ছেদক অন্য কালকের কোনো উল্লেখ নাই। দুষ্‌ষম কাল শ্রী শ্রমণ সঙ্ঘ স্তোত্রে 'গুণসুংদর সামজ্জ খংদিলায়রিয়'র উল্লেখ আছে কিন্তু গাথা ১৩তে আর্য বজ্রসেন, নাগহস্তি, রেবতিমিত্র, সিংহ ও নাগার্জুনের পর ভূতদিন্ন ও তাঁরপর যে 'কালক' এর উল্লেখ আছে তিনি গর্দভিল্লোচ্ছেদক হতে প্যারেন না। কারণ দ্বিতীয় যুগপ্রধান যন্ত্র (পট্টাবলী সমুচ্চয়. ভাগ ১, পৃ. ২৩-২৪) দেখলে জানা যায় যে এই কালকের সময় (আর্য বজ্রের শিষ্য) বজ্রসেনের ৩৬৩ বছর পর, যা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পরের। ধর্ম সাগর গণির তপগচ্ছ পট্টাবল্লীতে (পট্টাবলী সমুচ্চয়, ভাগ ১, পৃ. ৪১-৭৭) শ্যামার্য বীরাব্দ ৩৭৬ এ স্বর্গবাসী হন ও ওঁর শিষ্য জিতমর্যাদাকৃৎ সাণ্ডিল্য ছিলেন। পরে ইন্দ্রদিন্ন সূরীর পর বীরাব্দ ৪৫৩তে গর্দভিল্লোচ্ছেদক কালকসূরির উল্লেখ আছে। এই পট্টাবলীর রচনাকাল বিক্রম সম্বৎ ১৬৪৬। কিন্তু এতো অনেক পরের পট্টাবলী। দুষ্‌ষমকাল শ্রী শ্রমণ সংঘ স্তোত্র বিক্রম ত্রয়োদশ শতাব্দীর। ওই স্তোত্রের অবচূরির সময় সঠিক জানা নেই। এই অবচূরিতে নিম্নলিখিত বিধান আছে—

…মোরিঅরজ্জং ১০৮ তত্র মহাগিরি ৩০ সুহস্তি ৪৬ গুণসুন্দর ৩২ উনবর্ষাণি ১২ ॥…এবং (বীর নির্বাণাৎ) বর্ষাণি ৩২৩ ॥

রাজা পুষ্যমিত্র ৩০ বলমিত্র-ভানুমিত্র ৬০ (তত্র)—গুণসুন্দরস্যৈব শেষ বর্ষাণি ১২ কালিকে ৪ (৪১) খংদিল ৩৮ ॥ এবং বর্ষাণি ৪১৩ ॥

রাজা নরবাহন ৪০ গর্দভিল্ল ১৩ শাক ৪ (তত্র)—রেবতিমিত্র ৩৬ আর্যমঙ্গুধর্মাচার্য ২০ ॥ এবং বর্ষাণি ৪৭০ ॥

অত্রান্তরে বহুল সিরিব্বয় স্বামি (স্বাতি) হারিত্ত শ্যামাহর্ষ শাণ্ডিলা আর্য আর্যসমুদ্রাদয়ো ভবিষ্যন্তি।

তহ গদ্দভিল্লরজ্জস্স ছায়েগো কালগারিও হোহী।

ছত্তীসগুণোবেও গুণসকালিও পহাজুত্তো ॥ ১ ॥

বীরনির্বাণাৎ ৪৫৩ ভরুঅচ্ছে খপুটাচার্যাঃ বৃদ্ধবাদী পণ্ডকম্পাষিচ্ছেদো জীত-কম্পোদ্ধারঃ··· ॥

ধর্মাচার্যস্যেব শেষ বর্ষাণি ২৪ ভদ্রগুপ্ত ৩৯ শ্রীগুপ্ত ১৫ বজ্রস্বামী ৩৬। এবং সর্বাঙ্ক ৫৮৪ ॥ গর্দভিল্লনিবসুত বিক্রমাদিত্য ৬০ ধর্মাদিত্য ৪০ ভাইল্ল ১১ ॥ এবং ৫৮১ ॥ (পট্টাবলী সমুচ্চয়, ১, পৃ. ১৭)।

এই অবচূরির অন্তর্গত এই গাথায় এ স্পষ্ট নয় যে বীরাব্দ ৪৫৩ তে (গর্দভিল্লোচ্ছেদক) দ্বিতীয় কালক হয়েছিলেন। কিন্তু বিচার শ্রেণির গণনার সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পন্ন এই (অবচূরির) নৃপকালগণনায় গর্দভিল্লোর সময় বীরাব্দ ৪৫৩। কিন্তু নৃপ কাল গণনা সন্দেহাতীত নয়। বিক্রমাদিত্যকে গর্দভিল্লের পুত্র বলায় কোন কালক কথানক বা ভাষ্যের প্রমাণ নেই। আর ৪৫৩ তে গর্দভিল্লোচ্ছেদক কালকের সময়ে বলমিত্র-ভানুমিত্র হতেই পারেন না। আবার বলমিত্র-ভানুমিত্রের পরে গর্দভিল্লের ১৩ বছর গণা ও গর্দভিল্লোর ১০০ বা ১৫২ বর্ষের মিল পাবার জন্য বিক্রমাদিত্য, ধর্মাদিত্য, ভাইল্ল ও নাইল্লকে গর্দভিল্লো বংশের বলা ইত্যাদি এখনো বিবাদগ্রস্ত। স্বয়ং মেরুতুঙ্গকেও দুই বলমিত্র-ভানুমিত্র হবার বিচিত্র অনুমান করতে হল।[৮৮] আর্য খপুটের কার্যপ্রদেশ ভরোচ ছিল কালকাচার্যেরও ভৃগুকচ্ছের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তাঁরা সমকালীন ছিলেন (বীরাব্দ ৪৫৩) এরূপ জৈন গ্রন্থকারেরা (মধ্যকালীন পট্টাবলী ছাড়া) কোথাও উল্লেখ করেন নি। মৌর্যদের ১০৮ বছরও মান্য নয়। ডাঃ জয়সবালজীর কথনানুসারে যদি মৌর্যদের শেষ বছর রাসভদের বছরের সঙ্গে জুড়ে কোন রকমে ৪৭০ এ বিক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে এ স্পষ্ট হয় যে এই সব পট্টাবলীর নৃপ কালগণনা ভ্রান্তিহীন নয়। এতে আরো ভুল থাকতে পারে। এই গোলমালের কারণ এই যে প্রথম শক রাজ্যের পর কত বছর অতীত হলে বিক্রমাদিত্য হলেন তা স্পষ্ট না জানা থাকায় বিক্রম ও কালককে নিকটবর্তী করার আগ্রহ হল। একের বেশী কালক হয়ে থাকতে পারেন কিন্তু ঘটনার নায়ক ত প্রথম কালকই যা আমরা অন্য তর্কে গোড়াতেই দেখে নিয়েছি।

মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জীর মতে বলমিত্রই বিক্রমাদিত্য। আর ওঁর মতে গর্দভিল্লোচ্ছেদক দ্বিতীয় কালক বীরাব্দ ৪৫৩ তে হন। কিন্তু যদি বলমিত্রই বিক্রমাদিত্য

---

৮৮ মেরুতুঙ্গ লিখছেন — বলমিত্রভানুমিত্রৌ রাজানৌ ৬০ বর্ষাণি রাজ্যমকার্ষ্টাম্। যৌ তু কল্পচূর্ণৌ চতুর্থীপর্বকর্তৃকালকাচার্যনির্বাসকৌ উজ্জয়িন্যাং বলমিত্রভানুমিত্রৌ তাবন্যাবেব।' এ বিষয়ে মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জীর মতামত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বীর নির্বাণ সংবৎ, পৃঃ ৫৬-৫৭ ও পাদটীকা যেখানে তিত্থোগালী পইন্নয় নামে কি ধরণের গাথা পরবর্তী গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে মুনিজী তার সুন্দর আলোচনা করেছেন।

তবে তিনি গর্দভিল্লের পুত্র হতে পারেন না। তাহলে মেরুতুঙ্গের উপরোক্ত অবচূরির কথন ব্যর্থ বলে মনে হবে।

বীরাব্দ ৪৫৩ তে গর্দোভিল্লোচ্ছেদক কালক হবার সমস্ত আধার মধ্যকালীন। সেই পরম্পরায় কালগণনায় এধরণের গোলমাল রয়েছে। কালক কথানক ত গর্দভিল্লোচ্ছেদক কালকের গুরুরূপে গুণসুন্দর বা গুণাকরের কথাই বলে। সেই কালক শ্যামার্যই যিনি প্রজ্ঞাপনাসূত্র তৈরী করেন। উপলব্ধ প্রজ্ঞাপনা যদি মূল প্রজ্ঞাপনা না হয় তাহলেও তা মূলের নূতন সংস্করণ ও ওতে মূলের কিছু অংশ অবশ্যই থাকবে। এই প্রজ্ঞাপনা সূত্র তার লেখকের দেশ দেশান্তরের মানুষের জ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন লিপি জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয় যাতে মনে হয় তিনি গর্দভিল্লোচ্ছেদক ও সুবর্ণভূমি গমনকারী কালকই হবেন। প্রজ্ঞাপনা সূত্রের বিষয়ও তিনি যে নিগোদ ব্যাখ্যাকারক ছিলেন তার সূচনা দেয়।

বিচার শ্রেণিতে স্থবিরদের পট্টপ্রতিষ্ঠাকাল সূচক গাথা দেওয়া হয়েছে। এদেরই মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী স্থবিরাবলী বা যুগ প্রধান পট্টাবলী বলে অভিহিত করেছেন। এদের হস্তলিখিত পুঁথি তিনি দেখেছেন। সেই পুঁথি বা রচনা বিচারশ্রেণি হতে কত প্রাচীন তা কেউ জানেনা। বিচারশ্রেণির অন্তর্গত গাথাও মেরুতুঙ্গ হতে কত প্রাচীন সে কথা বলাও মুস্কিল। এই স্থবিরাবলীর গাথায় (পূর্বে দেওয়া হয়েছে)—'রেবইমিত্তে ছত্তীস অজ্জ মুঙ্গ অ বীস এবং তু। চউসয় সত্তরি চউসয়তিপন্নে কালগো জাও॥ চউবীস অজ্জধম্মে এগুণচালীস ভদ্দগুত্তেঅ।' ইত্যাদিতে পট্টধরদের বীরাব্দ ৪৭০ পর্যন্ত পরম্পরা বলার পরে ৪৪৩এ কালক হলেন এরূপ বিধান আছে। কিন্তু এতে ত এই সূচিত হয় যে দ্বিতীয় কালক যুগপ্রধান নন ও না তাঁর পরের যুগপ্রধান পট্টধর (বা গুরু) র কথা গ্রন্থকারেরা জানেন। এই গাথায় যদি কালকই যুগপ্রধান পট্টধর হন তবে একসময়ে এমন দুজন আচার্য যুগপ্রধান পট্টধর হচ্ছেন যা এই স্থবিরাবলীর অভিপ্রেত নয়। তাই এ সম্ভব যে 'চউসয় তিপন্নে কালগো জাও' এই কথা প্রাচীন যুগ প্রধান পট্টাবলীতে পরে বাড়ানো হয়েছে। প্রথম শক রাজ্য সম্পর্কে বাস্তবিক বর্ষ গণনা পরবর্তী লেকখদের নিকট দুর্লভ হওয়ায় ও কোনও প্রকারে বিক্রমের সময়ের নিকটে কালক ও প্রথম শকরাজ্যক আনার প্রচেষ্টায় বীরাব্দ ৪৫৩তে কালক হবার কল্পনা প্রবিষ্ট হয়েছে। উপলব্ধ সমস্ত পট্টাবলীতে সবচেয়ে প্রাচীন কল্পসূত্র ও নন্দীসূত্রের স্থবিরাবলী। কিন্তু এগুলিতে বীরাব্দ ৪৫৩তে রাখা যায় এমন কোন কালকের উল্লেখ নেই। পট্টাবলী সমুচ্চয়, ভাগ ১এ প্রদত্ত অন্য সব পট্টাবলী বিক্রম ত্রয়োদশ

শতক বা তার পরের। ডাঃ ক্লাট-এর পট্টাবলীও বিক্রম সংবৎ ষোড়শ শতাব্দী বা তার পরের।৮৯

কালক বিষয়ের প্রথম বিভাগের (চূর্ণি, ভাষ্য আদি) সমস্ত সন্দর্ভে আমরা একথা সিদ্ধ করে এসেছি যে সমস্ত ঘটনাই একই কালকের এবং তিনি আর্য শ্যাম। ওঁর পরে আর্য শাণ্ডিল্য এবং শাণ্ডিল্যের পরে হন আর্য সমুদ্র। সমস্ত থেরাবলী ও পট্টাবলীতে এই আর্য সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো আচার্যের জন্য 'তিসমুদ্দখায়কিত্তিং দীবসমুদ্দেসু গহিয় পয়ালং' এর মত শব্দ প্রয়োগ হয় নি। তাই এই আর্য সমুদ্র সুবর্ণভূমি গমনকারী সাগর শ্রমণ। আর সুবর্ণভূমি গামী ও গর্দভরাজোচ্ছেদক আর্য কালক এক একথা ত মুনি কল্যাণ বিজয়জীও মানেন। তাই সেই কালক শ্যামার্যই।

প্রাচীন জৈন পরম্পরানুসারে বীর নির্বাণ খৃঃ পূঃ ৫২৭এ যদি স্বীকার করা যায় তবে শ্যামার্যের সময় হবে খৃঃ পূঃ ১৯২-১৫১। আর যদি ডাঃ জেকোবী আদি পণ্ডিতদের মতানুসারে নির্বাণ খৃঃ পূঃ ৪৬৭ স্বীকার করি তবে শ্যামার্যের সময় হবে খৃঃ পূঃ ১৩২-৯১। এই সময়ে ভারতে শকদের প্রথম আগমন হয়। খরোষ্ঠী লিপির লেখ ও মথুরার অন্য কতিপয় লিপির অধ্যয়নে একথা সমস্ত পণ্ডিতদের স্বীকার্য যে দু'প্রকারের শক সম্বৎ প্রচলিত হয়ঃ প্রথম old Saka era = প্রাচীন (মূল) শক সম্বৎ ও দ্বিতীয় চালু (খৃষ্টীয় ৭৮ হতে সুরু) শক সম্বৎ। প্রাচীন শক সম্বতের প্রথম বছর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এ সমস্তর সমীক্ষা ডাঃ লোহুইঝেন-দ-ল্যু তাঁর 'দি সিথিয়ন পিরিওড' গ্রন্থে করেছেন। ডাঃ লোহুইঝেন-দ-ল্যুর মতে প্রথম শক সম্বৎ খৃঃ পূঃ ১২৯ সে আরম্ভ হয়। প্রোফেসর র‍্যাপ্‌সন-এর মতে খৃঃ পূঃ ১৫০, প্রোফেসর টার্ণ-এর মতে খৃঃ পূঃ ১৫৫, ও ডাঃ য়সওয়ালের মতে খৃঃ পূঃ ১২০। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে কিন্তু ডাঃ লোহুইঝেন-দ-ল্যু ও জয়সবাল এর মত বাস্তবতার বেশী নিকট। এই সব মতের আলোচনা শ্রী এম. এন. সাহা জার্ণাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি (বেঙ্গল) লেটর্স, ভাগ ১৯ (খৃঃ ১৯৫৩) সংখ্যা ১ পৃঃ ১-১২তে করেছেন ও সেখানে বলেছেন যে প্রথম শক সংবত ১২৩এ হয়ে থাকবে। এই সময় শক ও ইউ-চীর ব্যাকট্রিয়ায় পার্থিয়ানদের ওপর জয় লাভের। এর পর অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় মিথ্রদাত (Mithradates II) নামক পার্থিয়ান রাজা শকদের বিতাড়িত করেন।৯০ এই সময়ে শকরা ভারতে আসে।

---

৮৯ দ্রষ্টব্য, ক্লাট-এর প্রবন্ধ, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী, ভাগ ১১, পৃঃ ২৪৫ হতে। ডাঃ জেকোবী, ডাঃ লয়েমান আদির পট্টাবলী বিষয়ক প্রবন্ধের সূচির জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রাউন, দি ষ্টোরী অফ কালক, পৃঃ ৫, পাদটীকা ২৩।

৯০ দ্রষ্টব্য ডাঃ লোহুইঝেন-দ-ল্যু, ডাঃ এম. এন. সাহা আদির প্রবন্ধ ও গ্রন্থ ও ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় কৃত দি শকস্ ইন ইণ্ডিয়া (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৯৫৫) পৃঃ ৬।

এতে আমার মতে শ্যামার্যের সময় খৃঃ পূঃ ১৩২-৯১র মধ্যে স্বীকার করা অধিক উপযুক্ত হবে। খৃঃ পূঃ ৫৮তে বিক্রম সংবত (মালব সংবত) যখন চালু হয় তখন কালকাচার্য জীবিত ছিলেন এমন কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই কালকের সময় খৃঃ পূঃ ৯১র পর হতে হবে এমন কোনো কারণ নেই।

কালক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। ওঁর সময় উপরোক্ত দুটি সময়ের একটী। সেই সময় গর্দভের উচ্ছেদ হয়; সেই সময়ে কালক সুবর্ণভূমি যান। অন্য কালকাচার্য হয়ে থাকবেন।[৯১] কিন্তু তাঁরা কথানকের ঘটনার কালকাচার্য নন তা নিশ্চিত। এখন ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে প্রার্থনা যে তাঁরা গর্দভ, গর্দভিল্ল; বিক্রমাদিত্য আদি কূট প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাবার যেন প্রযত্ন করেন।

[ক্রমশঃ

প্রোফেসর র‍্যাপসন লিখছেন: It was in his reign that the struggle between the Kings of Parthia and their Scythian subjects in Eastern Iran was brought to a close and the suzerainty of Parthia over ruling power of Seisthan and Kandahar confirmed. (Cambridge Hist. of India, Vol. I. p. 567).

৬১ দ্রষ্টব্য, বীর নির্বাণ সম্বৎ ও জৈন কাল গণনা, পৃঃ ১২৫ হতে, পৃঃ ১২৮ এর পাদটীকায় দেবর্দ্ধিগণি ক্ষমাশ্রমণের গুর্বাবলী ও বালভী যুগপ্রধান পট্টাবলী। বালভী পট্টাবলীর নং ২৭ এর কালকাচার্যের অন্তিম বর্ষ নির্বাণ সম্বৎ ৯৯৩এ পুস্তকোদ্ধার হয়।

ভক্তামর স্তোত্র

মানতুঙ্গ স্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

বুদ্ধস্ত্বমেব বিবুধার্চিতবুদ্ধিবোধা-
ত্বং শঙ্করোঽসি ভুবনত্রয় শংকরত্বাৎ।
ধাতাসি ধীর শিবমার্গবিধের্বিধানাদ-
ব্যক্তংত্বমেব ভগবন্ পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ২৫

হে নাথ, বুদ্ধিবোধ বা কেবলজ্ঞান লাভে দেবগণ কর্তৃক অর্চিত হওয়ায় তুমি বুদ্ধ, ত্রিলোকের কল্যাণ কারক বলে তুমি শংকর। হে ধীর, মোক্ষমার্গের বিধান কারক বলে তুমি বিধাতা এবং এভাবে পুরুষদের মধ্যে উত্তম হওয়ায় তুমি পুরুষোত্তম বা নারায়ণ ॥ ২৫

তুভ্যং নমস্ত্রিভুবনার্তিহরায় নাথ
তুভ্যং নমঃ ক্ষিতিতলামলভূষণায়।
তুভ্যং নমস্ত্রিজগতঃ পরমেশ্বরায়
তুভ্যং নমো জিন ভবোদধিশোষণায় ॥ ২৬

হে নাথ, ত্রিভুবনের আর্তিহরণ কর বলে তোমাকে আমি নমস্কার করি। এই পৃথিবীর তুমি নির্মল অলংকার বলে আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি এই ত্রিজগতের পরম ঈশ্বর বলে তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে জিনেন্দ্র, তুমি সংসাররূপ সমুদ্রকে শোষণ কর বলে তোমাকে আমি নমস্কার করি। ২৬

কো বিস্ময়োঽত্র যদি নাম গুণৈরশেষৈ-
স্ত্বং সংশ্রিতো নিরবকাশতয়া মুনীশ।
দোষৈরুপাত্তবিবিধাশ্রয়জাতগর্বৈঃ
স্বপ্নান্তরেঽপি ন কদাচিদপীক্ষিতোঽসি ॥ ২৭

হে মুনীশ, অন্যত্র স্থান না পাওয়ায় সমস্ত গুণ যদি তোমাকে এসে আশ্রয় করে ও দোষ দেবাদিকে এবং অহংকার বশে সেই দোষ স্বপ্নেও যদি তোমাকে না দেখে থাকে তবে আশ্চর্যের কী আছে? ২৭

[মানুষ সাধারণতঃ পুণ্য অর্জন করতে চায়, আত্মাকে কেউ চায় না। পুণ্য অর্জন করে তারা দেবত্ব লাভ করে। কিন্তু পুণ্যও দোষ কারণ তাতে অপবর্গ সাধিত হয় না। তাই তুমি পুণ্য পরিত্যাগ করে (যা অন্য দেবতারা ভাগ করে নিয়েছেন ও যা তোমার দিকে আর ফিরে তাকায় না) আত্মগুণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছ। অর্থাৎ তুমি পাপ ও পুণ্যের ওপরে।]

উচ্চৈরশোকতরুসংশ্রিতমুন্ময়ূখ-
মাভাতি রূপমমলং ভবতো নিতান্তম্।
স্পষ্টোল্লসৎকিরণমস্ততমোবিতনং
বিম্বং রবেরিব পয়োধরপার্শ্ববর্তি ॥ ২৮

দীর্ঘ অশোক তরু সংশ্রিত তোমার যে প্রভা ঊর্দ্ধে বিকীর্ণ হচ্ছে তা নির্মল ও মেঘের নিকটবর্তী সূর্যরশ্মি যেমন অন্ধকার বিদীর্ণ করে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ ॥ ২৮

সিংহাসনে মণিময়ূখশিখাবিচিত্রে
বিভ্রাজতে তব বপুঃ কনকাবদাতম্।
বিম্বং বিয়দ্বিলসদংশুলতাবিতানং
তুঙ্গোদয়াদ্রিশিরসীব সহস্ররশ্মেঃ ॥ ২৯

হে ভগবন্, মণি কিরণের প্রভায় চিত্রবিচিত্র সিংহাসনস্থিত তোমার স্বর্ণকান্তি বপু সূর্যকিরণ জালে চিত্রবিচিত্র উদয়গিরি আরূঢ় সহস্ররশ্মির মতই সুন্দর। ২৯

কুন্দাবদাতচলচামরচারুশোভং
বিভ্রাজতে তব বপুঃ কলধৌতকান্তম্।
উদ্যচ্ছশাঙ্কশুচিনির্ঝরবারিধার-
মুচ্চৈস্তটং সুরগিরেরিব শাতকৌম্ভম্ ॥ ৩০

কুন্দাবদাত চামর বীজিত তোমার স্বর্ণকান্তি দেহ স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতের মত যার গা দিয়ে নবোদিত চন্দ্রমার সমান নির্মল নির্ঝর ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। ৩০

ছত্রত্রয়ং তব বিভাতি শশাঙ্ককান্ত-
মুচ্চৈঃ স্থিতং স্থগিতভানুকরপ্রতাপম্।
মুক্তাফলপ্রকরজালবিবৃদ্ধশোভং
প্রখ্যাপয়ৎত্রিজগতঃ পরমেশ্বরত্বম্ ॥ ৩১

হে নাথ, তোমার উপরিস্থিত তিনটী ছত্র, যা চন্দ্রমার মত রমণীয়, সূর্য কিরণের প্রখরতাহারী ও মুক্তাফল জালে হয়েছে আরো শোভন, তুমি যে তিন জগতের ঈশ্বর তা প্রকটিত করছে। ৩১

গম্ভীরতাররবপূরিতদিগ্বিভাগ-
স্ত্রৈলোক্যলোকশুভসংগমভূতিদক্ষঃ।
সদ্ধর্মরাজজয়ঘোষণঘোষকঃ সন্
খে দুন্দুভিধ্ব'নতি তে যশসঃ প্রবাদী ॥ ৩২

হে জিনেন্দ্র, গম্ভীর ও উদাত্ত শব্দে যা দিক পূরিত করতে পারে, ত্রিভুবনকে যা শুভ সমাগমের বার্তা দিতে চতুর ও তোমার যশের প্রসারকারী এরূপ দুন্দুভি আকাশে সদ্ধর্মরাজের অর্থাৎ তীর্থংকর রূপী তোমার জয় ঘোষণা করতে বাদিত হচ্ছে ॥ ৩২

মন্দারসুন্দরনমেরুসুপারিজাত-
সন্তানকাদিকুসুমোৎকরবৃষ্টিরুদ্ধা।
গন্ধোদবিন্দুশুভমন্দমরুৎপ্রপাতা
দিব্যা দিবঃ পতিত তে বচসাং ততির্বা ॥ ৩৩

হে নাথ, গন্ধোদকের ফোঁটায় মঙ্গলীকৃত ও মন্দমন্দ বাতাসে প্রবাহিত হয়ে ঊর্দ্ধমুখী দিব্য মন্দার, সুন্দর, নমেরু, সুপারিজাত, সন্তানক আদি পুষ্প আকাশ হতে বর্ষিত হচ্ছে। অথবা শুভ্র তোমার বাক্যপংক্তি আকাশ হতে প্রবাহিত হয়ে আসছে। ৩৩

শুম্ভৎপ্রভাবলয়ভূরিবিভা বিভোস্তে
লোকত্রয়ে দ্যুতিমতাং দ্যুতিমাক্ষিপন্তী।
প্রোদ্যদ্দিবাকরনিরংতরভূরি সংখ্যা
দীপ্ত্যা জয়ত্যপি নিশামপি সোমসৌম্যাম্ ॥ ৩৪

হে বিভো, দেদীপ্যমান কোটি সূর্যপ্রভ তোমার নিবীড় ভামণ্ডল ত্রিলোকের প্রকাশমান সমস্ত পদার্থের দ্যুতিকে তিরস্কার করতে সমর্থ হয়েও চন্দ্রমার মত শীতল ও রাত্রিকেও উজ্জ্বল করতে সমর্থ। ৩৪

স্বর্গাপবর্গগমমার্গবিমার্গণেষ্টঃ
সদ্ধর্মতত্ত্বকথনৈকপটুস্ত্রিলোক্যাঃ।
দিব্যধ্বনির্ভবতি তে বিশদার্থসর্ব
ভাষাস্বভাবপরিণামগুণৈঃ প্রযোজ্যঃ ॥ ৩৫

হে ভগবন্, স্বর্গ ও অপবর্গকামী মুনিদের যা ইষ্ট, ত্রিলোকে সদ্ধর্মতত্ত্বকে প্রসারিত করতে যা পটু, যা নির্মলার্থ ও সমস্ত ভাষা গর্ভিত সেরূপ তোমার দিব্য-ধ্বনি সমস্তদিকে প্রসারিত হচ্ছে ॥ ৩৫

উন্নিদ্রহেমনবপঙ্কজপুঞ্জকান্তী
পর্যুল্লসন্নখময়ূখশিখাভিরামৌ।
পাদৌ পদানি তব যত্র জিনেন্দ্র ধত্তঃ
পদ্মানি তত্র বিবুধাঃ পরিকল্পয়ন্তি ।। ৩৬

হে জিনেন্দ্র, তোমার চরণ কমল, যা প্রস্ফুটিত নবীন স্বর্ণকমলের মত কান্তিসম্পন্ন ও বিকীর্যমান নখ সমূহের কিরণ প্রভায় উজ্জল, যেখানে যেখানে তুমি স্থাপিত কর দেবতারা সেখানে সেখানে কমলদল রচনা করেন। ৩৬

[ক্রমশঃ

বস্তুপাল তেজপাল

[গুজরাত কাহিনী]

কুমারপাল দেবের মৃত্যুর পর গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র অজয়পাল দেব। অজয়পাল দেব পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতার নির্মিত জৈন মন্দির ধ্বংস করতে আরম্ভ করেন ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের হত্যা করতে। শেষে বয়জল নামক এক প্রতিহারীর ছুরিকাঘাতে নিজে নিহত হন। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন।

অজয়পাল দেবের পর মূলরাজ ২ বছর রাজত্ব করেন। মূলরাজের পর ভীম। ভীমের রাজ্যকাল ৬৩ বছর স্থায়ী হলেও মালবের আক্রমণে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই ছত্রভঙ্গ রাজ্যের ওপর রাজত্ব করেন ব্যাঘ্রপল্লীয় নামে প্রসিদ্ধ আনাক পুত্র লবণ প্রসাদ। আনাক কুমারপালের মাসতুতো ভাই ছিলেন।

কুমারপাল তখন জীবিত। একদিন দ্বিপ্রহরে আনাক যখন কুমার পালের কাছে বসে ছিলেন তখন সহসা তাঁর ভৃত্য এসে তাঁকে বাইরে ডাক দেয় ও তাঁর পুত্র হয়েছে সেকথা নিবেদন করে। আনাক যখন আবার কুমার পালের কাছে ফিরে এলেন তখন সে কে ছিল জিজ্ঞাসা করায় আনাক সমস্ত কথা নিবেদন করেন। সমস্ত শুনে কুমারপাল বলেন তোমার ভৃত্য যে বেত্রধারিণীদের বাধা অতিক্রম করে এখানে এসে তোমাকে পুত্রজন্মের সংবাদ দিল এতে মনে হচ্ছে যে তোমার ওই পুত্র নিজের পুণ্য প্রভাবে গুজরাতের রাজা হবে। তবে তোমার ভৃত্য তোমাকে এখান হতে তুলে নিয়ে যেয়ে সংবাদ দেওয়ায় সূচিত হচ্ছে তার রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অন্যত্র হবে।

এবং হলও তাই। ভীমের পর আনাক-পুত্র লবণ প্রসাদই গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই লবণ প্রসাদের পুত্র বীর ধবল।

বীর ধবল তখন ছোট। তাঁর মা মদন দেবী তাঁর ভগিনীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ও ভগ্নীপতি দেবরাজ কপর্দক হীন হয়ে গেছেন অবগত হয়ে স্বামীর অনুজ্ঞা নিয়ে তাঁকে দেখতে যান। কিন্তু দেবরাজ মদন দেবীকে সুন্দরী ও সুলক্ষণা দেখে তাঁকে নিজের গৃহিনী করে নেন। এতে কুপিত হয়ে লবণ প্রসাদ দেবরাজকে হত্যা করার জন্য গোপনে দেবরাজের গৃহে প্রবেশ করেন ও তাঁকে হত্যার সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় বীর ধবলের প্রতি দেবরাজের বাৎসল্য ভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হন ও দেবরাজকে ক্ষমা করে নিজের আবাসে ফিরে আসেন। বীর ধবল

যখন বড় হন ও সমস্ত বিষয় জানতে পারেন তখন তিনি দেবরাজের গৃহ পরিত্যাগ করে পিতার নিকটে উপস্থিত হন। লবণ প্রসাদ বীর ধবলকে কিছু ভূমি দান করেন ও বীর ধবলও খানিক ভূমি জয় করে চাহড় নামক রাজপুরোহিতের সহায়তায় রাজ্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন।

চাহড়ের সঙ্গে এক সময় প্রাগবট বংশীয় পত্তননিবাসী বস্তুপাল ও তেজপালের পরিচয় হয়। বস্তুপাল তেজপালের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তিনি এ'দের দুজনকে প্রধানামাত্য ও সেনাপতি রূপে নিযুক্ত করার জন্য বীর ধবলকে অনুরোধ করেন। বীর ধবলও তদনুসারে তাঁদের অভ্যর্থিত করলে তাঁরা তাঁকে সস্ত্রীক নিজ আবাসে আমন্ত্রণ জানান। বীর ধবল সস্ত্রীক তাঁদের আবাসে উপস্থিত হলে তেজপাল পত্নী অনুপমাদেবী রাজমহিষী জয়তলদেবীকে কর্পূর নির্মিত নিজের কর্ণফুল ও মুক্তামণি জড়িত কর্পূরময় সোণার হার উপহার দিতে গেলে বীর ধবল তার নিষেধ করেন ও বস্তুপাল তেজপালের হাতে রাজ কার্যের ভার তুলে দিয়ে বলেন, তোমাদের নিকট যে ধন আছে তা কুপিত হলেও গ্রহণ করবনা এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। তোমরা আমার রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ কর।

এইরূপ অনুরুদ্ধ হয়ে বস্তুপাল তেজপাল রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন। বস্তুপাল মহামাত্য ও তেজপাল সেনাপতি নিযুক্ত হন। বস্তুপালের সুব্যবস্থায় অল্প দিনের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। শুধু আভ্যন্তরীণ শান্তিই স্থাপিত হয় তাই নয় তাঁরা কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্য সীমারও বিস্তৃতি করেন। ফলে সেই বৃহৎ রাজ্যের ওপর বীর ধবল ও লবণ প্রসাদ একত্রে রাজ্য করতে লাগলেন।

একদিন তেজপালের নিকট তাঁর এক কর্মচারী মুঞ্জাল এসে বলল, প্রভু আপনি বাসি আহার করেন না গরম গরম? তেজপাল সহসা সেকথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন লোকটীর মাথার ঠিক নেই কিন্তু যখন সে দু'তিনবার এই প্রশ্ন করল তখন তিনি তাকে বললেন, বিজ্ঞ, তোমার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছিনা, বুঝিয়ে দাও। সে প্রত্যুত্তর দিল এর তাৎপর্য এই যে আপনি এখন যে বৈভব উপভোগ করছেন তা পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের প্রভাবে না ইহজন্মের? এর বেশী আমি জানিনা। আমি আপনার গুরুদেবের সন্দেশই আপনাকে দিলাম। সেকথা শুনে তেজপাল কুলগুরু বিজয় সেন সূরির কাছে গেলেন এবং তাঁর সদুপদেশে ধর্মকৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। বস্তুপাল শত্রুঞ্জয় ও গিরনার তীর্থের সংঘ বার করলেন। স্থানে স্থানে মন্দির ও বিহার নির্মাণ করলেন। বহু ভগ্নমন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করলেন। আর তেজপাল আবু পাহাড়ে নেমিনাথের ভব্য মন্দির নির্মাণ করলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লুণিগ মৃত্যুর সময় তাঁদের বলেছিলেন অর্বুদ পাহাড়ে বিমল বসহিকায় আমার যোগ্য দেবকুলিকা নির্মাণ করবে। কিন্তু সেখানকার পূজোরীরা তাঁকে সেখানে ভূমি না

দেওয়ায় বিমল বসহির নিকট নূতন ভূমি ক্রয় করে তিনি সেখানে ত্রিভুবন খ্যাত লুণিগবসহির মন্দির নির্মাণ করালেন। এই মন্দিরের গুণদোষ নির্ণয় করার জন্য তেজপাল জাবালিপুর হতে যশোবীরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মন্দির নিরীক্ষণ করে স্থপতি শোভনদেবকে বললেন, রঙ্গমণ্ডপে শালভঞ্জিকা যুগ মিথুন সর্বদা অনুচিত ও বাস্তু শাস্ত্রের বিপরীত। ভেতরের গৃহ প্রবেশ দ্বারে সিংহ তোরণ দেবতার বিশেষ পূজার বিনাশ কারক। আর পূর্ব পুরুষের মূর্তিযুক্ত হস্তীদের সম্মুখে মন্দিরের হওয়া নির্মাতার ভবিষ্যৎ বিনাশের সূচনা করছে। এই বলে তিনি যে ভাবে এসেছিলেন সেই ভাবে চলে গেলেন।

বস্তুপাল তেজপালের যেমন দানের তুলনা হয়না, তেমনি বিদ্বোৎসাহিতার। তাঁর দানের সম্বন্ধে একটী পদ এখানে দিচ্ছি।

পণ্ডিতেরা তাঁর সভায় একটী শ্লোকের তিনটী পদ বারবার বললেন যার অর্থ হল কর্ণ দানে চর্ম দিলেন, শিবি মাংস, জীমূতবাহন জীব ও দধীচি অস্থি—তখন চতুর্থ পদটী কবি জয়দেব এই ভাবে পূর্তি করলেন—আর বস্তুপাল দিলেন বসু অর্থাৎ ধন।

এই পাদ পূর্তির জন্য জয়দেব পেলেন চার সহস্র মুদ্রা।

তেজপালের স্ত্রী অনুপমা দেবীও বিদূষী, দানশীলা ও মহিয়সী মহিলা ছিলেন। আবুর মন্দির নির্মাণ কার্য যখন শ্লথ হয়ে যায় তখন তাঁর উৎসাহ, আর্থিক সহায়তা ও সহানুভূতি সেই কার্যে প্রগতি এনে দেয়। তিনি করিগরদের আহারের জন্য নিজ ব্যয়ে ভোজনালয় খুলে দেন ও শীতের সময় প্রত্যেক কারিগরকে দেন এক একটী সিগড়ী (শরীর গরম রাখার জন্য চুলো)। এছাড়া খোদাই-এর কাজকে সূক্ষ্ম করার জন্য তিনি ঘোষণা করেন যে যে পরিমাণ পাথর ঘ'ষে বার করে দেবে সে পাবে সেই পরিমাণ সোনা। সূক্ষ্মকাজের জন্য যে আবুর মন্দির আজ পৃথিবী খ্যাত হয়ে আছে তার পেছনে রয়েছে এই মহিয়সী মহিলার সংবেদনশীল মন। অনুপমা দেবী সম্পর্কে কোন জৈনচার্য লিখেছেন—

লক্ষ্মী চঞ্চলা, শিবা কোপনা, শচী সৌতদোষে দূষিতা, গংগা নিম্নগামিনী, সরস্বতী বাচাল কিন্তু অনুপমা অনুপমা।

শালিভদ্র

পূরণ চাঁদ সামসুখা

[শালিভদ্র-কথা পুরাতন জৈন সাহিত্যের একটি অতি বিখ্যাত কথা। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত জিনেশ্বর সূরি এই কথাটী এক বিশেষ ভঙ্গীর সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় তৎকালের বণিকগণের অতুল সম্পত্তির কথা এবং তাহাদের আবাসস্থানের ও আহারের বিবরণ বর্তমান কালের ইউরোপীয় ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের আবাস ও আহারের প্রথার সহিত সাদৃশ্য বিশেষে কৌতূহল উদ্রেক করে। উক্ত বর্ণনা অবলম্বনে এই কথাটি রচিত]

সেকালে, সে সময়ে রাজগৃহ নামক এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইহা মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং সে সময়ে মহারাজ শ্রেণিক সেখানে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ শ্রেণিকের সুশাসনে সমগ্র দেশে শান্তি বিরাজ করিত। বণিকগণ নির্ভয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেন।

একদা দূরদেশ হইতে রত্নকম্বল বিক্রেতা বণিকগণ রাজগৃহে আগমন করিয়া নগরের ধনশালী শ্রেষ্ঠিগণকে তাঁহাদের কম্বলগুলি দেখাইলেন এবং প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত মহার্ঘ বলিয়া কেহই তাহা ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রত্নকম্বল-বিক্রেতা বণিকগণ মহারাজ শ্রেণিকের নিকট গমন করিয়া কম্বলগুলি দেখাইলেন। শ্রেণিক তাঁহার পট্টমহিষী চেল্লনাকে দেখাইলে তিনি পছন্দ করিলেন ও ক্রয় করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মূল্যাধিক্য বলিয়া রাজা লইতে সম্মত হইলেন না।

বণিকগণ রাজবাটী হইতে নির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শালিভদ্র শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন করিয়া শালিভদ্রের মাতা ভদ্রাকে কম্বলগুলি দেখাইলেন এবং রাজগৃহের ন্যায় বিখ্যাত নগরে কম্বলগুলি ক্রয় করিতে সমর্থ কোন ধনবান্ ব্যক্তি নাই—এমনকি এখানকার রাজারও সামর্থ্য নাই বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিলেন। ভদ্রা সমস্ত কম্বলগুলি ক্রয় করিয়া তাঁহাদের প্রার্থিত মূল্য প্রদান করিলেন।

রাজগৃহ নগরে গোভদ্র নামক এক প্রভূত ধন-সম্পত্তিশালী বণিক ছিলেন। গোভদ্র শ্রেষ্ঠী বহু বৃহৎ বৃহৎ পোতে পণ্যদ্রব্য পূর্ণ করিয়া দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রপথে গমন করেন। সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উত্থিত হওয়ায় শ্রেষ্ঠীর সমস্ত পোত

নিমজ্জিত হইল এবং শ্রেষ্ঠীও নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ভদ্রা বাড়ীতে পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। এই সন্তানের নাম শালিভদ্র রাখা হইল। ভদ্রা তাঁহার মৃত স্বামীর ব্যবসায় এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে প্রভূত উপার্জন হইতে লাগিল এবং শীঘ্রই তিনি নগরের একজন প্রধান বণিকরূপে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। শালিভদ্রকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য গৃহে কলাচার্যকে রাখিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী করা হইল এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা ধনাঢ্য বণিকগণের বত্রিশজন সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করিলেন। ভদ্রা শালিভদ্রের জন্য একটি অত্যন্ত মনোহর প্রাসাদ প্রস্তুত করাইলেন। তাহার সর্বোপরিস্থিত ষষ্ঠতলে শালিভদ্র স্ত্রীগণসহ ভোগবিলাসে মগ্ন থাকিতেন; সূর্যচন্দ্রের উদয়াস্ত কখন হয় তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না। ব্যবসায়ের সমস্ত কার্য তাঁহার মাতা ভদ্রা নির্বাহ করিতেন।

এদিকে রাণী চেল্লনা রত্নকম্বল না পাওয়ায় মহারাজ শ্রেণিকের উপর রুষ্ট হইলেন। রাজা অগত্যা একটী কম্বল ক্রয় করিবার ইচ্ছায় বহিরাগত বণিকগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বণিকগণ আসিয়া নিবেদন করিলেন যে সব কম্বলই গোভদ্র শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ভদ্রা ক্রয় করিয়াছেন। রাজা বিস্মিত হইলেন এবং একজন রাজপুরুষকে ভদ্রার নিকট হইতে একটী কম্বল মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। ভদ্রা উত্তর করিলেন —দেবপাদের সহিত আমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবহার কেন? মূল্য না লইয়াই কম্বল দেবপাদকে ভেট প্রদান করা হইত, কিন্তু ষোলটী কম্বলই দ্বিখণ্ড করিয়া আমার বত্রিশজন পুত্রবধূর প্রত্যেকটিকে এক একটী টুকরো পর্যংকের নিম্নে পাদপ্রোঞ্ছনের জন্য দেওয়া হইয়াছে। কম্বলগুলি বহুদিনের প্রস্তুত বলিয়া স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইয়াছে ও তজ্জন্য বধূগণের পায়ে আঘাত লাগিতে পারে মনে করিয়া পাপোশরূপেও সেগুলি ব্যবহার করা হয় নাই। যদি ঐগুলির দ্বারা দেবপাদের কার্য সমাধা হইতে পারে তবে আজ্ঞা হইলে সমর্পণ করিব। রাজপুরুষ প্রত্যাগমন করিয়া রাজার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে রাজা তাঁহার রাজ্য মধ্যে এতাদৃশ ধনশালী শ্রেষ্ঠী আছেন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শালিভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে রাজ-সভায় ডাকিবার জন্য রাজপুরুষকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। রাজপুরুষ ভদ্রার নিকট রাজাদেশ বলিলে ভদ্রা বলিয়া পাঠাইলেন যে—শালিভদ্রের কখনও চন্দ্র সূর্যের দর্শন হয় না, অতএব দেব এরূপ আদেশ করিবেন না। দেব স্বয়ং মহারাজ্ঞী ও পরিজন সহ আমাদের গৃহে আগমন করিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। ভদ্রার প্রস্তাবে মহারাজ সম্মত হইলে ভদ্রা বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সংবাদ দিলে যেন দেব আগমন করেন।

এবার ভদ্রা মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি

রাজবাটীর সিংহদ্বার হইতে নিজ গৃহদ্বার পর্যন্ত রাজমার্গ সজ্জিত করাইলেন। রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে বংশদণ্ডের উপর শনবর্তিকার (দড়ি) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া উর্দ্ধমুখী দীর্ঘ দীর্ঘ বল্লরীসমূহ স্থাপন করা হইল। তাহার উপরে খসখসের টাটি দিয়া আচ্ছাদিত করা হইল। দ্রবিড়াদি দেশে প্রস্তুত উত্তম বস্ত্রের চন্দ্রাতপ বিস্তীর্ণ করা হইল। স্থানে স্থানে বৈদুর্যমণি ও স্বর্ণ নির্মিত ঝুমকা প্রলম্বিত করা হইল। পঞ্চবর্ণের নানাপ্রকার পুষ্প দ্বারা পুষ্পগৃহ ও মধ্যে মধ্যে তোরণ প্রস্তুত করা হইল। সুগন্ধ জলের দ্বারা রাজমার্গ সিক্ত করা হইল। স্থানে স্থানে অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াইয়া চতুর্দিক সুগন্ধিত করা হইল। স্থানে স্থানে শস্ত্রধারী প্রহরী সমূহকে নিযুক্ত করা হইল। বিলাসিনী স্ত্রীগণের দ্বারা মঙ্গলোপচারের জন্য স্থানে স্থানে গীতবাদ্যের সহিত নৃত্যের ব্যবস্থা করা হইল। এইরূপে সমস্ত সজ্জা সম্পন্ন করিয়া ভদ্রা মহারাজকে মহারাণী ও পরিজনগণসহ আগমন করিতে প্রধান পুরুষের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

মহারাজ শ্রেণিক মহারাজ্ঞী চেল্লনা সহ শিবিকায় আরোহণ করিয়া শালিভদ্রের গৃহে যাইবার জন্য নির্গত হইলেন। পথিমধ্যে দেবলোকের ন্যায় নয়ন-মন-সুখকর সুসজ্জিত ও সুগন্ধ পরিপূরিত রাজমার্গ স্বয়ং দেখিতে দেখিতে ও রাজ্ঞীকে দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে তিনি ভদ্রার গৃহদ্বারে সমাগত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে মঙ্গলোপচারের দ্বারা স্বাগত করা হইল।

এইবার রাজদম্পতি শ্রেষ্ঠীর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে দুই পার্শ্বে নির্মিত অশ্বশালা ও হস্তীশালা ও তাহাতে নানাস্থানের শঙ্খ-চামর শোভিত সুন্দর সুন্দর অশ্ব ও হস্তী দেখিতে পাইলেন। তৎপরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথম তলে নানাপ্রকারের দ্রব্যসমূহের ভাণ্ডাগার দেখিতে পাইলেন। দ্বিতীয় তলে দাস দাসীগণের বাস ও আহার করিবার ব্যবস্থা, তৃতীয় তলে একপার্শ্বে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিহিত সূপকারগণকে রন্ধন করিতে ও অন্যপার্শ্বে তাম্বুলপ্রস্তুতকারীগণকে সুপারী কর্তন ও কুঙ্কুম, ঘনসার ও কস্তুরীর দ্বারা সুবাসিত করিয়া তাম্বুলপ্রস্তুত করিতে দেখিতে পাইলেন। চতুর্থতলে শয়ন করিবার (Bed room), উপবেশন করিবার (Drawing room) ও ভোজন করিবার (Dining room) পৃথক পৃথক গৃহগুলি এবং মূল্যবান দ্রব্যের ভাণ্ডাগার সমূহ দৃষ্ট হইল। এই তলে রাজা রাজ্ঞীর জন্য সুখাসন বিস্তৃত করা ছিল তাহাতে তাঁহাদের উপবেশন করান হইল। রাজা শালিভদ্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্রা উত্তর করিলেন যে মহারাজের স্নানাহার সম্পন্ন হইলেই শালিভদ্র আসিবে। আপনারা কৃপা করিয়া স্নানাহার করুন।

এই প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলে রাজা রাজ্ঞীকে পৃথক পৃথক চিত্রবিচিত্র মণ্ডপে উপবেশন করাইয়া সুগন্ধিত অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্তনের দ্বারা তাঁহাদের শরীর মর্দন করা

হইল। তৎপরে তাঁহারা পঞ্চমতলে গমন করিলেন। সেখানে সর্বঋতুতে উৎপন্ন হয় এরূপ পুষ্প ও ফলের দ্বারা পরিপূর্ণ, পুন্নাগ নাগ চম্পকাদি নানাপ্রকারের পুষ্পবৃক্ষ ও লতাসমূহের দ্বারা সুশোভিত, নন্দনবনের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর উদ্যান দেখিতে পাইলেন। উদ্যানের উপরিভাগ আচ্ছাদিত থাকায় ইহাতে চন্দ্রসূর্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু ইহার মধ্যস্থিত স্তম্ভ ও অলিন্দগুলিতে পঞ্চবর্ণের রত্নসমূহ জড়িত থাকায় তাহার প্রভার দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হইয়া স্নিগ্ধ আলোকে সমস্ত উদ্যানটি উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত। এই উদ্যানের মধ্যভাগে একটী ক্রীড়া পুষ্করিণী (Swimming pool) ছিল। ইহার চতুর্দিকে স্থিত উপবেশন করিবার বেদীসমূহ চন্দ্রমণির দ্বারা নির্মিত। পুষ্করিণীর জল নিষ্কাশন ও পূরণ করিবার জন্য কীলকের ব্যবস্থা ছিল। ইহার চতুর্দিকে সুসজ্জিত তোরণ ছিল। সংক্ষেপে বলিলে পুষ্করিণীটির অসাধারণ সৌন্দর্য দেবতাগণেরও মনোহরণ করিত।

এই পুষ্করিণীতে মহারাজ শ্রেণিক ও রাজ্ঞী চেল্লনা জলক্রীড়া ও স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখনও রাজার প্রেরিত জলতরঙ্গের হিল্লোলে রাণী আকৃষ্ট হইয়া রাজার নিকট আসিতে লাগিলেন, কখনও বা রাণীর প্রেরিত তরঙ্গ হিল্লোলে রাজা আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে নানাপ্রকার জলক্রীড়া ও স্নান করিয়া তাঁহারা পুষ্করিণী হইতে উত্থিত হইতে যাইতেছিলেন ইতিমধ্যে রাজার অঙ্গুলি হইতে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় জলাশয়ে পড়িয়া গেল। রাজা ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে ভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্রা পুষ্করিণীর জল নিষ্কাশন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। জল নিষ্কাশিত হইলে দেখা গেল যে এক কোণে অঙ্গুরীয়টী মলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা তাহা উঠাইতে উদ্যত হইলে ভদ্রা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পুত্রবধূগণের গাত্র মলের দ্বারা উহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে, দেব, স্পর্শ করিবেন না। ভদ্রা দাসীর দ্বারা অঙ্গুরীয়টী আনাইয়া রাজাকে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে রাজ-দম্পতির শরীরে বিলেপন করিবার জন্য গোশীর্ষ চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য এবং পরিধান করিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র আনীত হইল।

স্নানান্তে রাজদম্পতি পুনরায় চতুর্থ তলে অবতরণ করিলে চৈত্যভবন উদ্ঘাটিত করা হইল। সেখানে মণিরত্ন ও সুবর্ণাদি নির্মিত জিন প্রতিমার দর্শন ও নানা উপকরণের দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা চৈত্যভবনের অপূর্ব শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।

এইবার মহারাজকে ভোজনগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা, কুল প্রভৃতি চর্বনীয় পদার্থ পরিবেশন করা হইল। রাজা যথাযোগ্য গ্রহণ করিলে ইক্ষু, খর্জুর, আম্রাদি চুষ্য দ্রব্য আনীত হইল, তৎপরে নানাপ্রকারের অবলেহ্যাদি (চাটনি)

লেহ্য পদার্থ এবং তাহার পরে অশোক, মোদক, ফেণী, ঘেবর, ঘৃতপূর্ণাদি ভোজ্যপদার্থ (মিষ্টান্ন) পরিবেশিত হইল। তৎপরে সুগন্ধযুক্ত নানাপ্রকারের চাউল (ভাত) ও অনেক দ্রব্যের সংযোগে প্রস্তুত কাঢ় আনা হইল। এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষিত হইলে ভোজন পাত্র সমূহ উঠাইয়া লইয়া রাজার হস্ত ধৌত করান হইল। তৎপরে নানা প্রকারের দধি নির্মিত খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপিত করা হইল ও তাহা ভুক্ত হইলে পাত্র উঠাইয়া লইয়া আবার হস্ত ধৌত করান হইল। তৎপরে শর্করা, মধু, কুঙ্কুমাদি মিশ্রিত ঘন দুগ্ধ প্রদত্ত হইল। আহার সমাপনান্তে মহারাজকে আচমন করান হইল। দন্ত পরিষ্কার করিবার দন্তশলাকা ও হস্ত প্রক্ষালন করিবার জন্য সুগন্ধিত উদ্‌বর্তন ও ঈষদুষ্ণ জল প্রদত্ত হইল যাহাতে অন্নের গন্ধ চলিয়া যায়।

রাজা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া উঠিলে তাঁহাকে অন্য গৃহে উপবেশন করাইয়া বিলেপন, পুষ্প, গন্ধ, মাল্য, তাম্বুলাদি প্রদান করা হইল। তাঁহার মনোরঞ্জনার্থে কুশল শিল্পীর দ্বারা গীতবাদ্যাদি আরম্ভ করান হইল। রাজা শালিভদ্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভদ্রা তাহাকে আনিবার জন্য ষষ্ঠতলে গমন করিয়া শালিভদ্রকে চতুর্থতলে নামিয়া আসিতে বলিলেন। বলিলেন যে শ্রেণিককে দেখিবে চল। শালিভদ্র কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন যে মা, ইহা মহার্ঘ কি সুলভ তাহা তুমিই জান, যাহা ভাল হয় কর। ভদ্রা তখন তাহাকে বলিলেন—বৎস, শ্রেণিক কোন পণ্যদ্রব্য নহেন। তিনি আমাদের দেশের রাজা, আমাদের স্বামী, আমাদের প্রভু। তিনি তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। চল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। শালিভদ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—আমারও কেহ স্বামী, প্রভু আছে? আমি এরূপ কথা কখনও শ্রবণ করি নাই। যাহা হউক মাতার আগ্রহে শালিভদ্র চতুর্থ তলে নামিয়া আসিলেন। রাজা তাঁহার দেবকুমারের ন্যায় সুন্দর রূপ দেখিয়া তাঁহাকে সাগ্রহে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিতে লাগিলেন। শালিভদ্র অস্বস্তি অনুভব করিতেছেন দেখিয়া অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে যাইতে দিতে ভদ্রা অনুরোধ করিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে—শালিভদ্র মনুষ্যের গন্ধ এমন কি এখানকার পুষ্পমাল্যাদির গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। প্রতিদিন দেবতা ইহাকে দেবলোকসুলভ পুষ্প, গন্ধ, বিলেপনাদি প্রদান করেন। আহারের জন্য দিব্য ফলাদি, পানের জন্য দিব্য জল ও পরিধানের জন্য দিব্য বস্ত্রালঙ্কারও দেবতা প্রদান করেন। একবার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করে না। অতএব এখানে এ অস্বস্তি অনুভব করিতেছে, ইহাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। নৃপতি চেল্লনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন যে তুমি বল যে বণিকের স্ত্রীগণ যাহা পাপোশ রূপে ব্যবহার করে রাজার অগ্রমহিষী তাহা গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করিতে লালায়িত হইয়াও পায় না। কিন্তু এখন দেখিলে এরূপ

বৈভব কোনও রাজার নাই। সমস্তই পূর্বজন্মকৃত পুণ্য কর্মের ফল। রাজা শালিভদ্রকে গমন করিতে আদেশ দিলেন। শালিভদ্র গমন করিলে রাজাও প্রত্যাবর্তনের জন্য উত্থিত হইলেন ও শিবিকায় আরোহণ করিলেন। ভদ্রা উত্তম জাতির অশ্ব ও হস্তিশাবক রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রাজা উপঢৌকন গ্রহণে প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ভদ্রার বিশেষ উপরোধে গ্রহণ করিয়া রাণী ও পরিজনগণ সহ প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শালিভদ্রের মনে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমারও স্বামী, প্রভু আছে। আমি স্বাধীন নই। আমার এই অতুল বৈভব, দেবলোকের ন্যায় প্রাসাদ, অনুপম সুখভোগ, সমস্তই বৃথা। বৃথা এ জীবন, ধিক্ এ সুখভোগ। তিনি তীব্র নৈরাশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার পাদবন্দনা করেন সেই সংসার ত্যাগী সাধুই শ্রেষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। ভদ্রার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হইল। একমাত্র পুত্রের বৈরাগ্যে তিনি মর্মাহত হইলেন। পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু শালিভদ্র নিজের সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকিয়া ভগবান মহাবীরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শালিভদ্রের সুন্দরী নাম্নী জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ধন্য নামক অতি সমৃদ্ধিশালী বণিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভগবান মহাবীরের রাজগৃহ আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া ধন্য তাঁহাকে বন্দনা করিতে যাইবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্নান করিবার জন্য স্নানপীঠে তিনি উপবেশন করিলেন ও তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী তাঁহার পায়ে অভ্যঙ্গ মর্দন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী অশ্রুবিন্দু ধন্যের পায়ে পতিত হইল। তিনি সুন্দরীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দরী উত্তর করিলেন যে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা শালিভদ্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার বত্রিশজন পত্নীর মধ্যে প্রতিদিন এক এক জনকে পরিত্যাগ করিতেছে। পূর্ণ যৌবন, অতুলনীয় সম্পত্তি, অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া দুঃখে অশ্রুপাত হইতেছে। সুন্দরীর কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য বলিলেন—সে কাপুরুষ। বৈরাগ্য হইলে সমস্ত একদিনেই পরিত্যাগ করিত। সুন্দরী কিছু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন—ত্যাগ করা মুখে বলা সহজ কিন্তু কার্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন। মহাশয় উদাহরণ দেখান না। ধন্য বলিয়া উঠিলেন—স্নান করিয়াই ভগবান মহাবীরের নিকট শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতেছি। ধন্যের কথায় সুন্দরী অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং নানা প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুনয় করিতে

লাগিলেন কিন্তু ধন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া স্নানের পরই মহাড়ম্বরের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথিমধ্যে শালিভদ্রের গৃহে আসিয়া শালিভদ্রকে সত্বর আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। শালিভদ্রও তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া মহাড়ম্বরের সহিত নির্গত হইয়া উভয়ে ভগবান মহাবীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

জৈন কথা

হরিসত্য ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্রব্য, গুণ, পর্যায়—দ্রব্য বিচারে গুণ ও পর্যায়ের কথা উঠে। জৈ গণের দ্রব্য কতকটা Cartesian গণের Substance। যাহা দ্রব্যের সহিত চিরকাল অবিচ্ছেদে অবস্থান করে অর্থাৎ যাহার অভাবে দ্রব্য দ্রব্যই হইতে পারেনা, জৈনগণ তাহাকে গুণ বলিয়া থাকেন। এই গুণ Cartesian গণের attribute। দ্রব্য স্বভাবতঃ অবিকৃত থাকিয়াও যে অনন্ত পরিবর্তন সমূহের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদের নাম পর্যায়। জৈনগণ যাহাকে পর্যায় বলিয়াছেন, Cartersian গণ তাহাকেই Mode বলিয়া থাকেন এ কথা মনে করা যাইতে পারে। জৈন মতে পুদ্গল, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল এই পাঁচ অজীব দ্রব্য এবং জীব—সর্বশুদ্ধ ছয়টি দ্রব্য।

অবধিজ্ঞান—মতিশ্রুতাদি পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে মতি জ্ঞান ও শ্রুতজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরতার বাহিরে যে সমস্ত রূপবিশিষ্ট দ্রব্য থাকে, তাহাদের অসাধারণ অনুভূতির নাম অবধিজ্ঞান, বর্তমান কালে Occultist গণ যাহাকে Clairvoyance বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই কতক পরিমাণে অবধি জ্ঞান, একথা বলা যাইতে পারে। অবধিজ্ঞান ত্রিবিধ—দেশাবধি, পরমাবধি ও সর্বাবধি। দেশাবধি দিক্ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ; পরমাবধি অসীম। সর্বাবধির দ্বারা বিশ্বের সমস্ত রূপী দ্রব্যই অনুভব করা যাইতে পারে।

মনঃপর্যায়—পরচিত্তবৃত্তির বিষয়ের অনুভব মনঃপর্যায়জ্ঞান। Occultistগণ ইহাকে Telepathy ও Mind-reading আখ্যা প্রদান করেন। ঋজুমতি ও বিপুলমতি ভেদে মনঃ পর্যায়জ্ঞান দ্বিবিধ। ঋজুমতি সঙ্কীর্ণতর। বিপুলমতীর সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত চিত্তের বিষয়াদির সূক্ষ্ম আলোকন হয়।

কেবলজ্ঞান—চৈতন্য বিশিষ্ট জীবগণের জ্ঞানের ইহাই চরম স্তর। বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই কেবল জ্ঞানের আয়ত্ত। ইহা সর্বজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্য Theosophist গণের Omniscience এর নামান্তর। কেবলজ্ঞান আত্মা হইতে উদ্ভূত হয় এবং ইহা ইন্দ্রিয় বা কোনও বিষয়েরই মুখাপেক্ষী নহে। কেবলজ্ঞানী মুক্তপুরুষ। কেবলজ্ঞানের প্রসঙ্গেই জৈন দর্শনের সপ্ততত্ত্বের কথা উঠিয়া পড়ে। জৈন দর্শনের সপ্ত তত্ত্বের নাম—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ।

জীব-অজীব—জৈন মতে জীব চেতনাদি গুণ বিশিষ্ট। স্বভাবতঃ শুদ্ধজীব অনাদিকাল হইতে অজীব তত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে। এই অজীব হইতে মুক্তির নামই জীবের মুক্তি।

আস্রব—স্বভাবতঃ শুদ্ধজীব যখন জীবাতিরিক্ত বিষয়ে অনুরাগী বা দ্বেষযুক্ত হয়, জৈন মতে তখন জীবতত্ত্বে কর্মপুদ্গলের আস্রব অর্থাৎ প্রবেশ হয়। আস্রব দুই প্রকার: শুভ ও অশুভ। শুভাস্রবের ফলে জীব স্বর্গ সুখাদির অধিকারী হয়, অশুভাস্রবের ফলে জীব নরকযাতনাদি ভোগ করে। আস্রব কালে যে সকল কর্মপুদ্গল জীবতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করে তাহাদের প্রকৃতি আট প্রকার যথা—জ্ঞানবরণীয় কর্ম, দর্শনাবরণীয় কর্ম, মোহনীয় কর্ম, বেদনীয় কর্ম, আয়ুষ্কর্ম, নামকর্ম, গোত্রকর্ম ও অন্তরায়কর্ম। যে কর্ম জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তাহার নাম জ্ঞানাবরণীয় কর্ম। যে কর্মের প্রভাবে জীবের স্বভাবিক দর্শনগুণ আচ্ছন্ন হয়, তাহার নাম দর্শনাবরণীয় কর্ম। যে কর্ম জীবের সম্যক্ত্ব ও চারিত্রগুণের ঘাত করে অর্থাৎ জীবকে অতত্ত্বে শ্রদ্ধা ও লোভাদির বশীভূত করায় তাহার নাম মোহনীয় কর্ম। বেদনীয় কর্মের ফলে সুখ দুঃখ রূপ সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। আয়ুকর্মের ফলে জীব মনুষ্যায়ু প্রভৃতি লাভ করে। নাম কর্মের সহিত জীবের গতি অগতি, শরীর প্রভৃতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট। গোত্র কর্মের ফলে উচ্চ বা নীচ গোত্র নির্দিষ্ট হয়। অন্তরায় কর্মের ফলে দানাদি সৎকার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই অষ্টবিধ কর্মের ১৪৮ প্রকার ভেদ আছে, বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

বন্ধ—উক্তরূপ কর্ম পুদ্গলের আস্রবে স্বভাবতঃ মুক্ত জীব বদ্ধ হয়। অজীব কর্মপুদ্গলের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ার নামই বন্ধ।

সংবর—সংসারে মুহ্যমান জীবের মধ্যে কর্মাস্রব যদ্দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তাহার নাম সংবর। সংবর বদ্ধ জীবকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। জৈনমতে তিন গুপ্তি, পঞ্চধা সমিতি, দশ প্রকার ধর্ম, দ্বাদশ অনুপ্রেক্ষা, দ্বাবিংশতি পরিষহ জয়, পঞ্চ চারিত্র ও দ্বাদশ তপ দ্বারা সংবর সাধিত হয়। এ সকলের লক্ষণ বলা এ স্থলে সম্ভবপর নহে।

নির্জরা—কর্মের একদেশ ক্ষয়ের নাম নির্জরা। সবিপাক ও অবিপাকভেদে নির্জরা দ্বিবিধ। নির্দিষ্ট ফলভোগান্তে কর্মের যে স্বাভাবিক ক্ষয়, তাহা সবিপাক নির্জরা এবং ফল ভোগের পূর্বেই ধ্যানাদি সাধনা দ্বারা কর্মক্ষয়ের নাম অবিপাক নির্জরা।

মোক্ষ—জীবের যাবতীয় কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জীব মোক্ষলাভ করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত হয়। জৈন মতে মোক্ষ পথে চতুর্দশটী স্তর (বা চতুর্দশ গুণস্থান) আছে। তাহাদের নাম—মিথ্যাত্ব, সাসাদন, মিশ্র, অবিরত সম্যক্ত, দেশ বিরত, প্রমত্ত বিরত, অপ্রমত্ত বিরত, অপূর্ব করণ, অনিবৃত্ত করণ, সূক্ষ্মসাম্পরায়, উপশান্তমোহ,

ক্ষীণমোহ, সংযোগ কেবলী ও অযোগ কেবলী। এ সকলের লক্ষণ কথন এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

মোক্ষমার্গ—জৈনাচার্যগণের মতে সম্যক দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক চারিত্র এই তিনটি একত্রে মোক্ষ প্রাপক। এই তিনটী জৈন দর্শনে ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

সম্যক দর্শন—জীব অজীব প্রভৃতি পূর্বোক্ত সপ্ত তত্ত্বে অবিচলিত বিশ্বাস বা আস্থা রাখার নাম সম্যক্ দর্শন।

সম্যক জ্ঞান—সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় নামক ত্রিবিধ সমারোপ অর্থাৎ ভ্রান্তি আছে। সমারোপ বিবর্জিত জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান।

সম্যক চারিত্র—রাগ দ্বেষ বিরহিত হইয়া পবিত্রাচরণের অনুষ্ঠান সম্যকচারিত্র।

এ স্থলে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করা হইতেছে। কিন্তু জৈনকথা বলিতে গেলে আরও কত কথাই বলিতে হয়। জৈন কথা জৈন কাব্য, জৈন পুরাণ, জৈন সাহিত্য, জৈন নীতিগ্রন্থ, জৈন জ্যোতিষ, জৈন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে কত কাহিনী কত সিদ্ধান্ত কত ঐতিহাসিক উপকরণ রহিয়াছে, তাহা আলোচনা ব্যতিরেকে লোক সমক্ষে ধরিবার উপায় নাই। উপরে জৈন দর্শনের যেটুকু বিবৃতি হইয়াছে তাহা অতি সামান্য—জৈন তত্ত্ব বিদ্যার কঙ্কাল মাত্র। প্রমাণাভাস, বাদবিচার, ফল পরীক্ষা প্রভৃতি জৈন দর্শনের অনেক তথ্যই এ প্রবন্ধে স্থান ও সময়াভাবে আলোচিত হয় নাই। তথাপি যেটুকু আলোচিত হইয়াছে, সুধীগণ তাহারই মধ্যে এমন অনেক তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন যেগুলির মধ্যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের বহু মূল নিহিত আছে।

জৈন বিদ্যা ভারতবর্ষের বিদ্যা, এ বিদ্যার পুনরুদ্ধার ভারতবর্ষের একটী কর্তব্য। এ বিদ্যার প্রতি বাঙ্গালীরও একটী কর্তব্য আছে। ভারতের লুপ্ত সভ্যতার অনুসন্ধানে বাঙ্গালীগণই অগ্রগামী। এই বাঙলা দেশে ইতিপূর্বেই বহু জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বাঙ্‌লাদেশে 'সরাক' নামে অহিংসা পরায়ণ একটী জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; হিন্দু সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও, তাহারা যে প্রাচীন জৈন বা শ্রাবকগণের বংশধর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাদের আচার কিংবদন্তী ও দীক্ষা হইতেও ইহা সপ্রমাণ হয়।

এরূপ অনুমিত হয় যে বংগদেশীয় বর্দ্ধমান নগর চতুর্বিংশতি তীর্থংকর মহাবীর স্বামীর অন্যতম নাম বর্দ্ধমানের স্মৃতিই বহন করিয়া আসিতেছে। উক্ত বীর স্বামীর নামেই বঙ্গদেশীয় বীরভূম অদ্যাপি সুপরিচিত। বাঙ্‌লাদেশে একাধিক তীর্থংকর মূর্তি ব্যতীত প্রাচীন জৈন মন্দিরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙ্‌লার অনতি দূরবর্তী মগধদেশেই জৈনগণের বহু তীর্থংকরের আবির্ভাব হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে সভ্যতা-ভিমানী বঙ্গদেশীয়গণ যদি জৈন বিদ্যার পুনরুদ্ধারে যত্নবান না হন তাহা হইলে তাহা

আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। আরও একটি কথা আছে। অহিংসা প্রভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উদ্ধার সম্পাদন করিতে হইবে ইহা মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা হইলেও বংগদেশই সর্বপ্রথম উক্ত রাজনৈতিক অহিংসা তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল এবং কার্যে পরিণত করিয়াছিল বোধ হয়, একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অহিংসা ব্রতের মূল কোথায়? বেদশাসিত ধর্মে অহিংসার প্রশংসা আছে, ইহা স্বীকার্য। বৌদ্ধগণও অহিংসাকে তাঁহাদের ধর্মের মূলভিত্তি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জৈন সম্প্রদায়ই অহিংসা ধর্মকে শুধু সমাদর করিয়াই নিরস্ত নহেন, কায় মন ও বাক্যের সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জৈন সমাজের এই সূচিভেদ্য অজ্ঞান অন্ধকারের দিনেও একথা স্বীকার করিতে হইবে। জৈন বিদ্যার সমাদর করিবার পক্ষে এটীও একটি কারণ বলিয়া বংগীয় বিদ্বৎগণের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

জিনবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

মুনিশ্রী মহেন্দ্রকুমারজী 'প্রথম'

প্রখ্যাত জৈনসাধু শ্রীমহেন্দ্রকুমারজী 'প্রথম' বিগত ৫ এপ্রিল কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রাজস্থানের রাজলদেশরে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ১১ বছর বয়সে মুনিদীক্ষা গ্রহণ করে তিনি জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের তেরাপন্থী সাধু সংঘে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল তিনি এই সংঘেই থাকেন কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে তেরাপন্থী সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীতুলসী গণির সঙ্গে মত পার্থক্য হওয়ায় তেরাপন্থী সাধু সংঘ হতে বহিষ্কৃত হন। বহিষ্কৃত হয়েও তিনি জৈন মুনির আচার যথোচিত পালন করতে থাকেন। তাঁর সাধুচর্যা ও বিদ্বতার জন্য তেরাপন্থী সম্প্রদায়ের গৃহী অনুযায়ীগণের এক বৃহৎ অংশ তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখেন।

জৈন সাধুর জীবন সরল ও বাহ্যাড়ম্বরহীন হয়। মহেন্দ্রমুনির জীবনও ছিল তাই। কিন্তু এই সরল জীবনের অন্তরালে ছিল এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পণ্ডিত ছিলেন ও উক্ত ভাষায় ক্ষণমাত্রে কবিতা রচনা করতে পারতেন। হিন্দীর ওপরও ছিল তাঁর ভালো অধিকার। জৈন কথানকের তিনি এক 'সিরিজ' লিখতে সুরু করেন যার ২৭ ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ১০০ ভাগ লেখার। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করেছেন। সেই সব গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় এক শ যার কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিছু হয়নি। তাঁর স্মৃতি শক্তিও ছিল অসাধারণ। এই স্মৃতি শক্তির প্রদর্শন ভারতের গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে তিনি বহুবার করেছেন। এই স্মৃতিশক্তির জন্য তাঁকে শতাবধানী বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাঁর ভক্ত ও অনুযায়ীরা তাঁকে 'উপাধ্যায়' ও 'অধ্যাত্মযোগী'র উপাধি প্রদান করে।

মুনি মহেন্দ্রকুমারজীর স্বাস্থ্য কোনো সময়েই ভালো থাকত না। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে তিনি এক দুর্ঘটনা গ্রস্ত হন। হয়ত সেই দুর্ঘটনা তাঁর মৃত্যুকে আরো সন্নিকট করে দিয়েছিল। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মুনিশ্রী মহেন্দ্রকুমারজী 'প্রথম' লিখিত গ্রন্থের তালিকা

১। অংক স্মৃতিকে প্রকার, আত্মারাম এণ্ড সন্স দিল্লী, ১৯৬১
২। অপ্রতিমযোগী ভগবান মহাবীর, অর্হৎ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৮
৩। আচার্য শ্রীভিক্ষু কী আচার ক্রান্তি, অর্হৎ প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৬
৪। আত্মগীত, অণুব্রত সমিতি, জয়পুর, ১৯৬৯
৫। উৎস এক ধারা অনেক, সাহিত্য সমিধি, অগ্রগামী যুবক পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৭৫
৬। ঐকাহ্নিক-পঞ্চশতী, সংস্কৃত, অণুব্রত সমিতি, জয়পুর, ১৯৬১
২য় সংস্করণ, সাহিত্য নিকেতন, দিল্লী, ১৯৬৯
৭। জনপদ বিহার, আত্মারাম এণ্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৬১
৮। জম্বুস্বামী কী লূর, অণুব্রত সমিতি, জয়পুর, ১৯৬৯
৯। জৈন কহানিয়াঁ, ভাগ ১ ৯, আত্মারাম এণ্ড সন্স, দিল্লী ১৯৬১
ভাগ ২, ৬, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬৩
ভাগ ১০, ১৯৬৪
ভাগ ১১-২১, ২৪, ১৯৭১
ভাগ ২৬-২৭, সাহিত্য সমিধি, অগ্রগামী যুবক পরিষদ, কলিকাতা ১৯৭৫
১০। তিন শ ষাঠ কহানিয়াঁ, ভাগ ১-২, সাহিত্য সমিধি, অগ্রগামী যুবক পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৭৫
১১। তীর্থংকর ঋষভ ঔর চক্রবর্তী ভরত, সাহিত্য সমিধি, অগ্রগামী যুবক পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৭৫
১২। প্রজ্ঞা প্রতীতি পরিণাম, আত্মারাম এণ্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৭২
১৩। ভগবান মহাবীর জীবন ঔর দর্শন, অর্হৎ প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৬
১৪। সত্যম্ শিবম্, হিন্দী-রাজস্থানী, মোহনলাল শুভকরণ, রাজলদেশর (চুরু), ১৯৬৭
১৫। সাগর মেঁ গাগর, অর্হৎ প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৭
১৬। স্মৃতি বঢ়ানে কা প্রকার, সাহিত্য সমিধি, অগ্রগামী যুবক পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৭৫
১৭। স্মৃতি বর্দ্ধিত করার উপায়, বাংলা, অনুবাদ এ. বি. রায়চৌধুরী, অর্হৎ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৬

১৮। How to Augment Human Memory, English, trans by K. C. Lalwani, Sahitya Samidhi, Agragami Yuvak Parishad, Calcutta, 1976

১৯। Jain Stories, Part 1-2, English, trans, by K. C. Lalwani, Arhat Prakashan, Calcutta, 1976

Part 3, 1978

অপ্রকাশিত গ্রন্থ

১। জাতি স্মরণ জ্ঞান ক্যা ও কৈসে ?
২। জৈন কহানিয়া, কয়েক ভাগ।
৩। তীন সো ষাঠ কহানিয়া, কয়েকভাগ।
৪। ধনজী সুভদ্রা কী লূর।
৫। শ্রীপাল ঔর ময়না সুন্দরী।
৬। সেল শিক্ষা শতক, রাজস্থানী।

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VII No. 3 Sraman July 1979
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

। ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮৬ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

প্রতীক [১]

ওপরে অংকিত চিহ্নের স্বস্তিক মানুষ, তীর্যক, দেব ও নারক গতির পরিচায়ক। তিনটী বিন্দু ত্রিরত্ন বা জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র্যের। অর্দ্ধচন্দ্র সিদ্ধশীলার। অর্দ্ধচন্দ্রের ওপরের বিন্দু সিদ্ধদের। এই চার গতির ভেতর দিয়ে যাত্রা শেষ করলেই জীব জ্ঞান দর্শন ও চারিত্র্যের-সাহায্যে সিদ্ধশীলায় যেতে পারে যেখান হতে আর পুনরাবর্তন করতে হয় না। একথা নিজেকে বারবার স্মরণ করাবার জন্যই ভক্তেরা মন্দিরে মন্দিরে তীর্থংকরদের মূর্তির সামনে, আচার্যের স্থাপনার কাছে চাল দিয়ে এই প্রতীক অংকিত করেন। এ প্রতীকের বিবিধ রূপ দেখা যায়। সেই রূপে শিল্পকলার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী দুই সংখ্যায় এই ধরণের আরো দুটী চিত্র প্রকাশিত করা হবে।

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে জৈন ধর্ম

ডাঃ জি. সি. চৌধুরী

ভগবান বুদ্ধ যে ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন তার নাম ছিল মাগধী। মাগধীতে বুদ্ধ বচনকে পরিয়ায় বা পলিয়ায় বলা হয়েছে। কালক্রমে এই পরিয়ায়/পলিয়ায় হতে পালি শব্দ নিষ্পন্ন হয় যার অর্থ ভাষার সঙ্গে যুক্ত করলে দাঁড়ায় বুদ্ধ বচনের ভাষা। বৌদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃতেও লেখা হয়েছে কিন্তু বুদ্ধবচনের প্রতিনিধিত্ব কারী ভাষা হল পালি।

যেভাবে বুদ্ধ জন ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন সেই রকম ভগবান মহাবীরও তৎকালীন জনভাষা অর্দ্ধ মাগধীতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই দুই ভাষ মগধে প্রচলিত মাগাধীরই দুই রূপ। এই দুই সম্প্রদায়ের নেতা একই ক্ষেত্রে বিচরণ করে উপদেশ দিয়েছিলেন এজন্য এই দুই সম্প্রদায়ের আগম গ্রন্থে ভাষা, ভাব, শৈলী ও বর্ণনার সাম্য দেখা যায় এবং এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ থাকে না যে মহাবীর ও বুদ্ধ সমকালীন ছিলেন। পালি গ্রন্থের বর্ণনা হতে এও জানা যায় যে এই দুই মহাত্মা কখনো কখনো একই নগরে, একই গ্রামে, একই পাড়ায় বিচরণ করতেন কিন্তু এ কথার উল্লেখ কোনো সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই পাওয়া যায় না যে এই দুই যুগ পুরুষ নিজেদের মতভেদ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বা আলোচনা করেছেন। তবে একথা অবশ্যই জানা যায় যে এঁদের শিষ্য তথা অনুযায়ীরা প্রায়শঃই একে অন্যের কাছে যেতেন, নিজেদের সন্দেহের সমাধান করতেন বা বাদবিবাদ করতেন।

যাহোক, পালি গ্রন্থ পাঠ করলে স্পষ্টতঃই জানা যায় যে ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর সমকালীন শিষ্যরা জৈন সম্প্রদায়ের অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেছিলেন। এই চোখে দেখা বর্ণনা হতে আমরা জৈনদের ইতিহাস, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও আচার বিষয়ক মান্যতা বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। এই নিবন্ধে তাই দেখানোর প্রযত্ন করব।

ইতিহাস ঃ

পালি গ্রন্থে জৈন সম্প্রদায়ের নাম 'নিগণ্ঠ', 'নিগ্গণ্ঠ' এবং 'নিগন্ধ' পাওয়া যায়, যাকে প্রাকৃতে 'নীয়ন্ঠ' ও সংস্কৃতে 'নিগ্র্ন্থ' নামে অভিহিত করা যায়। ঐ সম্প্রদায়ের প্রচারকের নাম 'নাতপুত্র' বা 'নাটপুত্ত' যাকে প্রাকৃতে 'নাতপুত্ত' বা 'নায়পুত্ত' ও সংস্কৃতে জ্ঞাতৃপুত্র বলা হয়। এভাবে 'নিগণ্ঠ' সম্প্রদায়ের 'নাতপুত্ত'কে একটী শব্দে 'নিগণ্ঠ নাতপুত্ত' বলা হয়েছে। 'নিগণ্ঠ'র অর্থ পালিগ্রন্থে বন্ধন রহিত যার তাৎপর্য ছিল অন্তর

ও বাহ্য পরিগ্রহ রহিত। কিন্তু 'নাতপুত্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তির জ্ঞান পালি গ্রন্থ হতে হয় না। জৈন গ্রন্থের সাহায্যে আমরা একথা জানি যে মহাবীর ক্ষত্রিয়দের একটী শাখা 'জ্ঞাতৃ' = নাত = নায় তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধকে শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করায় 'সাক্যপুত্র' বলা হয় সেভাবে মহাবীরকে 'নাতপুত্ত' বলা হয়। সামঞ্‌ঞফল আদি কিছু সুত্ত গ্রন্থে মহাবীরকে 'অগ্নিবেশন' (অগ্নিবৈশ্যায়ন) নামে সম্বোধিত করা হয়েছে কিন্তু জৈনগ্রন্থ দৃষ্টে বলা যায় যে তা ঠিক নয়। মহাবীরের গোত্র কাশ্যপ ছিল যদিও তাঁর একজন প্রমুখ শিষ্য সুধর্মা অগ্নিবৈশ্যায়ন গোত্রীয় ছিলেন।

পালিগ্রন্থে জৈন ধর্মের অনুযায়ীদের 'নিগণ্ঠপুত্ত', 'নিগণ্ঠ' ও 'নিগণ্ঠসাবক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য 'নিগণ্ঠী'[১] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কতিপয় বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধকালীন ছয় জন অন্য তীর্থংকরদের পরম্পরাগত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে নাতপুত্তের নামও উল্লিখিত হয়েছে। ঐসব নামের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিশেষণ লাগান হয়: 'সংঘী চেব গণী চ, গণাচারিয়ো, ঞাতো, যসস্সী তিত্থকরো, সাধুসম্মতো বহুজনস্স, রত্তঞ্‌ঞূ, চিরপব্বজিতো, অদ্ধগতো, বয়ো অনুপ্পত্তো'[২] অর্থাৎ সংঘ স্বামী, গণাধ্যক্ষ, গণাচার্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্থংকর, বহুজন কর্তৃক সম্মানিত, অনুভবী, চিরকাল হতে সাধু, বয়োবৃদ্ধ। এতে 'অদ্ধগতো' ও 'বয়ো অনুপ্পত্তো' এই দুই বিশেষণে বিদ্বানেরা মনে করেন যে অন্য তীর্থিকদের মত মহাবীরও আয়ুতে বুদ্ধের বড় ছিলেন ও বৃদ্ধ ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও অনুমান করেন যে দীঘ নিকায়ের সংগীতি পর্যায় ও পাসাদিক সুত্ত ও মজ্‌ঝিমনিকায়ের সামগামসুত্তের কথনানুসারে মহাবীরের নির্বাণ বুদ্ধের নির্বাণের পূর্বে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে শুধু এই-টুকুই বলা যায় যে জার্মান পণ্ডিত প্রফেসর জেকোবী একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মহাবীরের নির্বাণ বুদ্ধ নির্বাণের পরে হয়। ওঁর মতে বজ্জি ও লিচ্ছবীদের সঙ্গে অজাতশত্রু কুণিকের যে যুদ্ধ হয় তা বুদ্ধ নির্বাণের পরে কিন্তু মহাবীরের বর্তমান থাকা কালে। যদিও বজ্জি ও লিচ্ছবী গণরাজ্যের উল্লেখ দুই সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই পাওয়া যায় কিন্তু সেই যুদ্ধের উল্লেখ ও বর্ণনা কেবলমাত্র জৈনাগমেই পাওয়া যায়, বৌদ্ধাগমে নয়।[৩] শুধু তাই নয় এই দুই মহাপুরুষের আয়ু দেখলে একথা মনে হয় যে মহাবীর বুদ্ধ হতে আয়ুতে কিছু ছোট ছিলেন। বুদ্ধ নির্বাণের সময় বুদ্ধের বয়স ৮০ হয়, মহাবীরের ৭২।

১ মজ্‌ঝিমনিকায়, উপালিসুত্ত।
২ দীঘনিকায়, সামঞ্‌ঞফলসুত্ত।
৩ বীর সংবত ও জৈন কালগণনা, ভারতীয় বিদ্যা, সিংঘী স্মারক, পৃঃ ১৭৭।

এর সঙ্গে এও মনে রাখা দরকার যে মহাবীর ধর্মোপদেশ দান প্রারম্ভ করবার অনেক পূর্বেই বুদ্ধ নিজের ধর্মমত স্থাপিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। সে যা হোক, উপরোক্ত অনেক বিশেষণের ওই দুই বিশেষণ—'অদ্ধগতো' ও 'বয়ো অনুপ্পত্তো' পালিসূত্রেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে ও আরো আশ্চর্যের যে কিছু সূত্রে যেমন মহাসকুলদায়ী (ম নি) ও সভিয়সুত্ত (সুত্তনিয়াত)-এ তে পাওয়াও যায় না। নিগণ্ঠ নাতপুত্তের সঙ্গে অন্য বিশেষণের সমর্থন জৈন আগমের দ্বারা যথোচিত ভাবে হয়। উপালি সুত্তের 'নিগণ্ঠ', 'নিগণ্ঠী' শব্দে মনে হয় যে মহাবীরের সংঘে স্ত্রীলোকেরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতেন।

ভগবান মহাবীরের নির্বাণ সূচিত কারী কতিপয় তথোক্ত পালি সূত্রে লেখা হয় যে 'যে সময়ে নিগণ্ঠ নাতপুত্তের মৃত্যু পাবাতে হয় সেই সময় নিগণ্ঠদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। দুই পক্ষ হয়…একে অন্যকে বাক্যরূপ শেলে বিদ্ধ করতে থাকে যেন নিগণ্ঠদের মধ্যে বধ (যুদ্ধ) হচ্ছে। নিগণ্ঠ নাতপুত্তের যে শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহস্থ শিষ্য ছিল তারাও নিগণ্ঠদের ঐরূপ দুরাখ্যাত, দুষ্প্রবেদিত, অপ্রতিষ্ঠিত, আশ্রয় রহিত ধর্মে অন্যমনস্ক হয়ে খিন্ন ও বিরক্ত হয়।'[8] এই বর্ণনায় মনে হয় যে মহাবীরের মৃত্যু পাবায় হয় ও তার পরপরই সংঘভেদ হতে আরম্ভ করে। এই কথনানুসরে ভগবান মহাবীরের নির্বাণ পাবায় হওয়া জৈনাগম সমর্থিত। এই পাবা জৈন বৌদ্ধ আগমানুসারে মল্লদের পাবা যা বর্তমানে গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত। কিন্তু সংঘভেদের কথা ঐ সময়ে জৈনাগম দ্বারা সমর্থিত হয় না। জৈনমান্যতা অনুসারে ভগবান মহাবীরের নির্বাণের দুশো আড়াইশ বছর পর কতকগুলি কারণে সংঘভেদ হয়। এতে মনে হয় যে মহাবীরের নির্বাণের ঘটনার মতই এই ঘটনা উক্ত সূত্র গুলিতে নিরাধার ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বা পিটকের সংকলন সময়ে শ্বেতাম্বর দিগম্বর সংঘভেদের ঘটনাকে বিপর্যাসরূপে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। উক্ত বিবরণে গৃহস্থ শিষ্যদের শ্বেতবস্ত্রধারী বিশেষণে ভূষিত করায় মনে হয় যে শ্বেতাম্বর সাধুদের গৃহীশিষ্য রূপে নেওয়া হয়েছে। তবে এই উল্লেখে একথা বলা যায় যে পালিগ্রন্থ জৈনদের সংঘবিচ্ছেদ, তা আগেই হোক বা পরে, সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল।

পালিগ্রন্থ হতে এও জানা যায় যে ভগবান মহাবীর ও ওঁর অনুযায়ীদের বিচরণক্ষেত্র ছিল অংগ, মগধ, কাশী, কোশল ও বজ্জি, লিচ্ছবী ও মল্লদের গণরাজ্য। রাজগৃহ, নালন্দা, বৈশালী, পাবা ও শ্রাবস্তীতে জৈনরা অধিক সংখ্যায় বাস করত ও বৈশালীর লিচ্ছবীরা জৈনধর্মের প্রবল সমর্থক ছিল।

মজ্‌ঝিম নিকায় ও অংগুত্তর নিকায়ের কতিপয় সূত্রে বলা হয়েছে 'নিগণ্ঠগণ

---

[8] দীঘনিকায়, সংগীতি পর্যায় এবং পাসাদিক সুত্ত, মজ্‌ঝিমনিকায়, সামগামসুত্ত।

মহাবীরকে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অপরিমিত জ্ঞান ও দর্শন যুক্ত, চলা অবস্থায়, দাঁড়িয়ে থাকা কালে, নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় অপরিশেষ জ্ঞান দর্শন শালী বলে মনে করতেন।' [৫] এই বিবরণ জৈনগণের দ্বারা সমর্থিত ও জৈনমান্যতাও এইরূপ। এখানকার অপরিশেষ জ্ঞানদর্শন জৈনাগমের কেবলজ্ঞান ও কেবল দর্শনের সূচক। সর্বজ্ঞত সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের যে মত ছিল তা এই : না তিনি নিজেকে সর্বজ্ঞ বলে অভিহিত করতেন-না অন্যকে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করতেন। সন্দক সুত্তে [৬] তাঁর শিষ্য সর্বজ্ঞতাকে এই বলে পরিহাস করেছেন : 'যে শাস্ত্র সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অশেষ জ্ঞানদর্শন যুক্ত হবার দাবী করে সেও শূন্য ঘরে যায়, সেখানে ভিক্ষাও পায় না, কুকুরও কামড়ে দেয়, সর্বজ্ঞ হওয়া সত্বেও স্ত্রীপুরুষের নাম গোত্র আদি জিজ্ঞাসা করে, গ্রাম নিগমের নাম ও ও পথের খোঁজ করে। 'আপনি সর্বজ্ঞ হয়ে এ কেন জিজ্ঞাসা করছেন' জিজ্ঞাসা করলে বলেন, শূন্য ঘরে যাওয়া বিহিত ছিল তাই গেছি, ভিক্ষা পাওয়া বিহিত ছিল না তাই পাই নি, কুকুর কামড়ানো বিহিত ছিল তাই কামড়েছে, ইত্যাদি।' এই আলোচনা হতে মনে হয় যে সেই সময় সর্বজ্ঞতার মান্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার কটূ আলোচনা হতেও সুরু হয়েছিল।

দর্শন

ভগবান মহাবীরের দার্শনিকতার পৃষ্ঠভূমি ছিল ক্রিয়াবাদ (কর্মবাদ)। বিনয় পিটকের মহাবগ্‌গ গ্রন্থের সিংহ সেনাপতি প্রসঙ্গে ও অংগুত্তর নিকায়ে [৭] নিগণ্ঠমতকে 'কিরিয়াবাদ' (ক্রিয়াবাদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ক্রিয়াবাদের অর্থ 'সুখ-দুখং সয়ং কতং' [৮] অর্থাৎ সুখদুঃখের কর্তা জীব নিজে। এ কথা সূত্র কৃতাঙ্গে এ ভাবে বলা হয়েছে 'সয়ং কডং চ দুক্‌খং নাণ্‌ণকডম্‌' [৯] অর্থাৎ জীব নিজেই সুখ দুঃখের কর্তা ও ভোক্তা, তার সুখ দুঃখের কর্তা অন্য কেউ নয়। ক্রিয়াবাদের এই নিগণ্ঠ মান্যতা মজ্‌ঝিম নিকায়ের দেবদহ সুত্তে সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে : 'এই পুরুষ পুদ্‌গল যা কিছু সুখ দু:খ বা অদুঃখ অসুখ অনুভব করে সে সমস্ত পূর্বকৃত কর্মের জন্যই। এই পূর্ব কৃত কর্মকে তপস্যা দ্বারা নষ্ট করায় ও নূতন কর্ম না করলে

৫ চুল দুক্‌খক্খন্ধসুত্ত, চুলসকুলদায়িসুত্ত, অংগুত্তরনিকায়, III, পৃঃ ৭৪, IV. পৃঃ ৪২৮।
৬ মজ্‌ঝিমনিকায়, ৭৬।
৭ ভাগ ৪, পৃষ্ঠ ১৮০--১৮১।
৮ অংগুত্তর নিকায়, ভাগ ৩, পৃঃ ৪৪০।
৯ ১. ১২. II।

ভবিষ্যতে বিপাকহীন অনাশ্রব হয়। বিপাকরহিত হলে কর্মক্ষয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় ও দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় ও বেদনাক্ষয়ে সমস্ত দুঃখই জীর্ণ হয়ে যায়।'

ভগবান মহাবীর আধ্যাত্মিক শুদ্ধির জন্য তপস্যা প্রতিপাদিত করেন। এই দৃষ্টি কোণে নির্গ্রন্থ সাধু কঠোর তপশ্চরণ করেন। কিন্তু বুদ্ধ এই তপস্যার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে তোমার সাধনা ও তপোমার্গ ব্যর্থ যদি তুমি এ কথা না জান যে তুমি কেমন ছিলে, কেমন আছ, কোন কোন পাপ করেছ, কত পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, কত নষ্ট হবার আছে, কবে তা থেকে মুক্তি পাবে,[১০] ইত্যাদি। নির্গ্রন্থ তপস্যার এই ধরণের আলোচনা পালি গ্রন্থে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এতে মনে হয় যে বুদ্ধ নির্গ্রন্থ তপস্যার অন্তরাত্মার আলোচনা না করে কেবল তার উগ্র বাহ্য রূপের আলোচনা করেছেন। নির্গ্রন্থ পরম্পরার মান্যতা এই যে কায়ক্লেশ বা তপস্যায় চিত্তমল বিদূরিত করে আধ্যাত্মিক শুদ্ধি আনয়ন কর। যদি তাতে আধ্যাত্মিক শুদ্ধি না হয় তবে তা ব্যর্থ। এই দৃষ্টিতে বুদ্ধের আলোচনায় ও জৈন দৃষ্টিতে তাত্ত্বিক কোনো পার্থক্য নেই।

ভগবান মহাবীর ক্রিয়াবাদ স্থাপনা করতে গিয়ে বলেন যে সংসারে প্রাণীদের জীবন অংশতঃ ভাগ্য (পূর্বজন্মকৃত কর্ম) ও কিছু মানবীয় প্রযত্ন (ইহজন্ম কৃত)-র উপর নির্ভর করে। এ ভাবে নিয়য়ানিয়য়ং (নিয়তানিয়তঃ)-এর সিদ্ধান্ত স্থাপিত করে তৎকালীন অন্য ক্রিয়াবাদিদের হতে নিজের স্পষ্ট মত ভেদ প্রকট করেন। তিনি বলেন পূর্বজন্মকৃত কর্মের অধীন হয়ে আমরা কি ভাবে ভবভ্রমণ করেছি ও কি ভাবে এখন করছি। ভগবান বুদ্ধও ক্রিয়াবাদী ছিলেন কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল হেতু প্রভব। এই হেতুর (প্রতীত্য) সমুৎপাদ জন্য চক্রাকারে আমরা আবর্তিত হচ্ছি।[১১]

[ক্রমশঃ

১০ মজ্ঝিমনিকায়, চূলদুক্খখন্ধ এবং দেবদহসুত্ত।

১১ মহাবগ্গ, সারিপুত্ত মোগ্গলান প্রব্রজ্যা।

ভক্তামর স্তোত্র

মানতুঙ্গ স্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইত্থং যথা তব বিভূতিরভূজ্জিনেন্দ্র
ধর্মোপদেশনবিধৌ ন তথা পরস্য।
যাদৃক্‌প্রভা দিনকৃতঃ প্রহতান্ধকারা
তাদৃক্‌কুতো গ্রহগণস্য বিকাশিনোঽপি ॥ ৩৭

হে জিনেন্দ্র ধর্মোপদেশ দেবার সময় তোমার বিভূতি যেরূপ প্রকটিত হয় তেমন অন্যের হয় না। তা ঠিকই। কারণ অন্ধকারকে নষ্ট করবার প্রভা যেমন সূর্যের হয় তেমন অন্য প্রকাশমান নক্ষত্রাদির কোথায় হয়? ৩৭

শ্চোতন্মদাবিলবিলোলকপোলমূল
মত্তভ্রমদ্‌ভ্রমরনাদবিবৃদ্ধকোপম্।
ঐরাবতাভমিভমুদ্ধতমাপতন্তং
দৃষ্ট্বা ভয়ং ভবতি নো ভবদাশ্রিতানাং ॥ ৩৮

হে নাথ, ঝরতে থাকা মদে যার কপোলের মূলভাগ মলিন ও চঞ্চল এবং তার ওপর উন্মত্ত হয়ে ভ্রমণ কারী ভ্রমরের শব্দে যার ক্রোধ আরো বর্দ্ধিত হয়েছে এরূপ ঐরাবতের মত উন্মত্ত হাতীকে নিজের ওপর এসে পড়তে দেখেও তোমার যারা আশ্রিত তারা ভয়ভীত হয় না। ৩৮

[সংসারী জীব মদোন্মত্ত হাতীর মত। হাতীর কপোল হতে মদ ঝরে, এদের মুখ হতে অহঙ্কার সূচক বাক্য। আত্মীয় পরিজন ভ্রমরের মত যারা স্বার্থের জন্য সতত তাকে বিরত করে। এতে সে আরো কুপিত হয়। কিন্তু তোমার যারা ভক্ত তারা এরূপ সংসারী জীব হতে ভয় পায় না। তারা তাদের মধ্যে থেকেও তোমাকে সর্বদা দেখে ও নিত্য আনন্দে থাকে।]

ভিন্নেভকুম্ভগলদুজ্জ্বলশোণিতাক্ত
মুক্তাফলপ্রকরভূষিতভূমিভাগঃ।
বদ্ধক্রমঃ ক্রমগতং হরিণাধিপোঽপি
নাক্রামতি ক্রমযুগাচলসংশ্রিতং তে ॥ ৩৯

হে নাথ, হস্তী মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে রক্তপ্লুত মুক্তোয় পৃথ্বিভাগ যে শোভিত করেছে এবং আক্রমণে যে উদ্যত এরূপ সিংহের কবলে থেকেও তোমার যুগল চরণরূপী পর্বতের যে আশ্রয় নিয়েছে সে নির্ভয়ে থাকে। ৩৯

[মিথ্যাত্ব বা অবিদ্যা রূপী জ্ঞানই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান রূপী সিংহ সংসারের সমস্ত প্রাণীকে নিজের কবলে কবলিত করে রেখেছে। বড় বড় পণ্ডিত, বিদ্বান, ধর্মাত্মা হস্তীরূপ। এদের মস্তিষ্ক হতে যে তার্কিক সাহিত্য, লৌকিক জ্ঞান আদি নির্গত হয় তা মিথ্যাত্বরূপী রক্ত রঞ্জিত মুক্তো। এতে পৃথিবীর শোভামাত্র বিবর্দ্ধিত হয়। এরূপ অজ্ঞান সিংহের কবলে থেকেও যে তোমার চরণদ্বয়ের আশ্রয় নেয় সে নির্ভয় হয়ে যায়।]

কল্পান্তকালপবনোদ্ধতবহ্নিকল্প
দাবানলং জ্বলিতমুজ্জ্বলমুৎস্ফুলিঙ্গম্।
বিশ্বং জিঘৎসুমিব সম্মুখমাপতন্ত
ত্বন্নামকীর্তনজলং শময়ত্যশেষম্ ॥ ৪০

হে ভগবন্, প্রলয়কালীন পবনে উত্তেজিত অগ্নি সদৃশ এবং যা হতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ও যা বিশ্বসংসারকে বিনষ্ট করতে অভিলাষী এমন যে সম্মুখাগত দাবানল তাও তোমার নামোচ্চারণ মাত্র শান্ত হয়ে যায়। ৪০

[প্রলয়কালীন পবন কাম, ক্রোধ, লোভাদিরূপ কষায়। অগ্নি তৃষ্ণা। স্ফুলিঙ্গ সঙ্কল্প বিকল্প। এরূপ অগ্নি বিশ্বকে গ্রাস করছে। এরূপ অগ্নিকেও তোমার ভক্ত তোমার নামোচ্চারণে শান্ত করে দেয়।]

রক্তেক্ষণং সমদকোকিলকণ্ঠনীলং
ক্রোধোদ্ধতং ফণিনমুৎফণমাপতন্তম্।
আক্রামতি ক্রমযুগেণ নিরস্তশঙ্ক
স্ত্বন্নামনাগদমনী হৃদিয়স্যপুংসঃ ॥ ৪১

হে জগন্নাথ, যার হৃদয়ে তোমার নাম রূপ সর্পদমন কারী শেঁকড় রয়েছে সে লাল যার চোখ, মদে যে উন্মত্ত, কোকিলকণ্ঠের মত কালো যার গাত্রবর্ণ, ক্রোধে যে ফণা তুলে দংশন করবার জন্য উদ্যত এমন সাপকেও শঙ্কারহিত হয়ে পায়ের তলায় মাড়িয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যায়। ৪১

[সাপ যেমন গুপ্ত ধন রক্ষা করে তেমনি অন্তরায় (সৎকাজে যা বাধা দেয়) রূপী সর্প আত্ম রূপ ধনকে রক্ষা করে। সাধক যখন আত্মাভিমুখী হবার চেষ্টা করে তখন সেই সর্প তাকে বাধা দেয়। বাধা প্রাপ্ত হয়ে তারা নিশ্চেষ্ট হয় না বরং সেই সর্পকে দমন করে আরো তীব্র বেগে অগ্রসর হয়।]

বল্‌গত্তুরঙ্গগজগর্জিতভীমনাদ-
মাজৌ বলং বলবতামপি ভূপতীনাম্ ।
উদ্যদ্দিবাকরময়ূখশিখাপবিদ্ধং
ত্বৎকীর্তনাত্তম ইবাশু ভিদামুপৈতি ॥ ৪২

হে জিনেশ্বর, সংগ্রামে তোমার নাম কীর্তন করা মাত্র বলবান ভূপতিদের যুদ্ধরত হাতী ও ঘোড়ার গর্জনা ও যুদ্ধরত সৈন্যদল সূর্যোদয়ে সূর্য কিরণের অগ্রভাগ দ্বারা যেমন অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় সেই রকম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় । ৪২

[কিন্তু সেই সর্প অত সহজে আত্মারূপ গুপ্ত ধনকে প্রকট হতে দেয়না । বিপুল বিক্রমে সে তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু তোমার নামের কাছে সব ব্যর্থ ।]

কুন্তাগ্রভিন্নগজশোণিতবারিবাহ
বেগাবতারতরণাতুরয়োধমীমে ।
যুদ্ধেজয়ং বিজিতদুর্জয়জেয়পক্ষা-
স্ত্বৎপাদপংকজবনাশ্রয়িণো লভন্তে ॥ ৪৩

হে দেব, বর্শার অগ্রভাগদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হাতীদের রক্তরূপ জল প্রবাহে ভাসমান আতুর যোদ্ধাদের দুর্গতিতে ভয়ানক যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে তোমার চরণ রূপী কমল বনের যে আশ্রয় নেয় সে যে শত্রুকে জয় করা সম্ভব নয় সেরূপ শত্রুকেও পরাজিত করে জয়লাভ করে ॥ ৪৩

[পূর্ববর্তী ভাবই সম্প্রসারিত হয়েছে । আধ্যাত্মিক সংগ্রামে যখন সে পরাজিত প্রায়, মোহ যখন জয়ী হতে যায় সেই সময় সে যদি তোমার চরণে শরণ নেয় তবে মোহকে পরাস্ত করে বিজয়লক্ষ্মী সেই লাভ করে ।]

অংভোনিধৌ ক্ষুভিতভীষণনক্রচক্র-
পাঠীনপীঠভয়দোল্বণবাড়বাগ্নৌ ।
রংগতরংগশিখরস্থিতযানপাত্রাস্-
ত্রাসং বিহায় ভবতঃ স্মরণাদ্‌ব্রজংতি ॥ ৪৪

হে প্রভু, ভীষণ নক্রচক্র, মকর, পাঠীন ও পীঠে ও ভয়ঙ্কর বাড়বাগ্নিতে যে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ, সেই সমুদ্রের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত জাহাজে অবস্থিত ব্যক্তিও তোমাকে স্মরণ মাত্র ত্রাসহীন হয়ে তা অতিক্রম করতে সমর্থ । ৪৪

[অর্থাৎ তোমাকে স্মরণ মাত্র এরূপ দুস্তর যে ভব জলধি তাও অতিক্রম করতে সে সমর্থ হয় ।]

উদ্ভূতভীষণজলোদরভারভুগ্নাঃ
শোচ্যাংদশামুপগতাশ্চ্যুতজীবিতাশাঃ।
ত্বৎপাদপংকজরজোঽমৃতদিগ্ধদেহাঃ
মর্ত্যা ভবন্তি মকরধ্বজতুল্যরূপাঃ॥ ৪৫

হে জিনরাজ, ভীষণ জলোদর রোগে কুব্জতা প্রাপ্ত হয়ে যে এমন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে যার আর বাঁচবার আশা থাকে না, সেও যদি তোমার চরণ ধূলির অমৃতে নিজ দেহকে লিপ্ত করে তবে কামদেবের সমান রূপ লাভ করে। ৪৫

আপাদকংঠমুরুশৃংখলবেষ্টিতাঙ্গা
গাঢ়ং বৃহন্নিগড়কোটিনিঘৃষ্টজংঘাঃ।
ত্বন্নামমন্ত্রমনিশং মনুজাঃ স্মরংতঃ
সদ্যঃ স্বয়ং বিগতবন্ধভয়া ভবন্তি॥ ৪৬

হে দেব, যার শরীর পা হতে গলা অবধি বড় বড় শৃঙ্খলে নিরন্তর আবদ্ধ ও বেড়ীর তীক্ষ্ণতায় যার জংঘা ভীষণ ভাবে ছিলে গেছে, এমন মানুষও যদি তোমার নামরূপী মন্ত্র উচ্চারণ করে তবে সে নিজ হতেই সেই সময়েই বন্ধন ভয় হতে সর্বদা রহিত হয়ে যায়। ৪৬

[তোমাকে যে স্মরণ করে তার সমস্ত রকম ভৌতিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।]

মত্তদ্বিপেন্দ্রমৃগরাজদবানলাহি-
সংগ্রামবারিধিমহোদরবন্ধনোত্থম্।
তস্যাশু নাশমুপযাতি ভয়ং ভিয়েব
যস্তাবকং স্তবমিমং মতিমানধীতে॥ ৪৭

যে সুধী তোমার এই স্তব অধ্যয়ন করে, পড়ে, তার মত্ত হাতী, সিংহ, অগ্নি, সর্প, সংগ্রাম, সমুদ্র, উদরীরোগ ও বন্ধন. হতে যে আট প্রকারর ভয় সেই ভয় শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। ৪৭

স্তোত্রস্রজং তব জিনেন্দ্রগুণৈর্নিবদ্ধাং
ভক্ত্যা ময়া রুচিরবর্ণবিচিত্রপুষ্পাম্।
ধত্তে জনো য ইহ কণ্ঠগতামজস্রং
তং মানতুংগমবশা সমুপৈতি লক্ষ্মীঃ॥ ৪৮

হে জিনেন্দ্র, এই সংসারে ভক্তিদ্বারা আমি যে মনোজ্ঞ আকারাদি বর্ণের যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস আদি বিচিত্র ফুলের মালা গুম্ফিত করেছি সেই মালাকে সর্বদা যে কণ্ঠে ধারণ করে সেই মানতুঙ্গ বা আদরণীয় পুরুষ, রাজ্য, স্বর্গ, মোক্ষ ও সৎকাব্যরূপ লক্ষ্মী অনায়াসেই লাভ করে। ৪৮

সুবর্ণভূমিতে কালকাচার্য

ডাঃ ইউ. পি. শাহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরিশিষ্ট ১

দত্ত রাজা ও আর্যকালক

দত্ত রাজার সামনে যজ্ঞফল নিরূপণ করার ঘটনার উল্লেখ (ঘটনা নং ১) আবশ্যক চূর্ণির অতিরিক্ত আবশ্যক নির্যুক্তির দুই স্থানে পাওয়া যায়। ৯২ মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জীর ধারণা এই ঘটনার সম্পর্ক সম্ভবতঃ প্রথম কালকাচার্যের সঙ্গে। ৯৩ আবশ্যক নির্যুক্তির এক গাথায় (৮৬৫) উল্লিখিত সামায়িকের আট দৃষ্টান্তের মধ্যে তৃতীয় দৃষ্টান্ত আর্য কালকের যার বর্ণনা আবশ্যক চূর্ণিতে এই প্রকারে পাওয়া যায়ঃ তুরুমিণী নগরীতে জিতশত্রু নামে রাজা ছিল। সেখানে ভদ্রা নামে এক ব্রাহ্মণী থাকত যার ছেলের নাম ছিল দত্ত। ভদ্রার এক ভাই ছিল যে জৈনমতে দীক্ষা নিয়েছিল—তার নাম ছিল আর্য কালক। দত্ত জুয়াড়ী ও মদ্যপ ছিল। সে রাজসেবা করতে করতে প্রধান সৈনিকের পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শেষে সে বিশ্বাসঘাত করে। রাজকুলের ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সে রাজাকে বন্দী করে ও নিজে সিংহাসনে আরোহণ করে। সে অনেক যজ্ঞ করে, একবার সে নিজের মামা কালকের কাছে গিয়ে বলে, আমি ধর্মোপদেশ শুনতে চাই। বলুন যজ্ঞের ফল কি? কালক তাকে ধর্মের স্বরূপ অধর্মের ফল ও অশুভ কর্মের উদয়ের বিষয়ে উপদেশ দেন এবং জিজ্ঞাসিত হয়ে যজ্ঞের ফল নরক বলেন। দত্ত এর প্রমাণ চাইলে কালক বলেন আজ হতে সপ্তম দিনে তুমি কুম্ভীতে সেদ্ধ হতে হতে কুকুরের দ্বারা ভক্ষিত হবে। দত্ত কালককে বন্দী করে কিন্তু তাই হয় যেমন আর্য কালক ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।

গ্রন্থকার লিখছেন 'এই প্রকার সত্য কথা বলা উচিত যেমন কালকাচার্য বলেছিলেন।' এই কথানকের সংক্ষিপ্তসার আবশ্যক নির্যুক্তির নিম্নলিখিত গাথাতেও সূচিত হয়েছে ঃ

৯২ দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ৯৭

৯৩ ঐ, পৃঃ ১১৪-১৫।

দণ্ডেণ পুচ্ছিও জো জন্নফলং কালগো তুরুমিণীএ।
সময়াএ আহিএণং সংমং বুইয়ং ভয়ং তেণং ॥ ৮৭১

মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী লিখছেন, 'যতক্ষণ চতুর্থ কালকের অস্তিত্ব সিদ্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ এই সপ্তম ঘটনার সম্পর্ক প্রথম কালকের সঙ্গে স্বীকার করায় কিছু অন্যায় হবে না।'

পরিশিষ্ট ২

ঘটনা নং ৫—গর্দভরাজার উচ্ছেদ

গর্দভিল্লোচ্ছেদ ঘটনার ১৪ সঙ্গে দুইটী জায়গার সম্বন্ধ আছে; এক উজ্জয়িনী, দ্বিতীয় পারস্য কূল। নিশীথ চূর্ণিতে পারস্য কূলের উল্লেখ আছে। সেখান হতে সাহি রাজা ও অন্য ৯৫ সাহিদের নিয়ে আর্য কালক হিন্দুক দেশে আসেন। এভাবে ৯৫ বা ৯৬ সাহি সমুদ্র পথে সৌরাষ্ট্রে আসেন।

এই জায়গা সম্পর্কে কথানকে গোলমাল দেখা যায়। মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী তার ভালোভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন—

'প্রাকৃত কালক কথায় পারসকূলের জায়গায় শককূল পাওয়া যায়। প্রভাবক চরিত্রান্তর্গত কালক প্রবন্ধে এই স্থানের নাম শাহি দেশ। কল্পসূত্র মূলের সঙ্গে ছাপা সংস্কৃত কালক কথায় এই স্থানকে সিন্ধু নদীর পশ্চিমে পার্শ্বকূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার হিমবন্ত থেরাবলীতে এই জায়গাকে সিন্ধু দেশ বলা হয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্ন নামের মধ্যে আমার মতে পারস্যকূল নামই ঠিক যার উল্লেখ এ বিষয়ের সবচেয়ে পুরুণো গ্রন্থ নিশীথচূর্ণিতে আছে। ১৫ পারসকূলের অর্থ পারস্যের উপকূল। ...কারণ ওখানকার অধিবাসীরা শক জাতির। তাই ওই প্রদেশের নাম শককূলও সংগত। কালক কথায় সিন্ধু নদী পার হয়ে সৌরাষ্ট্রে কালকাচার্যের যাবার উল্লেখ আছে কিন্তু তা ভ্রান্তিশূন্য নয়। কারণ সিন্ধু নদী অতিক্রম করে পাঞ্জাব বা সিন্ধু দেশে যাওয়া যায় সৌরাষ্ট্রে নয়। কিন্তু একথাও সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে কালকাচার্য সৌরাষ্ট্রে অবতরণ করেন। যদি তিনি সাহিদের সঙ্গে সিন্ধু নদী অতিক্রম করে হিন্দুস্থানে এসে থাকতেন তবে তিনি কোনোভাবেই সৌরাষ্ট্রে অবতরণ করতে পারতেন না। এতে এই প্রমাণিত হয় যে তিনি সিন্ধু নদী নয় সিন্ধু সমুদ্র অতিক্রম করে সৌরাষ্ট্রে অবতরণ করেন। নিশীথ চূর্ণিতেও সৌরাষ্ট্রে অবতরণের উল্লেখ আছে।

১৪ নিশীথ চূর্ণিগত এই ঘটনার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ১৮-১৯।

১৫ ওঁর ধারণায় পারস্যকূল নয় পারস্যকূল হওয়া উচিত। দ্রষ্টব্য ঐ, ১১০ পাদটীকা ১, ২, ৩।

সেখানে সিন্ধু নদীর নাম পর্যন্ত নাই। সম্ভব সিন্ধুর সঙ্গে নদী শব্দ পরে যুক্ত করা হয়েছে।[৯৬]

মুনিজীর এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এতে কালকের জাহাজে সমুদ্রযাত্রা সিদ্ধ হয়। একথা যদি সত্য হয় তবে কালকের সুবর্ণ ভূমি গমন (ইন্দোচীন আদি দেশে গমন) সম্পর্কে প্রাচীন পন্থী শ্রাবক ও শ্রমণগণের মনে শঙ্কা না রাখাই উচিত। কালকাচার্য সুবর্ণ-ভূমিতে স্থল পথেই হয়ত গিয়েছিলেন। কারু মনে হতে পারে যে তিনি দুর্গম স্থলপথে যেতে পারেন না ও সাধুদের যখন জলপথে যেতে নেই তবে তিনি যান নি কিন্তু কালকাচার্য সম্পর্কে এ ধরণের শঙ্কাও থাকে না কারণ আর্যকালক শকদের সঙ্গে জাহাজে করে দেশে ফিরেছিলেন এরূপ মুনিজীর অভিমত। এই মত যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আনামের গ্রন্থেও আবার লেখা হয়েছে কালকাচার্য আনাম হতে জাহাজে টন্‌কিন (দক্ষিণ চীন) গিয়ে ছিলেন। তাও অসম্ভব মনে হয় না।

পরিশিষ্ট ৩

রত্নসঞ্চয় প্রকরণের গাথা সম্পর্কে মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী

মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী এই গাথা সম্পর্কে লিখছেন—'যতদূর আমি দেখেছি শ্যামার্য নামক প্রথম কালকাচার্যের সময় সবখানে নির্বাণাব্দ ২৮০ তে জন্ম ৩০০তে দীক্ষা ৩৩৫ এ যুগ প্রধানপদ ও ৩৭৬ এ পরলোক গমন লেখা হয়েছে। এঁর সম্পূর্ণ আয়ু ৯৬ বছর। ইনি প্রজ্ঞাপনাকার ও নিগোদ ব্যাখ্যাকার নামেও প্রসিদ্ধ। এই সব বিষয়ে বিবেচনা করার পর একথা বলা অনুচিত হবে না যে উক্ত প্রকরণের গাথায় প্রথম কালকাচার্যের নিরূপণ করা হয়েছে বাস্তবে তা সত্য।'

দ্বিতীয় কালকের সময়—গর্দভিল্লোচ্ছেদক কালকাচার্যের সময়—নির্বাণাব্দ ৪৫৩ আর এই দ্বিতীয় কালককেই মুনিশ্রী যথার্থ কালক বলেন। আগে তিনি লিখছেন—'তৃতীয় কালকাচার্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারি না। কারণ ৭২০র কালকাচার্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই গাথার অতিরিক্ত অন্য কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় কারণ এই যে গাথায় এই কালকাচার্য শক্রসংস্তুত বলা হয়েছে, যা সর্বথা অসঙ্গত কারণ শক্রসংস্তুত কালকাচার্য ত তিনিই যিনি নিগোদ ব্যাখ্যাকার রূপে প্রসিদ্ধ। যুগ প্রধান স্থবিরাবলীর লেখানুসারে এই বিশেষণ প্রথম কালকাচার্যের প্রাপ্ত ছিল।

'চতুর্থ কালকাচার্যকে চতুর্থী পর্যুষণা কারক লেখা হয়েছে তা ঠিক নয়। যদিও বালভী যুগ প্রধান পট্টাবলীর লেখানুসারে এই সময়েও এক কালকাচার্য অবশ্য

---

৯৬ ঐ, পৃঃ ১১০।

হয়েছেন—যিনি নির্বাণাব্দ ৯৮১ হতে ৯৯৩ পর্যন্ত যুগপ্রধান ছিলেন। কিন্তু ইনি চতুর্থী পর্যুষণা কারক উল্লেখ সর্বথা অসঙ্গত।' ৯৭

এই চতুর্থ কালকের বিষয়ে মুনিশ্রী আগে লিখছেন—'বর্দ্ধমান হতে ৯৯৩ বছর ব্যতীত হলে পর কালকসূরি চতুর্থী পর্যুষণা প্রারম্ভ করলেন এরূপ এক প্রাকরণিক গাথা আছে যা তিত্থোগালী পইন্নয় হতে নেওয়া হয়েছে এরূপ সংদেহ বিষৌষধি গ্রন্থের গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। উপাধ্যায় ধর্মসাগরজীও স্বরচিত কল্পকিরণাবলীতে বলেছেন যে যদিও এই গাথা ধর্মঘোষসূরি রচিত কালসপ্ততিতে দেখা যায় তবুও তীর্থোদ্‌গার প্রকীর্ণকে এই গাথা পাওয়া যায় না।' ৯৮ আগে মুনিশ্রী বলছেন যে দ্বাদশ শতকে চতুর্থীকে আবার পঞ্চমীতে পরিবর্তিত করার প্রথা চালু হয়। তখন চতুর্থী পর্যুষণাকে অর্বাচীন প্রমাণিত করবার উদ্দেশ্যে কেউ এই গাথা রচনা করে থাকবে।৯৯

এই সব কথায় এ সুস্পষ্ট যে একের অধিক কালকের পরম্পরা শঙ্কারহিত নয়। এক নামের অনেক আচার্য হয়েছেন এতে ও যেমন যেমন ঘটনার সম্পর্ক প্রথম কালকের সঙ্গে জুড়তে শঙ্কা হতে থাকে তেমন তেমন সময় বা যেমন যেমন বিক্রম, শক ও তৎকালীন রাজাদের ইতিহাস মানুষ বিস্মৃত হতে থাকে ও পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয় তেমন তেমন মধ্যযুগীয় গ্রন্থকারেরা বিভ্রমে পড়ে ঘটনা গুলোকে বিভিন্ন কালকের সঙ্গে জুড়তে থাকেন। তিথির নির্ণয়ে বা শ্রুত শাস্ত্রের পুনঃ সংগ্রহে যাঁরা সময়ে সময়ে কিছু প্রযত্ন করেছেন তাঁরা কালকাচার্য নাম লাভ করেছেন এমনো হতে পারে। এ সব বিষয়ও অনুসন্ধান যোগ্য।

মুনিজী আর এক গাথার সমীক্ষা করেছেন তার উল্লেখ করাও প্রয়োজন। তিনি লিখছেন—

'উপরোক্ত গাথা ছাড়া কালকাচার্য বিষয়ক আর এক গাথা মেরুতুঙ্গের বিচার শ্রেণীর পরিশিষ্টে পাওয়া যায় যাতে নির্বাণাব্দ ৩২০ তে কালকাচার্য ছিলেন লেখা হয়েছে। এই গাথার ১০০ অর্থ এই প্রকার : 'বীর জিনেন্দ্রের ৩২০ বছর পর কালকাচার্য হলেন যিনি ইন্দ্রকে প্রতিবোধ দিলেন।' এই গাথায় কালকাচার্য বর্তমান ছিলেন তা মনে করা যেতে পারে কিন্তু সেরূপ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। শক্র প্রতিবোধের

৯৭ মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়, আর্যকালক, দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ৯৬-৯৭।

৯৮ দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ১১৮-১৯।

৯৯ বীর নির্বাণ সম্বৎ ও জৈনকাল গণনা, পৃঃ ৫৬-৫৮, পাদটীকা।

১০০ গাথা এই ধরণের—

সিরিবীরজিণিংদাও বরিসসয়া তিন্নিবীস (৩২০) অহিয়াও।

নির্দেশেই এ স্পষ্ট যে এই কালক তিনিই যাঁকে যুগপ্রধান রূপে নিগোদব্যাখ্যারণ বিশেষণের সঙ্গে যুগপ্রধান স্থবিরাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০১] যখন ইন্দ্রপ্রতিবোধক নিগোদব্যাখ্যাতা প্রথম কালকই তখন উত্তরাধ্যয়ন নির্যুক্তি গাথার আধারে তিনিই যে সুবর্ণ ভূমি গিয়েছিলেন সেও মানা উচিত।

পরিশিষ্ট ৪
নিমিত্তশাস্ত্রজ্ঞ আর্যকালক

নিশীথচূর্ণি, উদ্দেশক-১, পৃঃ ৭০-এ নিম্নলিখিত উল্লেখ আছে—'ইদাণিং বিজ্জত্তি অস্য ব্যাখ্যা বিজ্জট্ঠা উভয়ং সেবেন্তি। উভয়ং ণাম পাসথ গিহিত্থা তে বিজ্জমংতজোগাদিণিমিত্তং সেবেত্যর্থঃ।' এভাবে বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য সাধু পতিত সাধু অথবা গৃহস্থের সেবা করতে পারে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের এই আদেশের ব্যবহার কালকাচার্যের জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। নিমিত্ত জ্ঞান ইনি আজীবিক মতের সাধুদের নিকট প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা নিয়ে আলোচনাকারী পঞ্চকল্পচূর্ণিগত উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি। কালকাচার্য যে গ্রন্থ লেখেন তাঁর উল্লেখ পঞ্চকল্প ভাষ্য ও *পঞ্চকল্পচূর্ণিতে এই ঘটনার সঙ্গে পাওয়া যায় তাও আমরা দেখেছি।*

মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী এ বিষয়ে আরো কিছু সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। তিনি লিখছেন, 'পাটনের তালপত্রীয় পুস্তক ভাণ্ডারে তালপাতায় লেখা এক প্রকরণে (আনুমানিক চতুর্দশ শতকে লেখা এই প্রকরণের নাম জানা যায়নি) আমি প্রাকৃতে এক গাথা পড়েছি যার অর্থ হল—কালকসূরি প্রথমানুযোগে জিন, চক্রবর্তী, বাসুদেব আদির চরিত্র, ওদের পূর্বভব বর্ণন করেছেন ও লোকানুযোগে এক বৃহৎ নিমিত্ত শাস্ত্রের রচনা করেছেন।...ভোজ সাগর গণি নামক জৈন বিদ্বান সংস্কৃত ভাষায় রমল (এক প্রকার ফলিত জ্যোতিষ) বিদ্যাবিষয়ক এক গ্রন্থ লিখেছেন তাতে উনি লিখছেন যে সর্বপ্রথম এই বিদ্যা যবনদেশ হতে কালকাচার্য নিয়ে আসেন। কালকাচার্য তা নিয়ে আসুন বা না আসুন···কিন্তু এতে এই সিদ্ধ হয় যে নিমিত্ত অথবা জ্যোতিষ বিদ্যার জৈন বিদ্বানেরা কালকাচার্যকে সেই পথের আদি পথিক বলে মনে করেন।'[১০২]

মুনিজী লিখছেন—'আর্যকালক দিগ্‌গজ বিদ্বান ছাড়াও ক্রান্তিকারী পুরুষ ছিলেন। বিদ্বতার জন্য তাঁর যতটা প্রসিদ্ধি তার চেয়েও বেশী তাঁর ঘটনাময় জীবনের জন্য।

১০১ দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃঃ ৯৬-৯৭।

১০২ ঐ, পৃঃ ১০৫।

...আর্যকালকের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা সাধু জীবনের সামান্য লক্ষণ হতে অনেক অগ্রবর্তী।"১০৩

কালক জীবনের ঘটনায় যে দুই তত্ত্ব সাধারণের সমক্ষে আসে তা এই সব ঘটনায় আছে—এক, ওঁর নিমিত্তজ্ঞান, দুই, ওঁর বৈপ্লবিক দুঃসাহসিক ভয়হীন জীবন।

পরিশিষ্ট ৫
উত্তরাধ্যয়ননির্যুক্তি ও চূর্ণির বিবরণ

উজ্জেণী কালখমণা সাগর খমণা সুবন্ন ভূমীয়।
ইংদো আউয়সেসং পুচ্ছই সাদিব্বকরণং চ ॥ ১২

—উত্তরাধ্যয়ন নির্যুক্তি, অধ্যয়ন ২

'উজ্জেণী কালখমণা' গাথা (১১৯-১২৭) উজ্জেণীএ অজ্জকালগা আয়রিয়া বহুসুসুয়া, তেসিং সীসো ন কোই নাম ইচ্ছই পঢিউং তস্স সীসস্স সীসো বহুস্সও সাগরখমণো নাম সুবন্নভূমীএ গচ্ছেণ বিহরই, পচ্ছা আয়রিয়া পলায়িতুং তথ গতা সুবন্নভূমীং, সো য সাগরখমণো অণুযোগং কহয়তি পন্নাপরিসহং ন সহতি, ভণংতি খংতা। গতং এয়ং তুব্ভে সুখক্খংধং জাবোকধিজ্জতু, তেণ ভন্নতি—গতংতি তো সুণ সো সুণাবেউং পয়ত্তো তে য সিজ্জায়রণিব্বংধে কহিতে তস্সিসা সুবন্নভূমিং জতো বলিতা লোগো পুচ্ছতি তং বৃংদং গচ্ছংতং—কো এস আয়রিও গচ্ছতি? তেণ ভন্নতি—কালগায়রিয়া, তং জণপরংপরেণ ফুসংতং কোড্ডং সাগরখমণস্স সংপত্তং, জহা—কালগায়রিয়া আগচ্ছংতি, সাগর খমণো ভণতি—খংত! সব্বং মম পিতামহো আগচ্ছতি? তেণ ভন্নতি—ময়াবি সুতং; আগয়া সাধুণো, সো অব্ভুট্ঠিতো. সো তেহিং সাধূহিং ভন্নতি—খমাসম! কেই ইহাগতা? পচ্ছা সো সংকিতো ভণতি—খংতো এক্কো পরং আগতো, ণ তু জাণামি খমাসমণা, পচ্ছা সো খামেতি, ভণতি—মিচ্ছামি দুক্কড়ং জং-এত্থ মএ আসাদিয়া, পচ্ছা ভণতি খমাসমণা! কেরিসং অহং বক্খাণেমি? খমাসমণেণ ভন্নতি—লঠ্ঠং কিংতু মা গব্বং করেহি কো জাণতি কস্স কো আগমোত্তি, পচ্ছা ধূলিণা-এণ চিক্খিলপিংডএণ য আহরণং করেংতি, ণ তহা কায়ব্বং জহা সাগরখমণেণ কতং, তাণ অজ্জকালগাণ সমীবং সক্কো আগংতুং নিগোয়জীবে পুচ্ছতি, জহা অজ্জক্খিয়াণং তথৈব জাব সাদিব্বকরণং চ।

—উত্তরাধ্যয়ন চূর্ণি (ঋষভদেব কেশরীমলজী শ্বে. সংস্থা, রতলাম, খৃঃ ১৯৩৩) পৃ. ৮৩-৮৪, আরো দ্রষ্টব্য শ্রীশান্তিসাগর সূরিকৃত উত্তরাধ্যয়ন বৃহদবৃত্তি, ভাগ ১, পৃ. ১২৭-২৮।

[ক্রমশঃ

১০৩ ঐ, পৃঃ ১০৫।

আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য এবং পশুবলি

হরিদাস হালদার

[পূর্বানুবৃত্তি]

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। এখন জানা গিয়াছে যে 'এনোফিল' নামক মশকগণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া তাহার দেহের বিষ লইয়া পরে সুস্থ নীরোগ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীরে ঐ ম্যালেরিয়ার বিষ সংক্রামিত করিয়া দেয়। এই রূপে ঐ মশক কর্তৃক ম্যালেরিয়ার বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এনোফিল মশা বিল, ডোবা ও জলাশয়ের জলের উপর ডিম পাড়ে এবং ঐ সকল ডিম হইতে অসংখ্য মশার উৎপত্তি হয় এজন্য মিউনিসিপালিটি হইতে খানা, ডোবা ও পুষ্করিণীতে কেরোসিন ঢালিয়া ঐ সকল মশার ডিম নষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই কাজ করে তাহাদের 'মস্‌কুইটো ব্রিগেড্' বলে। কিন্তু মনুষ্য কর্তৃক সারা বঙ্গ দেশের সকল জলাশয়ে কেরোসিন ঢালিয়া সমস্ত মশার ডিম নষ্ট করা সম্ভবপর নহে। এই বৃহৎকার্য সংসাধিত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান তাঁহার মস্‌কুইটো ব্রিগেড্ সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্গ দেশের খানা, ডোবা, খাল, বিল ও অসংখ্য জলাশয়ে যে সকল কই, মাগুর, সিঙ্গি, খলিশা, প্রভৃতি মাছ আপনা আপনি প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহারাই ভগবানের মস্‌কুইটো ব্রিগেড্। এই সকল মাছ জলের উপর ভাসমান মশার ডিমগুলিকে নিঃশেষে খাইয়া ফেলে। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বাঙ্গালী জাতি ঐ সকল মাছকে উদরস্থ করিয়া এক দিকে যেমন আপনাদের রক্তের রোগ নিবারক শক্তির হ্রাস করিয়া আনিতেছে, অপর দিকে ঐ মৎস্যকুল নির্মূল হওয়াতে এনোফিল মশার বংশ বাড়িয়া ম্যালেরিয়ার বিষকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। এই রূপে বাঙ্গালী জাতি আমিষ ভোজনের ফলে দুই দিক দিয়া ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

নিরামিষভোজী মানুষ ও পশুগণ যেরূপ শ্রমশীল হয়, আমিষ ভোজিগণ সেরূপ শ্রমশীল হয় না। প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখিয়া গিয়াছেন, মিশর দেশের প্রস্তর নির্মিত পর্বত প্রমাণ পিরামিডগুলি তদ্দেশের নিরামিষ ভোজী শ্রমিকদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। সুয়েজ খালের ইঞ্জিনিয়র ডি. লিসেপ্স বলিয়াছেন যে হিন্দুস্থান ও আরব দেশের নিরামিষ ভোজী মজুরদের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ প্রকাণ্ড খাল খনন করা সম্ভবপর হইত না। আমিষভোজীদিগের হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়। তাহারা প্রচণ্ড

বেগে আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু মহিষ ও হস্তীর মত দীর্ঘকাল যুঝিতে পারে না। কেহ কেহ এরূপ তর্ক করেন যে নিরামিষভোজী জীব সকল মন্থরগতি, ভারবাহী ও পরাধীন হইয়া থাকে। একথা ঠিক নহে। ঘোড়া ও হরিণ নিরামিষ ভোজী, কিন্তু তাহাদের মত ক্ষিপ্রগতি জীব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গরিলা নামক বনমানুষ হাত দিয়া বন্দুকের নলী অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং সিংহকে বধ করিতে পারে। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টানদিগের বীরত্ব ও স্বাধীনতা প্রিয়তা ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। স্পার্টান জাতি সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজী ছিল। জাপানের কুস্তিগিরগণ, ভারতবর্ষের সিপাহিগণ এবং প্রাচীন গ্রীসের গ্লাডিয়েটারগণ নিরামিষভোজী হইলেও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত।

নিরামিষ ভোজনে যে মানবদেহের শক্তি ও সকল প্রকার কার্যকারিতা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে তাহার পোষকতায় আর একটি সুন্দর প্রমাণ আছে। নিরামিষ-ভোজী গায়কদিগের গান গাহিবার শক্তি ও গলা বৃদ্ধ বয়স অবধি ঠিক থাকে। নিরামিষভোজী বক্তাগণ বৃদ্ধ বয়সেও বৃহৎ বৃহৎ সভায় বিশেষ প্রচেষ্টা না করিয়াও এরূপ স্বরে বক্তৃতা করিতে পারেন যাহা হাজার হাজার লোক স্পষ্ট রূপে শুনিতে পায়। নিরামিষ আহারেতে দেহের wind বা দম বাড়ে তাহা শিকারীরাও জানে। এই কারণে শিকারে যাইবার সাতদিন পূর্ব হইতে তাহারা শিকারী কুকুরগুলিকে পাঁউরুটি ও দুধ বা অপর কোন নিরামিষ খাদ্য খাওয়াইয়া রাখে এবং তাহাদের মাংস খোরাক ঐ সাত-দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে তাহারা শিকারের দিন খুব ছুটাছুটি করিতে করিতে সহজে হাঁপাইয়া পড়ে না।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য লোকপূজ্য ব্যক্তি সাত্বিক নিরামিষ আহার করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশেও প্রাচীনকালে পাইথা-গোরাস, সক্রেটিস, সেনেকা, প্লুটার্ক প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষগণ নিরামিষ আহার করিতেন। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশের যে সকল মনীষা ব্যক্তি নিরামিষাহারী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে কবি শেলি, গ্রে. পোপ ও মিল্টন এবং দার্শনিক ও লেখক রুসো, লামার্টিন, কোপেন হাঠয়ার, এমার্সন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, থোরো এবং বহু খ্যাতনামা চিকিৎসকের নাম করা যাইতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্তা সার আইজাক নিউটনও নিরামিষভোজী ছিলেন।

পৃথিবীর অনেক স্থানে এখনও এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা একশত বৎসরের উপর—এমন কি সওয়াশ, দেড়শ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। এই সকল দীর্ঘায়ু লোক নিরামিষভোজী। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আমিষ বর্জনের ফলে দেহের মধ্যস্থ ধমনী ও যকৃতাদি যন্ত্রগুলিতে কোনরূপ আবর্জনা সঞ্চিত হইতে পারে না। সে কারণে নিরামিষভোজীর দেহ সত্বর বার্দ্ধক্য

বা জরা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি যে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ধর্ম ও নীতির দিক দিয়াও উদর পূরণের জন্য জীব হত্যার সমর্থন করা যায় না। মানুষের মধ্যে ভগবান ধর্মজ্ঞান বা কর্তব্য অকর্তব্য বিবেচনা দিয়াছেন। আমরা যতই কেন নিষ্ঠুর হই না, একটি নিরীহ জীবকে হত্যা করিবার সময় আমাদের প্রাণে একটু না একটু আঘাত লাগিবেই লাগিবে। বধ্য পশু যখন কাতর দৃষ্টিতে ঘাতকের দিকে চাহিয়া থাকে তখন সেই ঘাতকেরও প্রাণ একটু বিচলিত হয়। যে ঘাতক কালীঘাটের কালী বাটিতে লক্ষাধিক ছাগ স্বহস্তে বলি দিয়াছে সে লেখকের নিকট এই সত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছে।[১] নিরীহ পশু শান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এমন অবস্থায় তাহাকে অকস্মাৎ হত্যা করিতে কষ্ট হয়। এই হেতু বধের অব্যবহিত পূর্বে বধ্য পশুকে কোন উপায়ে ক্রোধোন্মত্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীনকালে রোমনগরে গ্লাডিয়েটারগণ বধ্য ষাঁড়কে প্রথমে লাল পতাকা দেখাইয়া ক্ষিপ্ত করিয়া পরে হত্যা করিত। এদেশে বলিদানের পূর্বে মহিষের কানের মধ্যে সরিষা দিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলা হয়।

নিরীহ জীবকে হত্যা করিবার সময় তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা ও রক্ত দর্শনে হৃদয়ে যে বিবেকের বৃশ্চিক দংশন হয়, তাহা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য আমরা এক সুন্দর কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি। শক্তি পূজায় পশুবলি দিলে ধর্মকর্ম করা হইবে এইরূপ একটি ব্যবস্থা শাস্ত্রের নামে ভাঁড়াইয়া আমরা একটি ঘোর পাপ কর্মের ওপর ধর্মের আবরণ দিবার চেষ্টা করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, শত সহস্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়াও অধর্মকে ধর্ম পরিণত করা যায় না। যাহারা পাঁঠার পশু জন্ম ঘুচাইবার যুক্তি দেখাইয়া তাহাকে দেবীর নিকট বলি দিতে চাহে, তাহারা নিজ নিজ সন্তানের মানব জন্ম ঘুচাইয়া দেবজন্মলাভের জন্য তাহাদিগকে বলি দেয় না কেন? সকল কথা ও তর্কের উপরে এই মহাসত্য বিরাজ করিতেছে যে, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী, তিনি সকল জীবেরই জননী। সুতরাং তাঁহার এক সন্তান মানব, তাঁহার অপর সন্তান ছাগশিশুকে তাঁহার সম্মুখে বলি দিলে তাঁহার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিবার কথা। তাই জগজ্জননী আদ্যাশক্তিকে শাস্ত্রে পরমা বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। শক্তিপূজায় যে সকল তামসিক সাধক কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু দণ্ড বলি না দিয়া পশু বলি দেয় ও দেবীর প্রসাদ বলিয়া তাহার মাংস উদরস্থ করে তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'। আমিষভোজী মানবের যে বুদ্ধি মলিন ও চিত্তবৃত্তি পাপ মার্গগামী হয় এবং তজ্জন্য তাহার যে নৈতিক অধোগতি হইতে থাকে তাহা আমরা

১ লেখক নিজে কালীঘাটের কালীদেবীর সেবায়েত

প্রত্যহ চারিদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহারা অধিক মাছ মাংস আহার করে তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারে না; এবং এই কারণে তাহারা মৃত্যু ও পাপের পথে নিয়ত অগ্রসর হইতে থাকে। বধ্য পশু যদি মানুষের মত কথা কহিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতে পারিত, তাহা হইলে কিছুতেই তাহাকে বধ করিতে বা ধর্মের নামে বলি দিতে পারিতাম না। সে যে বোবা, কথা কহিতে পারে না। লোকে কথায় বলে, 'বোবার শত্রু নাই।' তবে আমরা বোবা ছাগ-মেষাদির প্রাণ হিংসা করিয়া অনন্ত পাপ সঞ্চয় করি কেন? এই সকল বাক্ শক্তিহীন নিরীহ পশুকে মায়ের কাছে বলি দিলে ধর্মার্জন হয় না। তাই মায়ের ভক্ত ও প্রকৃত সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি মন তা জাননা।
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন তার করতে যাওরে উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে তাঁর আছে কি পর ভাবনা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষ-মহিষ আর ছাগলছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্রে কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখান করবে পূজা, মা ত আর ঘুষ খাবে না॥

জিনবাণী আশ্বিন, ১৩৩১

বসুদেব হিণ্ডী

[প্রাকৃত জৈন কথা সাহিত্যে সংঘদাসগণি রচিত বসুদেব হিণ্ডি (বসুদেবের ভ্রমণ কথা) সব চাইতে প্রাচীন। শুধু তাই নয়, গুণাঢ্যের যে বৃহৎকথা পাওয়া যায়না, ডাঃ জগদীশচন্দ্র জৈন মনে করেন, এটি তার জৈন প্রতিরূপ। গুণাঢ্যের বৃহৎ কথায় নরবাহনদত্তের ভ্রমণ ও বিবাহ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে সেইরূপ বসুদেব হিণ্ডীতে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের ভ্রমণ ও বিবাহ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। বসুদেবহিণ্ডী কবে রচিত হয়েছিল জানা যায় না তবে জিনভদ্রগণি রচিত 'বিশেষণবতী'তে এর উল্লেখ থাকায় এটি যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বের রচনা সেকথা বলা যায়।

বসুদেবহিণ্ডী ৬ ভাগে বিভক্ত। যথা (১) কথোৎপত্তি, (২) পীঠিকা (৩) মুখ, (৪) প্রতিমুখ, (৫) শরীর ও (৬) উপসংহার ও ২৮ লম্বকে সমাপ্ত। এর মধ্যে ১৯ ও ২০ লম্বক পাওয়া যায় না ও ১৭ লম্বক অপূর্ণ। আমরা নীচে শরীর অংশের ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করব। কারণ এই অংশেই বসুদেবের ভ্রমণ ও বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।]

বসুদেবের পূর্বভব :

মগধ দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করত। নন্দীসেন নামে তার এক পুত্র ছিল। নন্দীসেন যখন খুব ছোট তখন তার পিতামাতার মৃত্যু হল। অভাগা বলে লোকেরাও তাকে পরিত্যাগ করল।

কিন্তু নন্দীসেনের মামার তার প্রতি দয়া হল। তিনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, তুই আমার গাই বাছুরের দেখাশোনা কর। তোর সঙ্গে আমার যে কোনো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব।

নন্দীসেনের মামার তিন মেয়ে ছিল। প্রথম মেয়ে যখন বড় হল ও জানতে পারল যে নন্দীসেনের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হবে তখন সে বেঁকে বসল। বলল, যে ভিখারিরো অধম তার সঙ্গে সে বিয়ে করতে পারবেনা। যদি জোর করে তার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয় তবে সে আত্মহত্যা করবে। মামা তখন দ্বিতীয় মেয়েকে নন্দীসেনকে বিয়ে করতে বললেন। কিন্তু সেও রাজী হল না। তৃতীয় মেয়েকে বলা হলে সেও পরিষ্কার বলে দিল, সেও তাকে বিয়ে করতে পারবে না।

মামা তবুও তাকে হতাশ হতে নিষেধ করলেন। বললেন, অন্য মেয়ের সঙ্গে তিনি তার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

কিন্তু নন্দীসেন ভাবল, যখন মামার মেয়েরাই তাকে বিয়ে করতে রজী হলনা, তখন অন্য মেয়েরাই বা কেন রাজী হবে?

নন্দীসেন তাই মনের দুঃখে মামার বাড়ী ছেড়ে রয়নপুরে চলে গেল।

তখন বসন্ত কাল। তাই তার বয়সী তরুণেরা উদ্যানে উদ্যানে অল্প বয়সী মেয়েদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছিল। তাই দেখে নন্দীসেনের নিজের জীবনে বিতৃষ্ণা এল। সে মনে মনে স্থির করল, সে আত্মহত্যা করবে।

নন্দীসেন ঠিক যে মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে এক শ্রমণ তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করলেন। বললেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। তার চাইতে তুমি তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাধু শ্রমণের সেবা কর। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

সেকথা নন্দীসেনের মনে ধরল। সে সেই হতে সেবা ব্রত গ্রহণ করল।

তারপর অনেকদিন পরের কথা। এক সময় দুই দেবতা শ্রমণের রূপ ধরে নন্দী-সেনের সেবাব্রতের পরীক্ষা নিতে এলেন। পরীক্ষায় নন্দীসেন উত্তীর্ণ হল। খুসী হয়ে তাঁরা তাকে বর দিতে চাইলেন। কিন্তু নন্দীসেন বলল, আমি যে জৈন ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি—সেই আমার বর।

সেকথা শুনে দেবতারা চলে গেলেন।

নন্দীসেন তার সমস্ত জীবন ধরে সাধু শ্রমণের সেবা করল আর ঠিক মৃত্যুর পূর্বে মনে মনে সংকল্প করল—সাধু শ্রমণের সেবায় যদি তার কিছুমাত্র পুণ্য হয়ে থাকে তবে সে যেন পর জন্মে পরম রূপবান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে যাতে মেয়েরা তার জন্য পাগল হয়।

মৃত্যুর পর নন্দীসেন স্বর্গে দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। দেব আয়ু শেষ হলে সে পৃথিবীতে অন্ধক বৃষ্ণির দশম পুত্র বসুদেব হয়ে জন্ম নিল।

অন্ধক বৃষ্ণি দীর্ঘদিন রাজ্য করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সমুদ্র বিজয়ের হাতে রাজ্য ভার তুলে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তারপর মুনিধর্ম পালন করে মোক্ষপ্রাপ্ত হলেন।

কথারম্ভ ঃ

আমার যখন বয়স আঠ আমায় তখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করা হল। আমি আমার মেধা ও বুদ্ধির জন্য শীঘ্রই তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলাম।

সেই সময় এক গন্ধবণিক তার পুত্র কংসকে আমার কাছে নিয়ে এল। বলল,

কুমার, তুমি একে তোমার সঙ্গী করে নাও। আমি তাতে রাজী হলাম। সেই হতে কংস আমার সঙ্গে থাকতে লাগল ও এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করতে লাগল।

আমাদের বিদ্যাভ্যাস যখন সমাপ্ত হয়ে এসেছে সেই সময় একদিন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে রাজগৃহের রাজা জরাসন্ধের দূত এল। দূত বলল, মহারাজ, জরাসন্ধ জানিয়েছেন—তাঁর রাজ্যের কেউ যদি সিংহপুরের রাজা সিংহরথকে বন্দী করে তাঁর কাছে উপস্থিত করতে পারে তবে তিনি তাঁর কন্যা জীবযশাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করবেন ও যৌতুক রূপে তাঁর একটী প্রধান নগরী তাঁকে দেবেন। সেকথা শুনে আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গিয়ে বললাম, এই সুযোগ তিনি যেন আমায় দেন। আমি সিংহরথকে বন্দী করে তাঁর চরণে উপস্থিত করব।

সেকথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, তুই এখনো শিশু। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্র কি তা তুই এখনো দেখিসনি। তাই তোর যাওয়া হতে পারে না।

কিন্তু আমিও আমার সঙ্কল্পে অটল হয়ে রইলাম। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে হল, আচ্ছা তুই যা।

আমি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিংহপুরে উপস্থিত হলাম। আমার আসার খবর পেয়ে সিংহরথও তার সৈন্য একত্রিত করল। কিন্তু আমি সিংহরথকে আক্রমণ করতে পারলাম না। আমার সেনা নায়কেরা আমাকে আক্রমণ করতে নিষেধ করল। বোধ হয় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তাদের প্রতি এরূপ নির্দেশ ছিল। আর সেই সুযোগে সিংহরথ আমার সৈন্যদের ছারখার করতে লাগল।

আমি তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। কংসকে আমার সারথী করে যুদ্ধে অগ্রসর হলাম। কংস আমার রথ সিংহরথের রথের নিকট নিয়ে গেল। সিংহরথ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হলেও কলা-কৌশলে সে আমার সমকক্ষ ছিলনা। আমি তাই প্রথমেই তার অশ্ব ও সারথীকে আহত করে তাকে নিশ্চেষ্ট করে দিলাম। কংসও সেই অবসরে তার লৌহ মুদগর দিয়ে সিংহরথের রথের ধূরি ভগ্ন করে সিংহরথকে বন্দী করে ফেলল।

রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় কংস সিংহরথকে বন্দী করে আমার রথে এনে তুলল। সিংহ-রথকে বন্দী হতে দেখে তার সৈন্যরা পলায়ন করল।

আমি যুদ্ধে জয় লাভ করে রাজধানীতে ফিরে এলাম। আমার জয়লাভে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খুসী হলেন ও আমায় সম্বর্দ্ধনা জানালেন। তারপর নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বললেন—বসু, আমি নৈমিত্তিক ক্রৌষ্ঠকীকে জীবযশার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করি। সে গণনা করে বলেছে জীবযশা তার পিতা ও পতি উভয় কুলের ঘাতিকা হবে। আমি তাই বলি, জরাসন্ধ তোমায় জীবযশাকে দিতে চাইলেও তুমি তাকে গ্রহণ করোনা।

আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, জীবযশার উপর আমার চাইতেও কংসের দাবী বেশী। কারণ সেই তাকে বন্দী করে আমার রথে এনে তুলেছে।

সেকথা শুনে তিনি বললেন, কিন্তু বণিক-পুত্রের সঙ্গে ত রাজকন্যার বিবাহ হতে পারে না।

আমি বললাম, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কংস ক্ষত্রিয়জনোচিত যে রকম বীরত্ব দেখিয়েছে তাতে আমার তাকে বণিকপুত্র বলে মনে হয় না।

আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন সেই গন্ধবণিককে ডেকে পাঠালেন। কংস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, দেব, কংস আমার পুত্র নয়। যমুনায় ভাসমান কাংস্য পাত্রে আমি তাকে প্রাপ্ত হয়েছি। সেই কাংস্য পাত্রে একটি মুদ্রিকাও ছিল। সেই মুদ্রিকায় রাজা উগ্রসেনের নাম খোদিত ছিল।

সে কথা শুনে আমার অগ্রজ বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমায় কংস সহ রাজগৃহে প্রেরণ করলেন।

আমি রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে সিংহরথকে জরাসন্ধের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, উগ্রসেন পুত্র এই কংস সিংহরথকে বন্দী করেছে। সে কথা শুনে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে জীবযশাকে কংসের হাতে সম্প্রদান করলেন।

কংস যখন এভাবে অবগত হল যে সে বণিকপুত্র নয় রাজপুত্র তখন তার ক্রোধ উগ্রসেনের উপর গিয়ে পড়ল। সে তার পিতাকে বন্দী করে মথুরার সিংহাসন অধিকার করে নিল।

আমার তখন প্রথম যৌবন। আমি তাই নূতন নূতন বস্ত্রালংকারে ভূষিত হয়ে নগর ভ্রমণে বার হতাম। আমি যেদিকে যেতাম সেদিকের অধিবাসীরা আমায় স্বাগত জানাত, আমার যশোগান করত। আর হাজার হাজার মেয়েদের চোখের দৃষ্টি আমার পিছু পিছু ছুটে চলত।

একদিন আমার এক অগ্রজ আমায় ডেকে বললেন, বসু, তুই সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে বেড়াস তাই তোর সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে। আমি তাই বলি তুই ঘরেই থাক। আর গান বাজনার অনুশীলন কর।

আমি তথাস্তু বলে সেদিন হতে নগর ভ্রমণ পরিত্যাগ করলাম।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধাত্রীর বোনের নাম ছিল কুব্জা। কুব্জা গন্ধদ্রব্য ও মাল্যাদি প্রস্তুত করত। সে একদিন যখন গন্ধদ্রব্য নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আমি তাকে আটক করলাম। একটু রঙ্গ করেই বললাম, কুব্জা, এই গন্ধদ্রব্য তুমি কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ?

সে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মহারাজের জন্য।

আমি তখন রহস্যময় হাসি হেসে বললাম, কেন, আমার জন্য নয় ?

সে একটু হেসে বলল, না। তুমি দোষী তাই গন্ধদ্রব্যাদি তোমাকে দেওয়া নিষেধ হয়েছে।

আমি তার কথার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারলাম না কিন্তু কি মনে করে জোর করে তার হাত হতে গন্ধদ্রব্যাদি কেড়ে নিলাম।

সে তখন কৃত্রিম রাগ করে বলল, তোমার এই রকম ব্যবহারের জন্যই না রাজা তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। কোথাও বার হতে দেন না।

তখন আমার প্রথম মনে হল কুব্জার কথার মধ্যে কোথাও কোনো সত্য আছে। আমি তখন তাকে সমস্ত খুলে বলতে বললাম। কিন্তু কুব্জা কিছুতেই কিছু ভাঙতে চাইল না। বলল, রাজার নিষেধ আছে।

আমি তখন তার পায়ে ধরতে গেলাম। বললাম, কুব্জা, আমার মাথা খাও, আমি কি দোষে দোষী যে রাজা আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন।

কিন্তু কুব্জার এক কথা রাজার নিষেধ।

আমি তখন কুব্জাকে আমার অঙ্গুরীয়ক উপহার দিলাম। বললাম, বল কুব্জা, আমি একথা কাউকেই বলব না।

কুব্জা তখন ধীরে ধীরে সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, একদিন নগরবাসীরা রাজার কাছে তোমার নামে অভিযোগ করতে এসেছিল। তারা রাজাকে বলেছিল ; কুমারের রূপ শরৎকালীন চাঁদের মতো। তাঁর স্বভাবও নির্মল। তাই তিনি সকলের প্রিয়। কিন্তু তাঁর রূপের জন্য তিনি যেদিকেই যান তরুণেরা তাঁর পিছু পিছু যায়। আর মেয়েরা ? তাঁকে একবার দেখবে বলে জানালায় অলিন্দে দরজার কাছে চিত্রার্পিত যক্ষীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কি স্বপ্নেও তারা ওই বসুদেব ওই বসুদেব বলে চিৎকার করে ওঠে। বাজার হতে ফলমূলাদি কিনতে গিয়ে বসুদেবের মূল্য কত জিগ্যেস করে বসে। গোবৎসকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে নিজের ছেলের গলাতেই দড়ি বেঁধে ফেলে। দেব, এভাবে তারা বসুদেবের জন্য পাগল হওয়ায় ঘরে দেবতাদের পূজা হয় না, অতিথিরা অবহেলিত হয়ে ফিরে যান। তাই আপনার কাছে অনুরোধ, কুমার নগর ভ্রমণে যেন আর না যান। সেকথা শুনে রাজা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বললেন। বললেন এর তিনি যথোচিত প্রতিকার করবেন। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমাকে তিনি বারবার নিষেধ করেছিলেন আমি যেন তোমাকে একথা না জানাই।

আমার যা জানবার ছিল তা জানা হল। আমি যদি এখন বাইরে যাবার চেষ্টা করি তবে আমায় জোর করে ঘরে এনে ধরে রাখা হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সেই

অবস্থার চাইতে কোনো অংশেই ভালো নয়। তাই আমার উচিত এখানে আর না থাকা। সে কথা ভেবে আমি কয়েকটী গুলিকা খেয়ে নিলাম, যাতে কিছু সময়ের জন্য আমার রূপ ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়। তারপর সন্ধ্যা হলে বল্লভ নামক আমার এক অনুচরকে নিয়ে আমি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করলাম।

রাত্রির অন্ধকারে নগরের মধ্যে দিয়ে আমি শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার ভাগ্যক্রমে সেখানে এক শব পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি তখন বল্লভকে কাঠ নিয়ে এসে চিতা সাজাতে বললাম। চিতা সাজান হলে আমি তাকে বললাম, আমি এই চিতায় প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করব। কিন্তু তার আগে আমার যে ধনরত্ন আছে তা দান করতে চাই। তাই তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার বিছানার ওপর হতে আমার রত্নপেটিকা নিয়ে এস। তাড়াতাড়িতে তা ভুলে এসেছি।

বল্লভ বলল, দেব আপনি যদি চিতায় প্রবেশ করেন তবে আপনার সঙ্গে আমিও চিতায় প্রবেশ করব।

আমি হেসে বললাম, সে তোমার যেমন ইচ্ছে হয় তাই করো। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে রত্নপেটিকা নিয়ে এস। আর একথা কাউকেই বলো না।

বল্লভ তাতে সম্মত হয়ে রত্নপেটিকা আনতে চলে গেল।

সে চলে যেতে সেই শবটিকে চিতায় তুলে আমি তাতে অগ্নি সংযোগ করলাম। তারপর শ্মশান ভূমি হতে লাল অলক্তক সংগ্রহ করে আমার অগ্রজ ও অগ্রজ পত্নীদের নামে এক পত্র লিখলাম যে যদিও আমি নিরপরাধ তবুও যখন নগরবাসীরা আমার নামে অভিযোগ করেছে, তাই আমি চিতানলে প্রবেশ করে দেহ বিসর্জন করছি। সেই পত্র চিতার কাছে একটি বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম ও যে পথে লোক চলাচল কম সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

পরদিন দুপুরে আমি যখন মাঠের পথ দিয়ে যাচ্ছি তখন আমার পাশ দিয়ে এক গাড়ী যেতে দেখলাম। সেই গাড়ীতে বৃদ্ধার পাশে এক তরুণী বসেছিল। সম্ভবতঃ শ্বশুর গৃহ হতে সে পিত্রালয়ে যাচ্ছিল। তার দৃষ্টি আমার ওপর পতিত হয়েছিল। কেন জানি না সে আমাকে দেখে সেই বৃদ্ধাকে বলে উঠল, মা ওই ব্রাহ্মণ বালকের শরীর মাখনের মত। তাছাড়া ওকে ক্লান্ত বলেও মনে হচ্ছে। আমরা যদি ওকে আমাদের গাড়ীতে তুলে নেই তবে আমাদের সঙ্গে ও আনন্দে যেতে পারবে।

সেই বৃদ্ধা তখন আমায় ডাক দিয়ে বলল, বাছা, তুমি মিথ্যে কেন পথ হাঁটছ, আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে এসো না।

আমিও তাই চাচ্ছিলাম। গাড়ীতে গেলে আমার ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি তাদের গাড়ীতে উঠে বসলাম।

সন্ধ্যার আগ দিয়ে আমরা তাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি ওদের ঘরেই স্নানাহার করলাম।

ওদের বাড়ীর কাছেই এক যক্ষায়তন ছিল। সেই যক্ষায়তনে সন্ধ্যের পর গ্রামের লোকেরা মিলিত হত। গ্রাম্যকথা হতে আরম্ভ করে রাজনীতি ধর্মনীতি নিয়ে সেখানে আলোচনা হত। নগরের সংবাদ জানবার জন্য আমি তাই স্নানাহার শেষ হলে সেই যক্ষায়তনে গেলাম। দেখলাম তারা আমার কথাই বলাবলি করছে যে কুমার বসুদেব কাল সন্ধ্যায় অগ্নি প্রবেশ করেছেন। তাঁর চিতা তাঁর অনুচর বল্লভই প্রথম দেখে। সে তাই দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে। লোকে তাকে কাঁদতে দেখে সে কেন কাঁদছে জিগ্যেস করে। সে তখন বলে যে নগরবাসী কুমারের নামে অভিযোগ করায় তিনি মনের দুঃখে চিতানলে প্রবেশ করেছেন। সেকথা শুনে তারাও কাঁদতে আরম্ভ করে। এভাবে নগরের চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। শেষে সে খবর রাজপ্রাসাদে পৌঁছয়। তখন তাঁর জেষ্ঠ ভ্রাতারা শ্মশানে আসেন ও বসুদেবের স্বহস্ত লিখিত পত্র দেখতে পান। তখন তাঁরা সেই চিতা নির্বাসিত করে নূতন করে চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করেন।

সেকথা শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয়ও হল। স্বস্তি এ জন্য যে আমার অগ্রজেরা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ায় তাঁরা আর আমার খোঁজখবর করাবেন না। আর ভয় এই কারণে যে পাছে এরা আমায় চিনে ফেলে।

আমি তাই তাড়াতাড়ি সেই স্থান পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে গেলাম। সেই রাত্রি সেইখানে কাটিয়ে পরদিন ভোর হবার আগেই আমি সেই গ্রামও পরিত্যাগ করলাম।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি একদিন বিজয় খেড়ায় এসে উপস্থিত হলাম।

আমি নগর প্রবেশ করতেই যাব কি পথের ধারে একগাছের ওপর দুজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। তারা আমায় দেখে বলে উঠল, ভদ্র, এই গাছের তলায় খানিক বিশ্রাম নিয়ে যান।

সেকথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম ও সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লাম।

তারা তখন আমায় জিগ্যেস করল, ভদ্র, আপনার নাম কি ও কোথা হতে আসছেন?

আমি সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিলাম, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম গৌতম। কুশাগ্রপুর হতে বিদ্যালাভের জন্য এখানে আসছি। কিন্তু আপনারা কেন আমায় এসব প্রশ্ন জিগ্যেস করছেন?

তবে শুনুন বলে তারা গাছ হতে নেমে এল। বলল, এখানকার রাজার নাম জিত-

শত্রু। তাঁর দুই মেয়ে আছে। নাম বিজয়া ও শ্যামা। উভয়েই সুন্দরী ও কলাবতী। রাজা তাদের স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করলে তারা বলে যে, নৃত্যগীতে যে তাদের পরাস্ত করতে পারবে তারা তাকেই বরণ করবে। সেকথা শুনে রাজা চার দিকে লোক পাঠালেন, সে যদি তরুণ ও রূপবান হয় ও নৃত্য গীতে নিপুণ তবে তাকে যেন রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা রাজার আদেশে এখানে অবস্থান করছি। আপনি তরুণ ও রূপবান। এখন আপনি যদি নৃত্যগীতে নিপুণ হন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, অবশ্যই অবশ্যই। আমি কলাচার্যের কাছে ভালো করে নৃত্য ও গীত শিক্ষা করেছি।

সেকথা শুনে তারা আমায় তখনি রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজাও আমায় দেখে প্রীত হলেন ও আমায় সম্মানিত করলেন।

আমার পরীক্ষা নেবার সময় আমি প্রথম রাজ কন্যাদের দেখলাম। সত্যিই তারা সুন্দরী ছিল। তাদের চুল ছিল মসৃণ, ঘন ও কালো। মুখ পদ্মের মত প্রস্ফুটিত ও চোখ আয়ত। ঠোঁট দুটি ছিল নবোদ্ভিন্ন কিশলয়ের মত। হাত মৃণাল তুল্য। স্তনদ্বয় ছিল পরস্পর সন্নদ্ধ, উন্নত, মংসল ও ঈষৎ হরিদ্রাভ। শ্রোণিমণ্ডল গুরু ও চক্রাকার। কটি ক্ষীণ ও মুষ্টিগ্রাহ্য। অলক্তকের রক্তিম শোণিমায় তাদের পদদ্বয় সূর্যরশ্মিতে উদ্ভাসিত কমল বলেই আমায় মনে হয়েছিল। তাদের গতি ছিল মরালের মত ও কণ্ঠস্বর আম্রমকরন্দপায়ী কোকিলের মত সুমিষ্ট।

যদিও তারা কলাবতী ছিল তবুও আমি নৃত্য ও গীতে তাদের পরাস্ত করতে সমর্থ হলাম

আমাকে জয়ী হতে দেখে রাজার আনন্দের সীমা ছিলনা। তিনি তারপর এক শুভদিন দেখে বিজয়া ও শ্যামাকে আমার হাতে সম্প্রদান করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর অর্দ্ধেক রাজত্বও আমাকে দিয়ে দিলেন।

আমি বিজয়া ও শ্যামার সঙ্গে আনন্দে দিন ব্যতীত করতে লাগলাম।

ক্রমে আমি যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী তারা তার পরিচয় পেল। তখন তারা আমায় জিগ্যেস করল, আমি যখন জাতিতে ব্রাহ্মণ তখন আমার যুদ্ধ বিদ্যায় কি প্রয়োজন?

আমি বললাম, কারু পক্ষে যে কোন বিদ্যা আয়ত্ত করা দোষের নয়।

কিন্তু যখন ভালবাসা আরো গভীর হল, প্রীতির সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ তখন তাদের কাছ হতে কিছু গোপন রাখা আমার ভালো মনে হল না। আমি আমার গৃহ পরিত্যাগ হতে তাদের সমস্ত কথা খুলে বললাম।

আমি বসুদেব, আমি দশাহ'দের একজন একথা যখন তারা জানতে পারল তখন এক

আনন্দের ঢেউ তাদের শরীরে খেলে গেল। সেই সময় শরৎকালীন আম্র বল্লরীর মতো তাদের আরো মনোহারী বলে আমার মনে হল।

কালে বিজয়া গর্ভবতী হল। তার দোহদ পূর্ণ হলে সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। তার নাম রাখা হল অক্রুর।

এ ভাবে এক বছর আমার বিজয় খেড়ায় ব্যতীত হল।

সেদিন আমি উদ্যান হতে ফিরছিলাম। সহসা দু'জন দেশিকের কথা আমার কানে গেল, একে অপরকে বলছে, কি আশ্চর্য সাদৃশ্য!

কার সঙ্গে?

কার সঙ্গে আবার? কুমার বসুদেবের সঙ্গে।

সে কথা শুনে আমি চিন্তিত হলাম। বিজয় খেড়ায় আর আমার এক মুহূর্ত'ও থাকা উচিত নয়। সে কথা চিন্তা করতে করতে আমি প্রাসাদে ফিরে এলাম।

আমি বিজয়া ও শ্যামাকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। তারপর তাদের অনুমতি নিয়ে আমি বিজয় খেড়া পরিত্যাগ করে উত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। উত্তরের দিকে যেতে যেতে আমি হিমালয় পর্বতের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। আর উত্তরে যাওয়া সম্ভব ছিলনা তাই পূর্ব দেশে যাবার ইচ্ছায় আমি কুঞ্জরাবর্ত অরণ্যে প্রবেশ করলাম। সেদিন দীর্ঘপথ হেঁটে আসার জন্য আমি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই জলাশায়ের সন্ধান করতে লাগলাম। আরো কিছু দূর অগ্রসর হতেই আমি এক জলাশয় দেখতে পেলাম। সেই জলাশয়ের জল ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও কমলদলে শোভিত। সেই জলাশয়ের কাছে কত না পশুপক্ষী বাসা বেঁধে ছিল।

আমার তখন তখনি জল খাওয়া উচিত বলে মনে হল না। আমি পথশ্রান্ত ত ছিলামই তাই খানিক বিশ্রাম করে অবগাহন স্নান শেষে জল পান করব স্থির করলাম।

ঠিক সেই সময় মেঘের মত প্রকাণ্ড ও কালো হাতীদের এক দলকে সেই জলাশয়ে জলপান করতে আসতে দেখলাম। তারা জলে নেমে জল পান করে চলে গেল।

আমি তখন জলে নেমে স্নান করতে আরম্ভ করলাম আর ঠিক সেই সময় পর্বতের মতো এক প্রকাণ্ড হাতী যার গণ্ড দিয়ে মদ ক্ষারত হচ্ছিল সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার পেছনে পেছনে এক হস্তিনীকেও আসতে দেখলাম। তার মদ গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠেছিল। সেই গন্ধ আমার এত ভালো লাগছিল যে আমি মুগ্ধ হয়ে সেই হাতীর দিকে চেয়েছিলাম। আর বোধ হয় সেই সময়ে সেও আমায় দেখতে পেয়েছিল। সে আমায় দেখে সহসা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল ও আমায় আক্রমণ করার জন্য জলে নাবল।

জলে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ করা উচিত হবে না ভেবে আমি কূলে উঠে এলাম। আমার আর এক উদ্দেশ্যও ছিল তাকে বশীভূত করা। সেই হাতীটিও আমার পেছন পেছন কূলে উঠে এল। আমি তার শুঁড় হতে যথোচিত দূরত্ব রেখে তাকে মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলাম। এভাবে অনেকক্ষণ মুষ্ট্যাঘাত করায় সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন তাকে আমি ছাগশিশুর মতো এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলাম। তার শরীর প্রকাণ্ড হলেও ভারী কোমল ছিল। এভাবে সে যখন আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন তার সামনে আমার উত্তরীয় ফেলে দিয়ে তার দাঁতে পা রেখে মাথায় উঠে বসলাম। সে তখন আমার বশীভূত হয়ে গেল। আমি তখন তাকে দিয়েই আমার উত্তরীয় তোলালাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কে বা কারা আমার দুহাত ধরে আমায় শূন্যে তুলে নিল ও আকাশ পথ দিয়ে ছুটে চলল।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VII No. 4 Sraman August 1979
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

WB/NC-120
Vol. VII No. 4
Registered with the R
under No.

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮৬ ॥ পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

প্রতীক [২]

চন্দ্রগুপ্ত

হরিসত্য ভট্টাচার্য

মৌর্যবংশীয় প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের নাম ঐতিহাসিকের নিকট সুপরিচিত। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে ইনিই সর্বপ্রথম চক্রবর্তী সম্রাট। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা বিশ্ববিজেতা আলেকজাণ্ডারের চমক উৎপাদন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে গ্রীকদিগকে পরাভূত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব প্রদেশকে যবন অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; বিজয়ী সেলুকাস নিকটেরকেও চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্তমান কালে যে প্রথায় ইতিহাস গ্রন্থাদি লিখিত হয়, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ঠিক সেরূপভাবে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ছিল না। সেই জন্য রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য, অশোক, ভোজরাজ প্রভৃতি স্বনামধন্য ভূপালগণের বৃত্তান্তের সহিত যেরূপভাবে নানা কথা-উপকথা জড়িত হইয়াছে সেইরূপ মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার ইতিবৃত্তের সহিত কত সত্য ও কাল্পনিক কথা মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার জন্ম, বংশ পরিচয় ও রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। বিষ্ণু পুরাণ, মুদ্রা-রাক্ষস, কামন্দকীয় নীতিসার, মহাভারত, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহে সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। এই সমস্ত গ্রন্থের মতে চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র ছিলেন বলিয়া কতকটা অনুমিত হয়। এদিকে বিনয়পিটক, মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের টীকাকারগণ চন্দ্রগুপ্তের অন্য কাহিনী প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিত্থ্যোগালিয়া পয়ন্না, তীর্থোদ্ধার প্রকীর্ণক, পরিশিষ্ট-পর্ব, স্থবিরাবলী চরিত, জৈন সূত্র, ঋষিমণ্ডল প্রকরণবৃত্তি, ভদ্রবাহচরিত প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ সমূহেও চন্দ্রগুপ্তের বর্ণনা আছে। চন্দ্রগুপ্ত জৈনমতাবলম্বী ছিলেন, ইহাই জৈনমত। স্বদেশের ন্যায় বিদেশেও চন্দ্রগুপ্ত সুপরিচিত। মিগাস্থিনিস, প্লুটার্ক, জাস্টিনাস, ডিওডোরাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয়গণ যে সমস্ত বিবরণ দিয়া থাকেন সে সমস্তের সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। তবে ঐ

সকল বৃত্তান্ত হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে অতি হীন অবস্থা হইতে চন্দ্রগুপ্ত আপন প্রতিভাবলে ও ব্রাহ্মণ চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধের রাজপদে উন্নীত হন এবং বিশেষে ভারতবর্ষের চক্রবর্তীত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

জৈনগণের মতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত জিনমতাবলম্বী ছিলেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভদ্রবাহু তাঁহার আচার্য ছিলেন। একদা মুনিপ্রবর ভদ্রবাহু আপনার নৈমিত্তিক জ্ঞানের প্রভাবে মগধে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায় দেখিয়া দ্বাদশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। শেষ জীবনে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কতকটা মুনিবৃত্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজ্যসুখ পরিহার পূর্বক মৌর্যরাজ গুরুর অনুসরণ করিলেন। দক্ষিণাপথে চন্দ্রগিরি পর্বতে মুনিবর ভদ্রবাহুর সংসারলীলার অবসান হয়। ঐ সময়ে তাঁহার নিকটে অপর কোন শিষ্য উপস্থিত ছিলেন না, মুনি প্রভাচন্দ্র নামে পরিচিত একমাত্র চন্দ্রগুপ্তই তৎকালে তথায় বর্তমান ছিলেন। গুরুর পরলোক গমনের কিছুকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত ঐ পর্বতে দেহরক্ষা করেন। মহীশূর দেশে চন্দ্রগিরি পর্বত মুনিব্রতধারী মৌর্য সম্রাটের স্মৃতি আজিও বহন করিয়া আসিতেছে।

পরবর্তীকালে (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে) চন্দ্রগিরি পর্বতে রাজা চামুণ্ড রায় দ্বাবিংশ তীর্থংকর নেমিনাথের সুরম্য মন্দির নির্মাণ করাইয়া ছিলেন এবং চামুণ্ড রায়ের সুযোগ্য পুত্র তথায় ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও ভদ্রবাহুর দক্ষিণাপথ প্রয়াণ জৈন সংঘের ইতিহাসে একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, কারণ ঐ ব্যাপার হইতেই জৈন সমাজ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। আচার্য ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল জৈন সাধু পূর্বোক্ত প্রকারে দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলে মগধে যে সমস্ত জিন মতাবলম্বী সাধু রহিলেন স্থূলভদ্র তাঁহাদের আচার্য হইলেন। দিগম্বরগণ বলেন দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত হইয়া ঐ সময়ে মগধস্থ জৈনভিক্ষুগণ সনাতন আচার পদ্ধতি অতিশয় কষ্টকর মনে করিয়া সরলাচার প্রবর্তন করেন। দুর্ভিক্ষের অবসানে জিনসিদ্ধান্ত পুনরুদ্ধার করিবার জন্য পাটলিপুত্র নগরে এক সাধু সংঘ আহূত হইল। ঐ সংঘে দক্ষিণাপথস্থ ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাজে কাজেই মগধস্থ ভিক্ষুগণের সহিত দক্ষিণাপথের ভিক্ষুগণের আচার ব্যবহারগত কতক পার্থক্য রহিয়া গেল। আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্যগণ 'দিগম্বর' ও আচার্য স্থূলভদ্রের সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণ 'শ্বেতাম্বর' নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। সম্প্রদায়গত এ পার্থক্য আজিও জৈন সমাজে প্রচলিত আছে এবং এই পার্থক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের স্মৃতি রঞ্জিত রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারে পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দের রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান ; কেহ কেহ পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দের

ঘটনা বলিয়া মনে করেন। সে মতে খৃঃ পূঃ ৩৮৫ অব্দে নন্দ রাজা হইয়া ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারেও তাঁহার অষ্টপুত্র ১০০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরে ব্রাহ্মণ চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নন্দ বংশের রাজ্যকাল ১০০ বৎসর না ধরিয়া ৬৫ বৎসর ধরিলে খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দে মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় বলা যাইতে পারে।

সিংহলদেশীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সমূহের বর্ণনা অনুসারে সম্রাট অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে তৃতীয় ধর্ম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। বুদ্ধ দেবের নির্বাণলাভের ২৩৬ বৎসর পরে তৃতীয় ধর্মসম্মিলন হয়, ইহাই উক্ত গ্রন্থ সমূহের অভিমত। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভ খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দের ঘটনা; তদনুসারে খৃঃ পূঃ ২৪১ অব্দে তৃতীয় ধর্ম সঙ্গীতির অধিবেশন হয় এবং খৃঃ পূঃ ২৫৯ অব্দ অশোকের রাজ্য প্রাপ্তির কাল বলিতে হইবে। অশোকের পিতা বিন্দুসার ৩০ বৎসর ও বিন্দুসারের পিতা চন্দ্রগুপ্ত ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব বৌদ্ধগ্রন্থাদির বর্ণনা অনুসারেও খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়।

প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ আলেকজাণ্ডারের যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সম্প্রমাণ হয় যে খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দের জুন মাসে বাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর এক বৎসর পরেই চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এ হিসাবেও খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দ চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের সময় নির্দিষ্ট হইতে পারে।

জৈন গ্রন্থসমূহের উক্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের যে কাল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। জৈন গ্রন্থকারগণ বলেন—যে রাত্রে তীর্থংকর মহাবীর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই রাত্রে রাজা পালক অবন্তীতে অভিষিক্ত হয়েন। পালক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর নন্দাদি রাজগণ ১৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের পর মৌর্য বংশীয় রাজগণ ১০৮ বৎসর রাজ্যভোগ করেন। মহাবীর স্বামীর নির্বাণ লাভ খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দের ঘটনা বলিয়া সাধারণতঃ অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ হিসাবেও ৩১০-৩২০ খৃঃ পূর্বাব্দই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু জৈন আচার্য হেমচন্দ্র বলেন যে মহাবীর স্বামীর নির্বাণের ১৫৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার হিসাবে খৃঃ পূঃ ৩৭২ অব্দই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়। ইহাতে ৫০।৬০ বৎসরের ব্যবধান হইয়া পড়ে। এ বিষয়ের সমাধান করা সুসাধ্য নহে। নন্দের রাজ্যপ্রাপ্তিকালের সহিত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির কালের একটা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে অথবা হেমচন্দ্র রাজা পালকের রাজ্যকাল গণনা করিতে ভুল করিয়াছেন—ইহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

মৌর্য সম্রাটের কাল নির্ণয়ে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা একেবারে প্রমাদ পরিশূন্য, এমন কথা বলিতে পারি না, খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রাপ্তির সময় একথা আচার্য হেমচন্দ্র 'পরিশিষ্ট পর্বে' স্বীকার না করিয়া খৃঃ পূঃ ৩৭০ অব্দই তাঁহার অভ্যুদয়ের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধের নির্বাণের ১১৮ বৎসর পরে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একটী ধর্মসম্মেলন হইয়াছিল, ইহাও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় ; সে হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত ৩৬০ খৃঃ পূর্বাব্দের নৃপতি হইয়া পড়েন। এ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিচার করিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্ণয় করা আবশ্যক। তবে ৩২০ খৃঃ পূর্বাব্দ তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়, এরূপ মনে করিবার যে সমস্ত ঐতিহাসিক কারণ আছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

জিনবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩১

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে জৈন ধর্ম

ডাঃ জি. সি. চৌধুরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই দুই ক্রিয়াবাদীর মতভেদকে ভিন্ন শব্দে এভাবে বলা যায় যে মহাবীর যখন অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ দুই শক্তিকে স্বীকার করে চলেন, বুদ্ধ তখন কেবল অন্তরঙ্গ শক্তি অর্থাৎ মন (মনোপুব্বগমা) কে স্বীকার করে চলেন। একজন যখন কায়কর্ম (দণ্ড), বচনকর্ম (দণ্ড) ও অন্তরংগ মনঃকর্ম (দণ্ড) কে বন্ধন রূপ বলেছেন তখন অন্যে কেবল অন্তরঙ্গ মনকেই অনর্থকর প্রতিপাদিত করেছেন। মজ্ঝিম নিকায়ের উপালি সুত্তে এই চর্চাই করা হয়েছে যে নিগ্গণ্ঠ নায়পুত্ত কায় বচন ও মন রূপ তিন দণ্ড স্বীকার করেন যখন কি বুদ্ধ কায় বচন ও মনকে তিন কর্ম বলেছেন, কিন্তু এই দুই মতের আলোচনা করতে গিয়ে উক্ত সূত্রে দেখান হয়েছে যে মহাবীর কায়দণ্ডকে মহাপাপকর বলেন যখন কি বুদ্ধ মনঃকর্মকে। এই প্রসঙ্গে দণ্ড ও কর্মের অর্থ একই বোঝা উচিত, পরন্তু মহাবীরের কায়দণ্ডকেই সব কিছু বলে তাকে ভ্রান্তরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। উপালি সূত্রে যদি আমরা উপালি সম্বাদ সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করি তবে মহাবীরের মান্যতার যথার্থরূপ বুঝতে পারি।

বুদ্ধ : চতুর্যাম সংবরে সংবৃত নিগ্গণ্ঠ আসতে যেতে ছোট ছোট জীব সমুদায়ের হত্যা করেন। হে গৃহপতি, নিগ্গণ্ঠ নাতপুত্ত এর কি ফল বলেন ?

উপালি : ভন্তে, অজ্ঞান (অসংচেতনিক) কৃত কে নিগ্গণ্ঠ নাতপুত্ত মহাদোষ মনে করেন না, সজ্ঞানকৃত কর্মকেই পাপ বলেন।

এই সংবাদে একথা সুস্পষ্ট যে মনঃপূর্বক অর্থাৎ জেনে বুঝে কৃত কর্মকেই পাপ বলা হয়েছে।

মহাবীরের এই সিদ্ধান্ত যে মনঃকর্ম ও কায়কর্ম দুইই সমানরূপে পাপজনক মজ্ঝিম নিকায়ের মহাসচ্চসুত্ত দ্বারা তা ভালো ভাবে সমর্থিত। উক্ত সূত্রে নিগ্গণ্ঠপুত্ত সচ্চক আজীবক ও বুদ্ধ মতের আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন আজীবক কেবল কায়িক ভাবনায় তৎপর হয়ে বিচরণ করে চিত্তের ভাবনায় নয় ও বুদ্ধ চিত্তের ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন, কায়িক ভাবনায় নয়। এই আলোচনায় মহাবীরের মতের তাৎপর্য বার করা শক্ত নয়। মহাবীরের মতে 'কায়ন্বয়ং চিত্তং হোতি, চিত্তন্বয়ো কায়ো হোতি' অর্থাৎ কায় ও মন দুই ভাবনায় মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, শুধু মন বা শুধু কায়ের ভাবনায় নয়। এভাবে পাপও দু'য়ের সংযোগেই হয়।

এতে এ কথা আমরা ভাল ভাবে বুঝতে পারি যে মন ও কায়ের দ্বন্দ্বাত্মক ক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মহাবীর তপস্যার আধার কায়মনোবিজ্ঞানাত্মক করেন ও মনোসংবর ও কায়ক্লেশকে নিজের ধর্মে মহত্ব দান করেন। ও'র বক্তব্য ছিল এই যে: পুরুষ যে সুখ দুঃখের অনুভব করে সে পূর্বজন্মকৃত কর্মের জন্যই। তাকে দুষ্কর তপস্যায় নষ্ট করো ও এখন যদি মন ও বাক্যকে সংবৃত করে কাজ করবে তো ভবিষ্যতে পাপ হবে না। এভাবে পুরুনো কর্মের তপস্যা দ্বারা বিনাশ ও নবীন কর্ম না করলে ভবিষ্যতে আস্রব হবে না। আস্রব না হলে কর্মের ক্ষয় হবে। কর্মের ক্ষয়ে দুঃখের নাশ দুঃখের নাশে বেদনার অন্ত ও বেদনার অন্ত হলে সমস্ত পাপ জীর্ণ হয়ে যাবে।[১২] তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল এই যে: পূর্ব জন্মে কৃত পাপ কর্ম যদি অবিপক্ব ফল সম্পন্ন হয় তবে তার জন্য দুঃখরূপ বেদনীয় আস্রব আসতে থাকবে ও জন্মান্তরে তার ফল প্রাপ্ত হবে।[১৩] ও'র উপদেশ ছিল যে সুখ হতে সুখ পাওয়া যায় না দুঃখেই সুখ পাওয়া যেতে পারে। যদি সুখের দ্বারাই সুখ পাওয়া সম্ভব, তবে রাজা শ্রেণিকই তা পেতে পারেন।[১৪]

পালি সুত্তের দ্বারা মহাবীরের ক্রিয়াবাদের অতিরিক্ত জ্ঞানবাদেরও সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। সংযুক্ত নিকায়ের চিত্তসংযুত্তয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে মহাবীর বলছেন: 'সদ্ধায় খো গহপতি ঞাণং এব পণীততরং' অর্থাৎ শ্রদ্ধার চাইতে জ্ঞান অনেক বড়। এই কথন জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়। জৈন দর্শনে জ্ঞানকে স্ব ও পর প্রকাশক বলা হয়েছে ও তাকে 'সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রমাণং' রূপেও স্বীকৃত করা হয়েছে।

আচারমার্গ:

পালিগ্রন্থ হতে জৈন শ্রাবক ও মুনিদের আচার বিষয়ক নিয়মেরো কিছু পরিচয় আমরা পাই। এই বর্ণনা হতে জানতে পারা যায় যে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের নিয়মের এক ব্যবস্থিত রূপ ছিল যার পালন সেই সময়ের বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা করত। শুধু তাই নয়, ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যে সাধনা মার্গ ও নিয়মের পালন করে পরিত্যাগ করেছিলেন তাতে কিছু এমন ছিল যা নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ে সেদিনও যেমন প্রচলিত ছিল, আজও তেমনি পালন করা হয়ে থাকে। উদাহরণের জন্য মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহাসীহনাদ নেওয়া যাক। এই সূত্রে অচেলক সম্প্রদায় রূপে জৈন মুনিদের কিছু আচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও অচেলক (বস্ত্ররহিত) বলতে পালি গ্রন্থে

১২ চুলদুক্‌খক্‌খন্ধসুত্ত।
১৩ অংগুত্তরনিকায়, চতুক্ক নিপাত, ১৯৫ সুত্ত।
১৪ চুলদুক্‌খক্‌খন্ধ সুত্ত।

আজীবক সম্প্রদায়ের কথাই বলা হয়েছে তবু জৈন আগম দৃষ্টে বলা যায় যে অচেলক নিগ্রন্থ সম্প্রদায়েও বর্তমান ছিল। মহাবীর নিজে বস্ত্ররহিত (নগ্ন) থাকতেন। আজীবকেরাও নগ্ন থাকত। জেকোবী পালিগ্রন্থে বর্ণিত আজীবকদের আচার ও জৈনাচারের সাম্য ও জৈনাগমে বর্ণিত মহাবীর ও আজীবক নেতা মংখলী গোশালকের ৬ বছর এক সঙ্গে অবস্থান দৃষ্টে এই সত্যে উপস্থিত হয়েছেন যে একে অন্যের দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। জৈন মান্যতা এই যে ভগবান মহাবীরের পূর্বে এই পরম্পরায় ভগবান পার্শ্বনাথ হয়েছেন। পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত আচার বিচারের নিয়ম তাই সেই সময় আজীবক, নিগ্রন্থ ও বুদ্ধের সামনে ছিল। সে যাহোক মহাসীংনাদ ও মহাসচ্চক সূত্রে অচলেকদের নামে জৈন আচারেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ সেই আচারই আচারাঙ্গ, দশবৈকালিক আদি সূত্রে নিগ্রন্থদের আচার রূপে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব সূত্রের বর্ণনা সংক্ষেপে এই প্রকার: অচেলক থাকা, মুক্তাচার হওয়া (স্নান না করা, দাঁতন না করা, দাঁড়িয়ে আহার নেওয়া), হাত চেটে খাওয়া, আসুন ভদন্ত, দাঁড়ান ভদন্ত এরূপ বললে তাকে শোনা না শোনা করা, সামনে এনে প্রদত্ত ভিক্ষার, তাঁর উদ্দেশ্যে তৈরী ভিক্ষার বা আমন্ত্রিত হয়ে ভিক্ষার গ্রহণ না করা, যে বাসনে রান্না করা হয়েছে তা হতে ও খল আদি হতে সরাসরি ভিক্ষা না নেওয়া, খেতে খেতে দুজনের একজনের দ্বারা প্রদত্ত ভিক্ষা, গর্ভিনী স্ত্রীর দ্বারা প্রদত্ত ভিক্ষা ও পুরুষদের সঙ্গে একান্তস্থিত স্ত্রীর নিকট হতে ভিক্ষা না নেওয়া···কখনো এক গৃহ হতে এক গ্রাস, কখনো দু'ঘর হতে দু'গ্রাস ভিক্ষা নেওয়া ত কখনো উপবাস কখনো দুই উপবাস ;এভাবে ১৫ উপবাস করা, দাড়ী গোঁফ আদির উৎপাটন করা দাঁড়িয়ে বা উৎকুট আসনে তপস্যা, স্নান সর্বথা পরিহার করা, শরীরের ময়লা পরিষ্কার না করা, এত সাবধানে যাতায়াত যাতে অন্য কোনো সূক্ষ্ম প্রাণীর হত্যা না হয়, কঠিন শীতে দাঁড়িয়ে থাকা, ইত্যাদি।"

তপস্যা জৈন সাধু জীবনের মুখ্য অঙ্গ, যার জন্য মুনিদের দীর্ঘ তপস্বী বলা হত। তাঁরা তপস্যা প্রায় দাঁড়িয়ে (উব্‌ভট্‌টকো), আসন ছেড়ে (আসন পটিকৃখিত্তো) করতেন। সে তপস্যা বড়ই দুঃখকর, তীব্র (তিপ্‌পা) এবং কটু (কটুকা) হত।

চতুর্যাম সংবর: দীঘ নিকায়ের সামঞ্‌ঞ ফলসুত্তে নিগ্‌গণ্ঠ নাতপুত্তকে চতুর্যাম সংবর দ্বারা সংবৃত বলা হয়েছে। সেখানে চতুর্যাম সংবর-র অর্থ দেওয়া হয়েছে সমস্ত প্রকারের জল হতে সংবৃত (সব্ববারি বারিতো), সব পাপ হতে নিবৃত্ত (সব্ববারি-য়ত্তো), সব পাপের শুদ্ধি দ্বারা সংবৃত (সব্ববারি ধুতো), সব পাপ ক্ষয়ে সুখানুভবকারী (সব্ববারি পুট্‌ঠো)। পালির এই চতুর্যাম সংবর আমাদের চাউজ্জাম (চতুর্যাম) এর

১৫ মজ্‌ঝিম নিকায়, চুলদুক্‌খক্‌খন্ধ সুত্ত।

স্মরণ করায় যার অর্থ চার ব্রত—অহিংসা সত্য অচৌর্য ও অপরিগ্রহ। এই চতুর্যামের জৈনাগম অনুসারে প্রবক্তা ছিলেন ভগবান পার্শ্বনাথ যিনি ভগবান মহাবীরের ২৫০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাবীর এই চতুর্যামে এক আর যাম—ব্রহ্মচর্যব্রত মিলিত করে পঞ্চযাম অর্থাৎ পঞ্চ মহাব্রতের স্থাপনা করেন। কিন্তু উক্ত পালি সূত্রে চতুর্যামের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তা একেবারে ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট। নিগ্রন্থ পরম্পরায় যথার্থ চতুর্যাম সম্বরের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধ বা তাঁর সমকালীন শিষ্যমণ্ডলী ভালো ভাবে পরিচিত ছিলেন না তা নয়। মজ্‌ঝিম নিকায়ের চূলসকুলদায়ি ও সংযুত নিকায়ের গামিণি সংযুত্তের অষ্টম সূত্র হতে জানা যায় যে প্রাণাতিপাত (হিংসা), অদিন্নাদান (চুরি), কামেষু মিচ্ছাচার (অব্রহ্মচর্য), মুসাবাদ (অসত্য) হতে বিরত হতে উপদেশ ভগবান মহাবীর সর্বদা দিতেন। তবুও এই সূত্রে সেগুলোর চতুর্যাম সংবররূপে উল্লেখ করা হয়নি। বৌদ্ধ পরম্পরায় নিগ্রন্থ পরম্পরায় এই চতুর্যাম বা পঞ্চ যামের এক রূপান্তর পঞ্চশীল ও দশশীল রূপে প্রতিপাদিত করা হয়েছে ও ওই নামেই তাদের বোঝানো হয়েছে। মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ের চতুর্যাম সম্বরকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জানতেন অবশ্যই কিন্তু পরে অর্থ সূচক তত্ত্বের নিজেদের গ্রন্থে নামান্তর দেখে জৈনপরম্পরার অর্থ ভুলে গিয়ে থাকবেন। মনে হচ্ছে পরে যখন পালি পিটকের সংকলন হয় তখন চতুর্যাম সংবরের অর্থ দেবার আবশ্যকতা হয় ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজেদের কল্পনায় সেই অর্থ করে নেয়। সে যা হোক, সেখানে চতুর্যামের ঠিক অর্থ দেওয়া হয়নি। কোন কোন বিদ্বানের অভিমত এই যে মহাবীরের অহিংসার চরম সাধনাকে দৃষ্টিতে রেখে পালিসূত্রে চতুর্যামের ওই অর্থ করা হয়েছে। সব প্রকার জল ত্যাগের সহজ অর্থ এই যে জৈনেরা ঠাণ্ডা জলে জীব থাকে বলেন ও তাকে প্রাশুক (উষ্ণ) করে ব্যবহার করেন। জৈন মুনি অপ্রাশুক শীতল জল গ্রহণ করতে পারেন না। এই আচরণের সঙ্গে পালি গ্রন্থ ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। উপালি সুত্তে স্পষ্ট লেখা আছে মহাবীর 'সীতোদকপটিক্খিত্তো' (শীতল জল ত্যাগী) 'উণহোদকপটিসেবী' (উষ্ণজল-সেবী) ছিলেন।

জৈন শ্রাবকদের কিছু ব্রত

অঙ্গুত্তর নিকায়ের তৃতীয় নিদানের ৭০ সূত্রে নিগ্‌গণ্ঠোপসথ নামে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে আমরা জৈন শ্রাবকের দিগ্‌ব্রত ও পৌষধ ব্রতের পরিচয় পাই। উক্ত সূত্রে ভগবান বুদ্ধ বিশাখা নামিকা উপাসিকার জন্য গোপালক উপসথ ও নিগ্‌গণ্ঠ উপসথের উপহাস করতে গিয়ে আর্য উপসথের নির্দেশ দিয়েছেন। নিগ্‌গণ্ঠ উপসথের বর্ণনা এই প্রকার: "প্রত্যেক দিকে এত যোজনের আগে যে জীব আছে ওদের দণ্ড—হিংসা ছাড়ো। দেখ বিশাখা, ওই নিগ্রন্থেরা ওমুক অমুক যোজনের পরে না যাবার নিশ্চয়

করে ও ওত অত যোজন পরের জীবের হিংসা ত্যাগ করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সীমত সীমার ভিতরের প্রাণীর হিংসার ত্যাগ করে না। এতে তারা প্রাণাতিপাত হতে বাঁচতে পারে না।"

ভগবান বুদ্ধের এই কথায় জৈন শ্রাবকের বারো ব্রতের প্রথম গুণব্রত দিগ্‌ব্রতকে পাওয়া কঠিন নয়। দিগ্‌ব্রতের অর্থ হল পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম দিকে যোজন নির্ণীত করে ওর আগে দিকে ও বিদিকে না যাওয়া। এতে শ্রাবক নিজের অল্প ইচ্ছা নামক গুণের বৃদ্ধি করে।

এই প্রসংঙ্গে আগে বলা হয়েছে, তারা উপসথের দিন (তদহ উপসথে) শ্রাবকদের এই প্রকার বলেন যে, "ভাইসব! তোমরা সমস্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করে এরূপ বলো যে আমি কারু নই ও আমার কেউ নেই, ইত্যাদি—কিন্তু যে একথা বলে সে নিশ্চিতরূপে জানে যে অমুক আমার মা ও বাবা, ওমুক আমার ছেলে, স্ত্রী, প্রভু বা দাস। এরূপ জেনেও যখন এরা বলে যে আমি কারু নই বা কেউ আমার নয়, তবে অবশ্যই মিথ্যে বলে।"

এই কথায় জৈন গৃহস্থের বারো ব্রতের দ্বিতীয় শিক্ষা ব্রত পোষধের উল্লেখ করা হয়েছে। জৈনগ্রন্থে পোষধব্রত উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য তিন প্রকার বলা হয়েছে। উত্তম পোষধ তাকে বলা হয় যখন জৈন শ্রাবক সমস্ত রকম আহার পরিত্যাগ করে মর্যাদিত সময়ের মধ্যে বস্ত্র অলংকার পরিবার পরিজনের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। মধ্যম উপসথে যদিও সমস্তই পূর্ব রূপ, তবে শ্রাবক সেদিন জলগ্রহণ করতে পারে। জঘন্য পোষধে আহারও গ্রহণ করে। এই জঘন্য উপসথকে আমরা উক্তপ্রসঙ্গে পরিহাসচ্ছলে বর্ণিত গোপালক উপসথ রূপে চিনে নিতে পারি। "বিশাখা, যেমন সন্ধ্যাকালে গোপেরা গরু চরিয়ে তাদের স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করে ও বলে কি আজ গরু অমুক জায়গায় ঘাস খেয়েছে ওমুক পুকুরে জল খেয়েছে, ও কাল অমুক অমুক জায়গায় চরবে ও জল খাবে আদি, সেরূপই যারা উপসথ নিয়ে খাওয়া দাওয়ার চর্চা করে যে আজ আমি এই খেয়েছি, ওমুক পান করেছি, ওমুক খাব, ওমুক পান করব, তাদের উপসথ গোপালক উপসথ।

এভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থে ছড়ানো সামগ্রীর জৈন গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করে তৎকালীন জৈন ধর্মের রূপ ভালো ভাবে জানা যেতে পারে।

আচার্য বিজয় বল্লভ সূরি স্মারক গ্রন্থ হতে সংকলিত ও অনূদিত।

সুবর্ণভূমিতে কালকাচার্য

ডাঃ ইউ. পি. শাহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরিশিষ্ট ৬

ব্যবহার ভাষ্য ও চূর্ণির বিবরণ

ভাষ্য গাথা—

পুরিসজ্জায়া চউরো বি ভাসিয়ব্বা উ আণুপুব্বিএ ।
অত্থকরে মাণকরে উভয়করে নোভয়করে য ॥ ৩
পঢমতইয়া এত্থং তু সফলা নিফ্‌ফলা দুবে ইয়রে ।
দিট্‌ঠংতো সগতেণা সেবতা অন্নেরায়াণং ॥ ৪
উজ্জেণী সগরায়ং নীয়াগব্বা ন সুট্‌ঠুসেবেংতি ।
বিত্তিয়দাণং চোজ্জং নিবেসয়া অন্নানিবে সেবা ॥ ৫
ধাবয়পুরতো তহ মগ্‌গতো যা সেবই য আসণং নীয়ং ।
ভূমিয়ংপি য নিসীয়ই ইংগিয়কারী উ পঢমো উ ॥ ৬
চিক্‌খেল অন্নয়া পুরতো উগতো সে এগো নবরি সব্বতো ।
তুট্‌ঠেণ তহা রন্না বিত্তী উ সুপুক্‌খলা দিন্না ॥ ৭
বিতিও ন করে অট্‌ঠং মাণং চ করেই জাইকুলমাণী ।
ন নিবসতি ভূমীএ য ন ধাবতি তস্‌স পুরতো উ ॥ ৮
সেবতি ট্‌ঠিতো বি দিন্নেবি আসণে পেসিতো কুণই অট্‌ঠং ।
বিইও ভয়করো তইউ জুজ্‌ঝই য রণে সভামট্‌ঠো ॥ ৯
উভয় নিসেহো চউত্থে বেইয় চউত্থেহিং তত্থ ন উ লদ্ধা ।
বিতী ইয়রেহিং লদ্ধা দিট্‌ঠং তস্‌সুবণতো উ ॥ ১০

—সভাষ্য ব্যবহার সূত্র, ৪ প্রকৃত, গাথা ৩-১০, পৃঃ ৯৪-৯৫

এখানে ভাষ্যগাথা ৫-৭ এর মলয়গিরি কৃত টীকা দ্রষ্টব্য ঃ

"যদা কালিকাচার্যেণ শকা আনীতাস্তদা উজ্জয়িন্যাং নগর্য্যাং শকো রাজা জাতঃ। তস্য নিজকাত্মীয়া একেঽস্মাকং জাত্যা সদৃশ ইতি গর্বাত্তং ন সুষ্ঠু সেবন্তে। ততো রাজা তেষাং বৃত্তিং নাদাৎ। অবৃত্তিকাশ্চ তে চৌর্যং কর্তুং প্রবৃত্তাঃ। ততো রাজা বহুভির্জনৈর্বিজ্ঞপ্তেন নির্বিষয়াঃ কৃতাঃ ততস্তেদেশান্তরং গত্বা অন্যস্য নৃপস্য সেবা

কর্তুমারব্ধাঃ। তত্রৈকঃ পুরুষো রাজ্ঞো গচ্ছত আগচ্ছতশ্চ পুরতো ধাবতি। তথা মার্গতশ্চ কদাচিদ্ ধাবতি রাজ্ঞশ্চ উর্দ্ধস্থিতস্যোপবিষ্টস্য বা পুরতঃ স্থিতঃ সেবতে যদ্যপি চোপবিষ্টঃ সন্ (তং) রাজানমনুজানাতি তথাপি স নীচমাসনমাশ্রয়তে। কদাচিচ্চ রাজ্ঞঃ পুরতো ভূমাবপি নিষীদতি রাজ্ঞশ্চৈাঙ্গিতং জ্ঞাত্বাহনাজ্ঞপ্তোপি বিবক্ষিত-প্রয়োজনকারী অন্যদা চ রাজা পানীয়স্য কর্দমস্য মধ্যেন ধাবিতঃ শেষশ্চ ভূয়ান্লোকো নিঃকর্দমপ্রদেশেন গন্তুং প্রবৃত্তঃ স পুনঃ শক পুরুষোহশ্চস্যাগ্রতঃ পানীয়েন কর্দমেন চ সেব্যমান একঃ স তস্য পুরতো ধাবতি ততস্তস্য রাজ্ঞা তুষ্টেন সুপুষ্কলা অতিপ্রভূতা বৃত্তির্দত্তা।" (ব্যবহার ভাষ্য, উঃ ১০, পৃঃ ৯৪-৯৫)

এই গাথার বিষয়ে চূর্ণিও দেখা উচিত—

"উজ্জেণী গাহাও। যদা অজ্জকালএণ সকা আণীতা সো সগরায়া উজ্জেণীএ রায়হাণীএ তস্স সংগণিজ্জগা অম্হং জাতীএ সরিসোত্তি কাউং গব্বেণং তং রায়ং ণ সুট্ঠু সেবন্তি। রায়া তেসিং বিত্তিং ণ দেতি। অবিত্তীয়া তেন্নং আঢত্তং কাউং বহুজণেণ বিন্নবিএণ তে ণিব্বিসতা কতা। তে অন্নং রায়ং ওলেগ্গএণ ট্ঠাএ উবগতা। তত্থেগো পুরিসো রন্নো অতিংতণতস্স পুরও ধাবতি। অণয়া পাণিএয়ং চিক্খল্লং মজ্ঝেণ পধাবিতো। অন্নো বহুজণো সুক্কেণ গতো। সো সগপুরুসো আসস্স অজ্জাণিতো পাণিএণ চিক্খলেণ য আসুট্ঠুএণ সিব্বংতোবি পুরও ধাবতি। রায়া তুঠ্ঠো…।" (ব্যবহার চূর্ণি, হস্তলিখিত পুঁথি, নং ১৫৮৪, মুনিরাজ শ্রী হংসবিজয় শাস্ত্রসংগ্রহ, বরোদা, পত্র ২২১ অ)

পরিশিষ্ট ৭

অনিলসুত যব-রাজা, গর্দভ ও অডোলিয়া

মা এব মসগ্গাহং গিণ্হসু গিণ্হসু সুয়ং তইয়চক্খুং।
কিং বা তুমেহনিলসুতো ন সুসুয়পুব্বো জবো রায়া ॥ ১১৫৪

সৌম্য! মৈবমসদ্গ্রাহং গৃহাণ, গৃহাণ সূক্ষ্ম-ব্যবহিতাদিষ্বতীন্দ্রিয়ার্থেষু তৃতীয় চক্ষুঃ-কল্পং শ্রুতম্। কিং বা ত্বয়া ন শ্রুতপূর্বোহনিলনরেন্দ্রসুতো যবো রাজা? ॥ ১১৫৪

কঃ পুনর্যবঃ? ইত্যাহ—

জব রায় দীহপট্ঠো সচিবো পুত্তো য গদ্দভো তস্স।
ধূতা অডোলিয়া গদ্দভেণ.ছুঢা য অগডম্মি ॥ ১১৫৫
পব্বয়ণং চ নরিংদে পুণরাগমহডোলিখেলণং চেডা।
জবপত্থণং খরস্সা উবস্সও ফরুসসালাএ ॥ ১১৫৬

যবো নাম রাজা। তস্য দীর্ঘপৃষ্ঠঃ সচিবঃ। গর্দভশ্চ পুত্রঃ। দুহিতা

অডোলিকা। সা চ গর্দভেণ তীব্ররাগাধ্যুপপন্নেন 'অগডে' ভূমিগৃহে বিষয়সেবার্থং ক্ষিপ্তা ॥ ১১৫৫

তচ্চ জ্ঞাত্বা বৈরাগ্যোত্তরঙ্গিতমনসো নরেন্দ্রস্য প্রব্রজনম্। পুত্রস্নেহাচ্চ তস্যোজ্জয়িন্যাং পুনঃ পুনরাগমনম্। অন্যদা চ চেটরূপাণামডোলিকয়া ক্রীড়নং খরস্য চ যবপ্রার্থনম্। ততশ্চোপাশ্রয়ঃ পুরুষ ঃ—কুম্ভকারস্তস্য শালায়ামিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১১৫৬

ভাবার্থ ঃ পুনরায়ম্—১০৪

উজ্জেণী নগরী। তত্থ অনিলসুও জবো নাম রায়া। তস্স পুত্তো গদ্দভো নাম জুবরায়া। তস্স ধূয়া গদ্দভস্স জুবরন্নো ভইণী অডোলিয়া ণাম, সা য অতীব রূববতী। তস্স য জুবরন্নো দীহপট্ঠো অমচ্চো। তাহে সো জুবরায়া তং অডোলিয়ং ভগিণিং পাসিত্তা অজ্ঝোববন্নো দুব্বলী ভবতি। অমচ্চেণ পুচ্ছিও। নিব্বংধে সিট্ঠং। অমচ্চেণ ভন্নতি—সাগারিয়ং ভবিস্সতি তো এসা ভূমিঘরে ছুব্ভতি তত্থ ভুংজাহি তাএ সমং ভোএ, লোগো জাণিসস্তি 'সা কহিং পি বিনট্ঠা'। 'এবং হোউত্তি কয়ং'। অন্নয়া সো রায়া তং কজ্জং নাউং নিব্বেদেণ পব্বতিও। গদ্দভো রায়া জাতো। সো য জবো নেচ্ছতি পঢিউং পুত্তনেহেণ য পুণো পুণো উজ্জেণিং এতি। অন্নয়া সো উজ্জেণীএ অদূরসামংতে জবখেত্তং তস্স সমীবে বীসমতি। তং চ জবখেত্তং এগো খেত্তপালও রক্খতি। ইও য এগো গদ্দভো তং জবখেত্তং চরিউং ইচ্ছতি তাহে তেণ খেত্তপালএণ সো গদ্দভো ভন্নতি—

আধাবসী পধাবসী মমং বা বি নিরিক্খসী।
লক্খিও তে ময়া ভাবো জবং পত্থেসি গদ্দভা ॥ ১১৫৭ ১০৫

অয়ং ভাষ্যান্তর্গতঃ শ্লোকঃ কথানকসমাপ্ত্যণন্তরং ব্যাখ্যাসাতে, এবমুত্তরাবপি শ্লোকৌ।

তেণ সাহুণা সো সিলোগা গহিও। তত্থ য চেডরূবাণি রমংতি অডোলিয়াএ, উংদোইয়াএ ত্তি ভণিয়ং হোই। সা য তেসিং রমংতাণং অডোলিয়া নট্ঠা বিলে পডিয়া। পচ্ছা তাণি চেডরূবাণি ইও ইও য মগ্গংতি তং অডোলিয়ং ন পাসংতি। পচ্ছা এগেণ চেডরূবেণ তং বিলং পাসিত্তা গায়ং—জা এত্থ ন দীসতি সা নূণং এয়ম্মি বিলম্মি পডিয়া তাহে তেণং ভন্নতি—

১০৪ এর আগে টীকান্তর্গত প্রাকৃত কথানক বৃহৎকল্প চূর্ণির পাঠ হতে উদ্ধৃত সামান্য যে পার্থক্য আছে তা গৌণ। এজন্য এখানে চূর্ণির পাঠ উদ্ধৃত করিনি।

১০৫ জাসি এসি পুণো চেব পাসেসুটিরিটিল্লসি।
লক্খিতো তে ময়া ভাবো জবং পত্থেসি গদ্দভা ॥
—ইতিরূপা গাথাবৃহৎকল্প চূর্ণৌ।

ইও গয়া ইও গয়া মগ্‌গিয়জ্জংতী ন দীসতি।
অহমেয়ং বিয়াণামি অগডে ছুঢা অডোলিয়া ॥ ১১৫৮

সো বি ণেণং সিলোগো পঢিও। পচ্ছা তেণ সাহুণা উজ্জেণিং পবিসিত্তা কুংভকারসালাএ উবস্সও গহিও। সো য দীহপট্‌ঠো অমচ্চো তেণং জবসাহুণা রায়ত্তে বিরাহিও। তাহে অমচ্চো চিংতেতি—'কহং এয়স্‌স বেরং নিজ্জাএমি?' ত্তি কাউং গদ্দভরায়ং ভণতি—এস পরীসহপরাতিও আগও রজ্জং পেল্লেউকামো, জতি ন পত্তিয়সি পেচ্ছহ সে উবস্‌সএ আউহাণি। তেন য অমচ্চেণ পুব্বং চেব তাণি আউহানি তম্মি উবস্‌সএ নূমিয়াণি পত্তিয়াবণনিমিত্তং। রন্না দিট্‌ঠানি। পত্তিজ্জিও। তীএ অ কুংভকারসালাএ উংদুরো ঢুক্কিউং ঢুক্কিউং ওসরতি ভএণং। তাহে তেণং কুম্ভকারেণং ভন্নতি—

সুকুমালগ! ভদ্দলয়া! রত্তিং হিংডণসীলয়া!
ভয়ং তে নত্থি মংমূলা দীহপট্‌ঠাও তে ভয়ং ॥ ১১৫৯

সো বি ণেণ সিলোগো গহিও। তাহে সো রায়া তং পিয়রং মারেউকামো রহং মগ্‌গই। 'পগাসে উড্‌ডাহো হোহি' ত্তি কাউং অমচ্চেণ সমং রত্তিং ফরুসসালং অল্লীণো অচ্ছতি। তত্থ তেণ সাহুণা পঢিও পঢ়মো সিলোগো—

"আধাবসী পধাবসী·· ···॥ ১১৫৭ [১০৬]

রন্না নায়ং—বেতিয়া মো, ধুবং অতিসেসী এস সাধূ। তও বিতিও পঢিও—"ইও গতা ইও গতা··· ॥"১১৫৮

তং পি ণেণং পরিগয়ং জহা—নাতয়ং (v. i নায়ং) এতেণ। তও তর্তিও পঢিও—'সুকুমালগ! ভদ্দলয়া...॥১১৫৯

তাহে জাণতি—এস অমচ্চো মমং চেব মারেউকামো কও মমং রাতা (রায়া) হোউং সংতে ভোএ পরিচ্চইত্তা পুণো তে চেব পত্থেতি ! এস অমচ্চো মং মারেউকামো এবং জত্তং করেই। তাহে রায়া অমচ্চস সীসং ছেত্তুং সাহুস্‌স উবগংতুং সব্বং কহেই খামেই য ॥

অথ শ্লোক ত্রয়স্যাক্ষরার্থঃ—আ-ঈষদ্ আভিমুখ্যেন বা ধাবসি আধাবসি, প্রকর্ষেণ পৃষ্ঠতো বা ধাবসি প্রধাবসি, মামপি চ নিরীক্ষসে, লক্ষিতস্তে ময়া 'ভাবঃ' অভিপ্রায়ো যথা 'যবং' যবধান্যং চরিতুং প্রার্থয়সি ভো গর্দভ। দ্বিতীয়পক্ষে যবনামানং রাজানং মারয়িতুং ভো গর্দভনৃপতে। প্রার্থয়সীতি প্রথম শ্লোকঃ ॥১১৫৭

ইতো গতা ইতো গতা মৃগ্যমাণঃ ন দৃশ্যতে, অহমেতদ্ বিজানামি 'অগডে' ভূমিগৃহে গর্তায়াং বা ক্ষিপ্তা 'অডোলিকা' উন্দোয়িকা নৃপতিদুহিতা বা। দ্বিতীয় শ্লোকঃ ॥১১৫৮

১০৬ গাথা ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯ আগে দেওয়া হয়েছে তাই পুর্ণতঃ উদ্ধৃত করা হল না।

মূষকস্য রাজ্ঞশ্চ শরীরসৌকুমার্যভাবাৎ সুকুমারক। ইত্যামন্ত্রণম্ 'ভদ্দলগ' তি ভদ্রাকৃতে। রাত্রৌ হিণ্ডনশীল। মূষকস্য দিবা মানুষাবলোকনচকিত, তয়া রাজ্ঞস্তু বীরচর্যয়া রাত্রৌ পর্যটনশীলত্বাৎ, ভয়ং 'তে' তব নাস্তি 'মন্মূলাৎ' মন্নিমিত্তাৎ কিন্তু 'দীর্ঘ-পৃষ্ঠাৎ' একত্র সর্পাৎ অন্যত্র তু অমাত্যাৎ 'তে' তব ভয়মিতি তৃতীয় শ্লোকঃ ॥১১৫৯

—বৃহৎকল্পসূত্র, বিভাগ ২, প্রথম উদ্দেশ, সূত্র ১, ভাষ্যগাথা ১১৫৭-৬১, পৃঃ ৩৫৯-৬১

উপরোক্ত উদ্ধরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। সমস্ত গল্পটি ঐতিহাসিক না হতে পারে কিন্তু গর্দভের সঙ্গে মনে হচ্ছে কালক কথার সম্পর্ক রয়েছে। এখানেও ওর কামী স্বভাব সুস্পষ্ট। অডোলিয়া নামটি বিদেশী (সম্ভবতঃ গ্রীক—যাবনী) নামের রূপান্তর। ডাঃ শান্তিলাল শাহ্ অনুমান করেন যে অনিলসুত Antialkidas ও গর্দভ Khardaa [১০৭], কিন্তু আমার তা ঠিক মনে হয় না কারণ Antialkidas-এর অনিলসুত হওয়া কঠিন। আর যদি অনিলের পুত্র এরূপ অর্থ করি তবে সে Antialkidas হতে পারে না আর Khardaa (মথুরার সিংহধ্বজ লেখের উদ্দিষ্ট) এই Antialkidas এর ছেলে হতে পারে না। শ্রীশান্তিলাল শাহর অনুমান 'অনিলসুতো জবো নাম রায়া'র স্থানে 'অনিলসুতো নাম যবনো রায়া' হবে। কিন্তু তাতে পূর্ণ সন্তোষ হয় না কারণ তার পুত্র Khardaa নয়।

তবুও গর্দভ কে?—এই বিষয়ের সংশোধনে এই উল্লেখ সাহায্য করতে পারে। কালকের জীবন ঘটনার বিষয়ে চূর্ণি কথানক এর অন্য অবতরণ এখানে আমি দিচ্ছি না কারণ সে সমস্ত নবাব ও ডাঃ ব্রাউন সংগৃহীত করেছেন।

উপসংহার

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য জৈন সাক্ষ্যের সমীক্ষা করা। এই সমীক্ষায় আমরা নিশ্চিত রূপে বলতে পারি যে কালক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। উনি অনুযোগাদি গ্রন্থ রচনা করেন যে গ্রন্থাদি হতে প্রব্রজ্যা বিষয়ক কালক রচিত গাথা আমরা পাই। নিগোদ ব্যাখ্যাকার, সুবর্ণভূমিগামী, আর্য সমুদ্রের গুরুর গুরু, অনুযোগ রচয়িতা, আজীবিকদের নিকট নিমিত্ত পঠনকারী ও যিনি সাতবাহন রাজাকে মথুরার ভবিষ্যৎ বলেছিলেন সেই কালক আর্য শ্যামই—এ নিশ্চিত।

ধর্মঘোষ সূরি শ্রীঋষভ মণ্ডল স্তবে প্রজ্ঞাপনাকার শ্যামার্যকে প্রথমানুযোগ ও লোকানু-যোগ-এর রচনাকার বলে অভিহিত করেছেন। কালকের পরে উনি আর্য সমুদ্রের স্তুতি করেছেন—

১০৭ শান্তিলাল সাহ্, দি ট্রাডিশনাল ক্রনোলোজি অব দি জৈনস্, পৃঃ ৬১, ৬৮। মথুরার সিংহধ্বজ Khardaa'র উল্লেখের জন্য দ্রষ্টব্য এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভাগ ৯, পৃঃ ১৪০, ১৪৭।

নিজ্জূঢা জেণ তয়া পন্নবণা সব্বভাবপন্নবণা ।
তেবীসইমো পুরিসো পবারো সো জয়উ সামজ্জো ॥১৮০

পঢমণুওগে কাসী জিনচক্কিদসারপুব্বভবে ।
কালগসূরী বহুঅং লোগণুওগে নিমিত্তং চ ॥১৮১

অজ্জসমুদ্দগণহরে দুব্বলিএ ধিপ্পএ পিহু সব্বং ।
সুত্তত্থচরমপোরিসিসমুট্ঠিএ তিণ্ণি কিইকম্মা ॥১৮২

—জৈন স্তোত্র সন্দোহ, ভাগ ১, পৃঃ ৩২৯-৩০

দেবেন্দ্র সূরির শিষ্য শ্রীধর্মঘোষ সূরির রচনাকাল বিক্রম সম্বৎ আনুমানিক ১৩২০-১৩৫৭। তাই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সঙ্ঘভাষ্য আদির কর্তা শ্রীধর্মঘোষ সূরির মত আচার্যও শ্যামার্যকেই অনুযোগকার কালকাচার্য বলে গণ্য করতেন।

গর্দভরাজোচ্ছেদক কালকই আর্য শ্যাম এরূপ আমার অভিমত। কিন্তু এখনো যদি কারো সন্দেহ থাকে তো তাঁদের বোঝা উচিত যে বলমিত্র ভানুমিত্র ও আর্যকালক সমকালীন ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ এর প্রমাণ। পট্টাবলীর পট্টধর কালগণনা বা স্থবির কালগণনা বা নৃপ কালগণনা, যাতে ভ্রান্তি আছে তাদের ছেড়ে প্রাচীন গ্রন্থসাক্ষ্যে আমি বলেছি যে গর্দভোচ্ছেদক কালক ও অন্য ঘটনার কালক একই এবং তিনি গুণ সুন্দরের শিষ্য আর্য শ্যামই। এঁর সময় খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী।

যাঁরা দ্বিতীয় কালক (বীরাব্দ ৪৫৩) স্বীকার করেন তাঁদের হিসাবেও কালকের সুবর্ণভূমি গমনের সময় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীই।

কালক কোন সাতবাহন রাজার সমকালীন ছিলেন। তিনি কে ছিলেন? কারণ কালক এক কাল্পনিক ব্যক্তি নন। তাই এখন সাতবাহন বংশের ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের নূতন করে আলোচনা করা উচিত। পঞ্চকল্প ভাষ্য, বৃহৎকল্প ভাষ্যর মত গ্রন্থের লেখক সংঘদাস গণি ক্ষমাশ্রমণ বা অন্য ভাষ্যকার চূর্ণিকার যে ঐতিহাসিক কথা লিখেছেন তা কপোলকল্পিত নয়, ইতিহাসনিষ্ঠ একথা এখন প্রতীয়মান হচ্ছে। কুণাল, সম্প্রতি ও অশোক বিষয়ক যে কথা বৃহৎকল্প ভাষ্যে আছে তার ঐতিহাসিকতা ডাঃ মোতিচন্দ্র ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কংগ্রেসের সপ্তদশ সম্মেলনে, ১৯৫৪ অহমদাবাদে স্ববিভাগীয় প্রধান বক্তব্যে উপস্থিত করিয়েছেন। ভাষ্যের মুরণ্ড রাজাদের উল্লেখও পরে সত্য:প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি জৈন সাধুদের বিহারের জন্য অন্ধ্র ও দক্ষিণ ভারতে সুবন্দোবস্ত করেন সেও সত্য ঘটনা। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে (দ্রবিড় প্রদেশে) সম্প্রতি মৌর্য সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত করেছেন বা বলবত্তর করেছেন। বৃহৎকল্পভাষ্যে ও আবশ্যক চূর্ণির নহপান ও সাতবাহনের মধ্যের সংঘর্ষে সাতবাহন রাজার জয়ও সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে কারণ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানদের মোহরে নিজের ছাপ অঙ্কিত

করিয়েছেন। আমার মতে নহপানজয়ী সাতবাহন কালকের সমকালীন সাতবাহন নরেশের পরবর্তী নরেশ।

বলমিত্র ভানুমিত্র ও কালকের সমকালীন সাতবাহন খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে বা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে বর্তমান ছিলেন। সেই সাতবাহন কে ছিলেন ? এ সব কথা এখন আবার বিচারণীয় হয়ে উঠেছে কারণ কালক সত্য সত্যই ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধ্যয়নে জৈন আগম সাহিত্য যে এক মহত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে সেদিকে এখনো যথাযোগ্য দৃষ্টিপাত করা হয়নি। এই আগম সাহিত্যে কতক বিষয় এমন আছে যার মহত্ব প্রাচীন বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য হতে কম নয়। এই তিনটি সাহিত্যের অধ্যয়ন একে অন্যের পূরক। যাকে আমরা পুরাতত্বে Northern Black Polished ware (N. B. P) বলি বা অশোকের সময়ে যে High Polish দেখতে পাই তার একমাত্র বর্ণনা জৈন ঔপপাতিক সূত্রে পৃথিবী শিলাপটের বর্ণনে পাওয়া যায়।[১০৮]

তাই আমাদের উচিত জৈন আগম সাহিত্য বিশেষ করে ভাষ্য ও চূর্ণির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দি। এর ভালো রকম সমীক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় সহায়ক হবে। ভাষা শাস্ত্রীর জন্যও ভাষ্যে বিশেষতঃ চূর্ণিতে বিপুল সামগ্রী পড়ে রয়েছে।

সুবর্ণভূমি ও সুবর্ণ দ্বীপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে পশ্চিম ও মধ্য ভারতেরও অবদান রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন। সূর্পারক হতে সুবর্ণভূমি যাত্রী ব্যবসায়ীদের কথা জাতকে পাওয়া যায়। কালকের কর্মক্ষেত্রও পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্য ভারত ছিল ও তিনি সুবর্ণভূমি গমন করেছিলেন। গুজরাতের ব্যবসায়ীরা জাভায় যেতেন, গুপ্তোত্তর কালেও। গুজরাতে এই ধরণের একটি কথা আছে যে যে জাভায় যায় সে প্রায়শঃই ফিরে আসে না। আর যদি আসে তবে এত ধন নিয়ে আসে বা বংশানুক্রমে অক্ষুন্ন থাকে। প্রাচীন জাভার রামায়ণ 'কাকবীন' [১০৯] এর বিষয় পশ্চিম ভারতে রচিত ভট্টিকাব্য হতে বিশেষতঃ নেওয়া হয়েছে তা এর দ্যোতক।

১০৮ দ্রষ্টব্য, উমাকান্ত শাহ, ষ্টাডীজ ইন জৈন আর্ট (বারাণসী, ১৯৫৫) পৃঃ ৬১-৬৯-৮৩।

১০৯ এর বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডাঃ সো হুইকাস কৃত দি ওল্ড জাভানীস রামায়ণ কাকবীন, কোপেন হেগেন (নেদারল্যাণ্ড), ১৯৫৫।

নিষণ্ণ ছিলাম ঘুমে

নিষণ্ণ ছিলাম ঘুমে,
তাই দেখি নাই এতকাল—
লাবণ্য কেবলি ভেঙে যায়,
দ্রুত ভেঙে যায়,
ভেঙে যায় তোমার গড়ন,
ফেটে যায় মুখের চাতাল,
ঝরে যায় বক্ষের বিশাল,
ঝরে যায় জঙ্ঘার বিশাল,
চুম্বনে জাগে না আর মদির যৌবন।
আমিও কি ভেঙে যাব দারুণ চীৎকারে ?
কেমন উত্তাপহীন তোমার শরীর।
পারিবে কি সূর্য ফিরে দিতে সেই তাপ,
সে গড়ন ?
আমার প্রয়াণকাল বধির আঁধারে
ভরে ওঠে।

পৃথিবীর দিকে দিকে

পৃথিবীর দিকে দিকে দেখি আজ ভেঙে ভেঙে পড়ে
উদাত্ত জীবন বোধ। শতাব্দীর বিরুদ্ধ বাতাসে
আজ তাই চারিত্রের বড় দীর্ঘ প্রয়োজন ছিল,
প্রয়োজন ছিল সেই সব মানুষের অবিরাম
আত্মার নির্মাণে যারা গড়ে যাবে নূতন পৃথিবী।
হে মানুষ, তাই আমি সকলেরে ডাক দিয়ে যাই,
আমাদেরো রয়েছে করার। আমরা সরিক
তীর্থ প্রতিষ্ঠার কাজে তীর্থকৃৎ মহামানবের।

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রথম বিস্ময়ের ভাবটা কাটতেই আমি ভাবতে লাগলাম, যে দু'জন আমায় নিয়ে যাচ্ছে, তারা কি আমার চাইতে বেশী বলশালী। কিন্তু আমি যখন তাদের চোখে আমার চোখ রাখলাম তখন তারা তাদের চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল। এতে বুঝতে পারলাম তারা আমার মত বলশালী নয়। আরো অনুভব করলাম ওরা আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ ও মৈত্রীভাবাপন্ন। তাই ওরা আমার অনিষ্ট করার চেষ্টা না করা পর্যন্ত আমি কিছু করব না স্থির করলাম।

তারা আমায় এক পর্বত শিখরে এনে নামিয়ে দিল। তারপর আমায় প্রণাম করে বলল তাদের নাম পবনবেগ ও অংশুমালী। এই বলে তারা তাড়াতাড়ি সেখান হতে চলে গেল।

তারা চলে যাবার খানিক পরেই এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক সেখানে এসে উপস্থিত হল ও বিদ্যাধররাজ অশনিবেগের কন্যা শ্যামলীর পরিচারিকা বলে নিজের পরিচয় দিল। তার নাম মত্তকোকিলা। মত্তকোকিলা আমায় বলল, কুমার, রাজার আদেশেই তাঁর মন্ত্রী পবনবেগ ও অংশুমালী আপনাকে এখানে ধরে এনেছেন। আপনি অন্যথা মনে করবেন না। রাজা আপনার সঙ্গে শ্যামলীর বিবাহ দিতে চান। এই বলে সে রাজকন্যার রূপ বর্ণনা করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই নিকটবর্তী একটা কূপে আকাশ হতে সরিসৃপ জাতীয় কোনো কিছু একটা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একথা উদিত হল—এ সাপ না বিদ্যাধরী।

আমার মনের ভাব ধরে নিয়েই মত্তকোকিলা বলে উঠল, কুমার, ও সাপ নয়। এই কুয়োয় যে জল রয়েছে তা যেমন মিষ্ট তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদ। যাতে জন্তুজানোয়ার ওখানে যেতে না পারে তার জন্য ওতে নামার মর্মর পাথরের সিঁড়ি করা আছে। আপনি যদি ওর জল পান করতে চান ত আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি।

আমি যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে আমার নীচে নিয়ে গেল। আমি পিপাসিত ত ছিলামই তাই সেই অমৃতোপম জল আকণ্ঠ পান করলাম।

আমি কূয়ো হতে বাইরে আসতেই অশনিবেগের অনুচরেরা সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদের হাতে স্নানদ্রব্য, বসনভূষণ ও রত্নালঙ্কার ছিল। নগরদ্বারের নিকট অন্তঃপুররক্ষিকা কলহংসীকে দেখতে পেলাম। সে ও তার সঙ্গিনীরা সেখানে আমায় স্নান করিয়ে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করল। তারপর সেখান হতে আমায় তারা তাদের রাজার নিকট নিয়ে গেল।

অশনিবেগকে আমি নত হয়ে প্রণাম করলাম। তিনিও আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পাশে সিংহাসনে বসালেন। তারপর এক শুভদিনে তিনি তাঁর কন্যা শ্যামলীকে আমার হাতে সমর্পণ করলেন।

বাসর শয্যায় শ্যামলী আমার কাছে বর প্রার্থনা করল।

আমি বললাম, তুমি কি বর চাও? তোমায় আমার কিছুই অদেয় নেই।

সে বলল, এই বর দাও যাতে সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

আমি বললাম, এ বর ত আমার চাইবার, তোমার নয়।

সে বলল, না, তা নয়, এর কারণ আছে। তোমায় বলি শোন—

বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণ ভাগে কিন্নরগীত বলে এক নগর আছে। সূর্যের মত প্রতাপশালী অর্চিমালী সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর ঔরসে প্রভাবতীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। নাম জ্বলনবেগ ও অশনিবেগ। জ্বলনবেগের স্ত্রীর নাম বিমলাভা, পুত্রের নাম অঙ্গারক। অশনিবেগের এক কন্যা হয়, সেই কন্যাই আমি। আমার মায়ের নাম সুপ্রভা।

একদা বৈতাঢ্য পর্বতের শিখর দেশে বিচরণ করে অর্চিমালী পত্নীসহ নগরোদ্যানের বৃক্ষতলে এসে উপবেশন করলেন। সেখানে যখন তাঁরা বিশ্রম্ভালাপে রত ছিলেন তখন দূরে এক হরিণকে বসে থাকতে দেখে অর্চিমালী তীর নিক্ষেপ করলেন। হরিণটী যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল অথচ তীরটি তাঁর হাতে ফিরে এল। এতে বিস্মিত হয়ে তিনি দ্বিতীয়বার তীর ছুঁড়বার উদ্যোগ করতেই কে যেন অন্তরীক্ষ হতে বলে উঠল, পূজ্য চারণমুনি নন্দ ও সুনন্দ ওই কুঞ্জবিতানে ধ্যানে বসে রয়েছেন। তুমি তাঁদের কাছে উপবিষ্ট হরিণকে দেখতে পেয়েছিলে। কিন্তু মুনিরা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অসংখ্য জীবের রক্ষা করেন। যে ওই সব জীবদের হত্যা করবার চেষ্টা করে তাঁরা যদি তার ওপর ক্রুদ্ধ হন তবে দেবতারাও তাকে রক্ষা করতে সমর্থ নন। তাই ওঁদের কাছে যেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর যাতে তোমার কোনো অনিষ্ট না হয়।

অর্চিমালী সেকথা শুনে ভয় পেলেন ও মুনিদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁদের প্রণাম করে বললেন, হে পূজ্য মুনিদ্বয়, আমি আপনাদের আশ্রিত। হরিণকে হত্যা করবার চেষ্টা করছিলাম, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।

সেকথা শুনে নন্দ বললেন, রাজন্, যারা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে জীব হত্যা করে তারা অধোগতি লাভ করে ও দীর্ঘকাল অসহায়ের মত দুঃখ ভোগ করে। তাই জীব হত্যা হতে বিরত হও। এভাবে তুমি হিংসার হাত হতে রক্ষা পেতে পার। দোষীকেও যে হত্যা করে সে পাপ সঞ্চয় করে, একশ' জীবনেও সেই পাপ ক্ষয় করা যায় না। এ হতেই অনুমান করতে পারবে যে নির্দোষ ও কোনোরকম অনিষ্ট করেনি তাকে হত্যার পরিণাম কি ভয়াবহ।

সেকথা শুনে অঁচিমালীর সংসারে বিতৃষ্ণা এসে গেল। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্বলনগ্রীবকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজের পন্নত্তি নামক বিদ্যা দান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন ও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকাল পরে পূজ্য মুনি নন্দ ও সুনন্দ আবার কিন্নরগীত নগরে উপস্থিত হলেন। জ্বলনবেগ তাঁদের বন্দনা করতে গেলেন। সেখানে সাংসারিক ধনৈশ্বর্যের বিনশ্বরতার কথা শুনে তিনিও সংসার বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি তার কনিষ্ঠ ভাইকে ডেকে বললেন, আমি প্রব্রজ্যা নেব, তাই হয় রাজ্য নয় পন্নত্তি বিদ্যা আমার কাছ হতে নিয়ে নাও।

আমার পিতা প্রত্যুত্তর দিলেন, কুমার (অঙ্গারক) এখনো বালক। তাই তুমি যা দিতে চাইছ তা নেওয়া আমার উচিত হয়না। ওর যা পছন্দ ওকেই তা আগে নিতে দাও।

অঙ্গারককে তখন ডাকা হল। অঙ্গারককে সে কথা জিগ্যাসা করা হলে বলল, মা যা বলবেন আমি তাই করব। মা তাকে বিদ্যা নিতেই বললেন। কারণ যে সেই বিদ্যা অর্জন করবে সেই রাজত্ব লাভ করবে। তাই মায়ের উপদেশানুযায়ী সে পন্নত্তি বিদ্যা গ্রহণ করল।

আমার পিতাকে রাজ্য দেওয়া হল। কিন্তু জ্বলনবেগের স্ত্রী বিমলাভা পূর্বের মতই প্রজাদের কাছ হতে কর সংগ্রহ করতে থাকলেন। একবার প্রজারা আমার পিতার নিকট এসে বলল, দেব, আমরা দেবী সুপ্রভাকে কর দিতে চাই কিন্তু বিমলাভা তাতে বাধা দেন। উভয়েই আমাদের কাছে সমান। তাই আমাদের নির্দেশ করুন, আমরা কি করব ?

বিমলাভাকে ডাকা হল ও প্রজাদের কাছ হতে কর নিতে নিষেধ করা হল। কিন্তু বিমলাভা বলল, আমি পুত্রের মা, তাই এ কর আমারই পাবার।

সকলে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছুই বুঝতে চাইল না। এমন কি সে তার পুত্রকে উত্তেজিত করল। অঙ্গারক নিজের প্রমোদের জন্য প্রজাদের কাছ হতে তার মনোমত বস্তু জোর করে ছিনিয়ে নিতে লাগল।

এভাবে আমার পিতা ও অঙ্গারকের মধ্যে বৈর বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধে অঙ্গারক আমার পিতাকে পরাজিত করল। পিতাকে তাই রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে যেতে হল।

অঙ্গারক রাজা হয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। বলল, শ্যামলী, তুমি কিছু ভেবনা। তুমি ভাই-এর ধন উপভোগ কর। তোমার কোন কিছুরই অভাব হবে না।

আমি বললাম, তুমি জয়লাভ করেছ ও অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধ হতে ফিরে এসেছ। কিন্তু আমার আত্মীয় পরিজনেরা তোমা হতে অনিষ্টের আশঙ্কা করেন। আমার

পিতা যখন এস্থান পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন তখন আমায় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দাও।

অঙ্গারক বলল, তোমার যাবার ওপর কোনো প্রতিবন্ধ নেই। তুমি ইচ্ছে মত যেতে আসতে পার।

আমি তখন আমার পরিচারিকা ও অনুচর সহ পিতার নিকটে গেলাম। তিনি তখন অষ্টাবয়ব পর্বতে অবস্থান করছিলেন।

সেই সময় পর্বতোস্থিত এক জিনালয়ে চারণমুনি অঙ্গীরসও অবস্থান করছিলেন। পিতা তাঁকে প্রণাম করে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি আমার রাজ্য ফিরে পাব? না শ্রমণ সংঘে আমার যোগদান করার সৌভাগ্য হবে?

অঙ্গীরস বললেন, রাজর্ষি, অংশুমালী যেহেতু আমার গুরুভ্রাতা তাই তোমায় বলছি যে শ্রমণ সংঘে যোগদান করার তোমার সৌভাগ্য হবে না তবে তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে।

আমার পিতা বললেন, মুনিবর, আমার রাজ্য আমি কি করে ফিরে পাব?

তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, তোমার এই কন্যার স্বামীর সাহায্যে তা সম্ভব হবে। যার সঙ্গে এর বিয়ে হবে তার পুত্র অর্দ্ধভরতের অধিশ্বর হবে।

আমার পিতা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পূজ্য, আমরা তাঁকে কি করে চিনতে পারব?

মুনি বললেন, কুঞ্জরাবর্ত অরণ্যে বন্য হাতীর সঙ্গে যাকে যুদ্ধ করতে দেখবে সে-ই সেই ব্যক্তি।

এরপর আমার পিতা তাঁকে প্রণাম করে এই পর্বতে এসে নিবাস নিলেন ও সেই হতে প্রতিদিন তাঁর দুজন অমাত্য কুঞ্জরাবর্তে গিয়ে তোমার সন্ধান করতে লাগলেন।

মুনি যেরূপ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেরূপ অবস্থায় তোমাকে দেখে পবনবেগ ও অংশুমালী তোমাকে এখানে নিয়ে আসেন।

মুনির ভবিষ্যৎবাণীর কথা অঙ্গারক জানে। তাই কোন অসাবধান মুহূর্তে সেই দুষ্ট তোমায় বধ করতে পারে এই আমার ভয়। বিদ্যাধরদের অধিষ্ঠাতা নাগ রাজের এই বিধান যে সাধুর নিকট, জিনালয়ে, স্ত্রীর নিকট বা শায়িত অবস্থায় থাকা কালে তাকে যদি কেউ বধ করে তবে তার বিদ্যা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্যই আমি তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করছি যে তুমি মুহূর্তের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করে যাবে না যাতে সে তোমায় বধ করতে না পারে।

শ্যামলীর কথা শেষ হলে আমি বললাম, অঙ্গারক আমার কিছুই করতে পারবে না। বড় জোর গালমন্দ দিতে পারে। তবুও তুমি যা বলবে তাই আমি করব।

তার সহবাসে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে আনন্দে আমার সময় ব্যতীত হতে লাগল।

শ্যামলী আমায় গান্ধর্ব বিদ্যায় নিপুণ করে দিল। এছাড়া সে আমায় আরো দুটি বিদ্যা দিল যার একটি হল বন্ধন বিমুক্তি, অন্যটি পাতার মত লঘু হওয়া।

একদিন আমি যখন শ্যামলীর সঙ্গে শুয়েছিলাম সেই সময় কে যেন আমায় তুলে নিয়ে গেল। ঘুম ভাঙতেই আমি যাকে দেখলাম তার মুখ শ্যামলীর মতই মনে হল। আমি তাকে অঙ্গারক বলে অনুমান করলাম।

শত্রুকে যে নিহত করে সে উত্তম, যে তাকে নিহত করে নিহত হয় সে মধ্যম, যে শুধু নিজে নিহত হয় সে অধম। আমি মধ্যম হব অন্তত: অধম হতে চাই না।

একথা চিন্তা করে আমি অঙ্গারককে আঘাত করতে গেলাম কিন্তু সহসা আমার শরীর শক্ত হয়ে গেল। আমি হাত তুলতেই পারলাম না।

অঙ্গারক তখন আমার দিকে চেয়ে বলল, কুমার, বিদ্যা অর্জন না করে সাপকে ধরা যায় না। আমি তোমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছি।

সেই সময় শ্যামলী সেখানে এসে উপস্থিত হল। বলল, ভাই, তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করতে পারনা। সে তোমার অবধ্য।

তারপর ঘৃণাভরে সে বলে উঠল, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। তা না হলে তোমার সঙ্গে আমায় অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে হবে।

সেকথা শুনে অঙ্গারক যেন একটু ঘাবড়ে গেল ও আমায় ঠেলে ফেলে দিল। আমি একটি বিচালিভরা জলহীন কুয়োয় গিয়ে পড়লাম। সেখান হতে দেখলাম দুই ভাইবোনে যুদ্ধ হচ্ছে।

অঙ্গারক তার তলোয়ার দিয়ে শ্যামলীকে দুখণ্ড করে ফেলল। আমি চীৎকার করে উঠলাম। কি নিষ্ঠুর! নিজের বোনকে মেরে ফেলল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখলাম, সেখানে দু'জন শ্যামলী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শ্যামলী তখন তার তলোয়ার দিয়ে অঙ্গারককে দুখণ্ড করে ফেলল। তার পরের মুহূর্তেই দেখলাম সেখানে দু'জন অঙ্গারক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তাহলে শ্যামলী মরে নি। ওদের বিদ্যার জন্যই আমার এই ভ্রান্তি হয়েছিল।

শ্যামলী ও অঙ্গারক যুদ্ধ করতে করতে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

যদিও আমি কুয়োর মধ্যে পড়েছিলাম ও স্তম্ভিত হয়ে ছিলাম তবুও মনে মনে আমি কায়োৎসর্গ ধ্যানে নিমগ্ন হলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তম্ভিতভাব দূর হয়ে গেল।

খানিক পরে এক গবাক্ষ হতে দীপালোক আসতে দেখলাম। সেই দীপালোককে আমার বাঘ বলে মনে হল। কিন্তু তখনি ভাবলাম, ওই আলো যদি বাঘ হত তবে সে

নিশ্চিত আমায় আক্রমণ করত। কারণ আমিত কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছি। তাই ওটা আলোই, বাঘ নয়। বোধ হয় নিকটে কোনো লোকালয় রয়েছে।

সকালে আমি কুয়ো হতে বার হলাম।

নিকটে এক মধ্য বয়স্ক লোককে দেখতে পেয়ে বললাম, ভদ্র, এই দেশের নাম কী, এই নগরীর নাম কী ?

সে আশ্চর্যের মত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, মহাশয়, মানুষ একদেশ হতে অন্যদেশে হেঁটে এসেই পৌঁছয়। তাই আপনি কেন এই দেশের ও নগরীর নাম জিগ্যেস করছেন। আপনি ত আর আকাশ হতে পড়েন নি ?

আমি বললাম, আমি মগধ হতে আসছি। জাতি ব্রাহ্মণ, নাম খন্দিল। গোত্র গৌতম। দুই যক্ষিণীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তাদের একজন আকাশ পথ দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে থাকে। ঈর্ষ্যাবশে আর একজন তাকে অনুসরণ করে মাঝ পথে আক্রমণ করে। তারপর তাদের মধ্যে কিলোকিলি চুলোচুলি সুরু হয়। আর সেই সময় আমি আকাশ হতে ঝুপ করে মাটিতে এসে পড়ি। তাই এই অংশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত।

লোকটি ভাল করে আমার দিকে চেয়ে নিল। তারপর বলল, যক্ষিনীদের ভালোবাসবার মতই তোমার চেহারা। তারপর একটু থেমে বলল, এই দেশের নাম অঙ্গ, নগরীর নাম চম্পা।

নিকটেই মন্দির ছিল। মন্দিরে তীর্থংকর বাসুপূজ্যের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমি সেই মন্দিরে গিয়ে তাঁর পূজা ও বন্দনা করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

মন্দির হতে বাজারে এলাম। বাজারে দেখলাম সকলের হাতে বীণা। শকট হতে অনেকে বীণা বিক্রী করছে, তাদের শকটের চারদিকে মানুষের অগণিত ভীড়।

আমি একটি লোককে জিগ্যেস করলাম এখানে এত বীণা বিক্রী হচ্ছে কেন ? এ কি এ দেশের প্রথা, না এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে ?

সে বলল, বণিক সংঘের প্রমুখ চারুদত্ত এখানে বাস করেন। তাঁর গন্ধর্বদত্তা নামে এক সুন্দরী কন্যা আছে। গন্ধর্ব বিদ্যায় তার মত কুশলা সচরাচর দেখা যায় না।

চারুদত্ত কুবেরের মত ধনী। তাঁর মেয়ের রূপে আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলে বীণ বাদনে আত্ম নিয়োগ করেছে। যে বীণ বাদন ও সংগীত বিদ্যায় গন্ধর্বদত্তাকে পরাস্ত করবে সে তাকে পত্নীরূপে লাভ করবে। তাই প্রতিমাসে একবার এখানে সঙ্গীত সভার আয়োজন হয়। গতকাল সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে গেছে। আবার একমাস পর সঙ্গীত সভার আয়োজন হবে।

মনে মনে ভাবলাম, আমাকে তাহলে এখানে এক মাসের ওপর থাকতে হবে। আমি তখন তাকে জিগ্যেস করলাম, এখানে কি কোনো কলাচার্য আছেন যিনি সংগীত

বিদ্যায় পারংগত। সে প্রত্যুত্তর দিল, হাঁ আছেন। তাঁদের মধ্যেও আবার সুগ্রীব ও জয়গ্রীব বিশেষ খ্যাতিমান।

আমি তখন তাঁদের ঘরে সময় কাটাব স্থির করলাম ও আমার অলঙ্কারাদি যা কিছু ছিল তা নিভৃতে মাটিতে পুঁতে নগরে ফিরে এলাম। তারপর মূর্খের মত আবোল তাবোল বকতে বকতে আমি সুগ্রীবের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁকে প্রণাম করলে তিনি আমাকে—আমি কে, কোথা হতে আসছি ও কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিলাম, আমি গৌতম গোত্রীয় খন্দিল। সংগীত শিখবার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

তিনি আমার পরীক্ষা নিলেন, আমি মূর্খ ও সংগীতের কিছুই জানি না দেখে তিনি আমায় বিতাড়িত করে দিলেন।

আমি তখন কলচার্যের পত্নীকে মাণিক্য জড়িত এক অঙ্গদ উপহার দিলাম। তিনি তা পেয়ে আনন্দিত হলেন ও বললেন, বাছা, ধৈর্য রাখ, তোমার কি প্রয়োজন আমায় বল। খাওয়া দাওয়া থাকা সম্পর্কে তোমায় কোনো চিন্তা করতে হবে না।

আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা বললাম।

তিনি সুগ্রীবকে গিয়ে বললেন, গুরু, ওত বাছ বিচার কোরো না, একে গান শেখাও। তিনি বললেন, ওর ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই ত আমি কি করব? গুরুপত্নী তখন বললেন আমাদের বুদ্ধিমান ছেলের দরকার নেই, ওকে শেখাও। বলে তিনি সেই অঙ্গদ দেখালেন। সুগ্রীবও তখন আমায় গান শেখাতে রাজী হলেন। তম্বুরু ও নারায়ণের পূজা করে আমায় বীণা দেওয়া হল। আমি এত জোরে বাজালাম যে বীণার তার কেটে গেল। সুগ্রীব তখন তাঁর স্ত্রীকে বিদ্রূপ করে বললেন, দেখলে তোমার ছেলের কৃতিত্ব? তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, তোমার বীণার তার পুরুনো হয়ে গিয়েছিল, তাই ছিঁড়ল। ওকে নূতন বীণা এনে দাও। সময়ে ও গান তুলে নেবে।

তখন আমায় মোটা তারের বীণা দেওয়া হল। গুরু আমায় ধীরে ধীরে বাজাতে বললেন। বললেন বীণার সঙ্গে এই গানটী গাও—

বেল তলাতে বসল গিয়ে
আট শ্রমণে মিলে,
মাথায় তাদের পড়ল বেল
কাক তাড়ানো ঢিলে!
বুড়োরা সব করল, আহা! আহা!
ছেলেরা সব উঠল করে হা-হা।

আমি জিগ্যেস করলাম, এই গানটি কি বণিক কন্যা জানে? তারা বললে, না। বললাম, তাহলে আমিই ত ওকে পাব। সে কথা শুনে তারা হাসতে লাগল।

এভাবে এক মাস কেটে গেল। শেষে সঙ্গীত সভার দিন এলো। গুরু অন্য শিষ্যদের নিয়ে সভায় চলে গেলেন। আমায় পরে যেতে বললেন। আমি বললাম, আগেই যদি কেউ তাকে জয় করে নেয় তবে আমার এত কষ্ট করে শেখার লাভ কি হল? আমি এখুনি যাব। কিন্তু তারা আমায় সঙ্গে নিল না।

আমি আর একটি অঙ্গদ এনে গুরুপত্নীকে দিলাম। তিনি খুসী হলেন ও আমায় বললেন, ওরা বাধা দিলেই বা কি? তুমি যাও ও তাকে জয় করে নিয়ে এস। এই বলে তিনি আমায় ক্ষৌম বস্ত্র, উত্তরীয়, মাল্য চন্দন তাম্বুল এনে দিলেন।

আমি তখন সুসজ্জিত হয়ে চারুদত্তের সংগীত সভায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। পরীক্ষকেরা তাঁদের জন্য নির্মিত উচ্চ মঞ্চের ওপর বসেছিলেন। বাকী সব মাটীতে। আমার গুরুর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল। তিনি ইঙ্গিতে তাঁর কাছে যেতে আমায় নিষেধ করলেন।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে চারুদত্ত যেদিকে বসেছিলেন আমি সে দিকে গেলাম। আমি চারদিক একবার নিরীক্ষণ করে বললাম, এ রকম সভা বিদ্যাধর লোকে দেখা যায়, মর্ত্যলোকে নয়। এ কথা শুনে চারুদত্ত খুসী হলেন ও আমায় বসবার জন্য উচ্চ আসন দিলেন। আমি স্থান গ্রহণ করলে লোকেরা আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল।

দেওয়ালের গায়ে আমি দুটো হাতী চিত্রিত দেখলাম। আমি চারুদত্তকে বললাম, চিত্রকার কেন যে এই ক্ষণজীবী হাতী অঙ্কিত করেছে? সে কথা শুনে তিনি বললেন, বিজ্ঞ, চিত্র হতে কি হাতীর আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা যায়?

আমি বললাম, যায়। ছোট ছেলেদের ডাকুন ও জল আনতে বলুন।

সেই দেয়ালের কাছে জল এনে রাখা হল। ছেলেরা সেই জল দিয়ে খেলতে লাগল। ফলে জলে সেই চিত্র ধুয়ে গেল। তা দেখে সভার লোকেরা চীৎকার করে বলে উঠল, আশ্চর্য! আশ্চর্য!

সেই চীৎকার আমার গুরুর কানে গিয়েছিল। তিনি তা শুনে চকিত হলেন।

তারপর যবনিকার অন্তরাল হতে গন্ধর্বদত্তা বেরিয়ে এল। কিন্তু তার সামনে বীণা স্পর্শ করবার কেউই সাহস করল না। তখন বণিক চারুদত্ত বললেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ গান গাইতে প্রস্তুত না হন তবে ও আবার অন্তঃপুরে চলে যাক। পরীক্ষকেরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, ও এখন যেতে পারে।

আমি তখন বললাম, ও কেন চলে যাবে? আমি ওর পরীক্ষা নেব।

জনতা তখন আমার দিকে দেখতে লাগল ও বলাবলি করতে লাগল, ও মাটির মানুষ নয়। হয় কোনো দেবতা নয় বিদ্যাধর। সাহসী, প্রতিভাসম্পন্ন ও সুন্দর।

বণিক তখন বীণা আনতে বললেন। বীণা এলে তা যখন তারা আমার হাতে তুলে দিতে গেল আমি তা নিলাম না। বললাম, এতে দোষ আছে। তাই এ বীণা আমি বাজাতে পারব না। সেই বীণা তখন পরীক্ষা করে দেখা হল। দেখা গেল সেই বীণার একটী তারে একটি সূক্ষ্ম চুল জড়িয়ে আছে। তখন অন্য বীণা আনা হল। আমি বললাম, এ বীণার সুর কর্কশ। কারণ এ বীণার কাঠ সেই বন হতে সংগৃহীত হয়েছে যে বনে দাবাগ্নি লেগেছিল। এর সত্যতা নিরূপণের জন্য যে সেই বীণা তৈরী করেছিল তাকে ডাকা হল। সেও সেই কথা বলল। তখন তৃতীয় বীণা আনা হল। আমি বললাম, এই বীণা যে কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছে সে কাঠ অনেকদিন জলে পড়েছিল। তাই এ থেকে শুদ্ধ স্বর বার হবে না। জিজ্ঞাসাবাদে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হলে জনতা আশ্চর্য চকিত হয়ে গেল।

শেষে গন্ধর্বদত্তার বীণাটিই আমায় এনে দেওয়া হল। সে বীণা চন্দনে চর্চিত ছিল, কুসুম দামে সুশোভিত ছিল ও সপ্ততন্ত্রী বিশিষ্ট ছিল।

আমি সেই বীণাটি হাতে নিয়ে বললাম, হাঁ, এই বীণাটি নির্দোষ ও উত্তম জাতীয়। তবে যে আসনে বসে আছি সেখানে বসে ভালো ভাবে বীণ বাজানো চলে না। তখন আমায় স্বতন্ত্র মহার্ঘ আসন দেওয়া হল। চারুদত্ত বললেন, ভদ্র আপনি যদি বিষ্ণুকুমারের গীত জানেন তবে সেই গীত শোনান।

আমি বললাম জানি। সে গীত আমি বিদ্যাধরদের মুখে শুনেছি।

সেকথা শুনে জনতা একস্বরে বলে উঠল বিষ্ণুকুমার কে ছিলেন ? কী সেই গীত ?

আমি সংক্ষেপে বিষ্ণুকুমারের ইতিবৃত্ত বিবৃত করলাম। কি ভাবে তিনি শ্রমণদের রক্ষার জন্য নমুচির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, কিভাবে তিনি বিরাট দেহ ধারণ করে ত্রিভুবনকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। তখন তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য দেবতারা, বিদ্যাধরেরা তাঁর প্রশস্তিতে যে গীত রচনা করেছিলেন এ সেই গীত। বিদ্যাধরদের গীত এত সুন্দর হয়েছিল যে তম্বুরু ও নারদ প্রসন্ন হয়ে তাঁদের সপ্তস্বরতন্ত্রী সমন্বিত গন্ধর্ব গ্রাম প্রদান করলেন ও বললেন আজ হতে তোমরা সংসারে গন্ধর্ব নামে পরিচিত হবে। সেই গান যা অমর্ত্য লোকের, আমি বসুদেব আপনাদের এখন শোনাছি।

আমি বীণ বাদনের সঙ্গে বিষ্ণুকুমারের গীত আরম্ভ করলাম—গান্ধার রাগের উত্থান ও পতনে নিয়ন্ত্রিত সেই গান। আমার কণ্ঠস্বরে গন্ধর্বদত্তাও তার কণ্ঠস্বর মেলাল। উদাত্ত হতে উদাত্ত আবার মধুর হতে মধুর। সমস্ত সভা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে সেই গান শুনল।

গান যখন শেষ হল তখন সকলে একবাক্যে বলে উঠল। এরকম গান তারা কখনো শোনেনি। বীণ বাদনও হয়েছে অপূর্ব, গানের সঙ্গে সুসমঞ্জস।

চারুদত্তের আনন্দের সীমা নেই। তিনি হর্ষোৎফুল্ল মুখে বিশেষজ্ঞদের কাছে গান ও বীণবাদন সম্বন্ধে অভিমত চাইলেন। তাঁরাও একবাক্যে গান ও বীণ বাদনের প্রশংসা করে বললেন—গান বীণবাদনের অনুরূপ হয়েছে, বীণবাদনও গানের অনুরূপ। আপনার কন্যা ও এই ব্রাহ্মণ যুবক বীণ বাদন ও গানে সমান দক্ষ। এই বলে তাঁরা সংগীত সভা ও প্রতিযোগীতার অবসান ঘোষণা করলেন। চারুদত্তও তাঁদের সম্মানিত করে বিদায় দিলেন।

চারুদত্ত তখন আমার নিকটে এসে বললেন, সংগীত প্রতিযোগীতায় জয়ী হয়ে তুমি আমার কন্যা গন্ধর্বদত্তাকে লাভ করেছ। আমার ইচ্ছে শীঘ্রই তুমি তার পাণি গ্রহণ কর। লোকোক্তি ত আছেই—ব্রাহ্মণ চার পত্নী গ্রহণ করতে পারে- ব্রাহ্মণ কন্যাকে, ক্ষত্রিয় কন্যাকে, বৈশ্য কন্যাকে, শূদ্র কন্যাকে। তাছাড়া আমি মনে করি গন্ধর্বদত্তা তোমার উপযুক্ত, হয়ত কোনো কোনো বিষয়ে সে তোমার চাইতেও বেশী প্রতিভাশালিনী।

আমার চাইতেও বেশী প্রতিভাশালিনীর কি তাৎপর্য ? কিন্তু তখন প্রশ্ন করার অবসর ছিলনা। আমি অন্তঃপুরে নীত হলাম। আমার পরিচর্যার জন্য সেখানে কয়েকজন পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল। তারা আমায় রাজার মত সম্মান দিল। তাদের হাত হতে নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কার গ্রহণ করে আমি পরিধান করলাম। মাঙ্গলিক ক্রিয়া শেষ হলে বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি বিবাহ সভায় উপস্থিত হলাম। সেখানে চারুদত্তের সমস্ত পরিবার একত্রিত হয়েছিল। মেয়েরা আমায় দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, অবশেষে গন্ধর্বদত্তা তার বহু প্রতীক্ষিত স্বামী লাভ করেছে, রূপে ও কামদেব।

গন্ধর্বদত্তাকে তখন আমার কাছে নিয়ে আসা হল। দেখে তাকে আমার বিদ্যাদেবীর মত মনে হল—নবোদিত সূর্যের মতো যার পরিমণ্ডল, সম্ভ্রান্ত ও দ্যুতিময়।

কুলবধূরা গন্ধর্বদত্তাকে আমার পাশে বসিয়ে দিলে চারুদত্ত আমায় বললেন, ভদ্র, কুল ও গোত্র জেনে তোমার কি হবে, আগুনে তুমি শমীপত্র নিক্ষেপ কর বা কন্যাকে নিক্ষেপ করতে দাও।

গন্ধর্বদত্তা যখন চারুদত্তের কন্যা তখন তিনি একথা কেন বললেন ? আমি তাই একটু আশ্চার্য চকিত হলাম কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললাম, আপনি যেরূপ আদেশ করেন। কিন্তু চারুদত্ত আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, ভদ্র, আমি কেন একথা বললাম, তা তোমায় পরে বলব। রত্ন যতক্ষণ না অলংকারে গ্রথিত হয় ততক্ষণ তা মর্যাদা লাভ করেনা।

আগুনে যথারীতি আমি শমীপত্র নিক্ষেপ করলাম। চারুদত্ত গন্ধর্বদত্তার হাত আমার হাতে দিলেন। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলে আমি বাসর গৃহে নীত হলাম। সেই রাত্রি গন্ধর্বদত্তার সঙ্গে আমার আনন্দে ব্যতীত হল।

এর কিছু দিন পর সুগ্রীব ও যশগ্রীব চারুদত্তের নিকটে এলেন ও বললেন, গন্ধর্বদত্তার সহচরী শ্যামা ও বিজয়াকে গন্ধর্বদত্তার অনুমতি নিয়ে আমার সেবা করতে দেওয়া হোক।

চারুদত্ত সেকথা আমাকে জানালে আমি গন্ধর্বদত্তাকে জানাতে বললাম। তার অভিমতই আমার অভিমত। গন্ধর্বদত্তা সানন্দে সেকথা স্বীকার করে নিল। এভাবে আমি শ্যামা ও বিজয়াকেও পত্নীরূপে লাভ করলাম। কিন্তু গন্ধর্বদত্তাকেই আমি বেশী ভালবাসতাম।

এভাবে অনেকদিন ব্যতীত হয়ে গেল। সেদিন আমি মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে বাইরের কক্ষে যখন বিশ্রাম করছিলাম তখন চারুদত্ত এলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম গন্ধর্বদত্তা তোমার উপযুক্ত হয়ত কোনো কোনো বিষয়ে তোমার চাইতেও বেশী প্রতিভাশালিনী। যদি সময় থাকে তবে তার কারণ তোমায় বলি।

আমি বললাম, আমার যথেষ্ট সময় রয়েছে এবং শুনতেও আমি আগ্রহী।

তবে শোন বলে চারুদত্ত বলতে আরম্ভ করলেন।

[ক্রমশঃ]

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VII No. 5 Sraman September 1979
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

[ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক জৈন কথা সংগ্রহ]

"বইটী পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল মনটাকে আবার সংসারের নিত্য কাজে ফিরিয়ে আনতে।"

—শ্রীজয়দেব রায়

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

"জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে আলোকবর্ষী আখ্যানমূলক তথ্য বিদ্যমান, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক বাংলা কবিতা…অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবানুগ দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।"

—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮০

কার্ত্তিক ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ। । সপ্তম সংখ্যা।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮৬ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

ধর্মান্তরিত দেব-বিগ্রহ

ধর্মান্তরিত দেব-বিগ্রহ

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব-বিগ্রহের আবার ধর্মান্তর হয় নাকি? সে তো হয় মানুষের। ইতিহাসের পূর্বে পূর্বে যেমন হয়েছে এই বহু ধর্মের দেশে। প্রাচীন পাশুপত বা বৈদিক আর্যধর্ম থেকে একদা দলে দলে মুমুক্ষু জৈন বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করেছেন, আবার সেখান থেকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের ছায়াতলে। উত্তর কালে, ভিনধর্মীদের ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে উত্তরণও ঘটেছে ব্যাপক হারে, অধুনা এ বিষয়ে রাজশক্তি আর আগের মত সক্রিয় নয় বলে, ভারতীয় সমাজে ধর্মান্তর গ্রহণ এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন এবং সেজন্যই তুলনায় অনেক কম। কিন্তু দেবমূর্তির ধর্ম পরিবর্তিত হয় কার ইচ্ছায় এবং কী উপায়ে? সঙ্গত প্রশ্ন সন্দেহ নেই।

ভারত-ইতিহাসে নানা ধর্মমতের উত্থান পতন তো সকলেরই জানা। প্রবলতর ধর্মবিশ্বাস যে প্রতিপক্ষীয় ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করবে বা তাকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করবে এমনই স্বাভাবিক। সে প্রয়াস অপর ধর্মের দেবমূর্তি আত্মসাতের চেষ্টায় পর্যবসিত হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। যেমন ঘটেছে আমার জানা কয়েকটী দৃষ্টান্তের একটীতে—বর্তমান প্রবন্ধের যা বিষয়বস্তু। সেখানে এক তীর্থংকর মূর্তি হীনবল জৈন ধর্মের প্রবলতর প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্মের প্রভাবে পরিণত হয়েছে এক বাসুদেব বিষ্ণু বিগ্রহে, অধুনা যার অন্তিম রূপান্তর ঘটেছে লৌকিক দেবী মনসায়। একেও যদি ধর্মান্তরিত দেবমূর্তি না বলেন তবে আর কাকে বলবেন?

সরকারী বুড়ী-ছোঁয়া ব্যবস্থাপনায় আজকাল কাতারে কাতারে পুরাকীর্তি প্রেমিক বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সহরে যান শুনি। আঞ্চলিক ধর্মীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পরমাশ্চর্য মূর্তিটি তাঁদের যে কেউ দু'তিন ঘণ্টার অবকাশে স্বচক্ষে দেখে

আসতে পারেন। সেটি ধরাপাট গ্রামে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছতে হলে বিষ্ণুপুর সোনামুখী পিচের সড়কে (সংবৎসর বাস চলে, সাইকেল রিক্সাতেও যাওয়া যায়) বিষ্ণুপুর থেকে চার মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীর ছাড়িয়ে কাছেই এক বাঁ-হাতি পায়ে চলা পথে আরও মাইলটাক যেতে হয়। 'মনসার মন্দির' বলে খোঁজ করলে ইঁটের এক কুঠরি ছোট দালান মন্দিরটীতে উপস্থিত হতে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়।

এ মন্দির হালের কিন্তু মূর্তিটি খৃষ্টীয় বারো শতকের পরবর্তীকালের না হওয়াই সম্ভব। কেন না আনুমানিক সেই সময়ে রাঢ় অঞ্চলের একদা প্রবল জৈন ধর্ম অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে এলাকা থেকে প্রায় উৎখাৎ হয়ে যায়। ফেলে রেখে যায় পূর্বতন জৈনধর্ম কেন্দ্রগুলিতে বহু মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ও নানান তীর্থংকর মূর্তি। ধরাপাট কেন্দ্রের সাবেক জৈন মন্দিরটী এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। কিন্তু তিনটী দিগম্বর জৈন মূর্তি প্রায় অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছে উত্তরকালের জন্য। সেগুলির মধ্যে দুটী গ্রথিত আছে স্থানীয় শ্যামচাঁদ ঠাকুরের বিশাল দেউলের দেওয়ালে আর বাকিটি স্থান পেয়েছে উল্লিখিত মনসা মন্দিরে।

এই শ্যামচাঁদ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবতঃ মল্লরাজ বীর হাম্বীর, নির্মাণকাল আনুমানিক খৃঃ ষোলো শতকের প্রারম্ভ। এই প্রাচীন ধর্মকেন্দ্রে সেটি চৈতন্য প্রচারিত বিষ্ণু (অথবা রাধাকৃষ্ণ) উপাসনা প্রবর্তনের স্মারকচিহ্নরূপ। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে জৈনধর্ম অন্তর্হিত হবার কাল থেকে নব বৈষ্ণবধর্মের সূত্রপাত অবধি অর্থাৎ খৃষ্টীয় বারো থেকে পনরো শতকের শেষ পর্যন্ত কোন ধর্ম এখানে আচরিত হয়েছে? তা যে বাসুদেব বিষ্ণুর আরাধনা তার এক পাথুরে প্রমাণ ওই শ্যামচাঁদ মন্দিরের দেওয়ালেই বিদ্যমান। সেটি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পাথরের এক বাসুদেব বিষ্ণু মূর্তি যা পূর্বতন তীর্থংকর মূর্তিগুলির মতোই রক্ষিত হয়েছে।

পাঠকের মনোযোগ এবার সঙ্গের ছবিটির দিকে আকৃষ্ট করছি। সেটি যে মূলতঃ সপ্তনাগছত্র লাঞ্ছন যুক্ত জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত সব শ্রেণীর অধিকাংশ মূর্তির মতো এটিও দিগম্বর মূর্তি। কিন্তু পেছনের প্রস্তরপট খোদাই করে আজানুলম্বিত সাবেক দুটী হাতের অতিরিক্ত আর দুটি হাত পরবর্তীকালে উৎকীর্ণ হয়েছে যার একটিতে গদা অন্যটীতে সুদর্শন চক্র। মূল হাত দুটিতে শঙ্খ এবং পদ্ম ক্ষোদিত করা যায় নি বলে বাসুদেব বিষ্ণুর এই প্রতীক চিহ্ন দুটী পৃথকভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে পশ্চাৎপটে। বাটালি চালিয়ে দিগম্বর মূর্তিটির উপস্থ প্রদেশ অনেকটা সমতল করে নেওয়া হয়েছে। বুকের উপর বাসুদেব বিষ্ণুর আর এক প্রতীক চিহ্ন বনমালাটিও লক্ষণীয়। এ সবই যে মধ্যবর্তীকালীন বাসুদেব আরাধনার যুগে অত্যুৎসাহী ভক্তদের দ্বারা কৃত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এভাবে একবার 'ধর্মান্তরিত' হয়ে (এবং সম্ভবতঃ কিছুকাল বাসুদেব-বিষ্ণুরূপে উপাসিত হয়ে মূর্তিটির নিগ্রহ কিন্তু শেষ হয়নি। বড় রকমের ভাঙচুর করতে গেলে মূল বিগ্রহের সমূহ ক্ষতির আশংকায় ধর্মান্তরকারীরা বৃহদায়তন নাগছত্রটিতে হাত দেন নি। সেই সূত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'ধর্মান্তরে'র সূচনা হয়েছে।

রাঢ়বঙ্গে বিশেষতঃ বাঁকুড়া অঞ্চলে মনসা অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবী। ভক্তেরা প্রায় সকলেই সরল পল্লীবাসী। বাসুদেব উপাসকেরা অন্তর্হিত হলে মূর্তিটি তাঁদের কারও অধিকারে আসে। অমনি পুরাতত্ত্বের এত কচকচির মধ্যে না গিয়ে শুধুমাত্র নাগছত্রের উপস্থিতিতে তাঁরা সেটিকে মনসা বলে সাব্যস্ত করেন। সেই জ্ঞানেই তাঁর পূজা চলছে বেশ কিছুকাল। তবে পার্শ্বনাথ মূর্তিটির এই দ্বিতীয় বার 'ধর্মান্তর' হয়ত ততটা মারাত্মক হয়নি যেহেতু মনসা আদিতে লৌকিক দেবী হলেও এখন ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেবলোকে প্রায় সমাসীন।

যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৯

জৈন দর্শনে কর্মবাদ

হরিসত্য ভট্টাচার্য

কর্মের সহিত একটা নির্দিষ্ট ফলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ইহারই নাম কর্মবাদ। এই কর্মবাদ পৃথিবীর সর্বকালের ও সর্বস্থানের দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহসমূহ হইতে ভারতবর্ষীয় দর্শনকে একটা বিশিষ্টত্ব প্রদান করিয়াছে। পরস্পর বিভিন্ন হইলেও ভারতের প্রত্যেক দর্শনই কর্মের অমোঘত্ব স্বীকার করে। পূর্ব মীমাংসা পরব্রহ্মের বিচার না করায় উত্তর মীমাংসা হইতে বিভিন্ন। আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্য ও যোগ দর্শন বেদান্তের বিরোধী। আত্মায় গুণাদি আরোপ করিয়া ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য ও যোগমতের প্রতিযোগী। আত্মার গুণসমূহ আত্মার স্বভাবজাত এবং বিভিন্ন গুণ পর্যায়ের মধ্য দিয়া আত্মাই প্রকাশিত হয়—এইরূপ মত প্রচার করিয়া জৈন দর্শন ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দোষাবিষ্কার করে। বৌদ্ধ দর্শন নিত্যসত্য পদার্থ আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। কিন্তু এরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও কর্মবাদ সম্বন্ধে—অর্থাৎ "মনুষ্য যাহা বপন করে তাহারই অনুযায়ী শস্য সে লাভ করে" এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে ঐকমত্য আছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 'করুণাবাদ' (Doctrine of Grace) এবং 'অপরানুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তবাদ' (Doctrine of Vicarious Atonement) প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল, একথা বোধহয় বলা যাইতে পারে। সম্যক জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রের ফলে প্রাক্তন কর্মের ফল প্রতিহত হয় এবং নূতন কর্মও তৎসম্পর্কীয় দুঃখময় জন্ম মরণাদির অভ্যুদয় নিবারিত হয়,—ইহাই ভারতীয় মত। প্রাক্তন কর্মের যে একটা অলঙ্ঘ্য শক্তি আছে, তাহা কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। কর্মের ফল এমনই দুরতিক্রমণীয় যে মুক্ত বা কেবলী পুরুষকেও প্রাক্তন কর্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত দেহ-কারাগারের মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য আবদ্ধ থাকিতে হয়,—এমন কথা শাস্ত্র গ্রন্থাদির মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতের বেদপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত কবি শিহ্লন মিশ্র গাহিয়াছেন—

> আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্ত-
> মম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টং।
>
> ছায়েব ন ত্যজতি কর্মফলানুবন্ধি ॥
>
> —শান্তিশতকম্, ৮২

আকাশে চলিয়া যাও, দিগন্তে প্রস্থান কর, সমুদ্রে প্রবেশ কর অথবা যেখানে ইচ্ছা অবস্থান কর; জন্মান্তরে যে সকল শুভাশুভ কর্ম করিয়াছ, সে সকলের ফল ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গেই চলিবে, পরিত্যাগ করিবে না।

মহাত্মা বুদ্ধও ঘোষণা করিয়াছেন—

> ন অন্তলিখ্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
> ন পব্বতানং বিবরং পবিসৃস।
> ন বিজ্জতী সো জগতি পদেসো
> যত্থট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা ॥
>
> —ধম্মপদ ৯।১২

অন্তরিক্ষে, সমুদ্র মধ্যে অথবা পর্বত বিবরে—জগতের মধ্যে এমন কোনও প্রদেশ নাই, যেখানে থাকিলে পাপ কর্মের ফলভোগ করিতে হয় না।

জৈনাচার্য অমিতগতিও বলিয়াছেন—

> স্বয়ং কৃতং কর্মযদাত্মনা পুর
> ফলং তদীয়ং লভতে শুভাশুভং।
> পরেণ দত্তং যদি লভ্যতে স্ফুটং
> স্বয়ং কৃতং কর্ম নিরর্থকং তদা ॥
>
> সামায়িক পাঠ, ৩০

পূর্বে স্বয়ং যে সমস্ত কর্ম করিয়াছ, জীব সেই সমস্ত কর্মেরই শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে; যদি পরকৃত কর্মের ফলভোগ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে স্বকৃত কর্ম নিষ্ফল হয়, বলিতে হইবে।

বর্তমান প্রবন্ধে এই অলঙ্ঘ্য শক্তি কর্ম ও কর্মের সহিত কর্মফলের সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। অর্থাৎ কর্ম কি এবং ফলের সহিত ইহার কিরূপে সম্বন্ধ হয়—ইহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পূর্বমীমাংসা দর্শনে কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে বটে কিন্তু বেদবিহিত কর্মের ফলে স্বর্গাদি লব্ধ হয়, ইহাই মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়; কর্মের স্বভাব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শনে মুখ্যতঃ কোনও বিচার নাই। তজ্জন্য মীমাংসা দর্শনের জটিল বিচারাদির মধ্যে এ স্থলে প্রবেশ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে বেদান্ত দর্শনের সমস্ত প্রয়াস অর্পিত হইয়াছে, কর্মের স্বভাব নির্দ্ধারণ করিবার অবসর বেদান্তের নাই। সাংখ্য ও যোগ-দর্শন সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। বৈশেষিক দর্শনও কর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে না। কর্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং প্রাক্তন কর্মই জীবের বর্তমান

অবস্থার কারণ—ইহা ঐ সমস্ত দর্শনেই স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু সম্যকরূপে বিচারিত হয় নাই।

কর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের কতকটা প্রচেষ্টা ন্যায় দর্শনে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কর্মতত্ত্ব বৌদ্ধদর্শনের মূলভিত্তি বলিলেও চলে। জৈন দর্শনে কর্মের প্রকৃতি ও বিভাগাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে ন্যায়, বৌদ্ধ ও জৈন এই মতত্রয় বর্ণিত হইবে মাত্র।

কর্মফল কিরূপে কর্মের সহিত সংযুক্ত হয়—এ প্রশ্ন ন্যায়দর্শনকারের নিকট উঠিয়া-ছিল। কর্ম পুরুষকৃত, ইহা তিনি জানিতেন। কর্মের ফল আছে, ইহা গোতম অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু অনেক সময়ে পুরুষকৃত কর্ম নিষ্ফলরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাও তাঁহার অগোচর ছিল না। এ জন্য পুরুষকৃত কর্ম স্বয়ং ফলোৎপাদনে সমর্থ কিনা, এ বিষয়ে গোতমের মনে একটা যুক্তি মূলক সন্দেহ হয় এবং কর্মের সহিত কর্ম ফলের ভূয়োদৃষ্ট অসম্বন্ধের সমাধান করিবার নিমিত্ত তিনি কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে কর্মাতিরিক্ত আর একটা কারণ আনিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ ॥
ন পুরুষকর্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ ॥
তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ॥

—ন্যায়সূত্রম্, ৪।১।১৯-২১

কর্মফল উৎপাদন বিষয়ে ঈশ্বরই কারণ; পুরুষকৃত কর্ম অনেক সময়ে নিষ্ফল দেখা যায়। পুরুষকৃত কর্মের অভাবে কর্মফলের উৎপত্তি হইতে পারে না, অতএব কর্মই ফলের কারণ, এরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। ফলের উদয় ঈশ্বরসাপেক্ষ, এইজন্য কর্মকে ফলের (একমাত্র) কারণ বলা যায় না।

গোতম সম্মত কর্মবাদ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—কর্মফল পুরুষকৃত কর্মের অধীন, ইহা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কর্মই কর্মফলের এক এবং অদ্বিতীয় কারণ, ইহা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যদি কর্মফল একমাত্র কর্মেরই অধীন হইত তাহা হইলে প্রত্যেক কর্মই ফলবৎ দেখা যাইত। কর্মফল কর্মের অধীন বটে কিন্তু কর্মফলের অভ্যুদয় কর্মের অধীন নহে। পুরুষকৃতকর্ম অনেক সময়ে অফল দেখা যায়; এতদ্বারা কর্ম ফলোৎপাদন বিষয়ে কর্মাতিরিক্ত একজন কর্মফল নিয়ন্তা ঈশ্বর আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এইস্থলে নৈয়ায়িকগণ বৃক্ষ ও বীজের দৃষ্টান্ত উদ্ভাবন করেন। বৃক্ষ বীজের অধীন এ কথা স্বীকার্য; কর্মফলও ঠিক সেইরূপ কর্মের অধীন। কিন্তু বৃক্ষের উৎপত্তি একমাত্র বীজ সাপেক্ষ না হইয়া জল, বায়ু, আলোকাদির যেরূপ অপেক্ষা করে ঠিক সেইরূপেই কর্মফলে ঈশ্বরের অপেক্ষা থাকে।

ন্যায় দর্শনের মূল অভিপ্রায় এই যে—ঈশ্বর কর্মাতিরিক্ত হইয়াও কর্মের সহিত ফলের যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু বাহির হইতে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন এ কথা অনেক দার্শনিক স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রাচীন ন্যায়ের উপরোক্ত কর্ম-কর্মফলবাদই যুক্তি; কিন্তু অনেক নব্য নৈয়ায়িক এ যুক্তিতে সমধিক আস্থাবান নহেন। কর্মের সহিত ফলকে সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া ফলকে সম্পূর্ণরূপে কর্মাধীন গণনা করা অর্থাৎ কর্মই ফলোৎপাদন করিয়া থাকে—এইরূপ বিবেচনা করাও অসঙ্গত নহে। অন্ততঃ ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভিমত।

কর্মনিমিত্ত এই সংসারপ্রবাহ চলিতেছে,—অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধ দর্শনও একথা স্বীকার করে। কিন্তু বৌদ্ধসম্মত কর্ম গৌতমের কর্ম হইতে কিছু বিভিন্ন। কর্ম বলিতে বৌদ্ধগণ যাহা বুঝেন, তাহা বলিতে হইলে সংসারের স্বরূপ আগে বলিতে হয়। বৌদ্ধমতে সংসার একটা অনাদি, অনন্ত, নিঃস্বভাব ধারাপ্রবাহ। বুদ্ধদেব একস্থলে বলিয়াছেন ঃ

"সংস্কার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়; সংস্কারের ফলে বিজ্ঞান; বিজ্ঞান হইতে নাম ও ভৌতিক দেহ; নাম ও ভূতাত্মক দেহ হইতে ষট্‌ক্ষেত্র; ষট্‌ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ ও বিষয় সকল উৎপন্ন হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়। বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উৎপাদন, উৎপাদন হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে বার্দ্ধক্য, মরণ, দুঃখ, অনুশোচনা, যাতনা, উদ্বেগ ও নৈরাশ্য উদ্ভূত হয়। দুঃখ যন্ত্রণার রাজ্য এইরূপে চলিতে থাকে।"

বৌদ্ধমতে সংসার ইত্যাকার একটা প্রবাহ। অজ্ঞান হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাম ও ভৌতিক দেহ, তাহা হইতে ষট্‌ক্ষেত্র, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে মরণাদি। পারিভাষিক শব্দাদি পরিহার করিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—বৌদ্ধমতে সংসার একটা নিরন্তর অনবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-প্রবাহ।

সংসার কর্মমূলক—বৌদ্ধগণের ইত্যাকার উক্তি হইতে তাঁহারা কর্ম বলিতে কি বুঝেন তাহা সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়। কর্ম তাঁহাদের মতে পুরুষকৃত কর্মমাত্র নহে। বৌদ্ধ মতে কর্ম একটা 'নিয়ম', একটা জগদ্ব্যাপী Law। ইহার অপর নাম 'কার্যকারণভাব'। এই নিয়মের নিকট জগতের সমস্ত ভাব, পদার্থ ও ব্যাপার অবনত; সংসার ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইহারই চালনে চালিত।

ফলোৎপাদন বিষয়ে বৌদ্ধগণের অভিমত—কর্ম স্বাধীন, ঈশ্বরাদি কোনও তত্ত্বের মুখাপেক্ষী নহে। কর্ম স্বয়ং তাহার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি

চৌরকর্ম করিল, তাহার ফলে সে চোর হইল। ন্যায়মতে ঈশ্বর চৌরকর্মের সহিত চোর ভাবরূপ ফলের সংযোজন করিয়া দেন। বৌদ্ধ মতে চৌরকর্মই চৌরভাবের উৎপাদক। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন চৌরকর্ম একটী 'বিজ্ঞান'। উৎপত্তির পরক্ষণে এই বিজ্ঞান অনবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-প্রবাহের মধ্যে মিশিয়া যাইল, রহিল যাহা, তাহা চোর কর্মের 'সংস্কার'। এই সংস্কারই আবার পরক্ষণের বিজ্ঞানের জনক। চৌরভাবই পরক্ষণের বিজ্ঞান। অতএব পূর্বক্ষণের বিজ্ঞান চৌরকর্ম পরক্ষণের বিজ্ঞান চৌরভাবের উৎপাদক, ইহা সিদ্ধ হইল।

বৌদ্ধ দর্শনের সার সিদ্ধান্ত—কর্ম পুরুষকৃত কর্মমাত্র নহে ; ইহার উপর সংসার প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, ফল সম্বন্ধে কর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীন,—ঈশ্বরাদি কোনও তত্ত্বেরই মুখাপেক্ষী নহে।

কর্মের প্রকৃতি ও ব্যাপার সম্বন্ধে বৌদ্ধ দর্শনের সহিত জৈনমতের আপাততঃ প্রভেদ নাই। জৈন মতেও কর্ম পুরুষকৃত চেষ্টামাত্র নহে ; কর্ম একটা জাগতিক ব্যাপার, ইহার উপর সংসার প্রবাহ নির্ভর করিতেছে। ফল সম্বন্ধেও জৈনগণ বলেন—কর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীন, ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয়ে জৈন দার্শনিকগণের অভিমত এই যে, পুরুষকৃত কর্মের অফলতা দেখিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করা কর্তব্য নহে। কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। ফল বিলম্বে হইতে পারে, কিন্তু কর্মের ফল হইবে না, ইহা হইতে পারে না। অনেক সময়ে পাপী ব্যক্তিকে সুখী হইতে দেখা যায় এবং সাধু ব্যক্তিকে অসুখী দেখা যায়, কিন্তু ইহা হইতে কর্মের অফলতা সপ্রমাণ হয়না। জনৈক জৈনাচার্য বলিয়াছেন—

যা হিংসাবতোঽপি সমৃদ্ধিঃ অর্হৎ পূজাবতোঽপি দারিদ্র্যাপ্তিঃ সা ক্রমেণ প্রাগুপাত্তস্য পাপানুবন্ধিনঃ পুণ্যস্য, পুণ্যানুবন্ধিনঃ পাপস্য চ ফলম্। তৎ ক্রিয়োপাত্তং তু কর্ম জন্মান্তরে ফলিষ্যতীতি নাত্র নিয়তকার্যকারণভাব ব্যাভিচারঃ।

হিংসাবান পুরুষের যে সমৃদ্ধি ও অর্হৎ পূজাপরায়ণ ব্যক্তির যে দারিদ্র্য দেখা যায় তাহা ক্রমান্বয়ে প্রাক্তন পাপানুবন্ধী পুণ্য কর্মের ও পুণ্যানুবন্ধী পাপ কর্মের ফল। তবে হিংসা কর্ম ও অর্হৎপূজা কর্ম অফল হইবে না, জন্মান্তরে ঐ কর্মের ফল অনুভূত হইবে। অতএব কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে কার্যকারণভাবের ব্যভিচার হইতে পারে না।

অতএব যখন জৈন মতে কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী এবং কর্মই ফলের উৎপাদক তখন জৈন দর্শনে কর্ম ফল নিয়ন্তা কোনও ঈশ্বরের স্থান নাই—ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কর্মের স্বরূপ ও ব্যাপার সম্বন্ধে বৌদ্ধ দর্শনের সহিত জৈন মতের যে সাদৃশ্য উপরে বর্ণিত হইল, তাহা বাক্যগত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উভয় মতের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। বৌদ্ধমতে কর্ম নিঃস্বভাব নিয়ম। জৈন মতে কর্ম সংসারী জীবের বন্ধের কারণ। ইহা জীব পদার্থ হইতে বিভিন্ন এক প্রকার দ্রব্য ; এই কর্ম দ্রব্যের

আস্রবে স্বভাবতঃ অনাদিকালীন অশুদ্ধতাবশতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে। জৈনমতে কর্ম পুরুষকৃত চেষ্টামাত্র নহে, ইহা বৌদ্ধসম্মত একটা নিঃস্বভাব নিয়ম মাত্রও নহে। কর্ম একটা প্রকৃত জড় পদার্থ, আত্মারই ন্যায় স্বাধীন একটা জীববিরোধী দ্রব্য। ইংরাজীতে Matter বলিতে যাহা বুঝায়, জৈন দর্শনের কর্ম অনেকটা সেইরূপ একটা দ্রব্য। ইহা জীব হইতে বিভিন্ন-স্বভাব, জীবের সহিত মিলিত হইলে, ইহা তাহার বন্ধের অর্থাৎ সংসারী অবস্থার কারণ হয়, ইহার বিয়োগে সংসারী জীব মুক্ত হয়। কুন্দকুন্দাচার্য বলিয়াছেন—

জীবা পুগ্‌গলকায়া অণ্ণোণ্ণাগাঢ়গহণপড়িবদ্ধা
কালে বিজুজ্জমাণা সুহদুক্‌খং দিংতি ভুংজংতি ॥
—পঞ্চাস্তিকায় সময় সার, ৭৩

জীব ও কর্ম পুদ্‌গল সমূহ পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট হয়। যথাকালে তাহারা বিযুক্ত হইয়া থাকে। যৎকালে জীব ও কর্ম পুদ্‌গল সংশ্লিষ্ট থাকে তখন কর্ম সুখ দুঃখ প্রদান করে এবং জীব তাহা ভোগ করে।

কর্ম সম্বন্ধে জৈন দর্শনে সুবিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। কর্মপুদ্‌গল স্বভাব, —Material। কর্মরূপ অজীব দ্রব্যের সহিত চৈতন্য স্বরূপ জীব পদার্থের কিরূপে সংমিলন সংঘটিত হয়, তাহাও জৈন দার্শনিকগণ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ব অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'কর্ম বর্গণা' নামক কর্ম দ্রব্যে এবং চেতন স্বভাব জীব-পদার্থে পরিপূর্ণ। জীব ও কর্ম দ্রব্য পরস্পর সন্নিহিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ স্বভাব হইলেও জীব রাগ বা দ্বেষ ভাবে অভিভূত হয়, তাহা হইলে তৎসন্নিহিত কর্ম বর্গণার মধ্যেও এমন একটা অনুরাগ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, যাহার ফলে ঐ সমস্ত কর্ম বর্গণা রাগদ্বেষাভিভূত জীব পদার্থে আস্রাবিত হইতে সক্ষম হয় এবং এই আস্রবের ফলে জীব বদ্ধ হয়। জৈনগণ শুদ্ধ জীবকে শুদ্ধ সলিল ও কর্মকে মৃত্তিকার সহিত তুলনা করিয়া বলেন,—সংসারী বা বদ্ধ জীব পঙ্কিল সলিলের তুল্য। যেমন পঙ্কিল জল হইতে মৃত্তিকাংশ অপনীত হইলে, সলিল বিশুদ্ধ অবস্থায় দৃষ্ট হয় সেই রূপ সংসারী জীব ইহতে কর্ম-মলীমস বিদূরিত হইলেই, জীব স্বাভাবিক শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত হয়।

জৈনগণ কর্ম পুদ্‌গলকে অষ্টধা বিভক্ত করেন। প্রথম—জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, ইহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। দ্বিতীয়—দর্শনাবরণীয় কর্ম, ইহা জীবগুণ দর্শনকে আচ্ছন্ন করে। তৃতীয়—মোহনীয় কর্ম, ইহা আত্মার সম্যক্ত্ব ও চারিত্র গুণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। চতুর্থ—অন্তরায় কর্ম, ইহা জীবের স্বাধীন শক্তির অন্তরায়। পঞ্চম —বেদনীয় কর্ম, ইহার ফলে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়। ষষ্ঠ—নাম কর্ম, ইহা

জীবের দেব মনুষ্য তির্যক প্রভৃতি গতি জাতি শরীরাদি উৎপন্ন করে। সপ্তম—গোত্র কর্ম, ইহার ফলে জীবের উচ্চ নীচাদি গোত্রে জন্ম লাভ হয়। অষ্টম—আয়ুঃ কর্ম, ইহা জীবের আয়ুঃ নির্দেশ করে। জ্ঞানাবরণীয় কর্ম আবার পঞ্চ প্রকার, দর্শনাবরণীয় কর্ম নব প্রকার, মোহনীয় অষ্টাবিংশতি প্রকার. অন্তরায় কর্ম পঞ্চবিধ, বেদনীয় কর্ম দুই প্রকার, নাম কর্ম ত্রিনবতি প্রকার, গোত্র কর্ম দ্বিবিধ এবং আয়ু কর্ম চতুর্বিধ। এইরূপে অষ্ট প্রকার কর্মপুদ্গল একশত আট চল্লিশ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। জৈন মতে জীবের প্রত্যেক ভাব বা প্রকৃতি কর্মপুদ্গল জনিত, এমন কি জীব শরীরের অস্থি পর্যন্ত অস্থি কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জৈন শাস্ত্রে উপরোক্ত ১৪৮ প্রকার কর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাহা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

জ্ঞানাবরণীয়াদি অষ্টবিধ কর্মকে জৈন দার্শনিকগণ 'ঘাতি' ও 'অঘাতি' দুইভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় কর্ম ঘাতি কর্মের এবং বেদনীয়, নাম, আয়ুঃ ও গোত্র অঘাতি কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

কর্মাস্রবের ফলে জীবের বন্ধ হয়; সুতরাং বন্ধ কর্মের অনুযায়ী। বন্ধের 'প্রকৃতি' উপরোক্ত অষ্টবিধ কর্মপ্রকৃতির অনুরূপ। বন্ধের 'স্থিতি' কর্মের স্থিতির উপর নির্ভর করে। কোন কর্মের স্থিতিকাল কত তাহাও জৈনগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বন্ধের 'অনুভব' বা 'অনুভাগ' কর্মের তীব্রমন্দাদি ফল দানের শক্তির অনুযায়ী। জীবে কত পরিমাণ কর্ম বর্গনা আস্রুত হইল তাহার দ্বারা 'প্রবেশ' বন্ধ নিরূপিত হয়। বাহুল্য ভয়ে এ সমস্তের বিচারও এস্থলে পরিহৃত হইল।

জৈন মতে কর্ম জীব বিরোধী পুদ্গল স্বভাব অজীব দ্রব্য। ইহার সহিত জীবের কিরূপে সংমিলন হয় তাহা উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম বিকারের কারণ নহে, কর্মও জীব বিকারের কারণ নহে। কুন্দকুন্দাচার্য বলিয়াছেন—

কুব্বং সগং সহাবং অত্তা কত্তা সগস্স ভাবস্স।
ণহি পোগ্গলকম্মাণং ইদি জিণবয়ণং মুণেয়ব্বং ॥

আত্মা আপন স্বভাব সম্বন্ধেই কার্য করিয়া আপন ভাবের কর্তা হয়। আত্মা নিশ্চয়তঃ পুদ্গল কর্ম সমূহ সম্বন্ধে কর্তা নহে।

কম্মং পি সগং কুব্বদি সেণ সহাবেণ সম্মমপ্পাণং।
কর্মও আপন স্বভাবের দ্বারা আপন ভাবের কর্তা।

এই বিষয়ে নেমিচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জীব-কর্ম সম্বন্ধ আরও পরিস্ফুট হয়:

পুগ্‌গলকম্মাদীণং কত্তা ববহারদো দু নিচ্চয়দো।
চেদককম্মাণাদা সুদ্ধণয়া সুদ্ধভাবাণং ॥

—দ্রব্য সংগ্রহ, ৮

ব্যবহার দৃষ্টিতে আত্মা পুদ্‌গল-কর্ম সমূহের কর্তা। অশুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় অনুসারে আত্মা রাগ দ্বেষাদি চেতন কর্ম সমূহের কর্তা। শুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় অনুসারে ইহা স্বকীয় শুদ্ধ ভাব সমূহের কর্তা।

অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ প্রভৃতি আত্মার স্বাভাবিক গুণ। শুদ্ধ-নয় অনুসারে আত্মার সহিত কর্মপুদ্‌গলের কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে অশুদ্ধ অবস্থায় আত্মায় রাগদ্বেষাদির আবির্ভাব হয়।

ভাবণিমিত্তো বন্ধো ভাবো রদিরাগদ্বেষমোহজুদো।

—পঞ্চাস্তিকায় সময় সার, ১৫৫

বন্ধ ভাব নিমিত্ত এবং রতিরাগদ্বেষমোহ যুক্ত ভাবই বন্ধের কারণ।

রাগ-দ্বেষাদি 'ভাব প্রত্যয়' হইতে 'মিথ্যা দর্শন', 'অবিরতি', 'প্রমাদ', 'কষায়' ও 'যোগ' উদ্ভূত হয়। অশুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় অনুসারে আত্মা 'ভাব-প্রত্যয়' ও মিথ্যাদর্শনাদি পঞ্চবিধ 'ভাব-কর্মে'র কর্তা। সুতরাং অশুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় অনুসারেও জীব কর্ম পুদ্‌গলের কর্তা নহে।

শুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় ও অশুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় অনুসারে আত্মা কর্মপুদ্‌গলের কর্তা না হইলেও ব্যবহার-নয় অনুসারে জীব দ্রব্যবন্ধ বা দ্রব্যকর্মের কর্তা। মিথ্যাত্বাদি 'ভাব-কর্মে'র উদয়ে আত্মার এরূপ অবস্থা হয় যদ্বারা তন্মধ্যে 'দ্রব্য কর্ম' বা কর্মপুদ্‌গলের আস্রব সঙ্ঘটিত হইয়া যায় এবং এই নিমিত্ত জীবের বন্ধ হয় এবং বন্ধের ফলে আত্মা পুদ্‌গল-কর্মের ফল স্বরূপ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে থাকে।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে শুদ্ধ-নিশ্চয়-নয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও অশুদ্ধ-নিশ্চয়-নয় অনুসারে আত্মা পুদ্‌গল কর্ম সমূহের কর্তা নহে। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ; সুতরাং ইহা কর্মের 'উপাদান কারণ' হইতে পারে না। 'ভাবকর্মে'র ফলে জীবে কর্ম বর্গণার আস্রব হইয়া থাকে, অতএব আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্মাস্রবের 'নিমিত্ত কারণ'ও বলা যায় না। আত্মা মাত্র আপন ভাব সমূহের কর্তা। ইহাই নিশ্চয়-নয়ের সিদ্ধান্ত তবে 'ভাব প্রত্যয়' ও 'ভাব কর্মে'র উদয়ে আত্মার এতাদৃশ অবস্থা হয় যদ্বারা কর্ম পুদ্‌গল আপনা-আপনি অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবাধে জীবের মধ্যে প্রবেশ করে। কর্ম বর্গণার জীবে প্রবেশ করিবার অনুযায়ী এই যে অবস্থা প্রাপ্তি, সে বিষয়ে আত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'উপাদান কারণ' বা 'নিমিত্ত কারণ' না হইলেও পরোক্ষ ভাবে তাহার কর্তৃত্ব আছে। সেই জন্য ব্যবহার-দৃষ্টিতে জীব পুদ্‌গল-কর্মের কর্তা বলিয়া কথিত হয়।

কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে জৈন সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইল। ন্যায় দর্শনের মতে কর্ম পুরুষ কৃত প্রচেষ্টা মাত্র। পুরুষ কৃত কর্মের ফল অনেক সময় দৃষ্ট না হওয়ায়, গৌতম কর্ম ফল নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কর্মের সহিত ফল সংযোগ ন্যায় মতে ঈশ্বরাধীন। বৌদ্ধ মতে কর্ম পুরুষ প্রচেষ্টা মাত্র নহে ; ইহা একটা সুমহান জাগতিক নিয়ম—সংসারে মূল ভিত্তি কার্য-কারণভাব। কর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়া কর্মফলের উৎপাদক বৌদ্ধ মতে কর্মফল নিয়ন্তা কোনও ঈশ্বর নাই। জৈন মতেও কর্ম একটা জাগতিক ব্যাপার এবং কর্মই ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইয়া ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। নানা কারণে কর্মের ফল বিলম্বে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কর্মের ফল অনিবার্য। জৈন মতে কর্ম পুরুষ প্রচেষ্টা মাত্র নহে। ইহা নিঃস্বভাব নিয়মমাত্রও নহে। কর্ম পুদ্গল স্বভাব অর্থাৎ material, ইহার আস্রবে নিশ্চয়তঃ শুদ্ধ ও ব্যবহারতঃ অনাদি বদ্ধ জীব পুন: বদ্ধ হয়। নিশ্চয় নয় অনুসারে জীব রাগ-দ্বেষাদি আপনভাবের কর্তা। জীব কর্ম পুদ গলের উপাদান কারণ বা নিমিত্ত কারণ নহে। তবে রাগ-দ্বেষাদি ভাবের আবির্ভাবে জীবে কর্মাস্রব সম্ভবপর হয় বলিয়া ব্যবহার দৃষ্টিতে জীবকে কর্ম পুদ্গলের কর্তা বলা হয়। কর্ম ঘাতী ও অঘাতী ভেদে দুই প্রকার। জ্ঞানা-বরণীয় দর্শনাবরণীয় ভেদে অষ্ট প্রকার এবং শ্রুতাবরণীয়, চারিত্র মোহনীয়, প্রভৃতি ভেদে ১৪৮ প্রকার। কর্ম সমূহের নির্মূল ক্ষয়ে জীব স্বভাবে অধিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

জিনবাণী, শ্রাবণ ১৩৩১

তিরুবল্লুবর ও তাঁর অমর গ্রন্থ তিরুকুরল

পণ্ডিত মহেন্দ্রকুমার জৈন, ন্যায়শাস্ত্রী

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই প্রকরণের শেষে কবি কর্মের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশেষ করে জৈন পরম্পরার। প্রত্যেক জীবে কর্মের জন্য কিছু সংচিত বা অব্যক্ত শক্তি থাকে যা উপযুক্ত উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়ে ব্যক্ত হয়। এই সংচিত প্রবৃত্তি জীবকে ভালোমন্দ কাজে প্রবৃত্ত করায়। জন্ম জন্মান্তরে সে যত ভালোমন্দ কাজ করেছে ভালোমন্দ চিন্তা মনে স্থান দিয়েছে ও ইহ জন্মে যত প্রকার কাজ ও যত প্রকার চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা সমষ্টি হয়ে কিছু অব্যক্ত রূপে থাকে ও কিছু ব্যক্তরূপে পরিণত হয়ে উদীয়মান হতে থাকে। এই জীবনের শেষে যত কর্মফল অব্যক্ত থাকে তাকে সে ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায় ও একেই তার জীবনের প্রারব্ধ, প্রাক্তন কর্মফল বা ভাগ্য বলা হয়। এই পরিচ্ছেদের সারাংশ এই যে কর্মই প্রধান ও কর্মের হাত হতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। ২৭ অধ্যায়ে কর্মকে নষ্ট করার জন্য তপের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। কৃচ্ছ্রসাধন অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তরিক তপে কর্মবন্ধন শিথিল হয়ে যায় ও মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারে। শেষের ৬০টি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে মানুষ দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা মন্দ ভাগ্যের ওপরও বিজয় লাভ করতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ের পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পুরুষার্থ অর্থের বর্ণনা আছে। এই খণ্ডে রাজা ও তাঁর যোগ্যতা, মন্ত্রীর নিযুক্তি, সেনা, গুপ্তচর, মিত্রকে জানা, মিত্রতার মহত্ব, অত্যাচারের পরিণাম, শত্রু হতে সাবধানতা, আদি পরিচ্ছেদের পর কৃষি, ভিক্ষুক, দান, যশ আদি বিষয়ের বর্ণনা ছোট ছোট প্রকরণে করা হয়েছে। প্রজাপালক, চতুর ও দয়ালু রাজা, উদ্যমী ও কৃষিতে প্রৌঢ় মানুষ, ধৈর্য, বীরতা, সাহস আদি গুণের বর্ণনা এই খণ্ডে আছে।

কুরলের তৃতীয় খণ্ডে কোন বিশিষ্ট প্রণয়ীযুগলের প্রেমগাথা রয়েছে। এতে নায়ক নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার হতে নিয়ে শেষের মিলন পর্যন্ত বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে করা হয়েছে। এই খণ্ডের আরম্ভ হচ্ছে আবার বিচিত্র ভাবে। এক রমনীয় উদ্যানে নায়ক এক নায়িকাকে দেখতে পাচ্ছে। চার চক্ষুর মিলন ঘটছে। একের প্রতি অন্যের মনে প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। যুবতীর লাবণ্য, বিশাল নেত্রদ্বয় ভ্রূলতা, উন্নত বক্ষস্থল যুবককে পাগল করে দিচ্ছে। এরপর সেই যুবতী দু'একবার

আরো সেই যুবকের সামনে আসছে। কিন্তু প্রতিবারেই নিজের ভাব গোপন করে তার প্রতি তার অরুচিই ব্যক্ত করছে। এতে নায়ক বলছে—'ও আমায় জানতে দিচ্ছে না যে ও আমায় দেখেছে কিন্তু যখন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখে না দেখবার ছল করছে তাতে আমায় মনে হচ্ছে যে বস্তুতঃ তার হৃদয়েও আমাকে দেখে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সে ওপরে বিরক্তি ভাব দেখাচ্ছে, কিন্তু হৃদয়ে গহন প্রেম পোষণ করছে।' পরে প্রণয়ীর অনুনয়পূর্ণ মুখ দেখে সেও দ্রবীভূত হচ্ছে এ শেষে নিজের নয়ন দ্বারা বিবাহের স্বীকৃতি দিচ্ছে। তারপর গোপনে তাদের বিবাহ হচ্ছে।

গোপনে বিবাহ হবার পরও তারা বন্ধুস্থিতি উভয়ের মাতাপিতা হতে গোপন রাখছে। দুজনে এমন কোন ঘটনার প্রতীক্ষা করছে যাতে সহজেই উভয়ের মাতাপিতা তাদের বিবাহে অনুমতি দেন কিন্তু অনেককাল অবধি সেই সুঅবসর তারা লাভ করছে না। তখন তৎকাল প্রচলিত তামিলদেশের এক বর্বর প্রথার তারা শরণ নিচ্ছে। ডাঁটি সহ কিছু তালপাতা কেটে একটা পুঁটলির মত করছে। প্রেমিক তার ওপর ঘোড়ায় বসার মত বসছে। সেই অবস্থায় তার বন্ধুরা প্রেমসংগীত গাইতে গাইতে গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একদিকে বেচারা প্রেমিকের দেহ তালপত্রের তীক্ষ্ণতায় কেটে কেটে যাচ্ছে অন্যদিকে গ্রামের যুবক ও বালকেরা তাকে ঘিরে নানা রূপ বাক্যবাণে বিদ্ধ করছে। মধ্যে মধ্যে তার প্রণয়িনীর নামও নেওয়া হচ্ছে। শেষে অপকীর্তির ভয়ে প্রেমিকার মাতাপিতা সেই প্রেমিকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুদিন পর্যন্ত প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের মধুময় সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করছে। তারপর নিরানন্দের কালো মেঘ তাদের প্রেমের নভোমণ্ডলকে আবৃত করে দিচ্ছে। যুদ্ধে সম্মিলিত হবার জন্য রাজার নিকট হতে যুবকের কাছে রাজ্যাদেশ নিয়ে দূত আসছে। এই অরুচিকর ঘটনায় অল্পক্ষণের জন্য উভয়ে বিচলিত হচ্ছে। যুদ্ধে যাবার অনুমতি চাইলে যুবতী বলছে—'আমায় ছেড়ে গেলে পর আমার মৃত্যু নিশ্চিত, ছেড়ে যাবার কথা হতে যদি অন্য কথা থাকে ত বল। এ ছাড়া যদি শীঘ্রই ফিরে আসবে বলতে চাও তবে তা তাকেই বল যে ততদিন বাঁচবার আশা রাখে।' যুবতী একথা বলার পরও যুবক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এর পর তরুণীর দারুণ বিরহ যাতনার বর্ণনা এগারো পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। বিয়োগাবস্থায় সে নিজের ভাব এ ভাবে প্রকাশিত করছে—'আমি যে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি সে তার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়। তার শীঘ্র আসার চিন্তায় আমার হৃদয় অধীর হয়ে উঠেছে। আমি রাত্রিদিন এই কামনা করছি যে ওর রূপ সুধা পান করে আমার উপাসিত নয়ন তৃপ্ত হয়ে যাক। আমার শীর্ণ বাহুর বিবর্ণতা দূর হয়ে যাক। আগুনে ঘী এর মত প্রেমে যার চিত্ত দ্রবিত সে কি প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদ করতে পারে?'

ওদিকে যুদ্ধস্থলে নায়কও ঘরে ফিরবার জন্য ছটপট্‌[/]করছে। সে সেইক্ষণে উড়ে ঘরে ফিরতে চাইছে। নিজের বিয়োগে পত্নীর দশার কল্পনা করে কাতর ও ভয়ভীত হয়ে উঠছে। সে মনে মনে বলছে—'আমার পৌঁছবার আগেই যদি তার কুসুম কোমল হৃদয় ভেঙে যায় ত ঘরে ফিরে গিয়েই বা কি লাভ ?'

যুদ্ধ হতে ও যখন ঘরে ফিরে আসছে তখনও তার প্রেমিকা দৌড়ে তার নিকটে আসছে না। সে মান করে বসে আছে। পাঁচ পরিচ্ছেদে কবি পাঠকদের মানের লীলা মাধুর্য আস্বাদন করিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদগুলি পড়বার সময় একাংকী পড়বার আনন্দ প্রাপ্ত হয়। রস পরিপাকের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সৃষ্টি করা হয়েছে—সে নায়িকার সখী। তাকে সম্বোধন করে নায়ক ও নায়িকা নিজের নিজের মনোভাব ব্যক্ত করছে ও সখীও আবশ্যকতানুসারে মধ্যে মধ্যে কিছু বলে তাদের ব্যবধান সংকীর্ণ করাচ্ছে।

এই খণ্ডে এক পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণীর শুদ্ধ আচরণ ও পবিত্র হৃদয়োত্থিত ভাবের সজীব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এতে কোথাও অসংযম, প্রগলভতা, উচ্ছৃংখলতা অপবিত্রতার গন্ধমাত্র নেই। এই প্রকরণ পরবর্তীকালের সাহিত্য গ্রন্থে বর্ণিত অবৈধ পরকীয়া প্রেম হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুই প্রেমিক যুগলের বর্ণনা হওয়া সত্বেও এতে অশ্লীলতার ছায়া পর্যন্ত নেই। প্রায়ই দেখা যায় যে উপদেশ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। উপদেশের এই ব্যর্থতাকে দেখে কবি দুই প্রেমিক যুগলের বর্ণনার দ্বারা শুদ্ধ প্রেমরাজ্যের বাস্তবিক স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন ও প্রেমবিধির যথোচিত নির্বাহের জন্য এক পথ প্রদর্শক আদর্শ রূপে যুবক যুবতীকে সামনে রেখেছেন।

প্রথম ধর্মখণ্ডে সর্বজীবে প্রেম করা, জীব দয়া, অহিংসা, মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ আদি বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা আছে। প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন—'প্রেমের দরজা বন্ধকারী বাধা কোথায় ? একে যে অন্যের সঙ্গে প্রেম করছে তা জানা যায় তার চোখের ছলছল করা জলে যা তার হৃদয়ের তরঙ্গিত প্রেম সাগরের অস্তিত্বের দ্যোতক। প্রেমের মধুরতা আস্বাদ করবার জন্যই জীব নিজেকে বারবার এই হাড় মাংসের শরীরে আবদ্ধ করে।' অন্যের হৃদয়ে পীড়া না দেবার কথা বলতে গিয়ে কবি বলছেন—'তোমার এক শব্দে যদি অন্যের হৃদয়ে বেদনা সংচারিত হয় তবে তোমার ভালো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আগুনে পোড়া শরীর আবার ভরে যায় কিন্তু জিহ্বা দ্বারা পোড়া স্থান আবার ঠিক হয় না। যখন দুটো মিষ্টি কথা বলে কাজ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা তখন মানুষ কেন কঠোর শব্দের প্রয়োগ করে ?' মিত্রতার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন—'যে রকম কোমরে বাঁধা কাপড় বাতাসে উড়তে থাকে ও হাত তাকে নিবারিত করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় সেই রকম মিত্রের লজ্জা ঢাকবার জন্য সত্যিকার মিত্র এগিয়ে আসে।' শত্রুকে কেবল বাইরের ব্যবহারে জানা যায় না তা বলতে গিয়ে কবি বলছেন—'তীর সোজা কিন্তু হত্যা করে। বীণা বাঁকা

কিন্তু মধুর সংগীত শোনায়।' এ রকম আর একটী উদ্ধরণ—'ফুলের সজীবতার মনে হয় ওতে কত জল দেওয়া হয়েছে। সেই রকম মানুষের বৈভবে অনুমান করা যায় সে কত পরিশ্রম করেছে।'

তিরুবল্লুবর উদার বিচার, পরিস্থিতির অনুকূল দৃষ্টান্ত ও রসপূর্ণ বর্ণনে প্রসিদ্ধ। তিরুবল্লুবরের দেড়শ' বছর পরের এক জৈন কবি কুরল সম্বন্ধে লিখছেন—'কুরল গ্রন্থে দোহার সীমায় অসীম অর্থ ভরা রয়েছে। যেন সরসে খুঁড়ে তাতে সপ্তসিন্ধুর বিশালতাকে ভরে দেওয়া হয়েছে।' তামিল সাহিত্যের মহান মহিলা সন্ত কবি অব্বয়ার কুরল সম্বন্ধে লিখছেন—'যে রকম ঘাসের পাতার শিশির বিন্দুতে গগন স্পর্শী তালবৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেই রকম কুরলের ছোট ছোট পদ্যে এক মহান অর্থের অনুভব হয়। এ রকম আরো কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে—'যে চোখে মধুরতা নেই তা গর্তমাত্র। বড়লোকের লক্ষ্মী গ্রামের মধ্যের চৌরাস্তার ফলভারাবনত বৃক্ষের মত। কেবল হাসির নাম মিত্রতা নয়, হৃদয়কে হাসাতে পারে এরূপ সত্য প্রীতিই মিত্রতা। যে দুঃখে দুঃখী হয় না সে দুঃখকে দুঃখী করে। যে কিষান বারবার নিজের জমিতে যায়না তার জমি পরিত্যক্তা পত্নীর মত তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। কেবল কিষানই নিজের পরিশ্রমের অন্ন খায়, জগতের আর সকলে অন্যের পরিশ্রমের। যে রাজ্যের ক্ষেত দানায় ভরা ভুট্টার ছায়ায় আরাম করে তার কাছে অন্য রাজ্যের মাথা নত হয়। আমার পেট খালী সে কথা শুনলে মা ধরিত্রী হাসেন।'

কুরলের ধর্ম অর্থ ও কাম খণ্ডের ওপরে যে দিগদর্শন করা হল তা কেবল তার রূপরেখা মাত্র। এক ছোট প্রবন্ধে এই গ্রন্থ রত্নের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই গ্রন্থে ময়লাপুরের এক প্রতিভাশালী অস্পৃশ্য জোলা মানুষের নৈতিক, পারিবারিক ও নাগরিক জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশ্ব সাহিত্যে অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থে প্রত্যেক দেশের মানব মনের ঊর্মির স্পন্দন আছে। সংক্ষেপে সাদাসিধা থাকা-পরা ও ও উচ্চ চিন্তা এই গ্রন্থের অভিপ্রেত। এই কাব্যের ছোট ছোট পদ্য তামিল প্রান্তের ছোটবড় সকলের জিহ্বাগ্রে। একদিকে এই গ্রন্থে শ্রমণ বা সাধু সংস্কৃতির সাধুদের প্রদত্ত জীবনোপযোগী উপদেশ আছে, অন্যদিকে তা ভীষ্ম, চাণক্য, বাৎসায়ন, আদি নীতি বিশারদের সঙ্গে এক আসনে বসবার উপযোগী। আবার অশ্বঘোষ, কালিদাস, সিদ্ধসেন দিবাকরের মত বাগীশ্বরদের ভাবপূর্ণ কল্পনা সামর্থও এই কাব্যে বিদ্যমান। এই গ্রন্থ পড়লে মনে এইভাব দৃঢ়ীভূত হয়ে যায় যে সাধুতা, পৌরুষ, সংযম, কষ্টপূর্ণ জীবন ও আত্মগৌরবের চেয়ে বড় এই পৃথিবীতে অন্য কোনো গুণ নাই। এদের বিকাশের জন্য দুষ্টতা ও পাপ পরিত্যাগ করতে হবে। এখন তিরুবল্লুবরের এই গ্রন্থ কেবলমাত্র তামিলনাড়ুর নয়, সমগ্র জগতের। কুরলের রচনা করে তিরুবল্লুবর বিশ্ব সাহিত্যকে এক অমূল্য সম্পত্তি দান করে গেছেন।

দিওয়ালি

পূরণ চাঁদ সামসুখা

যেদিন বঙ্গদেশে গৃহে গৃহে শ্যামা অধিষ্ঠান করেন,—যেদিন বাঙ্গালীগৃহে মহোৎসাহে ও বিপুল আয়োজনে মহাকালীর উপাসনা ও মহাপূজা সমাহিত হয়,—সেই কার্তিকী অমাবস্যাতে জৈনগণ 'দিওয়ালি' পর্বের অনুষ্ঠান করেন।

জৈন পর্বসমূহে কোন প্রকার উন্মত্ততা বা আনন্দাতিশয্য থাকে না; যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি কোনও প্রকার তৌর্যত্রিকী ক্রিয়া তাঁহাদের সাত্বিক ভাবের গম্ভীরতায় চাঞ্চল্যোৎপাদন করে না; কেবল মাত্র ধর্মের সম্মোহিনী শক্তি ও মধুর আনন্দ এবং মঙ্গলেচ্ছার ভাব পরম্পরায় তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীর ন্যায় জৈন ধর্মাবলম্বিগণ আনন্দে ও সুমিষ্ট খাদ্যাদি আহারে পর্বদিন অতিবাহিত করেন না। তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেক পর্বদিনে উপবাসাদি আহার-সম্পর্ক-শূন্য ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা আছে এবং যতদূর সম্ভব নৃত্যাভিনয় দর্শনে তাহাদিগকে বিরত থাকিতে হয়; তবে ভগবন্মন্দিরে গীতাদি করা প্রশস্ত। পর্বোপলক্ষে কেহ কেহ একমাস কাল পর্যন্তও উপবাস করিয়া থাকেন,—এ সময়ে কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের পেয় বা আহার্য থাকে না। কিন্তু 'দিওয়ালি' পর্বে এই বিধানের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। এই পর্বোপলক্ষে ইঁহারা নানাপ্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করেন এবং কতকগুলি আনন্দ পরিচায়ক আচারাদিরও অনুষ্ঠান করেন। বহুকাল যাবৎ নানা প্রকার দেশাচার ও স্ত্রী-আচারের সংসর্গে আসিয়া এবং এই আচার সমূহের কতকগুলি ইহার অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ায় 'দিওয়ালি' ক্রমেই এইরূপ আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শাস্ত্রানুসারে ইহা অন্যরূপ। যাহা হউক আমরা প্রথমতঃ ইহার উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

জৈন শেষ তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীর স্বামী কার্তিকী অমাবস্যাতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে সমবেত বহু মুনি অনশন গ্রহণ ও বহু শ্রাবক শ্রাবিকা 'পোষা'দি[১] গ্রহণ করিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সমাগত রাজন্যবৃন্দ ধর্মোৎসবে মত্ত হইলেন, অন্যান্য যাবতীয় শ্রাবক শ্রাবিকা দলে দলে মন্দিরাদিতে 'দর্শন' ও 'পূজা'র্থে গমন

১ ইহা ধর্মসম্মত একপ্রকার আচার। উপবাস করিয়া প্রায় সমস্ত দিবাভাগ ও রাত্রির কিয়দংশ মন্দিরে অবস্থান করতঃ নানাপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়।

করিতে লাগিলেন -চতুর্দিকে যে যেখানে ছিল সে সেখানেই ধর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিল। তৎকালাবধি জৈনগণ 'দিওয়ালি' পর্ব পালন করিয়া থাকেন।

মহাবীর স্বামী নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার নির্বাণোৎসব উপলক্ষে চতুর্দিক উজ্জ্বল রত্নরাজি দ্বারা আলোকিত করিলেন। জৈনগণ তদনুকরণে রত্নাভাবে প্রদীপালোকে অন্ধকার অমানিশা উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। হিন্দু গৃহেও এই রাত্রি 'দীপান্বিতা' রজনী রূপে পালিত হয়। 'দিওয়ালি' ও 'দীপান্বিতা' একার্থ বোধক।

জৈন শাস্ত্রানুসারে এইদিন সক্ষম ব্যক্তিগণকে উপবাস করিয়া দিবাভাগে 'পোষা'দি ক্রিয়া সমাপন ও রাত্রিকালে জপানুরক্ত হইয়া জাগরণ করিতে হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বে গ্রামে যতগুলি জৈন মন্দির থাকিবে তৎসমুদয়ে পূজা ও বন্দনাদি করিতে গমন করিতে হয়।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে নানাপ্রকার দেশাচার ও স্ত্রী আচারের সংমিশ্রণে 'দিওয়ালি' ক্রমে ক্রমে তাহার আদিম ভাব বিসর্জ্জন করিয়া কতকটা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধুনা প্রায় কেহই উপবাসাদি করিতে দৃষ্ট হন না, এবং উপবাস করেন না বলিয়া 'পোষা'দি ক্রিয়াও অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। রাত্রিতে কেহ কেহ জপ করেন বটে কিন্তু অল্প লোকই সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। এই সকলের পরিবর্তে তাঁহারা 'লক্ষ্মীপূজা', 'দেহলী পূজা' প্রভৃতি ইহার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন—বলা বাহুল্য যে প্রথমটি দেশাচার ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী-আচার সমুদ্ভূত। যাহা হউক এক্ষণে আমরা অধুনা প্রচলিত 'দিওয়ালি'র আদ্যন্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

অমাবস্যার অষ্টাহ পূর্ব হইতেই সকলে 'দিওয়ালি'র জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করেন। গৃহে গৃহে 'দিওয়ালিকা চিজ' অর্থাৎ দিওয়ালির খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার ধূম পড়িয়া যায়। 'নাইন' ও 'ভোজকানি'[২] গণের (নাপিতানি ও ভোজকানি) কোলাহলে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ইহারাই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে। প্রায় সমস্ত 'চিজ'ই—গোধূম কিংবা বেসন নির্মিত। এস্থলে আমরা পাঠকগণের বিদিতার্থে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিলাম। তদ্যথা : ফেনি, জমাও, মঠরি, পেঠা, ডোটা, ইত্যাদি। বাঙ্গালীদিগের নির্মিত কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের সহিত উপরিউক্ত 'চিজে'র কোন সাদৃশ্য না থাকায়—অন্ততঃ আমাদের অবিদিত থাকায়—আমরা এস্থলে তাহাদের সদৃশ কোন দ্রব্যের নামে বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত পরিচিত করাইতে সক্ষম হইলাম না। সুবিধা থাকিলে জৈন প্রতিবেশীর নিকট জিনিষগুলি দেখিয়া লইবেন।

২ ওশা নগরীতে জৈন মহাসভায় জৈনদিগের শাখা প্রশাখা স্থিরীকৃত হয়। এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণকে পূর্ব যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করাইয়া নবযজ্ঞসূত্র প্রদান করা হয়। এই ব্রাহ্মণগণই ভোজক নামে অভিহিত।

সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া গেলে সর্বপ্রথমে 'অছুতা' বাহির করা হয়, অর্থাৎ একটি থালে অল্প অল্প করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ৪. ৫ কিম্বা ৭ (যাহার বাড়ীতে যেরূপ রীতি প্রচলিত) স্থানে রাখা হয়, তৎপরে সেই দ্রব্যে 'রোলি' ও আতপ চাউল ছিঁটাইয়া দেওয়া হয় এবং থালের চারদিকে অল্প অল্প জল তিনবার ঢালিয়া দিয়া দণ্ডবৎ করিতে হয়। এই সমস্ত দ্রব্যগুলি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। 'অছুতার চিজ' মেয়ের বাড়ীতে ও তৎপরে অন্যান্য দ্রব্য আত্মীয়াদির বাড়ীতে প্রেরণ করা হয়। এইরূপে 'চিজ' হইয়া গেলে চতুর্দশীর পূর্বে যে কোন এক ভাল দিন দেখিয়া কন্যা পিত্রালয়ে 'দেহলী' পূজিতে আসে। সন্ধ্যার পরে শুভক্ষণে এই পূজা আরম্ভ হয়। প্রায়ই ভাণ্ডার ঘরের অথবা অন্য কোন এক ঘরের দ্বারের চৌকাঠের ওপর 'আল্পনি' দিয়া সারি সারি নয় স্থানে নৈবেদ্য রাখা হয়। মাঝের নৈবেদ্যের উপর একটি ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। প্রদীপের সম্মুখে মাটিতে একটি মৃণ্ময় গণেশ রাখিয়া তাঁহার মস্তকে রোলির তিলক দেওয়া হয় ও 'গঠিয়া', লাড্ডু প্রভৃতি দ্রব্য ভোগ প্রদত্ত হয়। গণেশের চার দিকে আরও কতকগুলি মৃণ্ময় পুতুল সাজাইয়া দেওয়া হয়। পূজা সমাপনান্তে মেয়ে তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে চলিয়া যায়; পূজার পর পিত্রালয়ে অল্পক্ষণও থাকিবার নিয়ম নাই। এই পূজাতে মেয়েকে এক সুট (suit) কাপড় বা তাহার মূল্য প্রদত্ত হয়। 'দেহলী' পূজার পর ত্রয়োদশী পর্যন্ত আর কিছুই হয় না। চতুর্দশীর দিন 'ছোটী দিওয়ালী'। এই দিন অল্প কয়েকটী প্রদীপ জ্বালান হয়। অমাবস্যায় 'বড়ী দিওয়ালী'। 'বড়ী দিওয়ালী'ই প্রকৃত 'দিওয়ালি'। সমস্ত দিবাভাগে প্রায় কিছুই করা হয় না—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অতি অল্প লোকই 'পোষা'দি করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা হইলেই বালক বালিকা মহলে প্রদীপ জ্বালাইবার ধূম পড়িয়া যায়। প্রত্যেক গৃহের ছাদের উপর সারি সারি দীপাবলী জ্বলিতে থাকে। যেখানে অনেক জৈন গৃহ আছে সেখানে দৃশ্যটি বড় মনোরম। সমগ্র পল্লী অলোক মালায় বিভূষিত হইয়া ঝক ঝক করিতে থাকে; স্থানে স্থানে আতসবাজী সুদূর আকাশে বেগে ছুটিয়া যায় ও তৎসঙ্গে বালক বালিকা-গণের মধুর আনন্দধ্বনি দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করে। সন্ধ্যার কিছু পরে শুভক্ষণে 'হটরী' ও 'লক্ষ্মী পূজা' আরম্ভ হয়। এস্থানে আমরা 'হটরী'র কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহা একপ্রকার খড় নির্মিত রথ বিশেষ—দেখিতে কতকটা রথের মত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা রথ বলিয়া অভিপ্রেত নয়। জৈন ধর্মানুসারে তীর্থঙ্করগণ কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া এক প্রকার উচ্চাসন প্রস্তুত করেন, এই আসনকে 'সমোসরণ' কহে। শ্রীমহাবীর স্বামী এইরূপ আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া উপদেশ বিতরণ করিতেন। 'হটরী' এই 'সমোসরণে'রই প্রতিরূপ। তবে নির্মাণকারী নাপিতগণ (নাপিতেই ইহা নির্মাণ করিয়া থাকে এবং মূল্য স্বরূপ এক টাকা বা বড় লোকের বাড়ীতে বেশী প্রাপ্ত হয়) ইহাকে কতকটা রথের মতো করিয়া তুলিয়াছে। এই পূজাতে পুরোহিতের

কোন প্রয়োজন হয় না। 'হটরী' এক প্রকার 'মাড়না'র (আলপনির) উপর রাখিয়া তাহার চারদিকে অল্প বিস্তর মৃণ্ময় পুতুল সাজাইয়া দেওয়া হয়। বাড়ীতে অন্য স্থানেও 'মাড়না' দেওয়া হয়। 'হটরী'র সম্মুখে একটি মৃণ্ময় লক্ষ্মীর মূর্তি এবং কতকগুলি পুরাতন টাকা ও মোহর রাখা হয়। 'হটরী' পূজা অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীলোকগণই করিয়া থাকে। তবে কোন কোন গৃহে পুরুষেও এই পূজা সম্পাদন করে। লক্ষ্মী পূজা কিন্তু পুরুষগণই করে। খই, ইক্ষু, কলা, মিছরি, চাল. পুষ্প, 'দিওয়ালিকা চিজ' প্রভৃতি দ্রব্য পূজোপকরণ। প্রথমে 'হটরী'তে আটটী প্রদীপ ও সম্মুখে একটী চতুর্মুখ প্রদীপ জ্বালিতে হয়। পূর্ব বর্ণিত 'দেহলী' পূজায় যেরূপ ভাবে গণেশ পূজা করিতে হয় 'হটরী' ও লক্ষ্মী পূজাও সেই ভাবেই করিতে হয় ;—অর্থাৎ 'হটরী' ও লক্ষ্মীর মস্তকে 'রোলি'র তিলক দিয়া সমস্ত দ্রব্য সম্মুখে 'চড়াইয়া' দিতে হয়। বলিতে ভুলিয়াছি যে এই সময় গণেশের পূজাও হইয়া থাকে। পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলেও সেই সমস্ত দ্রব্য সেইখানেই পড়িয়া থাকে—রাত্রি থাকিতে উঠাইতে হয় না। বালক বালিকাগণ অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রামগ্ন হয়, বৃদ্ধগণ কিয়ৎকাল জপ করেন। কেহ কেহ রাত্রি জাগরণও করিয়া থাকেন। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকার সময় স্ত্রীলোকগণ 'দলিদ্দর নিকালে' অর্থাৎ দরিদ্রতা বাহির করিয়া দেয়। সমস্ত ঘর ঝাট দিয়া আবর্জ্জনারাশি একটি 'ডগরা'তে (একপ্রকার কুলা, সুজি ঝাড়িতে ব্যবহৃত হয়) করিয়া লয় ও তাহার উপর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহিরে "দলিদ্দর দলিদ্দর বাহার যা, লছমী লছমী ঘরমে আ" বলিয়া নিক্ষেপ করে ও একটি 'বেলনা' দ্বারা সেই 'ডগরা'তে ঘন ঘন আঘাত করে। এইরূপে দরিদ্রতা বিতাড়নের একটি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ প্রবাদ প্রচলিত আছে। মহাবীর স্বামী নিয়ত ধর্মোপদেশ দ্বারা জনসমাজের হৃদয় হইতে মোহ বিদূরিত করিয়াছিলেন—মোহরাজ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া লোক সমাজ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নপর হয়। কার্তিকী অমাবস্যাতে মহাবীর স্বামী নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে মোহরাজ সাহস পাইয়া পুনরায় লোক সমাজে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে স্ত্রীলোকগণ সমস্ত গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া কুলার ঘন ঘন শব্দে মোহরাজকে ভয় প্রদর্শন করেন। খুব সম্ভব এই ক্রিয়া 'দিওয়ালি' পর্ব প্রচলিত হইবার বহু পরে ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে এবং বোধ হয় কোন সুরসিক কবির উর্বর মস্তিষ্কই ইহার উদ্ভাবক ;—ক্রমে ক্রমে ইহা জৈন সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। দেশাচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির সংঘর্ষেই হউক অথবা লক্ষ্মী পূজা ইহার অঙ্গীভূত বলিয়াই হউক, বাঙ্গলার জৈনগণ পূর্বতম শাস্ত্রোক্ত ভাব পরিত্যাগ করত: মোহবিজয় সম্বন্ধে এক্ষণে দরিদ্রতা বিতাড়ন ও লক্ষ্মী আবাহন রূপ প্রচলিত প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদুপযোগী শব্দও ব্যবহার করেন ; কিন্তু গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা আদিম ভাবেই প্রচলিত।

অল্প রাত্রি থাকিতেই প্রায় সকলে দলে দলে মন্দিরে 'দর্শন' করিতে গমন

করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গুলিকেও সঙ্গে লইতে ভুলেন না। স্ত্রী লোকেরাও পুরুষদিগের বাহির হইবার পূর্বেই গমন করেন এবং ভোর হইতে না হইতেই প্রত্যাগমন করেন। সমস্ত মন্দির পরিভ্রমণ করিয়া সকলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে 'হটরী' পূজাস্থল হইতে উঠাইয়া সযত্নে একটি উচ্চ স্থানে রক্ষিত হয়। মন্দিরে 'দিওয়ালির চিজ' ও বড় বড় লাড্ডু 'চড়ান' হইয়া থাকে,—এ সমস্ত পূজারিগণের প্রাপ্য। মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতে প্রায় অনেকেরই সকাল হইয়া যায়, তবে কেহ কেহ এত পূর্বে গাত্রোত্থান করেন যে ফিরিয়া আসিলেও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় না। প্রতিপদে সকলে 'সেলাম' করিতে গমন করেন। বাঙ্গালী হিন্দুরা যেরূপ দুর্গোৎসবের পর 'কোলাকুলি' প্রণামাদি করেন, জৈনগণ (বিশেষতঃ বাঙ্গলার জৈন ওসউয়ালগণ) সেইরূপ কতিপয় পর্বের পর 'সেলাম' করিতে গমন করেন। 'সেলাম' করিবার প্রথাটা বোধ হয় আধুনিক, কেননা 'সেলাম' শব্দটিই নবাবী আমল হইতে প্রচলিত, তবে এরূপ প্রণামাদির আদান প্রদান পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। শ্বশুরবাড়ী 'সেলাম' করিতে গেলে এক টাকা (অথবা শ্বশুর বড় লোক হইলে বেশী) ও একটি নারিকেল এবং অন্যান্য আত্মীয়ের বাড়ী কেবল একটি নারিকেল পাওয়া যায়।

সুধা, মাঘ, ১৩০৮

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

মা বললেন, শ্রেষ্ঠী যদি রাগ করেন তবে আমার ওপরই করবেন। তাই আমি যা বলছি তাই কর। তোমরা মন্দর কথা ভাবছ। কিন্তু আমি সে কথা ভাবছি না। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা চারু আমাদের ঐশ্বর্য উপভোগ করুক। এখন সেই সময় এসেছে। সে যদি এক গণিকার পেছনে আমাদের সমস্ত ধন নষ্ট করে দেয় তবে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তারা তখন সম্মত হল। সেই দাসী আমাকে এ সব কথাও জানাল। সে বলল, এরপর তোমাকে আর বাড়ীতে দেখাই যাবে না।

এর কয়েকদিন পর আমার বন্ধুরা আমায় বলল, চারু, চল উদ্যানে যাই। সেখানে খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ করে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে ফিরব।

আমি বললাম, যদি উদ্যানেই খাওয়া দাওয়া করবে তবে আমায় আগে জানাওনি কেন ?

তারা বলল, সময় হয়নি। তাছাড়া তোমায় যখন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না তখন তোমার ওত ভাববার কি আছে ?

আমি বললাম, বেশ। এই বলে তাদের সঙ্গে গেলাম।

উদ্যানে পৌঁছতে একটু বেলা হল। আমার ভয়ানক জল পিপাসা পেয়েছিল। তাই এক গাছের তলায় বসে তাদের সেকথা বললাম।

হরিশীর্ষ নিকটবর্তী পুকুরে জল আনতে গেল। কিন্তু একটু পরেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, চারু, এসে দেখ কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য !

আমি উঠে নেমে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, বল, এখানে এমন কি আশ্চর্য দেখলে।

পুকুরে অনেক পদ্মফুল ফুটে ছিল। সেই ফুল তরুণী মুখকেও লজ্জা দিতে পারে। সেদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে বলল, দেখ দেখ, পদ্মের ওপর চূর্ণির মত ওগুলো কি টল টল করছে।

খানিক ভেবে গোমুখ বলল, আমার মনে হয় ও দেবভোগ্য পদ্মমধু। তাড়াতাড়ি পদ্মপাতায় ওই মধু সংগ্রহ করে নাও।

সেই মধু সংগৃহীত হল। তখন তারা আলোচনা করতে লাগল মানুষের পক্ষে অলভ্য এই পদ্মমধু দিয়ে তারা কি করবে।

হরিশীর্ষ বলল, এই মধু নিয়ে গিয়ে আমরা রাজাকে দি না কেন ? তিনি খুসী হলে আমাদের আর আজীবিকার ভাবনা ভাবতে হবে না।

বরাহ বলল, কিন্তু রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক করাই কঠিন। সম্পর্ক স্থাপিত হলেও তাঁরা সহজেই সন্তুষ্ট হন না। তাই এই মধু মহামাত্যকে দেওয়া যাক। তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

কিন্তু মহামাত্য আমাদের কি কাজে আসবেন ?—তমন্তগ মাঝখানে বলে উঠল। তিনি কেবল রাজকোষ বৃদ্ধি করতে চান। তাই তাঁকে অর্থ দিয়ে মাত্র সন্তুষ্ট করা যায়, অলভ্য বস্তু দিয়ে নয়।

তাহলে এই মধু নগররক্ষককে দেওয়া যাক—মরুভূতি তার অভিমত দিল। নগররক্ষক যদি আমাদের মিত্র হয় তবে আমাদের অনেক লাভ।

কিন্তু গোমুখ তাদের সকলকে নিশ্চুপ করে দিয়ে বলল, তোমরা সবাই অজ্ঞ। বয়স্য চারুই আমাদের রাজা, আমাদের মহামাত্য ও নগররক্ষক ; ওই আমাদের সব কাজ করে দেয়। তাই যে অলভ্য বস্তু আমরা পেয়েছি তা ওরই প্রাপ্য। ওর বদান্যতায় আমরা বেঁচে আছি।

তখন সকলে মিলে আমায় বলল, বয়স্য এ মধু তুমিই পান কর।

আমি বললাম, তোমরা কি জান না আমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেছি সে কুলে মধু, মাংস, মদ্য নিষিদ্ধ। তোমরা আমায় মধু পান করতে বলছ ?

গোমুখ বলল, সেকথা আমরা জানি। তোমায় অন্যায় কিছু করতে আমরা কেন বলব ? কিন্তু এত মদ্য নয়, দেবভোগ্য অমৃত, তাই অবিবেকে তুমি এ পান করতে পার। এতে তোমার ব্রত ভঙ্গ হবে না।

তাদের নির্বন্ধ্যাতিশয্যে আমি সেই মধু পান করতে সম্মত হলাম ও হাতমুখ ধুয়ে পূর্বাভিমুখী হয়ে পদ্মপত্রে অমৃতজ্ঞানে সেই মধু আমি পান করলাম। পান করার পর আমার শরীরে এক নূতন প্রফুল্লতা, এক নূতন স্ফূর্তি এল।

আমার বন্ধুরা তখন বলল, চারু, তুমি এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমরা ফুল তুলে নিয়ে আসি।

তাদের কথা মত আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। মধু অসাধারণ ছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি দেখলাম আমি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। কারণ মনে হল গাছপালা সব ছুটে চলেছে। আমি ভাবলাম, এ মধুপানের ফল না তারা আমায় এভাবে মদ খাইয়ে দিয়েছে।

আমি যখন একথা চিন্তা করছিলাম তখন অশোক গাছের নীচে এক অপূর্ব সুন্দরী নারীকে বসে থাকতে দেখলাম। তার দেহে প্রথম যৌবনের সঞ্চার হয়েছিল। ক্ষৌমবাস পরিহিতা রত্নালঙ্কার ভূষিতা সেই নারীকে আমার মোহময়ী বলে মনে

হচ্ছিল। সে কে হতে পারে ভাবছিলাম এমন সময় অঙ্গুলি সঞ্চালনে সে আমাকে তার কাছে যেতে বলল।

আমি কাছে যেতে সে আমায় স্বাগত জানাল। আমি বললাম, তুমি কে?

সে প্রত্যুত্তর দিল, আমি অপ্সরা। দেবরাজ ইন্দ্র তোমার সেবার জন্য আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ত আমায় চেনেন না। তিনি কি করে তোমায় এখানে পাঠালেন?

তোমার পিতার নাম সর্বত্র খ্যাত। তোমার পিতার প্রতি তাঁর সৌহার্দ দেখাবার জন্য তিনি আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

তারপর একটু থেমে বলল, তোমায় এর জন্য ভাবতে হবে না। আমরা সবাইকে দেখা দি না বা যাদের প্রতি আমরা অনুকূল হই না তারা আমাদের দেখতে পায় না। যদি বিশ্বাস না হয় তবে তোমার বন্ধুদের দেখ। ওই ওরা আসছে। তারা আমায় দেখতে পাবে না এবং আমার বিদ্যার জন্য তোমাকেও দেখতে পাবে না। একটু স্থির হয়ে থাক।

সত্যিই আমি আমার বন্ধুদের আসতে দেখলাম। তারা আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেল। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে আবার তারা ফিরে এল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল—না, চারু ওত এগিয়ে যেতে পারে না। তারা তখন চীৎকার করে ডাকতে লাগল, চারু, তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?

সেই মেয়েটী বলল, দেখলে আমার বিদ্যার প্রভাব। এখন তারা তোমায় দেখতে পাবে।

সত্যি তখন তারা আমায় দেখতে পেল। বলল, চারু, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা অনেক ক্ষণ ধরে তোমায় ডাকছি—কিন্তু কোথাও তোমাকে দেখতে পেলাম না।

আমি বললাম, আমিত এখানেই ছিলাম।

তারা বলল, যা হবার হয়েছে, এখন চল।

চলতে গিয়ে দেখি আমার পা টলতে আরম্ভ করেছে।

সেই মেয়েটি তখন কাছে এসে আমার ডান হাত খানা ধরল। বলল, ভয় নেই। তোমার বন্ধুরা আমায় দেখতে পাবে না। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল।

আমি তার কাঁধে মাথা রাখলাম। তার শরীরের স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। আমি তখন ভাবলাম এ তবে সত্যিই ইন্দ্রের অপ্সরা। এভাবে তার দ্বারা ধৃত ও বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেখানে খাবার তৈরী হয়েছিল সেখানে এসে পৌঁছলাম। পরিচারকেরা আমাদের জন্য অপেক্ষাই করছিল।

আমরা খেতে বসলাম। সেই মেয়েটি একই আসনে আমার সঙ্গে খেতে বসল। আমার কেমন যেন ঘুম পেতে লাগল। স্বপ্নে যেমন মানুষ শোনে তেমনি আমি শুনতে পেলাম, আমরা চারুকে তোমাকে দিলাম।

আমাকে তারপর গাড়ীতে তোলা হল। সেই গাড়ীতে আমি মেয়েটির ঘরে গেলাম। সেই মেয়েটি আমার হাত ধরে গাড়ী হতে নামাল। গাড়ী হতে নামতেই তারই সমবয়সী অনেকগুলো মেয়ে এসে আমায় ঘিরে ফেলল। সেই মেয়েটি তখন আমায় বলল, শ্রেষ্ঠীপুত্র তোমাকে আমি আমার বিমানে নিয়ে এসেছি। এখন তুমি আমার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ কর।

তখন সেই মেয়েরা আমায় ঘিরে গান করতে করতে নাচতে নাচতে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। আমার তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল আমি যেন দেবলোকে পৌঁছে গেছি। সেই রাত্রি তার সঙ্গে আনন্দোপভোগ করতে করতে একই শয্যায় শয়ন করলাম।

সকাল হতে আমার নেশা যখন ছুটে গেল, তখন দেখলাম এ ঘর বসন্ত তিলকার।

আমি তখন তাকে জিগ্যেস করলাম, এ বাড়ী কার ?

সে বলল, আমার।

কিন্তু এতো দেব বিমান নয়, মানুষের ঘরের মতোই মনে হচ্ছে।

তাই যদি মনে হচ্ছে তবে তোমায় সত্য কথাই বলি—আমি গণিকাকন্যা বসন্ত তিলকা। আমি শৈশবে নৃত্য গীত শিক্ষা করি। আমি অর্থগৃধ্নু নই ও সৎ জীবন যাপন করেছি। তোমার মার ইচ্ছে মত তোমার বন্ধুরা ছলনা করে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গেছে। এখন দেখছি আমি তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। বলে সে উঠে গিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করে এল। বলল, আমাকে তোমার সেবা করার অধিকার দাও, আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ কর। আমি তোমার আজীবন সেবা করব।

তার সঙ্গে সহবাস করার জন্য আমি বললাম, সুন্দরী, তুমি সেবা কর বা না কর, তুমি আমার পত্নী।

সেই হতে আমি তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলাম। তার প্রতিদিনের শুল্ক ছিল এক হাজার কার্ষাপণ এবং বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনের এক লক্ষ কার্ষাপণ।

এভাবে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে আমি বারো বছর ব্যতীত করলাম।

সেদিনো রাত্রে মদিরা পান করে বসন্ত তিলকার সঙ্গে এক সঙ্গে শুয়েছিলাম। সহসা শীতল বাতাসের স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বসন্ত তিলকাকে আমার পাশে দেখতে পেলাম না। আমি তখন উঠে দাঁড়ালাম ও আমি এখন কোথায় আছি চিন্তা করতে লাগলাম। সহসা পথের ধারের ভূত গৃহ আমার চোখে পড়ল। সেই স্থানটি আমার পরিচিত ছিল। বুঝতে পারলাম সেই গণিকা এখানে আমায় ফেলে দিয়ে গেছে। এখন আমায় ঘরে ফিরে যেতে হবে।

সকালের আলো তখন সবে মাত্র ফুটতে আরম্ভ করেছিল। আমি তাই ঘরের জন্য রওয়ানা হলাম। যখন ঘরে প্রবেশ করতে গেলাম তখন দ্বারপাল আমায় বাধা দিল। বলল, তুমি কে? কি চাও? কোথায় যাবে?

আমি তখন তাকে জিগ্যেস করলাম, এবাড়ী কার?

সে বলল, শ্রেষ্ঠী রামদেবের।

আমি বললাম, কেন, এ বাড়ী কি শ্রেষ্ঠী ভানুর নয়?

সে বলল, এককালে ছিল, এখন নয়। তার ছেলে চারুদত্ত বিপথগামী হওয়ায় শ্রেষ্ঠী ভানু সংসার পরিত্যাগ করে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করেছে ও তার স্ত্রী অর্থ নিঃশেষিত হলে এই বাড়ী বন্ধক রেখে তার ভাইয়ের বাড়ী চলে গেছে।

আমাদের কথা রামদেবের কানে গিয়েছিল। সে দ্বারপালকে তাই জিগ্যেস করল, বাইরে কে?

দ্বারপাল প্রত্যুত্তর দিল। শ্রেষ্ঠী ভানুর বাড়ীর কথা কে একজন জিগ্যেস করছে। হয়ত তার ছেলে হতে পারে।

রামদেব বলল, ওই নির্লজ্জটাকে ঘরে ঢুকতে দিও না।

আমি লজ্জিত হলাম ও দুঃখও অনুভব করলাম। আমি তাড়াতাড়ি সেই স্থান পরিত্যাগ করে মামার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে ভিতরে গিয়ে মাকে দেখলাম। মার বেশ ভূষা অত্যন্ত সাধারণ ছিল, মুখ শ্রীহীন। আমি তাঁর পায়ে পতিত হলাম।

তিনি জিগ্যেস করলেন, কে?

প্রত্যুত্তর দিলাম, আমি চারু।

তিনি তখন আমায় তুলে ধরলেন ও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না শুনে আমার মামা এলেন। তিনিও আমায় দেখে কাঁদতে লাগলেন। পরিজনেরা তাঁদের সান্ত্বনা দিল। তারপর মলিন বসনে মিত্রবতী এল। জীর্ণ ভিত্তি চিত্রের মত তার মুখও ছিল লালিত্যহীন। সে আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে কাঁদতে নিষেধ করলাম। ভাগ্যদোষে এ সব কিছু হয়েছে বলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম।

মা আমার জন্য চাল এনে ভাত করে দিলেন। আমি সেই ভাত খেলাম। খাবার পর মাকে জিগ্যেস করলাম, মা আমাদের যে অবশিষ্ট ধন ছিল তার কি হল?

মা বললেন, আমাদের কোষে কত অর্থ ছিল তা আমি জানতাম না। কত অর্থ সুদে ধার দেওয়া ছিল বা আত্মীয়দের দেওয়া হয়েছিল তাও জানতাম না। তোমার পিতা যখন শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন যে অর্থ কাজের জন্য অনুচরদের দেওয়া

হয়েছিল তাও আর পাওয়া গেল না। ষোল কোটি স্বর্ণ তোমার ভোগোপভোগে ব্যয় হয়েছিল—তাই কোনো রকমে আমাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল।

আমি বললাম, মা, লোকে আমাকে অপদার্থ বলে। তাই এখানে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আমি দূর বিদেশে যাব এবং অর্থ উপার্জন করেই ফিরব। আমার দৃঢ় ধারণা তোমার আশীর্বাদে আমি তাতে সফল হব।

মা বললেন, তুমি ব্যবসায়ের কিছুই জান না। তাছাড়া দূর বিদেশে একা একা তুমি কি করে থাকবে? এখানে আমরা দু'জনে আছি। তাই তোমার যত্ন করতে পারব।

আমি বললাম, মা, তুমি ও কথা বলো না। আমি শ্রেষ্ঠী ভানুর পুত্র। কিছু না করে আমি এখানে কি ভাবে থাকতে পারি? তুমি বিষয়টিকে এভাবে দেখ ও আমায় যেতে দাও।

মা বললেন, ভালো। এ বিষয়ে আমি তোমার মামার সঙ্গে একবার কথা বলি।

মামা আমার কথায় সহমত হলেন। তবে তিনি নিজেও আমার সঙ্গে যাবেন বললেন।

তারপর এক শুভ দিনে আমরা যাত্রা করলাম ও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উষীরাবর্তর নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামের বাইরেই আমাকে অপেক্ষা করতে বলে মামা গ্রামে গেলেন ও খানিক বাদেই একটি লোক সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। তার হাতে গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র, অলঙ্কার আদি ছিল। আমি তখন নদীতে স্নান করলাম ও জিন মন্দিরে গিয়ে জিনোপাসনা করলাম। জিনোপাসনা শেষ হলে গ্রামে প্রবেশ করলাম। গ্রামে সকলকেই সচ্ছল বলে মনে হল। ব্যবসা করে তারা বেশ দু'পয়সা করেছিল।

মোড়ের মাথায় যে বাড়ী ছিল সেই বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম ও সাধারণ ভোজনালয়ে আহারাদি শেষ করলাম। সেই রাত্রি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে করতে অতিবাহিত করলাম।

পরদিন সকালে আমার মামা আমায় বললেন, চারু এই গ্রামের নাম দিকসংবাহ। ব্যবসার এটি একটি কেন্দ্র। এখানে কয়েক ঘর বণিক বাস করে যাদের সঙ্গে তোমার বাবার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তুমি তাদের কাছে কিছু অর্থ ঋণ নাও।

আমি ঋণ নিলাম না। আমার হাতে তখনো যে বহুমূল্য আংটি ছিল সেইটি বিক্রয় করে ব্যবসা আরম্ভ করলাম ও ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করলাম।

একবার আমার মামা বিদেশাগত বস্তু তুলো কিনলেন। সেই তুলো ও সুতো যে ঘরে রাখা ছিল, সে ঘরে রাত্রে ইঁদুরে জলন্ত প্রদীপ উলটে দেওয়ায় সলতের আগুনে তাতে আগুন ধরে গেল। ঘর হতে আমরা কোন মতে বার হতে পারলাম কিন্তু

অধিকাংশ তুলো ও সুতোই পুড়ে গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা যা বাঁচানো সম্ভব ছিল তা বাঁচাতে আমাদের সাহায্য করল ও সান্ত্বনা দিল।

বিক্রয়ের জন্য আমরা আবার তুলো ও সুতো ক্রয় করলাম। গাড়ীতে সেই মাল বোঝাই করে সার্থবাহদের সঙ্গে উৎকল হয়ে তাম্রলিপ্ত যাবার জন্য যাত্রা করলাম। পথে এক অরণ্য পেলাম। রাত্রের জন্য অরণ্যের বাইরে বাঁশ ঝাড়ের কাছে আমাদের তাঁবু ফেলা হল। সঙ্গে আরক্ষক ছিল তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম।

কিন্তু সন্ধ্যের পর পর দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করল। কিছুক্ষণ আমাদের আরক্ষকেরা দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করল কিন্তু সার্থবাহের অন্যান্য লোকেদের মত তারাও ধীরে ধীরে পলায়ন করল। দস্যুরা তখন সার্থবাহের দ্রব্যাদি লুট করে নিল ও আমাদের তুলোর গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই গোলমালে মামার সঙ্গ হতে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না। বনভূমি এমনিতেই অন্ধকার ছিল এখন সমস্ত কিছু ধূমাচ্ছাদিত হওয়ায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দূর হতে বাঘের হুঁকারও শোনা যেতে লাগল। আমি তাই ভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম।

সেই আগুন ক্রমশঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই আগুনে শাল পিয়াল আদি বড় বড় গাছের সঙ্গে ঝোঁপ ঝাড় পুড়তে লাগল। আমি ভয়ে সামনের দিকে ছুটতে থাকলাম। সেই সময় এক ক্ষপণকের সঙ্গে আমার দেখা হল। সে সেই বন উত্তীর্ণ হতে আমায় সাহায্য করল।

আমি বন পার হয়ে এলাম কিন্তু মামার কোনো সন্ধানই পেলাম না। তখন চিন্তা করতে লাগলাম যে আমার হতাশ হলে চলবে না। কারণ সম্পদ পুরুষাকারের দ্বারাই লাভ করা যায়। আর আমায় অর্থ উপার্জন করেই ঘরে ফিরতে হবে। তাই সামনের দিকেই আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম।

এভাবে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে প্রিয়ঙ্গুপট্টনের বাজারে যখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন প্রিয়দর্শন মধ্যবয়স্ক একটি লোক আমায় ডাক দিয়ে বলল, তুমি শ্রেষ্ঠী ভানুর পুত্র চারু না?

আমি বললাম, হাঁ।

সে তখন আমায় জড়িয়ে ধরল ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে আমায় তার দোকানে নিয়ে গেল।

দোকানে বসে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলল, চারু, আমি সমুদ্র বণিক। নাম সুরেন্দ্র দত্ত। আমি তোমার বাবার অধীনে কাজ করেছি। আমি শুনেছিলাম যে শ্রেষ্ঠী শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করেছেন আর তুমি এক গণিকাগৃহে বাস করছ। চারু, এখন বল তুমি এখানে কিজন্য এসেছ?

আমি তাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই বললাম। সে তখন বলল, চারু ধৈর্য হারিও না। আমার যে ধন আছে সে তোমারই এবং আমাকেও তোমার অধীন মনে করবে।

সে আমায় তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে স্নানাহারের পর আমি তাকে বললাম, সুরেন্দ্র, তুমি আমায় এক লক্ষ কার্ষাপণ ধার দাও, সময়ে সব শোধ করে দেব।

সে আমায় সহাস্যে এক লক্ষ কার্ষাপণ ধার দিল।

তার ওখানে আমি আমার নিজের ঘরেই রয়েছি বলে মনে হচ্ছিল। সেখানে আমি এক জাহাজ তৈরী করালাম ও তা পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করলাম। যারা আমার সঙ্গে যাবে তারাও তৈরী হয়ে এল। আমার কুশল সংবাদ মামার বাড়ীতেও পাঠান হল। রাজাদেশে বন্দর ত্যাগের অনুমতি পত্রও সংগৃহীত হল। তারপর শুভ লক্ষণ প্রকটিত ও অনুকূল বাতাস প্রবাহিত হলে আমরা জাহাজে উঠলাম। ধূপ প্রজ্বালিত করে চীন দেশের জন্য আমরা রওয়ানা হলাম। সমুদ্র যাত্রার সময় সমগ্র পৃথিবীকেই আমার জলময় বলে মনে হচ্ছিল।

চীনদেশে বাণিজ্য করে আমি সুবর্ণদ্বীপে এলাম। সুবর্ণ দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের বন্দরগুলি স্পর্শ করে কমলপুরে গেলাম, সেখান হতে সিংহলে এলাম। সিংহল দ্বীপ হতে বব্বর ও যবন দেশে গেলাম। সেখানে আমি আট কোটি কার্ষাপণ আয় করলাম। সেই অর্থ দিয়ে আমি পণ্যদ্রব্য কিনলাম—সই পণ্যদ্রব্য ভারতে বিক্রয় করলে তার মূল্য হবে ষোল কোটি কার্ষাপণ।

সেই পণ্য নিয়ে আমি সৌরাষ্ট্রের উপকূলের দিকে যাত্রা করলাম। সৌরাষ্ট্রের কূলে পৌঁছলাম কিন্তু সেই সময় এক সামুদ্রিক ঝড়ে আমাদের জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এক কাঠের তক্তা আশ্রয় করে আমি সাত রাত্রি জলে ভাসতে থাকলাম। অষ্টম দিন প্রভাতে আমি উম্বরবতীর কূলে নিক্ষিপ্ত হলাম। আমি যখন সমুদ্র হতে বার হলাম তখন আমার শরীর লবণজলে সাদা হয়ে গিয়েছিল। হাঁটবার সামর্থ ছিল না তাই এক গাছের তলায় পড়ে রইলাম।

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. VII No. 7 Sraman November 1979

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

অগ্রহায়ণ । ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । । অষ্টম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ ॥ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

সেতুসহ জলমন্দির, পাবাপুরী

বিহারের পাবাপুরে পদ্মসরোবরে মহাবীরের চরণ-চিহ্ন দেখে

শ্রীরামজীবন আচার্য

জীবনে বসন্ত দিনে বসুধার করুণ ক্রন্দনে
ব্যাকুল বিহ্বল হ'য়ে বর্দ্ধমান, রাজার কুমার
বিসর্জিয়া সর্বসুখ তপস্যার কঠিন সাধনে
মহাবীর হ'লে তুমি ঃ জাগে হৃদে বিস্ময়-পাথার।

তোমার তপের সাক্ষী বনভূমি হিংস্র বনচর
তা হেরি' পাষাণ বুঝি মগধের মৃত্তিকা সজল
ব্রতের বিশাল ভার হেরিয়াছে বৈভার ভূধর
শিষ্যের প্রথম মেলা সু-উন্নত বিপুল অচল।

অমল কমলসম মহাবীর জীবন তোমার
কৃচ্ছ্রব্রতের হোমানলে ধরিত্রীর আর্তি দূর লাগি
বিলীন করিয়া গে'ছ ; গন্ধ তার মধুর অপার
আকাশে বাতাসে ভাসে সবাকার প্রেম ভিক্ষা মাগি।

তোমারে লভিয়া ধন্য মগধের গিরি-দরী-বন
তোমারে লভিয়া ধন্য ভারতের ধূলির কণিকা
তোমারে লভিয়া ধন্য ধরণীর স্থাবর-জঙ্গম
যেখানে ছড়ায়ে দে'ছ অহিংসার অমূল্য মণিকা।

তোমার সাধনযত্ন নিজ হিতে কখনো যে নয়,
যতেক তোমার সুখ পৃথিবীরে প্রেম-প্রীতি দিতে ;
পর্বত-অরণ্য-নদী সমতল জনপদাশ্রয়
পর্যটন করিয়াছ অহিংসার সুধা বিতরিতে।

জীবন সায়াহ্নে বুঝি নিলে স্থান পুণ্য পাবাপুরে
পাবা নয় অপাপা যে পেয়ে তোমা অপাপ-সুন্দর
তোমার চরণপদ্ম বিকশিত পদ্ম সরোবরে
সাধু জন চিত্ত অলি ধায় ঐ পাদপদ্ম 'পর।

হিংসাপঙ্কে প্রস্ফুটিতে প্রেমপদ্ম ক্লিন্না ধরণীর
অর্ঘ্য র'চেছে তব জীবনের চারু শতদল
প্রফুল্ল পঙ্কজপুঞ্জে পূরে যথা পাবা-দীঘি-নীর
তেমনি উঠুক ফুটে স্বপ্ন তব কঠিন-কোমল ॥

সে এক সন্ধ্যার শেষে

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

সে এক সন্ধ্যার শেষে
সঙ্গহীন সৌম্য পরিবেশে
হে অর্হৎ, দেখেছি তোমাকে—
তোমার সে প্রতিমাখানি
আসন্ন আঁধারে
আপনার পরম প্রকাশে
দেবে কি আমাকে
করুণার শাশ্বত আলোক,
যেখানে নিখিল বিশ্ব
আর সব পরমাণু
বেদনার্ত থাকে।
প্রার্থনার এ সংলাপ
হৃদয় মাঝারে
একান্তে স্মরিছে তোমারে
হে তীর্থঙ্কর! তোমার চরণে
ঝরুক সে পুষ্প হ'য়ে
বারে বারে—
চেতনার মর্ম্মমাঝে
দেখেছি তোমাকে
অতীতের ভগ্ন দেবালয়ে
এক আশ্চর্য সন্ধ্যার শেষে
নামহীন পর্বতের নির্জন দুয়ারে।

পুরুলিয়া, ২১, ১১, ৭৯

মহাবীরের জন্যে

শ্রীমতী ফুল্লরা গঙ্গোপাধ্যায়

মুক্ত করিতে আর্ত জীবেরে
আসিলে যে সংসারে—
প্রণাম তোমায় জানাই যে তাই
জানাই যে বারে বারে ॥
অমৃত করিতে প্রাণী
মুক্ত করিতে গ্লানি
তোমার অমৃত বাণী
প্রবাহিত হল করুণা ধারায়
শত সহস্র ধারে ॥
ঘুচাতে মনের কালো
তোমার জ্ঞানের আলো
উজ্জ্বল করে জ্বালো
প্রেম-সঙ্গীত বাজিবে সবার
হৃদয় বীণার তারে ॥

সংবৎ-অব্দ

হরিসত্য ভট্টাচার্য

অধুনা ১৯৮১ সংবৎ-অব্দ চলিতেছে।[১] ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের বিশ্বাস, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য শকগণকে পরাভূত করিয়া বিজয় গৌরব কাহিনী চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি অব্দের প্রচলন করেন। উহাই বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সংবৎ নামে চলিয়া আসিতেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার ফলে এক্ষণে উক্ত ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিগণিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আগমন করেন; তাঁহার বর্ণনানুসারে মহারাজ শীলাদিত্যের রাজ্যকাল ৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। বিক্রমাদিত্য শীলাদিত্যের অব্যবহিত পূর্বেই রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, ইহাও হুয়েন সাঙ্ বলিয়াছেন। অতএব এ হিসাবে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কল্হন বলিয়াছেন মহারাজ কনিষ্ক ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ৩০ জন রাজার রাজ্যকাল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী কনিষ্কের রাজ্যকাল বলিয়া ধরিয়া লইলে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভূত হইতে পারেন না। বিক্রমাদিত্যের সভার 'নবরত্ন' সুপ্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে বরাহমিহির, বররুচি ও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস অন্যতম। ডক্টর ভাও দাজীর মতে বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। বররুচি প্রাকৃত ভাষায় একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেই প্রাকৃত ভাষায় পুস্তকাদি প্রণীত হইতে থাকে; সুতরাং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বররুচি উক্ত ভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। মহাকবি কালিদাস বৌদ্ধাচার্য দিঙনাগের সমসাময়িক ও প্রতিযোগী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; অনেক পণ্ডিতের ধারণা দিঙনাগাচার্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; সুতরাং মহাকবিও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বররুচি, কালিদাস ও বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইলে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ বিক্রমাদিত্যও উক্ত শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন, ইহাও মানিতে হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্মন সুবিশ্রুত মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ইহা আলবেরুণির পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

১ এখন ২০৩৬ সংবৎ। প্রবন্ধটী ৫৫ বছর পূর্বে লিখিত হয়।—সম্পাদক

ডক্টর ফ্লীট বলেন কাশ্মীরপতি মিহিরকুল ও তদীয় পিতা তোরামন শক জাতির হুন-কুলেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। যশোধর্মদেব বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত। অতএব বিক্রমাদিত্যের শক বিজয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা বলিয়া ধরিতে হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যদি বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা ছিলেন, তাহা হইলে তন্নামাঙ্কিত সংবৎ-অব্দ কিরূপে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ হইতে প্রবর্তিত হইতে পারে? তদুত্তরে অধ্যাপক ফ্লীট বলেন—সংবৎ অব্দ মালব-জাতির একটী অব্দ ছিল এবং ইহা খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৭ অব্দ হইতেই মলবীরগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরে যখন পরাক্রান্ত যশোধর্মদেব হুনগণকে পরাভূত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন উক্ত মালবাব্দ তাঁহার নামাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল। সংবৎ অব্দ পূর্বে মালবাব্দ নামেই পরিচিত ছিল, তদ্বিষয়ে একটি শিলালিপি মান্দাসোর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধিয়ারাজ্যের অন্তর্গত দাসপুর গ্রামে মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ একটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় যে বহু শতাব্দী পূর্বে ঐ স্থানে গুজরাট হইতে কতকগুলি রেশম ব্যবসায়ী আসিয়া ব্যবসায় স্থাপন করেন; পরে যখন কুমারগুপ্ত ভারতের সম্রাট পদে আসীন ছিলেন এবং দাসপুরে বিশ্ববর্মার পুত্র বন্ধুবর্মা রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে উক্ত বণিকগণ ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দির নির্মাণের কাল সম্বন্ধে উক্ত শিলালিপিতে বর্ণিত আছে—

মালবানাং গণস্থিত্যা যাতে শতচতুষ্টয়ে
ত্রিনবত্যাধিকেব্দানাং ঋতৌ সেব্যঘনস্বনে।

মালবগণের ৪৯৩ অব্দ গত হইলে, বর্ষাঋতুকালে।

ডাঃ ফ্লীট বলেন উক্ত মন্দির ৪৯৩ মালবাব্দে (যাহাকে এক্ষণে সংবৎ বলা হয়) অর্থাৎ ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। তখনও যশোধর্মদেব আবির্ভূত হয়েন নাই। এবং তাঁহার শক বিজয় তখনও শতাধিকবর্ষের পরের ঘটনা, এই জন্য উক্ত অব্দ তখনও মালবাব্দ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহ সত্ত্বেও অনেকে সংবৎকর্তা বিক্রমাদিত্যকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা বলিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য নামে অনেক রাজাই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। গুপ্ত বংশীয় একাধিক সম্রাট বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতারং হুয়েন সাঙ কথিত বিক্রমাদিত্যই যে সম্বৎ প্রবর্তক তৎসম্বন্ধে প্রমাণ নাই। তারপর ঐতিহাসিক কলহনের সময় নির্দেশে বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কারণ তিনি কাশ্মীররাজ গোনর্দকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া কলির ৬৫৩ বৎসর গতে তাঁহার রাজ্যকাল নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা একটা বিষম সমস্যা। কনিষ্কের রাজ্যকাল সম্বন্ধে কলহন

একস্থানে বলিয়াছেন—'বুদ্ধের নির্বাণের পর হইতে কণিষ্ক প্রভৃতির রাজ্যকালে ১৫০ বৎসর অতীত হইয়াছিল।' বুদ্ধের নির্বাণ ৪৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধরিয়া লইলে খ্রীঃ পূঃ ৩০০।৩৫০ অব্দে কণিষ্কের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। এ হিসাবে কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নৃপতি হইতে পারেন না এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যকেও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা যায় না। বরাহমিহিরের সময় সম্বন্ধে ডক্টর ভাওদাজীর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যগণ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই প্রাদেশিক ভাষায় উপদেশাদি দান করিতেন। সুতরাং বররুচি প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণ যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পুস্তক তাহা স্বীকার না করিবার কারণ আছে। কালিদাসের সমসাময়িক বৌদ্ধাচার্য দিঙনাগ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ধর্মকীর্তি দিঙনাগের কৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; ধর্মকীর্তির উক্ত টীকা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল; সুতরাং দিঙনাগাচার্য ও কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বের লোক। বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন অমর সিংহের গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এ হিসাবেও অমর সিংহ ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়; ভারতবর্ষে শক অভিযান অনেকবারই হইয়াছে এবং অনেকবারই শকগণ পরাভূত হয়; সুতরাং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে যে কখনও অন্য কোনও নৃপতি শকগণকে দূরীভূত করেন নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

যশোধর্মদেব শকগণকে পরাভূত করিয়া স্বনামে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত না করিয়া একটি প্রচলিত অব্দকে স্বনামাঙ্কিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভারতবর্ষে কণিষ্ক, শালিবাহন, যুধিষ্ঠির, গুপ্তরাজ প্রভৃতি রাজগণের প্রবর্তিত বহু অব্দের প্রচলন হইয়াছিল; এরূপস্থলে বিজয়ী যশোধর্মদেব, আপন নামে নূতন অব্দের প্রবর্তন না করিয়া একটা প্রচলিত অব্দকে স্বনামে চালাইয়া ইতিহাসের বিপর্যাস সাধন করিবেন, ইহা অসম্ভব। মান্দাসোরের শিলালিপি হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে যশোধর্মদেব, মালবাব্দকে স্বনামাঙ্কিত করিয়াছিলেন; উহা হইতে উক্ত অব্দ তাঁহার পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত ছিল, ইহাই সপ্রমাণ হয়।

বিক্রমাদিত্য সংবৎ অব্দের প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত অব্দ তাঁহার শক বিজয় ব্যাপার চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল, ইহাই জনসাধারণের ধারণা, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে (খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে) বিক্রমাদিত্য নামে উজ্জয়িনীতে কোনও রাজা ছিলেন কিনা; তিনি কোনও শক সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিলেন কিনা এবং স্বনামে কোনও অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন কিনা?

প্রাচীন আভিধানিক জটাধর বলিয়াছেন—

বিক্রমাদিত্যঃ স্বনামখ্যাতঃ রাজা। স চ সংবৎকর্তা।
তৎপর্যায়ঃ সাহসাঙ্কঃ শকারিঃ।

বিক্রমাদিত্য একজন স্বনামখ্যাত রাজা, তিনি সংবৎ প্রবর্তন করেন। তাঁহার অপর নাম সাহসাঙ্ক ও শকারি।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজা শকগণের শত্রু ছিলেন এবং তিনিই সংবৎ অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। নাসিক নগরের সন্নিকটে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমাদিত্য 'সাহসাঙ্ক' ও 'শকারি' নামে পরিচিত হইয়াছেন। উক্ত শিলা ফলক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সুতরাং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে যে একজন শক-বিজেতা বিক্রমাদিত্য ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্‌শককারকানৃপাঃ॥
যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪

উপরোদ্ধৃত বচনে বিক্রম একজন শকাব্দ প্রবর্তক নৃপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যকাল যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৪ বৎসর পরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত মত অনুসারে বর্তমানে ৫০২৫ বৎসর কলি গতাব্দ বলিয়া ধরিলে ৫০২৫ – ৩০৪৪ = ১৯৮১ বৎসর পূর্ব অর্থাৎ ১৯৮১ – ১৯২৪ = ৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। রাজবলিগ্রন্থেও বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল অবিকল এইরূপ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে বিক্রমাদিত্যনামা সংবৎ প্রবর্তক রাজসিংহ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি দুর্বৃত্ত শকগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচীন জৈন গ্রন্থ সমূহে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে।

অতীতের বিস্মৃত দিবসে যে পুরুষপ্রবর রাজদণ্ড গ্রহণপূর্বক উৎপীড়ক শকগণের হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া দেশমধ্যে কাব্য দর্শন বিজ্ঞান গণিত জ্যোতিষাদির আলোক ছড়াইয়াছিলেন—বেদপন্থী আর্যগণ সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে যেমন শত কথা-উপকথার সাহায্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় জৈন সম্প্রদায়ও ঠিক তেমনিভাবে তাঁহাকে অর্হৎ পন্থিগণের মধ্যে বরেণ্য আসন প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ধর্মপ্রাণ জৈনগণ আজিও সন্ধ্যাবন্দনার পূর্বে সঙ্কল্প মন্ত্রের সহিত

'সম্মার্গ প্রবর্তনে বিক্রমার্ক' মন্ত্র উচ্চারণ করেন। উক্ত সঙ্কল্প মন্ত্রে বিক্রমাদিত্যকে জৈন সম্প্রদায়সমাদৃত মহারাজ শ্রেণিকের তুল্যাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

জৈনমতে সিদ্ধসেন দিবাকর নামক জৈনাচার্য মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে জৈন মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এ প্রবাদের যাথার্থ্য যাহাই হউক না কেন—ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার মূল্য আছে। প্রথম কথা এই যে, যে বিক্রমাদিত্যকে সনাতন সদ্ধর্মের পালক ও পরিপোষক বলিয়া বেদপন্থিগণ সমাদর করিয়া থাকেন, যদি সেই রাজঋষভই অর্হন্মতে আস্থাবান প্রতিপন্ন হয়েন তাহা হইলে প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্ম লইয়া কোনও দ্বেষ বা কলহ ছিল না ইহা স্বীকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত জৈন প্রবাদের ভিতর বিক্রমাদিত্যের সভাসদ 'নবরত্নে'র মধ্যে একটী রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মহাকবি কালিদাস কবিজগতের উজ্জ্বলতম রত্ন। অমর কোষ অমর সিংহকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ঘটকর্পর কাব্য নামে ঘটকর্পর প্রণীত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। গণিতশাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট বরাহমিহির সুপরিচিত। বররুচির প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধন্বন্তরি সুচিকিৎসক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অবশিষ্ট রত্নদ্বয় বেতালভট্ট ও ক্ষপণকের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে জৈন সাধুগণ ক্ষপণক নামে অভিহিত হইতেন। মুদ্রারাক্ষসনাটকে ও অবদান কল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থে ক্ষপণক শব্দ জৈন সাধু অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষপণক অর্থ লজ্জাহীন ; জৈনসাধুগণ দিগম্বর ছিলেন বলিয়া হয়ত তাঁহারা ক্ষপণক আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ক্ষপণক শব্দের অপর অর্থ 'সহনশীল' ; কঠোর তপশ্চরণের জন্য হয়ত জৈন মুনিগণকে ক্ষপণক বলা হইত। ফলতঃ ক্ষপণক শব্দের অর্থ জৈন সাধু। আমাদের মনে হয়—ক্ষপণক নামীয় বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ যে রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় না আচার্য সিদ্ধসেন দিবাকরই সেই রত্ন। জৈন সাহিত্যে, আচার্য সিদ্ধসেন দিবাকর প্রকৃতই দিবাকর সদৃশ ছিলেন। 'ন্যায়াবতার' নামক প্রাচীন জৈন ন্যায়গ্রন্থ তাঁহার নাম অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। 'সম্মতি-তর্ক' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত দর্শনগ্রন্থের তিনিই কর্তা। সিদ্ধসেন কুমুদাচার্য নামেও পরিচিত। কথিত আছে, তিনি স্ব-রচিত 'কল্যাণ মন্দির স্তব' উচ্চারণ করিয়া উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল মন্দিরের রুদ্রলিঙ্গের মধ্য হইতে পার্শ্বনাথ মূর্তি আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। কামরূপপতি বিজয় বর্মা কর্মর নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আচার্য সিদ্ধসেন রাজা দেবলালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এতাদৃশ অদ্ভুতশক্তি-সম্পন্ন বিদ্বদ্বর জৈনাচার্য সিদ্ধসেন যদি বিক্রম-সভার অন্যতম রত্ন (ক্ষপণক) বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

প্রাচীন জৈন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হয় যে বীরনির্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে আচার্য সিদ্ধসেন দিবাকর উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যকে জিন ধর্মে দীক্ষিত করেন। এক্ষণে

বীরনির্বাণ সংবৎ ২৪৫০ চলিতেছে। অতএব অদ্য হইতে ২৪৫০ – ৪৭০ = ১৯৮০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮০ – ১৯২৪ = ৬৫ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অর্হদ্ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হয়। সুতরাং এ মতেও খ্রীঃ পূর্ব ৫৬।৫৭ অব্দে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল সপ্রমাণ হয়। প্রাচীন জৈনাচার্য মেরুতুঙ্গ, ধর্ম সাগর ও জিন বিজয়গণির মতে—

যে রজনীতে অর্হৎ তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্বাণগত হয়েন সেই রজনীতে রাজা পালক অবন্তীরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ; রাজা পালক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নন্দরাজগণ ১৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে মৌর্যগণ ১০৮ বৎসর ও পুষ্যমিত্র ৩০ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বলমিত্র ও ভানুমিত্র ৬০ বৎসর এবং রাজা নভোবাহন ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৩ বৎসর ধরিয়া গর্দ্দভীলের এবং ৪ বৎসর ধরিয়া শক রাজগণের রাজত্ব। এ হিসাবে মহাবীরের নির্বাণের ৬০ + ১৫৫ + ১০৮ + ৩০ + ৬০ + ৪০ + ১৩ + ৪ = ৪৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীঃ পূর্ব ৫৬।৫৭ অব্দে শকরাজগণের অবসান হয়।

প্রদ্যুম্ন সূরি বিরচিত 'প্রভাবক চরিত' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয়। যৎকালে মহারাজ সাতবাহন প্রতিষ্ঠান নগরে এবং রাজা মুরুণ্ড পাটলিপুত্র নগরে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে উজ্জয়িনী রাজ্যে গর্দ্দভীল রাজত্ব করিতেন। রাজা গর্দ্দভীল কামপীড়িত হইয়া জৈনাচার্য কালকাচার্যের ভগিনীর সতীত্ব নাশে উদ্যত হয়েন। আচার্য প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া শকগণকে উজ্জয়িনী রাজ্য আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। পরে বীরবর বিক্রম বাহুবলে শকগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং স্বনামে সংবৎ অব্দের প্রবর্ত্তন করেন। প্রভাবক চরিত গ্রন্থে সিদ্ধসেন দিবাকর কালকাচার্যের সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং মহারাজ বিক্রমাদিত্য শকগণকে দূরীভূত করেন এবং তিনিই সংবৎ অব্দের প্রতিষ্ঠাতা ইহা প্রাচীন জৈন গ্রন্থাদি দ্বারাও প্রমাণিত হইয়া থাকে।

জিনবাণী, আশ্বিন, ১৩৩১

জৈন শাস্ত্রে ধ্যান

পূরণ চাঁদ সামসুখা

আত্মার অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে আত্মা কি কারণে জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে এবং কি উপায়ে এই সংসার চক্র হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। যে সকল শাস্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই এই প্রশ্নের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছে। জৈন শাস্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর জৈন শাস্ত্রেও তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্র বলে যে আত্মা অনাদিকাল হইতে কর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে। যখন যে কর্ম উদয়ে আগত হইয়া ফল প্রদান করে তখন সেই কর্মের প্রভাবে প্রত্যেক জীবের নানা প্রকার রাগদ্বেষরূপ বিকারের উৎপত্তি হয় এবং সেই বিকার সমূহের জন্য আবার নবীন কর্মের বন্ধন হয় ও বদ্ধকর্মের ফলে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে করিতে সংসার চক্রে আবর্তিত হইতে হয়।

এই সংসার চক্রে ভ্রমণের অন্ত কি করিয়া হয়? জৈন শাস্ত্র বলে যে নবীন কর্মের আগমনকে নিরুদ্ধ ও পূর্ববদ্ধ সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করিতে পারিলে কর্মের আবরণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও আত্মার বিকাশ সাধিত হয়। এইভাবে আত্মার যখন পূর্ণ বিকাশ হয়—যখন আত্মার সম্পূর্ণ কর্মাবরণ ক্ষয় হইয়া যায়—তখন আত্মার স্ব-ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয় এবং তাহার সংসার-ভ্রমণের অন্ত হইয়া যায়। নবীন কর্মের আগমনের নিরোধকে জৈন পরিভাষায় 'সংবর' ও সঞ্চিত কর্মের ক্ষয়কে 'নির্জরা' বলে। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত ও রাগদ্বেষের পরিণামকে নিরোধ করিয়া সৎ চিন্তার দ্বারা 'সংবর' এবং তপস্যার দ্বারা 'নির্জরা' সাধিত হয়।

তপস্যা দুই প্রকার : বাহ্য ও আভ্যন্তর। উপবাসাদি বাহ্য তপস্যা এবং প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও ধ্যানাদি আভ্যন্তর তপস্যা। সমস্ত প্রকার তপস্যার মধ্যে ধ্যানই প্রধান। তপস্যার অন্যান্য প্রকারকে ধ্যানের সহায়ক মাত্র বলা যাইতে পারে। অতএব কর্মাবরণ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে ধ্যান একান্ত আবশ্যক।

জৈন শাস্ত্র মতে—কোন এক বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তিকে স্থাপন করাকে ধ্যান বলে। বিভিন্ন দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুর মুখে স্থাপিত দীপশিখা যেমন ক্রমাগত প্রকম্পিত হইতে থাকে তদ্রূপ আমাদের মানসিক চিন্তাধারাও ক্ষণে ক্ষণে বিষয় হইতে

বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে থাকে। এইরূপ অস্থির চিন্তাধারাকে অন্যান্য সমস্ত বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া কোন এক বিষয়ে নিবদ্ধ করাকে ধ্যান কহে। সকল মনুষ্যই ধ্যানের অধিকারী নয়—অর্থাৎ সকল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধ্যান করা সম্ভব নয়। কোন এক বিষয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে যতটা মানসিক শক্তির প্রয়োজন তাহা প্রাপ্ত হইতে হইলে উপযুক্ত শারীরিক সামর্থ্যেরও প্রয়োজন ; কারণ শারীরিক বলের সহিত মানসিক বলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি শরীরে দুর্বল, সে মনেও দুর্বল। এই কারণে জৈন শাস্ত্র বলে যে উত্তম 'সংহনন'[১] সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ধ্যান করা সম্ভব। সংহনন শব্দের অর্থ অস্থি-সন্ধির গঠন। যাহার অস্থি-সন্ধি সুদৃঢ়ভাবে সন্ধিত তাহাকে উত্তম সংহনন-সম্পন্ন ব্যক্তি বলা যায়, এবং এরূপ ব্যক্তিই ধ্যানের প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু অনুত্তম সংহননবিশিষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে যে মনকে একাগ্র করা একেবারেই অসম্ভব তাহা নয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিও কিছুক্ষণের জন্য চিত্তকে কতকটা একাগ্র করিতে পারে, কিন্তু তাহার মানসিক স্থৈর্য এত কম হয় যে তাহাকে প্রকৃত ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অতএব সুদৃঢ় শারীরিক গঠনসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা তাহার চিন্তাধারাকে কোন এক বিষয়ে একাগ্র করাকে ধ্যান বলে।

যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তিকে নিবদ্ধ করা যায় তাহা সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারই হইতে পারে। অসৎ বিষয়ে চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া সেই বিষয়ে চিন্তা-ধারা প্রবাহিত করিলে তাহা কর্মক্ষয়ের কারণ না হইয়া বরং কর্মবন্ধের এবং তজ্জন্য সংসার ভ্রমণেরই কারণ হয় বলিয়া এরূপ ধ্যানকে দুর্ধ্যান বলে। দুর্ধ্যান দুই প্রকার : আর্ত ও রৌদ্র।

আর্তি শব্দের অর্থ দুঃখ, পীড়া। দুঃখজনিত যে চিন্তা তাহা আর্তধ্যান। অনিষ্ট বা অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ, ইষ্ট বা প্রিয় বস্তুর বিয়োগ, প্রতিকূল বেদনা ও ভোগের লালসা—এই চারি প্রকার কারণে মানুষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে আর্তধ্যান চারি প্রকার। যথা : অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য যে চিন্তা তাহা প্রথম 'অনিষ্ট-সংযোগ' আর্তধ্যান, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে তাহা প্রাপ্তির জন্য যে চিন্তা তাহা দ্বিতীয় 'ইষ্ট-বিয়োগ' আর্তধ্যান ; দুঃখ বা বেদনা উপস্থিত হইলে তাহা দূর করিবার জন্য যে চিন্তা তাহা তৃতীয় 'রোগ-চিন্তা' আর্তধ্যান ; এবং উৎকট ভোগ-লালসা তৃপ্তির নিমিত্ত অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য যে চিন্তা তাহা চতুর্থ 'নিদান' আর্তধ্যান।

যাহা ক্রূর ও কঠোর তাহা রৌদ্র। ক্রূর ও কঠোর চিন্তাকে রৌদ্র ধ্যান বলে। রৌদ্র ধ্যানও চারি প্রকার : হিংসা করিবার প্রবৃত্তিজনিত যে চিন্তাধারা তাহা প্রথম

১ 'উত্তম-সংহননস্যৈকাগ্র-চিন্তা-নিরোধো ধ্যানম্'।—তত্ত্বার্থসূত্র, ৯।২৭। সর্বাপেক্ষা উত্তম সংহননকে জৈন পরিভাষায় 'বজ্রর্ষভ-নারাচ-সংহনন' বলে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে উল্লিখিত 'বজ্র-সংহননে'র (৩।৪৬) সহিত তুলনীয়।

'হিংসানুবন্ধী' রৌদ্রধ্যান ; মিথ্যা ভাষণ করিবার প্রবৃত্তিজনিত যে চিন্তাধারা তাহা দ্বিতীয় 'অনৃতানুবন্ধী' রৌদ্রধ্যান ; চুরি করিবার প্রবৃত্তি জন্য যে চিন্তাধারা তাহা তৃতীয় 'স্তেয়ানুবন্ধী' রৌদ্র ধ্যান এবং প্রাপ্ত বিষয়কে রক্ষা করিবার জন্য যে চিন্তাধারা তাহা চতুর্থ বিষয়সংরক্ষাণুবন্ধী' রৌদ্র ধ্যান। আর্ত ও রৌদ্র ধ্যানের দ্বারা সংসার ভ্রমণের বৃদ্ধি হয় বলিয়া এই দুইটি দুর্ধ্যান—হেয় ও পরিত্যাজ্য।

যেরূপ ধ্যানের প্রভাবে আত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া কর্মক্ষয়ের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তদ্রূপ ধ্যানকে সুধ্যান বা শুভধ্যান বলে। এইরূপ সুধ্যানই আদরণীয় ও আচরণীয়। সমত্ব অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীতে সমভাব অবলম্বনপূর্বক ধ্যান আরম্ভ করা উচিত। সমত্বের অভাবে প্রকৃত ধ্যান হয় না।[২] আবার ধ্যানের পুষ্টি সাধন করিবার জন্য মৈত্রী, প্রমোদ, কারুণ্য ও মাধ্যস্থ্য[৩] এই চারিপ্রকার ভাবনা অর্থাৎ চিন্তা করা উচিত। কোনও প্রাণী যেন পাপাচরণ না করে, কোনও প্রাণী যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হয়, জগতের সমস্ত প্রাণীই যেন মুক্তি লাভ করে এরূপ যে চিন্তা তাহাকে 'মৈত্রী ভাবনা' বলে। যাঁহার সমস্ত দোষ অপগত হইয়াছে, যিনি যথাস্থিত বস্তুতত্ত্ব অবগত আছেন, এরূপ মহাত্মার শম, দমাদি গুণরাশির চিন্তা ও কীর্তনকে 'প্রমোদ ভাবনা' বলে। দীন, আর্ত, ভীত ও মৃত্যুভয়ে কাতর প্রাণীর দুঃখ, কষ্ট বা ভয়ের প্রতিকার করিবার ইচ্ছাকে 'কারুণ্য ভাবনা' বলে। যাহারা ক্রূরকর্মী দেব গুরুর নিন্দক, নিজের অযথা প্রশংসায় মুখর এরূপ ব্যক্তিকে সংশোধনের অতীত মনে করিয়া তৎপ্রতি দ্বেষ না করিয়া উপেক্ষা অবলম্বন করাকে 'মাধ্যস্থ্য ভাবনা' বলে। এই চারি প্রকার ভাবনা ধ্যানের পুষ্টি সাধন করে।

সুধ্যান ও শুভধ্যান দুই প্রকার : ধর্মধ্যান ও শুক্লধ্যান। ধর্মধ্যান আবার চারি প্রকার : 'আজ্ঞা বিচয়', 'অপায় বিচয়', বিপাক বিচয়' ও 'সংস্থান বিচয়'। বীতরাগ তীর্থঙ্করের আদেশ কি তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য চিন্তা করা ও তীর্থঙ্করের আজ্ঞা অবগত হইয়া তাহার অর্থাদির বিষয়ে চিন্তা করাকে 'আজ্ঞা বিচয়' ধ্যান বলে। পদার্থের গুণ, পর্যায়, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করাও এই ধ্যানের অন্তর্গত। আমার আত্মা ক্রোধ, মান, মায়া, মোহের অধীন হইয়া কত প্রকার না দুষ্কার্য করিয়াছে ও তাহার ফলস্বরূপ কতবার না জন্ম, জরা মরণের কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, এরূপ নিজের দোষ সম্বন্ধে চিন্তা করা ও কি উপায়ের দ্বারা সেই সমস্ত দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে যে চিন্তা তাহাকে 'অপায় বিচয়' ধ্যান বলে। যে সমস্ত সুখ দুঃখাদি

---

২ 'সমত্বমবলম্ব্যাথ ধ্যানং যোগী সমাশ্রয়েৎ। বিনা সমত্বমারব্ধে স্বাত্মা বিড়ম্ব্যতে॥'—হেমচন্দ্রাচার্য প্রণীত যোগশাস্ত্র, ৪।১১২

৩ তুঃ 'মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাশ্চিত্তপ্রসাদনম্'—পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।৩৩

অনুভব করিতে হয় তাহা কোন্‌ কোন্‌ কর্মের বিপাকে উৎপন্ন ইত্যাদি কর্মের বিপাক সম্বন্ধে যে চিন্তন তাহাকে 'বিপাক বিচয়' ধ্যান বলে। কেহ এ সংসারে পূজনীয় হইতেছে কেহ বা নিন্দনীয়, কেহ রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছে আবার কেহ বা অত্যন্ত দীন অবস্থায় ভীষণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে এই সমস্ত পরিণাম নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মের ফল ইত্যাদিরূপ চিন্তা করাও এই ধ্যানের অন্তর্গত। বিশ্ব সংসারের আকার ও স্বরূপের বিচার করাকে 'সংস্থান বিচয়' ধ্যান বলে। যাহার মধ্যে যুগপৎ উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে. এরূপ অনাদি ও অনন্ত বিশ্ব-সংসারের আকৃতি, স্থিতি ও পরিণতি প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করা 'সংস্থান বিচয়' ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত।

আবার 'পিণ্ডস্থ', 'পদস্থ', 'রূপস্থ' ও 'রূপাতীত' এই চারি প্রকার ধ্যানও ধর্মধ্যানেরই প্রকার ভেদ। শরীরস্থ আত্মার ধ্যানকে 'পিণ্ডস্থ' ধ্যান বলে। এই ধ্যানের 'পার্থিবী', 'আগ্নেয়ী', 'বায়বী', বারুণী' ও 'তত্ত্বভূ' এই পাঁচ প্রকার বিভাগ আছে, কিন্তু তাহাদের বিবরণ বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। পবিত্র পদ অর্থাৎ 'ওঁ', 'অর্হং' প্রভৃতি কোন একটি অক্ষর বা পদ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করাকে 'পদস্থ' ধ্যান বলে। নাভি, হৃদয়, মস্তক প্রভৃতি স্থানে পদ্মের আকার কল্পনা করিয়া ও তাহার মধ্যে স্বরাদি বর্ণ স্থাপন করিয়া নানা প্রকার ধ্যান করা এই 'পদস্থ' ধ্যানের অন্তর্গত। অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন তীর্থঙ্করের মূর্তির ধ্যান করাকে 'রূপস্থ' ধ্যান কহে। অমূর্ত, চিদানন্দ-স্বরূপ, নিরঞ্জন, সিদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মার ধ্যান করাকে 'রূপাতীত' ধ্যান বলে। এই সমস্ত ধ্যানের বহু প্রকার ভেদ আছে।

শুক্লধ্যানও চারিপ্রকার: 'পৃথকত্ব-বিতর্ক-সবিচার', 'একত্ব-বিতর্ক-নির্বিচার', 'সূক্ষ্ম-ক্রিয়া-অপ্রতিপাতি', 'সমুচ্ছিন্ন-ক্রিয়া-অনিবৃত্তি'। ধর্ম-ধ্যানের দ্বারা স্বর্গসুখ ও ক্রমে অপবর্গ বা মোক্ষ সাধিত হয়, কিন্তু শুক্লধ্যানের দ্বারা নিশ্চিত অপবর্গই সাধিত হয়। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'সংহনন' বিশিষ্ট অর্থাৎ দৃঢ়তম অস্থি-সন্ধি যুক্ত এবং পূর্ব[৪] শাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন ত্যাগী সাধুই শুক্লধ্যানের অধিকারী। বিষয়-ব্যাকুলিত-চিত্ত, অল্প-সত্ত্ব মনুষ্যের পক্ষে এই ধ্যানের উপযুক্ত মানসিক স্থৈর্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

শ্রুত-জ্ঞান[৫]কে অবলম্বন করিয়া কোন দ্রব্য বা তাহার পর্যায়ের চিন্তাকে 'বিতর্ক' বলে, সেই দ্রব্যের শব্দ হইতে অর্থের ও অর্থ হইতে শব্দের বিচার যুক্ত চিন্তাকে 'সবিচার' ও দ্রব্য বা তাহার পর্যায় হইতে দ্রব্যান্তরে বা পর্যায়ান্তরে বিচার সংক্রমণকে 'পৃথকত্ব' বলে। অতএব যে ধ্যানে শ্রুত-জ্ঞানের আধারে দ্রব্য বা তাহার গুণ পর্যায়াদির বিভিন্ন

---

৪ জৈন শাস্ত্রকে 'অঙ্গ' শাস্ত্র বলে। 'অঙ্গ' শাস্ত্র দ্বাদশটি, তন্মধ্যে দ্বাদশতম অঙ্গকে 'পূর্ব' শাস্ত্র বলে। পূর্বশাস্ত্র আবার ১৪ ভাগে বিভক্ত। অধুনা সম্পূর্ণ 'পূর্ব' শাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে।

৫ অঙ্গ ও পূর্ব শাস্ত্রের জ্ঞানকে শ্রুত-জ্ঞান বলে।

প্রকার শব্দ বা অর্থের বিচার করা হয় তাহাকে 'পৃথকত্ব-বিতর্ক-সবিচার' বা 'শ্রুত-বিচার' নামক প্রথম শুক্লধ্যান বলে। যে ধ্যানে শ্রুত-জ্ঞানের আধারে কোন এক দ্রব্যের বা তাহার কোন এক গুণের নিশ্চল চিন্তা করা হয়, ও শব্দ অর্থাদির বিচার করা হয় না, তাহা 'একত্ব-বিতর্ক-নির্বিচার' বা 'অপৃথকত্ব-শ্রুত-অবিচার' নামক দ্বিতীয় শুক্লধ্যান। যে ধ্যানে মানসিক বাচনিক ও কায়িক প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া এবং মন ও বচনের প্রবৃত্তিকে ক্ষয় করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে 'সূক্ষ্ম ক্রিয়া-অপ্রতিপাতি' বা 'সূক্ষ্ম-ক্রিয়া-অনিবৃত্তি' নামক তৃতীয় শুক্লধ্যান বলে। এই ধ্যানে মাত্র অতি সূক্ষ্ম কায়িক প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। যে ধ্যানে অবশিষ্ট সূক্ষ্ম কায়িক প্রবৃত্তিরও সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় ও আত্মা সম্পূর্ণ নিস্পন্দ হইয়া যায় তাহাকে 'সমুচ্ছিন্ন-ক্রিয়া-অনিবৃত্তি' নামক চতুর্থ শুক্লধ্যান বলে। এই অবস্থার পরই অনতিবিলম্বে আত্মা মুক্ত হয়। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সহিত শুক্লধ্যানের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার এই চারিটি প্রকার শুক্লধ্যানের প্রথম দুই প্রকারের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যায়।

জৈন শাস্ত্রে লিখিত ধ্যানের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। বিশেষ বিবরণের জন্য হেমচন্দ্রাচার্য প্রণীত 'যোগশাস্ত্র', শুভচন্দ্রাচার্য প্রণীত 'জ্ঞানার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রমণ, ফাল্গুন, ১৩৬৬ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

ও ওপরে, ও নীচে

[জৈন গল্প]

ভগবান বুদ্ধের কথা তোমরা প্রায় সকলেই জান কিন্তু ভগবান মহাবীরের কথা ? অনেকেই জান না যদিও ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান মহাবীর প্রায় একই সময়ে একই অঞ্চলে তাঁদের ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু মহাবীর তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন জৈন ধর্মের শেষ প্রবক্তা চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকর।

আজ ভগবান মহাবীর সম্পর্কে তোমাদের একটী ছোট্ট গল্প বলব। ভগবান মহাবীরও তখন তোমাদের মতই ছোট। তোমাদের মতই তিনি তখন ছুটোছুটি করেন কখনো ওপরে, কখনো নীচে, কখনো উদ্যানে। তাঁর সঙ্গীসাথীও আবার কম নয়। তাদের নিয়ে তিনি কত রকম খেলা খেলেন। সে সব খেলাও অনেকটা আজকের মত—ছুটে গিয়ে গাছে চড়া, গাছের ডালে দোল খাওয়া, দোল খেয়ে যে আগে নেমে আসবে তাকে পিঠে নিয়ে ছোটা। বুদ্ধের মত তিনিও রাজার ছেলে ছিলেন। কিন্তু রাজার ছেলে হলে কি হয় ? ছোট ছোটই। আর তখনো তাঁর নাম মহাবীর হয় নি, তাঁর নাম তখন বর্দ্ধমান। কে জানে আমাদের আজকের বর্দ্ধমান তাঁর নামে হয়েছে কিনা ? তবে এ অঞ্চলে তিনি অনেকদিন সাধনা করেছিলেন, এখানে অনেক শিষ্যও করেছিলেন। সেই সব শিষ্যের বংশধরেরা আজো বীরভূম, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে। তোমরা তাদের জান কিনা জানিনা—তাদের সরাক বলা হয়।

কিন্তু যে গল্প বলব বলেছিলাম সেই গল্প। শরৎকালের এক সুন্দর সকাল। এমন সকালে কি ঘরে মন থাকে। তাই ছেলেরা এসেছে বর্দ্ধমানকে ডাকতে। তাকে নিয়ে গিয়ে উদ্যানে খেলা করবে। সারারাত ধরে কত যে শিশির ঝরেছে। সেই শিশির ঝলমল করছে ঘাসে ঘাসে, গাছের পাতায় পাতায় সকালের সোনালী সূর্যের আলোয়। বাতাসে ভুর ভুর করছে শিউলিফুলের গন্ধ। কিন্তু কোথায় বর্দ্ধমান ? বাবা সিদ্ধার্থ নীচে নিজের ঘরে বসে কাজ করছিলেন তাঁকে জিগ্যেস করতেই তিনি বললেন, ওপরে। ছেলেরা ওমনি পড়ি কি মরি করে ওপরে ছুটল। একেবারে তিনতলায় মা ত্রিশলার ঘরে। তাঁকে জিগ্যেস করতেই মা বললেন, নীচে। ওমনি ওরা দুড়দাড় করে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু নীচে কোথায় বর্দ্ধমান? আবার তারা ওপরে উঠতে লাগল। না এবার তারা তাকে পেয়েছে। দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

হ্যাঁরে তুই এখানে, বলে ছেলেরা এবার তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তোকে আমরা কখনো ওপরে খুঁজছি, কখনো নীচে।

বর্দ্ধমান বলল, কেন?

কেন আবার কি! নীচে তোর বাবাকে জিগ্যেস করতে বললেন, তুই ওপরে। ওপরে তোর মাকে জিগ্যেস করতে বললেন, তুই নীচে।

বর্দ্ধমান বলল, তাঁরা ঠিকই বলেছেন। বাবার চাইতে ওপরে আছি তাই তিনি ওপরে বললেন, আর মার চাইতে নীচে তাই তিনি নীচে বললেন।

বলতে বলতে বর্দ্ধমান যেন একটা নূতন তথ্য, একটা নূতন সত্য দেখতে পেলে। সত্য ত এমনি কখনো একান্ত নয়। কোন এক অপেক্ষায় সত্য। বাবা নীচে ছিলেন বলে আমি ওপরে সেটা সত্য। মা ওপরে ছিলেন বলে আমি নীচে এইটে সত্য।

তবে কেন আমরা অকারণে জিদ করি আমি যা বলছি তা সত্য। তোমারটা মিথ্যে, তুমি তোমার অপেক্ষা দিয়ে দেখছ, আমি আমার অপেক্ষা দিয়ে। যেমন অন্ধের হাতী দেখা। কানে হাত দিয়ে বলছে হাতী কুলোর মতো, দাঁতে হাত দিয়ে মূলোর মতো, ল্যাজে হাত দিয়ে দড়ির মতো। তুমি যাকে মা বলছ, আমি তাকে মাসি বলছি আর একজন পিসী বলছে, তবে কি সে? আমাদের সব বলাই এমনি। একটুখানি সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। সব সত্যকে করে না। সব সত্যকে দেখতে গেলে সব অপেক্ষা দিয়ে দেখতে হবে, তবে সত্যকে পাওয়া যাবে।

তবে ধর্মে ধর্মে ঝগড়া কেন? কেউ বলছে ঈশ্বর এক, কেউ বলছে অনেক। কেউ বলছে তাঁর চার হাত। কেউ বলছে তিনি নিরাকার—তাঁর কোন আকারই নেই। কেউ বলছে তিনি স্বর্গে থাকেন। কেউ বলছে তিনি সবখানে থাকেন। এর সব কটি সত্য, তবে পূর্ণ সত্য নয়। যে যে অপেক্ষায় দেখছে সেই কথা বলছে। বর্দ্ধমান ছোট হলে কি হয়, নিউটন যেমন আপেল ফল মাটিতে পড়তে দেখে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন বর্দ্ধমানও তেমনি, ওপরে নীচের মধ্যে তাঁর ধর্মের মূল সূত্র খুঁজে পেল। ও যখন বড় হল, মহাবীর হল, তখন সমস্ত মত ও পথের সমন্বয়ের সূত্র অনেকান্তর কথা বলল। জৈন ধর্মে এই অনেকান্ত বা আপেক্ষিক বাদের এতখানি প্রাধান্য যে অন্য ধর্মীয় দার্শনিকেরা জৈন ধর্মকে অনেকান্তবাদ বলে অভিহিত করতেন ও এখনো করে থাকেন।

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

সেই সময় এক ত্রিদণ্ডী সেখানে এলেন। তিনি দয়া পরবশ হয়ে আমায় তাঁর কুটীরে নিয়ে গেলেন। ওষধি দিয়ে তিনি আমার সমস্ত শরীর মর্দন করলেন। আমি সুস্থ হলে তিনি আমায় জিগ্যেস করলেন, বণিকপুত্র, তোমার এই দুর্গতি কি করে হল ?

আমি সংক্ষেপে যা যা ঘটেছিল তা তাঁকে বিবৃত করলাম।

আমি যা বললাম তা শুনে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ওরে নির্লজ্জ, তুই আমার ঘর হতে বেরিয়ে যা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘর হতে বেরিয়ে গেলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখি তিনি আমায় পেছন হতে ডাক দিচ্ছেন। আমি ফিরে আসতেই তিনি বললেন, আমি তোমাকে শিক্ষা দেবার জন্য ওকথা বলেছিলাম। তুমি যদি অর্থ চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তুমি যদি আমার কথা শোনো তবে তুমি খুব সহজেই তা লাভ করবে।

আমি তখন তাঁর ওখানেই রয়ে গেলাম।

একদিন আগুন জ্বালিয়ে তিনি আমায় ডাক দিলেন। নিকটে গেলে 'দেখ' বলে তিনি একটী লোহার টুকরো রসে ডুবিয়ে সেই আগুনে নিক্ষেপ করলেন। দেখতে দেখতে সেই লোহা সোনা হয়ে গেল। তখন তিনি আমায় বললেন, বাবা, এসব ত তুমি নিজের চোখেই দেখলে।

আমি বললাম, এ খুবই আশ্চর্যজনক।

তিনি তখন মৃদু হেসে বললেন, আমি রসায়নবিদ্, লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারি। যে মুহূর্তে আমি তোমায় প্রথম দেখলাম সেই মুহূর্তে তোমার প্রতি আমার কেমন যেন পুত্রস্নেহ জাগ্রত হয়ে উঠল। যাতে তুমি লক্ষ কোটি সোনার অধিকারী হও সেই রকম এই রস তোমার জন্য আমি সংগ্রহ করব। সেই রস সংগৃহীত হলে লক্ষকোটি সোনার অধিকারী হয়ে তুমি ঘরে ফিরে যেও। পূর্বসঞ্চিত রসের আমার কাছে খুব সামান্যই আছে।

আমি আনন্দিত হলাম, লোভেও পড়ে গেলাম। বললাম, কাকা, আমায় কি করতে হবে আদেশ করুন।

তিনি তখন যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলেন এবং যা যা প্রয়োজনীয় তা এক

করলেন। তারপর এক ভয়ঙ্কর রাত্রে আমরা যাত্রা করলাম ও হিংস্র পশু পরিপূর্ণ এক অরণ্যে গিয়ে পৌঁছলাম। দিনের বেলায় পুলিন্দদের ভয়ে আমরা হাঁটতে পারতাম না। তাই রাত্রে আমাদের হাঁটতে হত। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে সেই মহারণ্য অতিক্রম করে এক পর্বতের সানুদেশে এলাম। আরো কিছুদূর যেতে এক গুহামুখ পেলাম। ত্রিদণ্ডীকে অনুসরণ করে সেই গুহায় প্রবেশ করলাম। খানিক হাঁটবার পর সেই গুহায় তৃণাচ্ছাদিত এক কুয়ো দেখতে পেলাম। ত্রিদণ্ডী কুয়োর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ও আমায় অপেক্ষা ক^ত বললেন।

তিনি যখন গায়ে চামড়ার পরিধান পরে সেই কুয়োয় নামবার উপক্রম করলেন তখন আমি বললাম, কাকা এ আপনি কি করছেন? তিনি বললেন বাবা, এ কুয়োর মাঝখানে যাতে লোহা সোনা হয় সেই রসের উৎস রয়েছে। আমি এখন ঝুড়িতে করে নীচে নেমে যাব ও ঝুড়িতে বসে পাত্রে সেই রস ভরে নেব। তুমি ততক্ষণ ঝুড়ির দড়ি ধরে থাকবে।

আমি বললাম, কাকা, আপনি কেন নীচে নামবেন, আমিই নামছি।

তিনি বললেন, না বাবা, তুমি ভয় পাবে।

আমি বললাম, না, আমি একটুও ভয় পাব না। এই বলে সেই চামড়ার পরিধান আমি পরে ফেললাম। তিনি তখন আমার হাতে মশাল দিয়ে ঝুড়িতে করে নীচে নামিয়ে দিলেন। আমি নীচে গিয়ে সেই রস দেখতে পেলাম ও চামচে করে সেই রস তুলে রসের পাত্র ভরে নিলাম। রসের পাত্র ভরা হলে তিনি আমাকে ও রসের পাত্রকে একসঙ্গে তুলতে পারবেন না বলে সেই রসের পাত্র প্রথমে ঝুড়িতে বসিয়ে দিতে বললেন ও আমাকে কুয়োর মধ্যে পাথরের যে খাঁজ বেরিয়েছিল তাতে অপেক্ষা করতে বললেন। রস তোলা হলে তিনি আমায় তুলে নেবেন। আমি পাথরের খাঁজে দাঁড়িয়ে সেই রসের পাত্র ঝুড়িতে তুলে দিলাম। তিনি তা তুলে নিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন ঝুড়ি নীচে এল না তখন চৎকার করে বললাম, কাকা, তাড়াতাড়ি ঝুড়ি নামিয়ে দিন, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কিন্তু ওপর হতে কোনো সাড়া পেলাম না। ত্রিদণ্ডী সেই রস নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

আমি তখন চিন্তা করতে লাগলাম যে আমার মৃত্যু এখন অবধারিত। আমি লাভী, তাই সমুদ্রে যদিও আমার মৃত্যু হয় নি কিন্তু এই কুয়ো হতে আমার রের আর কোনো আশাই নেই; হাতের মশাল নিভে গিয়েছিল। সকাল লেও সূর্যের আলোক সেখানে প্রবেশ করে নাই। সেই অন্ধকারে পাথরের খাঁজে াড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বিকেলের দিকে না জানি কোথা দিয়ে সেই কুয়োর মধ্যে একটুখানি আলোক

প্রকাশ দেখা গেল। সেই আলোকে দেখলাম আমার পায়ের তলায় একটি ছিদ্র রয়েছে, সেই ছিদ্র ক্রমশঃ বড় হয়ে গেছে এবং সেই ছিদ্রপথ দিয়েই সেই আলো আসছে। সহসা একটি মানুষকে যেন আমি সেই রসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, আমি তখন তাকে ডাক দিয়ে বললাম, ভাই তুমি ওখানে কে ?

অতি কষ্টে সে আমার কথার প্রত্যুত্তরে ত্রিদণ্ডীর নাম করল। তখন বুঝতে পারলাম ত্রিদণ্ডী যে ভাবে আমায় এখানে নিয়ে এসেছে সেইভাবে ওই লোকটিকেও এখানে নিয়ে এসেছিল। আমি তখন বললাম, বন্ধু, এখান হতে বার হবারও কি কোনো উপায় আছে ?

প্রত্যুত্তরে ধীরে ধীরে সে বলল, সূর্যালোকে যখন এই কূয়োটি উদ্ভাসিত হয় তখন ওই ছিদ্রপথে এক সরীসৃপ এই কূয়োর জল পান করতে আসে। জল পান করে সেই ছিদ্রপথে সে ফিরে যায়। তোমার যদি সাহস থাকে তবে তার পিঠের ওপর উঠে বসো, সে তোমায় বাইরে নিয়ে যাবে। আমার সাহস ছিল না তাই পারিনি। তাছাড়া রসে আমার হাত পা এখন গলে গেছে, জীবনী শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আমি আর বাঁচব না।

আমি তখন সেই সরীসৃপের অপেক্ষা করে রইলাম। খানিক পরেই সে এল এবং তার কথা মত যখন সে ফিরে যেতে লাগল তখন তার পীঠে আমি চেপে বসলাম। সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সে আমায় সেই ভাবে বাইরে নিয়ে এল। আমার গায়ে চামড়ার পরিধান ছিল। তাই অক্ষত অবস্থায় আমি বাইরে এলাম। বাইরে এসে তার পীঠ হতে আমি লাফিয়ে নীচে নামলাম ও সেই কূয়োর অনুসন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু সেই কূয়ো খুঁজে পেলাম না। যেহেতু রাত্রে এখানে এসেছিলাম তাই জায়গাটী চিনতে পারলাম না।

আমি যখন ইতস্ততঃ বিচরণ করছি তখন এক বন্য মোষ আমায় তাড়া করল। আমি তখন ছুটে পালালাম ও একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ওপর উঠে পড়লাম। সে তখন সেই পাথরটীকে নাড়াবার চেষ্টা করল। পাথর সে নাড়াতে পারল না, কিন্তু পাথরের গা হতে একটী সাপ বেরিয়ে এল ও মোষটীকে কামড়ে দিল। মোষটী সেই মুহূর্তে মরে পড়ে গেল। আমি তখন সেই প্রস্তর খণ্ড হতে নেমে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক পথের প্রান্তে এসে পড়লাম। পথ রেখা দেখে ভাবলাম লোকালয় হয়ত নিকটেই আছে। এখানে হয়ত কারুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। হলও তাই। সেখানে রুদ্রদত্তের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

রুদ্রদত্ত আমার পায়ে পড়ে বলল, শ্রীমান চারু, আমি তোমার ভৃত্য। তুমি এখানে কি করে এলে ? আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বললাম। সে আমাকে জল

ও খাবার দিল। খাবার ও জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করলে সে বলল, চারু, আমি তোমার ভৃত্য, তুমি আবার ব্যবসা কর। চল রায়পুরে যাই।

আমরা তখন রায়পুরে গেলাম ও রুদ্রদত্তের বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান করলাম। রুদ্রদত্ত অলঙ্কার, কাপড়, রঙ ও চুড়ি কিনল। সে বলল, চারু তুমি কিছু ভেবনা। ভাগ্য মুখ তুলে চাইলে এবং তোমার পুরুষাকার থাকলে এই সামান্য পুঁজিতেই তুমি অনেক ধন উপার্জন করবে। এই সার্থ বাণিজ্যের জন্য দূরদেশে যাচ্ছে। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরাও এদের সঙ্গে যাব।

আমিও তখন তৈরী হয়ে সেই সার্থের সঙ্গে যোগ দিলাম

এভাবে চলতে চলতে আমরা সিন্ধু ও সাগরের মোহনা অতিক্রম করলাম। তারপর আমরা উত্তর পূর্বে যেতে হুন, খস ও চীনেদের দেশে উপস্থিত হলাম। সঙ্কু পথে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বয়ঢ্য পর্বতের পাদদেশে আমরা তাঁবু ফেললাম। সেখানেই রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা তুম্বরু ফলের বীজ চূর্ণ করলাম।

তখন দলপতি আমাদের বললেন, এই বীজ চূর্ণ তোমরা কোমরে বেঁধে নাও ও তোমাদের পণ্য দ্রব্য পীঠে ঝুলিয়ে নাও। তারপর ভাঙ্গা টাঙ্গীর ফলার মত এই পর্বতশির অতিক্রম করে তোমাদের কীলক পথে কীলক ধরে ধরে বিজয়া তাল অতিক্রম করতে হবে। হাত ঘেমে উঠলে তুম্বরু চূর্ণ হাতে লাগিয়ে নেবে যাতে সহজেই পাথরের কীলক ধরতে পার। অন্যথায় হাত ফসকে যেতে পারে এবং হাত ফসকালেই তোমরা দুর্বতিক্রম্য তলহীন বিজয়া তালের জলে গিয়ে পড়বে।

আমাদের যে ভাবে বলা হয়েছিল সেই ভাবে সেই পর্বত শির ও কীলক পথ অতিক্রম করলাম। কীলক পথ অতিক্রম করবার পর উসুবেগা নদী পেলাম। উসুবেগা নদীর তীরে তাঁবু ফেলা হল। সেখানে বন্য পাকা ফল খেলাম।

দলপতি তখন বললেন বৈত্যাঢ্য পর্বত হতে নির্গত এই নদী তলহীন। সাঁতার দিয়েও পার হওয়া যায় না কারণ এর প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নেয়। তাই একমাত্র বেতস লতার সাহায্যে এই নদী পার হতে হয়।

পাহাড় হতে আসা উত্তর হাওয়ায় বৃহৎ.গোপুচ্ছের মত বেতস লতার নমনীয় অথচ নির্ভরযোগ্য ডালগুলো উসুবেগা নদীর দক্ষিণ তট স্পর্শ করে। সেই সময় সেই বেতস লতার ডাল ধরে উসুবেগা নদীর দক্ষিণ তটে যেতে হয়। আবার যখন দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত হয় তখন ওপারের বৃহৎ গোপুচ্ছের মত বেতস লতার ডালগুলো উসুবেগা নদীর উত্তর তট স্পর্শ করে। সেই সময় বেতস লতার ডাল ধরে উসুবেগা নদীর উত্তর তটে আসা যায়। তাই এখন তোমরা বেতস লতার ডাল ধরে উত্তর বাতাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাক।

তাঁর কথা মত পণ্যদ্রব্য কাঁধে ফেলে বেতস লতার ডাল ধরে উত্তর হাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং যথা সময়ে দক্ষিণ তটে পৌঁছে গেলাম। সেখান হতে বেতস লতার মধ্য দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আরো এগিয়ে গেলাম ও টঙ্কনদের দেশে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে একটী পার্বত্য নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। তার তীরে আমরা তাঁবু ফেললাম। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে দলপতির নির্দেশ মত সেখানে আমাদের পণ্য দ্রব্য সাজিয়ে, কাঠ প্রজ্জ্বলিত করে দূরে সরে গেলাম। কাঠের ধোঁয়া দেখে টঙ্কনেরা এল ও আমাদের পণ্য দ্রব্য নিয়ে চলে গেল। তারাও আমাদের মত তাদের দলপতির নির্দেশে তাদের পণ্য দ্রব্য সাজিয়ে কাঠ জ্বালিয়ে দূরে সরে গেল। আমরা তখন সেই পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করলাম। দেখলাম তাদের পণ্যদ্রব্যে কেবল জিনকষা ছাগল ও ফলমূল ছিল।

তারপর সেই পার্বত্য নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে আমরা অজা পথ পেলাম।

সেখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে দলপতির নির্দেশমত চোখে পটি বেঁধে সেই ছাগলদের পিঠে আমরা উঠে বসলাম। ওদের পীঠে আমরা পথহীন ভাঙাভাঙা বজ্রকোটি পর্বত অতিক্রম করলাম। আরো খানিক যাবার পর শীতল বাতাস অনুভূত হতে ছাগলেরা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা তখন চোখের পটি খুলে নিলাম ও মাটিতে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম।

দলপতি তখন আমাদের ছাগলদের মেরে ফেলতে বললেন। বললেন, এদের মেরে ওদের রক্তমাখা চামড়া দিয়ে থলির মত করে নাও ও মাংস খেয়ে ফেল। তারপর পীঠে ছুরি বেঁধে সেই থলিতে ঢুকে পড়। এখানে রত্নদ্বীপ হতে বৃহদাকার ভারুণ্ড পাখীরা বাঘ ভাল্লুকের মাংস খেতে আসে। টুকরো টুকরো মাংস খেয়ে বড় বড় মাংসখণ্ড নিজেদের আবাসে নিয়ে যায়। রক্তমাখা চামড়াকে বড় বড় মাংসখণ্ড ভেবে তারা আমাদের রত্নদ্বীপে নিয়ে যাবে।

তারপর যখন তোমরা ভূমিস্পর্শ করবে তখন ছুরি দিয়ে চামড়ার থলি কেটে বেরিয়ে আসবে ও ইচ্ছেমত রত্ন সংগ্রহ করবে। এভাবে তোমাদের রত্নদ্বীপে যেতে হবে। তারপর সেখান হতে বেতাঢ্য পর্বতের নিকটস্থ সুবর্ণ ভূমিতে গিয়ে পুনরায় জাহাজে করে পূর্বদেশে ফিরে আসতে পারবে।

তখন দলপতির নির্দেশমত অন্য বণিকেরা ছাগলদের মারতে আরম্ভ করল। তা দেখে আমি রুদ্রদত্তকে বললাম, আমি এই রকম বাণিজ্যের কথা জীবনে শুনিনি। আমি যদি এসব আগে জানতাম তাহলে তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই আসতাম না। তোমরা আমার ছাগলটীকে মারবে না। এই দুর্গম পথে এই ছাগলটী আমাকে বহন করে এখানে নিয়ে এসেছে। এর সেবার মূল্য আমায় দিতে হবে।

রুদ্রদত্ত বলল, তুমি যদি ওর চামড়ার মধ্যে না ঢোক তবে ভারুণ্ড পাখীরা তোমাকেও মেরে ফেলবে।

আমি বললাম এই ছাগলের জন্য আমি নিজের প্রাণ দেব।

কিন্তু তাতেও তুমি এই ছাগলটীকে বাঁচাতে পারবে না। এই বলে সে ও অন্যেরা সেই ছাগলটীকে মারবার জন্য প্রস্তুত হল। আমি তাদের বাধা দিতে পারলাম না। কিন্তু আমি যে তার হত্যার প্রতিবাদ করেছি তা সেই ছাগলটী বুঝতে পেরেছিল ও আমার দিকে স্থির করুণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

আমি তখন সেই ছাগলটীকে বললাম, ভাই, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। কিন্তু শোন এখন যদি তুমি এই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছ তবে জেনো পূর্ব জন্মে তুমি প্রাণ ভয়ে ভীত কোন জীবকে হত্যা করেছিলে। তুমি নিজের কর্মের জন্য এই ফল ভোগ করছ। তাই যারা তোমায় হত্যা করছে তাদের প্রতি দ্বেষভাব রেখো না। এক্ষেত্রে তারা করণ মাত্র। রাগদ্বেষহীন অর্হতেরা জীবহত্যা না করবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের উপদেশমত চললে মানুষ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হতে পারে। তাই তুমি কায়মনোবাক্যে সমস্ত পাপাচার পরিত্যাগ করে অনশনব্রত গ্রহণ করো ও নমস্কার মন্ত্র চিন্তা করো। এভাবে তুমি পরজন্মে সদ্‌গতি লাভ করবে।

আমি যখন এই কথা বলছিলাম তখন ছাগলটী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে চোখের জল ফেলছিল। আমি তাকে ব্রত ধারণ করিয়ে তার কানে নমস্কার মন্ত্র দিলাম। সে সংসার ভয়ে ভীত হয়ে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থায় বণিকেরা তাকে হত্যা করল।

তার চামড়া দিয়ে তখন থলি তৈরী করা হল। রুদ্রদত্ত আমায় জোর করে সেই থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর বণিকেরা আপন আপন থলিতে ঢুকে পড়ল।

খানিক পরেই ভারুণ্ড পাখীরা এল। তাদের গলার স্বরেই তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারলাম। মাংসের লোভে তারা চামড়ার থলিগুলি তুলে নিল। আমায় দুই পাখী এক সঙ্গে তুলেছিল। কিন্তু সেকথা তখন আমার জানবার নয়। আমাকে তারা অনেক ওপরে নিয়ে গেল ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে এক জলাশয়ে এসে পতিত হল। রত্নদ্বীপে এসে গেছি ভেবে আমি থলি কেটে বার হলাম ও সাঁতার দিয়ে কূলে এলাম।

তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। দেখলাম পাখীরা আকাশপথ দিয়ে আমার সঙ্গীদের রত্নদ্বীপে নিয়ে চলেছে। এমন কি আমার শূন্য থলিটিকেও তারা বহন করে নিয়ে চলেছে।

আমি তখন নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। সম্মুখে অবধারিত মৃত্যু। পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই এমন কোনো পাপ করেছিলাম যার জন্য আমার আজ এই অবস্থা।

কিন্তু না, আমি নীচ গতি প্রাপ্ত হতে চাইনা। তাই স্থির করলাম এই পর্বত শিখরে আরোহণ করে শ্রমণ ব্রত অঙ্গীকার করব ও অনশনে দেহত্যাগ করে উর্দ্ধগতি লাভ করব।

এই কথা চিন্তা করে আমি সেই পর্বত শিখরে আরোহণ করতে লাগলাম। পথ বলতে কিছুই ছিল না। আমি বাঁদরের মত হাত-পা দুইই ব্যবহার করে পাহাড়ের গা আঁকড়ে কোন মতে পর্বতের শিখরে উঠে এলাম।

চারদিকে চাইতে বাতাসে কার শ্বেতবস্ত্র উড়তে দেখলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—এই শ্বেতবস্ত্র কার? তখুনি এক শ্রমণের ওপর আমার চোখের দৃষ্টি পতিত হল। তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটী প্রসারিত করে তপস্যা করছিলেন। তাঁকে দেখে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। আমার শ্রম সার্থক হল।

আমি তাঁর নিকটে গেলাম ও তিনবার তাঁকে প্রদক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালাম।

খানিকক্ষণ তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি শ্রেষ্ঠী ভানুর পুত্র চারুদত্ত না?

আমি বললাম, হাঁ ভগবন্।

তুমি এখানে কি করে এলে?

আমি তখন গণিকাগৃহে প্রবেশ হতে এই পর্বত শিখরে আরোহণ অবধি সমস্ত ইতিবৃত্ত বিবৃত করলাম।

তাঁর ধর্মকৃত্য শেষ হলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আমাকে চিনতে পার? আমি অমিতগতি। তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করেছিলে?

আমি তখন তাঁকে চিনতে পারলাম ও তারপরে কি ঘটেছিল জিগ্যেস করলাম।

তিনি তখন বলতে লাগলেন:

তোমাদের পরিত্যাগ করে যখন আকাশে উড়লাম তখন মন্ত্রবলে জানতে পারলাম সুকুমারিকা বৈতাঢ্য পর্বতের কাঞ্চন গুহায় ধূমশিখের নিকট অবস্থান করছে। আমি তাই কাঞ্চন গুহায় গেলাম ও সুকুমারিকাকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিতা ও বিশুষ্কা কুসুম মালিকার মত দেখতে পেলাম। বেতাল বিদ্যার প্রভাবে ধূমশিখ তাকে আমার মৃতদেহ দেখিয়ে বলছিল, তোমার স্বামী অমিতগতির মৃত্যু হয়েছে। হয় তুমি এখন আমার পতিত্বে বরণ কর, নয় চিতাগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ কর।

সুকুমারিকা বলল, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে চিতাগ্নিতে প্রবেশ করব।

চিতা তখন সাজান হল ও আমার মৃতদেহ তাতে তুলে দেওয়া হল। সুকুমারিকা আমার দেহ আঁকড়ে সেই চিতায় উঠল। ঠিক সেই সময় আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি সিংহনাদ করতেই ধূমশিখ বেতালাদি সকলে পালিয়ে

গেল। সুকুমারিকা চিতা হতে নেমে এল। আমাকে দেখে সে খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল।

আমি ধূমশিখদের সমুদ্র পর্যন্ত খেদিয়ে এলাম। তারপর সুকুমারিকাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলাম ও পিতাকে সমস্ত কথা বললাম। পিতা বিদ্যাধর সভায় ধূমশিখের কথা তুললে সকলে তার নিন্দা করল।

তারপর একদিন পিতা বিদ্যাধর রাজকন্যা মনোরমাকে নিয়ে এলেন ও তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিয়ে তিনি রাজ্যভার আমার হাতে তুলে দিলেন ও চারণ মুনি হিরণ্যকুম্ভ ও সুবর্ণকুম্ভের নিকট শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

আমি দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলাম। আমার সিংহযশ ও বরাহগ্রীব নামে দুই পুত্র ও গন্ধর্বদত্তা নামে এক কন্যা হল। কালে আমি আমার পিতার নির্বাণ-লাভের খবর পেলাম। তখন আমিও রাজ্যভার জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহযশের হাতে তুলে দিয়ে সেই চারণ মুনিদ্বয়ের নিকটে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলাম। এখন কম্বুক দ্বীপের কর্কোদয় পর্বতে অবস্থান করে শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যাচরণ করছি। রাত্রে এখানেই এক গুহায় বাস করি। চারু দত্ত, তোমার সঙ্গে আমার যে এখানে দেখা হল তা ভালোর জন্যই। এখন তোমার কিছুরি অভাব থাকবে না। আমাকে বন্দনা করতে আমার পুত্রেরা এখানে রোজই আসে। তারা তোমাকে এখান হতে চম্পায় পৌঁছে দেবে ও প্রচুর ধন দেবে।

অমিতগতির কথা শেষ হতে না হতে সিংহযশ ও বরাহগ্রীব এসে উপস্থিত হল। তারা তাদের পিতাকে প্রদক্ষিণা ও প্রণাম করলে পর অমিতগতি তাদের বলল, পুত্র, তোমরা তোমাদের কাকাকেও প্রণাম কর। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি আজ এখানে এসেছেন।

তারা বলল, ইনিই কি আমাদের ধর্মপিতা শ্রীচারুদত্ত ?

হাঁ, নিজের গৃহ ও ঐশ্বর্য হতে বঞ্চিত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এখানে এসে পড়েছেন।

তারা তখন পিতাকে যেভাবে প্রণাম করেছিল আমাকেও সেভাবে প্রণাম করল। বলল, আপনি আমাদের পিতার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই আপনি এখানে এসে গেছেন।

সেই সময় আকাশের মত নির্মল অলঙ্কার পরিহিত এক সুন্দর দেবতা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে দেখে আনন্দিত হলেন ও আমায় প্রণাম করে অমিতগতিকে প্রণাম করলেন।

তা দেখে সিংহযশ ও বরাহগ্রীব বিস্মিত হয়ে সেই দেবতাকে জিগ্যেস করল, দেব, শ্রমণ ও শ্রাবকের মধ্যে কাকে প্রথমে প্রণাম করা উচিত ?

সেই দেবতা প্রত্যুত্তর দিলেন, অবশ্যই প্রথমে শ্রমণকে, পরে শ্রাবককে। কিন্তু এই শ্রাবক আমার গুরু। এ'র কল্যাণেই আমি এই দেবদেহ ও ঋদ্ধি লাভ করেছি।

সিংহযশ বলল, কি ভাবে—শুনতে ইচ্ছে করি।

সেই দেবতা তখন নিজের আত্মবৃত্ত বিবৃত করলেন। বললেন, কোন এক জন্মে আমি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলাম ও অথর্ববেদীয় সূক্তানুসারে যজ্ঞে কি ভাবে অজা বলি দিতে হয় তা শিক্ষা দিতাম। এর ফলে ছ' ছ'বার আমার অজা জন্ম হয়। পাঁচ বার আমি অথর্ববেদীয় মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে আগুনে নিক্ষিপ্ত হই। ষষ্ঠবারে টঙ্কনে ছাগলরূপে জন্মগ্রহণ করি। রত্নদ্বীপগামী বণিকেরা যখন আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন বণিক চারুদত্তই আমাকে ধর্মে স্থিত করেন। ওঁর কথা মতই আমি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে অর্হৎদের নাম স্মরণ করতে থাকি। ফলে আমি নন্দীশ্বর দ্বীপে দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করি। এখন আমি এখানে ওঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি।

সিংহযশ ও বরাহগ্রীব বলল, দেব, উনি আমাদের পিতার জীবন রক্ষা করেছিলেন তাই প্রথমে আমাদের ওঁকে পূজো করতে দিন।

দেবতা বললেন, প্রথমে আমিই ও'র পূজো করব।

সিংহযশ বলল—আপনি যদি প্রথমে পূজো করেন তবে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া আমাদের সাধ্যের অতীত। তাই আগে আমাদের পূজো করতে দিন, তারপর আপনি করবেন। এই আমাদের অনুরোধ।

দেবতা সেকথায় স্বীকৃত হলেন। আমি সিংহযশ ও বরাহগ্রীব দ্বারা শিবমন্দির নগরীতে নীত হলাম। সেই দেবতা তখন আমায় প্রণাম করে বললেন—আপনি যখন চম্পায় যাবেন, তখন আমায় স্মরণ করবেন। ওই বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি সিংহযশ ও বরাহগ্রীবের প্রাসাদে নিজ গৃহের মতোই বাস করতে লাগলাম।

দীর্ঘদিন পর আমি তাদের বললাম, আমার মায়ের কথা আমার মনে পড়ছে। তাই এবার ঘরে ফিরে যেতে চাই।

সে কথা শুনে তারা বলল, কাকা, তুমি যদি বাড়ী ফিরে যেতে চাও তবে তোমাকে বাধা দেব না। তোমার যাতে সুখ তাতেই আমাদের সুখ। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে। আমাদের বাবা যখন এখানে ছিলেন তখন আমাদের বোন গন্ধর্বদত্তা সম্বন্ধে নৈমিত্তিকদের জিগ্যেস করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ভরতক্ষেত্রের ত্রিখণ্ডের যিনি অধিপতি হবেন তাঁর পিতার সঙ্গে ওর বিবাহ হবে। চারুদত্তের গৃহে অবস্থানকালে সংগীত প্রতিযোগিতায় তিনি তাকে জিতে নেবেন। ভানুপুত্র চারুদত্ত এখানে আসবেন।

আমি বললাম, আমি তাঁকে কি করে চিনব ?

তারা বলল, সেকথাও নৈমিত্তিক আমাদের বলে দিয়েছিলেন। তিনি চিত্রিত

হাতীর আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত করবেন, বীণায় দোষ আবিষ্কার করবেন, সপ্ত তন্ত্রীযুক্ত বিশুদ্ধ বীণা চাইবেন। তাই আ'াদের অনুরোধ আপনি গন্ধর্বদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

আমি সম্মত হলে তারা আমায় প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ ও রত্ন দিল যা কোনো মর্তে'র মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা স্বপ্ন মাত্র। বস্ত্র অলংকার দাসদাসীসহ তারা আমায় গন্ধর্বদত্তাকে দিল এবং বলল পিতার আদেশেই তারা তাকে আমার সঙ্গে দিচ্ছে।

আমি তখন সেই দেবতার কথা চিন্তা করলাম। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে উপস্থিত হলেন ও মধ্যরাত্রে বিমানে করে বাদ্যভাণ্ড সহকারে আমাদের চম্পায় নিয়ে এলেন। তিনিও আমাকে প্রভূত ধন দিলেন। সে রাত্রে আমরা নগরের বাইরে ব্যতীত করলাম।

আপনার আগমন সংবাদ আমি রাজাকে দিয়ে যাব। যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয় তখন আপনি আমাকে স্মরণ করবেন বলে সেই দেবতা আমার কাছে বিদায় নিলেন।

সকাল হবার পূর্বেই দীপ-বর্তিকা ও অনুচর সহ রাজা উপস্থিত হলেন। আমি উপঢৌকনসহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমায় আলিঙ্গন দিলেন। বললেন, তোমার নিজের ঘর আমি খালি করিয়ে দেব। তুমি অধিকার করে নাও।

সংবাদ পেয়ে সূর্যোদয়ের পর আমার মামা এলেন। তিনিও আমায় আলিঙ্গন দিলেন। বললেন, মানুষ যা করতে পারে তুমি তা করেছ। তুমি কুলগৌরব বৃদ্ধি করেছ।

আমি মা'র কথা জিগ্যেস করলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, শোন—

তুমি চলে যাবার পর বসন্ততিলকা তোমাকে নিজের ঘরে দেখতে না পেয়ে অশোক বনে খুঁজে বেড়াল তারপর কোথাও তোমাকে না দেখে পরিচারিকাদের জিগ্যেস করল। প্রথমে তারা কিছু বলতে চায় না, শেষে বলল, ওর মা তোমার দারিদ্র্যের জন্য তোমাকে মদ্যপান করিয়ে ভূতগৃহের নিকট ফেলিয়ে দিয়েছে। সে কথা শুনে সে তোমার অনুসন্ধানে আমাদের বাড়ীতে আসে ও সেখানেও তোমাকে না দেখে একবেণী ধরে দিনরাত্রি তোমার বিরহে যাপন করছে।

রাজার আদেশে রামদেব আমার পিতৃগৃহ খালি করে দিলে বণিকদের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়ে আমি সেই গৃহে প্রবেশ করলাম। গৃহে প্রবেশ করে মাকে প্রণাম করলাম, মিত্রবতীকে আলিঙ্গন দিলাম ও বসন্ত তিলকার বেণীবন্ধ মুক্ত করলাম।

গন্ধর্বদত্তা বিবাহ যোগ্যা হলে আমি সভাগৃহ তৈরী করালাম ও তোমাকে পাবার জন্য সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করলাম এবং প্রতিমাসে সিংহযশ ও বরাহগ্রীবকে সেই সংগীত প্রতিযোগিতার ফলাফল জানাতে লাগলাম।

এই জন্যই আমি তোমাকে বলেছিলাম কুলের দৃষ্টিতে কন্যা তোমার যোগ্য বা তোমার চাইতে বেশী কুলীন।

চারুদত্তের আত্মকাহিনী শেষ হলে আমি তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করে বিদায় দিলাম। সেইখানে অবস্থান করে আমি গন্ধর্বদত্তা, শ্যামা ও বিজয়ার সঙ্গে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম।

শীতের অন্ত হলে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হল। সুরভি পুষ্পের পরাগ চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সহকার বৃক্ষের অন্তরাল হতে কোকিলেরা অবিরাম কুহু ধ্বনিতে তরুণ চিত্তকে বিমথিত করতে লাগল। তাই দেখে সরোবরের নিকটস্থ শরবনে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হল।

এই সরোবর সম্বন্ধে বলা হয় যে চম্পাধিপতি পূর্বকের রাজ্ঞীর কোন সময় সমুদ্র জলে স্নান করার দোহদ উৎপন্ন হয়। সেই দোহদ পূর্ণ করবার জন্য পূর্বক এক বিপুল জলরাশি পূর্ণ বৃহৎ সরোবর খনন করান ও যন্ত্রের সাহায্যে উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করেন। সেই তরঙ্গমালায় স্নান করে রাজ্ঞীর দোহদ পূর্ণ হয়। পুত্র সন্তানের জন্ম হলে রাজ্ঞী সেই পুত্রকে নিয়ে এসে এখানে এক উৎসব করেন। সেই হতে বসন্তকালে প্রতি বৎসর এখানে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সেই উৎসবে যোগ দেবার জন্য আমিও চারুদত্তের অনুমতি নিয়ে কালোপযোগী বস্ত্রাভূষণে সজ্জিত হয়ে গৃহ হতে নির্গত হলাম। গন্ধর্বদত্তাও রত্নালঙ্কার পরিধান করে রথে আমার পাশে এসে বসল। আমরা উপবিষ্ট হলে সানুচর সারথি রথ রাজপথে নিয়ে এল। কিন্তু রাজপথে জনতার এত ভীড় ছিল যে সারথিকে মন্থর গতিতে রথ চালাতে হল। সেই অবসরে আমরাও নগরীর শোভা দর্শন করতে করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। ক্রমে আমরা উপবন পরিবেষ্টিত সেই সরোবর তটে এসে উপস্থিত হলাম।

সেই সরোবর তটে তীর্থংকর বাসুপূজ্যের এক মন্দির ছিল। নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভগবান বাসুপূজ্যের বন্দনা করে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসতে লাগলেন। আমরাও তাই রথ হতে অবতরণ করে বাসুপূজ্যের বন্দনা করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসলাম। সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করে আমি গন্ধর্বদত্তাকে নিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগলাম ও সহকার তিলক কুরুবকের পুষ্পশোভা দেখতে লাগলাম। তারপর ক্লান্ত হলে এক অশোক বৃক্ষের নীচে এসে বসলাম।

সেখানে বসে থাকতে-থাকতে আমার দৃষ্টি এক মাতঙ্গ পরিবারের দিকে আকৃষ্ট হল। মনে হল তারা যেন নাগবংশীয়। তাদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা ছিল, গায়ে চন্দন, কপালে ও হাতে সূক্ষ্মচূর্ণ বিলেপিত। কর্ণমূলে ছিল শিমুল বা কমল কলিকা। তাদের দেখে আমার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হল।

তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধাকে দেখলাম। শ্যামবর্ণ হলেও তাঁর নিজস্ব এক সৌন্দর্য ও আভিজাত্য ছিল—ক্ষৌমবসন পরিহিতা তাঁকে আমার উচ্চবংশীয় বলে মনে হল। রাজকীয় বৈভবে পরিবৃত হয়ে তিনি এক উচ্চ আসনে বসেছিলেন। তাঁরই অনতিদূরে শ্যামাবর্ণা এক মাতঙ্গী কন্যাকে দেখতে পেলাম। বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত যার রূপ মাধুরী। তার সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার ভূষিত থাকায় তাকে আমার নক্ষত্রময়ী রজনীর মত মনে হচ্ছিল। সখীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই মাতঙ্গী কন্যা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল।

সেই মাতঙ্গী কন্যাকে সম্বোধন করে তার সহচরীরা বলল, সখি, তুমি তোমার নৃত্য দিয়ে এই সরোবরতটকে নন্দিত করো।

স্নিগ্ধ হাসিতে চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে সে বলল, এই যদি তোদের ইচ্ছে তবে তাই হবে।

[ক্রমশ

নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয় । প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০ ।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. VII No. 8 Sraman December 1979
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পৌষ । ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । । নবম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮৬ ॥ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

সিদ্ধচক্র যন্ত্র

পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন

রাধাগোবিন্দ বসাক

উত্তরবঙ্গে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাদলগাছী থানার এলাকায় পাহাড়পুর নামক একটি স্থান আছে। ই. বি. রেলওয়ের সান্তাহার জংশন হইয়া প্রায় ১৫/১৬ মাইল উত্তরে জামালগঞ্জ নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই স্থানে যাওয়ার পথ আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই অবগত আছেন যে, বহুকাল পূর্ব হইতেই এই পাহাড়পুর নামক স্থানে ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল। এই অতিপ্রাচীন জঙ্গলময় স্তূপের অন্তঃস্থলে যে পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—এরূপ উক্তি প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বান্বেষণকারী কোন কোন মনীষী ও বিশেষজ্ঞ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। শতাধিক বর্ষের পূর্বেও যে এই স্থানটির নাম 'গোয়ালভিটার পাহাড়' বলিয়া পরিচিত ছিল, বুকানন্ হ্যামিলটন্ সাহেব ইংরেজী ১৮০৭ সনে এই স্তূপ পরিদর্শন সময়ে ইহা জানিয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর অতীত হইল রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম সুযোগ্য সভ্য শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয় এই পাহাড়পুরের স্তূপের চতুর্দিকস্থিত ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টক প্রাচীরের একটি কোণে লিপি সংবলিত 'দশবলগর্ভ' নামক কোন বৌদ্ধের দত্ত একটি শিলাস্তম্ভাংশ পাইয়াছিলেন। সেই লিপিটি আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ ছিল। তৎপরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির অন্যান্য সভ্যগণও প্রত্নতত্ত্বনিদর্শন ও প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কার করার লোভে অনেক বার পাহাড়পুরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে যতগুলি স্তূপ এযাবৎ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের সন্ধানের মধ্যে আসিয়াছে, তন্মধ্যে পাহাড়পুরের স্তূপই সর্বোচ্চ বলিয়া স্বীকৃত। স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট ছিল। সকলেই অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন বিভাগের অন্যান্য-সহায়তায় বাঙ্গালার এই উচ্চ স্তূপের খনন কার্য আরব্ধ হয় এবং তাহার ফলে ইং ১৯২৬-২৭ সনে এই স্তূপের ভিতরে একটি বিপুলায়তন গুপ্তযুগের হিন্দু দেব-মন্দির আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং তন্মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে সমস্ত নিদর্শন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, আলোচ্য তাম্রশাসনখানিও তাহার অন্যতম। এই মূল্যবান্ উপাদানের আবিষ্কর্তা সরকারী প্রত্নবিভাগের সুবিখ্যাত 'আযুক্তক' বা উচ্চ কর্মচারী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এম. এ. মহাশয়। সম্প্রতি তিনি এই লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়া সরকারী প্রাচীন-লেখ-সংকলনগ্রন্থে[১] একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

---

১ *Epigraphia Indica, vol. xx, No. 5, p. 59 ff.*

এই লেখের বিশেষত্ব ও বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস-সঙ্কলনে ইহার মূল্য নির্ণয়ের সময় আসিয়াছে।

শাসনখানির ফোটোগ্রাফ ও দীক্ষিত মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া আমরা সেই কার্যে অগ্রসর হইলাম। গুপ্তযুগের যে হিন্দু দেব-মন্দির, খনন-কার্যের ফলে তৎকালের নানারূপ নিদর্শন সহ, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানেই পরবর্তী কালে বাঙ্গালা ধর্মাবলম্বী পালনরপালগণের রাজ্য সময়েবও অনেক লিপি-সংবলিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নবিভাগের মনীষীরা মনে করেন যে, প্রাচীন গুপ্তযুগের এই হিন্দু দেব-মন্দিরের সহিত যবদ্বীপের দেব-মন্দিরগুলির সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, এই মন্দির স্থাপিত হওয়ার পূর্বে সম্ভবতঃ পাহাড়পুরের এই স্থানেই একটি 'চতুর্মুখ সর্বতোভদ্র' জৈন-মন্দির এই স্তূপের অত্যুচ্চশিখরে অবস্থিত ছিল। এই প্রকার মতের পোষকতায় তাঁহারা এই তাম্রশাসনে জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দি-প্রতিষ্ঠিত বিহারের উল্লেখের কথা উদ্ধৃত করেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দে গুপ্তসম্রাট-দিগের আমলে ব্রাহ্মণধর্মের পুনরভ্যুদয় এবং তৎসময়ে ও কিছু পরবর্তীকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির ফলে, খুব সম্ভবতঃ, পূর্ববর্তী সময় হইতে বিদ্যমান জৈন-মন্দিরটিকে হিন্দু দেব-মন্দিরে পরিণত করিয়া বর্দ্ধিতায়তন করা হয়। পরে তাহাই আবার বৌদ্ধ বিহার বলিয়া পরিচিত হয়। সেই বিহারই বাঙ্গালাব পালরাজাদের যুগে 'সোমপুর বিহার' আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এ নভেম্বর তারিখে পাহাড়পুরের স্তূপ খননের সময়ে আবিষ্কৃত মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় প্রদক্ষিণ-পথের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে এই তাম্রাশাসন-খানি পাওয়া যায়। দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, ইহা মন্দিরের উচ্চতর স্তর হইতে গলিত ইষ্টক ও মৃত্তিকা সহ সম্ভবতঃ এই দ্বিতল ভূমিতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। শাসন-খানিতে উৎকীর্ণ লিপিটি একরূপ সমগ্রভাবে পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তিকালে ইহার উপর সবুজবর্ণের ধাতু.মল সংলগ্ন ছিল, পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা পরিষ্কার করাতে, ইহাতে ক্ষোদিত অক্ষর সমূহ স্পষ্টতররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। খননকার্যে ব্যাপৃত কর্মকরগণের অজ্ঞানজাত প্রমাদে তাম্রফলকের উর্দ্ধদিকের দক্ষিণ কোণটি একটু কাটিয়া যাওয়ায়, প্রথমপৃষ্ঠার শেষে তিন চারি পঙ্‌ক্তিতে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অগ্রভাগের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে কয়েকটি অক্ষর লুপ্ত হইয়াছ। বামদিকের প্রান্তভাগ স্থনে স্থানে খসিয়া পড়ায় সেখানেও কতকগুলি অক্ষর লোপ হইয়াছে। তথাপি ইতিপূর্বে উত্তরবঙ্গেই আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের আমলের ধানাইদহ তাম্রলিপির এবং সেই নরপতি, বুধগুপ্ত ও ভানু (?) গুপ্তের আমলের দামোদরপুর তাম্রপট্ট-পঞ্চকের পাঠের সহায়তায়, আলোচ্য শাসনের পাঠোদ্ধার কার্য যে সুকর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। তাম্রফলকখানি চতুষ্কোণ এবং ইহা দৈর্ঘে ৭।০ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৪।।০ ইঞ্চ। ইহার

ওজন ২৯ তোলা মাত্র। দুই একটি সামান্য স্থান ব্যতীত দীক্ষিত মহাশয়ের পাঠে কাহারও কোন প্রকার অনাস্থার হেতু নাই। এই শাসনের লিপিটি পঞ্চম শতাব্দের উত্তর-ভারতীয় অক্ষরে (সংক্ষিপ্ত নাম 'গুপ্তাক্ষর') উৎকীর্ণ। আমাদের আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাট্ বুধগুপ্তের রাজ্যসময়ের দামোদরপুরের তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রশাসনের ২ অক্ষরের সহিত আলোচ্য শাসনের অক্ষরের সৌসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। উপরি উল্লিখিত ধানাইদহ-লিপিতে কোন কোন অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত 'আ'-কার চিহ্নগুলি লক্ষ্য করিয়া গুপ্তযুগের অক্ষর বিশেষের সহিত সেরূপ চিহ্ন ব্যবহারের স্বতন্ত্র একটি ধরণ দেখিয়া প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে আমরা প্রাচীন অক্ষর-তত্ত্বের যে একটি তথ্য নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম৩, তাহা লইয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একটি বাদ-প্রতিবাদ সমুত্থিত হইয়াছিল এবং তাহা লইয়া সেকালের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় লেখালেখিও চলিয়াছিল। তথ্যটি ছিল এই যে, গ, ণ, থ, ধ প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষরের সহিত সংযোজিত 'আ'-কার চিহ্নটি অক্ষরগুলির উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া উহাদের নীচের নিজ বাম কোণে অঙ্কুশাকারে প্রদত্ত হইত। দামোদরপুর লিপিগুলিতে আমরা 'আ'-কারযোগের এই বিশেষত্ব দেখাইয়া দিয়া নিজ মতটি পরিপুষ্ট করিয়াছিলাম। আবার এখন এই নবাবিষ্কৃত পাহাড়পুর-লিপিতেও সেই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি। অধিকন্তু, এই লিপিতে ব, র ও স-এতেও তদ্রূপ 'আ'-কার-সংযোগ দৃষ্ট হয়। লিপির অক্ষর-বিন্যাস সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে। 'র'-সংযোগে পূর্বস্থিত ক-কার ও পরস্থিত ক, ণ, দ, ম, য-কার দ্বিত্ব লাভ করিয়াছে (যথা, 'বিক্ক্রয়ো' পং ৫ ও ১২ ; 'ক্ক্রমেণা' পং ৫ ও ১৭ ; 'অর্ক্ক' পং ২০ ; 'অনুবর্ণ্ণ্য' পং ৩ ; 'নির্দ্দিষ্ট' পং ১৮ ; 'শর্ম্মা' পং ৪, 'আর্য্য' পং ১)। বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ-পার্থক্য বড় একটা মানিতেন না, পঞ্চম শতাব্দের এই লিপিতে অনেক স্থলে বর্গীয় ব-স্থানে (যথা, 'বাহ্য' পং ৪ ও ১১ ; 'বহুভির্' পং ২০) অন্তঃস্থ ব-এর প্রয়োগই তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লিপিতে অবগ্রহ-চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না (যথা 'বিক্রয়োনুবৃত্তস্' পং ৫ ও ১২, প্রার্থ্য (য়ে)-তে ত্র পং ১৬ 'অধ্যর্দ্ধোক্ষয়নীবী' পং ১৯, 'দাতব্যোক্ষয়নীবী' পং ২০)। ইহাতে সংখ্যাবাচক চিহ্নের মধ্যে ১০০, ৫০, ৯, ৭, ৪ ও ১ সংখ্যার চিহ্ন ব্যবহৃত আছে (পং ১৯, ২০ ও ২১ দ্রষ্টব্য)। লিপিশেষে উল্লিখিত ধর্মানুশংসী শ্লোক পাঁচটি ব্যতীত তাম্রলিপিটি সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে রচিত। ইহা হইতে ৫ম শতাব্দের সংস্কৃত গদ্য রচনার

২ *Epigraphia Indica*, vol. xv, 138-39 plates.

৩ সাহিত্য, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

নমুনার নির্দেশ করা যাইতে পারে। মূল পাঠে কখন কখন প্রাকৃত ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়, যথা 'অরহং তাং' (পং ১৩), 'রামিয়া' (পং ১৭), এবং 'কৃষ্ণাহিনঃ' (পং ২৫)। স্থানের দেশীয় নামগুলিকেও সংস্কৃতাকার দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়। লিপিতে সর্বসমেত ২৫ পঙ্‌ক্তি লেখা আছে, প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি। বিংশ পঙ্‌ক্তিতে লিপিকাল-বিজ্ঞাপক বর্ষের সংখ্যা ১৫৯ সংবৎ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা যে গুপ্ত সংবৎ তাহা দামোদরপুর ও ধানাইদহের লিপিগুলির সহিত অক্ষর ও সন তারিখ-সংখ্যার তুলনা করিলেই সহজে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই দলিলখানি ১৫৯ গুপ্তাব্দে, অথবা ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল,—অর্থাৎ ইহার বর্তমান বয়স ১৪৫৩ চৌদ্দ শত তিপান্ন বৎসর।

এই তাম্রপট্টখানি কোন রাজকীয় দানলিপি নহে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাবৎ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসনগুলির অধিকাংশই রাজগণের দান-পত্র। কিন্তু পূর্বকালে ধর্মকর্মার্থে রাজসম্পাদিত ব্রহ্মদায় ও দেবদায়ের উদ্দেশ্যে দানলিপি ব্যতীত অন্যান্য রূপ লেখও সম্পাদিত হইত। অনেক দিন পূর্বে আমরা এক প্রবন্ধে[৪] প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসনগুলির মধ্যে অনেকগুলি সেকালের দানোদ্দেশ্যে ক্রীত ভূমির বিক্রয়-বিষয়ক লেখ। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে[৫] নানারূপ রাজকীয় শাসন ও লেখ সম্পাদনের বিধি উল্লিখিত পাওয়া যায়। পৌর ও জানপদগণের স্বকীয় ব্যবহারের জন্যও বিক্রয়-লেখ প্রভৃতি নামে পরিচিত লেখাদির বিধান নির্দিষ্ট আছে। ইতিপূর্বে ধানাইদহের লিপিখানি ও দামোদরপুরের লিপি পাঁচখানি, উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত এই ছয়খানি এবং পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের আমলের লিপি চারিখানিও এই প্রকার ভূমি-বিক্রয় লেখ। এইগুলির 'দানার্থক ভূমিবিক্রয়শাসন' নাম অধিকতর সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং সর্বসাকুল্যে এ যাবৎ আমরা বাঙ্গলা দেশে এগারখানি সাধারণ দানশাসন-বিলক্ষণ প্রায় সমজাতীয় বিক্রয়-লেখ আবিষ্কৃত পাইলাম। রাজকীয় সাধারণ দান-পত্রের যেরূপ রচনা-পদ্ধতি, এইগুলির রচনা ও বর্ণনা তদ্রূপ নহে। এগুলির মুসাবিদাও স্বতন্ত্র। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খৃষ্টাব্দের এই লিপিগুলির মুসাবিদার প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর দলিলের পাঠে বা বিবরণে সাধারণতঃ ছয়টি বিভিন্ন ভাগ বা সন্দর্ভ লক্ষিত হয়। প্রথম ভাগে কোন্ রাজার

৪ Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes, *Orientalia*, Part 2, pp. 475 ff.

৫ ক্রয়লেখ্যের একটি পরিচয় শুক্রনীতিতে (২।৩০৭) এইরূপ প্রদত্ত আছে,—"গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীত্বা তুল্যম্‌ল্যপ্রমাণযুক্। পত্রং কারয়তে যত্তু ক্রয়লেখ্যং তদুচ্যতে॥"

শাসন সময়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানীয় শাসন বিভাগের অধিকরণে কোন্ রাজ-কর্মচারীর মধ্যস্থতায় ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞাপন থাকে। এই ভাগেই কখন কখন লিপিকালও লিখিত থাকে। দ্বিতীয় ভাগে প্রার্থয়িতার ভূমি-ক্রয়ের উদ্দেশ্য এবং বিষয়-বিশেষে প্রচলিত মূল্য-বিশেষের নির্দেশ ও সেই হারে অর্থ আদায় করিয়া ভূমি বিক্রয়ের উপযোগিতা প্রদর্শন। তৃতীয় ভাগে সরকারী শাসনবিভাগের পুস্তপালগণ কর্তৃক বিক্রেতব্য ভূমির স্বত্বাবধারণ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ ও বিক্রয়ের অনুমোদন। চতুর্থ ভাগে সেই পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে, প্রচলিত হারে মূল্যের বিনিময়ে, সীমানির্দেশ পূর্বক তত্তদ্দেশে প্রচলিত-নলাদি দ্বারা বিক্রেয় ভূমির পরিচ্ছেদ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রদান। পঞ্চম ভাগে ক্রেতা যে পুণ্য কর্মের নিমিত্ত মূল্য দিয়া রাজাধিকরণ হইতে ভূমি খরিদ করিয়া ব্রাহ্মণ বা দেবতাকে ইহা দান করিলেন, তদ্বিষয়ক উল্লেখ। সর্বশেষে ষষ্ঠ ভাগে এই ভাবে ক্রীত হইয়া প্রদত্ত ভূমির অনাপেক্ষ সহকারে প্রতিপালনের জন্য পরবর্তী সংব্যবহারিদিগের স্মরণার্থ ধর্মানুশংসী শ্লোক সমূহের উদাহরণ ও লিপি-পরিসমাপ্তি। কখন কখনও এই শেষ-ভাগেও লিপিকাল-বিজ্ঞাপক বৎসর, মাস ও দিনের পরিচয় প্রদত্ত থাকে। শাসন সরকারের অনুমোদনক্রমে নির্মিত ও বিহিত হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞাপিত হওয়ার জন্য অনেক সময় রাজকীয় অধিকরণের বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুদ্রা বা শিলমোহর দ্বারা চিহ্নিত থাকিত। সেগুলি যেন মনে হয় অধুনিক রেজিস্ট্রেরী করা পাকা দলিলের মর্যাদার ন্যায় মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকিত।

এইখানে আমরা পাহাড়পুর-লিপিখানির পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তৎপরে ইহার একটি বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া, উপসংহারে লিপিবদ্ধ কয়েকটি তথ্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

লিপি পাঠ

[প্রথম পৃষ্ঠা]

১। স্বস্তি [॥ *] পুণ্ড্র [বর্দ্ধ] নাদাযুক্তকা৬ আর্য্য-নগর-শ্রেষ্ঠি-পুরোগশ্চা-ধিষ্ঠানাধিকরণম্ দক্ষিণাংশক-বীথেয়-নাগিরট্ট—

২। —মণ্ডলিক—পলাশাট্ট—পার্শ্বিক—বট—গোহালী—জম্বুদেব—প্রাবেশ্য—পৃষ্ঠিম—পোত্তক ঘোষাট—পুঞ্জক—মূল—নাগিরট্ট—প্রাবেশ্য—

৩। নিত্বগোহালীষু ব্রাহ্মণোত্তরামহত্তরাদি—কুটুম্বিনঃ কুশলমনুবর্ণ্যানু—বোধয়ন্তি [। *] বিজ্ঞাপয়ত্যস্মানৃব্রাহ্মণ নাথ—

৬ দীক্ষিত মহাশয়ের 'যুক্তক' পাঠ মূলানুগত নহে।

৪। শর্মা এতদ্ভার্য্যা রামী চ যুষ্মাকমিহাধিষ্ঠানাধিকরণেদ্বি—দীনারিক্য—কুল্য-বাপেন শাশ্বৎ—কালোপভোগ্যা—ক্ষয়নীবী—সমুদয়—বা (বা) হ্যা—

৫। প্রতিকর—খিল—ক্ষেত্র—বাস্তু বিক্রয়োনুবৃত্তস্তদহ'থানেনৈব-ক্রমেণাবয়োস্-সকাশান্দী—নারত্রয়মুঝসঙ্গহ্যাবয়ো [স্ *] স্বপুণ্যাপ্যা—

৬। য়নায় বটগোহাল্যাম (মে) বাস্যাঙ্কাশিক-পঞ্চস্তূপ—নিকায়িক—নিগ্র'ন্থ-শ্রমণাচার্য্য-গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্যাধিষ্ঠিত-বিহারে—

৭। ভগবতামহ'তাং গন্ধ-ধূপ-সুমনো-দীপাদ্যর্থন্তল-বাটক—নিমিত্তক অ [ত *] এব বট-গোহালীতো বাস্তু-দ্রোণবাপমধ্যার্দ্ধ'ঞ্জ—

৮। মরুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠম—পোত্তকেৎ[৭] (কাৎ) ক্ষেত্র[৮] -দ্রোণবাপ-চতুষ্টয়ং ঘোষাটপুঞ্জান্দ্রোণবাপচতুষ্টয়ং মূল-নাগিরট্ট—

৯। প্রাবেশ্য-নিত্ব—গোহালীতঃ অৰ্দ্ধ'ত্রিক-দ্রোণবাপানিত্যো-বমধ্যার্দ্ধ'ং ক্ষেত্র-কুল্যবাপম-ক্ষয়নীবা দাতুমি [ত্য] র] যতঃ প্রথম—

১০। পুস্তপাল—দিবাকরনন্দি-পুস্তপাল-ধৃতিবিষ্ণু-বিরোচন—রামদাস-হরিদাস-শশি-নন্দিবু (?)[৯] প্রথমনু (?)·· ······[না] মবধারণ—

১১। রাবধৃতমস্ত্যাস্মদধিষ্ঠানাধিকরণে দ্বিদীনারীক্য-কুল্য—বাপেন শশ্বৎকালোপ—ভোগ্যাক্ষয়নীবী-সমু [দয় বা (বা)] হ্যা প্রতিকর—

১২। [খিল *]-ক্ষেত্র—বাস্তু-বিক্রয়োনুবৃত্তস্তদ্যদ্যুষ্মং (ন্) ব্রাহ্মণ-নাথ-শর্মা এতদ্ভার্য্যা রামী চ পলাশাট্ট-পার্শ্বিক-বট-[১০] গোহালীস্থ (?)-য়—

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা]

১৩। ……… ব-পঞ্চস্তূপ-কুল-নিকায়িক—আচার্য্য[১১]—নিগ্র'ন্থ-গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্যাধিষ্ঠিত-সদ্বিহারে অরহ (র্হ) তাং[১২] গন্ধ-[ধূপ] -দ্যুপযোগায়

১৪। [তল-ব *] টাক-নিমিত্তঞ্চ তত্রৈব বটগোহাল্যাং বাস্তুদ্রোণবাপমধ্যার্দ্ধ'ং ক্ষেত্রঞ্জমরুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম-পোত্তকে দ্রোণবাপচতুষ্টয়ং

৭ দীক্ষিত মহাশয়ের সংশোধিত 'পোত্তকে' পাঠ অসঙ্গত প্রতিভাত হয়। শব্দটি পঞ্চম্যন্ত পাঠ করিতে হইবে।

৮ দীক্ষিত মহাশয়ের 'ক্ষেত্রং' পাঠ মূলানুগত বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

৯ এ স্থলে কতকগুলি অক্ষর নষ্ট হওয়ায় পাঠ সংশয়পূর্ণ।

১০ এস্থলের পাঠও নিঃসংশয় নহে।

১১ সম্ভিষায়া 'নিকায়িকাচার্য্য' রূপ পাঠ বিধেয় ছিল।

১২ দীক্ষিত মহাশয় পাঠটি সম্যক্ লক্ষ্য করেন নাই। এখানে প্রাকৃত প্রভাব-দৃষ্ট হয়।

১৫। ঘোষাটক পুঞ্জদ্দে (স্তে দ্রো) ৭[১৩]-বাপচতুষ্টয়ং মূল—নাগিরট্টে প্রাবেশ্য—নিম্বগোহা· ীতো দ্রোণবাপদ্বয়মাঢ় বা [প-দ্ব] য়াধিকমিত্যে বম—

১৬। ধ্যন্বং ক্ষেত্রকুল্যবাপস্প্রার্থ্য (য়ে) তেত্র ন কশ্চিদ্বিরোধঃ গুণস্তু যৎ পরমভট্টারক—পাদানামর্থোপচয়ো ধর্ম্মষড্‌ভাগাপ্যায়—

১৭। নণ্ড ভবতি তদেবংক্রিয়েতামিত্যনেনাবধারণাক্রমেণা—স্মাদ্‌ব্রাহ্মণ—নাথ—শর্ম্মত এতদ্ভার্য্যা—রামিয়া (ম্যা) শ্চ[১৪] দীনার-ত্র—

১৮। য়মায়ীকৃত্যৈতাভ্যাং বিজ্ঞাপিতক[১৫] ক্রমোপয়োগাযোপরিনির্দ্দিষ্ট—গ্রাম—গোহালিকেষু তল—বাটক-বাস্তুনাসহ ক্ষেত্র[১৬]

১৯। —কুল্যবাপ (পঃ) অথার্দ্ধোক্ষয়নীবীধর্ম্মেণ দত্তঃ কু ১ দ্রো ৪ [। *] তদুত্থাভিঃ স্বকর্ম্মণাবিরোধিস্থানে ষট্‌কনডে (লৈ) রপ—

২০। বিষ্ণ্য দাতব্যোক্ষয়নীবীধর্ম্মেণ চ শশ্বদাচন্দ্রার্ক্কতারককাল মনুপাল্যিতব্য ইতি সম্ ১০০ ৫০ ৯।

২১। মাঘ দি ৭ (। *) উক্তঞ্চ ভগবতা ব্যাসেন [। *] স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ [। *]

২২। স বিষ্ঠয়াং ক্রিমিভূর্ত্বা[১৭] পিতৃভিস্‌সহ পচ্যতে [॥ ১ ॥ *] ষষ্টি-বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ [। *]।

২৩। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ [॥ ২ ॥ *] রাজভির্ব্ব (র্ব্ব) হু ভর্দ্দত্তা দীয়তে চ পুনঃ পুনঃ [। *] যস্য যস্য।

২৪। যদা ভূমি ত (স্ত) স্য তদা ফলম্ [॥ ৩ ॥ *] পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [। *] মহীং মহীমতাং[১৮] শ্রেষ্ঠ।

২৫। দানাচ্ছ্রেয়োনুপালনং (ম্) [॥ ৪ ॥ *] বিন্ধ্যাটবীষ্বনম্ভসৃসু[১৯] শুষ্ককোটর বাসিন [: । *] কৃষ্ণাহিনো[২০] (হয়ো) হি জায়ন্তে দেবদায়ং হরন্তি যে [॥ ৫ ॥ *]

---

১৩ দীক্ষিত মহাশয়ের পাঠ 'পুঞ্জাদ্রোণ' মূলানুগত নহে। পুঞ্জ শব্দে এ-কার চিহ্ন স্পষ্ট না থাকিলেও লেখক পরবর্তী 'দ্রোণ' শব্দ হইতে একটি দ-কার কাটিয়া দিয়াছিলেন।

১৪ এখানেও রাম্যাঃ' স্থলে 'রামিয়াঃ' পাঠ প্রাকৃত ভাষার প্রভাবযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

১৫ দীক্ষিত মহাশয় 'বিজ্ঞপিত' শব্দের পর 'ক'-কারটি লক্ষ্য করেন নাই।

১৬ দীক্ষিত মহাশয়ের 'ক্ষেত্রং' পাঠ এস্থলে নির্ভুল নহে।

১৭ দীক্ষিত মহাশয়ের 'কৃমি' পাঠ মূলানুগত নহে। সংস্কৃতভাষায় 'ক্রিমি' 'কৃমি' উভয় শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮ দীক্ষিত মহাশয়ের 'মতিমতাং' বলিয়া পাঠসংশোধন অসঙ্গত বোধ হয়। মূলে 'মহীমতাং' পাঠ আছে, তাহা অশুদ্ধ পাঠ নহে।

১৯ দীক্ষিত মহাশয়ের 'অনম্বুসু' পাঠরূপে সংশোধন অপ্রয়োজনীয়।

২০ মূলপাঠে প্রাকৃত ভাষার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

স্বস্তি ॥ পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে আয়ুক্তকগণ (উচ্চ রাজকর্মচারিগণ) ও আর্য নগর-শ্রেষ্ঠিপ্রধান অধিষ্ঠানের (নগরের) অধিকরণ (শাসন-পরিষৎ) দক্ষিণাংশক বীথিতে নাগিরট্ট মণ্ডলে পলাশাট্ট পার্শ্বে অবস্থিত বটগোহালী, জম্বুদেব-প্রাবেশ্য পৃষ্ঠিম—পোত্তক, ঘোষাটপুঞ্জক ও মূলনাগরিট্ট—প্রাবেশ্য নিত্বগোহালী (এই চারিটি গ্রামের)—ব্রাহ্মণোত্তর মহত্তরাদি (গ্রামবৃদ্ধ বা গ্রামের মাতব্বরাদি) কুটুম্বিগণকে (গৃহস্বামী-দিগকে) কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া (এই আদেশ) জানাইয়া দিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তদীয় ভার্যা রামী আমাদিগকে এইরূপে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—'আপনাদের এই অধিষ্ঠানের অধিকরণে প্রতিকুল্যবাপ দুই (সুবর্ণ) দীনারের মূল্যে চিরকালভোগ্য করিয়া অক্ষয়-নীবীরূপে (রাজার) সমুদয়-বাহ্য (বা আয়বহির্ভূত) ও সর্বপ্রকার করমুক্তভাবে খিল, ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমির বিক্রয়-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অতএব, সেই নিয়মানুসারে আমাদের (স্ত্রী-পুরুষের) নিকট হইতে তিন দীনার মূল্যস্বরূপ লইয়া, আমাদের স্বপুণ্যবৃদ্ধির জন্য এই বটগোহালী (গ্রামেই) অবস্থিত কাশীর 'পঞ্চ-স্তূপনিকায়'—শাখার নিগ্রন্থ (জৈন) শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্য-গণদ্বারা অধিষ্ঠিত বিহারে ভগবান্ অর্হদ্গণের গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপাদির জন্য ও তল-বাটের নিমিত্ত, এই বটগোহালী (গ্রাম) হইতে দেড়-দ্রোণবাপ পরিমিত বাস্তুভূমি জম্বুদেব-প্রাবেশ্য পৃষ্ঠিম—পোত্তক (গ্রাম) হইতে চারি দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি, ঘোষাটপুঞ্জ (গ্রাম) হইতে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত (ক্ষেত্র)—ভূমি ও মূল-নাগিরট্ট, প্রাবেশ্য নিত্বগোহালী (গ্রাম) হইতে আড়াই-দ্রোণবাপ-পরিমিত (ক্ষেত্র)—ভূমি, (সর্বসাকল্যে) দেড়ক্ষেত্র কুল্যবাপ ভূমি অক্ষয়-নীবীরূপে আমাদিগকে দিতে আজ্ঞা হয়।"

এ-সম্বন্ধে যখন প্রথম পুস্তপাল দিবাকরনন্দী ও অন্যান্য (নিম্নস্থ) পুস্তপাল ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দি প্রভৃতির অবধারণানুসারে অবধৃত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে যে, আমাদের অধিষ্ঠানাধি রণে শশ্বৎকালভোগ্য, অক্ষয়নীবী, সমুদয়—বাহ্য, অপ্রতিকর (অকিঞ্চিৎ-প্রগ্রাহ্য) খিল ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্যে বিক্রীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ নাথ-শর্মা ও তদীয় ভার্যা রামী যে পলাশট্ট পার্শ্বিক বটগোহালীগ্রামে স্থিত, (কাশীর) 'পঞ্চস্তূপ-কুলের নিকায়িক আচার্য নিগ্রন্থ (জৈন) গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দ্বারা অধিষ্ঠিত-সদ (জৈন) বিহারে অর্হদ্গণের গন্ধধূপাদির উপযোগ জন্য ও তলবাটক-নিমিত্ত সেই বটগোহালীতেই দেড়-দ্রোণবাপ—পরিমিত বাস্তুভূমি, জম্বুদেব-প্রাবেশ্য পৃষ্ঠিম পোত্তকে চারি—দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি, ঘোষাটপুঞ্জে চারি—দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি ও মূলনাগিরট্ট-প্রাবেশ্য নিত্বগোহালীতে আঢ়বাপদ্বয়াধিক দ্রোণবাপদ্বয়-

পরিমিত ক্ষেত্রভূমি, এই প্রকারে সর্বসমেত দেড়-ক্ষেত্রকুল্যবাপ পরিমিত ভূমি আমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে কোনরূপ বিরোধ (বা দোষ) নাই, বরং ইহাতে এই গুণ আছে যে, পরমভট্টারকপাদের (অর্থাৎ শাসক মহারাজাধিরাজের (কিছু) অর্থোপচয় ও ধর্মষড়্ভাগের লাভও হইবে,—অতএব, এইরূপ (ভূমি-বিক্রয়) কার্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(পুস্তপালগণের) এই অবধারণাক্রমেই এই ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তদীয় ভার্যা রামীর নিকট হইতে তিন দীনার (রাজার) আয় করিয়া বিজ্ঞাপিতক্রমে উপযোগের (বা ব্যবহারের) নিমিত্ত উপরি-নির্দিষ্ট গ্রাম-গোহালিক সমূহে তলবাটক-বাস্তু সহ দেড় ক্ষেত্র-কুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি অক্ষয়-নীবীধর্মানুসারে তাহাদিগকে দত্ত হইল। কু (ল্যাবাপ) ১ দ্রো (ণ) ৪।

অতএব, আপনারা নিজ কর্মদ্বারা অবিরোধি-স্থানে (বিক্রীত ভূমি অন্যান্য ভূমি হইতে ছয় (ছয়) নলদ্বারা (মাপিয়া) পৃথক করিয়া দিউন এবং অক্ষয়-নীবীধর্মের স্মরণ রাখিয়া চিরকাল চন্দ্র-সূর্য তারক-সমকাল পর্যন্ত ইহার অনুপালন করুন। ইতি সং (বৎ) ১০০, ৫০, ৯ (=১৫৯), মাঘ [মাসের] ৭ দি [ন]।

ভগবান ব্যাসও (এ সম্বন্ধে) এইরূপ বলিয়াছেন,—

(১) ভূমি স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই পিতৃগণ সহ বিষ্ঠায় কৃমি-রূপে পচিতে থাকিবেন ॥

(২) ভূমিদানকারী ষাইট হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং (ভূমির) অক্ষেপ-কারীও (সেই কার্যের) অনুমোদনকারী তত বৎসর পর্যন্তই নরকে বাস করেন ॥

(৩) (পূর্ববর্তী) বহুসংখ্যক রাজা ভূমি দান করিয়াছেন ও (এখনও) অনেক রাজা পুনঃ পুনঃ ভূমি দান করিয়া থাকেন,—(কিন্তু) যিনি যখন ভূমির অধিপতি থাকেন, তিনি তিনিই সেই (দান নিমিত্তক) ফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥

(৪) হে যুধিষ্ঠির! দ্বিজাতিগণকে পূর্বে মহী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্ন পূর্বক রক্ষা করিবে; যে-হেতু হে ভূম্যধিকারিগণের শ্রেষ্ঠ! দান করা অপেক্ষায় দানের অনুপালন অধিক শ্রেয়োদায়ক হইয়া থাকে ॥

(৫) যাহারা দেবদায় (দেবোত্তর সম্পত্তি) হরণ করে, তাহারা কিন্তু জলশূন্য বিন্ধ্যাটবীস্থলে শুষ্ককোটরবাসী কৃষ্ণসর্পরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তাম্রপট্টখানি ক্রেতার দানোদ্দেশে সম্পাদিত ভূমিবিক্রয়ের দলিল এবং ইহা প্রাচীন বাঙ্গলায় প্রচলিত ভূমি-বিক্রয় প্রথার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লিপিমর্ম হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, গুপ্তসংবৎ ১৫৯ বর্ষে (৪৭৮-৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) ৭ই মাঘ তারিখে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির রাজধানীতে যে আযুক্তকগণ ও নগর শ্রেষ্ঠিপুরোগ অধিষ্ঠানাধিকরণ রাজ-শাসন পরিচালন করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ নাথশর্মা

ও তদীয় ভার্যা রামী বটগোহলীগ্রামে অবস্থিত কাশীর পঞ্চস্তূপ (বা তৎকুল) নিকায়-শাখার নিগ্রন্থ (জৈন) শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যগণদ্বারা অধিষ্ঠিত বিহারে ভগবান্ অর্হদ্‌গণের (জৈনতীর্থঙ্করদিগের) গন্ধ ধূপ, পুষ্প, দীপাদি-পূজোপকরণ ও তলবাটের জন্য দেড়কুল্যবাপ-পরিমিত বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি অক্ষয়নীবীরূপে প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্য হারে সরকার হইতে খরিদ করিয়া লইয়া দান করিবার অভিপ্রায়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তৎপর সেই উচ্চ রাজকর্মচারীগণ বিক্রেতব্য গ্রাম-সম্পর্কিত ব্রাহ্মণোত্তর মহত্তরাণি গৃহপতিদিগকে নাথশর্মা ও রামীর এই অভ্যর্থনার বিষয় জানাইয়া আদেশ করিতেছেন যে, সরকারী প্রধান পুস্তপাল দবাকরনন্দী ও অন্যান্য নিম্নস্থ পুস্তপালগণের (government record-keepers) অনুসন্ধান ও অবধারণাক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাহাদের নিকট হইতে তৎপ্রদেশে প্রচলিত হারে মূল্য লইয়া তিন দীনার মুদ্রার বিনিময়ে প্রার্থিত দেড়কুল্যবাপ-ভূমি বিক্রয় করার ব্যবস্থাতে সরকার-পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। সেই উচ্চ রাজকর্মচারীরা আরও আদেশ করিলেন যে, প্রচলিত নলদ্বারা মাপিয়া তাঁহারা যেন প্রার্থিত ভূমি অন্যান্য ভূমি হইতে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত করিয়া নাথশর্মা ও তাহার ভার্যা রামীকে প্রদান করেন।

এখন দেখা যাউক, এই লিপি-মর্ম হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার কি কি ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, (দিনাজপুর জেলার) দামোদরপুরে গুপ্তযুগের তাম্রশাসন পাঁচখানি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ঐতিহাসিকগণ কেহই বলিতে পারিতেন না, বাঙ্গলার কোন দেশবিভাগ উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট্ গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন ছিল কিনা। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেই লিপিগুলির যথাসম্ভব পাঠোদ্ধার ও ব্যাখার সাহায্যে প্রথমতঃ এরূপ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ ১২৪ গুপ্তাব্দ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৪৪৩-৪৪ হইতে ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) একশত বৎসর পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে নিজ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত রাখিয়া, গুপ্তসম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত এবং সম্ভবতঃ ভানু (?) গুপ্ত সেকালের উত্তবঙ্গ প্রদেশ শাসন করিতেন। তখন এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তঃপাতী অনেকগুলি বিষয় বা জেলা বর্তমান ছিল। পঞ্চম হইতে নবম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কয়েকটি বিষয়ের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে খাদাপার বা খাটাপার, কোটিবর্ষ মহান্তা-প্রকাশ, স্থালীক্কট প্রভৃতির নাম সুবিদিত। উপরি উল্লিখিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীন ও তাহাদের দ্বারাই নিযুক্ত বিষয়-পতিগণ (আয়ুক্তকগণ) তৎ-তৎ বিষয়ের অধিষ্ঠানে (জেলানগরে) অবস্থিত অধিকরণ বা পরিষদের (council or board of administration) সাহায্যে রাজকার্যের 'সংব্যবহার' বা পরিচালন করিতেন। অন্যান্য তাম্রশাসনে আমরা পাইয়াছি যে, এই অধিকরণগুলিতে

নগরশ্রেষ্ঠী প্রথম সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক ও প্রথা-কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত চারিজন সভ্যও থাকিতেন। ইহা হইতে এইরূপ প্রতীত হয় যে, বিষয়-পতিগণের শাসন-পরিষদের এই সভ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি নগর-শ্রেষ্ঠী বলিয়া অভিহিত, তিনি সম্ভবতঃ, নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ সেখানে থাকিতেন ; যিনি প্রথম-সার্থবাহ-নামে পরিচিত, তিনি সেস্থানের বণিক্‌সঙ্ঘের প্রতিনিধি ; যিনি প্রথম-কুলিক সংজ্ঞার পরিজ্ঞাত, তিনি কারুশিল্পীদিগের প্রতিনিধি ; এবং যিনি প্রথম-কায়স্থ (অন্যত্র 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' সংজ্ঞক) তিনি হয়, শ্রেষ্ঠ করণিক বা লেখকরূপে (অথবা 'সর্বাধিকারী' chief secretary-রূপে) সেখানে কার্য করিতেন। আলোচ্য শাসনে অধিকরণটি কেবল 'আর্য্য-নগরশ্রেষ্ঠি-পুরোগ' বলিয়া বর্ণিত পাওয়া যাইতেছে। কেন যে বুধগুপ্তের রাজ্যের এইভাগে শাসন-পরিষৎ এইরূপ একজন সভ্য লইয়া গঠিত হইয়া থাকিবে, তাহা বলা যায় না। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা উচিত যে, সংস্কৃত-সাহিত্যের মৃচ্ছকটিক-নামক প্রকরণের ব্যবহার সংজ্ঞক অঙ্কে বিচারক (অধিকরণিক) শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ-সংজ্ঞক দুই ব্যক্তিকে সভ্যরূপে সঙ্গে লইয়া চারুদত্তের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, দামোদর পুরে আবিষ্কৃত সম্রাট্‌ বুধগুপ্ত ও ভানু (?) গুপ্তের আমলের দুইখানি তাম্রশাসনে "কোটিবর্ষবিষয়াধিষ্ঠানাধিকরণস্য" এই লিপি সংবলিত মুদ্রা বা শিল সংলগ্ন ছিল, অর্থাৎ তাম্রশাসনদ্বয় কোটিবর্ষ জেলা অধিষ্ঠান (নগর)-স্থিত অধিকরণের মুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। 'পরমদৈবত-পরম-ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ' বুধগুপ্তের তাম্রশাসন ও মুদ্রাদিতে যে সমস্ত সন তারিখের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি ১৫৭ গুপ্তাব্দ হইতে ১৭৫ গুপ্তাব্দের (অর্থাৎ ৪৭৬ হইতে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের) ভিতর পড়ে। পাহাড়পুর শাসনের সংবৎ ১৫৯, সুতরাং ইহা যে গুপ্ত সংবৎ এবং ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অভিন্ন, তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। কাজেই ইহাতে উল্লিখিত আযুক্তকগণ ও অধিকরণটি সম্রাট্‌ বুধগুপ্তের পাদ-পরিগৃহীত। ইহাতে যে (১৬ পঙ্‌ক্তিতে), 'পরমভট্টারক' পদের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তিনি স্বয়ং গুপ্তসম্রাট্‌ বুধগুপ্তই হইবেন। বহুকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, বুধগুপ্ত কেবল মালব প্রদেশের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তি বড় ক্ষীণ ছিল। উত্তরবঙ্গের তাম্রলিপিগুলির আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার ফলে, সেই আংশিক সত্য দূরীভূত হইয়াছে এবং আমরা এই পূর্ণ সত্য জানিয়াছি যে, সম্রাট্‌ বুধগুপ্ত উত্তর-ভারতে একদিকে মালব এবং অপরদিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত একচ্ছত্রাধিপত্য ভোগ করিয়া ছিলেন।

সেকালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয়ে বা জেলাতে প্রচলিত ভূমি-বিক্রয়-প্রথা বিভিন্ন রকমের ছিল। কোনও বিষয়ে ভূমি প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্যে, আবার কোথাও তিন দীনার দরে ["অনুবৃত্তত্রিদীনারিক্য-কুল্যবাপ-বিক্রয়মর্য্যাদা"] বিক্রীত হইত।

পূর্ববঙ্গের (ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত) এই শাসনের কিছু পরবর্তী সময়ের যে কয়েকখানি ভূমি-বিক্রয়-লেখের উল্লেখ পূর্বে একবার করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলে প্রতিকুল্যবাপ ভূমি চারি দীনার মূল্যে ['চতুর্দ্দীনারিক্য-কুল্যবাপেন'] বিক্রীত হইত। আলোচ্য শাসনে মূল্যের হার দুই দীনার বলিয়া উল্লিখিত।

প্রাচীন ভারতে 'কুল্য', 'দ্রোণ', 'আঢক' প্রভৃতি শব্দ শস্যাদি পরিমাপের মান বলিয়া অর্থশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত পাওয়া যায়। পরে ক্ষেত্রাদি ভূমি মাপিবার জন্যও এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশ আবিষ্কৃত অনেকগুলি প্রাচীন লিপিতে আমরা কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ প্রভৃতি শব্দ ভূমির পরিমাণ-বাচক বলিয়া ব্যবহৃত দেখিতে পাইয়াছি। আলোচ্য শাসনে আঢ়-বাপ বলিয়াও একটি শব্দ পাওয়া গেল। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ ততখানি, যতখানিতে এককুল্য পরিমিত বীজ বপন করা চলিত? সেইরূপ হয়ত এক দ্রোণ বা আঢ়-পরিমিত যতখানি ভূমিতে বপন করা চলিত, ততখানি ভূমি এক দ্রোণ-বাপ বা এক আঢ়-বাপ ভূমি। এই শাসন হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আট দ্রোণবাপে এক কুল্যবাপ ভূমি পরিমিত হয়, কারণ ইহাতে ১২ দ্রোণবাপে দেড়কুল্যবাপ ভূমি বলিয়া মোট পরিমাণ সূচিত হইয়াছে। আবার ৪ আঢ়বাপে এক দ্রোণ-বাপ পরিমিত হয়। প্রাচীন কালে গ্রামের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপ প্রমাণরূপে ধরিয়া আট-নয়-হাতী নল দ্বারা ["অষ্টক—নবক—নলাভ্যাম্"] ভূমি মাপের প্রথার উল্লেখ তাম্রশাসনাদিতে পাওয়া গিয়াছে। এই শাসনে ছয় হাতী নলের ব্যবহার কথা ["ষট্‌ক"—নলেন] লিখিত আছে। এখনও বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে অনেকস্থানে নলদ্বারা ভূমি মাপিবার রীতি রক্ষিত রহিয়াছে।

দীনার-শব্দটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশীয় শব্দ নহে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন-কালে (মৌর্যযুগাদিতে) সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। পরবর্তী কুষাণরাজগণের রাজ্যসময়ে সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[২১] 'পণ' ও 'মাষ' নামে যে মুদ্রার উল্লেখ আছে, তাহা যথাক্রমে রূপ্য-রূপ ও তাম্র-রূপ অর্থাৎ রূপার টাকা (রূপেয়া) ও তামার টাকা বলিয়া প্রচলিত ছিল। এই সব মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেন লক্ষণাধ্যক্ষ নামক রাজকর্মচারী ও পণযাত্রার (বা currency) ব্যবস্থা করিতেন যে রাজকর্মচারী, তাঁহার নাম ছিল 'রূপ-দর্শক'। নারদ ও বৃহস্পতির স্মৃতিতে সোনার মোহরের 'সুবর্ণ' ও 'দীনার' এই দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের রাজগণের মুদ্রাও এই দুই নামেই পরিচিত ছিল

২১ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় অধিকরণ, ১২শ অধ্যায়।

বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই যুগে যে ভারতবর্ষের সহিত রোমসাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ভাবে বর্তমান ছিল, ঐতিহাসিকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। রোমের সুবর্ণ মুদ্রার নাম ছিল দেনারিউস বা দীনারিউস (denarius)। ভারতীয়গণ সেই নামানুসারে এই দেশে প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রার অন্যতর নাম রাখিলেন দীনার। তাঁহারা প্রতীচ্য শব্দটিকে সংস্কৃত শব্দ করিয়া লইলেন।

অন্যান্য প্রাচীনলিপির ন্যায় এই লিপিতেও আমরা তিন প্রকার ভূমির মান পাইতেছি ; যথা—খিল, ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি। যে ভূমির অপর নাম 'অপ্রহত' অর্থাৎ যাহাতে হলকর্ষণ করা হয় নাই, সুতরাং যাহা সাধারণতঃ পতিত জমি বলিয়া জ্ঞাত, তাহাই 'খিল' ভূমি। কর্ষণযোগ্য ভূমি 'ক্ষেত্র' ভূমি ও গৃহনির্মাণাদি দ্বারা বাসের যোগ্য ভূমির নাম 'বাস্তু' ভূমি। 'অক্ষয়নীবী' রূপে ভূমি বিক্রয় ও দানের অর্থ কি ? তাহাও একটু বিবেচ্য। সংস্কৃত 'নীবী' শব্দের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারে যাহা মূলধন বা মূলদ্রব্য সেরূপ অর্থও পরিদৃষ্ট হয়। কোন ভূমি বা ধন যদি কেহ অক্ষয়-নীবীরূপে প্রদান করেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ক্রেতা বা প্রতিগ্রহীতা মূলের নাশসাধন না করিয়া ইহাকে চিরস্থায়ী দায় মনে করিয়া ইহার আয় দ্বারা উদ্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিবেন। এরূপ সর্ত থাকিলে তিনি মূলধন নষ্ট করিতে পারিবেন না অথবা প্রদত্ত বা বিক্রীত ভূমি হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না—এই প্রথাই 'অক্ষয়-নীবী-ধর্ম' অনুসারে দান-বিক্রয়-প্রথা।

বটগোহালী গ্রামে যে জৈনবিহারের অর্হৎগণের পূজাদির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ নাথশর্মা সস্ত্রীক রাজসরকার হইতে ভূমি খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বিহারটি লিপিকালের অর্থাৎ ৫৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব সময় হইতেই সেখানে বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দীই সর্বপ্রথম ইহা স্থাপিত করেন এবং লিপি-সম-সময়ে ইহা তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। উত্তর-ভারতে যে সকল ঐতিহাসিক যুগেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম অপ্রতিহতভাবে সেবিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌর্য সম্রাট্ অশোকের সময়েও বৌদ্ধদিগের সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রর্ন্থ (জৈন) ও আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকও পরস্পর অবিরোধে ও অবিদ্বেষে স্ব-স্ব ধর্মের সাধন করিতেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গুপ্তনরপতিগণ 'পরমভাগবত' ও 'পরমদৈবত' বলিয়া প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের রাজ্য-সময়ে অনেক নরপতি ও প্রজাজন জৈন ও বৌদ্ধবিহারাদির সুবিধার জন্য ভূমি ও অর্থ দান করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের পালরাজগণ ধর্মহিসাবে 'পরম-সৌগত' ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি কোনরূপ ধর্মবিদ্বেষ পোষণ করিতেন না, বরং কোন কোন নরপতি রাজ্যশাসন কার্যের অনুরোধে ব্রাহ্মণজাতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিয়া এমন কি, তাঁহাদের

আচার-নিয়মের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নাথশর্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তথাপি জৈনবিহারের প্রয়োজনে ভূমি খরিদ করিয়া তাহা দান করিয়াছিলেন। কি অদ্ভুত পরধর্মসহনশীলতা সে কালের ভারতবর্ষীয় জনগণের মনে স্থান পাইত ! সকল ধর্মাবলম্বীরাই এক সমাজে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিত। বটগোহালীনামক স্থানটিই হয়ত পরে গোয়ালভিটা নামে পরিচিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই জৈনবিহারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রমণাচার্য গুহনন্দীকে তাম্রশাসনে আমরা কাশিক বলিয়া আখ্যাত পাইতেছি। তবে কি তিনি কাশী হইতে উত্তরবঙ্গে আসিয়া এই বটগোহালী-গ্রামে প্রথমতঃ এই বিহার স্থাপিত করেন ? তদীয় অপর বিশেষণ 'পঞ্চ-স্তূপ (বা পঞ্চস্তূপ কুল) নিকায়ী' বলিয়া শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে 'পঞ্চনিকায়ী'—শব্দের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং ইহার অর্থ যিনি 'দীঘ-নিকায়াদি' পঞ্চ নিকায়শাস্ত্রে পারঙ্গম। কিন্তু এখানে 'পঞ্চ' ও 'নিকায়ী' এই দুই শব্দের মাঝখানে একত্র 'স্তূপ' ও অন্যত্র 'স্তূপকুল'—শব্দ প্রযুক্ত থাকায়, দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, এখানে 'নিকায়'—'শব্দটিকে' জৈন আচার্যগণের কোন শাখা 'অর্থে' প্রযুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং সেই শাখার নিবাস সম্ভবতঃ পঞ্চস্তূপ-নামক কোন স্থানবিশেষে সম্বদ্ধ ছিল। এইরূপ মনে করিয়া তিনি আচার্য গুহনন্দীকে 'পঞ্চস্তূপ' বা 'পঞ্চস্তুপকুলে'র শাখা হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালাদেশে যে এই গুপ্তযুগে জৈনাচার্যগণের প্রকৃষ্ট প্রভাব বর্তমান ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই লিপিকালের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ্ আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন পরিভ্রমণ করিবার সময়ে সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখিয়া তন্মধ্যে দিগম্বর নিগ্রন্থদের সংখ্যাধিক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[২২] এমন কি, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দে দিগম্বর জৈনাচার্যদিগের মধ্যে যশোনন্দী, জয়নন্দী, কুমারনন্দী প্রভৃতি জৈনাচার্যগণের নামতালিকাও পাওয়া যায়। মোট কথা, পুণ্ড্রবর্দ্ধনও প্রাচীন-জৈনাচার্যগণের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিমা-গৃহে রক্ষিত উত্তরবঙ্গের মান্দাইল—নামক স্থান হইতে সংগৃহীত একটি জৈনতীর্থঙ্করের মূর্তিও এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা এই লিপিতে সরকারী নথিপত্রে নিবন্ধ-পুস্তক রক্ষাকারী পুস্তপালগণের মধ্যে কয়েকটি নাম পাইয়াছি,—যথা দিবাকর নন্দী, ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশী নন্দী প্রভৃতি। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীদের ডাক-নাম

২২ Watters, *On Yuan Chwang*, vol, II, p. 184.

কেমন ছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসুদিগের দৃষ্টি এই নাম কয়েকটিতে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বুধগুপ্তের সময়ের উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত অপর দুইখানি লিপিতেও আমরা পুস্তপালগণের নামের মধ্যে পত্রদাস, বিষ্ণুদত্ত, বিজয়নন্দী, স্থাণুনন্দী প্রভৃতি নাম পাইয়াছি। আবার পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দের লিপিগুলিতেও শুচি পালিত, প্রিয় দত্ত, বিহিত ঘোষ, জনার্দন কুণ্ডু প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। দত্ত, নন্দী, পালিত, ঘোষ, কুণ্ডু প্রভৃতি কুল বা গোত্রনামের সৃষ্টি কি বাঙ্গালাদেশে এত পূর্বকালেই হইয়াছিল? এই গোত্রনামগুলির ব্যবহার অনেকেরই একটু বিস্ময় উৎপাদন করিবে, মনে হয়;

ব্রহ্মদায় বা দেবদায়-বিষয়ক লেখের সম্পাদন সময়ে সরকারী নগর-শাসন পরিষৎ ও আয়ুক্তকগণ বিক্রীত ও প্রদত্ত গ্রামগুলির গ্রামমহত্তর ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে কেন উপস্থিত রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিক্রয় বা দানের কথা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—ইহাও একটি আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। অর্থশাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে যে, কোন লেখ সম্পাদন সময়ে ও সীমাদির বিবাদ নির্ণয়কালে গ্রামবৃদ্ধদিগকে সম্মুখে রাখিতে হইত। এখানে দেখিতেছি, বিক্রীত ভূমিতে অধিকার ছিল মহারাজাধিরাজের, অথচ তাঁহার উচ্চকর্মচারিগণ বিজ্ঞাপন করিতেছেন ব্রাহ্মণাদির মহত্তর কুটুম্বিগণকে। এই বিক্রয়মূলে রাজার স্বত্ব বিক্রীত ভূমিতে রহিত হইল এবং দলিল-সম্পাদন কাল হইতে তিনি আর সেই ভূমি হইতে কোনরূপ 'সমুদয়' (আয়) বা করাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না—ইহারই অবগতির জন্য তাঁহাদিগের তথায় উপস্থিতি ঘটাইতে হইত কি? অথবা প্রদত্ত ভূমি রাজকীয় হইলেও, মূলে সব ভূমিতেই প্রজাবর্গের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হইত—ইহারই অভ্যুপগমের নিমিত্ত মহত্তরাদির উপস্থিতি দলিল-সম্পাদন সময়ে দরকার বোধ হইত কি? এই সব প্রশ্নের সমাধান দুরূহ এবং এস্থলে ইহা ইষ্ট বলিয়া মনে হয় না। বিক্রয় কালের পরে প্রদত্ত ভূমিজাত আয়-প্রত্যায় প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ বা দেবাদির জন্যই সংগৃহীত হইবে, রাজকোষের জন্য নহে, ইহাই এইরূপ শাসনের বিধান।

এই যুগের বাঙ্গালাদেশের ধর্ম, সমাজ, বাণিজ্য, কথিতভাষা, সংস্কৃত রচনায় গৌড়ীরীতির প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্যও এইরূপ তাম্রশাসনের ন্যায় ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন আরও বহুকাল পর্যন্ত অনুভূত হইবে।

শ্রীবিমলকুমার পালের সৌজন্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বাঙ্গলা এসোসিয়েশনের অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৯।

জীব

হরিসত্য ভট্টাচার্য

জগতের জড়াতিরিক্ত পদার্থকে জৈন দার্শনিকগণ জীব কহিয়া থাকেন। যোগ ও সাংখ্য দর্শনে যাহা পুরুষ, ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শনে যাহা আত্মা বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহাই জৈন দর্শনে জীব নামে পরিচিত। অথচ সাংখ্য ও যোগের প্রতিপাদ্য পুরুষের সহিত জিনদর্শনের জীবের প্রভেদ আছে; ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আত্মা ও জৈন দর্শনের জীব এক পদার্থ নহে; বেদান্তের আত্মা ও আর্হত মতের জীব বিভিন্ন। চার্বাক প্রচারিত নিরাত্মবাদও জৈনগণের অনাদৃত। বৌদ্ধের বিজ্ঞান প্রবাহবাদ ও জৈন দার্শনিকগণ খণ্ডন করিয়া থাকেন। তাহা হইলে জৈন দর্শন সম্মত জীবের লক্ষণ কি? কুন্দকুন্দাচার্য বলেন—

জীবোত্তি হবদি বেদা উবওগবিসেসিদো পহূ কত্তা।
ভোত্তা চ দেহমত্তো ণ হি মুত্তো কম্মসংজুত্তো॥ ২৭

—পঞ্চাস্তিকায় সময়সারঃ

জীব অস্তিত্ববান, চেতন, উপযোগবিশিষ্ট, প্রভু, কর্তা, ভোক্তা, দেহমাত্র, অমূর্ত ও কর্ম সংযুক্ত।

আচার্য নেমিচন্দ্রও বলিয়াছেন—

জীবো উবওগমও অমুত্তি কত্তা সদেহপরিমাণো।
ভোত্তা সংসারত্থো সিদ্ধো সো বিস্সসোড্ঢগেঈ॥ ২

—দ্রব্য সংগ্রহঃ

জীব উপযোগময়, অমূর্ত, কর্তা, স্বদেহপরিমাণ, ভোক্তা, সংসারস্থ, সিদ্ধ ও স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগতি।

শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য বাদিদেব বলিয়াছেন—

চৈতন্যস্বরূপঃ পরিণামী কর্তা সাক্ষাদ্ভোক্তা স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ পৌদ্গলিকাদৃষ্টবাংশ্চায়ম্।

—প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালংকারঃ ৭।৫৬

জীব চৈতন্যরূপ, পরিণামী, কর্তা, ভোক্তা, স্বদেহপরিমাণ, প্রতিক্ষেত্রে বিভিন্ন, কর্মপরতন্ত্র।

উপরোদ্ধৃত বচনাবলী হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে জৈন মতে জড়াতিরিক্ত জীবাখ্য সত্য পদার্থ আছে; তাহা চেতন, অমূর্ত, সংসারী অবস্থায় কর্মপরবশ, কর্তা, ফলভোক্তা, দেহ পরিমাণ, প্রভু ইত্যাদি।

চার্বাকগণ জড়াতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ক্ষিতি জল, বায়ু ও তেজঃ এই চারি ভূতই সত্য ; এতদ্ব্যতীত আর কোনও একান্ত সৎ পদার্থ নাই ; জগতের সমস্ত পদার্থই এই চারি মহাভূতের সংমিশ্রণাদির ফলে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যাদি জীব চেতন—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে চৈতন্য আছে বলিয়া একটা আত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন ধান্যগুড়াদি পচিয়া মাদক পদার্থের সৃষ্টি হয় সেইরূপ চৈতন্যটাও পূর্বোক্ত ভূত চতুষ্টয়ের একটা অদ্ভুত পরিণাম—ইহাই চার্বাকগণের অভিমত। বর্তমান যুগের জড়বাদি দার্শনিকগণও কতকটা এই কথারই প্রতিধ্বনি করেন। তাঁহাদের মতে—যেমন যকৃৎ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়, সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় ; অতএব আত্মা নামে একটা জড়াতিরিক্ত পৃথক পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এ আপত্তির এক উত্তর এই যে ধান্যগুড়াদির পরিণাম একটা জড় পদার্থই ; যকৃৎ হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা জড ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড় হইতে জড়েরই উৎপত্তি হইতে পারে—মস্তিষ্ক হইতে তদনুরূপ কোন জড়দ্রব্য প্রসূত হইতে পারে ; কিন্তু যাহা জড় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেই চৈতন্য কিরূপে মস্তিষ্কাদি জড় পদার্থের পরিণাম হইতে পারে ? এই নিমিত্ত বর্তমান যুগের অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ জড়বাদ পরিহার করিয়া চৈতন্যের একটা পৃথক সত্ত্বা স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণও চৈতন্যকে জড়ের প্রসব মাত্র বলিতে পারেন নাই ; বরং তাঁহারা একমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষণিকসত্ত্বা স্বীকার করিয়া জড়বাদের নিরাস করিয়াই গিয়াছেন। জীবে চৈতন্যগুণের আরোপ করিয়া জৈন দার্শনিকগণও বৌদ্ধগণের ন্যায় জড়বাদী চার্বাক মত পরিহার করিয়া থাকেন।

চার্বাকমত খণ্ডন বিষয়ে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে যদি চৈতন্য জড় শরীরের পরিণাম হইত, তাহা হইলে প্রাণী মৃত হইলেও তাহার চৈতন্য অটুট থাকিত ; কেননা মৃত অবস্থায় শরীর অটুটই থাকে ; বরং জ্বরাদির বিচ্ছেদ হওয়ায় মৃত্যুকালে শরীর আরও সুস্থ থাকে। জড় শরীরকে চৈতন্যের কারণ বলা যাইতে পারে না। শরীরকে যদি চৈতন্যের সহকারী কারণ বলা যায়, তাহা হইলে চৈতন্যের উপাদান কারণ স্বরূপ একটা অশরীর অজড় পদার্থের কল্পনা করিতে হয়—তাহা চার্বাক মত বিরুদ্ধ। আবার শরীরকে চৈতন্যের উপাদান কারণ বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে শরীরের প্রত্যেক বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের একটা বিকৃতি অনুভূত হইত। এদিকে আবার হর্ষবিষাদমূর্চ্ছানিদ্রাভীতিশোকাদি চৈতন্যবিকার সমূহের অনুরূপ বিকার শরীরে দেখা যায় না। সুবিপুল শরীর বিশিষ্ট প্রাণিসকলের বুদ্ধি অনেক সময়ে অল্পই দেখা যায় এবং ক্ষুদ্রকায় অনেক জন্তুর বুদ্ধি অনেক সময়ে অত্যন্ত অধিকই দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত চৈতন্য-প্রবাহের মধ্যে যে একটা 'অহং' জ্ঞান—একটা 'আমি'

ইত্যাকার জ্ঞান সর্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জ্ঞানটী শরীর হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। কারণ শরীর 'আমার শরীর' এইরূপই জ্ঞান হইয়া থাকে ; তাহা হইলে এই যে 'আমি'—তাহা শরীর হইতে বিভিন্ন ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিতে হইবে।

চৈতন্য জড় পদার্থের বিকার নহে—এ বিষয়ে জৈনগণের সহিত একমত হইলেও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ আত্মা নামক একটা সৎপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার লয় হয় ; এই বিজ্ঞান সমূহের মূলে কোনও স্থায়ী সৎপদার্থ নাই। এক ক্ষণের বিজ্ঞান সংস্কাররূপে পরক্ষণের বিজ্ঞানের কারণ ; আবার এই কার্যস্বরূপ পরক্ষণ বিজ্ঞান তৎপরক্ষণের বিজ্ঞানের কারণ। এইরূপে পরস্পর বিভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে পরম্পরা-ক্রমে একটা কার্যকারণ ভাব রহিয়াছে, এইজন্য ক্ষণিক বিজ্ঞান-সমূহ একটা বিজ্ঞান-প্রবাহরূপে কল্পিত হয় এবং বৌদ্ধগণ এই কার্যকারণ ভাব গ্রথিত বিজ্ঞান-প্রবাহকে বিজ্ঞান-সন্তান এই আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে প্রবাহরূপী বিজ্ঞান সন্তান ব্যতীত কোনও আত্মা বা জীবপদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। Hume, Mill প্রভৃতি বর্তমান যুগের Sensationist দার্শনিকগণও বৌদ্ধগণের ন্যায় বিজ্ঞানবাদী ও নিরাত্মবাদী, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে একটা চৈতন্যের ধারা (Flow) বা অপরিসমাপ্ত (Continuum) কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত বৌদ্ধ দর্শনের বিজ্ঞান প্রবাহের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

নিরাত্মবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে ক্ষণিক বিজ্ঞান-সমূহের মূলে কোনও নিয়ামক সৎপদার্থ স্বীকার না করিলে, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যায় এবং সন্তান বা বিজ্ঞানপ্রবাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। আত্মা না থাকিলে ক্ষণিক বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা সম্ভবপর হয় না—তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকিলে স্মৃতি (পূর্বানুভূতির পুনঃ প্রবোধ) ও প্রত্যভিজ্ঞা (উহা এবং তাহা একই—ইত্যাকার জ্ঞান) সম্ভবপর হয় না এবং পূর্ব কথিত 'আমি' এই জ্ঞানেরও কারণ পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে বেদন্তদর্শন বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ অনেক স্থলেই নিরাস করিয়াছেন। জৈনাচার্যগণও জড়াতিরিক্ত জীবপদার্থ স্বীকার করিয়া এবং তাহাতে অস্তিত্বের আরোপ করিয়া এই বিজ্ঞানবাদে দোষাবিষ্কার করিয়াছেন।

বৌদ্ধগণের অনাত্মবাদের নিরাস কল্পে জৈনগণ বলেন যে জীব পদার্থের অস্বীকারে স্মৃতি সম্ভবপর হয় না ; কারণ যদি একান্ত বিভিন্ন (স্বলক্ষণ) বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে একের অনুভবে অপরের স্মৃতি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে এক ব্যক্তির অনুভূত বিষয় অপর ব্যক্তির স্মৃতিগোচর হইতে পারে। অবশ্য বৌদ্ধগণ বলেন, এক সন্তানভুক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ই স্মৃত হয় কারণ এক সন্তানভুক্ত বিজ্ঞান সমূহ কার্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কিন্তু তাহার উত্তরে জৈনগণ বলেন যে যখন বিজ্ঞানসমূহ বৌদ্ধ মতে

স্বলক্ষণ অর্থাৎ একান্ত বিভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন কিরূপে একের অনুভবে অপরের স্মৃতি হইতে পারে ; আর কোন নিয়ম নাই। বিজ্ঞানসমূহ একান্ত বিভিন্ন এবং তন্মূলে কোনও আত্মানামক সৎপদার্থ নাই, একথা বলিলে 'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতপ্রণাশ' নামক দুইটী দোষ আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধমতে চৈত্যবন্দনা একটী সৎকর্ম এবং তাহার ফলে সুফল লাভ হয়। এখন কথা এই যে—যে জ্ঞান চৈত্য বন্দন করিল, সে জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইল—তাহা হইলে চৈত্যবন্দনার সুফল ভোগ করে কে? ইহাই কৃতপ্রণাশ। আবার সুফল ভোগকারী জ্ঞান ইতিপূর্বে ছিল না, তাহা হইলে কিরূপে ইহা চৈত্য বন্দনার সুফল ভোগ করিতে পারে? ইহারই নাম অকৃতাভ্যাগম। জৈনগণ বলেন, নিরাত্মবাদ প্রকৃতপক্ষে কর্মফলবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে।

বৌদ্ধগণের নিরাত্মবাদের পরিহার বিষয়ে জৈনদর্শন বেদান্তদর্শনের সহিত একমত হইলেও, বেদান্তের সহিত জিন সিদ্ধান্তের মৌলিক ভেদ আছে। বেদান্তদর্শনে জীবাত্মাসমূহের পারমার্থিক সত্তা নাই। আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়—অদ্বৈত ব্রহ্ম। অসংখ্য অসংখ্য পরিদৃশ্যমান জীব-আত্মা সমূহ সেই এক অদ্বিতীয় একমাত্র সত্য অদ্বৈত ব্রহ্মের পরিণাম বা বিবর্তমাত্র—ইহাই বেদান্তমত। সকল জীবের মধ্যে সেই একই পরমাত্মা বিরাজমান—একটী আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও আত্মা বা সৎপদার্থ নাই—ইহাই ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত। পাশ্চাত্য মহাদেশের দার্শনিক Spinoza ও Parmenides-এর মতের সহিত ভারতবর্ষীয় বেদান্ত দর্শনের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

জৈন দর্শন বেদান্তের এই অদ্বৈত মত গ্রহণ করেন না। জৈন মতে আত্মা বা জীব সংখ্যায় অনন্ত এবং প্রত্যেক আত্মা বা জীব পরস্পর বিভিন্ন। জীব সমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন না হইয়া মূলতঃ এক এবং অদ্বিতীয় হইত তাহা হইলে একজন জীবের সুখে সমস্ত জীব সুখী হইত, একের দুঃখে সকলে দুঃখী হইত, একের বন্ধনে সকলে বদ্ধ থাকিত এবং একের মুক্তিতে সকলে মুক্ত হইত। জীব সমূহের অবস্থার ভিন্নতা দেখিয়া সংখ্যদর্শন আত্মাদ্বৈতবাদ পরিহার করিয়া আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন' এইরূপ বলিয়া জৈনদর্শনও সাংখ্য সম্মত জীবনানাত্ববাদ স্বীকার করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে জৈন দার্শনিকগণ বলেন যে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ প্রভৃতি এমন কয়েকটী গুণ আছে যেগুলি সমস্ত আত্মা বা জীব পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায়, এই গুণ সামান্যের দিক দিয়া আত্মা বা জীব পদার্থ এক বলা যাইতে পারে : কারণ এই গুণ সামান্য সমস্ত জীব পদার্থের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এইরূপ ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। কিন্তু জীব

বলিতে শুধু জীবানুগত গুণ সামান্য নয়, প্রত্যেক জীবের একটা করিয়া বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্ট ভাবও আছে। এই বিশিষ্ট ভাববশতঃ এক জীব অপর হইতে ভিন্ন। এই বৈশিষ্ট্য না থাকিলে এক জীবের মুক্তিতে সকল জীবের মুক্তি হইয়া যাইত। এই বিশেষ ভাব আছে বলিয়াই জীবের বা আত্মার রাজত্ব স্বীকার করিতে হয়।

আত্মার নানাত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শন ও জৈনদর্শন অবিভিন্ন হইলেও জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব লইয়াই উভয়ের মধ্যে মতভেদ আছে। সাংখ্যমতে পুরুষাখ্য আত্মা নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তিনি অসঙ্গ, নিস্পৃহ, অলিপ্ত ও অকর্তা। জগৎ ব্যাপারে তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি আদি কার্য করে পুরুষ কোনও কার্য করেন না, কোনও ফল উপভোগ করেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় ও অভোক্তা। জর্মণ দার্শনিক Kant-এর মতে Noumenal self-এর সহিত ব্যবহারিক জ্ঞানপ্রবাহের যেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই, সাংখ্যদর্শনে জাগতিক তাবৎ ব্যাপারের সহিত পুরুষের সেইরূপ সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ কথিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পুরুষের কর্তৃত্ব রহিল না, তাহা হইলে কাহারই বা বন্ধ হয় আর কাহারই বা মুক্তি হয়? আর কাহারই বা প্রযত্নে মুক্তি লব্ধ হয়? যদি আত্মার সুখ-দুঃখ ভোক্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে এজগৎ ব্যাপারই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই নিমিত্ত পুরুষের অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ববাদ পরিহার করিয়া ন্যায়দর্শন আত্মাতে সুখপ্রযত্নাদিগুণের আরোপ করেন। জীবের একান্ত অসঙ্গত্ব বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া জৈনদর্শনও ন্যায়ের সহিত একমত।

সাংখ্যমতের উত্তরে জৈনগণ বলেন যদি পুরুষ একান্ত অকর্তা হন তাহা হইলে অনুভব কার্যও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। 'আমি শ্রবণ করি', 'আমি আঘ্রাণ করি' এরূপ প্রতীতি সকলের মধ্যেই আছে: সুতরাং আত্মার অকর্তৃত্ববাদ প্রতীতি বিরুদ্ধ। 'আমি শ্রবণ করি', 'আমি আঘ্রাণ করি'—ইত্যাকার প্রতীতি অহঙ্কার প্রসূত—একথা বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে আত্মার অনুভব কার্যও (যেটী সাংখ্যবাদিগণ পুরুষের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন) অহঙ্কার প্রসূত বলা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ স্বভাবতঃ ভোক্তা নহেন, তাঁহাতে ভোক্তৃত্ব আরোপিত হয় মাত্র। সুখ দুঃখ বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য হয়; বুদ্ধি প্রকৃতির সুতরাং পুরুষ সুখদুঃখ ভোগ করেন, ইহা কল্পনামাত্র। প্রকৃতি পরিণাম বুদ্ধিতেই সুখদুঃখ সংক্রান্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধ স্বভাব পুরুষে ঐ সুখদুঃখ প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। জৈনগণ বলেন পদার্থের একটু পরিণাম অর্থাৎ বিকৃতি স্বীকার না করিলে তাহাতে প্রতিবিম্বের উদয় সম্ভবপর হয় না। স্ফটিকে যে প্রতিবিম্বের উদয় হয় তাহাতে স্ফটিকের একটু পরিণাম স্বীকার করিতেই হয়। কাজে কাজেই সুখদুঃখ যদি পুরুষে প্রতিফলিত হয় বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পুরুষের পরিণাম

অর্থাৎ কিয়ৎপরিমাণে ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়; আবার এই পরিণামের জন্য পুরুষের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হয়। এই নিমিত্ত জৈন দার্শনিকগণ জীবকে কর্তা ও সাক্ষাৎ ভোক্তা বলিয়াছেন। আত্মাকে গুণাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও জৈন ও ন্যায় মতে প্রভেদ আছে। নৈয়ায়িক মতে আত্মা (১) জড় স্বভাব, (২) কূটস্থ নিত্য ও (৩) সর্বগত। জৈনগণ ইহা স্বীকার করেন না।

নৈয়ায়িক মতে ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখাদি আত্মার গুণ। গুণ গুণীর সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; অর্থাৎ জ্ঞানাদি গুণ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও স্বভাবতঃ আত্মা নির্গুণ। এইজন্য জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার স্বভাব নহে; কৈবল্য অবস্থায় আত্মা স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ নির্গুণ ভাবে অবস্থিত হয়; জ্ঞান আত্মার স্বভাব না হওয়ায় ন্যায় মতে আত্মা স্বরূপতঃ অজ্ঞান, অচেতন অর্থাৎ জড়স্বরূপ হইয়া উঠে। গ্রীক দার্শনিক Plato যেরূপ Idea কে Phenomenon-এর সহিত একান্ত সংযুক্তরূপে স্বীকার করিয়াও স্থানে স্থানে Idea-কে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন সেইরূপ নৈয়ায়িকগণও আত্মাকে জ্ঞানাদিগুণের সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াও তাহার জড়ত্বরূপ স্বতন্ত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের দ্বিতীয় মত এই যে আত্মা যেরূপ জ্ঞানাদিগুণ হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ ইহা পর্যায়াদি দ্বারাও অপরিবর্তিত; জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হউক অথবা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ না থাকুক, আত্মা সর্বদাই কূটস্থ অর্থাৎ অপরিণামী। আত্মা সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের তৃতীয় বক্তব্য—আত্মা সর্বব্যাপক ও সর্বগত। আত্মা জড় স্বভাব হওয়ায়—সর্বব্যাপক না হইলে জাগতিক পদার্থরাজির সহিত ইহার সংযোগ বা সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। আত্মা সর্বগত না হইলে নানাদিগ্দেশবর্তী পরমাণু সমূহের সহিত ইহার যুগপৎ সংযোগ হইতে পারে না; এবং উক্তরূপ সংযোগব্যতিরেকে শরীরাদিরও উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জন্য আত্মা সর্বব্যাপক।

নৈয়ায়িক মতের সহিত সকল দার্শনিক সম্মত হইবেন না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্য আত্মার গুণ নহে, ইহা আত্মার স্বরূপ অথবা জড় প্রকৃতি নহে, ইহা চৈতন্য-স্বরূপ—ইহা সাংখ্য ও বেদান্তেরও অভিমত। আত্মা জড়স্বরূপ হইলে, তদ্দ্বারা কিরূপে পদার্থ পরিচ্ছেদ হইবে? উহা একেবারে অপরিণামী অর্থাৎ কূটস্থ হইলেই বা কিরূপে পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে? তৃতীয়তঃ যদি আত্মা সর্বব্যাপক তাহা হইলে নানা আত্মা স্বীকার না করিয়া, বেদান্ত সম্মত 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' একটী আত্মা স্বীকার করিলেই ত চলে। এই সমস্ত কারণে জৈন দর্শন ন্যায়মত পরিহার করিয়া জীবকে (১) চৈতন্যস্বরূপ, (২) পরিণামী ও (৩) স্বদেহ-পরিমাণ বলিয়াছেন।

[ক্রমশঃ

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তারপর সে নৃত্য করতে আরম্ভ করল। প্রস্ফুটিত অশোক বৃক্ষের গায়ে বাতাসে আন্দোলিত হয়ে লতা যেমন নৃত্য করে ঠিক সেই রকম।

সে নৃত্য আরম্ভ করলে তার সখিরা তাকে ঘিরে গান করতে লাগল। সেই মাতঙ্গী কন্যা চক্ষু তারকার ইতস্ততঃ সঞ্চালনে নৃত্য ভঙ্গীতে চারদিকে কমল পত্রের সৃষ্টি করল। হাতের উৎক্ষেপনে মৃণালসম্বদ্ধ কমল কলিকার সমারোহ। পর পর এক একটা পা উত্তোলিত করে সারস পংক্তির বিভ্রম! তা দেখে আমার মনে হল এই মাতঙ্গী কন্যা সুন্দরী ও কলাভিজ্ঞা, কিন্তু কর্মদোষে নীচ কূলে জন্মগ্রহণ করেছে।

সেই মাতঙ্গী কন্যা আমার মন এমনভাবে অপহরণ করে নিয়েছিল যে গন্ধর্বদত্তা যখন আমাকে কিছু বলল, আমি তা শুনতে পেলাম না। গন্ধর্বদত্তা, এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, ওই চণ্ডাল কন্যার রূপে তুমি এমনি মজে গেলে যে আমার কথা তোমার কানেও গেল না। এই বলে সে সেখান হতে উঠে আমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেল।

আমি লজ্জিত হয়ে উঠলাম ও আমার মনকে মাতঙ্গী কন্যা হতে সরিয়ে নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। আমি উঠে যেতেই সেই মাতঙ্গীকন্যা সহচরীসহ তাদের বসবার জায়গায় ফিরে গেল। কেবল সেই বৃদ্ধা আমাকে নমস্কার করে যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসে রইলেন।

সূর্য অস্ত গেলে গন্ধর্বদত্তাকে নিয়ে আমি চারুদত্তের গৃহে ফিরে এলাম। গন্ধর্বদত্তা এসেই তার শয়ন গৃহে প্রবেশ করল। আমি নিকটে যেতেই বলল, তুমি কি সেই চণ্ডালকন্যা বা বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করেছিলে? কমল শয্যায় শুয়েও কি হংসের পরিতৃপ্তি হয় না?

আমি বললাম, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। সেই মাতঙ্গীকন্যায় আমার একটুও অনুরাগ নেই। আমি তার নৃত্য ও গানে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম।

এভাবে আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম।

পরদিন সকালে আমি যখন আমার ঘরে বসেছিলাম, তখন দ্বাররক্ষী এসে বলল, এক বৃদ্ধা ও কয়েকটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি তাদের ভিতরে নিয়ে আসতে বললাম।

তারা ভেতরে আসতেই আমি সেই বৃদ্ধাকে চিনতে পারলাম। তিনি আমার নিকটে এসে জিগ্যেস করলেন, পুত্র, তুমি ভাল আছ? তারপর আমায় আশীর্বাদ দিয়ে বললেন,

হাজার বছরের তোমার পরমায়ু হোক। এই বলে তিনি আমার নিকটে রক্ষিত আসনে বসে পড়লেন।

আমি তাঁর আচরণে বিস্মিত হয়ে ছিলাম। চণ্ডাল জাতীয়ের পক্ষে এমন স্বাভাবিক ভাবে অন্যের গৃহে প্রবেশ ও উচ্চ আসনে উপবেশন কোনটি সম্ভব ছিলনা।

মধুর কণ্ঠে তখন সেই বৃদ্ধা আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন, বাবা, কাল যে মেয়েটিকে সরোবর তটে নৃত্য করতে তুমি দেখেছিলে তাকে তোমার হাতে দিতে চাই, যদি তুমি তাকে তোমার উপযুক্ত মনে কর।

আমি বললাম, পণ্ডিতব্যক্তিরা সমবর্ণের বিবাহ সমর্থন করেন, অসম বর্ণের নয়।

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আদি তীর্থংকর ভগবান ঋষভ যাঁর হতে সমস্ত বর্ণের উদ্ভব হয়েছে যাঁর চরণযুগল দেবতা ও রাক্ষসেরও সেবনীয় তাঁর জয় হোক। তাঁর চরণযুগল হতে উদ্ভূত আমাদের এই বংশের জয় হোক।

আমি তখন তাঁর বংশ পরিচয় জানতে চাইলাম।

তিনি ভগবান ঋষভ হতে পূর্ব ইতিবৃত্ত বর্ণন করে বললেন সেই কূলে বিহসিত সেন নামে এক রাজা হন। তাঁর পুত্রের নাম প্রহসিত সেন। আমি তাঁর স্ত্রী। আমার নাম হিরণ্যমতি। আমার পিতা হিরণ্যাভ নলিনী সভা নগরের রাজা। আমার মায়ের নাম প্রিয়বর্দ্ধনা। আমার সিংহদৃঢ় নামে এক পুত্র ও নীলযশা নামে এক কন্যা আছে। মাতঙ্গীকন্যা রূপে যাকে তুমি কাল দেখেছ সেই নীলযশা। সে উচ্চ কূলজাতা। কৌতুক পরবশতঃ আমরা এখানে মাতঙ্গের রূপ ধারণ করে এসেছি। তাই তোমাদের মিলন হলে তুমি সুখী হবে। তুমি আমাদের ওখানে এসো না?

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, ভেবে দেখব। একথা শুনে তিনি যেন একটু মর্মাহত হলেন ও আমার কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, দেখো কি হয়?

গন্ধর্বদত্তাকে এ কথা আমি কি করে জানাব চিন্তা করতে করতে আমার সমস্ত দিন কেটে গেল। তারপর রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। সহসা কার কর স্পর্শে আমি জাগরিত হয়ে উঠলাম। সে স্পর্শেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে এই স্পর্শ গন্ধর্বদত্তার হাতের নয়।

আমি চোখ খুলতেই রত্নের মত দীপ্যমান এক বেতালকে দেখতে পেলাম।

দু'রকম বেতালের কথা আমি জানতাম—উষ্ণ ও শীতল। উষ্ণ বেতাল শত্রুকে ধ্বংস করে, শীতল বেতাল শত্রুকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, অনিষ্ট করে না।

সেই বেতাল আমায় তুলে নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে বাধা দিলাম না। ভাবলাম যে ওকে পাঠিয়েছে, আগে সেখানে ত আমায় নিয়ে যাক তারপর যা করবার তা করব।

সে আমায় ভেতরের ঘর হতে বাইরে নিয়ে এল। আমার পরিচারিকারা সব

ওখানে ঘুমোচ্ছিল। ওদের গায়ে পদস্পর্শ হলেও যখন ওরা জাগল না তখন বুঝলাম মন্ত্র প্রভাবে ওদের ঘুম পাড়ান হয়েছে।

বেতাল দরজা দিয়ে বাইরে এল কিন্তু দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেল। কিন্তু আমি যখন পেছন ফিরে চাইলাম, তখন দেখলাম দরজা বন্ধ। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম বেতাল যদিও অনিষ্টকারী তবু চারুদত্তের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এ ভালোই করেছে।

বাইরে যাবার সময়-অসংখ্য মালা আমার পা ছুঁয়ে গেল। চন্দ্রবিম্বের মত তাদের মনোহারী দেখে একে শুভলক্ষণ বলেই আমার মনে হল ও আমি সেগুলো হাতে তুলে নিলাম। আরও খানিকদূর যাবার পর আমি শুভ শ্বেত হস্তী দেখলাম। তারপর এক হস্তী দম্পতী। আরও খানিক দূর এগিয়ে গেলে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধা আমায় ডাক দিয়ে বলল, আমার সঙ্গে এসো, তোমার প্রিয়া তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

আমি তাকে বললাম, তুমি হাতীর পীঠে আরোহণ করে অগ্রবর্তী হও আমি মুহূর্তের মধ্যে আসছি।

সে হাতীর পীঠে আরোহণ করতেই হাতী উঠে দাঁড়াল। তাতে সে ভয় পেল। তাই দেখে মাহুত হাসতে লাগল।

এই ঘটনাকেও আমার শুভ লক্ষণ বলেই মনে হল।

তারপর আমি এক মন্দির দেখলাম, শ্রমণদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

এই সব শুভ লক্ষণ দেখতে দেখতে আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল, প্রিয় সমাগম হবে।

এইভাবে নিয়ে গিয়ে সে আমায় এক জায়গায় নামিয়ে দিল। সেখানে আমি সেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। তিনি বেতালকে বললেন, সৌম্য তুমি যথোচিত কাজ করেছ।

বেতাল অন্তর্হিত হলে সেই বৃদ্ধা আমায় বললেন, পুত্র রাগ করো না। তুমি বেতাল দ্বারা এখানে নীত হয়েছ। তোমার শক্তি ও সামর্থ আমি জানি। এখানে আনাবার সময়ও তোমায় কোন শারীরিক কষ্ট দিইনি। তুমি আমার কথা রক্ষা করনি তাই তোমাকে এখানে এভবে আনাতে হল। আমি এখন তোমায় বৈতাঢ্য পর্বতে নিয়ে যাব। বাদ প্রতিবাদ করো না।

আমি বললাম, আপনি যেমন আদেশ করেন।

তারপর তিনি আমায় নিয়ে গল্প করতে করতে শূন্য পথে উড়ে চললেন।

এক জায়গায় আমি একজনকে কণকের ধূমপান করতে দেখলাম।

ও কে জিগ্যেস করায় সেই বৃদ্ধা বললেন, পুত্র, ওর নাম অঙ্গারক। বিদ্যা নষ্ট হওয়ায় সে এখন তা প্রাপ্ত করবার চেষ্টা করছে। সুকৃতিসম্পন্ন লোকের সাক্ষাৎ

লাভ করলে সহজেই বিদ্যা অর্জন করা যায়। যদি তুমি ওর সামনে যাও, তাহলে ওর উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হবে।

আমি বললাম, আমি ওর মুখদর্শন করতে চাই না, তাই ও হতে দূরে থাকুন।

তিনি তাই তাকে দূরে রেখেই অগ্রসর হলেন ও অল্প সময়ের মধ্যে আমায় বৈতাঢ্য পর্বতে নিয়ে এলেন। তিনি আমায় এক উদ্যানে বসিয়ে চলে গেলেন।

খানিক বাদেই পরিচারিকারা এল। তারা আমায় স্নান করিয়ে বস্ত্রাভূষণে ভূষিত করল। তারপর আমি নগরে প্রবেশ করলাম। সেখানকার অধিবাসীরা আমার রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল ও আমি যে সামান্য মানুষ নই সেকথা বলাবলি করতে লাগল।

তারপর আমি প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। যেখানে রাজা সিংহদৃঢ় বসেছিলেন সেখানে আমায় নিয়ে যাওয়া হল।

আমি তাঁকে দেখেই প্রণাম করলাম। তিনি তার পূর্বেই সিংহাসন হতে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরলেন ও ও তাঁর পাশে সিংহাসনে বসালেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্যাধরেরা আমায় আশীর্বাদ দিলেন। নীলযশাকেও সেখানে নিয়ে আসা হল। তাকে নীল মেঘ পরিবেষ্টিত নবোদিত চন্দ্রের মত আমার মনে হল। তার গায়ে হংসাবলী চিত্রিত শ্বেত ক্ষৌম বসন ছিল, চুলে দুর্বাদল গ্রথিত পুষ্পের কুসুমদাম। সখী পরিবৃতা তাকে দিককুমারী পরিবৃতা পৃথ্বী দেবীর মতই আমার মনে হচ্ছিল।

গণৎকার সেদিন বিবাহের জন্য প্রশস্ত ঘোষণা করলেন ও আমাকে নীলযশার পাণি গ্রহণ করতে বললেন। তারপর হাজারো রকম বাদ্য ও প্রশস্তিগানের মধ্যে আমাদের দুজনকে বিবাহ মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হল। সুবাসিত জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস নিয়ে এয়ো স্ত্রীরা আমাদের পূত বারিতে অভিসিঞ্চিত করলেন, পুরোহিত অগ্নিতে শমীপত্র নিক্ষেপ করলেন ও আমি নীলযশার পাণি গ্রহণ করে সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করলাম।

বিবাহোৎসব শেষ হলে আমরা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেই কক্ষটি সুরভি পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত ছিল। বৈদুর্যমণি খচিত পালঙ্কে গঙ্গাপুলিনের মতো সুন্দর শয্যা বিস্তৃত ছিল। ঘরের দেয়ালে খণ্ডিতা প্রগল্‌ভা নায়িকার বহুবিধ চিত্র চিত্রিত ছিল। সেইরাত্রি নীলযশার সঙ্গে আমার অতীব আনন্দে ব্যতীত হল।

পরদিন সকালে আমি যখন নীলযশার সঙ্গে আস্থান মণ্ডপে বসেছিলাম তখন সহসা সমুদ্র গর্জনের মত-বিকট কোলাহল শুনতে পেলাম। আমি তখন দ্বাররক্ষিকা প্রভাবতীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রত্যুত্তরে প্রভাবতী বলল, দেব নীলগিরি পর্বতে শকটমুখ নগরে বিদ্যাধররাজ নীলধর রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল অঞ্জনসেনা। অঞ্জনসেনার গর্ভে নীলধরের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়—পুত্রের নাম নীল, কন্যার নাম নীলাঞ্জনা। একসময় খেলা করতে করতে উভয়ে উভয়কে বলে যে একের যদি পুত্র ও অন্যের যদি কন্যা হয় তবে

তারা তাদের বিবাহ দেবে। যৌবন প্রাপ্ত হলে নীলাঞ্জনার আমাদের রাজা সিংহদৃঢ়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর নীল সিংহাসনে আরোহণ করে ও তার নীলকণ্ঠ নামে এক পুত্র হয়। এদিকে আমাদের রাজ্ঞী নীলাঞ্জনা নীলযশার জন্ম দেন। তারপর নীলযশা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাজ গণৎকারকে জিজ্ঞেস করেন যে তাঁর কন্যা নীলযশার কার সঙ্গে বিবাহ হবে ও সে কি ধরণেরর লোক হবে? গণৎকার গণনা করে বলেন যে নীলযশার ভরতের ত্রিখণ্ডের যিনি অধিপতি হবেন :তাঁর পিতার সঙ্গে বিবাহ হবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এখন তিনি কোথায় আছেন ও কি করে আমরা তাঁকে চিনতে পারব?

গণৎকার বললেন, এখন তিনি চারুদত্তের ঘরে অবস্থান করছেন। বসন্তোৎসবে আপনারা তাঁকে দেখতে পাবেন।

সে কথা শুনে মহাদেবী নীলযশাকে নিয়ে বসন্তোৎসবে যান ও আপনাকে এখানে নিয়ে আসেন।

এখন নীল মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্যাধর পরিষদে এই বলে অভিযোগ করেছে যে মহারাজ সিংহদৃঢ় সত্য ভঙ্গ করেছেন। তিনি প্রথমে তাঁর কন্যাকে তাঁর পুত্রর হাতে সমর্পণ করে এখন এক মর্ত্যবাসীর হাতে সমর্পণ করেছেন।

বিদ্যাধর পরিষদ সমস্ত কথা শুনে এই অভিমত দিয়েছেন যে মহারাজ সিংহদৃঢ় কোনো সত্য ভঙ্গ করেন নি। কন্যা পিতার অধীন হয়, তাই তাঁর সম্মতি ছাড়া তাকে অন্যকে দেবার কারু অধিকার হয় না। জন্মের পূর্বে তাকে অন্যকেই বা কি করে দেওয়া যায়? বিবাহের পর কন্যা স্বামীর অধীন হয় এং তার সন্তানের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব থাকেনা। স্বামীর মৃত্যু হলেই একমাত্র কন্যার ওপর মাতার অধিকার জন্মায়। মহারাজ সিংহদৃঢ় যদি প্রথমে তোমাকে কন্যাদান করে থাকতেন ও পরে মর্ত্যবাসীর হাতে দিতেন তাহলে এই অভিযোগ সত্য হত। যা মরীচিকা সেখানে জল পাবার আশা করলে এমনি নিরাশ হতে হয়। বিদ্যাধর পরিষদের এই অভিমত শুনে নীল পক্ষীয় বিদ্যাধরেরা গর্জন করছে—ও তারি শব্দ।—বলে প্রভাবতী চলে গেল।

এরপর নীলযশার সঙ্গে আমার দিন আনন্দে ব্যতীত হতে লাগল।

একদিন নীলযশা আমায় বলল, তুমি কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যা জাননা তাই বিদ্যাধরেরা তোমায় তাচ্ছিল্য করতে পারে। সেজন্য তুমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা অধিগত কর।

আমি বললাম, তাই যদি তোমার ইচ্ছা তবে আমি অবশ্যই অধিগত করব।

সে তাই আমায় নিয়ে বৈতাঢ্য পর্বতে গেল। সেখানে বনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে আমরা একটী সুন্দর ময়ূর দেখতে পেলাম। সেই ময়ূর দেখে নীলযশা আমায় বলল, প্রিয়, আমায় ওই ময়ূরটী ধরে দাও না?

আমি তখন ময়ূর ধরবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কছুতেই তাকে ধরতে পারলাম না। তখন আমি নীলযশাকেই বললাম, আমি ওকে ধরতে পারছি না, তুমি তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রয়োগ করে ওকে ধরে নাও না।

নীলযশা তখন দৌড়ে গিয়ে তার পীঠে চেপে বসল আর সেই ময়ূরটাও তাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

আমি তখন ভাবলাম রাম যেমন হরিণ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছিলেন, আমি তেমনি ময়ূর কর্তৃক প্রতারিত হলাম। ময়ূরটি নিশ্চয় নীলকণ্ঠ যে আমার প্রিয়াকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

নীলযশাকে হারিয়ে রাজধানীতে আমার ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। আমি তাই সেই বনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে একদিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। যেতে যেতে ইতস্ততঃ ধাবমান হরিণযূথ দেখতে পেলাম। তারা এতদ্রুত দৌড়চ্ছিল যে মনে হচ্ছিল তোদের পা যেন ভূমি স্পর্শ করছে না।

হরিণযূথকে দেখতে পাওয়া শুভ লক্ষণ বলেই মনে হল।

আরও এগিয়ে যেতে একপাল গরু দেখতে পেলাম। মানুষের গন্ধে বিরত হয়ে তারা আমায় ঘিরে ফেলল। আমি মিথ্যে কেন তাদের সঙ্গে লড়াই করি বলে এক গাছে উঠে গেলাম। কিন্তু তারা সেই গাছটিকে ঘিরে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোপালকেরা লাঠি হাতে সেখানে এল ও আমায় দেখে গাইদের তাড়িয়ে দিল ও আমায় জিগ্যেস করল আমি কোন ইন্দ্র ?

[ক্রমশঃ

আবুর মন্দির
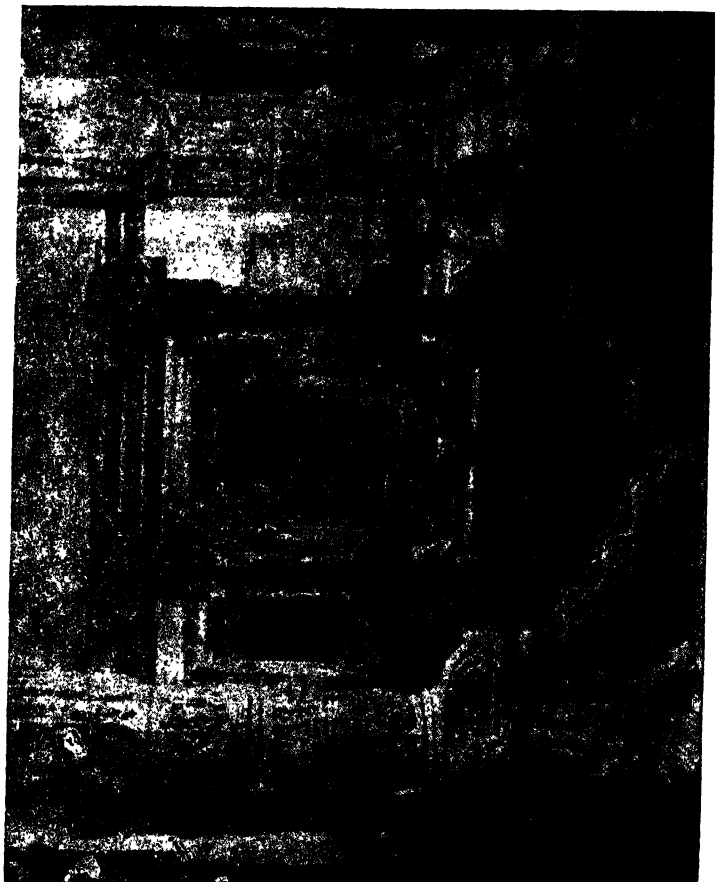
সংকলন

এক্ষণে বিমল-সাহ প্রতিষ্ঠিত জৈন মন্দিরের বর্ণনা করা যাইতেছে। ইহা গুর্জরের অন্তঃপাতি আবু নামক পর্বতোপরি সংস্থাপিত। এই মন্দির বাহ্যালঙ্কার শূন্য, কিন্তু তদভ্যন্তরস্থ বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত বিভূষণের সাদৃশ্য, বোধ হয়, ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই মন্দিরের ছাদ পিরামিডের সদৃশ এবং ইহার গর্ভস্থানে জৈন দেবতা পার্শ্বনাথের মূর্তি বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখে ৪৮টী স্তম্ভযুক্ত একটী বিস্তীর্ণ অলিন্দ আছে এবং ঐ স্তম্ভরাজির মধ্যে আটটী সর্বোচ্চ স্তম্ভ একটী মনোহর বৃহৎ গুম্বজাকার গঠন মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই গুম্বজাভ্যন্তরে যে কত প্রকার কারুকার্য দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অপর, এই অলিন্দসংযুক্ত দেব-মন্দির আবার অপেক্ষাকৃত দুই খর্ব স্তম্ভ শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্তম্ভ সকল চতুষ্কোণ ভিত্তিমূল হইতে উত্থিত হইয়া এরূপ বিভূষণে ভূষিত হইয়াছে যে, বৃহৎ চিত্রপট দর্শন ব্যতীত সে সকল হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহুআয়াস সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য বোধহয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা ইহার চাঁদনি লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সর ক্রিষ্টফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্ম মন্দির সকল এই জৈন চাঁদনির সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্তি ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০০০০ অষ্টাদশ কোটী টাকা এবং চতুর্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী, সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্য জাতির শিল্পচাতুরী, ১৮৭৪, পৃঃ ৪৯-৫০

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VII No. 9 Sraman January 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

মাঘ । ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । দশম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৮৬ ॥ দশম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সুমতি চাঁদ সামসুখা

জন্ম : ৭ এপ্রিল ১৯১২

মৃত্যু : ১৫ জানুয়ারী ১৯৮০

স্মরণে

আমি ত ছিলাম দূরে
বাণীর নির্জন অন্তঃপুরে
নিয়ে মোর কল্পলোক,
তুমি সেথা নিয়ে এলে
আশ্চর্য আলোক,
খুলে দিলে দ্বার—
দিলে মোরে জিনবাণী
প্রসারের ভার,
দিলে আরো হৃদয় অমৃত,
উদ্বুদ্ধ করেছে যাহা আমায় নিয়ত,
অদৃশ্য মণিকা
জ্যোতির কণিকা।

আজ তুমি নাই,
তাই
তোমার স্মরণে
রেখে যাই শেষ অর্ঘ
সকৃতজ্ঞ মনে।

জীব

হরিসত্য ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

জৈনগণ বলেন, আত্মা জড় স্বরূপ হইলে পদার্থের জ্ঞান তাহাতে সম্ভবে না। আকাশও জড়স্বরূপ—আকাশে যদি কোনও পদার্থের জ্ঞান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জড় স্বরূপ আত্মাতেই বা তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এস্থলে নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্মা জড় স্বরূপ হইলেও তাহাতে চৈতন্য সমবায়-সম্বন্ধে সমবেত; কিন্তু আকাশ একেবারে অচেতন; এইজন্য আত্মায় পদার্থ বিজ্ঞান সম্ভব, আকাশে সম্ভব নহে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—আত্মা ও আকাশ উভয়েই জড় স্বরূপ—অথচ আত্মাতে চৈতন্য সমবায় হয়, আকাশেই বা তাহা হয় না কেন? ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে আত্মার স্ব-ভাবেই চৈতন্য অবস্থিত। এ স্থলে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে আত্মার 'আত্মত্ব' আছে; ঐ 'আত্মত্ব' 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' ইত্যাকার প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আত্মার এই 'আত্মত্ব' জাতি থাকায় তাহাতে চৈতন্য সমবেত হইয়া থাকে; আকাশাদিতে 'আত্মত্ব' না থাকায় চৈতন্যও সমবেত হইতে পারে না। ন্যায়মতের এ যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আত্মত্বজাতি আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে সমবেত, ইহা নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা হইলে ন্যায় মতে 'অন্যোন্যসংশ্রয়' নামক দোষ আসিয়া পড়ে। আত্মায় 'আত্মত্বে'র প্রত্যয় হয় বলিয়া আত্মায় 'আত্মত্ব' সমবেত, আকাশত্ব নহে; আকাশে 'আকাশত্বে'র প্রত্যয় হয় বলিয়া আকাশে 'আকাশত্ব' সমবেত—'আত্মত্ব' নহে। অতএব কোন পদার্থে জাতির যে সমবায় হয়, তাহা প্রত্যয় বিশেষ দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়। আবার এই প্রত্যয় বিশেষত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে বলা যায় যে, আত্মায় 'আত্মত্ব' সমবেত বলিয়াই 'আত্মত্বে'র প্রত্যয় হয়, 'আকাশে'র প্রত্যয় হয় না; আকাশে 'আকাশত্ব' সমবেত বলিয়াই 'আকাশত্বে'র প্রত্যয় হয়, 'আত্মত্বে'র প্রত্যয় হয় না। জৈনগণ বলেন যে, আত্মায় এই যে 'আত্মত্বে'র প্রত্যয়, ইহা দ্বারা চৈতন্য যে আত্মার স্বরূপ বা প্রকৃতি তাহাই সপ্রমাণ হয়। আত্মার সহিত চৈতন্যের কথঞ্চিৎ তাদাত্ম্য স্বীকার না করিয়া উক্তরূপ প্রত্যয় বিশেষের কারণ নির্দেশ করা যায় না। ন্যায়াচার্যগণ বলেন, চৈতন্য আত্মার সহিত সমবায় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, এ বিষয়ে সকলেরই প্রতীতি আছে। তদুত্তরে জৈনাচার্যগণ বলেন, যদি প্রতীতিকে প্রমাণ বলিতে হয়, তাহা হইলে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এইরূপই প্রতীতি হয় বলিতে হইবে। কারণ 'আমি অচেতন, চেতনাযোগে চেতন হই' অথবা 'অচেতন

আমাতে চেতনার সমবায় হয়'—এরূপ প্রতীতি হয় না। 'আমি' স্বভাবতঃ জ্ঞাতা এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে। কলসাদি অচেতন পদার্থের যেরূপ 'আমি জ্ঞাতা' এরূপ জ্ঞান অসম্ভব, আত্মা স্বভাবতঃ অচেতন হইলে সেইরূপ তাহারও পক্ষে 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাকার জ্ঞান অসম্ভব হয়। এইরূপে জৈনাচার্যগণ বলেন যে আত্মা অচেতন ও জড়স্বভাব হইলে তাহার পক্ষে অর্থপরিচ্ছেদ সর্বপ্রকারেই অসম্ভব হয়। নৈয়ায়িক-গণের আর একটি যুক্তি এই—'আমি জ্ঞানবান' এইরূপ প্রত্যয়ের দ্বারা আত্মা ও জ্ঞান ভিন্ন বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। 'আমি জ্ঞানবান' এইরূপ প্রত্যয়ের দ্বারা যদি আত্মা ও ও জ্ঞান অভিন্ন ইহা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে 'আমি ধনবান' এই প্রত্যয়ের দ্বারা আত্মা ও ধনের অভিন্নতাও সপ্রমাণ হয়। জৈনগণ বলেন, ঐ প্রত্যয়ের দ্বারা আত্মা ও জ্ঞানের অভিন্নতাই সপ্রমাণ হয়। কারণ আত্মা জড়স্বভাব হইলে তাহার পক্ষে 'আমি জ্ঞানবান' এই প্রতীতি অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি বল, আত্মা জড়স্বভাব হইয়াও জ্ঞানবান, তাহা হইলে নৈয়ায়িকের নিজের মতই দুর্বল হয়। বিশেষ্য যে আত্মা তাহা এবং জ্ঞাননামক বিশেষণ গৃহীত না হইলে 'আমি জ্ঞানবান' ইত্যাকার প্রত্যয় হইতে পারে না; কারণ "না গৃহীত বিশেষণা বিশেষ্য বুদ্ধিঃ"—ইহা ন্যায়াচার্যগণই বলিয়া থাকেন। যদি বল আত্মা ও জ্ঞান উভয়েই গৃহীত হয় বলিয়া ঐরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে ওরূপ গ্রহণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? স্বয়ং আত্মা দ্বারা ওরূপ গ্রহণ সম্ভব নহে, কারণ আত্মা আত্মাদ্বারাই বিদিত হয় ইহা ন্যায়মত বিরুদ্ধ। যদি বল জ্ঞানান্তর দ্বারা উক্তাকার গ্রহণ হয় তাহা হইলে 'অনাবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে; কারণ এই জ্ঞানান্তর আবার জ্ঞানত্ব বিশেষণের গ্রহণ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না: এই গ্রহণ আবার জ্ঞানান্তর দ্বারা সম্ভব হয়, -এইরূপে অনাবস্থা-দোষ হয়। এইরূপে জ্ঞানের সহিত আত্মার অভিন্নতা স্বীকার না করিলে 'আমি জ্ঞানবান' ইত্যাকার প্রত্যয় অসম্ভব হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত জৈন দার্শনিকগণ ন্যায় দর্শন সম্মত আত্মার জড়ত্ববাদ পরিহার করেন। আত্মা সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের দ্বিতীয় মত ইহা 'কূটস্থ নিত্য' অর্থাৎ আত্মা সর্বদাই অপরিবর্তিত। জৈনগণ আত্মাকে পরিণামী বলিয়া এই মতও পরিহার করেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই—জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে আত্মার যে অবস্থা থাকে জ্ঞানোৎপত্তির সময়েও যদি আত্মার ঠিক সেই অবস্থাই থাকে তাহা হইলে ইহা কিরূপে পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে? সর্বদা স্বরূপে অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থিতির নাম কূটস্থভাব। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে আত্মা অপ্রমাতা; কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির সময়ে ইহা প্রমাতা, পদার্থ-পরিচ্ছেদক, সুতরাং আত্মার একটা পরিবর্তন হইয়া যায়, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। আর পরিবর্তন স্বীকার করিলে আত্মার কূটস্থভাবও সংরক্ষিত হয় না।

আত্মাকে 'স্বদেহ পরিমাণ' বলিয়া জৈনগণ নৈয়ায়িক সম্মত আত্মার ব্যাপকত্বও

অস্বীকার করেন। জৈনগণ বলেন আত্মাকে সর্বগত বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকে না। নানা মনের সহিত সংযোগ হইতেই নানা আত্মার অনুমান হয়। কিন্তু আত্মা যদি সর্বগত ব্যাপক পদার্থ হয়, তাহা হইলে যেমন একই সর্বগত ব্যাপক আকাশের সহিত নানা ঘটাদির সংযোগ হইয়া থাকে সেইরূপ একই আত্মার সহিত নানা মনের সংযোগ সম্ভবপর হয়। আত্মাকে সর্বব্যাপক বলিলে এইরূপে যুগপৎ তাহার সহিত নানা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরও সংযোগ প্রতিপাদিত হয় এবং তাহা হইলে আর নানা আত্মা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। যদি বল এক আত্মার সহিত যুগপৎ নানা শরীরাদির সংযোগ অসম্ভব কারণ তাহা হইলে আত্মায় পরস্পর বিরোধী সুখদুঃখাদির উৎপত্তি সম্ভব হয় না, তবে তাহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে ওরূপ যুক্তিতে আকাশে এক সঙ্গে নানা ভেরীর সমবায় অসম্ভব হইয়া উঠে ; কারণ ঐ সমস্ত ভেরীর শব্দাদি পরস্পর বিরোধী হওয়ায় উক্ত শব্দাদি শ্রুত হইতে পারে না। যদি বল প্রত্যেক শব্দের কারণ বিভিন্ন, এই নিমিত্ত প্রত্যেক শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও শ্রুত হয় এবং এই নিমিত্ত এক আকাশে নানা ভেরীর যুগপৎ সমবায় সম্ভব ; কিন্তু তদুত্তরে তাহা হইলে বলা যাইতে পারে—প্রত্যেক সুখ ও দুঃখের কারণ বিভিন্ন ; এই নিমিত্ত সুখ-দুঃখাদি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও যুগপৎ অনুভূত হইতে পারে এবং এই নিমিত্ত একই আত্মার সহিত নানা শরীরাদির যুগপৎ সংযোগও সম্ভব হইয়া উঠুক। যদি বল, বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাসবশতঃ আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আকাশেরও নানাত্ব স্বীকার করা হউক। যদি বল, আকাশ এক কিন্তু ইহা এক হইয়াও বহু পদার্থকে ইহার মধ্যে অবকাশ প্রদান করে, তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে—আত্মা একটী মাত্র, সমস্ত শরীরাদি পদার্থ ইহার প্রদেশে প্রদেশে সংযুক্ত রহিয়াছে। নৈয়ায়িকগণ বলেন, কেহ মরিতেছে, কেহ জন্মিতেছে কেহ কোন কার্য করিতেছে, ইত্যাকার ব্যাপারাদি হইতে নানাত্বই প্রতিপন্ন হয়। জৈনগণ ইহার উত্তরে বলেন, যে আত্মার সর্বগতত্ব স্বীকার করিলে জনন-মরণাদি ব্যাপার হইতে আত্মার একত্বও সপ্রমাণ হইয়া থাকে। কোনও ঘটাকাশ উপ ৎন্নহ ইতেছে সেই সময়েই অপর ঘটাকাশ বিনষ্ট হইতেছে হয়ত অপর একটি ঘটাকাশ পূর্ববৎ রহিয়া যাইতেছে—এই সমস্ত ব্যাপার হইতে যেমন আকাশের বহুত্ব স্বীকার করিবার অবশ্যকতা হয় না, সেইরূপ জনন-মরণাদি ব্যাপার হইতে আত্মার নানাত্বই যে সপ্রমাণ হয়, এমন নহে ; আত্মা এক হইলেও ঐ সমস্ত সম্ভব। যদি বল, আত্মার নানাত্ব স্বীকার না করিলে ইহার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব হয় ; কারণ এক বস্তুতে যুগপৎ বন্ধমোক্ষ রূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহাও তো বলা যাইতে পারে যে কোনও ঘটে আকাশ বদ্ধ হইলে আর ঘটমুক্ত আকাশ থাকিতে পারে না এবং ঘটমুক্ত আকাশের দ্বারা ঘটবদ্ধ আকাশও অসম্ভব হয়। যদি

বল প্রদেশ ভেদ থাকায় আকাশে যুগপৎ বন্ধ ও মোক্ষ সম্ভবপর, তাহা হইলে সর্বগত একই আত্মায় প্রদেশভেদ কল্পনা করিয়া তাহাতে বন্ধ ও মোক্ষ যুগপৎ আরোপ করা যাইতে পারে। জৈনাচার্যগণ এইরূপে প্রতিপন্ন করেন যে আত্মার সর্বগতত্ব ও সর্বব্যাপকত্ব স্বীকার করিলে তাহার নানাত্ব স্বীকার না করিলেও চলিতে পারে।

জৈনাচার্যগণ বলেন আত্মা ব্যাপক পদার্থ না হইলে অনন্তদিগ্‌দেশবর্তী উপযুক্ত পরমাণু সমূহের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব হয় না এবং উক্তরূপ পরমাণু সংযোগ না হইলে শরীরেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। জৈনগণ ইহার উত্তরে বলেন পরমাণু সমূহ আকর্ষণ করিয়া মিলিত করিবার জন্য আত্মাকে যে ব্যাপক পদার্থ হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। অয়স্কান্তের প্রতি লৌহ যে ধাবিত হইয়া থাকে তজ্জন্য অয়স্কান্তকে একটা ব্যাপক পদার্থ হইতে হয় না। যদি বল, আকর্ষণবশতঃ ত্রিভুবনস্থ পরমাণুপুঞ্জ আত্মার প্রতি ধাবিত হয় ইহা স্বীকার করিলে শরীরের পরিমাণ কিরূপ হইবে সে বিষয়ে একটা অনিশ্চয় থাকিয়া যায়,—তাহা হইলে, সকল পরমাণু ব্যাপক আত্মা পরমাণু সকলকে আকর্ষণ করে ইহা বলিলেও তো সেই দোষ আসে। যদি বল, অদৃষ্ট বশে শরীর উৎপাদনের উপযোগী পরমাণুগুলিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঠিক এই কথা আত্মার অব্যাপকত্ববাদীও তো বলিতে পারেন।

জৈন সম্মত আত্মার শরীর পরিমাণত্ববাদে নৈয়ায়িকের অপর আপত্তি এই যে আত্মা শরীরের প্রতি অবয়বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এরূপ বলিলে শরীরের ন্যায় আত্মাও সাবয়ব হইয়া উঠে; আত্মা সাবয়ব হইলে তাহাকে একটা 'কার্য' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এখন আত্মা যদি 'কার্য' হয় তাহা হইলে ইহার 'কারণ' কি? আত্মার বিজাতীয় কারণ থাকিতে পারে না; অনাত্মা হইতে আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব। আত্মার সজাতীয় কারণ সমূহ স্বীকার করাও সমীচীন নহে; কারণ ঐ তথাকথিত সজাতীয় কারণসমূহে 'আত্মত্ব' স্বীকার করিতে হয়; নতুবা তাহারা সজাতীয় কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে মোটের উপর ইহা দাঁড়াইল, আত্মা আত্মাসমূহ হইতে উৎপন্ন। নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইহা অযৌক্তিক মত। একই শরীরে একাধিক 'আত্মসমূহ' কিরূপে কার্যকরী হইতে পারে? যদি শরীরের একাধিক আত্মা কারণরূপে কার্য করে ইহা সম্ভব বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে একটী কারণ আত্মার কার্য অপর কারণ আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত ও একীভূত হইতে পারিবে কিরূপে? ঘটের যেরূপ বিভাগ আছে এবং বিভাগ সমূহের সংযোগ বিনষ্ট হইলে ঘট যেরূপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং আত্মাকেও বিনাশধর্মী বলিতে হয়।

এই প্রতিবাদের উত্তরে জৈনগণ বলেন—জৈন মতে আত্মা কথঞ্চিৎ সাবয়ব ও কার্য, অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণরূপে সাবয়ব ও কার্য পদার্থ নহে। ঘট যেরূপ সমান জাতীয় অবয়ব

সমূহের দ্বারা নিষ্পন্ন আত্মা ঠিক সেই প্রকার সজাতীয় কারণ সমূহের দ্বারা নিষ্পন্ন, ইহা বলা যায় না। আত্মা একটা কার্য বটে—কিন্তু কার্য শব্দের অর্থ কি? পূর্ব আকার পরিত্যাগ করিয়া অপর আকারে পরিণত হওয়াই দ্রব্যের কার্যত্ব। বিভিন্ন পর্যায় পরিণতিই আত্মার কার্যত্ব; এই হিসাবে আত্মা কথঞ্চিৎ অনিত্যও বটে। কিন্তু পর্যায়ের পর পর্যায়ে পরিণত হইয়াও আত্মা দ্রব্যতঃ অপরিবর্তিত থাকে; এই নিমিত্ত আত্মা সাবয়ব ও কার্য হইয়াও অবিচ্ছিন্ন, অবিভাগ ও নিত্য।

আত্মার শরীর পরিমাণত্বে নৈয়ায়িকগণের আর এক আপত্তি এই যে জীব স্বদেহ পরিমাণ হইলে উহা একটা মূর্ত পদার্থ হইয়া পড়ে; আত্মা মূর্ত দ্রব্য হইলে শরীরে উহার অণু প্রবেশ অসম্ভব; কারণ একটী মূর্ত পদার্থের মধ্যে আর একটী মূর্ত পদার্থ কিরূপে প্রবেশ করিবে? সুতরাং শরীর নিরাত্মক হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ আত্মা দেহপরিমাণ হইলে বালক-শরীরান্তর্বর্তী জীব কিরূপে ভবিষ্যতে যুবক শরীর পরিমাণ হইতে পারে? যদি বল, বালক শরীর পরিমাণ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা যুবক শরীর পরিমাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে শরীরের ন্যায় আত্মাও অনিত্য হইয়া পড়ে। আর যদি বল, বালক শরীর পরিমাণ পরিত্যাগ না করিয়াই আত্মা যুবক শরীর পরিমাণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে একটা অসম্ভব ব্যাপার হয় বলিতে হইবে; কারণ একটা পরিমাণ ত্যাগ না করিয়া অপর একটা পরিমাণ স্বীকার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ন্যায়াচার্যগণের শেষ যুক্তি—যদি জীব অণু পরিমাণ হয়, তাহা হইলে শরীরের কোনও অংশ খণ্ডিত হইলে আত্মারও কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়।

উক্ত আপত্তির নিরাকরণ কল্পে *জৈন দার্শনিকগণ* বলেন—আত্মা মূর্ত বলিতে কি বুঝায়? যদি ইহার অর্থ এই হয় যে আত্মা সর্ব পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নহে, মাত্র স্বদেহ পরিমাণ তাহা হইলে এ মতের সহিত জিন সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু যদি মূর্ত শব্দের অর্থ রূপাদিমান হয় তাহা হইলে জৈনগণের বক্তব্য আছে। আত্মা অসর্বগত অর্থাৎ স্বদেহ পরিমাণ হইলে তাহাকে রূপী বা মূর্ত পদার্থ হইতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। মন অসর্বগত; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা একটা মূর্ত পদার্থ নহে। আত্মা মূর্ত পদার্থ নহে; সুতরাং শরীরের মধ্যে মনের যেরূপ অনুপ্রবেশ সম্ভব, সেইরূপ আত্মাও ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। জৈনগণ বলেন, ভস্মাদির মধ্যে জল প্রভৃতি মূর্ত পদার্থের প্রবেশ যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে শরীরের মধ্যে অমূর্ত আত্মার অনুপ্রবেশ কেন সম্ভব হইবে না? আত্মা যখন যুবক শরীর পরিমাণ ধারণ করে তখন বালক শরীর পরিমাণ পরিত্যাগ করিয়াই উহা ধারণ করে বুঝিতে হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। ক্ষুদ্রকায় পরিবর্তন করিয়া ফণা বিস্তার পূর্বক বৃহৎ শরীর ধারণ করা সর্পের পক্ষে যেরূপ সম্ভব আত্মাও সঙ্কোচ বিস্তার

গুণের জন্য সেইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেহ পরিমাণ ধারণ করে ইহাতে অসঙ্গতির কিছুই নাই। বিভিন্ন অবস্থা বা পর্যায়ের মধ্য দিয়া দেখিলে আত্মার পরিবর্তন আছে স্বীকার করিতে হয় এবং সেই হিসাবে আত্মা অনিত্যও বটে; কিন্তু দ্রব্যত: আত্মা অপরিবর্তিত ও নিত্য। শরীর খণ্ডন বিষয়ক আপত্তির উত্তরে জৈনগণ বলেন শরীর খণ্ডনে আত্মা খণ্ডিত না হইয়া খণ্ডিত শরীরাংশে আত্মার প্রবেশ বিস্তার লাভ করে ইহাই জৈনমত। খণ্ডিত শরীরাংশে কিয়ৎ পরিমাণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে খণ্ডিত শরীরাংশে যে কম্পন দেখা যায় তাহার কোনও কারণ নির্দেশ করা যায় না। উক্ত খণ্ডিত অংশে কোনও পৃথক আত্মা নাই, যাহা থাকে তাহা দেহান্তর্গত দেহ পরিমাণ আত্মারই অংশ। শরীর দুই খণ্ডে অবস্থিত হইলেও আত্মা একই। সন্তানের (Series) অন্তর্গত বিভিন্ন জ্ঞান সমূহের মধ্যে যেরূপ একই আত্মা অনুপ্রবিষ্ট থাকে, সেইরূপ খণ্ডিত শরীরাংশ সমূহের মধ্যেও একই আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়। এইজন্য উত্তরকালে খণ্ডনাবশিষ্ট শরীরের মধ্যে আবার পরিপূর্ণ আত্মা অবস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে জৈনাচার্যগণ বলেন, আত্মার স্বদেহ পরিমাণত্ব স্বীকারে কোনও বাধা নাই।

ন্যায়মত উক্তরূপে খণ্ডন করিয়া জৈন দার্শনিকগণ যুক্তিসহকারে নির্দেশ করেন যে আত্মা ব্যাপক নহে, শরীর পরিমাণই বটে। তাঁহাদের এবিষয়ে অনুমান প্রয়োগ এইরূপ ঃ আত্মা ব্যাপক নহে; যেহেতু ইহা চেতন, যাহা ব্যাপক, তাহা চেতন নহে, যথা ব্যোম, আত্মা চেতন, সেইহেতু ইহা অব্যাপক; আত্মা যদি অব্যাপক হয় তাহা হইলে ইহা শরীর পরিমাণ হইবে; কারণ শরীরের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে।

জৈনমতে জীব 'কম্মসংজুত্তো' বা 'পৌদগলিক দৃষ্টবান' ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যাঁহারা নাস্তিক অর্থাৎ যাঁহারা কর্মফল বা পরলোকে বিশ্বাস করেন না, জীবকে 'অদৃষ্ট-বান' বলিয়া তাঁহাদেরই মত খণ্ডিত হইয়াছে। কর্মের সহিত ফলের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে 'কৃতপ্রণাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' দোষ হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই নিমিত্ত পরলোক স্বীকার্য। যদি বল, পরলোক তো প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে প্রত্যক্ষ না হইলেই যে পরলোক অসিদ্ধ হইবে এমন কোনও কথা নাই। পিতামহ, প্রপিতামহাদি অনেকেই অপ্রত্যক্ষ—কিন্তু সেইজন্য কি পিতামহাদি ছিলেন ইহা অস্বীকার করিতে হইবে? কেহ কোনও কালে পরলোক প্রত্যক্ষ করে নাই, একথা নাস্তিকের বলা সাজে না; কারণ তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। অপিচ, পরলোক-দর্শী কেবল-জ্ঞানিগণ আছেন, ইহা জৈনাদি আস্তিক সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন। এস্থলে নাস্তিকগণ বলেন—পরলোক থাকিলে তাহার একটা কারণ থাকিবে। কিন্তু এই কারণ কি? যদি বল, পরলোকের (অদৃষ্ট বা কর্মফলের) কারণ অদৃষ্ট, তাহা হইলে অনাবস্থাদোষ হয়। যদি বল, রাগদ্বেষাদি বশতঃ পরলোক সম্ভব হয়, তাহা হইলে তো নিষ্কর্ম-অবস্থায় হইতে পারে না, কারণ সংসারী মাত্রেই রাগদ্বেষের বশীভূত। যদি

বল, হিংসাদি ক্রিয়ার জন্য পরলোক ব্যবস্থা হয়, তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ ক্রিয়া-ফলের ব্যভিচার দেখা যায় ; হিংসাদি পাপকর্ম পরায়ণ ব্যক্তিকে অনেক সময়ে ধনধান্যাদি সম্পন্ন দেখা যায় এবং সৎকর্ম পরায়ণ সাধু ব্যক্তিকে অতি হীন অবস্থায় কাল যাপন করিতে হয়। যে কর্মফলের অবশ্যম্ভাবিত্ব নাই তজ্জন্য পরলোক স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। এই ত্রিবিধ আপত্তির উত্তরে জৈন দার্শনিকগণ বলেন—এই ত্রিবিধ আপত্তিই আমরা কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করি ; কিন্তু তদ্বারা পরলোকের বা অদৃষ্টের বাধ হয় না। জীব অনাদি কাল হইতেই কর্ম সংযুক্ত ইহা জৈনগণ স্বীকার করেন। এবিষয়ে অনাবস্থা দোষে কিছু যায় আসে না। রাগদ্বেষ বশতঃ পরলোক প্রাপ্তি হয়, স্বীকার করিলে যদি নিষ্কর্ম অসম্ভব হয়, হউক—কিন্তু পরলোক সপ্রমাণ হইল। প্রকৃত কথা এই যে যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন জীব রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া নিরন্তর কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে ছুটাছুটি করে ইহাই জৈনমত। অসাধু লোকের ঐশ্বর্য ও সাধুব্যক্তির দুর্গতি হইতে কর্মফলের ব্যভিচার প্রতিপন্ন হয় না, অসাধু ব্যক্তির ঐশ্বর্য প্রাক্তন পুণ্য কর্মের ফল ও সাধু ব্যক্তির দুর্গতি প্রাক্তন পাপ কর্মের ফল বুঝিতে হইবে। অসাধুর ভবিষ্যৎ দুর্গতি ও সাধুর ও ভবিষ্যৎ সম্পৎ অনিবার্য। সুতরাং হিংসাদি ক্রিয়াফল দৃষ্টে পরলোক বা অদৃষ্ট বাধিত হয় না।

জৈনগণ বলেন, পরলোক সম্বন্ধে আগম প্রমাণ আছে। 'শুভ: পুণ্যস্য', 'অশুভঃ পাপস্য'—ইহা অভ্রান্ত জিনশ্রুতি। অদৃষ্ট সম্বন্ধে আনুমানিক প্রমাণের অভাব নাই। একই সাধবী রমনীর গর্ভ হইতে একই সময়ে দুইটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল ; কিন্তু উত্তরকালে তাহাদের উভয়ের মধ্যে বীর্য-বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে নানা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। অদৃষ্ট ব্যতিরেকে এ প্রভেদের অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে না। জৈনমতে অদৃষ্ট পুদ্‌-গলঘটিত ; অর্থাৎ পরজন্মে আত্মা কিরূপ শরীরাদি লাভ করিবে তাহা তাহার পূর্ব জন্মার্জিত তৎ সংশ্লিষ্ট কর্ম পরমাণু দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা অদৃষ্টাধীন অর্থাৎ কর্মপুদগলরূপ নিগড়ে আবদ্ধ। নৈয়ায়িকগণ অদৃষ্টকে আত্মার বিশেষ গুণ বলিয়া থাকেন। সাংখ্যমতে অদৃষ্ট প্রকৃতির বিকার মাত্র, বৌদ্ধগণ অদৃষ্টকে বাসনা স্বভাব বলেন, বৈদান্তিকমত অদৃষ্ট অবিদ্যা স্বরূপ। জৈনগণ অদৃষ্টকে পৌদ্‌গলিক বর্ণনা করিয়া এই সমস্ত মত পরিহার করিয়া থাকেন।

জীব বা আত্মা সম্বন্ধে জৈনগণের যাহা অভিমত তাহা উপরে বর্ণিত হইল। জৈন মতের সহিত সাংখ্যাদি মতের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে এবং অনেক বিষয়ে বিভিন্নতাও আছে। ইহা হইতে বোধ হয় জৈন দর্শন ভারতবর্ষের এক সুপ্রাচীন স্মরণাতীত যুগের দর্শন। জৈন দর্শন বৌদ্ধযুগের পরবর্তীকালের একটা নবোদ্ভাবিত মতবাদ অথবা গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক একটা চিন্তা প্রবাহ—ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। যদি ন্যায় বেদান্তাদি দার্শনিক মত সমূহের সহিত জৈন সিদ্ধান্তের সাদৃশ্যও থাকে, বৈশিষ্ট্যও থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের যে বিস্মৃত যুগে ন্যায়াদি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, সেই যুগেই জৈন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব তাহাই সপ্রমাণ করে। [জিনবাণী, আষাঢ়, ১৩৩১]

নেমি প্রব্রজ্যা

[নৃত্য-নাট্য]

১ম দৃশ্য

[স্থান বনভূমি। রাত্রির শেষ যাম। বনবালাদের নৃত্য ও গান]

আনন্দ আজি গানে,
আনন্দ আজি প্রাণে,
আনন্দ সমীরণে,
আনন্দ নিঃশ্বাসে।
আনন্দ নীল অম্বরে,
আনন্দ জল কলস্বরে,
আনন্দ বন মর্মরে,
আনন্দ পুষ্প সুবাসে।

[সহসা দূরে ভেরী ধ্বনি, কোলাহল। বনবালারা চকিত হয়ে উঠছে। দূরে শোনা যাচ্ছে]

তোমাদের করিতে উৎখাৎ
অরণ্যের শান্ত পরিবেশে
প্রবেশ করেছে হিংস্র শিকারীর দল
লয়ে দল বল।
হে অরণ্যচর প্রাণীগণ,
দূর হতে দূরে
তাই যাও সরে
অরণ্যের আরও গভীরে।

[বনবালারা পালিয়ে যাচ্ছে। হরিণ, শশক, বরা আদি পশুগণ ছুটে পালাচ্ছে। শিকারীদের দলপতি মঞ্চের মধ্যে এসে লাফিয়ে পড়ছে। শিকারীরা চারদিকে বন ঘিরে নেবার অভিনয় করছে। দলপতির নৃত্য ও গান]

হাঁরে রে রে রে রে—
সব বন নেরে ঘিরে
যেন কেউ পলাতে না পারে।
হাঁরে রে রে রে রে—

ভোজ যে হবে ভারী
আয়োজনে এসেছি তারি
রাজার আদেশ নিয়ে
আমি কি ডরাই কারে ?
হ'ারে রে রে রে রে—
কর কর কর ত্বরা,
শশক হরিণ ধরা
কত যে হবে নিতে
গণিতে কে পারে তারে ?
হ'ারে রে রে রে রে—
রাজার মেয়ের বিয়ে
সব কিছু দিয়ে থুয়ে
কিছুনা কিছুনা করে
অনেক তুলিব ঘরে।
হ'ারে রে রে রে রে—

[পলাতে গিয়ে এক হরিণ শিশুর শিং জালে আটকে যাচ্ছে]

হরিণ শিশু : একি হল ! একি হল !
কি করে মোর শিং জড়ালো ?
যতই ছাড়াতে যাই
ততই জড়িয়ে যাই,
কি করি উপায়,
কি করি উপায়,
হায় হায় হায়—
মা—মা—মা—

দলপতি : হাঃ হাঃ হাঃ—
মজা কত !
ডেকেনে মা বলে
শেষ বারের মত।
শিয়রে তোর যম
আর তোর রক্ষা নাই।
হাঃ হাঃ হাঃ—

[শাবকের ডাক শুনে হরিণী ছুটে আসছে]

হরিণী : বাছা কোথা তুই—
কোথা তুই ?

দলপতি : হাঃ হাঃ হাঃ—

হরিণী : [শাবককে দেখে]
বাছা, একি দশা তোর—
ঘন ঘন বহে শ্বাস,
মুখ হতে ঝরে লালা
মাথা ছুঁয়েছে ভুঁই ।
একি দুর্দৈব ।
এ যে মরণ বাঁধন কঠিন
কি করে আমি সইব ?
হায় হায় হায়—

দলপতি : [হরিণীর নিকটে এসে]
হবেনা হবেনা সইতে
দুঃখ বেদনা বইতে
মুক্তি হাতে হাতে পাস তুই যাতে
তোকেও লইব ওর সাথে ।

হরিণী : তাই নাও তাই নাও,
শুধু ওকে ছেড়ে দাও,
জানে না জানে না কিছু
ও যে এখনো অবোধ—

দলপতি : দিওনা দিওনা মোরে বোধ,
শিশু তাই
ওর মাংস বড় সরেস ।

শিকারীরা : আহা ! বেশ বলেছ বেশ ।

দলপতি : ত্বরা কর ত্বরা কর,
ধর ওকে ধর,
যাতে—
না পারে পলাতে ।

হরিণী : ধরিতে হবে না মোরে
আমি আপনি দিয়েছি ধরা ।

দলপতি : কর ত্বরা কর ত্বরা কর ত্বরা।

[শিকারীরা ওকে ধরছে]

হরিণ শিশু : মা মা মা—

দলপতি : হাঃ হাঃ হাঃ—

[এর মধ্যে এক শশক ছুটে পলাবার চেষ্টা করছে। এক শিকারী তাকে মারবার অভিনয় করছে]

শশক : মেরো না মেরো না মোরে—
আমি যে ক্ষুদ্রপ্রাণ,
তীক্ষ্ণ তোমার বাণ।
সহিবে না সহিবে না,
করো করুণা
দেহ জীবন দান।

দলপতি : মারিস না মারিস না বাণ,
শুধু ওকে ধর,
চুপড়িতে ভর—
নিয়ে চল ঘর।

[শিকারীরা ওকে ধরতে যাচ্ছে। ও পলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না]

শশক : একি হল ! একি হল !
কেন সরে না আমার পা-টা—

দলপতি : ওই খানে দেয়া আছে আঠা।
ভয় নাই তোর ভয় নাই,
মারিব না মারিব না তোকে
নিয়ে যাব শুধু ঘর,
তারপর—
তুলে দেব পাচকের হাতে
আরো দেব কয়ে
মারে না মারে না যেন তোরে,
নেয় যেন শুধু জ্যান্ত
গায়ের চামড়া ছড়ায়ে।

[শিকারীরা চার দিক হতে বনের পশু ধরে নিয়ে চলেছে]

২য় দৃশ্য

[রাজন্তঃপুর রাজীমতীর সখীদের নৃত্য ও গান]

বসন্ত আজ এলো দ্বারে।
তার আমন্ত্রণ
অশোকে কিংশুকে
বনে বনান্তরে।
জাগে মধুমালতী,
জাগে মাধবিকা,
হৃদয় ছন্দিত আজ
মধূক্ষরা
বসন্ত বাহারে।
সাজায়ে আন ওরে
বরণ ডালা,
ফুল্ল ফুল দলে
গাঁথলো মালা,
বরণ করিতে হবে তারে
পান্থ যে আজ
আসিবে দ্বারে।

[দুজন সখীসহ রাজীমতী আসবে। রাজীমতীর নৃত্য ও গান]

সখি, ফুল সাজে
সাজায়ে দে আমারে,
জড়ায়ে দে সুরভিত কুন্তলে
কবরী মাল,
বাহুতে দোলায়ে দে
প্রফুল্ল মল্লিকা,
শিরীষ কর্ণমূলে,
মেখলায় নীলকান্তমণি
নীলমণি ফুল,
অপ্রতুল
অলক্তরাগে
চর্চিত কর চরণ।

[সখীদের রাজীমতীকে ঘিরে নৃত্য]

দেব দেব আজ তোকে
সাজায়ে—
কণকবর্ণা তুই ইন্দুলেখা
নীল অম্বরে।
কবরীতে দেব কবরী মাল
শিরীষ কর্ণমূলে,
বাহুতে মল্লিকা,
বক্ষপটে পত্রালিকা
দেব অঙ্কিত করি পরাগে,
মেখলায় নীলমণি ফুল,
দেব অলক্তরাগে
চর্চিত করি চরণ। ক্রমে
যখন দাঁড়াবি তাঁর বামে
মনে হবে যেন
কাঞ্চন লতা
বেষ্টিত করি আছে তমাল দ্রুমে।

[সখীদের রাজীমতীকে সাজাবার অভিনয়]

রাজীমতী : অঙ্গে অঙ্গে একি শিহরণ,
একি আকুলতা, একি ক্রন্দন,
একি উল্লাস, একি আলোড়ন,
একি আনন্দ প্লাবন।
[সহসা চকিত হয়ে]
কিন্তু একি—
কেন কাঁপে মোর দক্ষিণ বাহু,
কেন ঝরে যায় ফুল্ল মল্লিকা,
কোন অমঙ্গল কোন রাহু
ছুটে আসে করিতে গ্রাস পূর্ণচন্দ্র
পার হয়ে আকাশের সীমা,
কেন ভীরু হৃদয় কাঁপে,
কেন লাগে-ভয়,
কেন কালো কালো মেঘে ঢাকে
আনন্দ পূর্ণিমা?

[সখীরা রাজীমতীকে ঘিরে]

ও কিছু নয় ও কিছু নয়,
মিছে ভয় মিছে ভয়,
সৌভাগ্যবতী তুই কন্যা,
কর আনন্দ গান—
বিশ্বের অনিন্দিত পৌরুষ তাই
করিতে আসিছে
তোর চরণে আত্মদান।

[রাজীমতীর অন্য সখীরা আসছে]

ত্বরা কর ত্বরা কর—
এলো বলে
বিবাহের শোভাযাত্রা,
ত্বরা করা ত্বরা কর
ওই শোন বাজে কাড়ানাকাড়া
ওই শোন কোলাহল।

সখীরা : নাই নাই কোনো দেরী নাই
চল চল চল সবে চল।

[সকলে চলে যাচ্ছে]

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজপথ। বিবাহের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। রথে অরিষ্টনেমি আসছেন। সারথি রথ চালনার অভিনয় করছে। অরিষ্টনেমি কিছু শুনবার অভিনয় করে]

অরিষ্টনেমি : রাখ রাখ রথ—
কোথা হতে আসে আর্তস্বর,
কারা যেন করিছে ক্রন্দন
হৃদয় মন্থন।

সারথি : কিছু নয় রাজপুত্র, কিছু নয়।
বনচর
পশুদের ওই আর্তস্বর
যাহাদের আবদ্ধ করেছে হেথা আনি

অরিষ্টনেমি : বলিতে পার কি তুমি

কেন এত প্রাণী
আবদ্ধ করেছে হেথা আনি ?

সারথি ঃ বিবাহ উৎসবে
এসেছে রাজন্য যারা
তাহাদের আহারের তরে,
প্রাণ ভয়ে ভীত তাই ওরা
ক্রন্দন করিছে আর্তস্বরে
এইমাত্র—

অরিষ্টনেমি ঃ এইমাত্র—না না
যোধজিৎ,
হয় না উচিত
সামান্য প্রমোদ লাগি
এত জীব ঘাত,
সূর্যের জগতে
মরিতে চাহে না কেহ,
সামান্য আঘাত
দেহে যদি লাগে
কি বেদনা
অসহ্য যে মৃত্যুর যন্ত্রণা।
নয় নয় এত মোর প্রেয়,
নয় আরো শ্রেয়।

সারথি ঃ তার লাগি কোন শোক
কর প্রত্যাদেশ
এখনি হইবে মুক্ত ওরা।

অরিষ্টনেমি ঃ মুক্ত হবে ?
কিন্তু মুক্ত কি হবে ওরা।
জীবন মৃত্যুর
শাশ্বত প্রবাহ হতে ?
না না না
মিলায়ে যেতেছে ক্রমে দূরে
এই বিশ্ব লোক
ছায়া সম

শুধু দেখিতেছি এক মৃত্যু
তরঙ্গিত চারিদিকে—

[অরিষ্টনেমির রথ হতে নামবার অভিনয়]

সারথি : কোথা যাও রাজপুত্র,
হোথা রূপবতী
রাজীমতী
অপেক্ষিয়া আছে তব তরে
বরমাল্য করে,
আদেশ রয়েছে মোর প্রতি
রথ লয়ে যেতে দ্রুতগতি।

অরিষ্টনেমি : রথ লয়ে যাও তুমি।
ওই শোন
আহ্বান করিছে কারা মোরে—
যেতে হবে দূরে
বহুদূরে
ওই গিরিচূড়ে।
ওই শোনো কারা করে গান—

[গান]

হে মহাপ্রাণ,
করো করো ত্রাণ,
মুক্ত কর বন্ধ
মুক্ত কর ভয়,
জয় হোক তব জয়।
হে অমিত প্রাণ,
তাপিত পীড়িত
মর্ত্যের মাটি
করে তোমা আহ্বান।
হর কলুষ গ্লানি,
শোনাও অমৃতবাণী,
জীবনের মাঝে দেহ
মুক্তির পরিচয়,
জয় হোক তব জয়।

সারথি ঃ রাজপুত্র,
তুমি যদি যাবে চলে
ভেঙে যাবে
রাজীমতীর হৃদয়।

[অরিষ্টনেমি আভরণ খুলবার অভিনয় করছেন। শ্রীকৃষ্ণ আদি আত্মীয় পরিজন সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছেন]

অরিষ্টনেমি ঃ নারীর ললিত যত্ন
মোর তরে নয়,
মোর তরে নয় ভোগ,
ঐশ্বর্য সম্পদ,
মর্ত্যে অমৃত আনিব আমি,
মৃত্যুরে করিব আমি জয়।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ সুকঠিন সেই পথ ক্ষুরধার
পারিবে কুমার ?
মৃত্যুরে পারেনি কেহ
করিবারে জয়
মৃত্যুরে না করি বরণ।

অরিষ্টনেমি ঃ মৃত্যুকে বরণ করি
মৃত্যুকে করিব আমি জয়।
এই মর পণ।
কৃষ্ণ, তুমি দেহ আশীর্বাদ।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ করি আশীর্বাদ।
তাই যেন হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজান্তঃপুর। সখী পরিবৃতা রাজীমতী]

রাজীমতী ঃ গোধূলি লগ্ন বহে যায়
এলো না কেন পান্থ এখনো দ্বারে ?
কেন ঘন ঘন নাচে দক্ষিণ বাহু
কেন দক্ষিণ আঁখি স্পন্দিত বারে বারে ?
কেন দুরুদুরু করে হিয়া
কেন শঙ্কা জাগে নিশীথ অন্ধকারে ?

কেন নীরব ক্রন্দন উঠে গুমরিয়া
মহা মরণের পারে ?
[এক সখী বাইরে থেকে আসছে]

সখী : সখি, বলিবার নয় সেকথা,
অমৃত পাত্র ভেঙে হল খান খান
ভাগ্য যে করিল অন্যথা।
সখি, বলিবার নয় সেকথা

রাজীমতী : বল সখি, বল বল—
অজনা শঙ্কায় রেখে দিয়ে মোরে
করিস নে আরো দুর্বল।
বল সখি, বল বল।
হোক সে যতই দুর্দৈব
সে সব সইব আমি সইব।
শুধু বল—
আছেন ত তিনি সকুশল ?

সখী : তাঁর কুশল,
কিন্তু বলিব কি করি সেকথা—
অশ্রু বাষ্প কণ্ঠ যে করে রোধ
মরমেতে লাগে ব্যথা।
আসিতে আসিতে পথ হতে
প্রব্রজ্যা নিয়ে
গেলেন যে তিনি রৈবতাচল।

রাজীমতী : কি বলিলি সখি, কি বলিলি—
[রাজীমতী মূর্ছিতা হয়ে পড়ছে]

সখী : আন জল সখি, আন জল।

[সখীরা রাজীমতীর পরিচর্যা করছে। উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ রথনেমি আদি সব সেখানে আসছেন]

ছিন্নমূল লতিকা
লুটায় ভূমিতলে,
তীক্ষ্ণ শায়কে
বিদ্ধা হরিণী,

পূর্ণচন্দ্র করিল গ্রাস
রাহু অম্বরে।
[রাজীমতীর জ্ঞান ফিরে আসছে]

মা : কাঁদিস নে কন্যা কাঁদিস নে
কুটিল ভাগ্য লেখা,
বিবাহ দেব তোর পুনর্বার,
বৃষ্ণিকুলে
আছে কত যুবা, কত কুমার
পেলে তোর কৃপা কটাক্ষ
নিজেরে মানিবে ধন্য।
কাঁদিসনে কন্যা, কাঁদিসনে—
ভেবেছিনু যাহা হল না হল না তাহা
ভাগ্য করিল কিছু অন্য।

রথনেমি : পাই যদি তব প্রেম
তবে আমি নিজেরে মানিব ধন্য।

রাজীমতী : আমি নই বিক্রয় পণ্য,
মোর প্রেম সে অনন্য।
না না না সে হয় না—
আমি তাঁর
দেহ মন মোর
উৎসর্গীত য°ার জন্য।
তাঁর পথ মোর পথ—
জীবন যৌবন চঞ্চল।
দেহ আজ্ঞা
সংসার ছাড়ি আমি
যাব রৈবতাচল।

রথনেমি : তন্বি, তরুণ বয়স তোমার,
একা একা
কেমনে বহিবে যৌবন ভার,
করো আমায় বরণ—
আমি দেব আশ্রয়।

মা : ঠিক বলেছেন বৃষ্ণি কুমার।

সখীরা : ঠিক ঠিক ঠিক—

রাজীমতী : ধিক্ ধিক্ ধিক্—

বমন করা কেহ

লয় তুলে পুনর্বার ?

অসার এই সংসার,

সত্য প্রেম,

আমি তাঁর আমি তাঁর আমি তাঁর,

আমি নহি দেহ পণ্য।

শ্রীকৃষ্ণ : ধন্য ধন্য তুই কন্যা।

[রাজীমতী আভরণ খুলবার অভিনয় করছে]

পঞ্চম দৃশ্য

[রৈবতাচলে অরিষ্টনেমি ধ্যানমগ্ন। রাজীমতী তাঁর পায়ে আত্ম নিবেদন করছে]

হে মহাজীবন,

হে মহাজীবন,

তোমার জীবনে

আমার জীবন

করিনু সমর্পণ।

জীবনের টানিনু অবধি,

সাগরে মিলিত হোক নদী,

জীবনের যাত্রার

হোক তবে আজ

সুমধুর সমাপন।

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমি বললাম, ভয় পেয়ো না, আমি ইন্দ্র নই, মানুষ। এক বিদ্যাধরী ভালবেসে আমায় বৈতাঢ্য পর্বতে নিয়ে এসেছিল। তাকে হারিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে এখানে এসে পড়েছি। কাছাকাছি কোন গ্রাম বা নগর আছে বলতে পার?

তারা বলল, কাছাকাছি কোবিল শাষিত বেদসামপুর নগর ও গিরিকূট গ্রাম আছে।

আমি গ্রামে যাবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। প্রত্যুত্তরে তারা বলল, পথ বলে কিছু নেই তবে গোপবালকদের যাতায়াতে পায়ে পায়ে যে পথ হয়েছে সেই পথ দিয়ে গেলে গ্রামে যাওয়া যায়।

সেই পথ দিয়ে অনেকখানি পথ হেঁটে আমি সেই গ্রামে গিয়ে পেঁছলাম। বৃক্ষের ছায়া ও পদ্ম সরোবরে সেই গ্রামটী একটি পরিচ্ছন্ন ছবির মত আমার মনে হল।

পদ্ম সরোবরে স্নান করে আমার রত্নালঙ্কার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে আমি গ্রামে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ মুখেই এক আশ্রম আমার চোখে পড়ল। সেই আশ্রমে প্রবেশ করতেই দেখলাম কয়েকজন ব্রাহ্মণ বালক সেখানে বেদপাঠ করছে ও ভুল হতেই তারা সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে একজনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

প্রত্যুত্তরে সে বলল, সৌম্য, এই গ্রামের যিনি নায়ক সোমশ্রী নামে তাঁর এক কন্যা আছে। চন্দ্রবিম্বের মত সে সুন্দর ও সুতনুকা। শ্রীদেবী বলেই সহসা ভ্রম হয়। এক গণৎকার বলেছে, এক পুরুষ শ্রেষ্ঠের সঙ্গে তার বিবাহ হবে যে শ্রমণ ব্যূহ ও বিব্যূহের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে পারবে। তার সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধতায় আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণেরা এখানে এসে তাই বেদ পাঠ করে শোনায়। তারপর প্রশ্নোত্তর। কিন্তু সে পর্যন্ত কেউ যেতে পাতে পারে না। বেদপাঠে অশুদ্ধি হওয়ায় আগেই তাদের বিদায় নিতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বেদ শিক্ষা দিতে পারেন এখানে এমন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিত আছেন কি?

সে বলল, হঁা আছেন। তাঁর নাম ব্রহ্মদত্ত। যে গৃহের সম্মুখে তোরণ দেখবেন সেইটীই তাঁর গৃহ।

তার নির্দেশ মত আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ঘরে এক মধ্যবয়স্ক লোককে সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে বসে থাকতে দেখলাম। আমি তাঁকে প্রণাম করে

আমার পরিচয় দিলাম। বললাম, আমার নাম খন্দিল, আমি গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি আমায় তখন বসতে বললেন। ঠিক সেইসময় তাঁর স্ত্রী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে দু'গাছি চুড়ী ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার ছিল না। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি সহস্রায়ু হও বলে আমায় আশীর্বাদ দিলেন। তারপর পরিচারিকাকে আমার পা ধোবার জন্য জল নিয়ে আসতে বললেন। আমার পা ধোওয়া হলে এক জোড়া অঙ্গদ আমি তাঁকে উপহার দিলাম।

অঙ্গদ পেয়ে তিনি খুশি হলেন ও স্বামীকে দেখালেন, তিনি তখন আমার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও বললেন, তিনি যা জানেন সে সবই তিনি আমায় শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।

আমি বললাম, আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার কাছে বেদার্থ শিখতে চাই।

তিনি বললেন, বেদ দুই প্রকার, আর্য ও অনার্য। তুমি কোন বেদ শিখতে চাও?

আমি বললাম, দুই বেদই।

আমি ব্রহ্মদত্তের কাছে বেদধ্যয়ন করতে লাগলাম। আমার শিক্ষা সমাপ্ত হলে ব্রহ্মদত্ত আমায় নিয়ে সভায় গেলেন। আমায় দেখে দেবদেব ব্রহ্মদত্তকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুত্তর দিলেন, ও মগধ হতে এসেছে ও আমার গৃহে অবস্থান করে বেদধ্যয়ন করছে।

সেই সভায় বহু ও বিবহুর সম্মুখে সোমশ্রীকে পরাস্ত করতে কেউই অগ্রসর হল না। দেবদেব তখন বললেন, তাহলে আজকের সভা বিসর্জিত করি, আবার আমরা মিলিত হব।

আমার গুরু তখন আমায় বললেন, সৌম্য, তুমি এ'দের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সুন্দরী কন্যা লাভ কর।

তাঁর আদেশ পেয়ে জিন বন্দনা করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে বা যদি কিছু বুঝে না থাকেন তবে আমায় প্রশ্ন করুন। আমি প্রত্যুত্তর দেব।

আমার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনে ও আমার নির্ভয় ভাব দেখে লোকে বিস্মিত হয়ে গেল।

আমায় তখন প্রশ্ন করা হল, সৌম্য বেদের অন্তিম সত্য কি?

আমি বললাম, বেদ বিদ্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে যার অর্থ জানা। তাই যা জানি, যা দিয়ে জানি বা যাতে জানি তাই বেদ। বেদের অন্তিম সত্য তার যথার্থ অর্থবোধ।

আমার প্রত্যুত্তর শুনে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা খুসী হলেন। বললেন, বেদের অন্তিম পরিণাম কি?

আমি বললাম, জ্ঞান।

জ্ঞানের পরিণাম কি?

জাগতিক বস্তুতে আসক্তিহীনতা।

আসক্তিহীনতার পরিণাম কি?

সংযম।

সংযমের পরিণাম কি?

নূতন কর্মবন্ধের অবসান।

নূতন কর্মবন্ধের অবসানের পরিণাম কি?

তপ।

তপের পরিণাম?

কর্মের আংশিক ক্ষয় বা নির্জরা।

কর্মের আংশিক ক্ষয়ের পরিণাম কি?

সম্যক জ্ঞান।

সম্যক জ্ঞানের পরিণাম?

সমস্ত কর্মের অবসান!

সমস্ত কর্মের অবসানের পরিণাম কি?

কায়, মন ও বাক্যের বিরতি।

কায়, মন ও বাক্যের বিরতিতে কি হয়?

অজস্র আনন্দ, অবশেষে মোক্ষ।

আমার প্রত্যুত্তরে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা খুসী হলেন ও আমি জয়লাভ করেছি বললেন দেবদেবও খুসী হলেন ও আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তারপর শুভ দি দেখে সোমশ্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন।

স্নানাভিষেকের সময় আমি সোমশ্রীকে প্রথম দেখলাম। তার চোখ মুখ হাত ' উন্নত বক্ষ ও জঘন দেখে তাকে রমণীরত্ন বলেই আমার মনে হল। কামদেব রতি সঙ্গে বিহার করে যেমন প্রীত হন, আমিও সেই মত সোমশ্রীর সঙ্গে বিহার করে প্রী হলাম। এ ভাবে গিরিকূটে আমার দিনগুলো আনন্দে কাটতে লাগল।

একদিন গ্রামের বাইরে এক ঐন্দ্রজালিকের সঙ্গে আমার দেখা হল। সে আমা বট গাছে নাগকুমারদের নিবাস দেখাল।

তার সঙ্গে আমার আরো দু'একবার দেখা হল। বিদ্যাধর বলে সে তার পরিচ দিল। সে বলল, আমি শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই দুই বিদ্যার অধিকারী। এই দুই বিদ্য সুখ ও সমৃদ্ধির মূল। এদের প্রভাবে আকাশে উঠা যায় ও নীচে নামা যায়। তুমি উত্তম অধিকারী তাই তোমাকে আমি এই দুই বিদ্যা দিতে পারি। যা কিছু করার

আমিই করব। আমার সঙ্গে আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন দেখা করো। ১০০৮ বার মন্ত্র জপ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা তোমার অধিগত হবে।

আমি রাজী হলাম ও কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন উপবাস করে কাটালাম।

আজ রাত্রে আমায় মন্দিরে কাটাতে হবে বলে সোমশ্রীর কাছে আমি বিদায় নিলাম ও সেই ঐন্দ্রজালিকের সঙ্গে এক পর্বত গুহায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সেখানে সেই করল, তারপর আমায় মন্ত্র দিয়ে বলল, এই মন্ত্র জপ করার সঙ্গে সঙ্গে এক দিব্য বিমান উপস্থিত হবে। তুমি তাতে নির্ভয়ে উঠে বসো। সেই বিমানে তুমি যত উপরে উঠতে চাও উঠবে, আবার যখন নামতে ইচ্ছে হবে নামবার মন্ত্র বলবে তাহলে সেই বিমান মাটিতে নেমে আসবে। এই মন্ত্র তোমার অধিগত হয়ে গেছে বলে মনে কর। আমি নিকটেই আছি যাতে কোনো বিপদ না ঘটে। এই বলে সে দূরে সরে গেল।

আমি তখন একমনে সেই মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। মন্ত্র জপ শেষ হতে না হতে এক দিব্য বিমান সেখানে এসে উপস্থিত হল। সেই বিমান সংলগ্ন ছোট ছোট ঘণ্টার ধ্বনিতে সেই স্থান মুখরিত ও কুসুম মাল্যের সৌরভে পরিপূরিত হয়ে উঠল।

সেই বিমানে একটি আসন ছিল। ঐন্দ্রজালিকের কথা মত সেই আসনে আমি উঠে বসলাম।

ধীরে ধীরে সেই বিমান ওপরে উঠতে লাগল। ক্রমশঃ পর্বত শিখর অতিক্রম করল। তারপর একদিকে যেতে লাগল। আমি তখন নামবার মন্ত্র জপ করলাম কিন্তু নামবার পরিবর্তে আমি একদিকে প্রবাহিত হয়ে যেতে লাগলাম। তারপর কি হল মনে নেই। বোধহয় সেই বিমানে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমি যখন চোখ মেললাম তখন ভোর হয়েছিল। চারদিকে মানুষের কোলাহল শুনতে পেলাম। ভাবলাম দড়ির সাহায্যে কারু আদেশে আমার বিমানটি মাটিতে নামানো হয়েছে।

আমি বিমান হতে নীচে নামলাম। আমাকে নামতে দেখে কিছু লোক আমার নিকটে এল। বলল, মহাশয়, আপনি ভয় পাবেন না বা পলাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাদের বন্দী।

কিন্তু আমি যত জোরে পারি দৌড়তে লাগলাম। তারাও আমার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আমায় ধরতে পারল না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি আমি যখন তিলবস্তুগ গ্রামের নিকট এলাম তখন ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। গ্রামে প্রবেশর মুখ্যদ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রক্ষীরাও আমাকে ভিতরে নিতে রাজী হল না।

আমি বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসায় ক্লান্তও। তাই

আমায় ভেতরে নিয়ে নিন্।

তারা বলল, আমরা রাক্ষসের ভয়ে ভীত। ব্রাহ্মণই হোক বা সাধু অসময়ে এলে তাকে রাক্ষসেই খাবে!

তাদের নির্দয় ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হলেও তারা আমায় ভিতরে নিল না। বাধ্য হয়ে নিকটবর্তী এক মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। ভিতর হতে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। মধ্যরাতে এক গম্ভীর আওয়াজ শুনলাম—পথিক, দরজা খোল; নইলে দরজা ভেঙে তোমায় আমি মেরে ফেলব।

আমিও প্রত্যুত্তর দিলাম—এখান হতে দূর হও। আমার ঘুমে ব্যাঘাত করলে সাজা দেব।

সে একটু স্তম্ভিত হলেও আবার জোরে জোরে চীৎকার করতে লাগল।

আমি তখন দরজা খুললাম। দেখলাম হাতে গদা নিয়ে সেখানে নগ্ন দীর্ঘকায় এক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চুল নখ গোঁফ ও দাড়ি বেশ বড়, দাঁত উঁচু। তার শরীর হতে মানুষের রথাও গন্ধ বার হচ্ছিল, নীচু কাঁধের জন্য তাকে ভয়ঙ্কর লাগছিল। সে আমাকে দেখে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দুম করে আমার গায়ে গদার এক ঘা বসিয়ে দিল। আমি তার গদা কেড়ে নিয়ে তার গলার ওপর প্রহার করলাম। তারপর আমাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। আমার দ্বারা আহত হয়ে সে জোরে চীৎকার করে উঠল। বার বার আমাকে আঘাত করবার চেষ্টা করলেও তাকে পিছু হটতে হল। তার শরীরের স্পর্শ বাঁচিয়ে আমি তাকে মুষ্টি দিয়ে প্রহার করতে থাকলাম।

তার চীৎকার শুনে গ্রামবাসীরা জেগে গিয়েছিল। তারা ঢোল বাজাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কোলাহল শোনা গেল।

আমি তখন তাকে দুই হাতে চেপে ধরলাম। সেই চাপে সে রক্ত বমন করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল ও মরে গেল।

আমি তখন আমার ঘরে ফিরে গেলাম। ভাবলাম এখন নয়। কাল সকালেই স্নান করব।

সকাল হতে লাঠি সোটা নিয়ে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। মন্দিরের বাইরে সেই রাক্ষসকে মরে পড়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমিও সেই সময় ঘর হতে বেরিয়ে এলাম। আমায় দেখে তারা আমার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। বলল, দেব, আমরা ভেবেছিলাম রাক্ষসটি আপনাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনিই চীৎকার করছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনি কোন সাধারণ মানুষ নন, দেবতা। আপনি এই রাক্ষসটীকে হত্যা করে আমাদের নির্ভয় করেছেন। আপনি সহস্রায়ু হন।

এই বলে আমার স্নানের জন্য তারা সুবাষিত জল নিয়ে এল। আমার স্নান শেষ হলে আমায় বস্ত্রাভূষণে সজ্জিত করে রথে বসিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রামে নিয়ে গেল।

সেখানে এক সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে তারা আমায় বসাল ও সুন্দরী আটটি কন্যা আমায় দান করে বলল, আজ হতে আমরা আপনার অধীন। এদের সেবা গ্রহণ করে আপনি এখানে নিবাস করুন।

আমি বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশ যাচ্ছি। তাই আমার এখানে থাকা উচিত হয় না। মেয়েরাও আপন আপন ঘরে ফিরে যাক। ওরা সুখী হোক। আপনারা সুখী হয়েছেন দেখে আমিও সুখী।

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম।

ঘুরতে ঘুরতে আমি একদিন অর্গলগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক সার্থবাহের দোকানে প্রবেশ করতেই সে উঠে দাঁড়াল ও আমায় নমস্কার করল। তারপর তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমাকে স্নানাহার করাল।

তার এই আতিথ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, দেব, আমার নাম ধনমিত্র। আমার মিত্রশ্রী নামে এক কন্যা আছে। আমি একসময় তার সম্পর্কে নৈমিত্তিককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল এই কন্যার সঙ্গে পৃথিবীপতির বিবাহ হবে। আমরা তাঁকে কি করে চিনব বলায় সে বলল তিনি যখন তোমার দোকানে আসবেন তখন তোমার হাজার গুণ লাভ হবে। আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে হাজার গুণ লাভের সংবাদ পেলাম। তাই মিত্রশ্রীকে আপনি গ্রহণ করুন।

তারপর এক শুভদিনে মিত্রশ্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গেল। মিত্রশ্রীর শরীর শিরিষ কুসুমের মত কোমল ছিল, চোখ পদ্মের পাপড়ির মতো, চক্ষু তারকা ঘন কৃষ্ণ।

আমি মিত্রশ্রীর সঙ্গে সেখানে আনন্দে বাস করতে লাগলাম। একদিন মিত্রশ্রী আমায় বলল, আর্যপুত্র, আমাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ সোমের পুত্র জিহ্বার জড়তার জন্য বেদ পাঠ করতে অক্ষম। তুমি কি তাকে বেদ পাঠের উপযুক্ত করে দিতে পার?

আমি সোমপুত্রের জিহ্বার জড়তা কাটাবার জন্য কাঁচি দিয়ে দুইটি শিরা কেটে সেখানে ওষুধ প্রয়োগ করলাম। ফলে সে শুদ্ধ কণ্ঠস্বর লাভ করল।

এতে সন্তুষ্ট হয়ে সোম তার কন্যা ধনশ্রীকে আমার হাতে সমর্পণ করল।

আমি মিত্রশ্রী ও ধনশ্রীর সঙ্গে সেখানে সুখে দিন কাটাতে লাগলাম।

এভাবে কিছুকাল সেখানে কাটাবার পর আমি বেদসামপুরায় গেলাম। নগরের বাইরে থাকব বলে আমি এক উদ্যানে গেলাম। সেখানে এক তরুণীকে এক বৃদ্ধা ও শিশুদের সঙ্গে অবস্থান করতে দেখলাম। তাকে আমার বনদেবী বলে মনে হল। গভীর ভাবনায় নিমগ্ন তাকে চিত্রিত ছবির মত দেখাচ্ছিল!

আমাকে দেখে সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, দেবর সহদেব, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

আমি অপ্রস্তুত হলেও তাকে নিয়ে এক অশোক গাছের তলায় গিয়ে বসলাম।

সে তখন তার বৃত্তান্ত এভাবে বিবৃত করল :

আমার বাবার নাম বসুপালক। তিনি রাজা কোবিলের অশ্ববাহিনীর নায়ক। আমার নাম বনমালা। কামরূপাগত রাজকর্মচারী সুরাদেবের সঙ্গে আমার পিতা আমার বিবাহ দেন। বিবাহের পর আমাকে নিয়ে সে কামরূপে ফিরে যায়। তারপর তুমি বিদেশ ভ্রমণে বার হও। ওদিকে অনেকদিন আমার পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি বলে সুরাদেব আমাকে এখানে নিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুরাদেবের এখানে মৃত্যু হয়। ঘর অসহ্য হওয়ায় আমি এই কালা বৃদ্ধা ও শিশুদের নিয়ে এই উদ্যানে এখন অবস্থান করছি। তোমাকে দেখে আমার চিত্ত শান্ত হয়েছে।

আমি হুঁ বলে চুপ করে রইলাম। আমাকে দেবর বলে অভিহিত করে ও বেশ এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দেখি এখন কি হয়?

সে তখন আমাকে তার সঙ্গে ঘরে যেতে বলল।

আমি তার সঙ্গে বেদসামপুরার মধ্য দিয়ে তার ঘরে গেলাম। লোকে আমাকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল। কি সুন্দর! মানুষ নয়, দেবতা। এই বলে তারা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাচ্ছিল।

ঘরে গিয়ে সে দেবর সহদেব বলে আমার পরিচয় দিল। তারাও আমার রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। বনমালা নিজে আমার পা ধুইয়ে, গায়ে তেল মেখে আমায় স্নান করাল। তারপর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করল। প্রতি মুহূর্তে আমরা বসুপালকের ফিরে আসবার প্রতীক্ষা করছিলাম কিন্তু তিনি না আসায় বনমালা আমায় খেতে বসিয়ে দিল। আমার খাওয়া শেষ হতে না হতে বসুপালক এলেন। বসুপালককেও বনমালা দেবর সহদেব বলে আমার পরিচয় দিল।

বসুপালক আমায় স্বাগত জানালেন কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলেন। বনমালা বলল, বাবা, তুমি আজ এত দেরী করে কেন এলে? আগে এলে একসঙ্গে তোমরা দুজনে খেতে পারতে।

তিনি বললেন, ওর খাওয়া হয়ে গেছে সে ভালই। কিন্তু কেন দেরী হল সে কথা বলি—আমাদের রাজা কোবিলের কোবিলা নামে যে মেয়ে আছে তার সম্বন্ধে এক সময় গণৎকারেরা বলেছিল, অর্দ্ধ ভারতের যিনি অধিপতি হবেন তাঁর বাবার সঙ্গে ওর বিবাহ হবে। রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন আমরা তাঁকে কোথায় পাব ও কি করে তাঁকে জানব! তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন স্ফুলিঙ্গমুখ ঘোটককে যিনি দমন করবেন তিনিই সেই ব্যক্তি। এখন তিনি গিরিতটে দেবদেবর গৃহে অবস্থান করছেন। রাজা তখন তাঁর সভাসদদের জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যে তাঁকে কিছু না জানিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারে। ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রসোম্য বলল সে

এ কাজ করতে পারে এবং রাজার আদেশ নিয়ে সে কিছু অনুচর সহ গিরিতটে চলে যায়। তার কিছু দিন পর সে ফিরে এসে বলে মহারাজ, আমরা গিরিতটে গিয়ে সেই লোকটিকে দেখলাম। সে সত্যিই পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ। আমি তাকে ইন্দ্রজাল শিক্ষা দেব বলে সেই গ্রাম হতে পর্বত শিখরে নিয়ে এলাম ও বিমানে আরোহণ করালাম বিমান তাকে নিয়ে আকাশ পথ দিয়ে আসছিল। কিন্তু সকালে যখন তাকে বিমান হতে নামান হল তখন সে, তাকে যে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে ছুটে পালিয়ে গেল। সে এত জোরে ছুটছিল যে তাকে ধরা গেল না। তারপরও চারদিকে তাকে খুঁজলাম কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। সেকথা শুনে রাজা দুঃখিত হলেন। তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলেন তাই আমিও উঠে আসতে পারিনি। এজন্য আসতে আমার দেরী হল।

একথা শুনে আমি মনে মনে ভাবলাম, তাহলে ত আমায় এখন এখানে থাকতেই হবে।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VII No. 10 Sramen February 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

[ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক জৈন কথা সংগ্রহ]

"বইটী পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল মনটাকে আবার সংসারের নিত্য কাজে ফিরিয়ে আনতে।"

—শ্রীজয়দেব রায়

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

"জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে আলোকবর্ষী আখ্যানমূলক তথ্য বিদ্যমান, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক বাংলা কবিতা···অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবানুগ দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।"

—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮০

পরিবেশক :

অভিজিৎ প্রকাশনী

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ফাল্গুন । ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । একাদশ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮৬ ॥ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি ঃ

প্রকাশন স্থান ঃ কলিকাতা
প্রকাশের কাল ঃ মাসিক
মুদ্রকের নাম ঃ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
প্রকাশকের নাম ঃ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার, স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
সম্পাদকের নাম ঃ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
স্বত্বাধিকারীর নাম ঃ জৈন ভবন
ঠিকানা ঃ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

গণেশ লালওয়ানী
প্রকাশকের স্বাক্ষর

১৫. ৩. ৮০

ভারতীয় দর্শন সমূহে জৈন দর্শনের স্থান

হরিসত্য ভট্টাচার্য

অতীতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যে সমস্ত তথ্য অবস্থিত আছে, তাহাদিগকে প্রকাশ করিবার পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, তাঁহারা সময়ে সময়ে, যে সমস্ত ঘটনা বা সামাজিক ব্যাপারের খৃষ্টপূর্ব বা খৃষ্টঅব্দরূপ নির্দিষ্ট অঙ্কপাতের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তাহাদের সেইরূপে নির্দেশ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সর্বপ্রথমে কোন সময়ে যুক্তি চালিত সমালোচনা অর্পিত হইতে থাকে—বিদ্বদ্‌গণ অনেক সময়ে সেই সময় নির্দিষ্টরূপে নিরূপণ করিতে যাইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বহুদেববাদের পার্শ্বে স্থানে স্থানে যে অধ্যাত্মবাদ ও তত্ত্ববিচার দৃষ্ট হয় অনেক পণ্ডিতের মতে তাহা পরবর্তীকালের প্রক্ষেপমাত্র। কিন্তু তত্ত্ববিচার ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত একত্র থাকিবে না, তত্ত্ববিচার কোন নির্দিষ্ট নিরূপণযোগ্য সময়ে অথবা কোনও সুপ্রভাতে সহসা উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ ভাবিবার কোনও কারণ নাই। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোনটি অগ্রজ এই বিষয় লইয়াও তুমুল বাদ বিসম্বাদ আছে; কোন কোন পণ্ডিতের মতে জৈন ধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং কাহার কাহারও মতে জৈন মত বৌদ্ধমত অপেক্ষাও প্রাচীন। এই সমস্ত বাদ-বিসম্বাদের মধ্যে যে সত্যান্বেষণের স্পৃহা বর্তমান, তাহা সম্মাননার যোগ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের ধারণা,—এই সমস্ত তর্কের অনেক অংশই অনেক সময়ে রুচিকর হইলেও যে কেবলমাত্র মূল্যহীন তাহা নহে, কোনও দেশের তত্ত্ব চিন্তা বিকাশের ক্রম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত।

কারণ যদ্যপি বিচার-বৃত্তি মনুষ্য-প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া গণনা করা যায় তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য সমাজে চিরকালই কিছুনা কিছু অধ্যাত্মচিন্তা ও তত্ত্ববিচার প্রচলিত আছে; এমনকি যে সময়ে সমাজ অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে প্রোথিত বলিয়া অনুমিত হয় সমাজের সেই আদিম অবস্থার মধ্যেও কিছুনা কিছু আধ্যাত্মিকতা থাকে। বস্তুতঃপক্ষে ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে যে এই ক্রিয়াকাণ্ডও সামাজিক শৈশবের সুপ্ত মূঢ়তার উপর একটা আধ্যাত্মিকতার অবতারণা। সম্যকরূপে পরিস্ফুট না থাকিলেও, সমাজের প্রত্যেক অবস্থাতেই একটা বিচারবৃত্তি, প্রচলিত নীতি পদ্ধতির অতিক্রম বর্তমান থাকে।

এই নিমিত্ত দর্শনের জন্মদিন নিরূপণ করা অসাধ্য। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দর্শন মতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাহার পূর্বেও সেই সেই দর্শন মত বীজরূপে বর্তমান ছিল, একথা বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধমত বুদ্ধ হইতে এবং জৈনমত বর্দ্ধমান (মহাবীর) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা একপ্রকার ভ্রান্তধারণা। ইহা নিশ্চয় যে দুই মহাপুরুষের বহু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন শাসনের মূল তত্ত্বসমূহ সূত্ররূপে প্রচলিত ছিল। ঐ তত্ত্বসমূহকে বিশদরূপে প্রকটিত করা, জগতের সম্মুখে ঐ সমস্ত তত্ত্বের মাধুর্য ও গাম্ভীর্য প্রকাশিত করা এবং উহা দিগকে আপামর সাধারণের নিকট প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের গৌরবময় ব্রত ছিল। আমাদের ধারণা, তাঁহারা এতদধিক আর কিছুই করেন নাই। মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈনমত বুদ্ধ ও বর্দ্ধমানের জন্মের বহুপূর্ব হইতে বর্তমান ছিল; উভয় মতই প্রাচীন, উপনিষদের ন্যায় প্রাচীন—একথা বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ও জৈনমতের উপনিষদের সমকালীন কোনও নিদর্শন নাই এবং তজ্জন্য ঐ দুই মতকে উপনিষদের ন্যায় প্রাচীন বলা যাইতে পারে না,—এরূপ আপত্তি সমীচীন নহে। উপনিষৎসমূহ প্রকাশ্যরূপে বেদের প্রতিকূল হয় নাই এবং সেই নিমিত্ত তাহাদের শিষ্যবর্গের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। অবৈদিক মত সকল প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই একটু শঙ্কাগ্রস্ত ছিল এবং তাহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে অধ্যাত্মবাদস্বরূপে তাহারা উপনিষৎ যুগে বর্তমান ছিল; কারণ ইহা অসম্ভব যে যখন চিন্তাশীল মনীষিগণ তত্ত্বানুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উপনিষৎ বর্ণিত মার্গরূপ একটিমাত্র মার্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎকালে চিন্তার গতি অবাধ ছিল এবং এই তত্ত্বালোচনার ফলে অবৈদিক মার্গগুলিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অন্যান্য মতবাদ হইতে ঔপনিষদ মতবাদও এরূপ সুবোধ্য নহে যে উহাই সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল একথা বলা যাইতে পারে।

যদি বৈদিক ও অবৈদিক মতবাদ সমূহ একই সময়ে উদ্ভূত হইয়া উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে অনেকগুলি তত্ত্ব সাধারণ থাকিয়া যাইবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত ভারতের কোন বিশিষ্ট দর্শন সমূহ অধ্যয়ন করিবার সময় উহার সহিত ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রসিদ্ধ দর্শন সমূহ তুলনা করা অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

বঙ্গদেশে জৈন দর্শন বিশেষরূপে অধীত ও আদৃত না হইলেও ভারতবর্ষের দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে ইহার প্রকৃতপক্ষে গৌরবময় স্থান আছে। বিশেষতঃ জৈন দর্শন একটি সম্পূর্ণ দর্শন। তত্ত্ববিদ্যার সমস্ত অঙ্গই ইহাতে বর্তমান আছে। বেদান্তে তর্ক বিদ্যার উপদেশ নাই। বৈশেষিক কর্মাকর্ম বা ধর্মাধর্মের শিক্ষা দেয় না। কিন্তু জৈন

দর্শনে ন্যায়বিদ্যা আছে, তত্ত্ববিচার আছে, ধর্মনীতি আছে, পরমাত্ম তত্ত্ব আছে এবং অন্যান্য সমস্তই আছে। জৈন দর্শন প্রাচীন যুগের তত্ত্বানুশীলনে বাস্তবিকই একটি অমূল্য ফল, জৈন দর্শন ব্যতিরেকে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

আমরা যে প্রণালীতে জৈন দর্শনের আলোচনা করিতে চাই, তাহা উপরেই নির্দিষ্ট হইল। আমাদের আলোচনা সঙ্কলনাত্মক অর্থাৎ তুলনামূলক। এরূপ আলোচনা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার, সন্দেহ নাই; কারণ এরূপভাবে আলোচনা করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় সমস্ত দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা চাই কিন্তু আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি মাত্র কথার অবতারণা করিয়া যাইব।

জৈনমত নির্দেশ করিবার জন্য আমরা ইহার সহিত অন্যান্য মতবাদের নিম্নলিখিতরূপে তুলনা করিতে পারি। জৈমিনীয় দর্শন ভিন্ন ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক দর্শনই প্রকাশ্যভাবে অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপে অন্ধ আস্থার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের অবিরাম সংগ্রামের নামই দর্শন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতবর্ষের দর্শন সমূহকে এই দিক দিয়া দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রধান তত্ত্বগুলির আলোচনা করিব। অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শন সমূহের যে ক্রমবিকাশ এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে, তাহা যুক্তিগত মাত্র (logical), কালগত (chronological) নহে।

অনন্তকম্প আপাততঃ অর্থহীন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রতিবাদ চার্বাক সূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সমাজেই চিরকাল প্রতিবাদকারী স্বতন্ত্রী-সম্প্রদায় থাকে এবং প্রাচীন বৈদিক সমাজেও এরূপ সম্প্রদায় ছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে পরুষভাষায় আক্রমণ করা কোন কালেই কঠিন ব্যাপার নহে। চিন্তাশীল ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া এরূপ কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে প্রথম প্রতিবাদের উচ্ছ্বাস যে যজ্ঞীয় বিধি বিধান সমূহের নির্দয় নিন্দাবাদে পরিণত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। ইহাই চার্বাক দর্শন—বৈদিক কর্মকাণ্ডের অবিরাম প্রতিবাদ! চার্বাক দর্শন প্রতিবাদের দর্শন। গ্রীসদেশের সোফিস্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় চার্বাকগণ কখনও বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতেন না। চূর্ণ করা, দোষারোপ করা, অমান্য করা—ইহাই চার্বাক দর্শনের কার্য। 'প্রশংসা' না করিয়া 'প্রোথিত' করাই চার্বাক দর্শনের কার্য ছিল। বেদ পরকালে বিশ্বাস করিতেন,—চার্বাকগণ পরকালে অবিশ্বাস করিতেন। কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ষষ্ঠ শ্লোকে এতাদৃশ নাস্তিকবাদের পরিচয় পাওয়া যায়—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

উক্ত শ্লোকে পরলোকে বিশ্বাসহীন জনগণের কথা বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীর দ্বাদশ শ্লোকে নাস্তিকবাদের দোষাবিষ্কার দেখা যায়—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর বিংশ শ্লোকে পরলোকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের বর্ণনা দেখা যায়—

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

বেদ যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের উপদেশ দিতেন, অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ ঐ সকল যজ্ঞকর্মের প্রয়োজনীয়তায় সন্দিহান ছিলেন এবং যজ্ঞীয় বিধি বিধানের হাস্যাস্পদতা লোক সমক্ষে ধরিয়া দিতেন। । যে উপনিষৎ বেদসমূহের অংশ বলিয়া স্বীকৃত হয়, এমন কি সেই উপনিষৎই স্থানে স্থানে বৈদিক কর্মকাণ্ডের দোষ ধরিয়াছেন। বহু উদাহরণের মধ্যে একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭

"যজ্ঞ সমূহ এবং তদীয় অষ্টাদশ অঙ্গ ও কর্মাদি সমস্তই অদৃঢ় ও বিনাশশীল, যে সমস্ত মূঢ় ঐ সকলকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

কিন্তু উপনিষৎ ও চার্বাক মতে প্রভেদ এই যে উপনিষৎ এক উচ্চতর ও মহত্তর সত্যের পথ দেখাইবার জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করিতেন এবং নাস্তিক চার্বাকগণ দোষাবিষ্কাররূপ সহজসাধ্য কর্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই করিতেন না। চার্বাকদর্শন বিধিহীন নিষেধবাদ; বৈদিক বিধি-বিধানের নিন্দা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই চার্বাক দর্শনেই প্রথম যুক্তিবাদের উৎপত্তি হয়, ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দর্শনে এই যুক্তিবাদ পরিপুষ্টি লাভ করে।

নাস্তিক চার্বাক মতের ন্যায় জৈন দর্শনেও বৈদিক কর্মকাণ্ডের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। জৈন দর্শন প্রকাশ্যভাবে বেদের শাসন অমান্য করিয়া থাকেন এবং নাস্তিক মতের সহিত সমন্বয়ে যজ্ঞাদির নিন্দা করেন। চার্বাক মতের সহিত জৈন মতের এই স্থলে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জৈন দর্শন চার্বাক মতের ন্যায় নিষেধময় নহে। একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক মতের সৃষ্টি করাই জৈন দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথমে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে জৈন দর্শন চার্বাক মতের ঘৃণ্য ইন্দ্রিয় সুখ পরমার্থতা অবজ্ঞার সহিত দূরে পরিহার করিয়া থাকেন। আপাততঃ অর্থহীন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চার্বাক মতবাদিগণের পক্ষে হয়ত সঙ্গত ছিল, কিন্তু তাঁহারা কখনও গভীরতর বিষয়ে চিন্তাক্ষেপ করেন নাই এবং মনুষ্য প্রকৃতির যে অংশ পাশব ভাব

রঞ্জিত সেই অংশেই আকৃষ্ট থাকিতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে বৈদিক কর্মকাণ্ড লালসাকে চাপিয়া রাখিতে চায়, অবারিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পথে কণ্টকের সৃষ্টি করে—এই নিমিত্তই চার্বাক মত বেদ শাসন অমান্য করিতেন। কিন্তু যদি একান্তই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে সে প্রতিবাদের হেতু ওরূপ হওয়া উচিত নয়। নিরর্থক ক্রিয়াকলাপের অন্ধ অনুষ্ঠানে মনুষ্যের যুক্তি বা তর্ক বৃত্তির পথ রুদ্ধ হয়—এই কারণেই কর্ম কাণ্ডের প্রতিবাদ করা চলে। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা একথা বুঝেনা। সেইজন্য বৌদ্ধ মতের ন্যায় অধ্যাত্মবাদী জৈন দর্শন চার্বাক মত পরিহার করেন।

চার্বাক মতের পরেই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের তুলনা করা যাইতে পারে। নাস্তিক মতের ন্যায় বৌদ্ধ দর্শনও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে কারণে কর্মকাণ্ডে দোষারোপ করেন তাহা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধমতে কর্ম নিমিত্তই জীবের দুঃখময় অস্তিত্ব। যাহা করিয়াছি, যাহা করি, তাহার দ্বারাই আমাদের অবস্থা নিরূপিত হয়। অসার অবস্তু ভোগবিলাস অসাবধান জীবগণকে মুগ্ধ করে এবং সেই ভোগ লালসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই অবিরাম দুঃখ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কর্মের বন্ধন ভগ্ন করিতে হয়। কর্মের অধিকার অতিক্রম করিতে হইলে, কুকর্মেব পরিবর্তে সুকর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, লালসার পরিবর্তে সন্ন্যাস অভ্যাস এবং হিংসার পরিবর্তে অহিংসার আচরণ করিতে হইবে। বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানে যে কেবল মাত্র বহু নিরপরাধ প্রাণীর হত্যা সাধন হয় তাহা নহে, ঐ সকল কর্মের অনুষ্ঠাতা কৃতকর্মের ফলে স্বর্গাদি ভোগময় স্থানে গমন করেন, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এইরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবের দুঃখময় জন্ম-জন্মান্তরের কারণ হইয়া উঠে, বৌদ্ধমতে এই নিমিত্ত বৈদিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাজ্য। কর্মের রাজ্য অতিক্রম করিতে হইলে অহিংসা ও ত্যাগ প্রয়োজন ;—বৌদ্ধমতের ইহাই মূল সূত্র। বৈদিক কর্মকাণ্ড হিংসা কলুষিত ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্বাণের অন্তরায় স্বরূপ ; সেইজন্য বৈদিক বিধি-বিধান পরিহার্য। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে বেদশাসন অমান্য করণে চার্বাক দর্শনের সহিত একমত হইলেও, বৌদ্ধদর্শন দৃঢ়ভাবেই চার্বাকবাদিগণের ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা আক্রমণ করিয়াছেন। বৈদিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে লালসার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া না পড়ি, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন ; কঠিন সংযম ও সন্ন্যাসের দ্বারা কর্মের নিগড় ভাঙিতে হয়—ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের উপদেশ।

কর্মবন্ধনের নিমিত্তই জীবগণ সংসারের দুঃখ ভোগ করে, বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনও একথা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ মতের ন্যায় জৈন দর্শনও একদিকে বেদশাসন

অমান্য করেন এবং অপরদিকে চার্বাকগণের ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায় ঘৃণা করেন। অহিংসা ও বিরতি অনুষ্ঠেয়—জৈনগণ বৌদ্ধগণের সহিত সমস্বরে একথাও বলেন, এমন কি জৈন মতে অহিংসা ও বিরতির অনুষ্ঠান অধিকতর তীব্র ভাবাপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু সাদৃশ্য থাকিলেও জৈন দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনে প্রভেদ আছে,—বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তির যে দুর্বলতা আছে, জৈন দর্শনে তাহা নাই।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধমতের সুরম্য নীতি-হর্ম্য দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদশাসন অমান্য করিবার উপদেশ গ্রহণীয় হইতে পারে, অহিংসা ও সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের উপদেশ মনোজ্ঞ হইতে পারে, কর্ম বন্ধন ভগ্ন করিবার উপদেশ সারবান হইতে পারে—কিন্তু, বৌদ্ধ দর্শনের নিকট জিজ্ঞাস্য এই—'আমরা কি?' 'আমাদের উদ্দেশ্য, পরম পদ কি?' এ প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ দর্শনের যে উত্তর তাহা অতি ত্রাসকর ও রোমহর্ষক—'আমরা কিছু নহি'। তবে কি আমরা অন্ধকারের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছি এবং অসার মহাশূন্যই কি জীবের চরম নিবেশ? সেই ভীতিকর মহানির্বাণ এবং অনন্তকালের মহানিস্তব্ধতা নিকটে ডাকিয়া আনিবার জন্যই কি জীব কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবে এবং জীবনের অতি সামান্য সুখ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে? এজীবন অসার—ইহার পর যাহা তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে। বৌদ্ধ দর্শনের এই নিরাত্মবাদে সাধারণ মানব সন্তুষ্ট হইতে পারে না, একথা নিশ্চয়। বৌদ্ধধর্ম যে এককালে অসাধারণ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার নিরাত্মবাদের জন্য নহে, 'মধ্য পথ' বলিয়া যাহা কথিত হয়, বুদ্ধ নির্দিষ্ট সেই মধ্য মার্গের কঠোরতাহীন তপশ্চরণের আকর্ষণেই জৈনগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 'আমি আছি'—ইহা সকলেই অনুভব করে। 'আমি সত্য—অসার ছায়া নহি'—ইহা কাহার না অনুভব হয়?

আত্মা অনাদি অনন্ত—ইহা উপনিষদের প্রতি পংক্তিতে উজ্জলভাবে অঙ্কিত, এবং বেদান্ত দর্শন এই তত্ত্ব প্রচারে মুখরিত। আত্মা আছে, আত্মা সত্য ইহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, ইহা অনন্ত। আত্মা জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিতেছে, দুঃখ বা সুখ ভোগ করিতেছে এরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অসীম সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ সম্বন্ধে অসীম ও অনন্ত। বেদান্ত দর্শনের ইহাই মূল প্রতিপাদ্য এবং আত্মার অসীমত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া জৈন দর্শন বেদান্তের অবিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বৌদ্ধ দর্শনের নিরাত্মবাদ আক্রমণ করিয়া এবং আত্মার অনন্ত সত্তা স্বীকার করিয়া জৈন ও বেদান্তমত অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু উভয় মতে পার্থক্য আছে। বৈদান্তিক জীবাত্মার সত্তা স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট নহে; তিনি দর্শন জগতে আর একটু অগ্রসর হইয়া নির্ভীকভাবে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ প্রচার করেন। বেদান্ত মতে এই চিদচিন্ময় বিশ্ব সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার বিকাশমাত্র। আমি

তিনি, বিশ্বের উপাদান তিনি, আমি তাঁহা হইতে বিভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নহি, এই যে আমার বাহিরে অন্তঃহীন জগৎ যে জগৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই জগৎও তাঁহা হইতে বিভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নহে। এক অদ্বিতীয় সত্তা—তিনিই আছেন, তুমি, আমি চিদচিৎ ভাবসমূহ সেই 'সত্যস্য সত্যম্' হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক।

বেদান্তের এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-বাদ অতি গভীর ও মহান, কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে এই উচ্চভাব গ্রহণ দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ মানব, জীবাত্মা বলিয়া একটা সত্তা আছে, এটুকু অনুভব করিতে পারে ; কিন্তু মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের প্রভেদ নাই, মনঃ, জড়পদার্থ এবং অন্যান্য সত্যরূপে প্রতীয়মান পদার্থ সকলের মধ্যে স্বভাবতঃ কোনও ভেদ নাই ; একথা স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। এবং যদি কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এইরূপই সিদ্ধান্ত করেন—যে তিনি অন্য মানব হইতে স্বতন্ত্র, অন্যান্য অচেতন ও চেতন ভাব সমূহ হইতে স্বতন্ত্র এবং এই বিশ্ব চিদচিৎ অসংখ্য স্বতন্ত্র ভাব সমূহে পরিপূরিত—তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত একেবারে যুক্তিহীন, একথা বলা যায় না। আমরা বলি, এরূপ সিদ্ধান্ত একেবারে যুক্তিহীন নহে, বরং পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এইরূপ অনুভবগম্য, সুযোগ্য সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। এই কারণে বেদান্তমত সকলের গ্রহণীয় হয় না।

[ক্রমশঃ

॥ ত্রিশলা ॥

শ্রীরামজীবন আচার্য

ত্রিশলা,
তোমার যথার্থ নামের গুণ পুত্রধর্মে বর্তেছে নিশ্চয় ।
পুত্র তব জিন মহাবীর
দৃষ্টি-জ্ঞান-চারিত্রের তিনটি শলাকা জ্বেলেছে উজ্জ্বল ক'রে ।
গর্ভে ধ'রে তনয়েরে
শুভঙ্করী স্বপ্নরাজি হেরেছিলে যতেক যতেক
সে সব সার্থক আজ ।
রত্নগর্ভা অয়ি
কুলেরে পবিত্র ক'রে কৃতার্থা করিয়া জননীরে
পুত্ররত্ন তব
আমাদের মর্ত্যভূমে 'ত্রিরত্ন' প্রকাশে ।
সে যে আজ ইতিহাস ।
চক্ষুষ্মান্ শুধু, সে রত্ন দেখিতে পায়
অন্ধ সবে দেখিবে কেমনে ?
দৃষ্টি-জ্ঞান-চারিত্রের বিবশবৈকল্যে
অন্ধতমোরাশি মাঝে ডুবে যায় ভারত মোদের ।
ত্রিশলা,
তব সমা জননী কি আসিবে না ভারতে আবার ?

শ্রীপাল

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান চম্পা। রাজপ্রাসাদের একাংশ। রাজপুত্রের জন্মোপলক্ষে নর্তকীরা নৃত্য করছে। তারা বেরিয়ে যেতে একদিক দিয়ে অনুচর সহ রাজা (সিংহরথ), মন্ত্রী (মতিসাগর), রাজার কাকাতো ভাই (অজিত সেন), সেনাপতি (কীর্তিপাল) প্রবেশ করছেন]

সিংহরথ ঃ ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার পর কে সিংহাসনে আরোহণ করবে এই চিন্তা সতত আমাকে বৃশ্চিকের মত দংশন করছিল। আজ সেই চিন্তার অবসান হল। আজ আমার হৃদয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী, রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করে দাও প্রজাবৃন্দ তাদের ভাবী রাজার জন্মোপলক্ষে এমনি উৎসব যেন সাত দিন ধরে করে।

মতিসাগর ঃ মহারাজ! তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ওই শুনুন তাদের আনন্দোল্লাস। তারা তাদের ভাবী রাজার জন্মোপলক্ষে তাদের মনের আনন্দ স্বতঃ প্রকাশিত করছে। মহারাজ! নবজাতকের কি নাম রাখা হবে?

সিংহরথ ঃ কি আবার নাম? ওর শাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে ও প্রজাদের যথোচিত পালন। তাই ওর নাম হবে শ্রীপাল।

অজিত সেন ঃ শ্রীপাল আমাদের বংশের তিলক হবে।

কীর্তিপাল ঃ [অজিত সেনের কানে কানে] তিলক না কণ্টক?

অজিত সেন ঃ চুপ।

কৌঞ্চুকী ঃ মহারাজ, এই দিকে, এই দিকে—

সিংহরথ ; চল, আমরা নব-জাতকের মুখ দর্শন করে আসি।

[সিংহরথের পেছনে পেছনে সকলে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মহারাণী (কমলপ্রভা)র কক্ষ। মহারাণী অশ্রু বিসর্জন করছেন। মন্ত্রী তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন]

মতিসাগর ঃ মহারাণী ! রাজ্যের এই সঙ্কট মুহূর্তে আপনি যদি ধৈর্য হারান তবে রাজ্য রক্ষাই কঠিন হয়ে উঠবে। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে।

কমলপ্রভা ঃ জানি মহামাত্য ! কিন্তু পতি বিয়োগের এই শোকের আঘাত এতই আকস্মিক যে আমি এই শোক সহ্য করতে পারছি না। আমার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

মতিসাগর ঃ মহারাণী !

কমলপ্রভা ঃ মন্ত্রীবর ! বিবাহিত জীবনের বিশ বছর পর কত সাধ্য সাধনায় আমরা শ্রীপালকে পেয়েছিলাম। কিন্তু ওর জন্মের পর ছ' মাসও অতীত হল না মহারাজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রীপালের জন্ম শ্রবণে তাঁর কি আনন্দ ! কিন্তু সেই আনন্দ তাঁর ভাগ্যে সইল না।

মতিসাগর ঃ মহারাণী ! ভাগ্যের নির্বন্ধকে কে কবে অতিক্রম করতে পারে ? নইলে ওমন সুস্থ সবল মানুষ সামান্য দাহ জ্বরে এমন আকস্মিক ভাবে চলে যেতে পারে ? কিন্তু যা গত হয়েছে তাকে নিয়ে চিন্তা করে এখন আর লাভ নেই। আমাদের এখন ভবিষ্যতের দিকে দেখতে হবে। শ্রীপালের ও শ্রীপালের রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর এসে পড়েছে। ওর কথা চিন্তা করে আপনি নিজেকে শক্ত করুন।

কমলপ্রভা ঃ মহারাজের অভাবে আমি নিজেকে ভারী অসহায় মনে করছি মন্ত্রীবর !

মতিসাগর ঃ না মহারাণী, না। নিজেকে এত দুর্বল হতে দেবেন না। শ্রীপাল এখন শিশু। তাছাড়া তার রাজ্যও নিষ্কণ্টক নয়। তাই আমাদের আরো বেশী সজাগ থাকতে হবে।

কমলপ্রভা ঃ কেন মন্ত্রীবর ?

মতিসাগর ঃ কেন ? মহারাজের লঘুভ্রাতা অজিত সেন মহারাজ বহুদিন অপুত্রক থাকায় ভেবেছিলেন মহারাজের পর তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করবেন। শ্রীপাল এখন তাঁর পথের কণ্টক হয়েছে।

কমলপ্রভা ঃ তাহলে কি হবে মন্ত্রীবর ?

মতিসাগর ঃ সেইজনাই আমি চাইছিলাম মহারাণী, শ্রীপালকে যত শীঘ্র সম্ভব সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসনের ভার আপনি নিজের হাতে গ্রহণ করুন।

কমলপ্রভা ঃ কিন্তু...

মতিসাগর ঃ কিন্তু নয় মহারাণী ! আমিত আছিই আপনাকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করার জন্য। তা নইলে অজিত সেন যদি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে শ্রীপালকে রাজ্যই যে হারাতে হবে শুধু তাই নয়, তার জীবনও সংশয়।

কমলপ্রভা ঃ মন্ত্রীবর ! আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার পরলোকগত পতির সময়ে আপনি যে দায়িত্ব নির্বাহ করতেন সেই দায়িত্বই আপনার ওপর রইল। আপনি ওর রাজ্যাভিষেকের শীঘ্রাতিশীঘ্র ব্যবস্থা করুন।

মতিসাগর : যে আদেশ মহারাণী !

তৃতীয় দৃশ্য

[অজিত সেনের কক্ষ। তিনি পাশার গুটি সাজিয়ে বসে আছেন। সেই সময় তাঁর মিত্র বৃষ সেন এসে প্রবেশ করছে। সেই দিকে চেয়ে]

অজিত সেন ঃ এই যে বৃষ সেন, এই দেখ মন্ত্রীকে কেমন কোণঠাসা করে এনেছি।

বৃষ সেন ঃ তুমি দাবার গুটিতে মন্ত্রীকে যতই কোণঠাসা কর তাতে সংসারের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু জান ওদিকে কি হচ্ছে ?

অজিত সেন ঃ কোন দিকে ?

বৃষ সেন ঃ কোন দিকে আবার ? মহারাজের মৃত্যু হয়েছে সে খবরও কি তুমি এখনো পাওনি।

অজিত সেন ঃ পেয়েছি। তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেও গিয়েছিলাম।

বৃষ সেন ঃ তাহলে এখনো তুমি চুপ করে কি করে বসে আছ ? তুমি কি ভাবছ লোকে এসে তোমাকে বলবে—চলুন মহারাজ, সিংহাসনে গিয়ে বসুন। তারা জানে মহারাজের পর শ্রীপালই রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

অজিত সেন ঃ কিন্তু শ্রীপাল এখনো শিশু।

বৃষ সেন ঃ শিশু হলে কি হয়। ওদিকে রয়েছে ওই মন্ত্রী মতিসাগর। সে মহারাণীকে হাত করে শ্রীপালকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেবে।

অজিত সেন ঃ কি বললে ?

বৃষ সেন ঃ ঠিকই বলছি। তুমি এখানে পাশার গুটিতে রাজা মন্ত্রী মারতে থাক আর ওদিকে মন্ত্রী শ্রীপালকে শিখণ্ডী করে চম্পা দেশের রাজা হোক। কাল সকালে শ্রীপালের রাজ্যাভিষেক হবে। কিন্তু বাস্তবে মতিসাগরই হবে অঙ্গ দেশের প্রকৃত রাজা।

অজিত সেন ঃ মহারাণী জানেন সেকথা।

বৃষ সেন ঃ শুধু জানেনই নয়। তাঁর আদেশেই এসব হচ্ছে। তোমাকে তাই সচেতন করে দিতে এসেছি। জান ত শত্রুকে সময় দিতে নেই। যা করবার আজই, এখুনি করো।

অজিত সেন ঃ আমিও চুপ করে বসে নেই বৃষ সেন। মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই

আমি মতিসাগরকে হাত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে ধরা দিল না। প্রভু ভক্তির জন্য সে শ্রীপালের বিরোধিতা করতে পারবে না। সে মূর্খ নয়, মহামূর্খ। আজ তার প্রভু শ্রীপাল না অজিত সেন? আমি তাই পাশা নিয়ে বসেছিলাম। এই দেখ মন্ত্রীকে আমি কেমন কোণঠাসা করেছি।

বৃষ সেন : কি রকম? কি রকম?

অজিত সেন : সেনাপতিকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছি। সৈন্যদল এখন আমার বশীভূত।

বৃষ সেন : সাধু! সাধু!

অজিত সেন : রাজপুরুষদের প্রায় সকলেই আমায় আনুগত্য জানিয়েছে।

বৃষ সেন : সাধু! সাধু! কিন্তু ওদিকে—

অজিত সেন : মতিসাগর ওদিকে যাই করুক না কেন কাল সকালে অজিত সেন অঙ্গ দেশের রাজা। অঙ্গাধিপতি মহারাজা অজিত সেন…কেমন লাগছে শুনতে।

বৃষ সেন : লাগছে ত বেশ ভালোই। কিন্তু শ্রীপাল এখন প্রাসাদে রয়েছে। প্রাসাদরক্ষী সৈন্যও কিছু কম নেই।

অজিত সেন : সে কি আমি জানি না। সে সব চিন্তা করেই আমার জাল চারদিকে বিস্তৃত করতে হয়েছে। আগামীকালের সূর্যোদয় শ্রীপাল আর দেখবে না। সে জানে না আমার পথের যে কণ্টক তাকে আমি এভাবে তুলে ফেলেদি। [অভিনয় করে দেখাবেন] আজ রাত্রে সে তার পিতার কাছে গিয়ে পৌছবে।

বৃষ সেন : সাধু। সাধু।

[দ্বাররক্ষক আসছে]

দ্বাররক্ষক : সেনাপতি কীর্তিপাল আপনার দর্শনপ্রার্থী।

অজিত সেন : তাঁকে ভেতরে নিয়ে এস।

[দ্বাররক্ষক বাইরে যাচ্ছে। কীর্তিপাল ভেতরে আসছেন]

কীর্তিপাল : মহারাজ অজিত সেনের জয় হোক!

অজিত সেন : না না, এখনো মহারাজ নয় কীর্তিপাল, কাল সকালে যখন অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করব তখন—

কীর্তিপাল : কাল সকালে মতিসাগর শ্রীপালকে সিংহাসনে বসাবেন স্থির করেছেন। আজ হতে প্রজারা তাই আনন্দোৎসব করছে।

অজিত সেন : করতে দাও। কাল সকালে আমি যখন সিংহাসনারোহণ করব তখনো

ওরা ওমনি আনন্দোৎসব করবে। আজ রাত্রে আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শ্রীপালকে হত্যা করব।

কীর্তিপাল ঃ কিন্তু প্রাসাদ রক্ষী সৈন্যদল যদি বাধা দেয়।

অজিত সেন ঃ অজিত সেন ওত কাঁচা কাজ করে না। প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদলের নায়ক মহেন্দ্রবর্মাকে আমি হাত করেছি। সে কোনো বাধা দেবে না। মতিসাগরের চালে একটু ভুল হয়েছে। সে ভেবেছিল শ্রীপালকে সিংহাসনে বসালেই প্রজারা তাকে সমর্থন করবে। প্রভুভক্তির জন্য তোমরাও তার পক্ষে হবে। কিন্তু রাজনীতিতে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, প্রভুভক্তি বলে কিছু নেই। তোমরা যখন আমার সহায় তখন প্রজা কি করতে পারে ? বৃষ সেন—

বৃষ সেন ঃ কি আদেশ আমার প্রতি।

অজিত সেন আমার সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে—না না শ্রীপালের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে আমার প্রাসাদও আলোকমালায় সজ্জিত কর। নর্তকীদের আহ্বান কর। আজকের এই আনন্দ রাত্রি তাদের হাস্যে লাস্যে মদির করে দিক—

বৃষ সেন ঃ বুঝতে পেরেছি আর সেই অবকাশে তুমি প্রাসাদে প্রবেশ করে—

অজিত সেন : হাঁ। মনে পড়ে কীর্তিপাল, শ্রীপালের জন্ম সময়ে আমি বলেছিলাম, আমাদের কুলের তিলক হবে—তুমি বলেছিলে তিলক না কণ্টক। কীর্তিপাল, রাজনীতির চাল এইভাবেই চালতে হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

[মহারাণীর কক্ষ। শ্রীপাল একদিকে শুয়ে রয়েছে। মহারাণী তাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। সেই সময় মন্ত্রী তাঁর কক্ষে প্রবেশ করছে]

মতিসাগর ঃ অসময়ে আপনার কক্ষে প্রবেশ করে আপনার শান্তি বিঘ্নিত করলাম তার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু এক মুহূর্তের সময় নষ্ট করবার ছিল না। সম্মুখে সমূহ বিপদ...

কমলপ্রভা ঃ কি বিপদ মন্ত্রীবর ? আপনার কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠছে। কাল সকালে শ্রীপালের রাজ্যাভিষেক। প্রজারা সেই আনন্দ উৎসবে মগ্ন। এমন সময়ে আপনি কি সমূহ বিপদের বার্তা বহন করে এনেছেন।

মতিসাগর : কুমার শ্রীপালের সমূহ বিপদের বার্তা বহন করে এনেছি মহারাণী। আপনাকে এইমুহূর্তে শ্রীপালকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে যেতে হবে।

কমলপ্রভা ঃ কাল সকালে শ্রীপালের রাজ্যাভিষেক হবে আর এই মুহূর্তে আমায় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে যেতে হবে—আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা মন্ত্রীবর।

মতিসাগর ঃ কাল সকালে শ্রীপালের নয়, অজিত সেনের রাজ্যাভিষেক হবে। তার পূর্বে সে শ্রীপালকে—

কমলপ্রভা ঃ কিন্তু তার প্রাসাদেও ত শ্রীপালের রাজ্যাভিষেকের জন্য আনন্দোৎসব হচ্ছে।

মতিসাগর ঃ সে কেবল প্রজাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য। কিন্তু গোপনে গোপনে সে এক বিরাট চক্রান্ত করেছে। আমি গুপ্তচরদের নিকট হতে সমস্ত তথ্য অবগত হয়েছি। সে আজ রাত্রে আপনার কক্ষে প্রবেশ করে শ্রীপালকে হত্যা করবে।

কমলপ্রভা ঃ না না মন্ত্রীবর! তাছাড়া আমাদের সৈন্যদল রয়েছে, প্রাসাদ রক্ষী সৈন্য রয়েছে।

মতিসাগর ঃ না মহারাণী, না। তাহলে মতিসাগর এই অসময়ে আপনার কক্ষে আসত না। উৎকোচ দানে সে সেনাপতি কীর্তিপাল ও প্রাসদরক্ষী সৈন্যদের নায়ক মহেন্দ্রবর্মাকে বশীভূত করেছে। শ্রীপালের রক্ষার জন্য কেউই অস্ত্র ধারণ করবে না। মতিসাগরকেও সে বশীভূত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মতিসাগর কৃতঘ্ন পামর নয়। কিন্তু মহরাণী, আর দেরী করবেন না। সুপ্ত কুমারকে নিয়ে আপনি এখুনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করুন। আপনাকে আজ রাত্রেই রাজধানী হতে অনেক দূরে চলে যেতে হবে। অজিত সেন আমাকেও বন্দী করবার আদেশ দিয়েছে।

কমলপ্রভা ঃ কিন্তু এত রাত্রে কুমারকে নিয়ে আমি একলা কি করে প্রাসাদ পরিত্যাগ করে যাব? দ্বারীরা যদি অজিত সেনের বশীভূত হয়ে থাকে তবে তারা কি আমায় বাধা দেবে না?

মতিসাগর ঃ সে উপায়ও আমি স্থির করে রেখেছি। মহারাণী, উদ্যানের পুষ্প গৃহ হতে এক সুড়ঙ্গ পথ রাজধানীর প্রত্যন্তবর্তী অরণ্যের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই সুড়ঙ্গপথের সন্ধান মহারাজ ও আমি ছাড়া কেউ জানে না। সেই সুড়ঙ্গ পথে আপনাকে যেতে হবে।

কমলপ্রভা ঃ কিন্তু তারপর?

মতিসাগর ঃ তারপরের কথা চিন্তা করার এখন সময় নেই। ঈশ্বর ভরসা। কিন্তু এখন যদি আপনি দেরী করেন তবে শ্রীপালকে বাঁচানো যাবে না।

[মহারাণী শ্রীপালকে কোলে তুলে নিচ্ছেন]

কমলপ্রভা : আমি প্রস্তুত মন্ত্রীবর।
[মন্ত্রী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন]

মন্ত্রিসাগর : এই দিকে মহারাণী, এই দিকে—
[মহারাণী ও মন্ত্রীর স্থান ত্যাগের খানিক পরই অন্যদিক দিয়ে অজিত সেন মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করছে]

অজিত সেন : কই মহারাণী কোথায় ? শ্রীপাল কোথায় ? কৌঞ্চকী—
[কৌঞ্চকী প্রবেশ করছে]

অজিত সেন : মহারাণী কোথায় ?

কৌঞ্চকী : মহারাণী কুমারকে নিয়ে উৎসব দেখবার জন্য আস্থান মণ্ডপের দিকে গেছেন।

অজিত সেন : আস্থান মণ্ডপ। [বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন]

পঞ্চম দৃশ্য

[অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ। দূরে কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের বিরাট দল। সমানে এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কথা বলছে]

মঙ্গল : খেয়ে দেয়ে অনেক বিশ্রাম করা হল। এখন এগিয়ে যেতে হয়। কি বল দলপতি ? সন্ধ্যের আগে যদি পৃষ্ঠচম্পায় পৌঁছুতে পারি।

সুজন : না পারলেই বা কি ? আমরা ত কোন রাজ্য জয় করতে যাচ্ছি নে, না তীর্থ যাত্রায় যে আমাদের অমক সময়ে সেখানে পৌঁছুতে হবে। আমাদের ত পথই ঘর বাড়ী তাই যদি আজ এখানেই থাকি তাতেই বা কী ? দেখছ শরতের রোদ—কেমন মিষ্টি। একটা আলস্য যেন আমায় পেয়ে বসেছে।

মঙ্গল : তোমায় ঠিক বুঝতে পারি না সুজন। তুমি ক্রমশঃই যেন কেমন—

সুজন : ভাবছি এবার তোমায় দলপাত করে দেব।

মঙ্গল : না ভাই। দলপতি হবার আরেক ঝঞ্ঝাট। ও সবে আমি নেই। আমি এই বেশ আছি : তুমি আমায় কাজ করতে বলবে, আমি কাজ করব। কি করব সে সব ভাবার ঝুঁকি আমি কেন নেব ?

সুজন : ঝুঁকি লোকে নেয় পদের জন্য। পদের জন্যই না অজিত সেন তাঁর কচি ভাইপোটিকে মারতে গিয়েছিল কি জানি তুমি যদি কখনো আমায় মেরে দলপতি হতে চাও ?

মঙ্গল : [সুজনের পায়ে হাত দিয়ে] খুব বলেছ ? পদের জন্য তোমায় আমি মারব ? তার আগে আত্মঘাত করব। আমার জন্য তুমি কিনা করেছ ?

সুজন : ওসব করাকরির কথা কি মনে থাকেরে ভাই। পদের মোহ বড় মোহ। মানুষ উপকার ভুলে যায়। কিন্তু রাণী ভারী বুদ্ধিমতী। অজিত সেন রাত্তিরে শ্রীপালকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু সে তার আগেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে কেউ জানে না। ভাবছি রাণীকে যদি তাঁর ছেলে সহ অজিত সেনের লোক ধরে ফেলে তবে কি অনর্থই না হবে!

মঙ্গল : ভগবান না করুন। কিন্তু দেখ ত ওই দূরে—কে যেন এদিকেই আসছে না! স্ত্রীলোকের মতই মনে হচ্ছে—কোলে আবার ছেলে। রাণী নয়ত?

সুজন : হলে বেশ হয়। আমরা তাঁকে আশ্রয় দেব।
[শ্রীপাল কোলে কমলপ্রভা আসছেন কিন্তু ওদের দেখেও না দেখার মত করে এগিয়ে যাচ্ছেন]

সুজন : [সামনে গিয়ে] শোন বাছা, তুমি কোন ভাল ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। তবে কেন একলা এই বন পথ দিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছ?

কমলপ্রভা : সে অনেক দুঃখের কথা ভাই। সে সব শুনে তোমরা কি করবে?

সুজন : তোমায় সাহায্যও ত করতে পারি।

মঙ্গল : হঁা হঁা সাহায্যও ত করতে পারি।

কমলপ্রভা : আমি এতই দুঃখী যে তোমরা আমার সাহায্য করতে পারবে না।

সুজন : তবে কি তুমি চম্পা দেশের রাণী?

কমলপ্রভা : [চমকে] সে কথা তোমাদের কে বলল?

সুজন : কে আর বলবে? তোমার চাল চলন দেখেই বুঝেছি। আমরা চম্পা হয়েই আসছি কিনা। সেখানেই শুনলাম রাণী তাঁর ছেলেকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। আর মন্ত্রীও। রাণীকে ধরবার জন্য রাজা অজিত সেন চারদিকে লোক পাঠিয়েছেন।

কমলপ্রভা : তাই নাকি। তোমারা কি তাঁর লোক?

সুজন : না না। আমরা তাঁর লোক হতে কেন যাব। কিন্তু তোমার একা একা এভাবে পথ হাঁটা আর উচিত হবে না। তোমাদের ধরতে পারলে তারা তোমাদের মেরে ফেলবে। তাই তোমরা আমাদের দলে সামিল হয়ে যাও। আমাদের মধ্য হতে তোমাকে ধরে কার সাধ্য?

কমলপ্রভা : তোমাদের দল?

সুজন : হঁা হঁা আমাদের দল বই কি? আমরা সাতশ জন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। আমি ওদের দলপতি।

কমলপ্রভা : কিন্তু...

সুজন : কিন্তুর আর সময় নেই। ওই দূরে ঘোড়ার পায়ের ধূলো উড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার সন্ধানেই অজিত সেনের লোক এদিকে আসছে। মঙ্গল সিং, তুমি ওঁকে আমাদের দলের মধ্যে লুকিয়ে দাও।

মঙ্গল : এস বাছা এস শিগ্‌গির এস।

[মঙ্গল এগিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে রাণী কমলপ্রভাও শ্রীপালকে কোলে নিয়ে যাচ্ছেন]

[দুইজন সৈনিকের প্রবেশ। সুজনের নিকটে গিয়ে একজন সৈনিক তাকে জিগ্যেস করছে]

১ম সৈনিক : তুমি কি এদিক দিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছ ?

সুজন : না।

১ম সৈনিক : না কি ? সত্যি করে বল, আমরা রাজার লোক।

সুজন : সত্যি বলছি। এই বন বাদাড়ে কোন মেয়ে মানুষ একা একা যাবে ? কার এত সাহস ?

১ম সৈনিক : সাহসের কথা নয়। যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও।

সুজন : তার জবাব ত দিয়েছি। কাউকে দেখিনি।

১ম সৈনিক : আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। দূরে ওরা কারা ?

সুজন : আমার দলের লোক।

১ম সৈনিক : তোমার দলের লোক ? তোমরা কারা ?

সুজন : আমরা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। আশ্রয়ের অভাবে এভাবে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াই। আজ এখানে ত কাল সেখানে—

১ম সৈনিক : তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি তোমার দলের তল্লাসী নেব ?

সুজন : তা নিন। কিন্তু আমাদের তল্লাসী নিতে গেলে ছোঁয়া ছুঁয়িতে এ রোগ আপনাদেরও হতে পারে।

২য় সৈনিক : ঠিক বলেছ ভাই। কি দরকার ওদের তল্লাসী নেবার ? চল এখান থেকে ফিরে যাই।

১ম সৈনিক : কিন্তু মহারাণীকে ধরতে পারলে যে পুরস্কার পাওয়া যেত—

২য় সৈনিক : রাখো তোমার পুরস্কার। তল্লাসী নিতে গিয়ে কি শেষে কুষ্ঠরোগ কিনে নেব। দরকার নেই, চল।

১ম সৈনিক : কি হে ঠিক বলছ ত ?

সুজন : হ্যাঁ হুজুর।

১ম সৈনিক : [দ্বিতীয় সৈনিককে] তবে ফিরে চল।

[ক্রমশঃ

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরদিন সকালে বসুপালকের সামনে বনমালা আমায় বলল, সহদেব, তুমি কি স্ফুলিঙ্গমুখকে দমন করতে পার না ?

প্রত্যুত্তর দিলাম—ঘোড়াকে দেখেই সেকথা আমি বলতে পারি।

বসুপালক বলল, তুমি ঘোড়া অবশ্যই দেখতে পার।

আমি তখন স্ফুলিঙ্গমুখকে দেখতে গেলাম। তার গায়ের রঙ কচি পদ্মপত্রের মত সুন্দর ছিল। দৈর্ঘ ১০৮ আঙ্গুল, উচ্চতা ৭৫ আঙ্গুল। মুখ ৩২ আঙ্গুল। তার শরীরে সর্বত্র শুভ চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। সে খুব বলশালী ছিল তাই তার পীঠে আরোহণ করা ও চালান খুব সহজ ছিল না।

সেই ঘোড়াটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে আমি বললাম, আমি একে দমন করতে পারি।

বসুপালক বলল, রাজার আদেশ আছে যে একে দমন করতে চায় তাকে সুযোগ দেবার। তাই তুমি একে দমন করতে পার। এখন বল তোমার কি কি প্রয়োজন ?

আমি বললম, বিশেষ কিছু নয়। শুধু অর্হৎ পূজার আয়োজন করুন ও কাঁটা লাগানো একটী শেকল দিন।

বসুপালক আমার আজ্ঞা পালন করলে আমি অর্হৎ পূজা করে সেই ঘোড়ার পীঠে উঠে বসলাম। জিনের চারদিকে সেই কাঁটা লাগানো শেকল বসালাম। যদি সে বসে পড়তে চায় তবে সেই কাঁটার খোঁচা দিয়ে আমি তাকে ছোটাতে পারব। যদি বেশী জোরে ছোটে তবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। রাজা অলিন্দে বসে এসমস্তই দেখলেন। আমি যখন অশ্বে আরোহণ করে নগর ভ্রমণ করে ফিরে এলাম তখন অশ্ববিশেষজ্ঞেরাও আমার সাধুবাদ দিল। আমি অশ্বকে দমন করেছি দেখে রাজাও আনন্দিত হলেন।

এমন সময় আমি ইন্দ্রসৌম্যকে দেখতে পেলাম। সে আমায় দেখে আমার নিকটে ছুটে এল। অজ্ঞানবশতঃ আমাকে দিয়ে যে কাজ করান হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাইল।

তারপর শুভদিনে কোবিলার সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া হল। কোবিলার গায়ের রঙ ছিল শ্রী দেবীর গায়ের মত কাঞ্চন বর্ণ ও মনোহর। মুখ ছিল শরৎকালীন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। পুরোহিত আগুনে শমীপত্র নিক্ষেপ করলে রাজা কোবিলার সুন্দর হাত আমার হাতে নিতে বললেন। তারপর তার হাত ধরে আমি অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করলাম।

বিবাহের পর আমি সেই রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করতে লাগলাম। কুমার অংশুমন্ত আমার দেখাশোনা করত। আমিও তাকে অনেক বিদ্যা শেখালাম। দেখতে দেখতে এক বছর এভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

একদিন মাহুত এক বন্য হাতীকে নিয়ে এল। সেই হাতী দেখে আমার মনে হল হাতিটী ভদ্র জাতীয়। আমার ইচ্ছা হল আমি এই হাতীতে আরোহণ করি।

কুমার অংশুমন্তকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে সে আমায় নিষেধ করল। রাজা কোবিলও আমায় নিষেধ করলেন। কিন্তু আমি হাতীর নিকটে গিয়ে তাকে আঘাত করতেই সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমি অন্যদিকে গিয়ে আবার তাকে আঘাত করলাম। এভাবে আমি তাকে দ্রুত চক্রাকারে ঘোরাতে লাগলাম। সে ক্লান্ত হতে তার সামনে আমার উত্তরীয়খানি ফেলে দিলাম। সে তখন বসে পড়ল। সে বসে পড়তে আমি তার দাঁতে পা দিয়ে তার পীঠে আরোহণ করলাম ও তাকে যথেচ্ছ চালাতে লাগলাম। লোকে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল ও আমার জয়ধ্বনি করতে লাগল। কিন্তু সহসা দেখি সেই হাতী আমায় নিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। কুমার অংশুমন্ত আমার পেছনে ধাওয়া করল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমি অনেক দূরে নীত হলাম। কেউ আমায় অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে আমি সেই হাতীর মাথায় আঘাত করলাম। সেই আঘাতে হাতী নীলকণ্ঠে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে আমাকে সেইখানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি বনের মধ্যে এক পুকুরে গিয়ে পড়লাম। সাঁতার দিয়ে কূলে এলাম কিন্তু এখন কোথায় আছি অবধারিত করতে না পেরে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে শালগুহা নামক একটি স্থানে এলাম। সেখানে এক উদ্যান দেখতে পেলাম। বিশ্রাম নেব ভেবে সেই উদ্যানে প্রবেশ করলাম।

সেই উদ্যানে রাজা অভাগ্যসেনের পুত্রেরা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম তারা কি কোনো শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করে অস্ত্র প্রয়োগ করছে না এমনি। তারা প্রত্যুত্তর দিল—আমরা পুণ্যাংশের কাছে শিক্ষা লাভ করছি। আপনি যদি কিছু জানেন তবে প্রদর্শন করুন।

আমি তখন তারা যেভাবে বলল সেভাবে তীর ছুঁড়লাম। প্রত্যেকবারই আমার তীর লক্ষ্য বিদ্ধ করল। তাই দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হল ও বলল, আপনি কি আমাদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেবেন? আমি প্রত্যুত্তর দিলাম আমি পুণ্যাংশের ক্ষতি করতে চাই না।

কিন্তু তারা বারবার বলতে লাগল, আমাকে তাদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে হবে।

আমি বললাম, আমাকে যদি শিক্ষা দিতে হয় তবে তোমাদের শিক্ষকের অনুমতি-ক্রমেই দেব। তিনি যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ আমি এখানেই আছি।

তারা খুশী হল ও বলল বেশ তাই হবে। এই বলে তারা আমায় বসবার জায়গা

দিল, খাবার দিল ও এক মুহূর্তের জন্য আমায় পরিত্যাগ করে গেল না।

পুণ্যাংশ বোধ হয় এসব জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনিও সেখানে তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অস্ত্রবিদ্যা জানেন?

আমি বললাম, আমি অস্ত্র, অপাস্ত্র ও ব্যস্ত্র এই তিনটী বিদ্যাই জানি। অস্ত্র বিদ্যা পদাতিক ও হস্তীবাহিনী সম্পর্কিত। অপাস্ত্র অশ্ববাহিনী সম্বন্ধীয়। ব্যস্ত্র তরবারি, তীর, বর্শা, কুঠার, ত্রিশূল, চক্র সম্পর্কিত। আমি তীর নিক্ষেপের দৃঢ়, বিদৃঢ় ও উত্তর এই ত্রিবিধ বিদ্যাও জানি

পুণ্যাংশ আমার অস্ত্রক্ষেপণের জ্ঞান দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে রাজা অভাগ্যসেনের কাছেও এসব সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি সপরিষদ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ধনুর্বিদ্যা কে রচনা করেছিলেন?

আমি প্রত্যুত্তরে কুলকরদের হক্কার, মক্কার, ধিক্কার নীতির কথা বললাম। হায়, তুমি এরকম করলে (হক্কার), এরকম কোরো না (মক্কার), ধিক তোমাকে, তুমি এরকম করলে (ধিক্কার)। কুলকরদের সময়ে এভাবে মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত করা যেত। কিন্তু মানুষকে যখন এই নীতিতে সৎপথে চালিত করা গেলনা তখন কুলকর নাভির পুত্র ঋষভকে তারা রাজা বলে নির্বাচিত করল। তাঁর সময়েও অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যখন তাঁর পুত্র ভরত সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন তাঁর ঘরে চোদ্দ রত্ন ও নয় নিধি উৎপন্ন হল। এই নয় নিধির এক নিধি 'মানবে'র সাহায্যে তিনি সৈন্য সমাবেশ, আক্রমণ, আত্মরক্ষা আদি বিদ্যা জনসাধারণকে শিক্ষা দিলেন। তারপর যতই দিন যেতে লাগল, নবীন নবীন রাজা ও মন্ত্রীরা নতন নূতন অস্ত্রের উদ্ভাবন ও ব্যবহার করতে লাগলেন। এভাবে অস্ত্রবিদ্যা সমাজে প্রবর্তিত হল।

এরপর নানা ব্যক্তি আমায় নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমি তাদের যথোচিত প্রত্যুত্তর দিতে লাগলাম। শেষে রাজা তাদের থামিয়ে দিলেন ও আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।—আমি কে, কোথা হতে আসছি ও কোথায় যেতে চাই?

আমি বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, বিদেশে গিয়ে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করব বলে গৃহ পরিত্যাগ করেছি।

আপনি যদি ব্রাহ্মণ তবে অস্ত্রবিদ্যা ও অর্থার্জনের আপনার কি প্রয়োজন?

আমি বললাম, ব্রাহ্মণ যদি অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করে থাকে তবে তা দিয়ে অর্থার্জন তার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

রাজা তখন কি ভাবলেন। তারপর আমায় বললেন, দয়া করে আমার আবাসে চলুন।

আমি সম্মতি দিলে রাজার আদেশে অনতিবিলম্বে সেখানে অশ্ব গজ রথাদি

এসে উপস্থিত হল।

রাজার আদেশে এক ব্যক্তি এক সুসজ্জিত অশ্ব আমার নিকট নিয়ে এল। বলল, এই অশ্ব উত্তম জাতীয়। এই অশ্বে আপনি আরোহণ করুন।

আমি সেই অশ্বে আরোহণ করে তাকে যথেচ্ছ চালিত করলাম।

তখন মাহুত আমার কাছে এক হাতী নিয়ে এল। সেই হাতীর বৃংহিত মেঘ গর্জনের মত। দেখলাম সে মন্দ জাতীয় হাতী। তার পীঠে পদ্মচিত্রিত আস্তরণ বিস্তৃত ছিল। তার গলায় সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা ঘণ্টায় এক মনোহর টুংটাং শব্দ উঠছিল।

রাজা সেই হাতীর পীঠে আমায় উঠতে বললেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আমার অনুসরণ করবেন।

তাঁর আদেশে আমি ঘোড়া হতে নেমে হাতীর পীঠে উঠলাম। মাহুত আমার উঠবার জন্য হাতীকে বসিয়ে দিল।

আমি তখন মাহুতকে বললাম, তুমি পেছনে বস। আমি হাতীটিকে পরিচালিত করছি।

আমাকে অবলীলায় হাতীকে চালিত করতে দেখে রাজা আশ্চর্যান্বিত হলেন। লোকে আমার জয় ধ্বনি দিতে লাগল।

আমাকে দেখবার জন্য রাজপথ জনাকীর্ণ হয়েছিল। তাই আমি ধীরে ধীরে হাতীটিকে চালাতে লাগলাম। লোক আমার বয়স, শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিল।

কেউ কেউ বলছিল এই লোকটি যদি আমাদের রাজ্যে থাকে ত ভালো হয়।

মেয়েরা ছাদ অলিন্দ গবাক্ষ হতে আমার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করছিল।

এভাবে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলাম। রাজভবন, তোরণ সমস্তই কুসুমদামে সুশোভিত করা হয়েছিল।

রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলে আমাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দেওয়া হল। আহারাদির পর আমি যখন বিশ্রাম করছি তখন আমার সেবায় নিয়োজিত এক পরিচারিকা বলল, দেব, মহারাজ অভাগ্যসেনের পদ্মা নামে এক মেয়ে আছে। প্রস্ফুটিত পদ্ম বনের যে সৌন্দর্য তার সৌন্দর্য সেইরূপই মনোহর। মহারাজ স্থির করেছেন তার সঙ্গে আপনার বিবাহ দেবেন।

আমি বললাম, তুমি সেকথা কি করে জানলে?

সে বলল, মহারাজ মহারাণীকে আপনার গুণের কথা বলছিলেন। আপনার যেমন রূপ তেমনি গুণ, তেমনি আপনার শৌর্য। ঈশ্বর যখন আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন তখন তিনি বৃথা কাল হরণ করবেন না। আগামী কালই তিনি পদ্মার সঙ্গে

আপনার বিবাহ দেবেন। মহারাণী কুলশীল না জেনে আপনার সঙ্গে পদ্মার বিবাহ দেওয়া কি উচিত হবে বললে মহারাজ বললেন, মেঘের আড়ালে সূর্যোদয় হলেও প্রস্ফুটিত কমলবনের দ্বারা যেমন সূর্যের পরিচয় পাওয়া যায় সেইরকম আপনার শৌর্যই আপনার পরিচয় দিচ্ছে। দেবতা না হলেও আপনি নিশ্চয়ই বিদ্যাধর, মর্ত্যের কোন রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তিনি যেন মনের সমস্ত আশঙ্কা দূর করে দেন। ভাগ্যবান না হলে এমন সুন্দর আকৃতি কখনো হয় না। এই বলে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। তাই বলছিলাম পদ্মার সঙ্গে আপনার কাল বিবাহ হবে।

সে রাত্রি সেখানে আমার আনন্দেই কাটল। পরদিন সকালে আমায় বিবাহ মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পদ্মাকে আমি প্রথম দেখলাম। নক্ষত্র পরিবৃত রোহিণীর মত সখিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে আমার কাছে উপস্থিত হলে রাজা আমাকে তার পাণি গ্রহণ করতে বললেন। তারপর সপ্তপদী অন্তে আমি অভ্যন্তর গৃহে প্রবেশ করলাম।

পদ্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়'সুখ ভোগ করে আমি সেখানে বাস করতে লাগলাম। এভাবে কিছুকাল গত হলে এক সকালে পরিচারিকা এসে আমায় বলল, দেব বিদেশাগত এক যুবক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তখন আস্থান মণ্ডপে গেলাম ও সেখানে তাকে নিয়ে আসতে বললাম। সে আমার সামনে আসতেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে রাজপুত্র অংশুমন্ত। আমি তাকে পাশে বসিয়ে তার সেখানে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

সে বলল, আপনি যখন ওই হাতীটিকে দমন করে তার পীঠে উঠে বসলেন তখন আমরা সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তারপর দেখলাম আপনি তাকে অঙ্কুশ ছাড়াই চালিত করতে লাগলেন। সে কিছুদূর গিয়েই আকাশে উঠে পড়ল। তাই দেখে আমি আপনার অনুসরণ করলাম। খানিকদূর গিয়েই হাতীটি মোষের রূপ গ্রহণ করল। তারপর দেখলাম সে শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারপর সে পাখীর রূপ পরিগ্রহ করল। তারপর তাকে আর দেখতে পেলাম না। তাই দেখে আমার মনে বিষাদ হল ও আপনাকে না নিয়ে প্রাসাদে ফিরব না স্থির করলাম। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি এদিকে উড়ন্ত হাতীকে যেতে দেখেছে ?

তাদের কেউ কেউ প্রত্যুত্তর দিল, হ্যাঁ তারা দেখেছে। তবে তার ওপর কোন লোক ছিল কিনা তা তারা বলতে পারে না।

আমি সমস্ত দিন সেই দিকে হেঁটে গেলাম। সন্ধ্যার দিকে এক বন পেলাম। রাত্রি বনের উপান্তে কাটিয়ে সকালে সেই বনে প্রবেশ করলাম।

সেই বনে বনফল খেয়ে কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালাম। এইভাবে কয়েকদিন ঘুরবার পর এক বনবাসী আমায় বলল, যে দেবতার মত সুন্দর এক মানুষ শালগুহার দিকে গেছে।

সেই খবর পেয়ে আনন্দিত হয়ে আমি শালগুহার দিকে গেলাম। তারপর এখানে এসে আপনাকে পেয়ে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হয়েছে।

আমিও আমার কাহিনী অংশুমন্তকে শোনালাম।

রাজা অভাগ্যসেনও অংশুমন্তকে চিনতে পারলেন। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে রাজা ও রাণী খুসী হলেন।

পদ্মা বলল, আর্যপুত্র, রাজা কোবিল আদি অনেকেই আপনাকে কন্যা দান করেছেন। কিন্তু আপনার পরিবারের অগ্রজেরা কোথায় বাস করেন যেখানে গিয়ে আমরা তাঁদের সেবা করতে পারি?

আমি তখন তাকে নিজের পরিচয় দিলাম দক্ষিণ বাতাস যেমন বসন্তকে প্রফুল্লিত করে, তেমনি সেই সংবাদ পদ্মাকে উৎফুল্ল করল।

একদিন আমি ও অংশুমন্ত অলিন্দে বসে দূরের বনরাজির শোভা নিরীক্ষণ করছিলাম। সেই সময় রাজা অভাগ্যসেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে কেমন যেন চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। তিনি আসন গ্রহণ করলে তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সে কথাই বলতে এসেছি শোন—

আমার বাবা রাজা সুবাহুর দুই সন্তান, জ্যেষ্ঠ মহাসেন, ছোট আমি। পৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে সংসারে বিরক্ত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে তিনি হংস নদীকে সীমা রেখা করে তাঁর রাজ্য আমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেন। আমরা তখন জয়পুরে বাস করি। আমার অগ্রজ আমায় এক অশ্বের ওপর বাজী রাখতে বললেন। তিনি যদি হারেন তবে তিনি আমাকে কিছুই দেবেন না কিন্তু আমি যদি হারি তবে আমার অংশ তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি সেই বাজীতে হারি। তিনি আমার রাজ্য অধিকার করে নেন ও আমি এখানে এসে বাস করতে আরম্ভ করি। কিন্তু তিনি এখানেও আমায় শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না। বলছেন, আমি জ্যেষ্ঠ তাই আমি সমগ্রদেশের রাজা। তোমার যদি আমার অধীন হয়ে থাকতে হয়ত থাক, নয়ত যেখানে খুসী যেতে পার। এই বলে আমার প্রজাদের কাছ হতেও তিনি কর আদায় করছেন। অগ্রজ বলেই এতদিন এসব আমি সহ্য করেছি। কিন্তু তিনি এখন আমাকে এখানেও থাকতে দিতে চান না। বুঝতে পারছিনা এখন আমার কি করা উচিত।

আমি বললাম, আপনি আপনার অগ্রজকে যে সম্মান দিয়ে এসেছেন তা উচিতই। এরজন্য তাঁর মনে একথা অবশ্যই আসবে যে আপনি যখন বিনীত তখন আপনাকে রক্ষা করাও তাঁর কর্তব্য।

অংশুমন্ত বলল, পিতা যখন রাজ্য দু ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন তখন তা রক্ষার জন্য ওঁকে যদি অস্ত্রধারণ করতেও হয় তবে তা অনুচিত হবে না। এতে কোন দোষ নেই।

এর কিছুদিন পরই মহাসেন অভাগ্যসেনের রাজ্য আক্রমণ করলেন। বাধ্য হয়ে অভাগ্যসেনকেও যুদ্ধযাত্রা করতে হল। আমিও অংশুমন্তকে সারথী করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে অভাগ্যসেন আমায় বললেন, মহাসেন তাঁকে পত্র দিয়েছেন, তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার বশ্যতা স্বীকার কর তবে তোমাকে আমি এখানে বাস করতে দেব তা না হলে তোমাকে এদেশ হতেও বিতাড়িত করব। তাই আমার অগ্রজের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। তুমি দর্শকের মত এই যুদ্ধের গতি বিধি পর্যবেক্ষণ কর।

তাই আমি দর্শকের মত সেই যুদ্ধের গতি বিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতিকে পদাতিকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল, রণ বাদ্যের সঙ্গে মানুষের কোলাহল ও চীৎকারে কর্ণ পটহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম করল—দাঁড়াও এখুনি আমি তোমাকে বধ করছি এইরকম ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কিন্তু অল্পক্ষণেই দেখলাম মহাসেনের সুশিক্ষিত বাহিনীর কাছে অভাগ্যসেনের সৈন্যদল পরাজিত হয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করল। মহাসেনের সৈন্য দল যখন আরও অগ্রসর হল তখন অভাগ্যসেন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করতেই অভাগ্যসেনের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলাতে লাগল।

আমি তখন অংশুমন্তকে বললাম, এরপর কেবল দর্শক হয়ে থাকা আমার আর উচিত হয় না। মহাসেন নগরে প্রবেশ করেই অভাগ্যসেনকে বন্দী করবেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে রথ নিয়ে যাও। আমি মহাসেনের দর্প খর্ব করব।

আমি অভাগ্যসেনের সৈন্যদের আবার একত্রিত করলাম ও তাদের পুরোভাগে অবস্থিত হয়ে মহাসেনের সৈন্যদের বাধা দিলাম। তারা তখন আমায় আক্রমণ করল। কিন্তু তাদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে আমি তাদের অনেককে নিরস্ত্র ও রথহীন করে দিলাম।

আমি তখন অংশুমন্তকে বললাম, ইতর লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি হবে, তুমি রথ মহাসেনের কাছে নিয়ে চল। অংশুমন্তও তাই শত্রুব্যূহ ভেদ করে রথ মহাসেনের নিকট নিয়ে গেল। তিনি আমাদের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দক্ষিণ পশ্চিমের বাতাস যেমন মেঘকে উড়িয়ে নেয় তেমনি আমার বাণ তাঁর বাণকে উড়িয়ে নিতে লাগল। ক্রমে আমি তাঁর ধনুক, ধ্বজ ও রথ ধ্বংস করলাম। তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে তবু মুদ্গর দিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ করুন নয়ত আপনাকে আমি বধ করব। মহাসেন বোধহয় মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়েছিলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে অংশুমন্ত তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বন্দী করে আমার রথে নিয়ে এসে তুলল। মহাসেনকে বন্দী হতে দেখে তাঁর

সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অভাগ্যসেনের সৈন্যরা তখন তাঁর রথ অশ্ব গজ সমস্ত কিছু ধ্বংস করল।

আমি নগরে প্রবেশ করে মহাসেনকে সেনাপতির হাতে তুলে দিলাম। লোকে আমার জয়ধ্বনি দিতে লাগল। বলল, আপনার দয়াতেই আজ আমাদের জীবন রক্ষা পেল।

রাজা অভাগ্যসেন সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন ও আমায় সম্বর্দ্ধিত করলেন।

রাণী আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

পদ্মা আমার সমস্ত গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত লাগে নি ত ?

মহাসেন যখন সেনাপতি ও অংশুমন্ত কর্তৃক অভাগ্যসেনের কাছে নীত হলেন, লজ্জায় তখন তিনি মুখ তুলে উপরের দিকে চাইলেন না। অভাগ্যসেন তখন তাঁকে বললেন, দাদা, সামান্য দাস কর্তৃক তুমি ধৃত হয়েছ বলে দুঃখ করো না। তোমার জামাতা পদ্মার স্বামী তোমায় বন্দী করেছে। মানুষ ত দূর দেবতাও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।

মহাসেন তখন বললেন, তবে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল। আমার জীবন এখন তাঁর হাতে, তার ওপর আমার নিজেরো কোন অধিকার নেই।

অভাগ্যসেন তখন আমার কাছে লোক পাঠালেন। আমি তখন বললাম, তাঁর যদি তাই ইচ্ছে তবে মহাসেনকে এখানে নিয়ে এস।

মহাসেন ও অভাগ্যসেন দু'জনেই আমার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখেই মহাসেন আমার পায়ে পতিত হলেন ও বললেন, দেব, আপনার মহানুভবতা আজ আমায় জয় করে নিয়েছে। আদেশ করুন এখন আমায় কি করতে হবে ?

আমি তাঁকে তুলে পাশে বসালাম। বললাম আপনাদের দুই ভাইয়ের রাজ্যসীমা আপনার পূজনীয় পিতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন। সেই সীমা উলঙ্ঘন করবেন না। এতে আপনার সুনাম বর্দ্ধিত হবে ও আমার আদেশও পালিত হবে।

মহাসেন বললেন, দেব, আমি তাই করব। এখন অনুমতি দিন আমি স্বশিবিরে ফিরে যাই। আমার অনুচরেরা সকলে চিন্তিত আছেন।

আমি বললাম, আপনার ভাইয়ের অনুমতি ক্রমে আপনি যেতে পারেন।

অভাগ্যসেন তখন তাঁর অগ্রজকে সম্বর্দ্ধিত করলেন ও সসন্মানে বিদায় দিলেন।

এর কয়েকদিন পর মহাসেন ফিরে এলেন। আমায় নমস্কার করে বললেন, আমার ইচ্ছে আমার কন্যা অশ্বসেনাকে আপনার হাতে সমর্পণ করি।

আমি বললাম, আমার আপত্তি নেই, যদি এতে পদ্মার আপত্তি না থাকে।

পদ্মার অনুমতি পাওয়া গেল। আমি তাই মহাসেনের কন্যা অশ্বসেনাকে বিবাহ করলাম।

অশ্বসেনার গায়ের রঙ নবোভিন্ন দুর্বাদলের মত মনোহর ছিল। আমি তার ও পদ্মার সাহচর্যে গন্ধর্ব কুমারের মত সেখানে বাস করতে লাগলাম।

একদিন আমি অংশুমন্তকে বললাম,সৌম্য, চল আমরা কোনো আশ্চর্য দেশে যাই। এই একঘেয়েমি ভালো লাগছেনা।

সে বলল, বেশত। চলুন আমরা মলয় দেশে যাই। সেখানকার মানুষ বেশ হাসি খুশী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপূর্ব। যদি মত হয়ত—

তাই একদিন আমরা কাউকে কিছু না বলে প্রাসাদ হতে বেরিয়ে পড়লাম ও ভুলপথে যাত্রা করলাম। তারপর অনেক ঘুরে আমরা ঠিক পথে এলাম।

আমায় ক্লান্ত দেখে অংশুমন্ত বলল, আর্য, আপনাকে আমি বহন করব না আপনি আমাকে বহন করবেন ?

আমি ভাবলাম, অংশুমন্ত, যে নিজেই হাঁটতে পারছে না সে আমায় কি করে বহন করবে ? তাছাড়া ও বয়সে ছোট, তাই আমারই উচিত ওকে বহন করা। তাছাড়া ও আমার আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাই তাকে বললাম, অংশুমন্ত। তুমি আমার পীঠে ওঠ, আমি তোমাকে বহন করব।

অংশুমন্ত হেসে বলল, আর্য, পথে ওভাবে বহন করা হয় না। পথে সেই বহনা করে যে গল্প বলে সঙ্গীর ক্লান্তি দূর করে।

আমি বললাম তাই যদি হয় তবে তুমিই আমায় বহন কর। কারণ তুমি সুন্দর গল্প বলতে পার।

অংশুমন্ত তখন বলল, আর্য, গল্প দু ধরণের। এক সত্য, জীবনে যা ঘটেছে, যার অনুভব রয়েছে বা অন্যের জীবনে যা ঘটেছে বা যা শুনেছি। দুই, কাল্পনিক। তাছাড় মানুষ তিন রকমের—উত্তম, মধ্যম, অধম। সেই অনুসারে গল্পেরও আবার ভেদ হয়।

আমি বললাম, ওত আমি জানি না। তোমার যা ভালো লাগে তাই বল।

সে তখন সত্য ও কাল্পনিক দুই গল্পই শোনাতে লাগল—কোনটা আশ্চর্য রসের ত কোনটা শৃংগারিক, কোনটা কেবলি হাসির।

এভাবে গল্প শুনতে শুনতে আমরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গেলাম।

এক জায়গায় খানিক বিশ্রাম নেবার পর অংশুমন্ত আমায় বলল, আমরা এখন হতে ব্রাহ্মণ বেশে হাঁটব। আপনার নাম হবে আর্য জ্যেষ্ঠ, আমার আর্য কনিষ্ঠ।

আমি বললাম, বেশ তাই হবে।

তখন আমরা আমাদের অলঙ্কার উর্দ্ধবাসে বেঁধে নিলাম ও যথেচ্ছ বিচরণ করতে করতে ভদ্দিলপুরে এসে উপস্থিত হলাম।

অংশুমন্ত তখন আমায় বলল, আর্য, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণে বাসস্থানাদি ঠিক করে আসি। আমাদের একসঙ্গে যাওয়া উচিত নয়।

আমি তাতে সম্মত হলে সে আমায় পুরোনো উদ্যানে অপেক্ষা করতে বলে নগরের দিকে চলে গেল। আমি তখন সেই উদ্যানে অশোক গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। গাছটি দেখতে ভারী সুন্দর ছিল ও ফুলে ফুলে ভরেছিল। তার শোভা দেখতে দেখতে আমি আমার চিত্ত বিনোদন করতে লাগলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও অংশুমন্ত যখন ফিরল না তখন তার জন্য চিন্তান্বিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তখনি একটি রথকে আমার দিকে ছুটে আসতে দেখলাম। সেই রথে অংশুমন্ত বসেছিল ও এক সুন্দর যুবক সেই রথ পরিচালিত করছিল। মনে হল সেই যুবক অংশুমন্তের পূর্ব পরিচিত।

রথটি নিকটে আসতে তারা দুজনে নেমে আমার কাছে এল। সেই যুবকটি বলল, আর্য জ্যেষ্ঠ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমার নাম বীণাদত্ত।

অংশুমন্ত বলল, আমিও আপনাকে প্রণাম করছি। আমার নাম আর্য কনিষ্ঠ।

বীণাদত্ত তখন আমায় বলল, দয়া করে রথে উঠুন। আপনাকে আমার বাড়ী যেতে হবে।

আমি তখন অংশুমন্তের অনুমতি ক্রমে সেই রথ উঠলাম। সেই যুবকটি রথ পরিচালনা করতে লাগল। আমি নগরের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম ও লোকেরা আমাকে দেখতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, দেখ ব্রাহ্মণটির রূপ দেখ। বা কোন দেবতা নগরের সৌন্দর্য দেখবার জন্য মর্ত্য লোকে নেমে এসেছেন।

অন্য কেউ বলল, ঐ মহাদাকৃতি লোকটি কে যে শ্রেষ্ঠীপুত্র বীণাদত্ত স্বয়ং তাঁর রথ পরিচালনা করছে ?

তার প্রত্যুত্তরে কে একজন বলল, ব্রাহ্মণ ত, তাই সকলেরই পূজনীয়।

এভাবে তাদের শুভসূচক কথা শুনতে শুনতে আমরা বীণাদত্তের আবাসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের সসম্মানে সেখানে রথ হতে নামানো হল। তারপর খানিক বিশ্রাম নেবার পর আমাদের স্নানাহার করান হল। আমাদের যে সম্মান দেখান হচ্ছিল তার কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। তাই রাত্রে যখন আমরা একলা রইলাম তখন অংশুমন্তকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। অংশুমন্ত বলল তবে শুনুন—

আমি আপনাকে ছেড়ে যাবার পর বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে বিভিন্ন স্থান হতে আনীত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছিল ও বিভিন্ন বেশধারী বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ উপস্থিত ছিল। আমি এক বণিকের দোকানে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন ও বললেন, আমরা আপনার কি সেবা করতে পারি ?

আমি বললাম, আমি থাকবার ঘর চাই।

তিনি বললেন আপনি এই দোকানের একাংশে থাকতে পারেন।

আমি বললাম—আমার সঙ্গে আমার অগ্রজ রয়েছেন। তাঁর জন্য স্বতন্ত্র স্থান পেলেই ভালো হয়। সে রমক স্থান যদি আপনাদের না থাকে তবে আমি অন্যত্র দেখি।

তিনি বললেন, তবে তাই দেখুন।

আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন এক তুমুল কোলাহল শুনতে পেলাম। ভাবলাম বাজারে হাতী বা মোষ ঢুকে পড়েছে তাই মানুষ এভাবে চীৎকার করছে। কিন্তু সেরকম কিছু দেখলাম না। একটু নিস্তব্ধতার পর আবার সেই কোলাহল শোনা গেল। আমি তখন সেই বণিককে জিজ্ঞেস করলাম, মহাশয়, ও কিসের শব্দ?

তিনি বললেন, ধনী বণিকেরা প্রচুর অর্থ বাজী রেখে পাশা ফেলে জুয়ো খেলছে—ওখান হতে ওই শব্দ আসছে।

আমি তখন সেই বণিককে বললাম, আচ্ছা আমি তবে চলি। অন্যত্র কোন আবাস দেখি। আমার অগ্রজের সেই আবাস যদি পছন্দ হয় তবে আমরা সেখানে থাকব।

তিনি বললেন, উত্তর দিকের বিজয় নামক রাজপথের ওপর আমি বাস করি। ইচ্ছে করলে আপনি সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

আমি একে শুভ লক্ষণ ভেবে যেখানে জুয়ো খেলা হচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দ্বারী আমায় ভিতরে প্রবেশ করতে দিল না। বলল, বণিক পুত্ররা ওখানে জুয়ো খেলছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার ওখানে যাবার কি প্রয়োজন?

আমি বললাম, সৌম্য, আমি পাশাখেলায় পারদর্শী তাই আমার ওখানে যেতে কোন বাধা নেই।

তখন সে আমায় ভেতরে যেতে দিল। আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম দুপক্ষে খেলা হচ্ছে। আমার কাছে দুপক্ষই সমান। আমি তাই এক দিকে বসে পড়লাম।

যাঁর কাছে বসলাম তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি কি পাশা খেলা জানি। আমি বললাম, জানি। তখন এক কোটি কর্ষাপণ বাজী রেখে খেলা আরম্ভ হল। আমার নির্দেশমত দান ফেলে বীণাদত্ত জয়ী হল। বীণাদত্ত তখন আমায় বলল, আপনি আমার কাছে থাকুন ও খেলুন।

অন্যপক্ষের লোকেরা বলল, ওঁর নিজের যদি অর্থ থাকে তবেই উনি খেলতে পারেন। তাছাড়া ব্রাহ্মণের এসব খেলার কি দরকার?

বীণাদত্ত বলল, এই ব্রাহ্মণ আমার অর্থ দিয়ে খেলবেন।

আমি তখন তাঁদের আমার কাপড়ে বাঁধা অলঙ্কার দেখালাম। সেই অলঙ্কার দেখে তাঁরা আমায় খেলতে দিলেন। তাঁরা তখন অনেক অর্থ বাজী রেখে খেলতে আরম্ভ করলেন। আপনার আশীর্বাদে আমি সেই খেলায় জিতলাম।

বীণাদত্ত তখন সেই অর্থ তাঁর লোকদের আমার জন্য সংগ্রহ করতে বললেন।

আমি আর না খেলে তখনি উঠে পড়লাম। বীণাদত্ত আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, আমার অগ্রজের জন্য নিবাস স্থানের অনুসন্ধান করতে। তিনি বললেন। তার কি প্রয়োজন, আপনারা আমার গৃহে অবস্থান করতে পারেন। এই বলে তিনি আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর কাছে আমার অর্জিত অর্থ গচ্ছিত রেখে আপনাকে আনতে গেলাম।

আমি বললাম অংশুমন্ত, বীণাদত্ত আমাদের প্রতি স্নেহশীল। তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের এখানে বেশী দিন থাকা উচিত হয় না।

পরদিন সকালে বীণাদত্তকে আমরা সেকথা বললাম। বীণাদত্ত প্রথমে তার কি প্রয়োজন বলে আমাদের নিরস্ত করতে চাইল কিন্তু শেষে আমাদের আগ্রহাতিশয্যে পৃথক আবাসের ব্যবস্থা করে দিল।

অংশুমন্ত যে বণিকদের হারিয়ে দিয়েছিল তারা ঈর্ষ্যাপন্ন হয়ে আরও দক্ষ পাশাবিৎদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে জুয়ো খেলতে এল। আমি তাদের সহজেই হারিয়ে দিলাম। আমি মানুষ নই, দেবতা, না হয় গন্ধর্ব বা নাগকুমার এই বলতে বলতে তারা চলে গেল।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VII No. 11 Sraman March 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

[ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক জৈন কথা সংগ্রহ]

"বইটী পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল মনটাকে আবার সংসারের নিত্য কাজে ফিরিয়ে আনতে।"

—শ্রীজয়দেব রায়

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

"জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে আলোকবর্ষী আখ্যানমূলক তথ্য বিদ্যমান, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক বাংলা কবিতা···অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবানুগ দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।"

—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮০

পরিবেশক :

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

চৈত্র । ১৩৮৬ সপ্তম বর্ষ । দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮৬ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

অভিমত

আপনার সম্পাদিত 'শ্রমণ' পত্রিকা পেয়ে থাকি। সত্যি খুব খুসী হয়েছি। খুবই পরিচ্ছন্ন পত্রিকা এবং লেখাগুলো উন্নত মানের। মনকে পরিশুদ্ধ করার মতো। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে আপনাদের ভাষা সম্পদের সংগে কিছুটা পরিচয় আছে। পত্রিকাটা আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছে।

—খালিদা এদিব চৌধুরী

সম্পাদিকা, অতলান্তিক, ঢাকা, বাঙলাদেশ

আপনাদের প্রকাশিত 'শ্রমণ' পত্রিকার একখানি কপি পড়লাম। খুবই ভাল লাগল। আমি একজন ইতিহাসের শিক্ষক। 'শ্রমণ' পত্রিকাটি খুবই তথ্যপূর্ণ এবং বহু অজানার সন্ধান দেয়।

—রঘুনাথ ভট্টাচার্য

শালবনী, মেদিনীপুর

'শ্রমণ' পত্রিকাটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। এর প্রতিটি লেখাই যেমন সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ তেমনি জৈন-ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক তত্ত্বকে সহজবোধ্যরূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও অনন্য। প্রতিটি রচনাই যেমন জৈন ধর্মের প্রতি মানুষের মনে একটি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ সৃষ্টি করে, তেমনি জাগিয়ে তোলে মানবতাবোধ, সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে এক প্রীতিমধুর সম্পর্ক। প্রতিটি রচনারই ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল।

—শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিগঞ্জ, মেদিনীপুর

'৮৬ আশ্বিন সংখ্যা খানি পেয়ে খুব ভালো লাগল।...বসুদেব হিণ্ডীতে গোমুখের ক্রিয়াকলাপ যে শার্লক হোমসের ডঃ ওয়াট্‌সনকে লজ্জা দিল। বিপুলা এ দেশের সাহিত্যের কতটুকু জানি?

—অপূর্ব সান্যাল

অধ্যাপক, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া

ভারতীয় দর্শন সমূহে জৈন দর্শনের স্থান

[পূর্বানুবৃত্তি]

হরিসত্য ভট্টাচার্য

কপিল প্রণীত সুবিখ্যাত সাংখ্য দর্শনের মতবাদ এইস্থলে বিচারিত হইতে পারে। বেদান্তের ন্যায় সাংখ্যও আত্মার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্য আত্মার বহুত্ব অস্বীকারে পরাঙ্মুখ। বেদান্তমতের সহিত সাংখ্যের আরও এক অনৈক্য এই যে—সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মার সহিত আপাততঃ সংযুক্তভাবে ক্রিয়াশীলা অচেতনা প্রকৃতি নামে এক বিশ্বরচন পটীয়সী শক্তি আছেন। এইরূপে সাংখ্যদর্শন আত্মার অনাদিত্ব, অনন্তত্ব ও অসীমত্ব স্বীকার করেন এবং তন্মতে সংখ্যায় আত্মা বহু। কপিল মতে পুরুষ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র এক অচেতনা প্রকৃতি আছেন, তিনি পুরুষ হইতে পৃথক হইলেও কিয়ৎ কালের জন্য পুরুষের সহিত মিলিতভাবে প্রতীয়মানা হয়েন। এই বিজাতীয়া প্রকৃতির অধিকার হইতে আত্মাকে পৃথকভাবে অনুভব করার নামই মোক্ষ।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে জৈন দর্শনও আত্মার অনন্তত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার করেন। কপিল দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনও স্বভাবতঃ স্বাধীন আত্মার বন্ধ সংঘটক বিজাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যের ন্যায় জৈনমতও আত্মার নানাত্ব-বাদী। সাংখ্য ও জৈন উভয় দর্শনেরই মতে বিজাতীয় পদার্থের সংশ্লেষ হইতে আত্মার পৃথক করণেই মোক্ষ।

এইস্থানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রায় প্রত্যেক মানবই অতর্কিতভাবে আপনার সম্মুখে আপনা হইতে উচ্চতর, মহত্তর ও পূর্ণতর এক আদর্শ ধরিয়া থাকেন। অজ্ঞ মানবের বিশ্বাস, এমন এক পুরুষ, ঈশ্বর, প্রভু বা পরমাত্মা আছেন, যিনি পরিপূর্ণতার অনন্ত আধার, সুমহান পবিত্র আদর্শ। পূর্ণ জ্ঞান-বীর্য-আনন্দের আধার এক পুরুষ প্রধানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে মনুষ্য প্রকৃতি স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। গভীরতম জৈব-সত্তায় বিশ্বাসের নাম যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মপ্রবণতা মানবের প্রায় প্রকৃতিগত, একথা বলা যাইতে পারে। জ্ঞান, বীর্য, পবিত্রতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমরা ক্ষুদ্র, সসীম ও বদ্ধ ; সুতরাং যে সমস্ত বিষয়ে আমরা অধিকার লাভ করিতে চাই, সেই সমস্ত বিষয় যাঁহাতে উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান এমন শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ প্রভু বা পরমাত্মায় যদি আমরা স্বভাবতঃ বিশ্বাসবান হই, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

টীকাকারগণের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলে, ইহা প্রতীয়মান হয় যে সাংখ্যদর্শনে উক্তরূপ শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ পরমাত্মার স্থান নাই। এই অপাপাবিদ্ধ পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে জীব হৃদয়ের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, ভারতবর্ষীয় যোগদর্শন সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাংখ্যের ন্যায় যোগদর্শন আত্মার সত্তা ও নানাত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু যোগ দর্শন আর একটু অগ্রসর হইয়া জীবাত্মা সমূহের অধীশ্বর অনন্ত আদর্শরূপী এক পরমাত্মাকে দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে যোগ দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যোগ-দর্শনের ন্যায় জৈন মত পরমাত্মরূপী প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তিনি অর্হৎ পদবাচ্য। অর্হৎরূপী ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি পূর্ণতার অনন্ত আদর্শ, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমাত্মা। সেই অনন্ত পবিত্র, পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে বদ্ধজীব একাগ্রমনে ধ্যান ও ধারণা করিবে। পরমাত্মার সন্নিধান জীবের পক্ষে উৎকর্ষ বিধায়ক—পরমাত্মার ভাবনায় জীবের নির্মল জ্ঞান হয়, বদ্ধজীব নূতন প্রাণ, তেজের অধিকারী হয়। জৈন ও পাতঞ্জল উভয় দর্শনই ইত্যাকার মত পরিপোষণ করিয়া থাকেন।

অতঃপর কণাদ প্রণীত সুবিশ্রুত বৈশেষিক দর্শন বিবেচিত হইতেছে। বৈশেষিক দর্শনের স্থান নিম্নলিখিত রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। আত্মা বা পুরুষ হইতে যাহা স্বতন্ত্র, তাহাই সর্বোদরী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত—ইহাই সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অভিমত। জগতে সৎপদার্থ মাত্রেই বিশ্বপ্রধানে বীজরূপে বর্তমান ছিল। এই নিমিত্ত কপিল ও পতঞ্জলি আকাশ, কাল ও পরমাণু সমূহের তত্ত্ব নির্ণয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের মতে এ সমস্তই প্রকৃতির বিকৃতি বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কিন্তু এতাদৃশ ধারণা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। সাধারণ মানবের চক্ষে দিক্‌, কাল ও পরমাণু সমূহ সমস্তই অনাদি, স্বতন্ত্র সৎপদার্থ। জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে দিক ও কাল মনের সংস্কারমাত্র—কিন্তু তিনি সর্বস্থানে এইমত রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মন হইতে দিক্‌ ও কালের স্বতন্ত্র সত্তা আছে—এমন মতও কাণ্ট স্থানে স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। তারপর ডিমোক্রিটাস হইতে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই পরমাণু সমূহের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কপিল ও পতঞ্জলি দিক, কাল ও পরমাণু সকলের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার করিতে পারেন না।, দিক কাল ও পরমাণু—ইহাদের প্রকৃতি ও লক্ষণ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, সকলেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় বিশ্বপ্রধানের বিকার—এ ধারণা সুবোধ্য না হইলেও সাংখ্য ও যোগমতে ইহাই তত্ত্ব।

বৈশেষিক দর্শনেই পরমাণু, দিক্‌ ও কালের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক মতে দিক্‌ কালাদির স্বভাব নির্ণয় হয়ত অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষিত। দিক্‌ কালাদি আমাদের চক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও শূন্যবাদী

বৌদ্ধ উহাদিগকে অবস্তু বলিয়া থাকেন। বেদান্তও আপাততঃ ঐরূপ কথাই বলেন। সাংখ্য ও যোগ মতে দিক্ কালাদি অজ্ঞেয় প্রকৃতির মধ্যে বীজরূপে নিহিত। একমাত্র কণাদ মতেই দিক্, কাল ও পরমাণু সমূহের নিত্যত্ব, সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনেও ঐ সকলের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকৃত হয়।

সুযুক্তিবাদের এই সমস্ত উপাদেয় ফল ভারতীয় দর্শন সমূহের অঙ্গীভূত। ন্যায় দর্শনে যুক্তি প্রয়োগের ব্যাপারক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তর্ক বিদ্যার জটিল নিয়মাবলী এই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। গোতম দর্শনে হেতুজ্ঞানাদি বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হয়। জৈন দর্শন জগতের দার্শনিক তত্ত্ব সমূহের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, এই দর্শনেও তর্ক তত্ত্বাদি বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ন্যায় দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই কারণে ন্যায় দর্শন অধ্যয়নের পর জৈন দর্শন অধ্যয়ন নিরর্থক মনে করিবার কারণ নাই; কারণ ন্যায় দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট; স্যাদ্বাদ ও সপ্তভঙ্গী-নয় নামে জৈন দর্শনে যে সুবিখ্যাত যুক্তিবাদের কথা আছে, তাহা গোতম দর্শনে নাই,—তাহা জৈন দর্শনের নিজস্ব ও গৌরবের বিষয়।

ভারতীয় দর্শন সমূহের মধ্যে জৈন দর্শনের স্থান উপরোক্ত রূপে নির্দিষ্ট হইল। অনেকের মতে জৈনমত বৌদ্ধমতের অন্তর্ভুক্ত। লাসেন ও বেবর জৈনধর্মের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন নাই। এমন কি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর-ব্যক্তি হিউয়েন সাঙ জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের শাখা বলিয়া গিয়াছেন এদিকে বীলার ও জেকাবি জৈন ধর্মকে স্বতন্ত্র ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের মতে ইহা বুদ্ধের পূর্বেও বর্তমান ছিল। আমরা পুরাতত্ত্বীয এই সমস্ত বিবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম তাহাদের তথাকথিত প্রবর্তক-গণের বহুপূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। বৌদ্ধমত বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, জৈন মতও বর্দ্ধমান হইতে প্রবর্তিত হয় নাই। যে প্রতিবাদ হইতে উপনিষদের উৎপত্তি, বেদ শাসন ও কর্ম কাণ্ডের বিরুদ্ধে সেই প্রতিবাদ হইতেই জৈন ও বৌদ্ধমতের উৎপত্তি। হিউয়েন সাঙ যে কারণে জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সে সময়েও এদেশে বৌদ্ধধর্মই প্রবল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অহিংসা ও ত্যাগ এই দুইটি বৌদ্ধধর্মের প্রধান উপদেশ। বৈদিক ক্রিয়া কলাপের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম যে সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল তাহাতে অহিংসা ও ত্যাগ এই দুইটিই তাহার আক্রমণ ও আত্মরক্ষার পক্ষে আয়ুধ স্বরূপ ছিল। অবৈদিক সম্প্রদায় মাত্রেই অহিংসা ও ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ বৈদিক যজ্ঞাদি হিংসালিপ্ত এবং ইহ ও পরকালের নশ্বর সুখলাভের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। জৈন সম্প্রদায়ও বেদ শাসন অমান্য করিতেন,

এই নিমিত্ত অহিংসা ও বিরতি জৈন সমাজেও বিশেষরূপে আদরণীয় ছিল। একারণে বাহ্যতঃ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম একই বোধ হইত। উভয় ধর্মই বেদবিধি অমান্য করিয়া চলিতেন এবং অহিংসা ও সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন। বাহ্যভাব দেখিয়া যদি কোন বিদেশীয় পর্যটক জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে এক মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে তত্ত্বতঃ উভয়ধর্ম এক। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার সমূহ অবিভিন্ন হইলেও তত্ত্বতঃ উহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—সাংসারিক ক্ষণিক সুখাদি বিসর্জন করিয়া কঠোর সংযম বিশুদ্ধিময় জীবন অতিবাহিত করণের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় ইহা ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক দর্শনের অভিমত। কিন্তু তত্ত্বতঃ প্রত্যেক দর্শনই অপর হইতে বিভিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুমণ্ডল পরস্পর হইতে যেরূপ বিভিন্ন সেইরূপ গ্রীস দেশীয় সিনিক সম্প্রদায়ের মূল সূত্র সাইরিনেক সম্প্রদায়ের মূল সূত্র হইতে বিভিন্ন ছিল; কিন্তু তথাপি এমন এক সময় ছিল, যেদিন এই উভয় সম্প্রদায়ই সর্বত্যাগকে আদর্শনীতি বলিয়া গ্রহণ করিত। সেইজন্য আচারগত অপার্থক্য লক্ষ্য করিয়া জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে অপৃথক বিবেচনা করা সমীচীন নহে। বাহ্যতঃ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে অপার্থক্য বিদ্যমান তাহা হইতে একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা সপ্রমাণ হয় না; বরং উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক সম্প্রদায়ের আপাততঃ নিষ্ঠুর ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও মুক্তিবাদ সমুত্থাপিত হয়, তাহা হইতেই এই উভয় ধর্মই উৎপন্ন হইয়াছে।

বাস্তবিক জৈন ও বৌদ্ধমতের তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উভয়ের তত্ত্ব সমূহ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৌদ্ধ মতে শূন্যই তত্ত্ব—জৈন মতে সৎ পদার্থ আছে এবং তাহাদের সংখ্যা অগণ্য বৌদ্ধ মতে আত্মার অস্তিত্ব নাই; পরমাণুর অস্তিত্ব নাই, দিক্ কাল, ধর্ম (গতি) নাই; ঈশ্বর নাই কিন্তু জৈন মতে এ সমস্তেরই সত্তা আছে। বৌদ্ধমতে নির্বাণ লাভ হইলে জীব শূন্যেই বিলীন হয়, কিন্তু জৈন মতে মুক্ত জীবের অস্তিত্ব চির আনন্দময়, উহাই প্রকৃত অস্তিত্ব। এমন কি বৌদ্ধ দর্শনের কর্ম জৈন দর্শনের কর্ম হইতে ভিন্নার্থবাচক।

উল্লিখিত কারণে আমরা জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের শাখা বলিতে পারি না। বৌদ্ধ দর্শন অপেক্ষা সাংখ্য দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের সাদৃশ্য অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাংখ্য ও জৈন উভয় দর্শনই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পরিহার করেন এবং উভয়েই আত্মার নানাত্ববাদী। উভয় দর্শনই জীবাতিরিক্ত অজীব তত্ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া এ উভয় দর্শনের কোনটি অপরটি হইতে প্রসূত বা তাহার সহিত মূলতঃ অভিন্ন, ইহা বলা যায় না। কারণ পর্যবেক্ষণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সাংখ্য ও জৈন দর্শনের মধ্যে বাহ্যতঃ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তত্ত্বতঃ উভয়ে পরস্পর হইতে

বিভিন্ন। প্রথমেই দেখা যায় সাংখ্য দর্শনে অজীবতত্ত্ব বা প্রকৃতি এক ; কিন্তু জৈন অজীবতত্ত্বের সংখ্যা পাঁচ এবং সেই পঞ্চ অজীবের মধ্যে পুদ্গলাখ্য অজীব অসংখ্যে সংখ্য পরমাণুময়। তাই সাংখ্য দ্বিতত্ত্ববাদী জৈন দর্শন বহুতত্ত্ববাদী। এতদ্ব্যতীত উভয় দর্শনের মধ্যে আরও অনেক প্রভেদ আছে। উভয়ের মধ্যে এক প্রধান প্রভেদ এই যে কপিল-দর্শন অনেক পরিমাণে চৈতন্যবাদী জৈন-দর্শন বহুশঃ জড়বাদী।[১] সাংখ্য দর্শনের আলোচকের মনে প্রথমেই প্রশ্ন হয়—প্রকৃতির স্বরূপ কি? ইহা জড় স্বরূপ না চৈতন্য স্বরূপ? স্বভাবতঃ প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে জড় একথা স্বীকার করা যায় না। সাধারণতঃ জড়পদার্থ বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা প্রকৃতির বিকৃতি ক্রিয়ার শেষ পরিণাম। তাহা হইলে প্রকৃতি কি? বিভিন্ন ভাবাপন্ন গুণসমূহের সাম্যাবস্থা, ইহাই প্রকৃতির স্বরূপ—সাংখ্য দর্শন অস্পষ্টরূপে প্রকৃতির এই লক্ষণ দিয়াছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তথাকথিত জড়পদার্থ যে বিভিন্নভাবী গুণ ত্রয়ের সাম্যাবস্থা নহে—তাহা সহজেই অনুমেয়। বহুর মধ্যে যাহা এক, নানাবিধ সংঘর্ষ পরায়ণ গুণ পর্যায়ের মধ্যে যাহা স্বীয় একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিতে পারে তাহা নিশ্চয়ই জড় পদার্থ না হইয়া অধ্যাত্ম-পদার্থ হইবে—ইহা সকলেরই বোধগম্য এবং ভূয়ো দর্শন ও তত্ত্ব বিচার ইহাই সমর্থন করে। তাই আপাততঃ বিভিন্ন ভাবাপন্ন গুণত্রয় বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা যদি জগদ্বিবর্তক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে প্রকৃতিকে অধ্যাত্মপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এবং আপাততঃ বিভিন্ন গুণত্রয়কেও ঐ অধ্যাত্ম পদার্থ প্রকৃতির স্বাত্মবিকাশের প্রকার-ত্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রকৃতিকে স্বভাবতঃ একান্ত বিভিন্ন গুণত্রয়ের অচেতন সংঘর্ষ ক্ষেত্রমাত্র বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি হইতে কোনও পদার্থেরই উদ্ভব সম্ভব হয় না। প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম পদার্থরূপে স্বীকার করিলেই জগৎ বিকাশন কার্য সম্ভবপর হয়।

প্রকৃতি-প্রসূত তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহা জড় পরমাণু, প্রস্তর বা কোনও রূপ জড়পদার্থ নহে, ইহা এক অধ্যাত্ম পদার্থ। অহঙ্কারাখ্য দ্বিতীয় তত্ত্বও অধ্যাত্ম পদার্থ। তাহারপর ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা এবং ক্রমশঃ মহাভূতগণের সমূদ্ভব দেখিতে পাই। যদি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে জড় প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির এই বিশ্ব প্রসূতি কার্য একটা অর্থহীন, অবোধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার অধ্যাত্ম পদার্থ, কপিলের নিজের মতেই *প্রকাশ, কার্য ও কারণ একই স্বভাবের পদার্থ, তাহা হইলে প্রসূত তত্ত্বসমূহের ন্যায় প্রসব কারিণী প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম পদার্থ বলিলে নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না।*

১ এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাংখ্য দর্শন পূর্ণরূপে চৈতন্যবাদী ও জৈন দর্শন জড়বাদী ইহা লেখকের অভিপ্রেত নহে।

যদি প্রকৃতই প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে জড়স্বভাব হইবে তাহা হইলে জড়স্বভাব পঞ্চ তন্মাত্রার সমুদ্ভবের পূর্বে কেন এবং কিরূপে দুইটি অধ্যাত্ম পদার্থের সমুদ্ভব হয় তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম পদার্থ বলিয়া অনুমান করিলে সমস্তই সুগম হয়। প্রকৃতি বীজরূপী চিৎপদার্থ, পূর্ণ রূপে বিকসিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইলে সর্বপ্রথমেই লক্ষ্যজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। ইহাতেই বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের সমুদ্ভব। তাহার পর প্রকৃতি আপনা হইতে স্বাত্মবিকাশের করণ স্বরূপে প্রয়োজন মত ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, মহাভূতাদি তথ কথিত জড়তত্ত্বাদির সৃষ্টি করেন। এইরূপে তত্ত্বগুলিকে প্রকৃতির স্বাত্মবিকাশের সাধন বলিয়া গণনা করিলে সাংখ্য কথিত জগৎ বিবর্তক্রিয়া সম্যকরূপে বোধগম্য হয়।

প্রকৃতি তত্ত্বকে অধ্যাত্ম পদার্থরূপে স্বীকরণ প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য এবং প্রাচীন-কালেও যে প্রকৃতি অধ্যাত্মপদার্থ রূপে কল্পিত হন নাই, তাহা নহে। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর নিম্নোদ্ধৃত ১০/১১ শ্লোকে প্রকৃতিকে অধ্যাত্মস্বভাবা রূপে প্রকাশ করিতে এবং তদ্দ্বারা যেন সাংখ্য দর্শনকে বেদান্ত দর্শনে পরিণত করিতে সুস্পষ্টরূপে চেষ্টা করা হইয়াছে—

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভশ্চ পরং মনঃ।
> মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
> মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥

"ইন্দ্রিয় সকল হইতে অর্থ সমূহ শ্রেষ্ঠ, অর্থসমূহ হইতে মনঃ শ্রেষ্ঠ ; মনঃ হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে মহদাত্মা শ্রেষ্ঠ ; মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ; অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ; পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই : পুরুষই সীমা, শ্রেষ্ঠ গতি।"

জৈন দর্শনের অভিমত সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জৈন দর্শনে অজীব তত্ত্ব যে কেবলমাত্র সংখ্যায় একাধিক তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক অজীব তত্ত্বই অনাত্মস্বভাব। উপরোক্ত বর্ণনাক্রমে সাংখ্যের অজীবতত্ত্ব বা প্রকৃতিকে অধ্যাত্মপদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে কিন্তু জৈন দর্শনের অজীবতত্ত্ব সমূহকে কোনক্রমেই জীবস্বভাবাপন্ন করা যাইতে পারে না। জৈন মতে অজীবতত্ত্ব পঞ্চসংখ্যক—পুদ্গলাখ্য জড় পরমাণুপুঞ্জ, ধর্মাখ্য গতিতত্ত্ব, অধর্মাখ্য স্থৈর্যতত্ত্ব, কাল ও আকাশ, এ সমস্তই জড় পদার্থ অথবা তৎ সহকারী। এমন কি জৈন দর্শন আত্মাকে অস্তিকায় অর্থাৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন। জৈন মতে আত্মার কর্মজনিত 'লেশ্যা' বা বর্ণভেদ আছে। জৈন দর্শনে আত্মা অতিশয় লঘুপদার্থ ও উর্দ্ধগতিশীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ সমস্তই সাংখ্যমতের বিরোধী। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সাংখ্যদর্শন অনেকটা

চৈতন্যবাদের নিকটবর্তী—এবং জৈন দর্শন অনেক সময়ে জড়বাদের অত্যধিক সান্নিহিত হইয়া পড়ে।[২]

জৈন দর্শন সাংখ্য দর্শন হইতে বিভিন্ন, এবং সাংখ্য হইতে জৈন দর্শনের উৎপত্তি সম্ভবপর, ইহা বলা যায় না। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে সাংখ্য ও জৈন দর্শন পরস্পর সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—সাংখ্য মতে আত্মা নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়; কিন্তু জৈনমতে ইহা অনন্ত উন্নতি ও পরিপূর্ণতার অভিমুখীন এবং অনন্ত ক্রিয়াশক্তির আধার। এইরূপে বলা যাইতে পারে—আর্হত-দর্শন সুযুক্তিমূলক দর্শন; বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ হইতে ইহার উৎপত্তি, নাস্তিক চার্বাকবাদ ইহার নিকট অনাদৃত, ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় ইহারও নিজস্ব মূলসূত্র, তত্ত্ব বিচার ও মতামতাদি আছে।

জৈন ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে এরূপ ধারণা হইতে পারে যে উভয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও প্রভেদ নাই। পরমাণু, দিক, কাল, গতি আত্মা প্রভৃতির তত্ত্ব বিচার উভয় দর্শনেই প্রায় একরূপ। কিন্তু উভয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্যও কম স্পষ্ট নহে। বৈশেষিক দর্শন নানা তত্ত্ববাদী হইয়াও ঈশ্বর স্বীকরণের দ্বারা একতত্ত্ববাদের দিকে কতকটা অগ্রসর—কিন্তু জৈন দর্শন নানা তত্ত্ববাদের উপরেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে জৈন দর্শন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বৌদ্ধ, চার্বাক, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সদৃশ হইলেও, ইহা স্বতন্ত্র দর্শন; ইহার উৎপত্তি ও উৎকর্ষের জন্য ইহা অন্য কোনও দর্শনের নিকট ঋণী নহে। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দর্শনের সহিত জৈন দর্শনের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা বহুবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দর্শন হইতে বিসদৃশ।

জিনবাণী, বৈশাখ ১৩০১

২ এস্থলেও লেখকের নিবেদন এই যে সাংখ্য দর্শন পূর্ণরূপে চৈতন্যবাদী ও জৈন দর্শন জড়বাদী, ইহা লেখকের অভিমত নহে।

জিন সহরের জিন মন্দির

জিন সহরের জিন মন্দিরের কথা জানা ছিল। এই মন্দিরটির কথা প্রথম শুনেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা বন্ধুবর পরেশবাবুর কাছে। এই মন্দিরটি দেখে এসে তিনি বলেছিলেন—এক হাজার বছর পুরুনো মন্দির বলে মনে হয়। সাপের খোলস সেখানে ছড়িয়েছিল যত-তত্র। বাঘও থাকে নাকি সেই মন্দিরে।

তারপর কৌশিকী শারদীয় সংখ্যায় পড়ি শ্রীদীপক রঞ্জন দাসের লেখা 'বালিহাটির জৈন (?) মন্দির'। সে আজ তিন বছর আগের কথা। মন্দিরটি দেখবার ইচ্ছা থাকলেও তখন যাওয়া হয়নি। কদিন আগে এই মন্দিরটি সম্বন্ধে ছোট্ট একটি লেখা প্রকাশিত করেছেন মহঃ ইয়াসীন পাঠান যুগান্তরে। সেই লেখাটী পড়ে মন্দির সম্পর্কে নূতন করে কৌতূহল জাগ্রত হল।

মেদিনীপুর খড়গপুর রোড ব্রীজের নিকটে কাঁসাইর দক্ষিণ তীরে বালিহাটি গ্রাম। সেই গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এরই পাশে জিন সহর। নাম হতে মনে হয় কোন সময় এখানে সমৃদ্ধ জৈন বসতি ছিল। জৈন বসতি না থাকলে জিন মন্দিরই বা নির্মিত হবে কেন? এতদিন জানতাম সরাকেরা বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পুরুলিয়া বর্দ্ধমান অঞ্চলেই বাস করতেন। মেদিনীপুরেও যে সরাকেরা বাস করতেন এ তার নূতন দলীল। নিঃসন্দেহে মেদিনীপুরের এটি একটি অন্যতম প্রাচীন মন্দির।

খড়গপুর হতে জীপে করে এসেছি আমরা কয়েকজন। সঙ্গে রয়েছেন পরেশবাবুও। P. W. D-র জীপ পাওয়া গেছে তাঁরই দৌলতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীপের পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হল না। তাই নেমে মাঠের মধ্যে আলের ওপর দিয়ে মাইল খানেক পথ হেঁটে যেতে হল। রোদ থাকলেও ফুরফুরে হাওয়ায় আলের পথে হেঁটে যেতে ভালই লাগছিল।

হাত দিয়ে লতাপাতা সরিয়ে পাশের ভাঙা দেয়ালের ভেতর দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। গর্ভগৃহ অবশ্যই শূন্য—তীর্থংকর মূর্তি অনেক কাল আগেই অপসৃত হয়েছে। না দেখলাম সাপের খোলস। তবু পরেশবাবু বার বার সাবধান করে দিলেন।

মন্দিরটি পূর্বদ্বারী ও সম্পূর্ণ মাকড়া পাথরের। নির্মাণ শৈলীতে উড়িষ্যার প্রভাব, আকৃতি পীড়া দেউলের মত। না হয়েও উপায় নেই। কারণ খোদাই করা মাকড়া

পাথরের খণ্ডগুলি এমনভাবে বসানো হয়েছে যে বলা যাবে না চুন সুরকীর ব্যবহার ছাড়াই সম্পূর্ণ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ভারসাম্য রক্ষার ভিত্তিতে—কারিগরদের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত হতে হয়। মন্দিরের বর্তমান উচ্চতা প্রায় পনেরো ফীট।

এক দীর্ঘ প্রবেশ-নির্গমন পথ গর্ভগৃহকে তার চারপাশের প্রদক্ষিণ পথের সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রদক্ষিণ পথটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের অধিকাংশই আজ অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু উত্তর দিকের দেয়ালে একটি গবাক্ষ এখনো বর্তমান। অনুরূপ গবাক্ষ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেয়ালেও হয়ত ছিল। পূর্বদিকের দেয়ালের মধ্যভাগে প্রবেশের পথ। সে পথ জঙ্গলে আবৃত। প্রবেশ পথের বাম দিকের দেয়ালের ভিতর দিয়ে মন্দিরের ওপরে যাবার সিঁড়ি। সিঁড়ি অনেকখানে ভেঙে ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে পরেশবাবু ওপরে উঠে গেলেন। তাঁর পেছনে পেছনে আমিও। মন্দিরের ওপরিভাগও ভাঙা ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন।

মন্দিরের বহির্ভাগে দেয়ালের উত্তর পূর্বকোণ সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। অনুরূপ প্রকোষ্ঠ দক্ষিণ পূর্ব কোণেও হয়ত ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে পরেশবাবু বাঘের পায়ের ছাপ দেখাতে লাগলেন মাটীতে। ঠিক জানিনা তা বাঘের কিনা তবে দেখলাম সেখানে প্রকাণ্ড উঁইয়ের ঢিপি। উঁইয়ের ঢিপিতেই ত সাপের নিবাস।

মন্দিরের গায়ে ভাটি ফুলের জঙ্গল। রাত্রে সেই ফুলের উগ্রগন্ধে যখন বাতাস ভুর ভুর করে তখন সাপেরা হাওয়া খেতে বার হয় কিনা কে জানে? কিন্তু দেখি আমার মন সেই সুদূর অতীতে ভেসে যায় যেদিন তীর্থংকরের পূজা ও আরতিতে মুখর ছিল এই জায়গাটি। উঠত ধূপের গন্ধ, কাঁশর ঘণ্টার শব্দে গম গম করত আকাশ। আসত ব্রতধারী শ্রাবক, ব্রতধারিণী শ্রাবিকারা। তীর্থংকরের সামনে রাখা বেদীর ওপর চাল ছিটিয়ে দিয়ে আঁকত তারা স্বস্তিক, জ্ঞান-দর্শন-চারিত্র, সিদ্ধ ও সিদ্ধশীলা, আজকের ব্রতচারিণীরা যেমন এঁকে থাকে। কি রকম ছিল তাদের চাল চলন, কি ছিল তাদের বেশ-বাস? আমি মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করি। ভাবি তাদের মধ্যে কি ছিলাম না আমি? সেদিন হয়ত আমার পায়ের ছাপও পড়েছিল এই মন্দিরের পথের ধূলায়। সেই পায়ের ছাপ কি খুঁজে পেতে পারি না আজ?

আমাদের এখানে আসতে দেখে পাশের গ্রাম হতে এসেছিলেন এক গ্রামবাসী। তাঁর ডাক কানে গেল। আসুন এদিকে আপনাদের দেখাই তীর্থংকর মূর্তি। সেই প্রকোষ্ঠের এক বিবর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এই প্রকোষ্ঠের বাইরের দেয়ালে মাকড়া পাথরের গায়ে পদ্ম ফুলের আভাস, সেই পদ্ম ফুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তীর্থংকরের ভাঙাভাঙা অস্পষ্ট কায়োৎসর্গ মূর্তি, তীর্থংকর মূর্তির দুপাশে দুটো উপবিষ্ট মূর্তির ছায়া।

মন্দির দেখা শেষ হল। ফিরে চলেছি আবার। এই মন্দিরের গায়ে দেখি একটা পাকা বাড়ী উঠেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ইঁটের পাঁজা। মাঠে গাইবাছুর চরে বেড়াচ্ছে। দূরে বহু দূরে রোদ কেবলি ঝিলমিল করছে।

সেই গ্রামবাসী পরেশবাবুকে মন্দির সংরক্ষণের কথা বলছিলেন। আমিও সেই কথা বলতে যাচ্ছিলাম। সহসা মনে হল আমার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ল পেছনে ফেলে আসা তীর্থংকরের নিস্পৃহ চোখের দৃষ্টি। কিছু বলা হল না। মন বলে উঠল, কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

আত্ম-নির্বাণ

শ্রীপ্রদীপ জৈন

কালের ঘণ্টা বাজে
টং টং টং—
তবু পড়ে না পলক
সাধনার ধ্যান জগত হতে।

দিবসের পর রাত্রি,
রাত্রির পর দিবস,
ধ্যানে অন্তর্লীন শ্রমণ।

শেষে দিবসও নেই,
রাত্রিও পলায়িত,
কেবল
জ্ঞান আর দর্শনের সমুদ্র।

ডুব দেয় সে সেই সমুদ্রে।

শ্রীপাল

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান : উজ্জয়িনী। রাজপথ। রাজপ্রাসাদের দাসী কৌমুদিক হাতের আংটি দেখতে দেখতে আসছে। অন্য দিক দিয়ে অপর দাসী বকুলাবলী প্রবেশ করছে]

বকুলাবলী : ওলো কৌমুদিকে, তোর এত গর্ব কোথা থেকে হল যে আমি তোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি তা তুই দেখতে পেলি না।

কৌমুদিকা : ওমা, এ যে বকুলাবলী। দেখ ভাই দেবীর নাগমণি বসানো এই আংটিটি স্যাকরার দোকান হতে আনার সময় এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আসছিলাম তাই তোকে দেখতে পাইনি।

বকুলাবলী : দেখি দেখি। তোর দৃষ্টি উচিত স্থানেই পড়েছে। আংটি থেকে যেন কিরণের ছটা বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ফুল হতে ফুলের রেণু ঝরে ঝরে পড়ছে আর তোর হাতে যেন দিব্যি একটা ফুল ফুটে রয়েছে।

কৌমুদিকা : তুই কোথায় যাচ্ছিস ভাই ?

বকুলাবলী : সুরসুন্দরী ও মৈনাসুন্দরীর আচার্যদের সংবাদ দিতে। মহারাজ তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন তাদের শিক্ষা কতদূর হয়েছে জানবার জন্য।

কৌমুদিকা : কেন ? কেন ? তার এত তাড়া কিসের ?

বকুলাবলী : তাড়া হবে না ? মেয়েদের বয়স হয়েছে। তাদের এখন সৎপাত্রে পাত্রস্থ করা চাই। সুরসুন্দরী ত ইতিমধ্যে কুরু-জাঙ্গালের নরপতি অরিদমনকে আত্মদান করে বসে আছে।

কৌমুদিকা : তাই নাকি, তাই নাকি ?

বকুলাবলী : তাই নাকিই আর নয়। অরিদমনও আজ কয়েকদিন হল মহারাজের সম্মতি পাবার আশায় মহারাজের অতিথি হয়ে প্রাসাদে অবস্থান করছেন।

কৌমুদিকা : এতদূর ! কিন্তু উভয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হল কি করে ?

বকুলাবলী : কেন, মহাকাল মন্দিরে। প্রথম দর্শন, তারপর চার চক্ষুর মিলন, তারপরই আত্মদান।

কৌমুদিকা : ঠিকই বলেছিস। মীনকেতন কখন কাকে কিভাবে আক্রমণ করে বোঝা যায় না। সুরসুন্দরী তাহলে পাত্রস্থ হতে চলেছে। কিন্তু মৈনাসুন্দরী ?

বকুলাবলী : মৈনাসুন্দরীর মন বোঝা বড় কঠিন। সব সময় গম্ভীর। ও যেন দূরের মানুষ, সাধারণ নয়।

কৌমুদিকা : হবে না। অর্হৎ মতাবলম্বীর কাছে যে ওর শিক্ষালাভ হয়েছে। ওদের সব কিছুতে বাড়াবাড়ি।

বকুলাবলী : কিন্তু মেয়েটি বড় সুশীলা। সুরসুন্দরীর মত অহঙ্কারী নয়।

কৌমুদিকা : রাজার মেয়ের সুশীলা হওয়া কি ভাল ? তাদের হতে হবে অহংকারী —অহংকারে তাদের মাটিতে পা পড়বে না। দাসদাসীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে তবেই না রাজার মেয়ে।

বকুলাবলী : তা যা বলেছিস।

কৌমুদিকা : আচ্ছা তবে তুই যা। আমিও দেবীর কাছে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উজ্জয়িনীর রাজসভা। রাজা প্রজাপাল সিংহাসনে বসে। সম্মুখে সুরসুন্দরী ও মৈনাসুন্দরী দাঁড়িয়ে। ডান দিকে সুরসুন্দরী ও মৈনা-সুন্দরীর আচার্যদ্বয় বসে। বাঁ দিকে কুরু-জাঙ্গালপতি অরিদমন। তাঁর পাশে মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্য সভাসদেরা]

প্রজাপাল : [কন্যাদের দিকে চেয়ে] তোমাদের শিক্ষার বিষয়ে তোমাদের আচার্যেরা যা বললেন তা শুনে আমি খুব খুসী হয়েছি। এবং তোমরাও জিজ্ঞাসিত হয়ে যে নির্ভুল প্রত্যুত্তর দিলে তাতে আমার হৃদয় গর্বে ভরে উঠেছে। আজ আমার আনন্দের দিন। আজ এই আনন্দের দিনে তোমরা তোমাদের মনোভিমত প্রার্থনা কর। এবং একথাও বোধহয় জান যে আমি নির্ধনকে ধনী করতে পারি, দরিদ্রকে রাজা। আমি যার প্রতি সন্তুষ্ট হই সংসারের সমস্ত বস্তু সে লাভ করতে পারে, যার প্রতি রুষ্ট, সংসারে সে কোথাও ঠাঁই পায় না।

সুরসুন্দরী : আপনি ঠিকই বলেছেন পিতা। কারণ সংসারে জীবনদাতা মাত্র দু'জন। এক মেঘ, দ্বিতীয় রাজা। যদি এ দের অভাব হয় তবে সংসারে সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

প্রথম সভাসদ : কথাটি কি সুন্দর গুছিয়ে বললেন রাজকুমারী। এমন বৈদগ্ধপূর্ণ ভাষণ এর আগে আমরা কখনো শুনি নি।

অন্য সভাসদেরা : হাঁ, হাঁ, আমরা কখনো শুনি নি।

প্রজাপাল : তোর কথায় গর্বে আমার বুক আরো প্রসারিত হয়ে গেল। তোর মত বিদূষী কন্যা লাভ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। মেঘ আর রাজা। মেঘ যেমন অযাচিত ভাবে বারি বর্ষণ করে আমিও তেমনি তোর ওপর অযাচিত ভাবে আমার কৃপা বর্ষণ করব। আমি এই রাজসভায় এই ঘোষণা করছি যে তোকে তোর ইচ্ছেমত কুরু-জাঙ্গালপতি অরিদমনের হাতে সমর্পণ করব।

সকলে : জয় মহারাজ প্রজাপালের জয়! জয় রাজকুমারী সুরসুন্দরীর জয়! জয় কুরু-জাঙ্গালপতি অরিদমনের জয়!

প্রজাপাল : [মৈনাসুন্দরীর দিকে চেয়ে] সবাই যখন জয়ধ্বনি দিচ্ছে তখন মৈনা, তুই কেন চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছিস। যে কথা সুরো বলল বা আমি—যা রাজসভার সবাইর অনুমোদন লাভ করল তা কি তোর অনুমোদন লাভ করল না? তাই যদি হয়, আর তুই নিজেকে যদি এতই চতুরা মনে করিস তবে তা সভার সমক্ষে ব্যক্ত কর।

মৈনাসুন্দরী : যেখানে লোক মোহজালে আচ্ছন্ন, রাজা অবিবেকী সেখানে আমার কিছু বলা উচিত হয় না। তবু ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, আপনার আদেশ পালনের জন্য আমি কিছু বলব। যার হৃদয় জ্ঞানের আলোকে আলোকিত সে কখনো অজ্ঞান অন্ধকারে পড়ে না। পিতা! আপনি হৃদয়ে বিবেকের স্থান দিন ও মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ করুন। সংসারের প্রাণী যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে তা তার কর্মাধীন। তাই মানুষের এমন কি আপনারও এমন ক্ষমতা নাই যে তা পরিবর্তন করেন। আপনি বলছেন—'আমি নির্ধনকে ধনী করতে পারি, দরিদ্রকে রাজা'—কিন্তু তা ঠিক নয়। কারু যদি মন্দ কর্মের উদয় হয় তবে হাজার চেষ্টা করেও আপনি তাকে সুখী করতে পারবেন না। আর কারু ভাগ্যে যদি সুখ থাকে তবে সেই সুখ হতে আপনি তাকে বঞ্চিত করতেও পারবেন না। তাই আপনার কাছে আমার নিবেদন আপনি মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ করুন। তাতেই আপনার কল্যাণ।

প্রজাপাল : [ক্রুদ্ধ হয়ে] বাঃ মৈনা বাঃ! তুইত খুব সুন্দর শিক্ষালাভ করেছিস। তোকে লেখাপড়া শেখাবার এই পরিণাম যে এই ভরা রাজসভায় আমার কথার দোষ দেখিয়ে আমার অপমান করলি। কিন্তু

শুনে রাখ মৈনা, তোর এসব কথায় আমার কিছুই.হবে না, বরং তুই নিজে নিজের পায়ে কুড়োল মারলি। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করলি। আমি তোকে এতদিন পালন পোষণ করলাম, দাস দাসী বস্ত্র অলঙ্কার দিলাম, তোকে সর্বতোভাবে সুখী রাখবার প্রয়াস করলাম, তা আমি করিনি, তুই কি বলতে চাস, এসব তোর ভাগ্য দিয়েছে।

মৈনাসুন্দরী : পিতা, আমার কথার অন্যথা নেবেন না। আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি যা বলেছি তা ঠিক। আমি আবারো বলছি। আমার শুভ কর্ম সংযোগেই আমি আপনার বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। আপনি যে দাসদাসী বস্ত্র অলঙ্কার আমায় দিয়েছেন তা আমার শুভ কর্মোদয়ের কারণেই। আপনি শান্তভাবে যদি ভাবেন—

প্রজাপাল : চুপ কর মৈনা, চুপ কর। আমি আর তোর কথা শুনতে চাই না। প্রারব্ধের ওপর তোর যদি এত বিশ্বাস তবে তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেব প্রারব্ধই যাকে এখানে টেনে আনবে। তারপর তোর প্রারব্ধ বলে তুই কত সুখভোগ করিস তাই দেখব।

[রাজা চলে যাবেন। মৈনাসুন্দরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে তারপর সভাসদ ছাড়া ধীরে সকলে চলে যাবে]

প্রথম সভাসদ : মূর্খতা, মূর্খতা, আকাট মূর্খতা। মূর্খতা ছাড়া একে আর কি বলা যায়।

দ্বিতীয় সভাসদ : তুমিই ঠিকই বলেছ। বলিহারী সেই শিক্ষার যে শিক্ষায় মুহূর্তে রাজার প্রসন্নতাকে ও অপ্রসন্নতায় পরিবর্তিত করে নিল।

তৃতীয় সভাসদ : হবে না? কার কাছে ওর শিক্ষা হয়েছে? ক্ষপণকদের কাছেইত। ওরা ওমনি উদ্দণ্ড। ব্যবহার বুদ্ধি ওদের মোটেই নেই।

প্রথম সভাসদ : তুমি ঠিক বলেছ। ওদের মধ্যে বিবেক ও নম্রতা বলে কিছু নেই। অন্ততঃ গুরুজন বলে ওর চুপ করে থাকা উচিত ছিল।

তৃতীয় সভাসদ : ছি:! ছিঃ! ছিঃ!

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজা প্রাজাপালের কক্ষ। প্রজাপাল উত্তেজিত ভাবে বিচরণ করছেন। এমন সময় দ্বাররক্ষী প্রবেশ করছে]

দ্বাররক্ষী : মহারাজ! রাজদ্বারে কুষ্ঠীদের প্রতিনিধি অপেক্ষা করছে। তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

প্রজাপাল : আমার সঙ্গে ? কি চায় ওরা ? ওদের কোষাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যা। ওঁকে ওদের অর্থ দিয়ে বিদেয় করতে বল।

দ্বাররক্ষী : মহারাজ ! তাদের কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা বলল, তারা অর্থের জন্য আসে নি। অন্য প্রয়োজনে এসেছে।

প্রজাপাল : অন্য প্রয়োজনে ? আচ্ছা তবে তাদের এখানে নিয়ে আয়।

[দ্বাররক্ষী যাচ্ছে। কুষ্ঠরোগীদের দু-তিন জন প্রতিনিধি প্রবেশ করছে]

১ম প্রতিনিধি : মহারাজের জয় হোক ! প্রার্থী হয়ে অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

প্রজাপাল : কি চাও তোমরা ? অর্থ ? তবে কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখ করনি কেন ?

১ম প্রতিনিধি : না মহারাজ, আমরা অর্থের প্রার্থী নই। অর্থ আমরা পেয়েই যাই। কিন্তু যে প্রয়োজনে এসেছি, অভয় দেন ত বলি।

প্রজাপাল : বল নির্ভয়ে বল। প্রজাপাল সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

১ম প্রতিনিধি : সেইজনাই ত আপনার কাছে এসেছি মহারাজ ! আমাদের যিনি রাজা উম্বর রাণা তাঁর জন্য আমরা ছত্র চামর আদি সমস্ত দ্রব্যই সংগ্রহ করেছি। পারি নি শুধু রাণী সংগ্রহ করতে। সেই রাণীর প্রার্থনা নিয়ে আমরা আপনার কছে এসেছি। তাঁর জন্য যদি কোনো সুশীলা, সরল-স্বভাবা, ধর্মপরায়ণা কন্যার ব্যবস্থা করে দেন তবে আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

প্রজাপাল : তোমাদের রাজা ? কোথা হতে সংগ্রহ করলে তাকে ?

১ম প্রতিনিধি : মহারাজ, ভাগ্যই ওঁাকে আমাদের মধ্যে এনে দিয়েছে।

প্রজাপাল : ভাগ্য ?

১ম প্রতিনিধি : হ্যাঁ মহারাজ ! তাইত মহারাজ তাঁর জন্য তাঁর উপযুক্ত রাণীর আমরা অনুসন্ধান করছি।

প্রজাপাল : করবার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব। তোমাদের রাজাকে আমার এখানে উপস্থিত কর। তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

১ম প্রতিনিধি : মহারাজ ?

প্রজাপাল : কি, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

১ম প্রতিনিধি : হ্যাঁ মহারাজ ! এ অসম্ভব।

প্রজাপাল : অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে একমাত্র প্রজাপালই। যাও বৃথা সময় আর নষ্ট কোরো না। তোমাদের রাজাকে এখানে নিয়ে এস।

[কুষ্ঠীদের প্রতিনিধিরা চলে যাচ্ছে। রাজা দ্বারীকে আহ্বান করছেন। সে এলে]

প্রজাপাল : মৈনাসুন্দরীকে এখানে নিয়ে আয়। হংসপদিকাকে বিবাহের আয়োজন করতে বল।

[দ্বারী চলে যাচ্ছে। রাজা ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে]

প্রজাপাল : ভাগ্য ?...না না, হৃদয়কে দুর্বল হতে দেব না। ভাগ্যই তার পতিকে এখানে টেনে এনেছে। তার সঙ্গেই আমি তার বিবাহ দেব। এতে আমার কীর্তি আরো বর্দ্ধিত হবে আর মৈনাও তার ভাগ্য পরীক্ষায় অবসর পাবে।

[মৈনাসুন্দরী এসে পিতাকে প্রণাম করছে]

প্রজাপাল : মৈনা, তোর ভাগ্য আজ যাকে এখানে নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে আমি তোর বিবাহ দেব স্থির করেছি।

মৈনাসুন্দরী : আমার ভাগ্যই যদি তাঁকে এখানে নিয়ে এসে থাকে, তবে তিনিই আমার পতি।

প্রজাপাল : কিন্তু কে সেই পতি তুই জানিস ?

মৈনাসুন্দরী : জানবার প্রয়োজন নেই পিতা। তিনি যেই হোন তাঁর সঙ্গে যখন আপনি আমার বিবাহ দিচ্ছেন তখন প্রশান্ত মনে আমি তাঁকে গ্রহণ করব।

প্রজাপাল : প্রশান্ত মনে—তবে শোন। সে কুষ্ঠীদের রাজা উম্বর রাণা। নিজেও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ..কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? গা শিউরে উঠছে ? মনে ঘৃণার সরীসৃপ কিলবিল করছে ? রাজা প্রজাপাল ভাগ্যকে উল্টে দিতে পারে। তুই যদি চাস্ ত এখনো বল—এ সম্বন্ধ আমি ভেঙে দিতে পারি।

মৈনাসুন্দরী : না, তা পারেন না পিতা। ভাগ্যই যদি এই বিবাহ লিখে থাকে তবে তার অন্যথা করতে আপনি পারেন না।

প্রজাপাল : এখনো এখনো তুই তোর মিথ্যা মতবাদ ছাড়বি না। [দূরে কোলাহল] ওই শোন কুষ্ঠীদের আনন্দ কোলাহল। ওরা ওদের রাজাকে নিয়ে এখানে আসছে। আমি তোকে ওদের রাজার হাতে সম্প্রদান করব এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

মৈনাসুন্দরী : সে প্রতিশ্রুতি পালন করুন পিতা।

প্রজাপাল : তবে কি তুই চাস কুষ্ঠীর সঙ্গে আমি তোর বিবাহ দি—

[এক দিক দিয়ে উম্বর রাণাকে নিয়ে কুষ্ঠীরা প্রবেশ করছে। অন্যদিক দিয়ে মৈনাসুন্দরীর মা রূপসুন্দরী, মন্ত্রী আদি প্রবেশ করছেন]

রূপসুন্দরী : মহারাজ! এ কি শুনলাম আমি। এক কুষ্ঠীর সঙ্গে আপনি আমার মেয়ের বিবাহ দিচ্ছেন। মায়ের অমতে এ বিবাহ হতে পারে না।

প্রজাপাল : অবশ্যই পারে, কারণ সন্তানের বিবাহ দেবার অধিকার মায়ের নয়, পিতার।

মন্ত্রী : মহারাজ, কিন্তু এ অধর্ম।

প্রজাপাল : কন্যা প্রকাশ্য রাজসভায় পিতার অপমান করে এ কোন ধর্ম ?

মন্ত্রী : মহারাজ! কিন্তু সেত আপনারই কন্যা। সন্তানের সুখদুঃখের কথা ভেবে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।

প্রজাপাল : জানি। কিন্তু এই পতি কন্যারও অভিমত। মন্ত্রীবর, ওকেই না হয় জিগ্যেস করুন।

(মন্ত্রী মৈনাসুন্দরীর দিকে চাইছেন। সকলের দৃষ্টি মৈনাসুন্দরীর ওপর নিবদ্ধ হচ্ছে। হংস পাদিকা আসছে]

মৈনাসুন্দরী : পিতা যখন ওঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চাচ্ছেন তখন তা আমি সহর্ষে স্বীকার করছি। এতে আমার একটুও মনোকষ্ট নেই বা সংকোচ। আমি পিতার আজ্ঞা পালন করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

উম্বর রাণা : না না মহারাজ। এ অসম বিবাহ কিছুতেই উচিত নয়। এ ঠিক যেন কাকের গলায় রত্নহার পরানো। এই কন্যা আপনি আমায় দান করবেন না মহারাজ! একে বিবাহ করে এর জীবন নষ্ট করলে আমার ভয়ঙ্কর পাপ হবে।

মন্ত্রী : তুমি ঠিকই বলছ উম্বর রাণা। এ তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক।

উম্বর রাণা : মহারাজ!

প্রজাপাল : কিন্তু এতে আমার কি দোষ উম্বর রাণা। আমার মেয়ের ভাগ্যের ওপর অগাধ বিশ্বাস। আমি তাকে সুখ দেই নি। সুখ দিয়েছে তার ভাগ্য। তাই যদি হয় তবে তোমার সঙ্গেও ও সুখেই থাকবে। আমি রাজা। আমি ওর এই দুরাগ্রহের জন্য ওকে দণ্ড দিচ্ছি। আমি দেখতে চাই ওর ভাগ্য ওকে কি করে সুখী করে। হংসপদিকা, আমাদের বিবাহ মণ্ডপের দিকে নিয়ে চল।

হংসপদিকা : এই দিকে মহারাজ, এই দিকে—

[হংসপদিকাকে অনুসরণ করে রাজা মৈনাসুন্দরী, উম্বর রাণা ও কুষ্ঠীদের দল চলে যাচ্ছে]

১ম পারিষদ : অন্যায়, অন্যায়, ঘোর অন্যায়—

২য় পারিষদ : রাজার হৃদয় পাষাণের চেয়ে কঠিন।

৩য় পারিষদ : আর উম্বর রাণা ? কেমন উদার চেতা—ওর শরীরই ব্যাধিতে দূষিত কিন্তু মন চন্দ্র বিম্বের মত নির্মল।

১ম পারিষদ : রাজার এই বিবাহ দেওয়া উচিত হয়নি—

২য় পারিষদ : তা ঠিক—কিন্তু আমরাই বা কি করতে পারি।

চতুর্থ দৃশ্য

[কুষ্ঠীদের শিবিরের একাংশ। মৈনাসুন্দরী ও উম্বর রাণা]

উম্বর রাণা : মৈনা !

মৈনাসুন্দরী : স্বামী !

উম্বর রাণা : আজ এই বাসর শয্যার রাতে তোমায় কি যে বলব, কিছুই বুঝতে পারছিনা। যতই তোমাকে দেখছি ততই তোমার ক্ষমাশীলতা, মনের সৌন্দর্যে আমি অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। তুমি রমণীদের মধ্যে রত্ন। কিন্তু এই রত্ন ধারণ করবার আমি উপযুক্ত নই। তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করে খুবই অনুচিত কাজ করেছেন। কিন্তু আমি তোমার বাবার মত অবিবেকী নই। যদিও আমাদের বিবাহ হয়ে গেছে—তবুও তোমাকে বলি। আর একবার ভেবে দেখ মৈনা। এখনো যদি তুমি চাও আমার হতে পৃথক জীবন যাপন করতে পার। আমি তোমাকে সহর্ষ অনুমতি দিচ্ছি।

মৈনাসুন্দরী : ওমন কথা বোলো না স্বামী, ওকথা শুনলেও আমার পাপ হয়।

উম্বর রাণা : কিন্তু আমি যথার্থই বলছি। কোথায় তোমার কুসুম-কোমল সুকুমার দেহ আর কোথায় আমার রোগ জর্জর শরীর। এ কথা ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি—তুমি আমায় স্পর্শ করছ ও এই রোগ তোমার শরীরে সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে। তাই একটুও লজ্জা বা সংকোচ না করে মৈনা—

মৈনাসুন্দরী : তুমি অনুচিত কথা বলে আমায় কষ্ট দিওনা স্বামী। তোমা হতে আমাকে কিছুই দূরে রাখতে পারবে না।

উম্বর রাণা : না না মৈনা, আমার হৃদয় উদ্ঘাটিত করে যদি দেখাতে পারতাম তবে

দেখতে সামান্য সময়ের পরিচয় হলেও কি প্রচণ্ড ভাবে আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। আর ভালবেসেছি বলেই বলছি—তোমার ওই শরীর কুরূপ রোগ জর্জর হোক এ আমি চাই না। একি মৈনা, তোমার চোখে জল ?

মৈনাসুন্দরী : ও কিছু নয়। কিন্তু পিতা যখন তোমার হাতেই আমাকে সমর্পণ করেছেন তখন তুমিই আমার একমাত্র গতি। মনে করো যে মন্ত্রোচ্চারণ করে তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ। স্বামী! পতি পত্নীর সম্পর্ক ত দূরে থাকবার নয়। তোমার মন হতে এসব চিন্তা দূর করে দাও। আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকব। তোমার সেবা করব। সুখ-দুঃখ রোগ শোক এসব ভাগ্যের নির্বন্ধেই হয়। তার কেউ অন্যথা করতে পারে না। তার জন্য এখন হতেই কেন চিন্তা কর। স্বামী, তোমার চরণ সেবা হতে আমায় বঞ্চিত করো না।

উম্বর রাণা : মৈনা, সত্যিই তুমি সুন্দর। তুমি অপরূপ! অনেক ভাগ্যোদয়ে আমি তোমাকে লাভ করেছি। আমার যৌবন স্বপ্নে যে মুখ আমি অনেকবার দেখেছি আজ মনে হচ্ছে সে মুখ তোমার। তুমি ওই প্রভাতের শুকতারা। কিন্তু—

মৈনাসুন্দরী : স্বামী, সেজন্য তুমি কেন ভাবছ। ভাগ্য অপ্রসন্ন হলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যায়, আবার সুপ্রসন্ন হলে অসুস্থও সুস্থ। আমার ভাগ্যে যদি সুখ থাকে তবে তুমিও সুস্থ হয়ে উঠবে। স্বামী, কাল সকালে তোমায় জিনালয়ে নিয়ে যাব। সেখানে দেব দর্শন করবে ও পাশের উপাশ্রয়ে আমার গুরুদেব থাকেন, তাঁরও দর্শন করবে। কেমন যাবেত ?

উম্বর রাণা : নিশ্চয় যাব মৈনা, নিশ্চয় যাব। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

পঞ্চম দৃশ্য

[উপাশ্রয়। গুরুদেব ধর্মঘোষ সূরী উপদেশ দিচ্ছেন। কিছু শ্রাবক শ্রাবিকা বসে রয়েছে]

ধর্মঘোষ সূরী : অনেক জন্মের পরে জীব মনুষ্য দেহ লাভ করে। তাই হেলায় একে নষ্ট করো না। এর সদুপযোগ করো। যারা এই অপূর্ব অবসর হেলায় নষ্ট করে তারা পশ্চাত্তাপ করে। তাই নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করে ধর্ম কার্যে প্রবৃত্ত হও।

[মৈনা সুন্দরী ও উম্বর রাণা প্রবেশ করছে]

ধর্মঘোষসূরী : আরে মৈনা, তুমি ? অন্য দিন ত তুমি দাসদাসী পরিবৃত হয়ে উপাশ্রয়ে আসতে, আজ একা ?

মৈনাসুন্দরী : মহারাজ আমি বিবাহিত হয়ে গেছি।

ধর্মঘোষ সূরী : তুমি বিবাহিত হয়ে গেলে আর আমরা জানতেই পারলাম না।

১ম শ্রাবক : মহারাজ, সে আপনি কি করে জানবেন ? রাজকন্যার বিয়েতে তো কোন আনন্দ উৎসবই হয়নি, না কেউ নিমন্ত্রিত। রাজা গর্ব করে বলেছিলেন, আমি নির্ধনকে ধনী করতে পারি দরিদ্রকে রাজা। রাজকন্যা তাতে সহমত হননি বলেছিলেন, তা তিনি পারেন না, সকলে নিজ নিজ কর্মানুসারে সুখী বা দুঃখী হয়।

ধর্মঘোষ সূরী : রাজকন্যা ত ঠিকই বলেছিলেন।

১ম শ্রাবক : হাঁ গুরুদেব ! কিন্তু রাজা তাতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, তোদের ভালো খাইয়ে পরিয়ে এত বড় করলাম সে কি আমি করিনি ? রাজকন্যা বললেন, আপনি আমাদের ভালো খাইয়ে পরিয়ে অবশ্য বড় করেছেন কিন্তু আপনার ঘরে যে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সে আমাদের ভাগ্যেই। এতে রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে যান। ও দেখি ভাগ্য তোকে কি দেয় বলে এক অজ্ঞাত কুলশীল কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে ওর বিবাহ দিয়ে দেন—

২য় শ্রাবক : অন্যায়, অন্যায়, ঘোর অন্যায়।

১ম শ্রাবক : অন্যায় ! যারা শুনেছে তারা সকলেই ছি ছি করেছে। রাজার হলেও তিনি পিতা। নিজের সন্তানের প্রতি কি করে তিনি এত কঠোর হলেন ?

ধর্মঘোষ সূরী : কর্মের গতি অতি গহন। [মৈনার দিকে চেয়ে] এই তোর পতি ?

মৈনাসুন্দরী : হাঁ গুরুদেব ! কিন্তু এর জন্য আমার দুঃখ নেই। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পতিই যদি আমার ভাগ্যের লিখন হয় তবে তার অন্যথা হবে না। সুন্দর যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিলেই বা কি ? সেও ত বিবাহের পর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার দুঃখ সেজন্য নয়, আমার দুঃখ এর জন্য লোকে অর্হৎ ধর্মের নিন্দা করছে। বলছে অর্হৎ ধর্মাবলম্বীর সান্নিধ্য আমাকে এত অবিনীত করেছে।

ধর্মঘোষ সূরী : কন্যা, তার জন্য দুঃখ করার কি আছে ? সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ রয়েছে, তুই কার কার মুখ বন্ধ করবি। তাই তুই তাদের উপেক্ষা কর। কিন্তু আমি দেখছি তোর ভাগ্যবলেই তুই এই পুরুষরত্নকে লাভ করেছিস। ভবিষ্যতে এ মহা প্রভাবশালী রাজা

হবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে লোকে ততদিন এর খ্যাতি কীর্তিত হবে।

মৈনাসুন্দরী : গুরুদেব! আপনার কথার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আপনি যা বলছেন তা অবশ্যই একদিন সত্য হবে। কিন্তু আপনি এমন কিছু উপায় আমায় বলুন যাতে এ রোগমুক্ত হয়।

ধর্মঘোষ সূরী : কন্যা, ঐহিক বিষয়ের উন্নতির জন্য কিছু বলা যদিও মুনির আচার নয়, তবুও তোকে আমি বলব। কারণ এর পুণ্য প্রভাবই তা আমাকে বলতে উদ্বুদ্ধ করছে। একে দিয়ে জিন শাসনের অভ্যুদয় হবে। আমি তাই তোকে 'সিদ্ধচক্র' রূপ এক যন্ত্র দেব। এই যন্ত্রের উপাসনা করে এর প্রক্ষালিত জল তুই তোর পতির ওপর ছড়িয়ে দিবি। তা হলেই সে রোগমুক্ত হবে।

মৈনাসুন্দরী : গুরুদেব! আপনার এই করুণা আমাকে আরো প্রার্থনা করতে সাহসী করে দিয়েছে। এ'র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যে সাতশ' জন সঙ্গী রয়েছে তারাও যেন এই জলের প্রভাবে রোগমুক্ত হয়।

ধর্মঘোষ সূরী : হাঁ হাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই।

[ক্রমশঃ

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

একদিন আমি যখন প্রাসাদ অলিন্দে বসেছিলাম তখন রাজপথ দিয়ে জৈন সাধ্বীদের যেতে দেখলাম। তাঁদের দেখে অংশুমন্ত নীচে নেমে গেল। সে সন্ধ্যায় ফিরে এসে বলল, এই সাধ্বীদের যিনি প্রমুখা তিনি তার পিসী হন। নাম বসুমতী। তিনি প্রথমে তাকে চিনতে পরেন নি পরে যখন চিনতে পারলেন তখন সহজেই আসতে দিলেন না। তাই ফিরতে দেরী হল।

এরপর সে আর একদিন তার পিসীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। গিয়ে বারো দিন ফিরল না। তার জন্য একটু চিন্তিত হয়েছিলাম কিন্তু এও জানতাম সে যেমন চতুর তাতে কোনো বিপদে সে পড়বে না। তের দিনের দিন দেখি সে নূতন বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত ও পরিজন পরিবৃত হয়ে ফিরে এল। এসেই সে আমায় বলল, আর্য জ্যেষ্ঠ, এখান হতে যাবার পর আর্যিকাদের ওখানে বণিক তারকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। কথাবার্তার সময় তিনি আমায় চিনতে পারেন ও জোর করে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সাধ্বীকে তিনি বলেন, আর্যিকা, আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল তখনি ওকে আমি রাজা পৌণ্ড্রের সামনে অংশুমন্তকে দান করি। এখন দু'জনেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে ও সংযোগবশতঃ অংশুমন্ত যখন এখানে এসে গেছে তখন ওকে নিয়ে গিয়ে এখনি আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব। আশা করি আপনি তা অনুমোদন করবেন। এরপর তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে রাজা পৌণ্ড্রের সামনে তাঁর মেয়ে সুতারার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দেন। রাজা পৌণ্ড্রও আমাকে প্রচুর যৌতুক দেন। এই কয় দিন উৎসবে উৎসবে কেটে যায়। আজ ছাড়া পেয়েছি তাই চলে এসেছি।

আমি তার এই সৌভাগ্যের জন্য তাকে সাধুবাদ দিলাম ও সুতারাকে উপযুক্ত যৌতুক পাঠালাম।

এই বিবাহোপলক্ষে আট দিন ধরে জিনালয়ে অষ্টাহ্নিকা উৎসব পালিত হল। রাত্রি জাগরণের জন্য বীণাদত্তের সঙ্গে আমিও জিনালয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে রাজা পৌণ্ড্রকে প্রথম দেখলাম। তাঁর শরীর দেবতার মত কমনীয় ও রূপবান ছিল।

বীণাদত্তের ভজন গানের পর রাজা পৌণ্ড্রের যখন গান করবার পালা এল তখন অংশুমন্ত আমায় বলল, আর্যজ্যেষ্ঠ, হয় আপনি রাজার গানের সময় বীণবাদন করবেন, নয়ত গান গাইবেন। জিনভক্তির জন্য আমি গান গাইতে সম্মত হলাম। রাজার

গানের পর আমি যখন গান গাইতে লাগলাম তখন দেখলাম রাজার মুখ বিকসিত হয়ে আরো প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সেই মুখ আমার রমণীর মুখ বলে মনে হল। আমি স্মর বাণে বিদ্ধ হয়ে গেলাম।

সেইদিন হতে আমার আহারে রুচি চলে গেল। তাই দেখে অংশুমন্ত আমায় বলল, আপনার কি হয়েছে বলুন ত?

আমি বললাম, যেদিন জিনালয়ে রাজার সঙ্গে গান করি সেইদিন হতে সে আমার সমস্ত মন-প্রাণ হরণ করে নিয়েছে। আমি তার সঙ্গে মিলিত হবার কথা ভাবছি। তাই আমার আহারে রুচি নেই।

সেকথা শুনে অংশুমন্ত বলল, আর্যজ্যেষ্ঠ, আপনি এরূপ কথা কেন বলছেন। রাজা পুরুষ মানুষ। তাই আপনার এ কথা বলা উচিত হয় না। অথবা আপনি ভূতগ্রস্ত হয়েছেন।

এই বলে সে চলে গেল ও খানিকবাদে ভূত ঝাড়া ওঝা নিয়ে উপস্থিত হল।

তারা আমায় একান্ত স্থানে নিয়ে যেতে বলল। সেখানে তারা মন্ত্রাদি প্রয়োগ করবে।

আমি সেকথা শুনে অংশুমন্তকে বকলাম। সে ভয় পেয়ে গেল ও রাজাকে গিয়ে সমস্ত কথা জানাল।

রাজা আমায় দেখতে এলেন ও তাঁর কমল কলিকা তুল্য হাত দিয়ে আমার ললাট বুক ও মাথা পরীক্ষা করে বললেন, না দাহ নেই। তাই যথারীতি আমি আহার গ্রহণ করতে পারি। রাজার আদেশে আমি আহার গ্রহণ করলাম। যতক্ষণ আহার গ্রহণ করলাম ততক্ষণ রাজা সেখানে বসে রইলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

অংশুমন্ত তখন আমায় জিগ্যেস করল, আমি এখন কেমন আছি?

আমি বললাম, আমার হৃদয় যে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে নিজে হতে এল, এখন তাকে বিদেয় করে তুমি জিগ্যেস করছ আমি কেমন আছি।

আপনি প্রলাপ বকলে আমি কি করতে পারি?

আমি তখন রেগে অংশুমন্তকে গালাগাল দিলাম। সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সে আর ফিরে এল না।

এভাবে কিছুদিন ব্যতীত হয়ে গেল। এর মধ্যে একদিন শ্রেষ্ঠী তারক এসে বলল, রাজার সম্বন্ধে আপনার অনুমান সত্য। তিনি পুরুষ নন নারী। তিনিও আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চান। তাই বরবেশ এখন তাঁকে বিবাহ করতে চলুন।

আমি সম্মত হলাম ও শ্রেষ্ঠী তারকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গেলাম। সেখানে (রাজা) রাজকন্যা পৌণ্ডার সঙ্গে আমার বিবাহ হল। বিবাহের পর তার সঙ্গে আমার আনন্দে দিন কাটতে লাগল।

আমার তখন অংশুমন্তের কথা মনে হল। আমি তার ওপর রাগ করেছিলাম বলে সে চলে গিয়েছিল তারপর আসেনি। কিন্তু সে গেল কোথায়? কোথায় আছে, কেমন আছে সে সব কথা ভাবছিলাম। আমার প্রতি তার স্নেহও অপরিসীম। সে তাই তার রাজ্য ও আত্মীয় স্বজন ছেড়ে আমার সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু এখন তাকে খুঁজব ত কোথায় খুঁজব? সেই সময় আমার চোখ পথের মধ্যে অস্ত্রধারী পরিবৃত একটি লোকের ওপর গিয়ে পড়ল! আমি মুহূর্তেই তাকে চিনতে পারলাম ও আমার কাছে ডেকে পাঠালাম।

সে আমার সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, অংশুমন্ত, তুমি এই বলে গর্ব কর কেন যে তোমার মত বন্ধু না থাকলে তার অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না।

সে হেসে প্রত্যুত্তর দিল, আপনার অভিষ্ট যে সিদ্ধ হল সে কার জন্য জানেন? আমার জন্য।

তা কি করে?

তবে শুনুন বলে সে বলতে আরম্ভ করল—আপনি সেদিন আমায় গালাগাল দিলে আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেলাম। আমায় কাঁদতে দেখে সুতারা আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করল। আমি কোনো প্রত্যুত্তর দিলাম না। তখন সে গিয়ে তার পিতাকে ডেকে আনল। অন্য লোক সরিয়ে দিয়ে আমি তাঁকে রাজা পৌণ্ড্র পুরুষ না নারী জিজ্ঞাসা করলাম ও তাঁর বিরহে আপনার মানসিক স্থিতির কথা বললাম। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, এ সম্পর্কে আমি তদন্ত করছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তবে রাজা পৌণ্ড্র যখন জন-সমক্ষে আসেন তখন তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর ও গাত্রবর্ণ গোপন করেন বলে আমার মনে হয়েছে। তিনি চলে যাবার খানিক পরেই সেখানে আর্যিকা বসুমতী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমায় বললেন, আর্যজ্যেষ্ঠের ব্যাধির কারণ ধরা পড়েছে। শোনো—

আমি রাজা সুসেনের প্রধানা মহিষী ছিলাম। ভগবান নমি কর্তৃক প্রবোধিত হয়ে পুত্র পুণ্ড্রকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা একই সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি। প্রব্রজ্যা নেবার পর আমার স্বামী এই স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেলেন কিন্তু পুত্র স্নেহের জন্য আমি এই স্থান পরিত্যাগ করতে পারলাম না। পুণ্ড্রের কোনো সন্তান ছিল না।

একবার আর্যিকাদের সঙ্গে আমি সম্মেত শিখরে যাই। সেখানে একদিন রাত্রে পাহাড়ে স্বর্গীয় আলো দেখতে পেয়ে পাহাড়ে আরোহণ করি। সেখানে চিত্রগুপ্ত ও সমাধিগুপ্ত মুনিদ্বয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁদের কেবলজ্ঞান লাভের জন্য দেবতারা সেই স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত করেছিলেন।

আমরা তাঁদের প্রণাম করতে তাঁরা আমায় বললেন, তুমি কিছুক্ষণ এখানে

অপেক্ষা কর ও তোমার শিষ্যাকে নিয়ে যাও। তার খানিক পরেই এক বিদ্যাধর দম্পতী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁদের কাছে দীক্ষিত হলেন। দীক্ষিত হবার পর সেই বিদ্যাধরীকে তাঁরা আমায় দিলেন। তারপর আমরা সেইস্থান পরিত্যাগ করলাম।

সেই বিদ্যাধরীর নাম চিত্রবেগা। তার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল—

বৈতাঢ্য পর্বতে কাঞ্চন গুহা নামে এক গুহা আছে। সেই গুহায় আমরা বাঘ ও বাঘিণী রূপে পূর্বজন্মে বাস করতাম। সেই বনে একদিন আমরা কায়োৎসর্গে স্থিত দুজন মুনিকে দেখলাম। তাঁদের সাধু প্রকৃতির জন্য আমরা তাঁদের বন্দনা করে ফলমূল আহারের জন্য দিলাম। কিন্তু তাঁরা ধ্যান নিমগ্ন থাকায় আমাদের কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না বা আমাদের প্রদত্ত কোনো আহার্যও গ্রহণ করলেন না। খানিক পরে তাঁদের ধ্যান যখন শেষ হল তখন তাঁরা আকাশ পথে অন্যত্র চলে গেলেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম ও আবার তাঁদের বন্দনা করলাম।

তাঁদের কথা চিন্তা করতে করতেই এক সময় অশনিপাতে আমাদের মৃত্যু হল। আমাদের মৃত্যুর পর বৈতাঢ্য পর্বতের উত্তরার্দ্ধে চমরচঞ্চা নামে যে নগর আছে সেই নগরে রাজা পবনবেগের ঔরসে রাণী পুষ্কলাবতীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করলাম। আমার নাম রাখা হল চিত্রবেগা। ভবিষ্যতে প্রভাবশালী মহিলা হব বলে আমার উরু কেটে তাতে কিছু ওষুধ ভরে দেওয়া হল যার ফলে আমি রাজপুত্রের মত দেখতে হলাম ও বড় হতে লাগলাম।

যৌবন প্রাপ্ত হলে একবার আমি মন্দার পর্বতে জিনোপাসনা করতে যাই। সেখানে বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণার্দ্ধে অবস্থিত রত্নসঞ্চয় নগরীর রাজা গরুড়কেতুর পুত্র গরুড়বেগ আমায় দেখে ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে আমায় বিবাহ করতে চায় যদিও লোকে তখন আমায় রাজপুত্র বলেই জানে। তার আগ্রহাতিশয্যে আমার মাতাপিতা তার সঙ্গে আমার বিবাহ দেন। বিবাহের পর আমার উরু হতে সেই ওষধি বার করে নেওয়া হয় ও আমি রাজকন্যায় পরিবর্তিত হয়ে যাই।

এক সময় আমরা সিদ্ধায়তনে যাই ও সেখানে চিত্রগুপ্ত ও সমাধিগুপ্ত মুনিকে দেখি। তাঁদের দেখে আমার স্বামী বলে উঠলেন। মুনিবর, আপনাদের আমি যেন কোথাও দেখেছি।

তাঁরা প্রত্যুত্তর দিলেন, শ্রাবক তুমি ঠিকই বলছ। পূর্বজন্মে কাঞ্চনগুহায় তোমরা বাঘ ও বাঘিণী রূপে বাস করতে। সেই সময় তোমরা আমাদের দেখেছিলে।

তাঁদের এই কথায় আমাদের পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হয়। আমরা তখন শ্রাবক ব্রত গ্রহণ করে রাজধানীতে ফিরে আসি।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

সূচীপত্র

সপ্তম বর্ষ ॥ সপ্তম খণ্ড

বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৬

ইতিহাস

কবিতা

গল্প

জীবনী

নাটক

প্রবন্ধ

WB/NC-120
Vol. VII No. 12 Sraman April 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত

অতিমুক্ত

[ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক জৈন কথা সংগ্রহ]

"বইটী পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল মনটাকে আবার সংসারের নিত্য কাজে ফিরিয়ে আনতে।"

—শ্রীজয়দেব রায়

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

"জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে আলোকবর্ষী আখ্যানমূলক তথ্য বিদ্যমান, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক বাংলা কবিতা···অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবানুগ দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।"

—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮০

পরিবেশক :

অভিজিৎ প্রকাশনী

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৭ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

অক্ষয় তৃতীয়ায় সাধ্বীদের ইক্ষুরস দেওয়া হচ্ছে

পূর্ববাংলার বৃহত্তম নদী পদ্মা কি জৈন স্মৃতিবাহী ?

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাল

বাংলাদেশ নদী মাতৃক। অনাদি অতীত থেকেই বাংগালী ভয়ে, ভক্তিতে, বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় বাংলাদেশের অসংখ্য নদনদীকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নদনদীর মধ্যে গংগার মত আর কোন নদী বাংগালীদের এত শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করতে পারেনি। গংগার দুইটি শাখানদী—ভাগীরথী ও পদ্মা বাংগালীদের সম্পদ ও সমৃদ্ধির মূল উৎস। গংগার দক্ষিণ বাহিনী শাখাটি বাংলা দেশে ভাগীরথী নামে পরিচিত এবং খুবই প্রাচীন। পৌরাণিক কাহিনী-কিংবদন্তীতে উল্লেখ, সগরের ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হলে সগরের বংশধর ভগীরথ পূর্ব-পুরুষদের উদ্ধারের আশায় অনেক স্তবস্তুতি করে স্বর্গের দেবী গংগাকে মর্ত্যে কপিলমুনির আশ্রমে নিয়ে আসেন। গংগার জলধারায় সগরের পুত্ররা মুক্তিলাভ ক'রে স্বর্গে প্রস্থান করেন। সেই থেকে বাংলাদেশে গংগার একটি প্রবাহের নাম ভাগীরথী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের বিশ্বাস গংগা বা ভাগীরথীর জলস্পর্শে সর্বপাপের বিনাশ ঘটে এবং মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং ভাগীরথী পুণ্য-সলিলা, ভাগীরথী সুরসরিৎ বা দেবনদী। প্রাচীন কাল থেকে ভাগীরথীর উভয় তীরে তাই গড়ে উঠেছে অনেক তীর্থ, অনেক মন্দির ও দেবস্থান।

ভাগীরথীর পবিত্রতা প্রসংগে কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, প্রাচীনকালে গংগার বিপুল জলরাশি ভাগীরথীর প্রবাহ-পথেই সম্ভবতঃ সমুদ্রে পতিত হতো, তাই হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে ও প্রাচীন কাহিনী-কিংবদন্তীতে ভাগীরথীর এত মাহাত্ম্য কীর্তন করা হ'য়েছে।

অতীতকালে ভাগীরথীর কিরূপ বিস্তার ছিল বলা কঠিন, তবে ভাগীরথীর প্রবাহ-পথের ক্রম-সঙ্কোচের ইতিহাস যে দীর্ঘকালের, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কারণ বৃহৎ-ধর্মপুরাণে ভাগীরথীর ক্ষীণ স্রোতের ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

গংগার পূর্বযাত্রার প্রবাহ-পথ পদ্মাবতী বা পদ্মানদী পূর্ব বাংলার বৃহত্তম নদী।

পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল ঘন-জন-বসতি পূর্ণ ও বাংলাদেশের সম্পদ এবং শস্যের ভাণ্ডার। বর্ষায় পদ্মা হয়ে উঠে সাগরের মত কূলহীন ও ভয়ংকর কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐতিহ্য-মহিমায় ও লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে পদ্মা গংগা কেন, গংগা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অন্যান্য অনেক নদীরই সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। বরং "কীর্তিনাশা", "নয়া-ভাংগনী" ইত্যাদি দুর্নাম নিয়ে বাংগালী হিন্দুদের অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছে বহুকাল ধরে। বাংগালী হিন্দুদের নিকট পদ্মা শুধু কীর্তিনাশা নয়, পদ্মা পাপ-প্রবাহিনী। পদ্মার জল অপবিত্র; পদ্মার জলস্পর্শে, কবি কৃত্তিবাস বলেছেন, "মুক্তি...কেহ পাবে না সংসারে।"

এখন প্রশ্ন পদ্মার প্রতি বাংগালী হিন্দুদের এত অশ্রদ্ধা, এত অবজ্ঞা, এত ঘৃণার কারণ কি? কেউ কেউ মনে করেন, পদ্মা অর্বাচীন নদী; ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে পদ্মার কোন অস্তিত্বই ছিল না বাংলাদেশে। এই অর্বাচীনত্বের জন্যই প্রাচীন পুঁথিপত্রে পদ্মাবতীর কোন উল্লেখ নাই। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এই মতের সমর্থন মেলে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, "When the Musalman Sarkar or administrative division of Rajshahi was formed, the Padma was still terra-firma." অর্থাৎ "মুসলমান সরকার বা রাজসাহী প্রশাসনবিভাগ গঠনের সময়েও পদ্মার উৎপত্তি হয়নি। পদ্মার প্রবাহ-পথ তখনও ছিল স্থলভূমি।" এই রিপোর্টেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, "The formation of the Padma from the west to east in the sixteenth or seventeenth century and the formation of the Jamuna from the north to south in the nineteenth century, both flowing to a common centre at Goalando, suggests the existence of an area of depression in the middle of eastern Bengal." অর্থাৎ "পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে পদ্মার উৎপত্তি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ বাহিনী যমুনার সৃষ্টি এবং গোয়ালন্দে উভয় প্রবাহের মিলন পূর্ববংগের মধ্যবর্তী ভূপৃষ্ঠের অবনমণেরই ইঙ্গিত বহন করে।"

কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিক পদ্মাকে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সৃষ্ট নদী বলে দাবী জানালেও, তাদের দাবীর ভিত্তি খুবই দুর্বল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বৃহৎ-ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত গ্রন্থে পদ্মাবতী বা পদ্মা নদীর উল্লেখ রয়েছে। মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজল পদ্মার প্রবাহ পথের বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন তাঁর সময়ে গংগা কাজি হাটার সন্নিকটে দ্বিধা হয়ে একটি শাখা

দক্ষিণগামী হ'তো। অন্যটি পূর্ববাহিনী হয়ে পদ্মা নাম নিয়ে চট্টগ্রামের কাছে সমুদ্রে সংগত হ'তো। একাদশ শতাব্দীর তাম্রলিপি থেকেও পদ্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব নয়। একাদশ শতাব্দীর চন্দ্রবংশীয় রাজা মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁর ইদিলপুর তাম্র শাসনে "সতট পদ্মাবতী বিষয়"-এর উল্লেখ করেছেন। "সতট পদ্মাবতী বিষয়"-এর উল্লেখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে দশম-একাদশ শতাব্দীতে পদ্মানদী স্বমহিমায় বিরাজিত ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে রচিত একটি চর্যাপদেও পদ্মানদীর পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। চর্যাপদটি ভুসুকু নামে একাদশ শতাব্দীর জনৈক সিদ্ধাচার্যের রচনা।

পদটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হ'লো—

"বাজ নাব পাড়ী পঁউআ খালে' বাহিউ
অদ অবঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী—
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥"

পদটির বঙ্গার্থ হ'লো—

"পদ্মাখালে বজ্রনৌকা পাড়ি বাহিতেছি
অদ্বয়বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল
ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বাংগালী হইল
চণ্ডালীকে তুই নিজের ঘরণী করিয়া লইয়াছিস্।"

ইদিলপুরের তাম্রশাসন ও ভুসুকুর চর্যাগীতি থেকে পদ্মানদী যে দশম বা একাদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন, তা প্রমাণ করা যায়। কোন কোন লেখক মনে করেন, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ ও ভৌগলিক টলেমী আন্তর্গাংগেয় উপকূল ভাগের বর্ণনায় গংগার যে পাঁচটি মুখ বা মোহনার উল্লেখ করেছেন—তার একটি মোহনা বা মুখ পদ্মার। টলেমীর প্রমাণ স্বীকৃত হলে পদ্মাবতী বা পদ্মানদীর প্রাচীনতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

আবার কোন কোন লেখকের অভিমত, পদ্মানদী অর্বাচীন হয়তো নয়, কিন্তু প্রাচীন কালে নদীটি ছিল ক্ষীণস্রোতা। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দু লেখকদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেনি। এরকম ধরণের যুক্তির বিপক্ষে একথা বলা অসংগত নয় যে, ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী পূর্ববংগের মধ্যবর্তী ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক অবনমণের ফলেই যদি পদ্মার প্রবাহ-পথের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহ'লে জন্ম লগ্ন থেকেই পদ্মা ছিল বিপুল জলবাহী এবং স্ফীতকায়। প্রাচীনকালে পদ্মাবতী বা পদ্মানদী ক্ষীণ-স্রোতা ছিল, অনুমান ছাড়া এ ধরণের মতামতের বাস্তব ভিত্তিই বা কি? তাছাড়া,

দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর বা পূর্ব ভারতের অনেক ক্ষীণস্রোতা নদী, যাদের পূর্বতন বিপুলত্বের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, কাহিনী, কিংবদন্তী ও লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে বিশাল আয়তন বিশিষ্ট পদ্মানদী অপেক্ষা অধিকতর মহিমান্বিত। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, প্রাচীনকালে ক্ষীণস্রোতা ছিল বলে পদ্মানদী বাংগালী হিন্দুদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু পাপ প্রবাহিনী বলে ধিকৃত হ'লো কেন? সুতরাং পদ্মার প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বাংগালীদের নিন্দা, ক্রোধ ও ধিক্কারের কারণ অন্যত্র নিহিত মনে হওয়া স্বাভাবিক। এখন ঐ সকল কারণের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা সংগত মনে করি।

পদ্মা বা পদ্মাবতীর প্রতি হিন্দু সমাজের অশ্রদ্ধার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস বলেছেন, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের পরে গংগাদেবীকে পদ্ম নামে জনৈক মুনি পথ ভ্রষ্ট করেন এবং ঐ মুনি গংগাদেবীকে পূর্ব দিকে নিয়ে যান। গংগাদেবী অনতিকালের মধ্যে ভুল উপলব্ধি করে ভগীরথের অনুসরণ করে দক্ষিণ বাহিনী হন এবং পদ্মাবতীকে অভিশাপ দেন যে পদ্মার জলে কারোর মুক্তি হবে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে উপরোক্ত স্তবকটি উদ্ধৃত করা হ'লো—

"কাণ্ডারের প্রতি গংগা মুক্তি পদ দিয়া।
গৌড়ের নিকট গংগা মিলিল আসিয়া॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব মুখে যায়।
ভগীরথ বলি গংগা পশ্চাৎ গোড়ায়॥
যোড় হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব দিকে যাইতে আমার নাহি পথ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সংগেতে চলিল ভাগীরথী॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তি কেহ তব নীরে পাবে না সংসারে॥"

বৃহৎ-ধর্ম পুরাণে পদ্মার প্রতি হিন্দুদের অশ্রদ্ধার কারণ সম্পর্কে অনুরূপ আর একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। উক্ত কাহিনীতে বলা হয়েছে, কপিলমুনির আশ্রমে আসার পথে গংগার জল প্রবাহে জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত হয়। ইহাতে ক্ষিপ্ত হয়ে জহ্নুমুনি এক গণ্ডুষে গংগাকে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি গংগাকে জানু থেকে নিষ্কাসিত করেন। সেই থেকে গংগা জহ্নুমুনির কন্যারূপে জাহ্নবী নামে পরিচিত। এই ঘটনার পরে জহ্নুমুনির আত্মজা পদ্মাবতী ভগ্নী গংগাকে দর্শনের আশায় শংখধ্বনি করেন এবং ঐ শংখধ্বনি অনুসরণ করে গংগাদেবী পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভগীরথের শংখধ্বনি শ্রবণ করে গংগা স্বীয় ভুল

উপলব্ধি করেন এবং পদ্মাবতীকে অভিশাপ দিয়ে ভগীরথকে অনুসরণ করে দক্ষিণ বাহিনী হন। গংগাদেবীর অভিশাপে পদ্মাবতী বিস্তৃর্ণ নদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

বৃহৎ-ধর্ম পুরাণের আলোচ্য অংশটি বাংলা অনুবাদে উদ্ধৃত করা হলো—

"ইতিমধ্যে মহাত্মা জহ্নুমুনির কন্যা পদ্মাবতী ভগিনীকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সময় বুঝিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র পর্বতনন্দিনী গঙ্গা অগ্নিকোণের দিকে কিছুদূর গমন করিলে রাজা ভগীরথ তাঁহাকে অন্যদিকে যাইতে দেখিয়া 'চল সারথে! দেখিতেছ না দেবী অন্যদিকে যাইতেছেন।' এই বলিয়া উচ্চ শংখ বাজাইতে লাগিলেন। সেই শংখধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দেবী গঙ্গা জল হইতে উত্থিত হইয়া রাজাকে দূরে শঙ্খনাদ করিতে দেখিলেন এবং পদ্মাবতীর প্রতি কুপিতা হইলেন। সেই কোপে পদ্মাবতী বিস্তীর্ণা নদীমূর্তিতে পরিণত হইয়া পূর্বদিকে গমন পূর্বক সমুদ্রে সংগত হইলেন। দেবীও তীরদেশ সংক্ষিপ্ত করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিকটে সমুদ্র বুঝিয়া দক্ষিণ স্রোতা হইলেন। যমুনাসংগ ত্যাগ করিয়া রাজাকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া সমুদ্র ভেদ করিলেন।"

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে জহ্নুমুনি যিনি গংগাকে এক গণ্ডুষে পান করেছিলেন কে তিনি এবং কি তাঁর পরিচয়? পদ্মাবতীরই বা সত্যিকারের পরিচয় কি? জহ্নুমুনিকে পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আদিতে এই মহাক্রোধী মুনিটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বাহী হিন্দুদের বিরোধী ছিলেন বলেই মনে হয়। তা না হলে পতিত পাবনী গংগাকে তিনি এক গণ্ডুষে অদৃশ্য করবেন কেন ?

কৃত্তিবাসী রামায়ণে জনৈক পদ্মমুনির উল্লেখ রয়েছে। হিন্দুদের দেবমণ্ডলী বা ঋষিমণ্ডলীতে পদ্মমুনি নামে কোন উল্লেখযোগ্য দেবতা বা ঋষির সাক্ষাৎ মেলে না। কিন্তু জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্করদের মধ্যে পদ্মপ্রভু বা পদ্মপ্রভ নামে এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদ্মপ্রভ জৈন সম্প্রদায়ের ৬ষ্ঠ তীর্থঙ্কর। জন্ম তাঁর কৌশাম্বীতে। লাঞ্ছন তাঁর রক্তপদ্ম। তিনি নির্বাণ লাভ করেন হাজারিবাগের সমেত শিখরে। কৌশাম্বীকে প্রায় সকল পণ্ডিত উত্তর প্রদেশের "কোশীমের" সংগে অভিন্ন প্রতিপাদন করেছেন। তবে কৌশাম্বী নামে একটি স্থান একাদশ/দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশেও ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" কৌশাম্বী রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে যার অবস্থান উত্তরবঙ্গে ছিল অনেকের ধারণা।

জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ৬ষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভ বাংলাদেশে প্রাচীন কালেও অ-জনপ্রিয় ছিলেন না। কারণ রক্তপদ্ম লাঞ্ছনযুক্ত তাঁর কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের পদ্মমুনিকে জৈন তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভের সংগে অভিন্ন কল্পনা করলে কি খুব ভুল হবে ?

এখন দেখা যাক্‌, জহ্নু কন্যা পদ্মাবতীর সত্য পরিচয় কি উদ্‌ঘাটিত হয়। বর্তমান হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় সর্পদেবী মনসার একটি নাম পদ্মাবতী। সর্পদেবী মনসার নাম কেন পদ্মাবতী হ'লো তার উত্তর দিতে গিয়ে পদ্মাপুরাণের অন্যতম কবি বিজয় গুপ্ত বলেছেন—

"পদ্মবনে উৎপত্তি নাম থুইল পদ্মাবতী
মনসা নাম থুইল নাগরাজে।"

অর্থাৎ শিবকন্যা মনসার জন্ম হয়েছিল পদ্মবনে তাই মনসার ভাসান পূর্ববংগে পদ্মাপুরাণ নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ। এবং সেখানে মনসাপূজা খুবই জনপ্রিয়। সর্পদেবী মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের ধারণা এইরূপ: প্রথমে এই সর্পদেবীটি অনার্য কৌমের দেবতা ছিলেন এবং অনার্যদের দ্বারাই পূজিত হতেন। পরে তিনি মহাযান বৌদ্ধদের জাংগুলী দেবীর সংগে একাত্ম হয়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবিত হিন্দু সমাজে প্রবেশলাভ করেন। প্রথমে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনার্য ও অব্রাহ্মণ্য সমাজ পূজিত এই সর্পদেবীটিকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন এবং তাদের ঐ মনোভাবই চাঁদ সদাগর ও মনসার বিবাদের কাহিনীতে প্রতিফলিত। প্রাথমিক বিরোধের পর মনসা বিপুল গৌরবে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজে অধিষ্ঠিত হন। চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসাদেবীর হিন্দু সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তার আর একটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। মনে হয় সর্পদেবী মনসা জৈন সম্প্রদায়ের আরাধ্য পদ্মাবতীর গুণ গরিমাও ঐ সময়ে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। তাই পুনরুজ্জীবিত হিন্দু সমাজে বিপুল বৈভব ও গৌরবে তিনি অচিরকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হন।

জৈনদের এই শাসনদেবী সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলা প্রয়োজন। জৈনদের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথ, বাংলাদেশে যিনি পরেশনাথ নামে পরিচিত, সর্পকুলের সংগে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে যুক্ত। ফণাধারী সর্প তাঁর লাঞ্ছন, সর্পদ্বয়ের অন্তরালে তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁর পার্শ্বচর ধরণেন্দ্র যক্ষ, নাগ বাসুকীরই রূপান্তর। পার্শ্বনাথের যক্ষী বা শাসনদেবীর নামই পদ্মাবতী। তিনি চতুর্হস্তা ও কুক্কুট বাহনা। বজ্র অংকুশ, পুষ্পপাশ, সুবর্ণ ফল ও রক্তপদ্ম বা কুমকুম পদ্ম তাঁর চার হস্তের আয়ুধ। এক সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জৈন সম্প্রদায়ের উপাস্য পদ্মাবতীর নাম থেকেই সম্ভবতঃ ভাগীরথীর পূর্ব-প্রবাহ পথের নাম হয়েছে পদ্মাবতী। সংক্ষেপে পদ্মানদী। পদ্মানদীর প্রবাহ পথের উভয়দিক প্রাচীন ও মধ্যযুগে সম্ভবতঃ অবেদাচারী, অব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই জন্যই ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত হিন্দু বাংগালীদের পদ্মানদীর প্রতি এত অশ্রদ্ধা এবং এজন্যই পদ্মাবতীর প্রবাহ পথের উভয় পার্শ্বে হিন্দু তীর্থের এত বিরলতা। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বিক্রমপুরে পদ্মার প্রবাহ পথের অনতি-

দূরে "জৈনসার", "বজ্রযোগিনী" প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধস্মৃতিবাহী পল্লীর অস্তিত্ব উপরোক্ত অনুমানের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে।

অর্বাচীনত্বের জন্য পদ্মাবতী বা পদ্মা নদী হিন্দু বাংগালীদের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করতে পারে নি বলে যে মত প্রচলিত, তার ভিত্তি অতি দুর্বল। বরং অতি প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত পদ্মানদীর প্রবাহ পথের পরিমণ্ডল ছিল বেদ-বিরোধী কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীন তাই বাংগালী হিন্দুদের নিকট, পদ্মানদী অপুণ্যসলিলা, কীর্তিনাশা, পাপ-প্রবাহিনীরূপে ধিক্কৃত।

পদ্মাকে "কীর্তিনাশা" অভিধাতে কবে ধিক্কৃত করা সুরু হলো—সঠিক বলা সম্ভব নয়। মেজর রেনেলের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের "মানচিত্রে" দেখা যায় যে পদ্মানদী পূর্বে বিক্রমপুরের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। ঐ সময়ে "কীর্তিনাশা" বা "নয়া ভাংগনী" নামে কোন নদীর অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। সুতরাং কীর্তিনাশার উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক কালে। অনেকের ধারণা, সিরাজ-উদ্-দৌল্লার মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস করার পরে পদ্মার নাম হয়েছে কীর্তিনাশা। কিন্তু "বিক্রমপুরের ইতিহাস" রচয়িতা শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত বলেছেন, চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্তিনাশ করেছিল বলে পদ্মার অন্য নাম হয় কীর্তিনাশা। (বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫) অর্থাৎ উপরোক্ত গ্রন্থের লেখক পদ্মাবতীর কীর্তিনাশা নাম করণের তারিখটি আরও পিছিয়ে দেবার পক্ষপাতী। যদিও ঐতিহাসিক প্রমাণের একান্তই অভাব, তথাপি বলতে দ্বিধা নেই, পদ্মার কীর্তিনাশা নামকরণ ষোড়শ শতাব্দী কেন তার পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না, কাশী ও বিহারের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে বাংলাদেশের কীর্তিনাশার প্রায় সমার্থক "কর্মনাশা" নামে একটি নদী রয়েছে। ঐ "কর্মনাশা" নদী সম্পর্কে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত। নদীটির জলস্পর্শে নাকি সর্বপুণ্য নষ্ট হয়, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় উপরোক্ত "কর্মনাশা" নদী পাপ প্রবাহিনীরূপেই গণ্য। পদ্মানদী সম্পর্কে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাসও অনুরূপ মনোভাবই প্রদর্শন করেছেন যখন তিনি বলেন—

> "শাপ বাণী সুরধনী দিলেন পদ্মারে
> মুক্তি কেহ তব নীরে পাবে না সংসারে।।"

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, বাংগালীদের পূজিতা লক্ষ্মীর অন্যতম নাম পদ্মা। কেউ কেউ বলতে পারেন পদ্মানদী নামটি লক্ষ্মী নামান্তর থেকে উৎপন্ন। ঐরূপ মত খণ্ডনের জন্য একটি মাত্র যুক্তির উল্লেখই যথেষ্ট। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী, যিনি ধন দৌলতের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বাংগালীর নিত্য পূজ্যা ও গৃহদেবতা, তার নাম থেকে পদ্মাবতী বা পদ্মানদীর উৎপত্তি হলে, পদ্মাবতী বা পদ্মানদী হিন্দু সমাজে এত অশ্রদ্ধাভাজন ও এত ধিক্কৃত হতো না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে দ্বিধা নেই পদ্মাবতী বা পদ্মানদী জন্মসূত্রে অব্রাহ্মণ্য ও অবৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগে সংযুক্ত ছিল এবং জৈনদের আরাধ্য পদ্মাবতী দেবীর নাম থেকেই পদ্মানদীর নামকরণ হয়েছে। তাই পদ্মানদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের নিকট কোনদিনই পুণ্যতোয়া বা সুর নদীরূপে আরাধ্য হয়ে উঠেনি। বরং কীর্তিনাশা নামে কর্মনাশার মত পাপ প্রবাহিনীর দুর্নাম অর্জন করেছে। পদ্মার প্রবাহপথে সংগত কারণেই হিন্দুতীর্থের এত অভাব।

পরিশেষে মন্তব্য করা অনুচিত হবে না, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের নাম যেমন মহাবীরের স্মৃতি রঞ্জিত বাংলার সীমান্তবর্তী হাজারীবাগের পরেশনাথ পাহাড় যেমন পার্শ্বনাথের নাম থেকে আগত, পূর্ববাংলার সর্ববৃহৎ নদী পদ্মাবতী বা পদ্মা জৈন-তীর্থঙ্কর পাশ্বনাথের শাসনদেবী পদ্মাবতীর স্মৃতিবাহী। জৈনদের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মত তাঁর শাসনদেবী পদ্মাবতীও সম্ভবতঃ এককালে বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তার সর্বাধিক জনপ্রিয়তার যুগে পূর্ববাংলার অধিবাসীরা তাদের প্রাণপ্রিয় সুবর্ণ-শস্য প্রসবিনী নদীটির নাম অনুরাগভরে রেখেছিল পদ্মাবতী, সংক্ষেপে পদ্মা।

গ্রন্থপঞ্জী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ
২। বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড
৩। Census Report 1891
৪। বংগীয় শব্দকোষ
৫। বৃহৎ-ধর্ম পুরাণ (বঙ্গানুবাদ)
৬। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা
৭। বাইশ কবির মনসা মঙ্গল বা বাইশা
৮। Heart of Jainism
৯। History of Ancient Bengal
১০। বাংগালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)

গৈরিক প্রান্তরে

শ্রীপরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

দেখেছি বনানী আমি
দিগন্তের আশ্চর্য সীমায়
পিঞ্জরে আবদ্ধ যত
বিহঙ্গের ক্রন্দনে ও গানে
বারংবার অনুভূতি সত্তারে ছু'য়েছে—
এ গাথার সুরস্পর্শ প্রাচীন বীণায়
তন্ময়িত পুষ্পগুলি
যেখানে মিশেছে
তরুর মৌনঘন পাতার আড়ালে
শুধুমাত্র গুঞ্জরণ
বাতাসের সাথে—
যেন এক মায়াময়
প্রাণের ওপারে
বর্ধমান আছ প্রভু
গৈরিক প্রান্তরে।

কানাই নাট্টশাল
বর্ধমান
৮. ৪. ৮০

শ্রীপাল

[পূর্বানুবৃত্তি]

অংক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান কৌশাম্বী। মন্দিরের বহির্ভাগ]

১ম নাগরিক : আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

২য় নাগরিক : কি আশ্চর্য ভাই ?

১ম নাগরিক : সিদ্ধচক্রের মহিমা।

২য় নাগরিক : সিদ্ধচক্রের মহিমা ?

১ম নাগরিক : তুমি কোথায় থাক ?

২য় নাগরিক : কেন কৌশাম্বীতেই।

১ম নাগরিক : মনে হয় না। নইলে সিদ্ধচক্রের প্রভাবে মালব রাজকন্যা মৈনাসুন্দরী তাঁর স্বামীকে রোগমুক্ত করলেন, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর সাত শ' অনুচরকে, সে খবর তুমি জানতে না ?

৩য় নাগরিক : শুধু তাই নয়, এখন জানা গেছে উম্বর রাণা সামান্য ব্যক্তি নয়, চম্পাধিপতি সিংহরথের তিনি পুত্র, নাম শ্রীপাল।

২য় নাগরিক : তাইত ! কি করে জানা গেল ?

১ম নাগরিক : কি করে আবার ? শ্রীপালের মায়ের কাছে।

২য় নাগরিক : শ্রীপালের মায়ের কাছে ? তিনি এখানে কোথা হতে এলেন ?

৩য় নাগরিক : সেই কথাইত বলছিলাম…

১ম নাগরিক : সিংহরথের মৃত্যুর পর শ্রীপালের কাকা অজিত সেন যখন চম্পারাজ্য অধিকার করে নিলেন তখন শ্রীপালের মা শ্রীপালকে নিয়ে রাত্রিবেলা চম্পানগরী পরিত্যাগ করলেন। তারপর আত্মরক্ষার জন্য এক কুষ্ঠীদের দলে যোগ দিলেন।

৩য় নাগরিক : সেখানে শ্রীপালের কুষ্ঠরোগ হয়ে গেল।

১ম নাগরিক : তখন তিনি শ্রীপালকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বৈদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে কাল এখানে এসে পৌঁছলেন।

৩য় নাগরিক ঃ আর এই মন্দিরেই তাদের দেখা হল। মা ছেলেকে চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

১ম নাগরিক ঃ আর এসব সিদ্ধচক্র যন্ত্রের উপাসনার প্রভাব।

২য় নাগরিক ঃ আশ্চর্য, সত্যিই আশ্চর্য।

৪র্থ নাগরিক ঃ আশ্চর্যের আরো কিছু বাকী আছে!

সকলে ঃ কি? কি? কি?

৪র্থ নাগরিক ঃ আমাদের রাজা পুণ্যপাল মৈনাসুন্দরীর মা রূপসুন্দরীর ভাই।

১ম নাগরিক ঃ হাঁ হাঁ তাত জানি।

৪র্থ নাগরিক ঃ মালবপতি মৈনাসুন্দরীর বিয়ে উম্বর রাণার সঙ্গে দিলে তিনি রাগ করে কৌশাম্বী চলে এলেন। কাল সন্ধ্যেবেলা তাঁর সঙ্গে এই মন্দিরে মৈনাসুন্দরীর দেখা হয়ে গেল। তিনি প্রথমে মৈনাসুন্দরীর উপর রুষ্ট হন কিন্তু পরে দেবোপম জামাইর যথার্থ পরিচয় পেয়ে তাদের সবাইকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেছেন।

২য় নাগরিক ঃ অহো সত্যিই আশ্চর্য!

৪র্থ নাগরিক ঃ তারপর সিংহরথের মন্ত্রী বৃদ্ধ মতিসাগরও এখানে এসে জুটেছে। সে শ্রীপালকে তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে বলছে।

সকলে ঃ সে ত উচিতই, উচিতই।

৪র্থ নাগরিক ঃ কুমার শ্রীপাল এখন তাই সৈন্যদল গঠন করছেন।

১ম নাগরিক ঃ আমার ইচ্ছে করছে আমি এই সৈন্যদলে যোগ দেই।

২য় নাগরিক ঃ ভাই, তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছ। আমারো তাই ইচ্ছে।

৪র্থ নাগরিক ঃ তবে চল কুমার শ্রীপালের কাছে যাই।

সকলে ঃ চলো চলো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অন্তঃপুর। শ্রীপাল, পুণ্যপাল, কমলপ্রভা, মৈনাসুন্দরী বসে রয়েছেন। সামনে দাঁড়িয়ে মতিসাগর]

মতিসাগর ঃ কুমার, এক মস্ত বড় সৈন্যদল সংগৃহীত হয়েছে। রাজা পুণ্যপালও তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। এবার চম্পারাজ্য উদ্ধারের জন্য আমাদের যুদ্ধযাত্রার দিন নিশ্চিত করতে হবে। আমি গণৎকারদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা আগামী শুক্লা

ত্রয়োদশীর দিনটি প্রশস্ত বলে অভিমত দিয়েছে। সেদিন যুদ্ধযাত্রা করলে বিজয়শ্রী আমরা অবশ্যই লাভ করব।

পুণ্যপাল ঃ মন্ত্রীবর ঠিকই বলেছেন, কুমার।

শ্রীপাল ঃ আমারো তাই অভিমত। কিন্তু চম্পা আক্রমণের পূর্বে মালব রাজকে কিছু শিক্ষা দিতে চাই। তিনি অহঙ্কার বশতঃ কেবল ধর্মেরই অপমান করেন নি, সত্য বলার জন্য মৈনার জীবনও দুঃখময় করবার কোন প্রযত্নই অবশেষ রাখেন নি। মালবপতি ক্রোধাবেশে যে অনুচিত কার্য করেছিলেন তা তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই। কিন্তু এত করেও কি তিনি মৈনার জীবন দুঃখময় করতে পেরেছেন, না তার ভাগ্যকে পরিবর্তিত করতে ?

পুণ্যপাল ঃ তুমি এখন এ সম্বন্ধে কি করতে চাও কুমার ?

শ্রীপাল ঃ সে কথা আমি মৈনাকেই জিজ্ঞাসা করছি। ও যেরূপ বলবে তাই হবে।

মৈনা ঃ আমি এ সম্বন্ধে কি বলতে পারি আর্যপুত্র। তুমি বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন। তাই তুমি যা করবে তাই উপযুক্ত হবে।

শ্রীপাল ঃ তবু, তোমার মুখে শুনতে চাই মৈনা।

মৈনা ঃ আর্যপুত্র, তুমি যদি আমার মুখে শুনতে চাও তবে বলব তাঁর অভিমান দূর করা অবশ্যই কর্তব্য, তবে তাঁর যাতে কোনো ক্ষতি হয় সেরূপ কাজ করা আমাদের উচিত হবে না। তিনি ক্রোধপরবশ হয়েই অবশ্য কুষ্ঠ রোগাক্রান্তের হাতে আমায় সমর্পণ করেছিলেন কিন্তু তা যদি না করতেন তবে আজ আমি যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছি তা কি হতে পারতাম ?

কমলপ্রভা ঃ এমন পুত্রবধূকে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি শ্রীপাল। আমি বলি কি তুমি এই বলে মালবপতির কাছে দূত প্রেরণ কর যে হয় তিনি কাঁধে কুড়োল রেখে তোমার কাছে আসুন নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। আমাদের সমবেত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ করবার সাহস হবে না। তাই তিনি কাঁধে কুড়োল নিয়ে তোমার শিবিরে আসবেন, এতে তাঁর 'আমি নির্ধনকে ধনী করতে পারি, দরিদ্রকে রাজা' এ অভিমান দূর হয়ে যাবে ও তাঁর কল্যাণ হবে। তাঁর দৃষ্টান্তে অন্যেও শিক্ষালাভ করবে।

মতিসাগর ঃ ঠিকই বলেছেন মহারাণী।

শ্রীপাল ঃ তুমি কি বল মৈনা ?

মৈনা ঃ মা যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এতে আমার বাবার কল্যাণ হবে।

শ্রীপাল ঃ তবে তাই হবে। [হাত তালি দিচ্ছেন। দ্বাররক্ষক আসছে] সন্ধি বিগ্রাহিক মতিমন্দকে এখানে উপস্থিত কর।

দ্বাররক্ষক ঃ যে আজ্ঞা।

[দ্বাররক্ষক বেরিয়ে যাচ্ছে। সন্ধিবিগ্রাহিক মতিমন্দ আসছে]

শ্রীপাল ঃ মতিমন্দ, তোমাকে এখুনি উজ্জয়িনী যেতে হবে। উজ্জয়িনীরাজকে এই সন্দেশ দিতে হবে—হয় তিনি কাঁধে কুড়োল নিয়ে চম্পারাজ-কুমারের শিবিরে আসুন, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

[মতি সাগরের দিকে চেয়ে]

মন্ত্রীবর। শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন আমাদের সৈন্য বাহিনীকে মালবের পথে প্রধাবিত করুন।

মতিসাগর ঃ যে আজ্ঞা কুমার।

[মন্ত্রী বেরিয়ে যাবেন। রণবাদ্যের শব্দ শোনা যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[উজ্জয়িনীর বহির্ভাগ। শ্রীপালের শিবির। শ্রীপাল ও মতিমন্দ]

মতিমন্দ ঃ কুমার, আমি মালবপতিকে আপনার সন্দেশ নিবেদন করি। শুনে প্রথমে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু মন্ত্রীরা যখন তাঁকে আপনার সৈন্যের বিশালতা ও বাস্তব পরিস্থিতির কথা নিবেদন করল তখন নিরুপায় হয়ে তিনি আপনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কাঁধে কুড়োল নিয়ে তিনি আপনার এখানেই আসছেন।

[দ্বারপাল ভিতরে আসছে]

দ্বারপাল : মালবরাজ প্রজাপাল বাইরে অপেক্ষা করছেন।

শ্রীপাল : তাঁকে সসম্মানে ভিতরে নিয়ে এস।

[দ্বারপাল চলে যাচ্ছে ও একটু পরে প্রজাপাল প্রবেশ করছেন]

শ্রীপাল ঃ [এগিয়ে গিয়ে] আসুন আসুন মালবপতি, আপনার সৌহার্দ্য আমার পরম কাম্য।

প্রজাপাল ঃ সৌহার্দ্য নয় চম্পাধিপতি, আনুগত্য। সেই আনুগত্য জানাতেই আমি এসেছি।

শ্রীপাল ঃ আপনি কি বলছেন মালবরাজ! আপনি আমার গুরুজন।

প্রজাপাল ঃ আপনার...

শ্রীপাল ঃ হাঁ মালবপতি। আপনার কন্যা মৈনাসুন্দরী আমার পত্নী।

[মৈনা আর একদিক হতে আসছে]

মৈনা ঃ বাবা! বাবা! [প্রণাম করতে যাচ্ছে]

প্রজাপাল ঃ না না না। তুই আমার চরণ স্পর্শ করিস না। ওঃ এই দিন দেখবার জন্য কেন আমি বেঁচেছিলাম। তুই চম্পাধিপতির পত্নী? কুলকলঙ্কিনী—

মৈনা ঃ বাবা, আপনি মিথ্যা ক্রোধ করছেন। আপনি ত আমায় এঁর হাতেই সমর্পণ করেছিলেন।

প্রজাপাল ঃ না না, কখ্‌খনো না। হায়, আমার দুষ্কর্মের এই পরিণাম!

শ্রীপাল ঃ মালবপতি, আপনি ভালো করে আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আমিই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সেই উম্বর রাণা।

প্রজাপাল ঃ তুমি? তুমি?

শ্রীপাল ঃ হাঁ আমি।

প্রজাপাল ঃ হাঁ তুমিই। [মৈনার দিকে চেয়ে] মৈনা, তুই আমায় ক্ষমা কর। [মৈনা প্রণাম করছে] সেদিন তুই রাজসভায় দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছিলি তা অক্ষরশঃ সত্য। আর আমি অহঙ্কার ও অজ্ঞান বশে যে কথা বলেছিলাম তা সত্য ছিল না। তোকে কষ্ট দেবার আমি কোনই ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু তুই সেই চরম দুঃখকেও ভাগ্য বলে পরম সুখে পরিণত করে নিয়েছিস। এখন দেখছি মানুষ যে সুখ দুঃখ ভোগ করে তা আপন ভাগ্য বলেই। কেউ নির্ধনকে ধনী করতে পারেনা বা দরিদ্রকে রাজা। আমি সুরসুন্দরীর উচ্চকুলেই বিবাহ দিয়েছিলাম কিন্তু জানি না আজ সে কোথায়?

মৈনা ঃ কেন? কি হয়েছে তার পিতা?

প্রজাপাল ঃ কি করে জানব মা! এখান হেতে বিদায় নিয়ে শংখপুর যাবার পথে সে দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিতা হয়। তারপর অনেক অনুসন্ধান করেও তার কোনো খবরই পাইনি।

মৈনা ঃ পিতা, মহর্ষিরা ঠিকই বলেছেন, মানুষ কত দুর্বল, অসহায়—

প্রজাপাল ঃ [চোখ মুছে] আচ্ছা মা, তবে আমি চলি—

মৈনা ঃ না বাবা, তা হতে পারে না। আপনার অভ্যর্থনার জন্য আমরা এখানে সামান্য উৎসবের আয়োজন করেছি। আপনাকে তা দেখে আহারাদি করে যেতে হবে।

প্রজাপাল ঃ না মৈনা না। [শ্রীপালের দিকে চেয়ে] দেখো শ্রীপাল, আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তোমরা আমায় যাবার অনুমতি দাও।

শ্রীপাল ঃ অনুমতি দেবার অধিকার আজ আমার নয়, মৈনার। আর তার

কথাত আপনি শুনেছেন। তাই আসুন এই সিংহাসনে বসুন। [নিয়ে গিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসাচ্ছে] আর মতিমন্দ, তুমি নট-মণ্ডলীকে এখানে উপস্থিত হতে বল।

[মতিমন্দ চলে যাচ্ছে ও একটু পরে নটসহ নটী আসছে। নৃত্য করতে গিয়ে নটী কান্নায় ভেঙে পড়ছে। মৈনা তার নিকটে আসছে ও তার মুখখানা তুলে ধরছে]

মৈনা : আরে এত সুর সুন্দরী।

সুর : [মৈনাকে জড়িয়ে] হ্যাঁ আমি সুর সন্দরী।

[নটেরা সরে যাচ্ছে। প্রজাপাল শ্রীপাল নিকটে এসে দাঁড়াচ্ছেন]

মৈনা : কাঁদিসনে বোন কাঁদিসনে। আজ হতে মনে কর তোর দুর্ভাগ্যের অন্ত হয়েছে।

সুর : আমার দুর্ভাগ্যের বোধহয় আর অন্ত হবে না, দিদি। সেদিন তোর দুর্ভাগ্য দেখে আমি হেসেছিলাম। মনে মনে নিজের ভাগ্যের গর্ব করেছিলাম। আজ তাই নটী হয়ে তোর এখানে নৃত্য করতে এসেছি।

মৈনা : বোন যা হবার হয়েছে। এখন যাতে তুই সুখী হোস তার চেষ্টা আমরা করব।

শ্রীপাল : অবশ্যই করব। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে অরিদমনের হাতে দিয়ে আসব।

মৈনা : চল বোন ভেতরে চল। [ভেতরে যাচ্ছে]

প্রজাপাল : এখন দেখছি মানুষের ভাগ্যই বলবান। মানুষ ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নকমাত্র।

চতুর্থ দৃশ্য

[চম্পার রাজসভা। সপারিষদ অজিত সেন বসে রয়েছেন। সামনে শ্রীপালের দূত চতুর্মুখ]

চতুর্মুখ : মহারাজের জয় হোক!

অজিত সেন : কি সংবাদ নিয়ে এসেছ দূত?

চতুর্মুখ : মহারাজ, কুমার শ্রীপাল বলে পাঠিয়েছেন আপনি তাঁকে বিদেশে যে সব বিদ্যার্জনের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন তিনি সে সব বিদ্যা এখন অর্জন করে নিয়েছেন—

অজিত সেন : বাঃ বেশ বলেছ দূত! কিন্তু আমিত তাকে কোনো বিদ্যার্জনের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিনি। নিতান্ত শিশু ছিল বলেই দয়া পরবশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম—কি বল বৃষ সেন?

বৃষ সেন : আপনি ঠিকই বলছেন মহারাজ। নিতান্ত শিশু ছিল বলে আপনি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অজিত সেন : সে বিদ্যার্জন করে ভালোই করেছে। কি বল বৃষ সেন? [দূতের দিকে চেয়ে] এখন সে কী চায়?

চতুর্মুখ : তিনি নিজের জন্য কিছুই চান না। তবে আপনার বয়স হয়েছে। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই আপনার মঙ্গলের জন্য এই রাজ্যভার আপনার স্কন্ধ হতে নামিয়ে দিতে চান।

অজিত সেন : কি বললে?

চতুর্মুখ : কুমার শ্রীপালের অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর আশ্রয়ে এখন কত কত নরপতি বাস করে। আপনারও উচিত তাদের অনুসরণ করা।

অজিত সেন : বটে!

চতুর্মুখ : মহারাজ! কিন্তু আপনি তা না করে যদি অনর্থক বিরোধ করেন তবে তিনি মুহূর্তেই সেই বিরোধের অবসান ঘটাতে পারেন। কারণ আপনাতে ও তাঁতে অনেক পার্থক্য। কোথায় পর্বত তুল্য তিনি ও কোথায় ধূলিকণের মত আপনি? কোথায় পূর্ণিমা রজনীর শারদ চন্দ্র আর কোথায় মিটমিট করা ক্ষীণ তারা। কোথায় সহস্রমালী সূর্য আর কোথায় সামান্য খদ্যোত—

অজিত সেন : দূত, যথেষ্ট হয়েছে। দূত বলেই তোমার এই আস্পর্দ্ধা আমি সহ্য করেছি। এরপর—

চতুর্মুখ : মহারাজ, আমি দূত। আমি আমার স্বামীর বক্তব্যমাত্র উপস্থিত করছি। তিনি বলেছেন—আপনার যদি প্রাণের মমতা থাকে তবে তাঁর রাজ্য তাঁর হাতে দিয়ে দিন নচেৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তবে একথা মনে রাখবেন কুমার শ্রীপালের সৈন্যের কাছে আপনার সৈন্য সমুদ্রের কাছে গোস্পদের মত।

অজিত সেন : দূত, তোমার দুঃসাহস কম নয়। যাও শ্রীপালকে গিয়ে বলো যে অজিত সেন নির্বীর্য নয়। কেবল বাক্যবাণে চম্পারাজ্য অধিকার করা যায় না। সে সুপ্ত সিংহকে জাগ্রত করবার দুঃসাহস করেছে। আমি যুদ্ধের জন্য শ্রীপালকে আহ্বান করছি। রণক্ষেত্রে সে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

চতুর্মুখ : মহারাজ! আর একবার বিবেচনা করে দেখুন। কুমার শ্রীপাল চান না অনর্থক লোকক্ষয় হোক। পরাজিত হলে আপনার যে

অখ্যাতি হবে, তাঁর ইচ্ছে আপনাকে সেই অখ্যাতি হতেও বাঁচানো।

অজিত সেন : দূত, চুপ করো। এরপর কথা বললে তোমায় এখান হতে বার করে দেব।

চতুর্মুখ : তবে আমি যেতে পারি ?

অজিত সেন : হঁ্যা।

[দূত চলে যাবে]

অজিত সেন : [সেনাপতির দিকে চেয়ে] কীর্তিপাল, সৈন্যদল প্রস্তুত কর।

কীর্তিপাল যে আজ্ঞা মহারাজ।

পঞ্চম দৃশ্য

[রণক্ষেত্র]

অজিত সেন : বৃষ সেন, যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করছি ততদূর দেখছি কেবল শ্রীপালের সৈন্য। এত সৈন্য ও কোথা হতে সংগ্রহ করল।

বৃষ সেন : মহারাজ, এ যুদ্ধে অগ্রসর না হলেই বোধহয় ভালো ছিল। উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ও তার নিজস্ব সৈন্য মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য। সেক্ষেত্রে চম্পার সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিরিশ হাজার। ঐ দেখুন মহারাজ, আমাদের সৈন্যদল পেছনে হটছে। না, এই দুর্বার শত্রু সৈন্যের তরঙ্গকে রোধ করা কঠিন বলে মনে হচ্ছে। মহারাজ এখনো সময় রয়েছে—সন্ধির প্রস্তাব করে দূত প্রেরণ করুন।

অজিত সেন : না বৃষ সেন। ক্ষত্রিয়ের বশ্যতা স্বীকারের চাইতে পরাজয় কম গ্লানিকর।

[সংবাদবাহক আসছে]

সংবাদবাহক : শ্রীপালের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়েছে। আমাদের ব্যূহমুখ ভেঙে পড়েছে। মহারাজ—

অজিত সেন : সেনাপতি কীর্তিপালকে ব্যূহমুখ আরো দৃঢ় করতে বল। যেমন করে হোক শ্রীপালের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। যাও, শীঘ্র যাও—দাঁড়াও আমিও আসছি।

[অজিত সেন সংবাদবাহকের পেছনে পেছনে চলে যাচ্ছেন]

বৃষ সেন : এই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা আর আমার উচিত হয় না।

[বৃষ সেন চলে যাবে অন্যদিক দিয়ে সুজন মঙ্গল ও অন্য দুজন সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অজিত সেন আসবেন]

সুজন : অস্ত্র পরিত্যাগ করুন নচেৎ—

অজিত সেন : তোমরা আমায় হত্যা করবে ? ক্ষত্রিয় মরতে ভয় পায় না।

সুজন ঃ আপনার সাহসের প্রশংসা করি, কিন্তু আপনাকে হত্যা করতে কুমার শ্রীপালের নিষেধ আছে। নইলে কখন আপনাকে—

অজিত সেন ঃ হাঃ হাঃ নিষেধ ? কিন্তু কেন ?

সুজন ঃ কারণ আপনি তাঁর পিতৃব্য। সাবধান—

[মঙ্গলের তরবারির আঘাতে অজিত সেনের তরবারি ছিটকে পড়ছে। তিন জন তখন তাঁকে ঘিরে ফেলছে]

১ম সৈনিক ঃ আপনি এখন আমাদের বন্দী।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[শ্রীপালের শিবির। কুমার শ্রীপাল বসে রয়েছে। দ্বারপাল ভিতরে আসছে]

দ্বারপাল ঃ সুজন ও মঙ্গল বন্দী অজিত সেনকে নিয়ে এসেছে।

শ্রীপাল ঃ তাদের ভিতরে আসতে বল।

দ্বারপাল ঃ যে আজ্ঞা।

[দ্বারপাল চলে যাচ্ছে। খানিক পরে সুজন ও মঙ্গল অজিত সেনকে ভিতরে নিয়ে আসছে। শ্রীপাল নিজের হাতে তাঁর বন্ধন মোচন করছে]

শ্রীপাল ঃ কাকা, এর জন্য আপনি মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি কেবল মুক্তই নন, চম্পার রাজ্য যেভাবে শাসন করছিলেন সেইভাবে শাসন করুন। আমার রাজ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি পিতৃরাজ্য এজন্য অধিকার করতে এসেছিলাম নইলে সংসারে আমার অখ্যাতি থাকত। লোকে বলত শ্রীপাল নির্বীর্য। সে নিজের হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারল না। এখন সেকথা আর রইল না।

অজিত সেন ঃ শ্রীপাল, আজ তুই আমার চোখ খুলে দিলি। কোথায় আমি যে তোর পিতৃরাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, আর তোকেও হত্যা করতে চেয়েছিলাম আর কোথায় তুই ? গোত্রদ্রোহ করলে কীর্তির নাশ হয়, রাজদ্রোহ করলে নীতির ও বালদ্রোহ করলে সদ্গতির। আমি এই তিন অপরাধে অপরাধী। না শ্রীপাল, এ রাজ্যের আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব যাতে আমি ভবিষ্যৎ জীবন নির্মাণ করতে পারি। তুই রাজা হ, সুখী হ, এই আমার আশীর্বাদ।

[চারিদিক হতে শ্রীপালের জয়ধ্বনি উঠছে]

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমার শ্বশুর গুরুড়কেতু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে আমার স্বামী সিংহাসনে আরোহণ করেন ও আমার পুত্র গুরুড়বিক্রম যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়। এভাবে আমরা রাজকীয় বৈভব ভোগ করে বাস করতে থাকি। আজ যখন দেবতারা মুনিদ্বয়ের কেবলজ্ঞান লাভের জন্য স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত করলেন তখন সংসারে বৈরাগ্য হওয়ায় গুরুড়বিক্রমকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা এখানে আসি ও দীক্ষিত হই।

আমি তাকে সেই ওষধির কথা জিজ্ঞেস করলে সে সেই ওষধি এখনো তারি কাছে আছে বলে। সেই ওষধি কাজে লাগতে পারে বলে আমি তার কাছ হতে নিয়ে নেই। তারপর আমরা এখানে ফিরে আসি।

আমার পুত্র পুণ্ড্রের কোনো সন্ততি ছিল না। সেজন্য সে চিন্তিত ছিল। তারপর একসময় আমার পুত্রবধূ গর্ভবতী হয়। আমি তখন তাকে বলি যে তোমার যদি কন্যা হয় তবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিও।

যথাসময়ে তার কন্যা হয়। সেই সংবাদ পেয়ে তরে উরুতে সেই ওষধি আমি প্রবেশ করাই। একথা আমি, তার মা ও ধাত্রী ছাড়া আর কেউই জানত না। আর্য-জ্যেষ্ঠ যে তাকে কন্যা বলে জানতে পেরেছে তা তার বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়। এই বলে তিনি রাজপ্রাসাদে চলে গেলেন।

আমি তখন মন্ত্রী সিংহসেন ও তারককে নিয়ে রাজবাড়ীতে যাই ও পৌণ্ড্রের উরু হতে সেই ওষধি বার করে নেই। তখন সে রাজকন্যায় রূপান্তরিত হয়।

আমি তাই বলছিলাম, আমার অনুগ্রহে আপনি বিবাহিত হয়েছেন।

আমি তখন অংশুমন্তকে সম্মানিত করলাম ও ভাবতে লাগলাম মুনিদের বন্দনা করার জন্য বনের পশুরা যখন বিদ্যাধরযোনিতে উৎপন্ন হয় তাহলে মানুষ যদি তাদের বন্দনা নমস্কার করে তবে তাদের অভিষ্ট লাভের কোন বিঘ্ন থাকে না।

এরপর পৌণ্ড্রের সঙ্গে আমি সেখানে সুখে বাস করতে লাগলাম। কালে আমার মহাপুণ্ড্র নামে এক পুত্র হল।

একদিন যখন পৌণ্ড্রের সঙ্গে বিহার করে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে আমি শুয়েছিলাম তখন কার করুণ কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। হে সুখী, প্রিয়ার সঙ্গে সমাগত হয়ে এখন তুমি সুখে নিদ্রা যাচ্ছ।

সে কথা শুনে আমি উঠে পড়লাম। সামনেই দ্বারপালিকা কলহংসীকে দেখতে

পেলাম। তার হাতে একটা রত্নপেটিকা ছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে আমায় একটু দূরে নিয়ে গেল। তারপর বলল, দেব, দেবী শ্যামলী আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। আপনাকে মনে করে তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাজপরিবারের সকলে ভালো আছে ত? শ্যামলী ভাল আছে ত?

সে প্রত্যুত্তর দিল, দেব, শুনুন : দুষ্ট অঙ্গারক তার বিদ্যা হারিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে এল। আপনার আশীর্বাদে রাজা তাকে পরাজিত করতে সমর্থ হলেন ও কিন্নরগীত নগর অধিকার করে নিলেন। এখন দেবী রাজকীয় বৈভব পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আপনার দর্শনাভিলাষিণী হয়েছেন।

তার দুঃখ মোচন করা উচিত ভেবে কলহংসীকে আমি বললাম, আমাকে প্রিয়া শ্যামলীর কাছে নিয়ে চল।

সে তাতে আনন্দিত হয়ে আমাকে নিয়ে আকাশে উঠে পড়ল।

কিন্তু যখন আমি দেখলাম সে আমাকে বৈতাঢ্য পর্বতের দিকে না নিয়ে গিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, এ কখনই কলহংসী নয়, কলহংসীর ছদ্মবেশে আমায় অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি তখন আমার মুষ্টি দিয়ে তার কপালে আঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে অঙ্গারকে পরিবর্তিত হয়ে গেল। অঙ্গারক ভয় পেয়েছিল। তাই সে আমায় সেখানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি এক জলাশয়ে গিয়ে পড়লাম।

জলাশয় এত বৃহৎ ছিল যে তা আমার নদী বলেই মনে হল। আমি সেই নদী পার হয়ে কূলে এলাম। আমি যখন সেখানে বিশ্রাম করছিলাম তখন দূর হতে ভেসে আসা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলাম। ভাবলাম কোনো নগর তা হলে নিকটেই আছে।

পরদিন সকালে আমি সেই নগরে গেলাম ও একজনকে নগরের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে প্রত্যুত্তর দিল, ইলাবর্দ্ধন। কিন্তু তুমি কোথা হতে আসছ যে নগরের নাম জান না?

আমি বললাম, তা জেনে তোমার কি দরকার?

আমি তখন স্নান করে আমার অলঙ্কারগুলো গোপন করলাম। তারপর নগরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলাম। পুষ্পশোভিত বৃক্ষ ও হর্ম্যাবলীতে গঙ্গাতটবর্তী সেই নগরীকে আমার কুবেরের অলকা বলেই মনে হতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে আমি জন সমাকীর্ণ বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে নানা আকারের নানা বর্ণের চিত্রিত রথ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আনাগোনা করতে দেখলাম। তাদের কেউ দুকূল পরিধান করে ছিল ত কেউ চিনাংশুক। কারো গায়ে পীতবর্ণ বস্ত্র ছিল ত কারু গায়ে কুসুম্ভী। সকলের গায়ে নানা রঙের নানা ধরণের অলঙ্কার ছিল।

আমি এক শ্রেষ্ঠীর দোকানে গেলাম। তিনি লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আমায় বসতে বললেন। আমি বসে থাকতে থাকতেই দেখলাম তিনি এক কোটী টাকার বাণিজ্য করলেন। তারপর হাতজোড় করে তিনি আমায় বললেন, ভদ্র, আজ আপনি আমার ঘরেই আহারাদি করবেন। আমি রাজী হলাম। তখন তিনি আমাকে সেখানে বিশ্রাম করতে বলে তাঁর এক সুন্দরী দাসীকে তাঁর স্থানে বসিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

আমি দেখলাম, আমি যখনি কিছু তাকে জিজ্ঞেস করছি, প্রত্যুত্তর দেবার সময় প্রতিবারই সে তার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, আমার মুখ হতে লসুনের গন্ধ বার হয় তাই আমি সামনাসামনি হয়ে আপনার সঙ্গে কি করে কথা বলি।

আমি বললাম, তোমার মুখের গন্ধ আমি দূর করে দেব। এখন আমি যা যা ব'ল আমায় তা এনে দাও।

সে সেই সব দ্রব্য এনে দিলে আমি তাদের মিশ্রিত করে ঘী দিয়ে ছোট ছোট বড়ি করলাম ও সেগুলো তার মুখে ভরে দিলাম। তখন তার মুখ হতে পদ্মগন্ধ বার হতে লাগল।

ইতিমধ্যে সেই শ্রেষ্ঠী ফিরে এলেন ও আমায় তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি পরম আতিথেয়তার সঙ্গে আমায় স্নান ও আহারাদি করালেন। আমি তাঁর এরূপ করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, আমার নাম মনরথ। আমার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। আমার রত্নাবলী নামে এক কন্যা আছে। রত্নাবলীর যখন জন্ম হয় সেই সময় আমার দাসীরও এক কন্যা হয়। তার মুখ হতে লসুনের গন্ধ বার হত বলে তার নাম রাখি লসুনিকা। লসুনিকা আমার গৃহেই বড় হয়।

এক সময় ত্রিকালজ্ঞ মুনি শিবগুপ্ত এখানে আসেন। আমি সপরিবারে তাঁকে বন্দনা করতে যাই। তাঁর প্রবচন শেষ হলে তাঁকে লসুনিকার মুখের এই গন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করি। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—

পুরাকালে চক্রপুর নামে এক নগর ছিল। সেখানে রাজা পুষ্পকেতু রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল পুষ্পদন্তা। তিনি সুন্দরী ছিলেন। তাঁর এক পরিচারিকা ছিল যার নাম ছিল পণ্ডিতিকা।

দীর্ঘকাল পর পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে পুষ্পকেতু শ্রমণ দেবগুরুর নিকট শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাণী পুষ্পদন্তা ও পণ্ডিতিকা তাঁর অনুসরণ করেন।

পুষ্পকেতু দীর্ঘদিন শ্রমণ ধর্ম পালন করে মুক্তিপ্রাপ্ত হন কিন্তু পুষ্পদন্তা কুল, গোত্র, সৌন্দর্য ও রাজন্যতার গর্ব পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তিনি পণ্ডিতিকাকে এই বলে প্রায়ই ভৎ'সনা করতেন, 'নিজের কুলের কথা ভুলে গেছিস, দূরে হয়ে যা।

মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াস নে। আমার কাছে বসে আমার কথার প্রত্যুত্তর দিস নে। মুখ কাপড় দিয়ে ঢাক।'

পণ্ডিতিকা এভাবে অপমানিত হলেও ক্রুদ্ধ হত না। ভাবত তিনি সত্যি কথাই বলছেন। সে তাঁকে পূর্বের মত বন্দনা ও নমস্কার করত। এভাবে পণ্ডিতিকা তার নীচ গোত্রকর্ম নষ্ট করল ও উচ্চ গোত্রকর্ম অর্জন করে সুন্দর শরীর গন্ধ স্পর্শাদি গুণ অর্জন করল অপরপক্ষে পুষ্পদন্তা নীচ গোত্র কর্ম অর্জন করল ও দুর্গন্ধ মুখ নিয়ে জন্ম নেবার কর্ম বন্ধন করল। পণ্ডিতিকাই তোমার ঘরে রত্নাবলী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে আর পুষ্পদন্তা লসুনিকা হয়েছে। অর্দ্ধ ভরতের যিনি অধীশ্বর হবেন তাঁর পিতার সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ হবে।

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ভগবন্, তিনি এখন কোথায় আছেন ও কি করে আমরা তাঁকে জানব? তিনি বললেন, তোমার দোকানে তিনি পদার্পণ করা মাত্রই তুমি এক কোটি টাকা উপার্জন করবে। তিনি লসুনিকার মুখের দুর্গন্ধও দূর করে দেবেন।

সেই থেকে লসুনিকাকে আমি দোকানে রাখলাম। আপনি দোকানে পদার্পণ মাত্রই আমি এক কোটি টাকা উপার্জন করেছি। আপনি লসুনিকার মুখের দুর্গন্ধও দূর করে দিয়েছেন।

তারপর এক শুভদিনে শ্রেষ্ঠী রত্নাবলীর সঙ্গে আম'র বিবাহ দিলেন। আমিও তার সঙ্গে যৌবন সুখ ভোগ করে আনন্দে বাস করতে লাগলাম। তার মুখ ছিল পূর্ণ চন্দ্রবিম্বের মত, চন্দ্র কিরণের মত ছিল তার অনিন্দ্য রূপরাশি। কমলদল বিহারিণী শ্রীদেবীর মতোই তাকে আমার মনে হত।

বর্ষাকাল সমাগত হলে শ্রেষ্ঠী একদিন আমায় বললেন, ভদ্র ইন্দ্রের সম্মানার্থে মহাপুর নগরে ইন্দ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। যদি ইচ্ছে কর তবে সেখান হতে বেড়িয়ে আসি। আমি সম্মতি দিলাম।

আমরা তখন মহাপুর নগরে গেলাম। মহাপুরে প্রবেশের পূর্বে পথের দুধারে কতকগুলো শূন্য প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—

রাজা সোমদেবের সোমশ্রী নামে এক কন্যা আছে। সে অসাধারণ সুন্দরী। রাজা তার স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। হংসরথ, হেমাঙ্গদ, অতিকেতু, মাল্যবন্ত, প্রিয়ঙ্কর প্রভৃতি অনেক রাজন্যবর্গকে তিনি আহ্বান করেন। তাঁদের জন্য এই সব নিবাস স্থান তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সোমশ্রী কাউকেই পছন্দ করলেন না। সেই হতে সে মৌনাবলম্বন করে আছে। এই সব প্রাসাদ সেই হতে শূন্য পড়ে রয়েছে।

সেই শূন্য প্রাসাদ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে আমরা নগরে প্রবেশ করলাম ও উৎসব

দেখতে দেখতে ইন্দ্র স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রাজা সোমদেবের অন্তঃপুরিকারাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা রথ হতে নেমে ইন্দ্রস্থানের পরিক্রমা দিতে আরম্ভ করলেন। পরিক্রমা শেষ হলে তাঁরা রথে এসে বসলেন।

ঠিক সেই সময় আমরা লোকদের চীৎকার করতে ও চারিদিকে ছুটতে দেখলাম। কি ঘটেছে দেখবার জন্য আমরা সেদিকে গেলাম। দেখলাম এক মদোন্মত্ত হাতী মাহুতকে ফেলে দিয়ে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে পিষ্ট করতে করতে সেদিকে ছুটে আসছে। তাকে তখন কালান্তক যমের মতই মনে হচ্ছিল।

খানিক বাদেই সেই হাতী রাজান্তঃপুরিকাদের রথ বিনষ্ট করতে আরম্ভ করল। সারথীরা মেয়েদের রক্ষা করবার চেষ্টা করল কিন্তু ওরি মধ্যে সে একটি মেয়েকে শুঁড় দিয়ে তুলে মাটীতে ফেলে দিল। সে 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও' বলে চীৎকার করতে লাগল। আমি তাকে দেখতে পেয়ে সেদিকে ছুটে গেলাম ও হাতী সারথিকে মেরে মেয়েটী পর্যন্ত যাবার আগেই হাতীর পীঠে মুষ্ট্যাঘাত করলাম। সে তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার দিকে ঘুরল। আমিও দ্রুত গতিতে ঘুরে নানাভাবে তাকে আঘাত করতে করতে ক্লান্ত করে ফেললাম ও শেষে তার পুচ্ছ ধরে তাকে ঘোরাতে লাগলাম। তাই দেখে লোকে আমার প্রশংসা করতে লাগল। রাজান্তঃপুরের মহিলারা ও তাঁদের পরিচারিকারা 'ভগবান তোমায় রক্ষা করুন, তুমি জয়ী হও' বলে আমার ওপর ফুল, সুগন্ধিত চূর্ণ নিক্ষেপ করতে লাগল। হাতীটি নিস্তেজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, আমি মেয়েটীর কাছে গেলাম। তাকে আমার কমল কলিকার মত কমনীয় মনে হচ্ছিল। আমি তাকে দুহাতে তুলে ধরলাম ও সামনের ঘরের নীচের প্রকোষ্ঠে নিয়ে এলাম। তাকে কোল হতে নামিয়ে দিয়ে বললাম, আর ভয় নেই। হাতী আর তোমার কিছুই করতে পারবে না।

মেয়েটী আশ্বস্ত হয়ে মূর্চ্ছাভাব কাটিয়ে উঠে বসল ও আমার পায়ে পতিত হয়ে বলল, ভদ্র, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এই বলে সে আমায় আলিঙ্গন করল ও আমার উত্তরীয় নিয়ে নিজের উত্তরীয়খানি আমায় দিল। সে তার হাতের আঙ্‌টিও আমায় দিল।

এর মধ্যে রাজানুচরেরা সেখানে এসে উপস্থিত হল ও তাকে প্রাসাদে নিয়ে গেল।

সেই গৃহের যিনি কর্তা তিনি ওপর হতে নেমে এলেন ও আমায় সেখানেই বিশ্রাম করতে বললেন। এর মধ্যে আমার জন্য সেখানে রথ এসে উপস্থিত হল। সেই রথে আমি উঠে বসলাম।

আমি যখন রথে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন লোকে আমার প্রশংসা করছিল—এমন লোক হয় না। শরৎচন্দ্রের মত রূপ আদি আদি। সেই রথ আমাকে আমার শ্বশুরের কাকা শ্রেষ্ঠী কুবের দত্তের ঘরে নিয়ে গেল।

আমি যখন তাঁর আলয়ে প্রবেশ করলাম তখন দরজার কাছে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা দ্বাররক্ষিকাকে দেখতে পেলাম। তাকে আমার গৃহদেবীর মত মনে হচ্ছিল। সে স্বর্ণযষ্টি দিয়ে উৎসুক জনতার ভীড় নিয়ন্ত্রিত করছিল।

আহারাদির পর আমি যখন বিশ্রাম করছি তখন সেই দ্বাররক্ষিকা আমার নিকট এল ও আমায় বলল—দেব, এদেশের রাজার নাম সোমদেব, রাণীর নাম সোমচন্দ্রা। সোমশ্রী নামে তাঁদের এক মেয়ে আছে। রাজা সোমদেব সোমশ্রীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। সেই স্বয়ম্বরে বহু উচ্চবংশীয় রাজন্যরা আসেন। স্বয়ম্বরের আগের দিন সোমশ্রী যখন সখিদের সঙ্গে অলিন্দে বসেছিল তখন সে মুনি সর্বাণুর কেবল জ্ঞান প্রাপ্তিতে দেবতাদের আকাশ হতে অবতরণ করতে দেখে ও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। অনেকক্ষণ পর অবশ্য তার সংজ্ঞা ফিরে আসে কিন্তু সে মৌন ধারণ করে। নানাবিধ মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগেও যখন তাকে কেউ কথা বলাতে পারল না তখন রাজন্যরা একে একে দেশে ফিরে গেল। সোমশ্রীর যা কিছু বলবার থাকত তা সে কাগজে লিখে দিত।

একদিন নির্জনে আমি সোমশ্রীকে বললাম, আমি তোর মায়ের মত। তোর মৌনের অবশ্যই কোনো কারণ আছে। তাই সমস্ত কথা আমায় বলতে পারিস।

সে তখন একটু হাসল ও আমায় বলল, হাঁ, অবশ্যই তার কারণ আছে। আমি তা তোমাকে বলছি কিন্তু একথা আমার সম্মতি ছাড়া তুমি আর কাউকে বলবে না। এই বলে সে বলল—

পূর্বজন্মে আমি কণকচিত্রা দেবীরূপে সৌধর্ম দেবলোকে জন্মগ্রহণ করি ও মহশুক্র দেবলোকের সামাণিক দেবের রাণী হই। তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে আমার দিন ব্যতীত হতে থাকে।

মুনি সুব্রতের জন্মাভিষেক উপলক্ষ্যে আমি পতির সঙ্গে মর্ত্যলোকে আসি। তারপর অর্হৎ দৃঢ়ধর্মের কেবলজ্ঞান উৎসবে যোগ দিয়ে আমরা যখন ফিরে যাচ্ছি তখন ব্রহ্মলোক দেবলোকে যেতে না যেতে আমার পতি রামধনুর রঙের মত মিলিয়ে গেলেন। ফলে দিক সকল অন্ধকার হয়ে গেল ও আমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হল।

ভালবাসার জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা অবধারণ না করে তিনি কোথায় গেলেন খুঁজবার জন্য আমি নীচে অবতরণ করতে লাগলাম ও মর্ত্যলোকে নেমে এলাম। সেখানে এক জিন মন্দিরে দুজন চারণ মুনির সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি তাঁদের আমার পতি কোথায় গেছেন, জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা বললেন, দেবী তোমার স্বামী দীর্ঘদিন স্বর্গসুখ ভোগ করে স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তুমিও শীঘ্রই রাজবংশে মহাপুরে সোমদেবের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। সেখানে তোমার পতির সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি এক বন্য হাতীর সম্মুখে পতিত হবে। তার হাত

হতে যিনি তোমার জীবন রক্ষা করবেন তিনিই তোমার পতি হবেন। সেকথা শুনে আমি আমার বিমানে ফিরে গেলাম। এর কিছুকাল পরে আমি স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সোমশ্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম। সেদিন যখন কেবলজ্ঞান উৎসবে দেব বিমানদের নামতে দেখলাম তখন আমার পূর্বস্মৃতি ফিরে এল ও আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন আমার জ্ঞান হল তখন মনে হল স্বয়ম্বরে উপস্থিত হওয়া আর আমার উচিত হয় না। তাই আমি মৌন ধারণ করে রইলাম।

আজ সকালে যে ঘটনা ঘটল তাতে আমি চারণমুনির ভবিষ্যৎবাণী সত্য হতে দেখলাম। সে আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে প্রাসাদে ফিরে এলে আমি তাকে 'তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক' বলে রাণীকে সমস্ত কথা বলতে গেলাম। সেখানে রাজাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমস্ত শুনে বললেন, সোমশ্রীকে জীবন দান করার জন্য এখন তার ওপর একমাত্র ওঁরই অধিকার। আগামী কাল সোমশ্রীর সঙ্গে ওঁর বিবাহ দেব। এই বলে তিনি সমস্ত কথা আপনাকে জানাবার জন্য আমায় প্রেরণ করলেন। যেহেতু আপনি রাজকন্যার প্রিয় তাই আমি এখানে এসেছি।

এর খানিক বাদেই রাজপ্রাসাদ হতে আমার জন্য বস্ত্রালঙ্কারাদি নিয়ে লোক এল। রাজা ব্যক্তিগতভাবে আমার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন।

পরদিন সকালে মন্ত্রী ও সভাসদেরা এসে আমায় রাজভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে সোমশ্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ হল। রাজা আমায় অপরিমিত যৌতুক দিলেন। আমিও সোমশ্রীর সঙ্গে সহবাসের আনন্দ উপভোগ করে আনন্দে দিন ব্যতীত করতে লাগলাম। পূর্ব প্রণয়ের জন্য সোমশ্রীও আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং আমিও কামদেব যেমন রতির প্রতি তেমনি তার প্রতি স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলাম।

একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই হঠাৎ দেখি সোমশ্রী আমার পাশে শুয়ে নেই। ভাবলাম আমায় না বলে সে কোথায় যেতে পারে? হয়ত কোনো কাজে গিয়ে থাকবে। তাই পরিচারিকাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না।

তখন তাকে সবখানে খোঁজা হল। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। ভাবলাম সে হয়ত রাগ করে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। এই সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে সেই রাত্রি কোনো মতে ব্যতীত করলাম।

পরদিন সকালে রাজা ও রাণীকে সেকথা জানান হল। তাঁরাও সবখানে তাকে খুঁজলেন। কিন্তু সোমশ্রীর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। তখন রাজা বললেন, হয়ত কোনো বিদ্যাধর তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে থাকবে। আমারও ঐ রকম মনে হচ্ছিল। কারণ রাগ করে সে এতক্ষণ আমার নিকট হতে দূরে থাকত না। আমার মুহূর্তের অদর্শন যার কাছে বিচ্ছেদের মত সে স্বাধীন হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই

ফিরে আসত। কোন মন্দ বুদ্ধি তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে ও তার চরিত্র অবগত না হয়ে তাকে নিশ্চয়ই অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও, প্রাসাদে, উপবনে, বান্ধবীদের গৃহে আমি তার অনুসন্ধান করলাম কিন্তু সব নিরর্থক হল। আমি তখন সাশ্রু নয়নে কুঞ্জে, লতা-বিতানে যেখানে তার সঙ্গে ক্রীড়া করেছি সেখানে গিয়ে তার নাম ধরে কত ডাকলাম, বললাম, কেন তুমি রাগ করে আছ, তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমায় আর দুঃখ দিও না—তুমি ফিরে এস। সে ফিরে এল না। আমি ওই ভাবে বনে বনে ঘুরতে লাগলাম।

আমার সেই অবস্থা দেখে তার সখীরা চোখের জল ফেলল ও মধুর কথা বলে আমার মনকে প্রবোধ দিতে লাগল ও মুহূর্তের জন্যও আমায় পরিত্যাগ করে গেল না। কিন্তু আমার সমস্ত মন জুড়ে তখন সোমশ্রী অধিষ্ঠান করছিল তাই নৃত্য-গীতাদিতে ত দূর, আহারেও আমার রুচি ছিল না।

আমায় আহার পরিত্যাগ করতে দেখে রাজা ও রাণীও আহার পরিত্যাগ করলেন। গৃহ শূন্য বলে মনে হতে লাগল। রাত্রেও আমার ঘুম হল না। তার কথা ভাবতে ভাবতে আমি এমন তন্ময় হয়ে যেতে লাগলাম যে তাকে সহসা আমার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখলাম। যদিও তা ভ্রম মাত্রই ছিল।

এ ভাবে দু দিন ব্যতীত হয়ে গেল। তৃতীয় দিনও ব্যতিক্রান্ত হতে চলল। সহসা ভাবলাম যে অশোক বনে একত্রে আমরা ক্রীড়া করেছি সেই অশোক বনে গেলে হয়ত কথঞ্চিত আমি শান্তি পাব। আমি তখন অশোক বনে গেলাম। কী আশ্চর্য! আমি সেখানে সোমশ্রীকে দেখতে পেলাম। আমি তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তার নিকটে গেলাম ও বললাম, সুতনুকে, তুমি অকারণে আমার উপর কেন রাগ করেছ? তোমার বিরহে আমি মরণাপন্ন হয়েছিলাম। দয়া করে এখন তোমার কোপ পরিত্যাগ কর।

সে প্রত্যুত্তর দিল, আর্যপুত্র, আমি ত তোমার উপর রাগ করিনি। শোন, কেন আমি কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছিলাম তার কারণ বলছি—

এক সময় আমি এক ব্রত গ্রহণ করব বলে সংকল্প করেছিলাম। সেই ব্রতের সময় মৌনাবলম্বন করে থাকবার কথা এমন কি নিতান্ত আপন জনের সঙ্গে কথা বলার নিষেধ ছিল। তোমার আশীর্বাদে সেই ব্রত পালনে আমি সমর্থ হয়েছি। সেই ব্রতের সময় পূর্ণ সংযম পালন করবার ছিল তাই একে অন্যথা বলে মনে করো না।

আমি বললাম, প্রিয়ে এতে, তোমার কোনও দোষ নেই। এখন বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

সে বলল, এই ব্রতের নিয়ম এই যে বিবাহের সমস্ত কার্যক্রম এরপর আবার করতে হয়। নইলে ব্রত অপূর্ণ থাকে।

আমি বললাম, তুমি যা আদেশ করবে তাই হবে।

সেই সুসংবাদ প্রাসাদে দেওয়া হল যে সোমশ্রীকে পাওয়া গেছে।

তারপর চতুরঙ্গ খেলা হল ও দূর্বা, কুশ, শর্ষপ আদি আনা হল। সে অগ্নিতে হবি নিক্ষেপ করল ও জলপূর্ণ কুম্ভ চারদিকে স্থাপিত করল। সখীরা মাঙ্গলিক গীত গাইল। তারপর সে কুম্ভপূর্ণ বারি দিয়ে নিজে স্নান করল ও আমায় স্নান করাল। তারপর দেবতাদের উদ্দেশ করে সে বলল, হে দিকাধিপতি সোম, যম, বরুণ ও বৈশ্রমণ, শ্রবণ করুন, হে দেবগণ শ্রবণ করুন, হে পুরবাসী শ্রবণ করুন আজ হতে আমি ওর বিবাহিতা পত্নী। আজ হতে আমার জীবনের ওপর ওর সম্পূর্ণ অধিকার। তারপর বর ও বধূ বেশে সজ্জিত হয়ে আমি ওর পাণি গ্রহণ করলাম ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করলাম। তারপর গৃহে প্রবেশ করলাম। সে পরিচারিকাদের মোদক, সোমরস পুষ্পমাল্য চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য আনতে বলল। পরিচারিকারা তা অবিলম্বে নিয়ে এল। শয়নগৃহের দ্বার বন্ধ করে সে সেখানে শ্বেত কুসুমময়ী এক দেবী স্থাপিত করল ও তাঁর উপাসনা করল। উপাসনা অন্তে সে সেই মোদক আমায় খেতে বলল। সেই মোদক আমি খেলাম। খেয়ে মনে হল আমার সমস্ত শরীরে যেন প্রাণের সঞ্চার হল।

তখন সে সোমরস পূর্ণ রত্ন পাত্র আমার সামনে তুলে ধরল ও তা পান করতে বলল। আমি বললাম, আমি মদিরা পান করি না কারণ গুরুজন তা পান করতে নিষেধ করেন।

প্রত্যুত্তরে সে বলল, এ দেবতার প্রসাদী। তাই গুরুজনদের আদেশ অমান্য করা হবে না। এই সোমরস পান কর, অন্যথা করো না ও আমার ব্রত পূর্ণ করতে সাহায্য কর।

তার কথা রক্ষা করার জন্য আমি সেই সোমরস পান করলাম। তা অগ্নিপ্রবাহের মত আমার সমস্ত শিরা উপাশিরায় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। আমি তখন তাকে তুলে বিছানায় নিয়ে গেলাম। সহবাস অন্তে সে তার বস্ত্রাদি পরিবর্তন করল। আমার তখন ঘুম পাচ্ছিল, আমি তাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

এভাবে কয়েকদিন আনন্দে তার সঙ্গে ব্যতীত হল। একদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যেতে মণিদীপের আলোকে তাকে দেখলাম। কিন্তু সে সোমশ্রী ছিল না অন্য আর একজন। আমি তখন ভাবতে লাগলাম এ কে হতে পারে? একি কোনো দেবী? কিন্তু এর চোখ নিমেষহীন নয়। তা হলে দেবী নয়। তবে কি ও পিশাচী যে আমায় ছলনা করতে এসেছে। কিন্তু তাও নয় কারণ পিশাচীরা ক্রুর প্রকৃতির হয়ে থাকে

ও ভয়ঙ্করী। তাছাড়া পিশাচদের দেহ অনেক বড় হয়। তবে কি ও কোন পুরস্ত্রী যে আমার প্রিয়াকে অপসারিত করে নিজেকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে।

আমি তখন তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে লাগলাম। সে তখন ঘুমোচ্ছিল। তার ঘুমন্ত মুখ পদ্মফুলের মত ফুটেছিল। তার ঘন কালো চুল মসৃণ ও কুসুম দামে সজ্জিত ছিল। তার কপাল প্রভাতের মত উজ্জল ও মনোহারী ছিল, ভ্রূযুগল দীর্ঘ ও সম্বদ্ধ। চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত ছিল ও নাসিকা উন্নত ও বক্র। কপোল ছিল মাংসল ও গোলাকার। ওষ্ঠ বিম্বফলের মত রক্তিম ও রসপূর্ণ। এরূপ স্ত্রী কখনই স্বেচ্ছাচারিণী হতে পারে না। তবে ও কে?

এসব চিন্তা করতে করতে আমি তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তার পায়ের তলায় উর্দ্ধ রেখা ও শুভচিহ্ন দেখতে পেলাম। আমি তখন নিঃসন্দেহ হলাম যে এ কোনো রাজকন্যা। এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দরী কখনো দুষ্টা হতে পারে না।

সহসা তার ঘুম ভেঙে গেল ও আমাকে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল, প্রিয়! এত করে তুমি আমায় কি দেখছ—তারপর সহসা কি স্মরণ হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ও কুম্ভপূর্ণ বারি নিজের ওপর নিক্ষেপ করল। সেই জল কোথায় গেল জানতে পারলাম না এবং তার শরীরেও এক ফোঁটা জলও লেগে রইল না।

সে তখন হাত জোড় করে বলল, প্রিয়, তোমাকে সমস্ত কথা বলছি শোন: বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণ ভাগে সুবর্ণাভ বলে এক নগরী আছে। সেখানে চিত্তবেগ নামে বিদ্যাধর রাজ রাজত্ব করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম অঙ্গারবতী। চিত্তবেগের ঔরসে অঙ্গারবতীর গর্ভে এক পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। পুত্রের নাম মানসবেগ ও কন্যার নাম বেগবতী। সেই কন্যাই আমি।

পিতা সংসার বিরক্ত হয়ে মানসবেগকে সিংহাসন দান করে রাজ্যের একাংশ আমায় দিয়ে বয়োবৃদ্ধদের বললেন, বেগবতীকে আপনারা দেখবেন। ওর ভাই যদি ওকে বিদ্যা শিক্ষা না দেয় তবে আপনারা ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। এই বলে তিনি তাপস সংঘে যোগ দিলেন।

আমি ক্রমে বড় হলাম কিন্তু মানসবেগ আমায় বিদ্যা শিক্ষা দিলনা। তখন বয়োবৃদ্ধরা আমায় পিতার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আমায় বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। আমি বিদ্যা লাভ করে মায়ের কাছে ফিরে এলাম।

একসময় মানসবেগ মর্ত্যবাসিনী এক রমণীকে তুলে নিয়ে আসে এ নিজের প্রমোদ বনে আবদ্ধ করে রাখে। আর্যপুত্র, নাগাধিরাজের এই নির্দেশ আছে যদি কোনো বিদ্যাধর জৈন সাধু, জিন মন্দির, দম্পতির অবমাননা করে বা অনিচ্ছাসত্বে

অন্যের স্ত্রীকে উপভোগ করে তবে সে বিদ্যা হতে বঞ্চিত হবে। এইজন্য সে তাকে নিজের শয়ন মন্দিরে না নিয়ে গিয়ে আমাকে বলে, বেগবতী, তুমি ওই মর্ত্যবাসিনীকে বোঝাও যে সে যেন আমার সঙ্গে প্রেম করে।

এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি তার কাছে যাই ও তাকে চিন্তামগ্না দেখি। তাকে প্রবোধ দিয়ে আমি বলি, সুন্দরী, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, নিজের পুণ্যবলে জীব যেমন স্বর্গে যায় তেমনি তোমার পুণ্যবলে তুমি বিদ্যাধর লোকে আনীতা হয়েছ। আমি বিদ্যাধর রাজ মানসবেগের বোন বেগবতী। বিদ্যাধর লোকে মানসবেগের খ্যাতি সর্বত্র। সে উত্তম কুল জাত ও রূপবান। মর্ত্যবাসী স্বামীর কথা তাই ভুলে যাও। মর্ত্যলোকেও নীচকুলজাতীয়া স্ত্রীর প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তবে লোকে তাকেও সম্মান দেয়। তুমিও সেইরূপ বিদ্যাধর লোকে সম্মান প্রাপ্ত হবে। তাই ওসব চিন্তা পরিত্যাগ কর ও বিদ্যাধরলোকে যৌবন সুখ ভোগ কর।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 1 Sraman May 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73
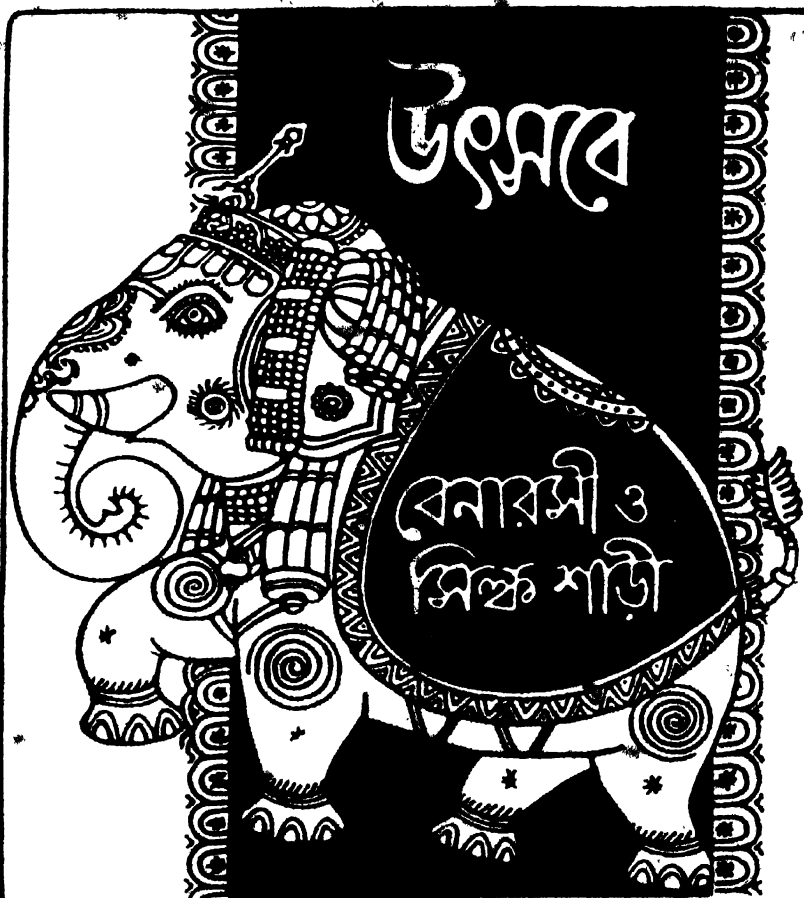
শ্রমণ

জৈন ভবন

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদ

ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদ

ডঃ জ্যোতিপ্রসাদ জৈন

১৮৫৭র স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হতে ১৯৪৭র স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৯০ বছরকে দেশের পক্ষে এক অদ্ভুত জাগৃতি, বিকাশ ও প্রগতির যুগ বলা যায় যে সময়ে জনজীবন সম্বন্ধিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলন, অভিযান, ক্রান্তি ও পরিবর্তন দেশ ও সমাজের আদল সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে মধ্যযুগ কালীন অবস্থা হতে তাকে আধুনিক যুগে স্থাপিত করে। ভারতীয় জৈন সমাজ ভারতীয় জনতারই অঙ্গ। তাই দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় চেতনা ও বিচারক্রান্তি হতে তারাও নিজেদের দূরে রাখতে পারেনি, পারেও না। তবু ধার্মিক ও সমাজ জীবনে সেই বিচার ক্রান্তির প্রতিক্রিয়া তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংগঠনের অনুরূপ হয়েছে। এই ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে জাগৃতি ও উন্নয়নের প্রস্তোতা, পুরস্কর্তা, সমর্থক ও কার্যকর্তা এই সমাজ হতেই উদ্ভূত হয়েছেন। জৈন জাগৃতির এই অগ্রদূতদের প্রথম পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের আজ আর কেউ জীবিত নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতারাও নিঃশেষিত প্রায়। তৃতীয় পর্যায়ের নেতাদের দু'চার জন বেঁচে রয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যেও না আছে সেই উৎসাহ ও নিষ্ঠা, না সেই কর্মক্ষমতা।

জৈন ধর্মভূষণ, ধর্ম দিবাকর, সন্তপ্রবর ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদ সমাজব্যাপী জাগৃতি ও উন্নয়নের প্রস্তোতা ও পুরস্কর্তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ও সম্ভবতঃ তৃতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যের যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন। ঠিক এইভাবে তিনি প্রাচীনপন্থী, যাঁরা পরিবর্তন চাইতেন না, ও প্রগতিবাদী ও সংস্কার পন্থীদের, পণ্ডিত বর্গ ও বাবুদের, সাধু ও শ্রাবকদের মধ্যেরও যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের জন্ম হয়। ১৮৯৬খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮বছর তখন তিনি সমাজ সংস্কারক রূপে অবতীর্ণ হন। সেই সময় তাঁর লিখিত জাগৃতি মূলক এক প্রবন্ধ জৈন গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৭ বছর বয়সে তিনি ঘর সংসার পরিত্যাগ করেন এবং ৩২ বছর বয়স হতে না হতে তিনি এক জৈন পরিব্রাজকে রূপান্তরিত হয়ে যান। তখনো প্রথম পর্যায়ের জৈন নেতৃবৃন্দ বর্তমান ছিলেন। তাই ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদের শিক্ষানবিশীর কাজ তাঁদের সান্নিধ্যে হয়. কিন্তু তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ সেবাভাবের জন্য শীঘ্রই সে সব নেতৃবৃন্দের স্থান তিনি অধিকার করে নেন। ১৯১০ হতে ১৯৪০ পর্যন্ত তাই

সামাজিক প্রগতি ও উন্নয়নের এখন কোন ক্ষেত্র নেই যা ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের প্রভাব হতে মুক্ত। কি বালক কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ কি নারী সকলকে তিনি প্রভাবিত করেছেন। সীমান্ত প্রদেশ হতে কন্যাকুমারী ও গুজরাট-মহারাষ্ট্র হতে আসাম-বঙ্গ তিনি পরিমভ্রণ করেছেন। শুধু তাই নয় দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ও পূর্বে বর্মা দেশেও তিনি গিয়েছেন। চাতুর্মাস্যের চারমাসই তিনি কোন এক স্থানে অবস্থান করতেন বাকি আটমাস পর্যটন। বহুমুখী সমাজ সংস্কার ও সম্যক ধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচার; বৃদ্ধ বিবাহ, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও শ্রাদ্ধভোজ নিরোধ; আন্তর্জাতীয় বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রচলন; পাঠশালা, গুরুকুল, সংস্কৃত বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, পুস্তকালয় ও পাঠাগার, বাল ও বনিতাশ্রম প্রতিষ্ঠা, পত্রপত্রিকার সম্পাদন, অগণিত প্রবন্ধ ও ছোট বড় এক'শর ওপর পুস্তক প্রণয়ন, নূতন লেখক ও কার্যকর্তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দানে কার্যক্ষেত্রে নিয়ে আসা, অনুন্নত ও গ্রৌণত্ব প্রাপ্তদের নূতন জীবন প্রদান (যেমন তারণপন্থী ও সরাকদের উন্নয়ন), খাদির প্রচার ও জৈন সমাজে রাষ্ট্রীয় চেতনার সংচার ছিল ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের জীবনের অভিন্ন অঙ্গ। তিনি নিজে শুদ্ধ খাদি পরিধান করতেন ও নগরে গ্রামে যেখানে যেতেন সকলকে খাদি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতেন। অনেক জৈন মন্দিরে বহুমূল্য মখমল ও রেশমের পর্দা, চাঁদোয়া, পুঁথি বেঁধে রাখবার কাপড়ের জায়গায় তিনি খাদির প্রচলন করান। অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের প্রায় সবগুলিতেই তিনি উপস্থিত থাকতেন। যেখানে যেতেন সেখানে সার্বজনিক সভায় ভাষণ দিতেন যাতে জৈন অজৈন সকলেই তাঁর বিচারধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তাঁর ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার কোনো গন্ধ থাকত না। তিনি জীবনকে ধর্ম ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে, সহজ ও সরল হতে বলতেন ও অহিংসা ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন।

ব্রহ্মচারীজী, দেহ ভোগে বিরক্ত গৃহত্যাগী ব্রতী ছিলেন। জৈন পারিভাষিক অর্থে হয়ত তিনি সাধু বা মুনি ছিলেন না কিন্তু জনসাধারণ তাঁকে সত্যিকারের জৈন সাধুরূপে আদর ও ভক্তি করত। তিনিও ব্রতীর চর্যা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতেন। জৈন ধর্ম ও জৈন শাস্ত্রের উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল কিন্তু তাই বলে তিনি অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কখনো অবমাননা করেন নি। সমস্ত ধর্মের মূল তত্ত্ব জানবার ও সমভাব রক্ষার জন্য তিনি বৌদ্ধাদি অন্য ধর্মেরও তুলনাত্মক অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু যাঁরা পরিবর্তন চাইতেন না তাঁরা প্রায়ই সবসময় তাঁর বিরোধ করেছেন। তাঁর কাজে বাধা দিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন ও তাঁকে সমাজ হতে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদকে কোনো কিছুই ক্ষুব্ধ বা বিচলিত করতে পারেনি।

ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের মান সম্মানের প্রতি এতটুকু মোহ ছিল না। সামাজিক অভিনন্দন, মানপত্র, উপাধি আদি হতে তিনি নিজেকে সর্বদা বাঁচিয়ে চলতেন। নিজের জন্য তিনি কখনো কারু কাছে কিছু চাননি, না প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে নিজের স্বজন বা পরিজনের জন্য। নিজের নামে তিনি কোন সংস্থা স্থাপিত করেন নি। তাঁর অনুরাগীদের অনেকে তা চাইলেও তিনি তা হতে দেন নি। সেকালের প্রায় সমস্ত ধনী পরিবারের সঙ্গে ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল কিন্তু তিনি কখনো তাঁদের খোসামদ করেন নি না তাঁদের প্রশস্তি গান। তাঁদের প্রভাবে নিজের মতেরো কখনো পরিবর্তন করেন নি। তবুও তাঁদের সহজ আদর তিনি লাভ করেছেন। বম্বাইর সেঠ মাণিক চাঁদ ঝবেরী ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত। সর সেঠ হুকম চাঁদ, সেঠ লালচাঁদ সেঠী আদি ছিলেন তাঁর অনুরাগীদের অন্যতম।

ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের মত মিশনারী উৎসাহী জৈন সমাজের মধ্যে আর কেউই হন নি। তিনি বর্মা ও শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন সেকথা বলেছি। ধর্ম প্রচারার্থ য়ুরোপ ও আমেরিকায় যাবারও তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা সফল হতে হতেও হয়নি। বিদেশে ধর্মপ্রচারের ক্ষমতা তাঁর স্বভাবতঃই সীমিত ছিল কিন্তু উৎসাহ ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তিনি নিজে না যেতে পারলেও ব্যারিষ্টার জুগমন্দর লাল জৈনী ও চম্পতরায় জৈন যে ইংল্যাণ্ডে ধর্মপ্রচারার্থে গিয়েছিলেন তা তাঁরই প্রচেষ্টায়।

সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নিঃস্বার্থ সেবক তৈরী করতে ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের মত একালে আর কাউকে দেখা যায়নি। সেঠ মাণিক চাঁদ ঝবেরীর সমস্ত জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক কাজের প্রেরণাদাতা ও সহযোগী ছিলেন তিনিই। তা ছাড়া জজ জুগমন্দর লাল জৈনী, ব্যারিষ্টার চম্পত রায়, বাবু দেবকুমার, কুমার দেবেন্দ্র প্রসাদ, উকিল অজিত প্রসাদ, উকিল রতনলাল, কামতাপ্রসাদ জৈন, মাষ্টার উগ্রসেন আদি যে সমাজ ও সাহিত্য সেবার কাজে ব্রতী হয়ে ছিলেন তার মুখ্য কৃতিত্ব ছিল ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদেররই। কাপড়িয়ার 'জৈন মিত্র' কাগজের তিনিই ছিলেন স্তম্ভ স্বরূপ।

১৯৪০ সালে ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদ কম্প বায়ু রোগে আক্রান্ত হন ও তদবধি লক্ষ্ণৌর অজিতাশ্রমে নিবাস করতে থাকেন। সেই খানেই ১৯৪২-র ১০ ফেব্রুয়ারী তিনি মরদেহ পরিত্যাগ করেন। যে সাহস, ধৈর্য ও সমভাব নিয়ে তিনি রোগ জনিত যন্ত্রণা সহ্য করেন তা বর্ণনাতীত। জৈন সমাজ তাদের এই বীর ও নিঃস্বার্থ সেবকের কথা আজ প্রায় বিস্মৃত।

ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদের সাহিত্য

[ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদ লিখিত, সম্পাদিত বা অনূদিত গ্রন্থের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে। , পৃষ্ঠ সংখ্যা ১৬০০০ এরও আধক। কর্মব্যস্ত পর্যটক জীবনে এই পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি সত্যিই আশ্চর্য জনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সাহিত্য আজ আর সুলভ নয়। এর পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন।

এই সংকলন করেছেন শ্রীবংশীধর শাস্ত্রী]

হিন্দী

আধ্যাত্মিক		পৃঃ সংখ্যা
১।	অধ্যাত্মজ্ঞান	১২৮
২।	অনুভবানন্দ	১২৮
৩।	আত্মধ্যান কা উপায়	৫৬
৪।	আত্মধর্ম	১৫৬
৫।	আধ্যাত্মিক সোপান	৩২৫
৬।	আত্মানন্দকা সোপান	২০
৭।	তত্ত্বমালা	১০৪
৮।	নিশ্চয়ধর্মকা মনন	৩৯৭
৯।	মোক্ষমার্গ প্রকাশক দ্বিতীয় ভাগ	৩৪৪
১০।	স্বতন্ত্রতা কা সোপান	৪১৫
১১।	সহজ সুখ সাধন	৩৯২
১২।	সহজানন্দ সোপান	২৭৪
		২৭৩৯

বিবিধ		
১।	গৃহস্থ ধর্ম	৩১৪
২।	দীপমালিকা বিধান	২৪
৩।	প্রতিষ্ঠা সার সংগ্রহ	২২৩
৪।	মানবধর্ম	১৬৮
৫।	বিদ্যার্থী জৈন ধর্ম শিক্ষা	২১৬
		৯৪৫

মৌলিক		
১।	জৈন ধর্ম প্রকাশ	২৬৫
২।	জৈন ধর্মমে অহিংসা	১০৩

		পৃঃ সংখ্যা
৩ ।	মদ্রাজ, মৈসুর প্রান্তকে জৈন স্মারক	৩৩৪
৪ ।	মধ্যপ্রান্ত, মধ্য ভারত ঔর রাজপুতানাকে স্মারক	২০৪
৫ ।	সংযুক্ত প্রান্তকে প্রাচীন জৈন স্মারক	১১১
		১০১২

টীকা, অনুবাদ বা সম্পাদন

		মূল লেখক	
১ ।	আধ্যাত্মিক চৌবীস ঠাণা	তারণ স্বামী	১২৪
২ ।	ইষ্টোপদেশ	পূজ্যপাদ স্বামী	২৫৬
৩ ।	উপদেশ শুদ্ধসার	তারণ তরণ স্বামী	৩২০
৪ ।	ছঃ ঢালা	দৌলতরামজী	৫৮
৫ ।	জিনেন্দ্রমত দর্পণ ১ম ভাগ	বাবু বনারসীদাস	৩২
৬ ।	জম্বুস্বামী চরিত্র	পাণ্ডে রায়মল্ল	২১৩
৭ ।	তত্বভাবনা (বৃহৎ সামায়িকপাঠ)	অমিতগতি	৩৪৪
৮ ।	তত্বসার টীকা	দেবসেনাচার্য	১৬২
৯ ।	নিয়মসার	কুন্দকুন্দাচার্য	২২৩
১০ ।	পঞ্চাস্তিকায় ১ম ভাগ	"	৪২৪
১১ ।	পঞ্চাস্তিকায় ২য় ভাগ	"	২৪৫
১২ ।	প্রবচনসার ১ম খণ্ড	"	৩৭৩
১৩ ।	প্রবচনসার ২য় খণ্ড	"	৩৯৬
১৪ ।	প্রবচনসার ৩য় খণ্ড	"	৩৬২
১৫ ।	পরমার্থ বচনিকা	বনারসীদাস	৭৬
১৬ ।	মমলপাহুড় ১ম ভাগ	তারণস্বামী	৪২০
১৭ ।	মমল পাহুড় ২য় ভাগ	"	৪৫০
১৮ ।	মমল পাহুড় ৩য় ভাগ	"	৩২৮
১৯ ।	যোগসার	যোগেন্দ্রদেব	৬৪
২০ ।	বৃহজ্জৈন শব্দার্ণব	বিহারীলাল	৩৯১
২১ ।	বৃহৎস্বয়ম্ভূস্তোত্র	সমন্তভদ্রাচার্য	৬১৬
২২ ।	সমাধি শতক	পূজন্যপাদাচার্য	১৭৫
২৩ ।	সামায়িক পাঠ	অমিতগতি	২৪
২৪ ।	সময়সার	কুন্দকুন্দাচার্য	৩৪২

		মূল লেখক	পৃঃ সংখ্যা
২৫ ।	সময়সার কলশ	অমৃতচন্দ্রাচার্য, পাণ্ডে রাজমল্ল	৩৬৬
২৬ ।	স্বসমরানন্দ	,,	৮১
২৭ ।	সার সমুচ্চয় সার	কুলভদ্রাচার্য	২০২
২৮ ।	ত্রিভঙ্গী সার	তারণ তরণ স্বামী	১৩৫
২৯ ।	জ্ঞান সমুচ্চয় সার	,,	৫০৪
৩০ ।	তারণ তরণ শ্রাবকাচার	,,	৫৩৯
			৮৮৭৮

ইংরেজী

1.	Comparative Study of Jainism and Buddhism	204
2.	Jainism : A Key to True Happiness	133

এছাড়া গোম্মট্সার, নিয়মসার, তত্বার্থসূত্র, সময়সার, আত্মানুশাসনের যাঁরা ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তাঁদের যথেচ্ছ সাহায্য করেছেন ।

শ্রমণ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ভোগ নয়, ত্যাগ নয়
শুধু ধ্যানে বসা,
অন্তহীন মুহূর্তগুলি
আকাশেতে বলাকার মতো
উড়ে চলে চলে...

যারা জাগে তারা তোলে
ঘণ্টার নিনাদ,
কিন্তু যে প্রবল প্রাণ
রুদ্ধ তার দ্বার।
আকাশ-পৃথিবী জুড়ে ভোর হয়
পড়ে আলো—
নদী আর ক্ষেতে।
সিডারের বন থেকে উঁকি মারে
সিঁদুরের টিপ।
লাল সূর্য দিনের শেষে
অস্তাচলে চলে।
পাহাড়ের বুকে জমা মেঘ হয় লাল।
ছড়ায় আবীর।
শৈলশীর্ষে জমে ওঠে বরফের স্তূপ,
উড়ে যায় দিগন্ত পানে
দোয়েলের ঝাঁক।
কত রাত কত দিন ছায়া আর রোদ
মানে না প্রবোধ।
জ্ঞানের সমুদ্রে বসে রুদ্ধ মন—
রেখেছে আঁকড়ি নিত্য
সে তার দর্শন।
নিশ্চল শ্রমণ।

জৈন ধর্ম ও অহিংসা

পূরণ চাঁদ সামসুখা

মানুষ যখন আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার মন ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে অপসৃত হইয়া বৃহত্তর পরার্থের দিকে প্রসারিত হয়। সে নিজের সঙ্গে অপরাপর প্রাণীর তুলনা করে—নিজের যে সমস্ত কারণে দুঃখ বোধ হয় অন্য প্রাণীরও তদ্রূপ কারণে দুঃখ বোধ নিশ্চয়ই হইবে, অন্য প্রাণীও ত তাহার ন্যায়ই সুখ প্রাপ্ত হইতে ও দুঃখ পরিহার করিতে চায়, আমার যেমন সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে অন্য প্রাণীরও সেইরূপ অনুভূতি আছে—এই প্রকার বিচার ধারার দ্বারা অন্য প্রাণীর প্রতি সমবেদনা ও সমতার ভাব জাগরিত হয়। অন্য প্রাণীকে হিংসা করিলে সে আমার ন্যায়ই দুঃখ ও বেদনা প্রাপ্ত হয় অতএব অন্য প্রাণীকে হিংসা করা উচিত নয়। বিচার ধারার এই প্রকার বিকাশের দ্বারা অহিংসা ভাবের উদয় হয়।

জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকগণ সমস্ত প্রাণীকে নিজের ন্যায় দেখিয়া তাহাদিগকে হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ধর্মেই প্রাণী হিংসা নিষিদ্ধ আছে কিন্তু জৈনগণ কেবলমাত্র প্রাণী হিংসা নিষেধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অহিংসাকে ধর্ম—পরম ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভগবান্ মহাবীর বলিয়াছেন :

ধম্মো মংগল মুক্কিঠ্‌ঠং অহিংসা সংজমো তবো।
দেবা বি তং নমংসন্তি জস্‌স ধম্মে সয়ামণো॥

অর্থাৎ অহিংসা, সংযম ও তপস্যারূপ ধর্মই উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর, যাহারা এরূপ ধর্ম পালন করে তাহাদিগকে দেবতারাও নমস্কার করে।

বৈদিক ধর্মে যখন যজ্ঞে পশুবধ হইত তখন জৈন ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া প্রাণী হিংসার প্রতিবাদ করিতেন এবং ব্রাহ্মণ আচার্যগণকে যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা স্বমতে আনয়ন করিতেন জৈন সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যজ্ঞানুষ্ঠানের হ্রাস ও যজ্ঞে পশুবধের বিলোপে জৈন অহিংসাবাদের প্রভাব নাই একথা বলা যায় না।

জৈনসংঘে সাধু ও শ্রাবক বা গৃহস্থ এই দুইটী প্রধান বিভাগ। এই উভয় বিভাগের ব্যক্তিগণের আচার অহিংসার উপরই প্রতিষ্ঠিত। অহিংসাই তাঁহাদের আচরণের মূল ভিত্তি—অন্যান্য নিয়ম অহিংসারই পরিপূরক মাত্র।

ভগবান মহাবীর সাধুগণকে প্রথমেই উপদেশ দিয়াছেন যে কতপ্রকার প্রাণী এই জগতে আছে ও তাহাদের স্বরূপ কি তাহা তোমরা জান এবং তোমাদের প্রত্যেক

আচরণে এই সমস্ত প্রাণীগণের—তাহা যতই ক্ষুদ্র ও নিম্নস্তরের হউক না কেন—হিংসা না হয় তৎপ্রতি সর্বদা সাবধান থাকিবে। হিংসার অর্থ প্রাণীগণের প্রাণসংহার করা মাত্র নয়, তাহাদিগকে কোনপ্রকার দুঃখ কষ্ট না দেওয়াও। তিনি বলিয়াছেন যে—"যাহাকে তুমি প্রহার করিবার ইচ্ছা কর, যাহাকে পরিতাপ প্রদান করিবার ইচ্ছা কর, যাহাকে দুঃখ প্রদান করিবার ইচ্ছা কর, বা যাহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা কর সে তুমিই (অর্থাৎ সে তোমারই ন্যায় প্রাণ ধারণ করে এবং তোমারই ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করে)। এইরূপ জানিয়া সরল ও প্রতিবুদ্ধ মানুষ কাহারও হিংসা করিবে না।" অহিংসার কি মহান্ আদর্শ! প্রত্যেক প্রাণীকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তাহার সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া মানুষ হিংসা হইতে বিরত হইবে।

ভগবান্ মহাবীর বলিয়াছেন যে ঃ

এবং খু নাণিনো সারং জন্ন হিংসই কিংচন।
অহিংসা সময়ং চেব এতাবংতং বিয়াণিয়া ॥

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের সার ইহাই যে কাহারও হিংসা করিবে না। সমস্ত জীবের প্রতি সমতার ভাব অবলম্বন করা—সমস্ত জীবকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করাই অহিংসা, ইহা অবগত হও। উৎপীড়িত হইলে আমি যেরূপ বেদনা অনুভব করি অন্য সমস্ত প্রাণীও সেইরূপ পীড়া অনুভব করে, ইহা যখন আমরা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিব তখনই আমরা অন্য প্রাণীকে নির্যাতন করিতে বিরত হইব, তখনই আমরা প্রকৃত অহিংসক হইতে পারিব। আবার কেবল স্বয়ং হিংসা হইতে বিরত হইলেই প্রকৃত অহিংসক হওয়া যায় না। প্রকৃত অহিংসক হইতে হইলে স্বয়ং হিংসা করিবে না, অন্যের দ্বারা করাইবে না, বা অন্য কেহ হিংসা করিলে তাহা অনুমোদন করিবে না। মনের দ্বারা হউক, বা কায়া দ্বারা হউক কোন রূপেই হিংসা করিবে না, করাইবে না বা অনুমোদন করিবে না। সম্পূর্ণরূপে হিংসা হইতে বিরত হইতে হইবে। অহিংসার এইরূপ ব্যাপক আদর্শ লইয়া জৈন ঋষিগণ অহিংসা ধর্মের প্রচার করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা জল, স্থল, আকাশ ব্যাপ্ত যে সম্পূর্ণ অহিংসক হইয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। এমন অনেক প্রাণী আছে যাহা আমাদের চক্ষুর অগ্রাহ্য। আমাদের প্রতিটী কার্যে, প্রতিটী অঙ্গ সঞ্চালনে হয়ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণীর হিংসা হইয়াই থাকে—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রাণীও হয়ত দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্বেই বিমর্দিত হইতে পারে। অতএব হিংসার সংজ্ঞা কি তাহা জানা আবশ্যক। এই প্রশ্নের উত্তরে জৈন শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে ঃ

প্রমত্তযোগাৎ প্রাণব্যপরোপণং হিংসা।

অর্থাৎ প্রমাদযুক্ত হইয়া প্রাণনাশ করাকে হিংসা কহে। প্রমাদ শব্দের অর্থ রাগ, দ্বেষ, অনবধানতা প্রভৃতি। ইহার দ্বারা এরূপ অর্থ প্রতিফলিত হয় যে রাগদ্বেষ যুক্ত এবং অসাবধান অবস্থায় যে প্রাণীবধ হয় তাহাই হিংসা। প্রাণীবধ বলিলে প্রাণীকে দুঃখ প্রদান করা বা যে কোনও প্রকার নির্যাতন করা প্রভৃতি সমস্তই তাহার অন্তর্ভুক্ত। অতএব রাগদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বা নিজের কর্তব্যের প্রতি অমনোযোগী হইবার অবস্থায় যদি কোন প্রাণীর কোনও প্রকার বধাদি সংঘটিত হয় তবে তাহা হিংসা। হিংসকের মনোভাব যদি দুষ্ট হয় তাহা হিংসা, আর যদি মনোভাব সৎ ও শুদ্ধ হয় তবে তাহা হিংসার অন্তর্গত নয়। জৈন শাস্ত্রকার আরও বলেন যে ভাবনা দুষ্ট না হইয়া এবং সম্পূর্ণ সাবধান থাকিয়াও যদি প্রাণীবধ হইয়া যায় তবে তাহা দ্রব্য হিংসা মাত্র—এরূপ দ্রব হিংসা বিশেষ দোষাবহ নয়। কিন্তু যদি হিংসকের ভাবনা দুষ্ট থাকে তবে কারণ বশতঃ প্রাণিবধ না হইলেও তাহা হিংসা। এরূপ হিংসাকে ভাবহিংসা বা নিশ্চয় হিংসা বলে এবং তাহা অত্যন্ত দোষাবহ। ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে মানসিক অবস্থার উপর হিংসার সংজ্ঞা নির্ভর করে। কোনও ব্যক্তি যদি দুষ্ট ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোনও প্রাণীকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র চালনা করে কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ আক্রান্ত প্রাণী আঘাত প্রাপ্ত না হইয়া সম্পূর্ণ নিরাপদেই থাকিয়া যায়, তবুও আততায়ী ব্যক্তি তাহার মানসিক অসৎভাবের জন্য হিংসার ঘোর পাপে লিপ্ত হইবে। আবার যদি কোন ব্যক্তি কাহারও উপকার করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য করে কিন্তু কোন কারণে সেই উপকারের কার্য; উপকারীর দিক হইতে কোনরূপ ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যযুক্ত না হইলেও, অপর প্রাণীর পক্ষে যদি অপকাররূপে পরিণত হয় বা বেদনাদায়ক হয় তবে সেই উপকারক ব্যক্তি, তাহার উদ্দেশ্য শুদ্ধ থাকার জন্য ভাব হিংসার ঘোর পাপে লিপ্ত হইবে না। দৈনন্দিন সমস্ত কার্যে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে--একজন মানুষের পক্ষে যতটা সাবধান হওয়া উচিত ততটা সাবধান না হইলেই—অসাবধানতার জন্য তাহার কার্য দোষাবহ হইবে এবং সে ভাব হিংসার পাপে লিপ্ত হইবে। এইরূপ হিংসা অহিংসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া জৈন সাধুগণের নিয়ম সমূহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী আচরণ না করিলে হিংসার পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

সম্পূর্ণ অহিংসক হইলে কেবল মাত্র প্রাণীবধ হইতে নিবৃত্ত হইলেই হইবে না, তাহাকে মিথ্যা, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ হইতেও বিরত হইতে হইবে। মিথ্যা কথা বলিলে বা মিথ্যা আচরণ করিলে সর্বপ্রথম নিজেরই হিংসা করা হয় এবং যাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বাক্য বা আচরণের প্রয়োগ করা হয় তাহারও হিংসা করা হয়। এইরূপে চুরি করিলে স্ব-আত্মার ও যাহার দ্রব্য চুরি করা হয় উভয়েরই হিংসা হয়। ব্রহ্মচর্য পালন না করিলেও স্ব ও পরের হিংসা হয়। পরিগ্রহ অর্থাৎ ধন ধান্যাদি সকল

প্রকার সম্পত্তি রাখিলে স্ব-আত্মার ও অপরের হিংসা করিতেই হয়। এই সমস্ত কারণে পরিপূর্ণরূপে অহিংসা পালন করিতে হইলে হিংসা পরিত্যাগের সহিত মিথ্যা, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সরল অনাড়ম্বর জীবন ও মানসিক উচ্চভাবধারা ইহাই জৈন ধর্মের আদর্শ।

স্বয়ং নির্ভয় হইতে হইলে অপরকেও ভয়শূন্য করিতে হইবে। অহিংসকের আচরণ এরূপ হইবে যে মনুষ্য পশু হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত কোনও জীব তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা করিবে না এবং মাত্র তখনই সে নিজেও নির্ভয় হইতে পারিবে—কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার ভয়ের স্থান তাহার থাকিবে না।

অহিংসককে সর্বদা মৈত্রী, প্রমোদ, কারুণ্য ও মাধ্যস্থ ভাবনার দ্বারা চিত্তকে নির্মল করিয়া রাখিতে হইবে। সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রীতির ভাবকে মৈত্রী বলে।

মিত্তি মে সব্বভূএসু বেরং মজ্‌ঝ ণ কেণই।

সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার মৈত্রী, কাহারও সহিত আমার বৈরভাব নাই। এইরূপ ভাবনার দ্বারা মনকে সুবাসিত করিয়া রাখিতে হইবে। কোনও প্রকার উন্নতি দেখিয়া তাহার প্রতি অল্পমাত্রও ঈর্ষ্যা করিবে না, তাহাকে নিজের চেয়ে অধিকতর গুণবান্ মনে করিয়া তাহাব আদর সৎকার করিবে—ইহাকে প্রমোদ ভাবনা বলে। কোনও প্রকার দুঃখ কষ্টের দ্বারা পীড়িত প্রাণীর প্রতি সর্বদা অনুকম্পার ভাব রাখিতে হইবে এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে—এইরূপ ভাবকে কারুণ্য ভাবনা বলে। যাহার হৃদয়ে করুণা নাই তাহাকে অহিংসক বলা যায় না। হিংসক প্রবৃত্তিযুক্ত মনুষ্যকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা সফল না হয়, সে সংশোধনের অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তবে তাহার প্রতি কোনও প্রকার বৈরভাব বা অন্য কুভাব পোষণ না করিয়া মাত্র উপেক্ষার বা ঔদাসীন্যের ভাব অবলম্বন করিবে—এইরূপ ভাবকে মাধ্যস্থ ভাবনা বলে। অহিংসককে এইরূপ মৈত্রী, প্রমোদ, কারুণ্য ও মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া অহিংসা পালন করিতে হইবে। এই সমস্ত নির্মল ভাবনা অহিংসা ভাবকে পরিপোষণ করে।

মানসিক এই সমস্ত সমুচ্চ ভাবের বিকাশ ও তদনুযায়ী আচরণ জৈনধর্মের অহিংসাবাদ বা পরিপূর্ণ অহিংসা।

মহাবীর জন্ম

[নৃত্যনাট্য]

প্রথম দৃশ্য

[অন্ধকার। একটি মেয়ে এসে নৃত্য করবে তীর্থংকরের আবির্ভাব প্রার্থনা করে। গান চলবে সঙ্গে সঙ্গে। গান আরম্ভ হবার স'ঙ্গ সঙ্গে ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠবে]

গহন ঘন অন্ধকার।
তৃষিত পৃথিবী করে অপেক্ষা
খুলিবে কে মুক্তি দ্বার ?
আনিবে কে উজ্জীবন,
দিবে মন্ত্র সঞ্জীবন,
জীবনে আনন্দ
করিবে কে সঞ্চার ?
পার হয়ে স্থিতি প্রলয়ঙ্কর,
এসো এসো হে তীর্থঙ্কর.
ঘুচাও কালিমা ঘুচাও বিষাদ,
লভি যেন মোরা মুক্তির স্বাদ,
নিঃশ্বাস যেন বহে আনন্দ
সৌরভ ভার।
[অন্ধকার হয়ে যাবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে শুয়ে রয়েছেন ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থ]

[কথা]

শুয়ে ছিলেন ত্রিশলা
হঠাৎ ভাঙে ঘুম,
স্বপ্ন দেখে উঠেন বসে
আকাশ নিঝুম।

[ত্রিশলা উঠে বসবেন। তারপর সামনে এসে নৃত্য করবেন। সঙ্গে সঙ্গে গান চলবে]

এ কি হেরিলাম আমি,
এ কি হেরিলাম!
আনন্দ আজি প্রাণে,
আনন্দ আজি গানে,
আনন্দ সমীরণে
যার নেই কোনো নাম।
এ কি হেরিলাম আমি,
এ কি হেরিলাম!
জীবনে জেগেছে ছন্দ,
টুটে গেছে সব বন্ধ,
এ কি আনন্দ এ কি আনন্দ
হেরি সুন্দর অভিরাম।
এ কি হেরিলাম আমি,
এ কি হেরিলাম!

[ত্রিশলা সিদ্ধার্থের কাছে গিয়ে বলছেন—ওগো শোনো। সিদ্ধার্থ উঠে বসছেন। বলছেন—বল। ত্রিশলা মুদ্রায় চোদ্দটী স্বপ্ন বিবৃত্ত করবেন। তারপর দুজনে সহ নৃত্য করবেন]

[কথা]

সিদ্ধার্থ বললেন ত্রিশলাকে—
আশ্চর্য স্বপ্ন,
এমন স্বপ্ন দেখে থাকে
ভাগ্যবতী রমণীরাই।
তবু কাল সকালে ডাকব
গণৎকারদের,
জানব স্বপ্ন ফল।

[অন্ধকার হয়ে যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[গণৎকারদের আসার মূকাভিনয়। অন্ধকার হয়ে যাবে। আলোর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করতে করতে সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলা আসবেন। সঙ্গে

পুরজন। তারপর গণৎকারেরা আসবেন। সিদ্ধার্থ গণৎকারদের সম্বর্দ্ধনা জানালে পর তারা গণনার অভিনয় করবে। শেষে তাদের একজন স্বপ্ন ফলের কথা বলবে]

[কথা]

এমন স্বপ্ন ত দেখেন
রাজ চক্রবর্তী
বা তীর্থঙ্কর জননীরা—

[শুনতেই পুরজন সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলাকে ঘিরে নৃত্য করবে]

[অন্ধকার হয়ে যাবে]

চতুর্থ দৃশ্য

[অন্ধকারে এসে দাঁড়াচ্ছেন ত্রিশলা। ধীরে ধীরে আলো ফুটছে]

[কথা]

ত্রিশলা দেখেন—
সুন্দরী সুন্দরী নারীরা
আসছে,
সেবা করছে তাঁর।
বুঝতে পারেন না এরা কারা,
গায়ে তাদের দিব্যগন্ধ।

[আলো ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। তখন সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াবেন। ক্রমশঃ আবার আলো ফুটে উঠবে]

[কথা]

সিদ্ধার্থ দেখেন—
ভারে ভারে কারা
রত্ন সম্ভার এনে
ভরে তুলছে তাঁর কোষ।
সামন্ত নৃপতিরা এসে
প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে,
বৃদ্ধি হচ্ছে রাজ্যসীমার।

[অন্ধকার হয়ে যাবে]

পঞ্চম দৃশ্য

[একটা প্রতীক্ষা নিয়ে সিদ্ধার্থ বসে আছেন। প্রিয়ভাষিতা এসে সুসংবাদ দিচ্ছে। সিদ্ধার্থ নিজের গলার মালা খুলে তাকে উপহার দিচ্ছেন। প্রিয়ভাষিতা পথ দেখিয়ে তাঁকে এক দিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে শিশুকে কোলে করে দেবতারা আসছেন]

[কথা]

তীর্থংকরের আবির্ভাবে
ঘুচে গেছে স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান—
দেবতারা এসেছেন নেমে—
নিয়ে চলছেন শিশুকে
স্নানাভিষেকের জন্য
মেরু শিখরে।

[ইন্দ্র শিশুকে কোলে নিয়ে বসছেন। দেবাঙ্গনারা তার অভিষেক করছে। অন্য দেবতাদের নৃত্য ও গীত]

জয় হোক তব জয়,
হোক তব নব অভ্যুদয়।
হানো শঙ্কা, হানো গ্লানি,
নির্ভয় করো প্রাণী,
হোক জীবন আনন্দময়।

[কথা]

ওমনি আনন্দময় হয়ে উঠেছে
ক্ষত্রিয়কুণ্ডপুর।
আজ কারো কোনো
অভিযোগ নেই,
অভাব নেই।

[দেখা যাবে বন্দীরা মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনে ফিরে যাচ্ছে। প্রার্থীরা দান নিয়ে ঘরে ফিরছে]

[কথা]

তীর্থংকরের আবির্ভাবে
এমনি আনন্দোচ্ছল
হয়ে ওঠে জীবন।

সেই আনন্দের স্পর্শ
আমাদের জীবনকেও
আনন্দময় করে তুলুক।

[দেবতা ও মানুষের সমবেত নৃত্য ও গীত]

জয় মহাবীর,
জয় মহাবীর।
আনন্দমূল তুমি
গুণ গম্ভীর।
তুমি শান্তি তুমি প্রেম,
মহামুক্তি, মহাক্ষেম,
দীন শরণ ধীর।
জয় মহাবীর,
জয় মহাবীর।

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমার সেই কথা শুনে সে বলল, বেগবতী, পরিচারিকাদের কাছে যা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল যে তুমি বুদ্ধিমতী কিন্তু এখন দেখছি তুমি অনুচিত কথা বলছ। হয়ত এর কারণ তোমার ভ্রাতৃস্নেহ। কিন্তু শোন, কন্যা যখন একবার কাউকে প্রদত্ত হয়, সে সুন্দর হোক অসুন্দর, বিজ্ঞ বা অজ্ঞান সে স্ত্রীর নিকট দেবতুল্য। সে তার স্বামীর সেবা করে ইহলোকে খ্যাতি ও পরলোকে সুন্দর জীবন লাভ করে। তুমি তোমার ভাইয়ের রূপ গুণের প্রশংসা করলে কিন্তু যে রাজধর্ম পালন করে ও উত্তমকুল জাত সে কখনো অন্যের সুসুপ্তা স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসে না। তুমিই বল এ তার শৌর্যের পরিচয় না ভীরুতার? সে যদি আমার স্বামীকে আগে জাগরিত করত ও পরে আমায় অপহরণ তবে তোমার ভাই জীবিত থাকত না। তুমি বলছ তোমার ভাই রূপবান। কিন্তু শোন, সংসারে সূর্যের মত দীপ্তিমান চাঁদের মত কমনীয় যেমন আর কেউ নেই তেমনি কি মর্ত্যে কি স্বর্গে আমার স্বামীর মত রূপবান ব্যক্তিও আর নেই। তিনি যেমন শৌর্যশালী তেমনি বৃহস্পতির মত জ্ঞানী। তিনি উচ্চ রাজকুল জাত। বেগবতী, একথা তুমি ভ্রমেও মনে এনো না যে আমি তোমার ভাইয়ের ভজনা করব। আমি আমার স্বামীর গুণ এক মুখে বলে শেষ করতে পারব না। তুমি তাই আমায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করো না। তুমি অনার্যের মত কথা বলে আমার দুঃখ আরও বর্দ্ধিত করছ।

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, সুচরিতে, আমি সম্ভ্রান্ত বংশীয়ের ব্যবহার জানি। আমার ভাইয়ের ব্যবহার আমাদের কুলোচিত মর্যাদারও বিপরীত। আমি যে অনার্য শব্দ প্রয়োগ করেছি তা ভাইয়ের প্রতি সৌহার্দ্য বশতঃ। আমাকে ক্ষমা কর। আমি ওরূপ শব্দ আর ব্যবহার করব না।

আমি তখন তার কাছেই রইলাম ও তার বিরহে তোমার অবস্থা মনে মনে কল্পনা করলাম। আমি তখন বললাম, বোন, আমি বিদ্যাবলে জম্বুদ্বীপের যে কোন জায়গায় যেতে পারি। তাই তোমার পিতার গৃহে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। তোমার জন্য আমি সেখানে যাব ও তোমার পতিকে এখানে নিয়ে আসব। তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া ভ্রাতৃদ্রোহ হবে বলে আমার উচিত হবে না।

সে প্রত্যুত্তরে বলল, বেগবতী, তুমি যদি আমার স্বামীকে এখানে নিয়ে আসতে পার তবে আমি তোমার অধীনা হয়ে থাকব। যাও। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

তখন তার অনুরোধক্রমে ও আমার বিদ্যাবলে আমি এখানে এসে উপস্থিত হলাম।

এখানে এসে তোমাকে যে পরিস্থিতিতে দেখলাম তাতে তোমাকে সত্য কথা বলার আমার সাহস হলনা। ভাবলাম আমি যদি তোমাকে সত্য কথা বলি তবে তুমি তা বিশ্বাস করবে না ও তার বিরহে প্রাণত্যাগ করবে। তোমার মত মানুষ তার, আমার বা কারু একার হতে পারে না। এখন আমার কি করণীয়? এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে হল সোমশ্রীর রূপ পরিগ্রহ ছাড়া তোমার দুঃখ দূর করার আর কোনো আশু সমাধান আমার নাই। আমি তাই তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য তার রূপ পরিগ্রহ করলাম। ও তোমার সঙ্গে সহবাসের পূর্বে তোমাকে দিয়ে আমাকে বিবাহ করিয়ে নিলাম। আমি তোমাকে আত্মদান করার পূর্বেই তুমি আমাকে বিছানায় নিয়ে গেলে। সোমরস পান করে তুমি আমার রূপ দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলে। তোমাকে একথা বলছি সে জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো।

আমি বললাম, সুন্দরি, আমি তোমাকে দোষ দেইনা। তুমি আমায় জীবন দান করেছ। তুমি যদি তার আকৃতিতে আমায় প্রলুব্ধ না করতে তবে আমি হয়ত বেশীক্ষণ বাঁচতাম না।

এভাবে কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রভাত হল। সকালে পরিচারিকারা এসে সোমশ্রীর জায়গায় বেগবতীকে দেখে বিস্মিত হল ও রাণীকে গিয়ে বলল শয়নমন্দিরে এক রূপবতী নারী রয়েছে তবে সে সোমশ্রী নয়।

সেই সংবাদ পেয়ে রাজা ও রাণী এলেন। বেগবতী আমাকে যে কথা বলেছিল সেই কথা তাঁদের নিবেদন করল।

সমস্ত শুনে রাজা বললেন, আমার গৃহকে তোমার নিজের গৃহ বলে মনে করো ও যতদিন ইচ্ছে হয় এখানে থাক। তোমাকে দেখে আমরা সোমশ্রীকে কথঞ্চিত ভুলতে পারব।

এভাবে বেগবতীর সঙ্গে আমি সেখানে বাস করতে লাগলাম। বেগবতী তার ব্যবহারে সকলের স্নেহ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

একদিন রতিরঙ্গের পর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন দেখি কে যেন আমায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরের শীতল বাতাসে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভাবলাম কে আমায় নিয়ে যেতে পারে? আমি তখন লোকটীর দিকে চেয়ে দেখলাম। বেগবতীর মুখের সঙ্গে এর মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য। তাহলে এ নিশ্চয়ই দুষ্ট মানসবেগ, আমাকে মারবার জন্য অন্যত্র কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাকেও মরতে হবে। আমার ওপর তাকে বিজয়ী হতে দেব না। এই তোমার শেষ বলে আমি তার মাথায় মুষ্ট্যাঘাত করলাম। সে পালিয়ে গেল আর আমি অবলম্বন হীন হয়ে গঙ্গাবক্ষে এসে পতিত হলাম।

সাধুর মত বেশধারী একব্যক্তি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে জলে এসে পড়তে দেখে আমায় ধরে নিলেন। তিনি তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমায় দেখে আমি বিদ্যা অধিগত করেছি। এখন বল, তুমি কোথা হতে আসছ ?

আমি বললাম, দুই যক্ষিনী আমার নিয়ে বিবাদ করতে করতে আমায় এখানে ফেলে দিল। ভদ্র, এই স্থানটীর নাম কি ?

তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, এই স্থানটীর নাম কণকখলদ্বার। তুমি কিছু বর চাওত বল। আমি বিদ্যাধর।

আমি বললাম, আপনি যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আকাশগামিনী বিদ্যা আমায় প্রদান করুন।

তিনি বললেন, তুমি যদি পুরশ্চরণ করতে পার তবে চল অন্যত্র যাই। তোমাকে সেখানে সেই মন্ত্র দেব তুমি তা জপ করতে থাকবে।

আমি সম্মত হলে তিনি বললেন, তোমার জন্য আমি বিদ্যালাভ করেছি। তাই তোমার জন্য আমি সব কিছু করব।

তিনি আমায় অন্যত্র নিয়ে গেলেন ও বললেন, তোমাকে এখানে অনেক বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। দেবীরাই এসব বাধা সৃষ্টি করবেন বিশেষ করে প্রণয় সূচক বাক্য ও হাব ভাবে তোমায় প্রলোভিত করবার চেষ্টা করবেন। তাদের সাহচর্যে তোমায় অসঙ্গ থাকতে হবে, সাহসের সঙ্গে শান্তভাবে তোমায় সব কিছু সহ্য করতে হবে।

আমি সম্মত হলে মন্ত্র দিয়ে তিনি চলে গেলেন। বললেন, কাল সকালে আমি আবার আসব। পুরশ্চরণ অন্তে তুমি নিশ্চয়ই বিদ্যা লাভ করবে।

আমি সমস্তদিন পুরশ্চরণের কাজে নিযুক্ত রইলাম। সন্ধ্যাবেলা নূপুর ও মেখলার সুমিষ্ট ধ্বনি তুলে এক তন্বী সেখানে এসে উপস্থিত হল। উল্কার মত প্রদীপ্ত ও বিভ্রম উৎপাদক তার রূপ। সে আমায় প্রদক্ষিণ করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার দিকে চাইলাম ও ভাবলাম, ও কে ? স্বর্গের কোন দেবী না বস্ত্রালংকারে ভূষিতা কোনো মানবী ? আমার গুরু যেমন আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন, আমার সাধনার ও বিঘ্ন স্বরূপ হতে পারে কারণ চন্দ্রবিম্বের মত ও আমার দৃষ্টির আনন্দ স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

তারপর ভাবলাম, এধরণের রূপ ও আকৃতি কথনো দুঃখের কারণ হতে পারে না। হয়ত ওই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, পুরশ্চরণে পরিতুষ্ট হয়ে আমায় দেখা দিয়েছে।

আমি যখন এসব কথা চিন্তা করছি তখন সে করযোড়ে আমায় বলল, দেব, আমি আপনার কাছে বর প্রার্থী হয়ে এসেছি।

আমি ভাবলাম, আমিই যার কাছে বর চাইতে যাচ্ছিলাম সেই আমার কাছে বর

চাইছে। এতে মনে হচ্ছে আমি ওর ওপর বিজয় লাভ করেছি। তাই ওকে বর দিতে আমার বাধা নেই। আমি তখন বললাম, আমি তোমায় একটা বর দেব।

সে কথা শোনামাত্র আনন্দে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ও আমায় তুলে নিয়ে শূন্যপথ দিয়ে উড়ে চলল। মুহূর্তে সে আমায় এক গিরি চূড়ায় নিয়ে গেল যেখানে বৃক্ষ ও গুল্ম পরিপূর্ণ এক অরণ্য ছিল। সেখানে পুষ্পভারনত এক অশোক বৃক্ষের তলায় আমায় নামিয়ে দিয়ে বলল, ভয় পাবেন না। এই বলে সে চলে গেল।

এর কিছুক্ষণ পরে সেখানে দুজন সুন্দরাকৃতি পুরুষ এসে উপস্থিত হল। তারা নিজেদের দধিমুখ ও চণ্ডবেগ বলে পরিচয় দিল। তার পরপরই আমার গুরু এসে উপস্থিত হলেন ও নিজের দণ্ডবেগ বলে পরিচয় দিলেন। তাঁকে গন্ধর্ব রাজকুমার বলে আমার মনে হল। তাঁর দেহ অলঙ্কার দ্যুতিতে চর্চিত ছিল।

তাঁরা সকলে আমায় পেয়ে আনন্দিত হলেন ও আমায় নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। দেখলাম পতাকা দিয়ে সমস্ত নগর সুসজ্জিত করা হয়েছে।

আমায় নগর পরিদর্শন করিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। সকলের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে আমি সেই রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করলাম।

পরদিন সকালে আমায় বরবেশে সাজান হল ও মদনবেগার সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া হল। প্রভূত বস্ত্রালঙ্কার ছাড়া ৩২ ক্রোড় সুবর্ণ আমায় যৌতুক রূপে দেওয়া হয়েছিল। কল্পবাসী দেবতার মত সেই ঐশ্বর্য আমি মদনবেগার সঙ্গে ভোগ করতে লাগলাম।

একদিন আমি যখন সানন্দে বসেছিলাম তখন দধিমুখ আমার কাছে এলেন। বললেন ভদ্র, মদনবেগা তোমার কাছে একটি বর প্রার্থনা করেছিল, তা তোমার মনে আছে। তার কারণ বলছি শোন—

বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণার্দ্ধে অরিঞ্জয়পুর বলে এক নগর আছে। সেখানে মেঘনাদ নামে রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর রাণীর নাম শ্রীকান্তা। পদ্মশ্রী নামে তাঁদের এক মেয়ে আছে। তার রূপের জন্য পদ্মশ্রী বিদ্যাধর মহলে সুপরিচিতা।

সেই সময় দিবিতিলগ নগরে বজ্রপাণি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি পদ্মশ্রীর পাণি প্রার্থনা করে মেঘনাদকে পত্র দেন কিন্তু এর পূর্বে মেঘনাদ এক নৈমিত্তিককে জিজ্ঞাসা করেন পদ্মশ্রীর সঙ্গে কার বিবাহ হবে। নৈমিত্তিক গণনা করে বলে অর্দ্ধচক্রীর পিতার সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ হবে। তাই তিনি তাকে কন্যা দিতে অস্বীকার করে পত্র দিলেন। বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ হয়ে মেঘনাদের রাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে মেঘনাদের হার হল। মেঘনাদ তখন সপরিবারে এখানে এসে আশ্রয় নিলেন।

বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণার্দ্ধে বহুকেতুমণ্ডিক নামে এক রাজ্য আছে। সেখানে

বীরবাহু রাজত্ব করেন। বীরবাহুর চারপুত্র ঃ—অনন্তবীর্য, চিত্রবীর্য, বীরযশ ও বীরদত্ত। বীরবাহু মুনি হরিচন্দ্রের প্রবচন শুনে প্রব্রজ্যা নিতে অভিলাষী হয়ে তাঁর পুত্রদের ডেকে পাঠান ও রাজ্যভার নিতে বলেন। কিন্তু তারা সকলেই রাজ্য-ভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে বলে। তাই বীরবহু যশবতীর পুত্র বীরসেনকে রাজ্য দিয়ে চার পুত্র সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কালক্রমে বীরবাহু নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর চারপুত্র নানাস্থানে পরিব্রাজন করতে করতে এক সময় অমৃতধার নগরীর বহিরুদ্যানে এসে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁরা কেবলজ্ঞান লাভ করেন। তাঁরা কেবলজ্ঞান লাভ করলে দেবতারা নেমে আসেন। ও উৎসব করেন।

স্বর্গীয় বাদ্য ও আলোক দেখে মেঘনাদ হর্ষিত হন ও মুনিদের বন্দনা করবার জন্য সেখানে যান। বন্দনা, নমস্কার ও প্রবচন অন্তে তিনি পদ্মশ্রীর পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত জানতে চান। প্রত্যুত্তরে তাঁরা তার পূর্বজন্ম বিবৃত করেন।

দেব, বিভীষণের বংশে বিদ্যুৎবেগ নামে এক রাজা হন। তাঁর তিন পুত্র এক কন্যা হয়। পুত্রদের নাম দধিমুখ, দণ্ডবেগ ও চণ্ডবেগ, কন্যার নাম মদনবেগা। এক সময় বিদ্যুৎবেগ নৈমিত্তিকদের জিজ্ঞাসা করেন, মদনবেগার সঙ্গে কার বিবাহ হবে? তারা প্রত্যুত্তরে বলে, ভরত খণ্ডের অর্দ্ধচক্রীর পিতার সঙ্গে এর বিবাহ হবে। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? আমরা তাঁকে কি করে জানব? তারা বলে, তিনি আকাশ হতে আপনার পুত্র দণ্ডবেগের ঘাড়ে এসে পতিত হবেন। তাঁর পতিত হওয়া মাত্র আপনার পুত্র বিদ্যালাভ করতে সমর্থ হবে।

দিবীতিলিয় নগরে তিসেহর নামে এক রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর সর্পক নামে এক পুত্র আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের বংশানুক্রমিক শত্রুতা।

তিসেহর একবার আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেন ও পিতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নগরের বাইরে বেঁধে রাখেন। আমরা তাঁকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়ে এই পর্বতে এসে বাস করছি। নৈমিত্তিকের কথা মত মদনবেগাকে আপনাকে দান করেছি। মদনবেগা আপনার কাছে যে বর প্রার্থনা করেছে সেই বর পিতার বন্ধনমুক্তি ও রাজ্যলাভ।

দধিমুখ তার বক্তব্য শেষ করলে আমি ভাবতে লাগলাম তিসেহর ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী, আমিও দধিমুখের কাছে কিছু বিদ্যালাভ করেছি। সেই বিদ্যা তিসেহরের ওপর প্রয়োগ করে আমি যাচাই করে নেব।

এর কয়েকদিন মধ্যেই তিসেহর আমাদের অক্রমণ করল। তার আক্রমণের কারণ মানসবেগাকে দধিমুখ মর্ত্যবাসীর হাতে সম্প্রদান করেছে সেই আক্রোশ। দধিমুখের আত্মীয় পরিজনেরা ভয় বিহ্বল হয়ে আর্ত চীৎকার করতে লাগল।

আমি দধিমুখকে নির্ভয় হতে বললাম। বললাম, আমি তিসেহরকে নিহত করে শ্বশুরকে বন্ধন মুক্ত করব।

তিসেহর নিজেই আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। শ্বেত অশ্বযুক্ত রথে আমি আরোহণ করলাম। দধিমুখ আমার সারথ্য করতে লাগল। দণ্ডবেগ চণ্ডবেগ অশ্ব ও গজবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হল।

গোড়ার দিকে তিসেহরের সৈন্যরা জয়লাভ করতে লাগল। কিন্তু আমি যখন তার সমস্ত ইন্দ্রজাল ছিন্ন করতে লাগলাম তখন সে আমায় এসে আক্রমণ করল ও শক্তি প্রহার করল। শক্তিকে আমি অর্দ্ধপথে কেটে দিলাম ও বাণবর্ষণে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললাম। সে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে পড়তে দেখেই তাঁর পুত্র সর্পক ও অন্য পরিজনেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আমরা নগর অধিকার করে নিলাম ও রাজা বিদ্যুৎবেগকে বন্ধন মুক্ত করলাম।

আমার শ্বশুর ও অন্যান্য পরিজন কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হয়ে আমি অরিঞ্জয়পুরে বাস করতে লাগলাম দধিমুখ আমার সেবা করতে লাগল। মদনবেগার সঙ্গে তাই আমার জীবন আনন্দে ব্যতীত হতে লাগল। কালক্রমে মদনবেগা গর্ভবতী হল। গর্ভধারণের কারণ তার সৌন্দর্য আরো বিকসিত হয়ে উঠল।

একদিন বসন ও ভূষণে সুসজ্জিতা হয়ে মদনবেগা আমার নিকটে এল। তাকে তখন প্রস্ফুটিত চম্পক লতার মত আমার মনে হচ্ছিল। তার পদ্মের মত মুখ কানের কুণ্ডলি দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল চক্রবাক যুগল একটা বিকসিত কমল পুষ্পকে ধরে রয়েছে। আমি তাকে দেখে অভিভূত হয়ে বলে উঠলাম, ও বেগবতী তুমি সৌন্দর্যের পতাকা স্বরূপ। সেকথা শুনে সে রাগ করে বলে উঠল. যার ছাপ তোমার মনে অঙ্কিত রয়েছে তুমি তার প্রশংসা করছ। আমি বললাম, রাগ করো না। সে এখন অনেক দূরে রয়েছে। তুমি এখন আমার হৃদয় জুড়ে রয়েছ। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছি মাত্র। সে প্রত্যুত্তর দিল, এইমাত্র তুমি যার নাম উচ্চারণ করেছ সেই তোমার প্রিয়া হোক। যদি ক্ষুধাই না থাকে তবে উপবাস ভঙ্গের কি প্রয়োজন? এই বলে সে অন্যত্র চলে গেল। আমি তখন ভাবতে লাগলাম, এখন আমি তাকে কি ভাবে শান্ত করি।

এর কিছুক্ষণ পরেই মদন বেগা ফিরে এল। ঠিক সেই সময় প্রাসাদে কোলাহল শোনা গেল। প্রাসাদে আগুণ লেগেছিল। দেখলাম বাতাসে অভিবর্দ্ধিত হয়ে সেই আগুণ চারদিকে লেলিহান শিখা বিস্তার করতে লাগল। বোধহয় আগুণ হতে বাঁচাবার জন্য সে আমায় নিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। তারপরই দেখলাম আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য মানসবেগ হাত বাড়াল। মদনবেগা তখন আমায় পরিত্যাগ করে মানসবেগকে আক্রমণ করল। মানসবেগ পালিয়ে গেল ও আমি শূন্য হতে

পতিত হতে হতে এক খড়ের গাদার ওপর এসে পড়লাম। তাই আমার কোনরূপ আঘাত লাগল না। আমি ভাবলাম, আমি বিদ্যাধর লোকের কোনো অংশে এসে পতিত হয়েছি। মনে মনে ভাবলাম অরিঞ্জয়পুর না জানি কোনদিকে।

কিন্তু সেখান হতে অদূরেই একটি লোককে জরাসন্ধের গুণগান করতে শুনলাম। আমি তখন সেই খড়ের গাদার ওপর হতে নীচে নেমে এলাম ও তাকে জিজ্ঞেস করলাম নিকটস্থ নগরের নাম কি? রাজারই বা কি নাম?

লোকটী বলল, দেশের নাম মগধ, নগরীর নাম রাজগৃহ। বৃহদ্রথ পুত্র জরাসন্ধ এই নগরীর রাজা। কিন্তু তুমি কোথা হতে আসছ যে দেশ, নগরী ও রাজার নাম জান না?

তা দিয়ে তোমার কি দরকার?—বললাম। তারপর ভাবতে লাগলাম তা হলে এ বিদ্যাধর রাজ্য নয়। আমি যেখানে খুশি এখন যেতে পারি।

আমি তখন সেই নগরে প্রবেশ করলাম ও নগরের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে দ্যূত গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে মন্ত্রীপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র, সার্থবহপুত্র পুরোহিতপুত্র, ও আরক্ষকপুত্রদের জুয়ো খেলতে দেখলাম। তারা আমার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা আমায় বসতে বলল ও জিজ্ঞেস করল, আমি জুয়া খেলতে ইচ্ছে কারি কী?

আমি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লে তারা বলল, আমরা ধন রত্ন বাজী রেখে জুয়ো খেলছি। তুমি কি বাজী রাখবে?

আমি তাদের আমার হাতের আংটি দেখালাম। তারা সেই আংটি পরীক্ষা করে বলল, এর মূল্য এক কোটি সুবর্ণ।

আমি সেই আংটি বাজী রেখে খেললাম ও এক কোটি সুবর্ণ জয় করে নিলাম।

আমি তখন সেই দ্যূত গৃহের অধিকারীকে ডেকে বললাম, আমি এক কোটি এই সুবর্ণ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই। তাই তারা যাতে এখানে এসে উপস্থিত হয় তাই করুন।

অধিকারী বাইরে গিয়ে সেই কথা ঘোষণা করে লোক জড় করলেন। আমি সেই অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম। তারা এতে খুসী হল ও আমার প্রশংসা করতে লাগল। আমি মানুষ নই স্বয়ং কুবেরের কমলাক্ষ যক্ষ। তাই সুবর্ণের প্রতি আমার একটুও মোহ নেই। আমিই এই পৃথিবী শাসন করব।

এই সময় রাজপুরুষেরা এসে উপস্থিত হলেন ও আমার রাজা ডাকছেন বলে তাঁদের সঙ্গে যেতে বললেন। আমি তাদের অনুগমন করলাম। জনতাও প্রীতি বশতঃ আমার অনুগমন করতে লাগল। রাজার সৈনিকেরা তাদের নিরস্ত হতে বলল।

রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলে পর, রাজাকে সংবাদ দাও বলে তারা আমাকে

এক নির্জন স্থানে নিয়ে গেল ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখল। কেউ বলল, কেমন, আর জুয়ো খেলবে? অন্যেরা বলল কি পাপ যে নির্দোষ লোকটাকে হত্যা করা হচ্ছে!

আমি রাজপুরুষদের জিজ্ঞেস করলাম, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যার জন্য আমায় হত্যা করা হচ্ছে। আমি কি ন্যায়ালয়ে আমার পক্ষ সমর্থন করতে পারব না। এখানে কি ধর্ম নেই?

তারা বলল তবে শোন—

গতকাল এক নৈমিত্তিক রাজাকে বলে যে যে তাঁকে হত্যা করবে তার পিতা আজ এখানে আসবেন। রাজা বললেন, আমি তাঁকে কি করে চিনব? প্রত্যুত্তরে গণৎকার বলে যে তিনি জুয়া খেলায় এক ক্রোড় কার্ষাপণ জিতে তা দরিদ্রদের দান করবেন। সে জন্য রাজার আদেশে আড্ডাধারীদের ঘরে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাজপুরুষ নিযুক্ত করা হয়। তুমি দরিদ্রদের এক কোটি কার্ষাপণ দান করেছ। এর জন্য তুমিই দায়ী।

আমি তখন ভাবলাম আমার দোষেই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি। আমি যদি এর কারণ আগে জিজ্ঞেস করে নিতাম তা হলে তারা বলত ও আমি বিক্রম দেখিয়ে মুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু দুঃখ করেই বা কি লাভ। পূর্ব জন্মার্জিত কর্মের ফলভোগ ছাড়া ত কোনো উপায়ই নেই। তাই এতো স্বাভাবিকই যে মানুষকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়।

এই সময় গাড়ী নিয়ে লোক এল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে এই লোকটাকে গোপনে হত্যা করা হবে।

তারপর তারা আমায় চামড়ার থলিতে ভরে গাড়ীতে তুলল।

গাড়ীতে করে আমায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা আমি জানতে পারলাম না। তবে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল এই নিরপরাধ লোকটার হত্যার জন্য ঐ গণৎকারই দায়ী।

এক পর্বত শিখরের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে তারা আমায় সেখান হতে গড়িয়ে দিল। আমি উচ্চশিখর হতে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম। আমার চারুদত্তের কথা মনে হল। চারুদত্তকে ভারুণ্ড পাখী নিয়ে যাচ্ছিল আর আমায় আমার ভাগ্য। সে পঞ্চপরমেষ্ঠী স্মরণ করে রক্ষা পেয়েছিল আমিও তাই পঞ্চপরমেষ্ঠীকে মনে মনে স্মরণ করতে লাগলাম। সেই সময় আমার মনে হল কে যেন আমায় ধরে নিল। আমার গতি রুদ্ধ হল। আমি তখন চামড়ার থলি হতে বার হলাম। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে বেগবতী কাঁদছে।

সে আমায় আবেগে জড়িয়ে ধরল ও কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, প্রিয়, পূর্বজন্মে তুমি এমন কি কুকৃত্য করেছিলে যার জন্য তোমার এই দশা হল।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, প্রিয়ে তুমি দুঃখ পরিত্যাগ কর। কারণ চারণ মুনিরা আমায় বলেছেন যে এই জন্মেই আমি মুক্তিপ্রাপ্ত হব। মুনিদের কথা কখনো মিথ্যা হয় না। পূর্বজন্মে অবশ্যই কাউকে কষ্ট দিয়েছিলাম যার জন্য এই দুঃখ আমায় পেতে হল। দুঃখে পতিত হয়েও তাই জ্ঞানীরা বিষাদ করেন না। কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে ?

সে কাঁদতে কাঁদতেই প্রত্যুত্তর দিল। প্রিয়, ঘুম ভাঙতেই যখন তোমাকে আমার পাশে দেখতে পেলাম না তখন কাঁদতে লাগলাম। ভাবলাম, তুমি কোথায় যেতে পার ? তখন মনে হল মানসবেগ নিশ্চয়ই তোমায় অপহরণ করেছে। আমি তখন রাজাকে গিয়ে নিবেদন করলাম। তিনি প্রাসাদের ও উদ্যানের সর্বত্র তোমার অনুসন্ধান করালেন কিন্তু তোমাকে কোথাও পাওয়া গেলনা। তখন তিনি আমায় বললেন, কন্যা, তুমি দুঃখ পরিত্যাগ কর। তুমি নানা বিদ্যার অধিকারিণী। সেই বিদ্যাবলে তোমার পতি কোথায় রয়েছেন তা এখুনি জানতে পারবে। আমি তখন বিদ্যাবলে জানতে পারলাম যে তুমি কুশলে রয়েছ। মানসবেগ তোমায় অপহরণ করেছিল। তারপর বিদ্যাধরেরা তোমায় নিয়ে গেছে। মানসবেগার সঙ্গে তোমার বিবাহ হচ্ছে। এসব কথা আমি রাণীকে বললাম।

শুনে তিনি বললেন, তোমার পতি কুশলে রয়েছেন সে সুখের। তিনি তোমার মত মেয়েকে কখনই ভুলে যাবেন না। ইচ্ছে করলে তুমি তাঁর কাছে যেতেও পার। আর এ বাড়ীত তোমারই। তোমার এখানে থাকতেও কোনো বাধা নেই।

আমি বললাম, বিদ্যাধরীরা যারা ওড়ে তারা সাধারণতঃ স্বামীর সঙ্গেই ওড়ে। বিশেষ কাজ না পড়লে একা ওড়েনা। তাছাড়া আমার স্বপত্নীর কাছে আমি যেতে চাই না। তাই আমি এখানেই থাকব। তারপর সেখানেই আমার দিন ব্যতীত হতে লাগল।

তোমাকে আবার দেখার ইচ্ছা হওয়ায় রাণীর আদেশ নিয়ে আমি অরিঞ্জয় নগরে উপস্থিত হলাম। সেখানে মানসবেগাকে আমার নাম নিয়ে ডাকতে শুনলাম তাতে সে অভিমান করল। প্রিয়, আমার খুব আনন্দ হয়েছিল যে তুমি আমায় ভোলো নি। মানসবেগা রাগ করে চলে গেল ও তার খানিক পরেই সূর্পনখী মন্ত্রবলে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিল। সূর্পনখীই মানসবেগার রূপ ধরে তোমায় নিয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে হত্যা করার। সূর্পনখী আমার চাইতে অনেক বেশী বিদ্যা জানে। তাই আমি তার কিছু করতে পারলাম না কিন্তু আমার হাত প্রসারিত করে সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম যদি সে তোমায় ফেলে দেয় তবে আমি ধরে নেব। সে তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমায় ফেলে দিয়ে আমায় আঘাত করে বলে উঠল ওরে ও দুষ্ট মানসবেগ, তুই আমার পতিকে হত্যা করতে চাস্। এর পূর্বে সে আমায় মন্ত্রবলে মানসবেগে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।

আমি পালিয়ে জিন মন্দিরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে তার পূর্বেই আমায় ধরে নিল ও আমার সমস্ত বিদ্যা নষ্ট করে দিল।

তোমার দুঃখে আমার মন এত অভিভূত হয়েছিল যে আমার নিজের বিষয়ে কিছুই মনে হল না। আমি তোমার সন্ধানে কাঁদতে কাঁদতে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলাম।

ঘুরতে ঘুরতে যখন এখানে এসেছি তখন আকাশবাণী শুনতে পেলাম, তোমার পতিকে পর্বত শিখর হতে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি তাঁর রক্ষা কর। আমি তাই সেই চামড়ার থলি ধরে নিলাম। তারপর তুমি এই চামড়ার থলি হতে বেরিয়ে এলে।

আমরা দুজনে তখন পঞ্চনদীব সঙ্গম স্থলে গেলাম, স্নান করলাম ও বনফল আহার করলাম। নিকটেই সাধুদের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে রাত্রি যাপন করলাম।

পরদিন সকালে সেখান হতে যাত্রা করে বরুণোদকা নদীর তীরে এলাম। নদীর জল বেগবতীর হৃদয়ের মতই নির্মল ছিল। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সিংহনরা পর্বতে আরোহণ করলাম। বেগবতীকে আমি বললাম—তোমার বিদ্যা নষ্ট হলেও আমরা দুজনে এখানে আনন্দে বাস করতে পারব। তার জন্য আর দুঃখ করো না।

বেগবতী প্রত্যুত্তর দিল, তোমার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে আমার বিদ্যা নষ্ট হয়েছে তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই। নিজের জীবনের চাইতেও স্বামীর জীবন স্ত্রীর কাছে প্রিয়। তোমায় যে আবার ফিরে পেয়েছি—সেই আমার আনন্দ।

এভাবে আমরা উভয়ে উভয়কে ভালবেসে সেখানে বাস করতে লাগলাম। একদিন এক অশোক তরুর তলায় মন্ত্র বদ্ধ অবস্থায় এক কন্যাকে দেখতে পেলাম। শ্যাম শিলাপট্টের ওপর তাকে নীল পদ্ম কোরকের মত দেখাচ্ছিল। অশোক গাছটিও ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল ও অশোক সংলগ্ন সহকার বৃক্ষও পুষ্প মঞ্জরীতে অবনত হয়ে পড়েছিল। সেই পরিবেশে তাকে কাঞ্চনবর্ণা দেবীর মত আমার মনে হচ্ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম এ বনদেবী না কোন স্বর্গীয় অপ্সরা? কেউ একে মন্ত্র বদ্ধ করে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে।

তাকে দেখেই বেগবতী বলে উঠল, প্রিয়, ও বৈতাঢ্য পর্বতের উত্তরার্দ্ধের গগন-বল্লভ নগরীর রাজা চণ্ডাভর কন্যা। ওর মা মহারাণী মিনগা আমার আবাল্যের প্রিয়সখী। ওর নাম বালচন্দ্রা। ও উচ্চকুল জাতা ও এখনো অবিবাহিত। তুমি ওর একটা উপকার কর। তুমি ওর কাছে যাও। বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য পুরশ্চরণ করতে গিয়ে ও বিপিন্ন হয়ে পড়েছে। তোমার সান্নিধ্যে ও এই বদ্ধাবস্থা কাটিয়ে উঠবে।

আমি করুণার্দ্র কণ্ঠে বললাম, তবে তাই হোক।

এই বলে আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, মন্ত্রবদ্ধতার জন্য যন্ত্রণায় তার মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে আছে।

আমি সামনে দাঁড়াতেই সে বদ্ধাবস্থা হতে মুক্তিলাভ করল। কিন্তু ভয়ে বা ক্লান্তিতে মাটির উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি তখন কেতকী পত্রে জল নিয়ে এসে তার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম। সে তখন সংজ্ঞালাভ করে চোখ মেলে চাইল। বেগবতী তাকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

বেগবতীকে সে বলল, আমার জীবন দান দিয়ে আপনি আমার প্রতি অসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন। সংসারে জীবন দানের চাইতে বড়দান আর কিছু নেই।

তারপর আমার দিকে চেয়ে যুক্ত করে বলল, দেব, আমাদের কুলে যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই বিদ্যা সিদ্ধ করতে হয়। আপনার প্রসাদে আমি বিদ্যা সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছি। এর জন্য আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

দেখলাম কথা বলবার সময় তার মুক্তাবলীর মত উজ্জ্বল দন্তপংক্তি হতে এক মধুর প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছিল ও নিম্ন ওষ্ঠ আমার মনে কেমন যেন অনুরাগ জাগ্রত করছিল। তার অঞ্জলিবদ্ধ কর দুটি পবনান্দোলিত কমল কলিকাকেও লজ্জা দিচ্ছিল।

প্রত্যুত্তরে আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, এর জন্য বিব্রত হয়ো না। আমাকে তোমার আপন জন বলেই মনে করো। আর যদি বলতে বাধা না থাকে তবে তোমাদের কুলে কেন যন্ত্রণা ভোগ করে বিদ্যা অর্জন করতে হয় শুনতে ইচ্ছে করি।

আপনাকে বলতে কেন বাধা থাকবে বলে সে আমাদের শিলাপট্টে বসতে বলল। আমরা বসলে সে বলতে আরম্ভ করল—

দেব, বৈতাঢ্য পর্বতের উত্তরার্দ্ধে গগনবল্লভ নামে এক নগর আছে। সেই নগরে এক সময় বজ্রদৃঢ় নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি নিজ ভুজবলে সমস্ত বিদ্যাধরদের পরাজিত করে একশ দশটী নগরীর ওপর নিজ আধিপত্য বিস্তারিত করেন। তিনি একবার অবর বিদেহ হতে এক ধ্যানস্থ মুনিকে ধরে নিয়ে আসেন ও তাঁর অধীনস্থ বিদ্যাধর রাজদের বলেন, তোমরা তোমাদের অস্ত্রক্ষেপণ করে এই মুনিকে এখুনি হত্যা কর। নইলে এ আমাদের সমূলে ধ্বংস করবে।

বিদ্যাধর রাজেরা তখন মুনিকে বিনষ্ট করবার জন্য নিজ নিজ বিদ্যা স্মরণ করে অস্ত্রধারণ করলেন। ঠিক সেই সময় নাগরাজ ধরণেন্দ্র আকাশ দিয়ে অন্যত্র যাবার পথে তাদের দেখতে পেলেন ও নেমে এসে তাদের ভৎর্সনা করে বললেন,

এ তোমরা কি করছ ? যাদের বিবেক নেই তাদের বিদ্যা ধারণের অধিকার নেই। এই বলে তিনি তাদের বিদ্যা হরণ করে নিলেন।

বিদ্যাধর রাজেরা তখন বিমূঢ় হয়ে ধরণেন্দ্রর শরণাপন্ন হলেন ও তাঁকে বললেন যে তাঁরা বজ্রদৃঢ়ের আদেশ ক্রমে মুনিরাজকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন কারণ তিনি বলেছিলেন যে এই মুনি আমাদের বিনষ্ট করবেন। তাই এই বিষয়ে আমাদের অপরাধ নেই। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন আর ইনি কে তাও বিস্তারিত বলুন।

বিদ্যাধর রাজাদের বিনয়ে পরিতুষ্ট হয়ে ধরণেন্দ্র তখন বলতে আরম্ভ করলেন—

অবর বিদেহে সলীলবতী নদীর কাছে বীতশোক নামে এক নগর আছে। সেই নগরে বৈজয়ন্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সত্যশ্রী। তাঁদের দুই পুত্র ছিল—সংজয়ন্ত ও সংজয়। সংজয়ন্ত ও সংজয় রাজ্যভোগের পর সংযম গ্রহণ করে। সংজয় নিদান জন্য ধরণেন্দ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। আমি সেই সংজয়, আর এই সাধু সংজয়ন্ত—আমার অগ্রজ।

সে কথা শুনে বিদ্যাধর রাজেরা বজ্রদৃঢ় কেন যে এঁকে ধরে নিয়ে এলেন সেকথা জানতে চাইলেন।

ইতিমধ্যে সংজয়ন্ত কেবল জ্ঞান লাভ করলেন। ধরণেন্দ্র তখন বললেন, এস এই কেবলীকেই আমরা তার কারণ জিজ্ঞেস করি।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫0 পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.00।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120

Vol. VIII No. 2 Sraban June 1980

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮৭ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

নালাঞ্জনার নৃত্য

কাঁকালীটিলা, মথুর

চব্বীস তীর্থংকর স্তুতি

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

সকলার্হৎপ্রতিষ্ঠানমধিষ্ঠানং শিবশ্রিয়ঃ।
ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়ীশান-মার্হন্ত্যং প্রণিদধ্মহে ॥১

যাঁরা সকলের পূজ্য, যাঁরা মোক্ষরূপ লক্ষীর নিবাসরূপ, যাঁরা পাতাল, পৃথিবী ও স্বর্গের ঈশ্বর সেই অর্হৎদের আমি ধ্যান করি।

নামাকৃতিদ্রব্যভাবৈঃ পুনতস্ত্রিজগজ্জনম্।
ক্ষেত্রে কালে চ সর্বাস্মি-ন্নর্হতঃ সমুপাস্মহে ॥২

যাঁরা সকল ক্ষেত্রে সকল কালে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান) নাম, স্থাপনা, দ্রব্য ও ভাব নিক্ষেপে তিন লোককে পবিত্র করেন সেই অর্হৎদের আমি উপাসনা করি।

আদিমং পৃথিবীনাথ-মাদিমং নিষ্পরিগ্রহম্।
আদিমং তীর্থনাথং চ ঋষভস্বামিনং স্তুমঃ ॥৩

যিনি পৃথিবীপতিদের মধ্যে প্রথম, যিনি ত্যাগব্রতীদের মধ্যে প্রথম ও প্রথম তীর্থংকর সেই ঋষভদেবের আমি স্তব করি।

অর্হন্তমজিতং বিশ্ব-কমলাকরভাস্করম্।
অম্লান-কেবলাদর্শ-সংক্রান্ত-জগতং স্তুবে ॥৪

বিশ্বরূপ কমল সরোবরের যিনি মার্তণ্ডরূপ, যিনি নির্মল কেবল-জ্ঞানরূপ দর্পণে ত্রিলোক প্রতিবিম্বিত করেছেন সেই অর্হৎ অজিতনাথের আমি স্তব করি।

বিশ্বভব্য-জনারাম-কুল্যা-তুল্যা জয়ন্তি তাঃ।
দেশনা সময়ে বাচঃ শ্রীসংভবজগৎপতেঃ ॥৫

ভব্য জীবরূপ উদ্যানকে সিঞ্চিত করতে জগৎপতি শ্রীসম্ভবনাথের মুখনিঃসৃত জলধারারূপ যে বাণী সেই বাণী সর্বদা যশস্বী হোক্।

অনেকান্ত-মতাংভোধি-সমুল্লাসন-চন্দ্রমা:।
দদ্যাদমন্দমানন্দং ভগবানভিনন্দন: ॥৬

অনেকান্তরূপ সমুদ্রকে উল্লসিত করতে যিনি চন্দ্রতুল্য সেই ভগবান অভিনন্দন স্বামী আনন্দদায়ী হোন।

দ্যুসৎকিরীট-শাণাগ্রো-ত্তেজিতাংঘ্রি-নখাবলিঃ।
ভগবান্ সুমতিস্বামী তনোত্বভিমতানি বঃ ॥৭

দেবগণের মুকুটমণি প্রভায় প্রদীপ্ত যাঁর চরণ নখর, সেই ভগবান সুমতিনাথ তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

পদ্মপ্রভ-প্রভোর্দেহ-ভাসঃ পুষ্ণংতু বঃ শ্রিয়ম্ ।
অন্তরঙ্গারিমথনে কোপাটোপাদিবারুণাঃ ॥৮

কামক্রোধাদিরূপ অন্তরঙ্গ বৈরী মন্থন হেতু কোপপ্রবলতার জন্য যাঁর শরীর অরুণবর্ণ ধারণ করেছে সেই পদ্মপ্রভ তোমাদের কল্যাণ করুন ।

শ্রীসুপার্শ্ব-জিনেন্দ্রায় মহেন্দ্র-মহিতাংঘ্রয়ে ।
নমশ্চতুর্বর্ণসংঘ-গগনাভোগ ভাস্বতে ॥৯

চতুর্বিধ সংঘরূপ আকাশে যিনি সূর্যের মত দেদীপ্যমান ও যাঁর চরণ ইন্দ্র দ্বারা পূজিত সেই শ্রীসুপার্শ্বনাথকে নমস্কার করি ।

চন্দ্রপ্রভ-প্রভোশ্চন্দ্র-মরীচি-নিচয়োজ্জ্বলা ।
মূর্তিমূর্ত-সিতধ্যান-নির্মিতেব শ্রিয়েঽস্তু বঃ ॥১০

চন্দ্রকৌমুদীর মত উজ্জ্বল চন্দ্রপ্রভের যে মূর্তি তাকে দেখলে মূর্তিমন্ত শুক্লধ্যান বলেই মনে হয় । সেই মূর্তি তোমাদের জ্ঞানলাভের কারণ হোক ।

করামলকবদ্বিশ্বং কলয়ন্ কেবলশ্রিয়া ।
অচিন্ত্যমাহাত্ম্যনিধিঃ সুবিধির্বোধয়েঽস্তু বঃ ॥১১

যিনি কেবলজ্ঞান প্রভাবে জগৎকে করামলকবৎ জানেন ও যিনি অচিন্ত্যনীয় প্রভাবের আধার সেই সুবিধিনাথ তোমাদের বোধ প্রদান করুন ।

সত্ত্বানাং পরমানন্দ-কন্দোদ্ভেদনবাংবুদঃ ।
স্যাদ্বাদামৃত-নিস্যংদী শীতলঃ পাতু বো জিনঃ ॥ ১২

প্রাণীমাত্রে আনন্দ অঙ্কুর বিকাসত করতে যিনি নবীন জলদতুল্য ও যিনি স্যাদ্বাদরূপ অমৃত বর্ষণ করেন সেই শীতলনাথ তোমাদের রক্ষা করুন ।

ভবরোগার্তজন্তূনা-মগদংকারদর্শনঃ ।
নিঃশ্রেয়সশ্রীরমণঃ শ্রেয়াংসঃ শ্রেয়সেঽস্তু বঃ ॥১৩

যাঁর দর্শন সংসাররূপ রোগপীড়িত জীবের পক্ষে বৈদ্যরূপ ও যিনি নিঃশ্রেয়সরূপে মোক্ষরূপ লক্ষ্মীর পতি সেই শ্রেয়াংসনাথ তোমাদের কল্যাণের কারণ হন ।

বিশ্বপকারকীভূত-তীর্থকৃৎকর্মনির্মিতিঃ ।
সুরাসুরনরৈঃ পূজ্যো বাসুপূজ্যঃ পুনাতু বঃ ॥১৪

যিনি সমস্ত বিশ্বের কল্যাণকারী তীর্থংকররূপ নাম কর্ম প্রাপ্ত হয়েছেন ও যিনি সুরাসুরনর-পূজিত সেই বাসুপূজ্য তোমাদের রক্ষা করুন ।

বিমলস্বামিনো বাচঃ কতকক্ষোদসোদরাঃ ।
জয়ংতি ত্রিজগচ্চেতো-জলনৈর্মল্যহেতবঃ ॥১৫

নির্মাল্যচূর্ণের মত জগৎজনের চিত্তরূপ বারিকে যিনি নির্মল করেন সেই বিমলনাথের বাণী জয়যুক্ত হোক্ ।

স্বয়ম্ভূরমণস্পর্দ্ধি-করুণারসবারিণা।
অনন্তজিদনন্তাং বঃ প্রযচ্ছতু সুখশ্রিয়ম্ ॥১৬

যাঁর করুণারূপবারি স্বয়ম্ভূরমণনামক সমুদ্র-জলের প্রতিস্পর্দ্ধী সেই অনন্তনাথ অসীম মোক্ষরূপ লক্ষ্মী তোমাদের প্রদান করুন।

কল্পদ্রুমসধর্মাণ-মিষ্টপ্রাপ্তৌ শরীরিণাম্।
চতুর্ধাধর্মদেষ্টারং ধর্মনাথমুপাস্মহে ॥১৭

শরীরধারী জীবেদের কল্পবৃক্ষের মত যিনি অভীপ্সিত বস্তু দান করেন ও দান, শীল, তপ ও ভাবরূপ ধর্মের উপদেশ দেন সেই ধর্মনাথ স্বামীর আমরা উপাসনা করি।

সুধাসোদরবাগ্‌জ্যোৎস্না-নির্মলীকৃতদিঙ্‌মুখঃ।
মৃগলক্ষ্মা তমঃশান্তৈ শান্তিনাথ জিনোহস্তু বঃ ॥১৮

যাঁর বাণীরূপ চন্দ্রিকা সমস্ত দিক্‌সমূহকে নির্মল করে ও যিনি মৃগলাঞ্ছন সেই শান্তিনাথ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার শান্ত করে তোমাদের শান্তি প্রদান করুন।

শ্রীকুংথুনাথো ভগবান্ সনাথোঽতিশয়র্দ্ধিভিঃ।
সুরাসুরনৃনাথানা-মেকনাথোহস্তু বঃ শ্রিয়ে ॥১৯

যিনি অতিশয়রূপ ঋদ্ধি সম্পন্ন ও সুরাসুরনরেন্দ্রের অদ্বিতীয় স্বামী সেই কুংথুনাথ তোমাদের কল্যাণরূপ লক্ষ্মীপ্রাপ্তির কারণ হোন।

অরনাথস্তু ভগবাং-শ্চতুর্থারনভোরবিঃ।
চতুর্থপুরুষার্থশ্রী-বিলাসং বিতনোতু বঃ ॥২০

কালচক্রের চতুর্থ অর রূপ আকাশে যিনি মার্তণ্ডরূপ সেই ভগবান অরনাথ তোমাদের চতুর্থ পুরুষার্থ (মোক্ষ) রূপ লক্ষ্মীর সহিত বিলাস অভিবর্দ্ধিত করুন।

সুরাসুরনরাধীশ-ময়ূরনববারিদম্।
কর্মদ্রুন্মূলনে হাস্তি-মল্লং মল্লিমভিষ্টুমঃ ॥২১

নবীন মেঘোদয়ে যেমন ময়ূর আনন্দিত হয় তেমনি যাঁকে দেখামাত্র সুরাসুরনরপাল-দের চিত্ত আনন্দিত হয় ও যিনি কর্মরূপ অটবী উৎখাতে মত্ত হস্তীরূপ সেই মল্লীনাথের আমি স্তব করি।

জগন্মহামোহনিদ্রা-প্রত্যূষসময়োপমম্।
মুনিসুব্রতনাথস্য দেশনাবচনং স্তুমঃ ॥২২

যাঁর বাণী মোহনিদ্রাপ্রসুপ্ত প্রাণীর জন্য প্রভাতীরূপ মুনিসুব্রত স্বামীর সেই বাণীর আমি স্তব করি।

লুঠন্তো নমতাং মূর্ধ্নি-নির্মলীকার কারণম্।
বারিপ্লবা ইব নমেঃ পান্তু পাদনখাংশবঃ ॥২৩

প্রণাম করার সময় যাঁর চরণ নখপ্রভা নিখিল জনের মস্তকে এসে পড়ে ও জল-ধারার মত যা তাদের হৃদয়কে নির্মল করে সেই চরণ নখপ্রভা তোমাদের রক্ষা করুক।

যদুবংশসমুদ্রেন্দুঃ কর্মকক্ষহুতাশন।
অরিষ্টনেমির্ভগবান্ ভূয়াদ্বোঽরিষ্টনাশনঃ ॥২৪

যদুবংশ রূপ সমুদ্রের জন্য যিনি চন্দ্রমা রূপ ও কর্মরূপ অরণ্যের জন্য যিনি হুতাশন তুল্য সেই ভগবান অরিষ্টনেমি তোমাদের অরিষ্ট বা দুঃখ দূর করুন।

কমঠে ধরণেন্দ্রে চ স্বোচিতং কর্ম কুর্বতি।
প্রভুস্তুল্যমনোবৃত্তিঃ পার্শ্বনাথঃ শ্রিয়েস্তু বঃ ॥ ২৫

কমঠ ও ধরণেন্দ্র নিজের নিজের কাজ করে চলে কিন্তু উভয়ের প্রতি যাঁর মনোভাব একরূপ সেই ভগবান পার্শ্বনাথ তোমাদের কল্যাণ করুন।

কৃতাপরাধেপি জনে কৃপামন্থরতারয়োঃ।
ঈষদ্বাষ্পাদ্র'য়োর্ভদ্রং শ্রীবীরজিননেত্রয়োঃ ॥ ২৬

যাঁর নয়ন তারকায় কৃতাপরাধীর প্রতিও দয়াভাব পরিস্ফুট ও সেই কারণে যাঁর নয়নপল্লব ঈষৎ বাষ্পাদ্র' সেই ভগবান মহাবীরের নয়ন কল্যাণবর্ষী হোক।

ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র, পর্ব ১, সর্গ ১

বাংলার জৈন-স্মৃতিবাহী গ্রাম, জনপদ, নদী ও পর্বত

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাল

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে বিপুল গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। রাজানুগ্রহে বহু বৌদ্ধ মন্দির, বিহার মহাবিহার ও সংঘারাম স্থাপিত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে। বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাত্ত্বিকদের আন্তরিক যত্নে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার সীমা ছাড়িয়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বৌদ্ধযুগের স্মৃতি বর্তমানে বঙ্গদেশে বিলুপ্ত প্রায়। এককালের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন ঐ ধর্মের স্মৃতি চিহ্ন বাংলার পল্লী ও নগরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন কি বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবাহী গ্রাম-জনপদের নাম বঙ্গদেশে বিরল।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাজাসন, ধামরাই, উয়ারী, মহাস্থান, নবাসন প্রভৃতি গ্রামের নামের মধ্যে বিলুপ্ত বৌদ্ধস্মৃতি আবিষ্কার করেছিলেন। ধামরাই ধর্মরাজিকা, উয়ারী উপকারিকা, বাজাসন বজ্রাসনের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে তিনি গণ্য করেছিলেন। উপরোক্ত গ্রামের নামগুলি বাদ দিলে, বুধপুর, কুল্লা, বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী, পাঁচথুপী সুবর্ণ বিহার প্রভৃতি গ্রাম নামের মধ্যে বৌদ্ধস্মৃতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। কিন্তু পশ্চিমবংগ ও বাংলা দেশের অসংখ্য গ্রামের মধ্যে ঐ সংখ্যা তো নিতান্ত নগণ্য।

বৌদ্ধধর্মের মত জনপ্রিয়তা জৈনধর্ম বংগদেশে কোনদিন অর্জন করেছিল কিনা সন্দেহ। বৌদ্ধধর্মের মত রাজানুগ্রহও জৈনধর্মের ভাগ্যে এদেশে কোনদিন জোটে নি। বাঙ্গালী জৈন আচার্য ও তত্ত্বজ্ঞানীদের কীর্তি-কাহিনী কালের ব্যবধান অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গণ-স্মৃতি একদা জনপ্রিয় এই ধর্মের ঐতিহ্য বংগদেশ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হতে দেয়নি। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাম, জনপদ, নদী ও পর্বত জৈনধর্মের স্মৃতিকে এখনও সজীব করে রেখেছে।

প্রাচীনকালে রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধনে জৈনধর্ম খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ "আচারাঙ্গ সূত্র" থেকে জানা যায়, শ্রমণ মহাবীর রাঢ় দেশের বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে পদচারণা করেছিলেন, এবং রাঢ়ের অধিবাসীরা শ্রমণ মহাবীরের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল সেদিন। পরে অবশ্য রাঢ়ের অধিবাসীরা শ্রমণ মহাবীরের ধর্ম গ্রহণ করে। ঐ ধর্ম দ্বারা এত গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে আজও রাঢ়ের কয়েকটি প্রধান জেলা বর্ধমান মহাবীরের নামেই পরিচিত। আধুনিক

বর্ধমান জেলা ও বর্ধমান শহর জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের স্মৃতি রঞ্জিত। প্রাচীনকালে, মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে, এই অঞ্চলে শূলপাণি নামে এক যক্ষের নিবাস ছিল। তার হাতে নিহত প্রাণীদের হাড়ে এখানে গড়ে উঠেছিল হাড় বা অস্থির স্তূপ। তাই তখন এই স্থানের নাম হয় অস্থিগ্রাম। বর্ধমান মহাবীর কৈবল্য লাভের পর এই গ্রামেই প্রথম বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করেন। "কল্প সূত্রে"র ভাষ্য অনুযায়ী অস্থি গ্রামের পূর্বনাম ছিল বর্ধমান। কিন্তু আমাদের ধারণা ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ মহাবীরের স্মৃতি থেকে "অস্থি গ্রামে"র নাম পরিবর্তিত হয়েছে "বর্ধমানে"। বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থ "দীপ বংশে"ও "বর্ধমানপুর" নগরটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ধমান নামটির প্রাচীনত্ব সংশয়াতীত। তবে কত প্রাচীন বলা শক্ত। লিপি প্রমাণ থেকে বলা যায় অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আধুনিক কালের বর্ধমান জেলা নামে পরিচিত অঞ্চলটি ' বর্ধমানভুক্তি" নামে অভিহিত হতো। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ মহারাজ বিজয় সেনের মল্লাসারুল তাম্রশাসন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

অষ্টম শতাব্দীর হরিকেশ মণ্ডলের বৌদ্ধ রাজা মহারাজাধিরাজ কান্তি দেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে "বর্ধমানপুর" নামে একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ননীগোপাল মজুমদার বর্ধমানপুরের সংগে বর্ধমানভুক্তির কোন সম্পর্ক নাই বলে মন্তব্য করেছেন, তথাপি অধুনিক লেখকদের অধিকাংশই বর্ধমান-পুরকে আধুনিক বর্ধমান শহরের সংগে অভিন্ন গণ্য করেন।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে "বর্ধনকোট" স্থানটি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তিস্তানদীর পারে স্থানটি অবস্থিত। ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খলজী তিব্বত অভিযানের সময় স্থানটি অতিক্রম করে কামরূপে প্রবেশ করেন। বর্ধমান কোট নামটি মহা-বীরের নাম থেকে আগত বলে অনেকের ধারণা। বর্ধমান কোট বর্ধমান কোটির সংক্ষিপ্ত রূপ বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। প্রাচীন পুণ্ড্র বর্ধনভুক্তিতে স্থানটি অবস্থিত। মহারাজ অশোকের সময়ে "পুণ্ড্রবর্ধন" জৈনধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। "দিব্যাবদান" গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনে জৈন প্রাধান্য সম্পর্কিত কাহিনী-কিংবদন্তীর অভাব নেই। শুধু বৌদ্ধদের রচিত "দিব্যাবদান" নয়, জৈনাচার্য হরিসেনের "বৃহৎ কথাকোষ" থেকেও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে জৈন প্রাধান্যের ইতিহাস জানা যায়। সুতরাং বর্ধমান মহাবীরের নামানুসারে বর্ধন কোটের নামকরণ হওয়া অসম্ভব নয়।

বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বীরভূম জেলা প্রাচীন যুগের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। "বীরভূম" নামটি বর্ধমান মহাবীরের নামের শেষাংশ থেকে উৎপন্ন, মনে হয়। অন্যদিকে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা, অত্যল্প কালপূর্বে, "মানভূম" নামে যে জেলাটি বিহার

প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, জৈনধর্মের স্মৃতি-চিহ্নে খুবই সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় অভিধান প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনন্দলাল দের অনুমান মানভূম শব্দটি "মান্যভূমির" সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ মান্য বা শ্রদ্ধেয় দেশ। মহাবীরের নাম থেকেই এই জেলা নামটির উৎপত্তি। কৈবল্য লাভের পরে মহাবীর নিজেও "মাননীয়" বা "শ্রদ্ধেয় শ্রমণ মহাবীর" নামেই শিষ্যদের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন। বর্তমান বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলা প্রাচীন কালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। এ অঞ্চলটিও মাননীয় শ্রমণ মহাবীরের পদধূলি ধন্য বলে অনেকের ধারণা। "সিংভূম" (অর্থাৎ সিংহের দেশ) শব্দটি "সিংহ-ভূমি" শব্দটির পরিবর্তিত রূপ। বর্ধমান মহাবীরের নাম থেকে পরোক্ষভাবে আগত। ব্যক্তিগত জীবনে মহাবীর ছিলেন পুরুষ সিংহ, লাঞ্ছন ছিল তাঁর কেশরী বা সিংহ। সিংভূম শব্দটি মহাবীরের লাঞ্ছন সিংহ থেকে উৎপন্ন বলে শ্রীযুক্ত নন্দলাল দের ধারণা।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক সমতলভূমির দেশ। পাহাড় পর্বত দেশের অভ্যন্তরে নেই, যা আছে সীমান্তে। পরেশনাথ পাহাড় বর্তমান বংগের ভৌগোলিক সীমার বাইরে, বিহারের হাজারীবাগ জেলায়। অতীতে হাজারীবাগ জেলার ঐ পাহাড়টি বংগদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই ছিল। পাহাড়টি জৈনধর্মাবলম্বীদের নিকট অতি পবিত্র কারণ তাঁদের ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ঐ হাজারীবাগ পাহাড়ের শীর্ষে নির্বাণ লাভ করেন। সেই থেকে হাজারীবাগের ঐ পাহাড়টির নাম হয় পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ পাহাড়। ঐ পাহাড়ের শীর্ষে পার্শ্বনাথ ছাড়া আরও ১৯ জন তীর্থঙ্কর নির্বাণ লাভ করেন। এই কারণেই পরেশনাথ পাহাড় জৈনতীর্থঙ্করদের সমাধি শিখর বা "সমেত শিখর" হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। সমেতশিখর শব্দটি সমাধি শিখর নাম থেকে আগত বা ঐ নামটির অর্ধমাগধী রূপ।

প্রাক্তন মানভূম জেলার "শেখরভূম" নামক অঞ্চল বা পরগণাটির নাম সম্ভবতঃ সমেত শিখরের শেষাংশ থেকে উৎপন্ন। "বংগের জাতীয় ইতিহাসে"র লেখক শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসুর ধারণা শেখরিয়া রাজাদের নাম থেকে "শেখর ভূম" নামের উৎপত্তি। পাল সম্রাট রাম পালের সময়ে ঐ অঞ্চলে রুদ্রশেখর নামে একজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন। তবে এই প্রসংগে মনে রাখা উচিত, মানভূম জেলার ঐ অঞ্চল জৈনস্মৃতিতে এত উজ্জ্বল যে "সমেত শিখর" নাম থেকে শেখরভূম শব্দটির উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

পূর্ববাংলার ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। ঐ জেলায় স্থিত চন্দ্রনাথ ও শম্ভুনাথ পাহাড় জৈনতীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভ ও সম্ভবনাথের নামানুসারী বলে কেউ কেউ মনে করেন। সম্ভব নাথ জৈন সম্প্রদায়ের তৃতীয় আর চন্দ্রপ্রভ অষ্টম তীর্থঙ্কর।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিবাসীরা নদীকে ভয় যেমন করে, নদীর প্রতি ভক্তিও তাদের তেমনই সীমাহীন। বাংলার বর্তমান নদ-নদীর নামের অধিকাংশই হিন্দু দেব দেবীর নাম থেকে আগত। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা দরকার, প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার নদনদীর গতি পথের যেমন বারংবার পরিবর্তন হয়েছে, তেমন-ই নদী নামের পরিবর্তনও হয়েছে অনেক বার। অনার্য নদী নামের আর্যীকরণের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

পদ্মা পূর্ববাংলার বৃহত্তম নদী। "বৃহৎ-ধর্ম পুরাণ", "কৃত্তিবাসী রামায়ণ", এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন ইংরেজ লেখকের রচনায়, পদ্মা নদী "পদ্মাবতী" নামেই উল্লেখিত হয়েছে। জৈনদের ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শাসন দেবী বা যক্ষী পদ্মাবতীর নাম থেকে পদ্মা নদীর নামের উৎপত্তি।[১] পদ্মার পরিমণ্ডল প্রাচীন কাল থেকে অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সম্পৃক্ত। পদ্মার সংগে যুক্ত ক্ষুদ্র একটি নদীর নাম "চন্দনা"। চন্দনা নামটি কি মহাবীরের প্রথমা শিষ্যা চন্দনার কথা স্মরণে আনে না? পদ্মার সংগে যুক্ত আর একটি নদীর নাম "কুমার", প্রাচীন একটি লিপিতে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। কুমার কার্তিকের নামান্তর সন্দেহ নাই কিন্তু ভুললে চলবে না জৈনদের অষ্টম তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্যের যক্ষের নামও কুমার। পদ্মার সংগে যুক্ত নদী "ভৈরব" এককালে খুবই বেগবান ছিল। রুদ্ররূপী শিবই হিন্দুশাস্ত্রে "ভৈরব" নামে পরিচিত। কিন্তু তান্ত্রিকদের মধ্যেই ভৈরব বিশেষ ভাবে আরাধ্য। এই প্রসংগে ভুললে চলবে না বঙ্গদেশ থেকে জৈনধর্মের অবলুপ্তির পরে জৈনদের দিগম্বর তীর্থঙ্কর মূর্তি হিন্দুসমাজে কাল ভৈরব রূপে অনেক স্থানেই পূজা পাচ্ছেন। পাক্ বিড়ায় জৈন তীর্থঙ্কর "পদ্মপ্রভে"র কালভৈরব রূপে হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ, এক্ষেত্রে অপ্রাসংগিক হবে না। পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ "মেঘনা" নামে বাংলাদেশের পূর্ব পার্শ্ব ভেদ করে সমুদ্রে সংগত হয়েছে। মেঘনা শব্দটি মেঘনাদের সংক্ষিপ্ত রূপ। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র মেঘনাদ অনার্য রাক্ষস সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ।

বাঁকুড়া জেলায় "অম্বিকা নগর" ও বর্ধমান জেলায় "অম্বিকা কালনা" প্রভৃতি নামের গ্রাম এবং শহর রয়েছে। জৈনদের দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসন দেবী অম্বিকা বা আম্রার নাম থেকে ঐ নামের উৎপত্তি বলে লোকের ধারণা। বাঁকুড়া জেলার "বিহারী নাথ", "পরেশ নাথ" প্রভৃতি গ্রামও জৈন স্মৃতিবাহী। খড়্গপুরের অদূরবর্তী "জিন শহর" নামে একটি গ্রাম থেকে সম্প্রতি তীর্থঙ্কর মূর্তি সহ জৈন মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। নাম থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, একদা গ্রামটি জৈনধর্মের

১ লেখকের 'শ্রমণ' পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কেন্দ্র রূপে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার "থেরীসুর", "জৈনসার" প্রভৃতি গ্রামের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ অসম্ভব নয় যে একদা ঐ পরগণা ছিল অব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। পশ্চিমবংগের কোন কোন জেলায় "জিন নগর". "জিনপুর" প্রভৃতি নাম বিশিষ্ট দু-একটি গ্রাম খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে "জিনউর" বা "জিনউরা" শব্দটির বারংবার উল্লেখ রয়েছে। "জিনউর" শব্দটি "জিনপুর" থেকে উৎপন্ন বা "জিনউরা" শব্দটির সংস্কৃত রূপ "জিনঝুর" এবং শব্দটি জৈন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জিন নগর প্রভৃতি গ্রামে সম্ভবতঃ কোন একসময়ে জৈনদের বাস ছিল। বর্তমানে ঐ সমস্ত গ্রামে জৈন সম্প্রদায়ের আর কোন অস্তিত্ব নেই কিন্তু নামগুলি রয়ে গেছে।

মালদহের আদিনা মসৃজিদ পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় মসৃজিদ। আদিনাথের মন্দির ভেঙ্গেই নাকি এই মসৃজিদটি গড়েছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজবংশের দ্বিতীয় সুলতান সেকেন্দর শাহ। এই আদিনাথ কি জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব? নাম থেকে একদা স্থানটি যে জৈন ধর্মকেন্দ্র ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বাংলা দেশে বীরা শব্দ যুক্ত গ্রাম খুঁজে পাওয়া যায়। বীরা শব্দের অর্থ যা-ই হোক না কেন, কোন কোন বীরা বা বিড়া অন্ত্য শব্দ যুক্ত গ্রামে জৈন স্মৃতি চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় দিগম্বর পুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। জৈন দিগম্বর সম্প্রদায় থেকে দিগম্বর পুর নামটির উৎপত্তি হতে পারে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় "গাছা", "গাছিয়া" ও "গাছি" শব্দযুক্ত শত শত গ্রাম সকলের চোখে পড়ে। এই সব "গাছা", "গাছি" গ্রামের কতকগুলির উৎপত্তি বিশেষ কোন "বৃক্ষ" বা "গাছে"র নাম থেকে। উদাহরণ স্বরূপ "কুলগাছি" "কাকুরগাছি" বা "বেলগাছিয়া" নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু কতকগুলি গাছা-গাছি গ্রামের সংগে "বৃক্ষ" শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ সকল গ্রামের নাম করণের অর্থও স্পষ্ট নয়। বারাসাত শহরের নিকটবর্তী "বামনগাছি" গ্রামের উল্লেখ এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ ছাড়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত "জ-গাছা", "জয়গাছি", "নাচনগাছি", "লক্ষ্মীগাছা", "গগুলগছ", মুক্তাগাছা ইত্যাদি গ্রামের উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুযুগেও বাংলাদেশে এই রকম "গাছ" শব্দ যুক্ত গ্রামের বা জনপদের সম্ভবতঃ অভাব ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজাধিরাজ ভোজ বর্মনের বেলার তাম্রশাসনে "অষ্টগচ্ছ খণ্ডল" নামে একটি স্থান দৃষ্টিগোচর হয়।

ভদ্রবাহুর "কল্পসূত্র" ও মথুরায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, জৈন সম্প্রদায় প্রাচীনকালেই গণ, শাখা ও কুলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই বিভাজনের ঐতিহ্য মধ্যযুগের অন্তকাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। জৈন সম্প্রদায়ের ঐ গণগুলি

পরবর্তী-সময়ে "গচ্ছ" নামে অভিহিত হ'তে থাকে। হেমচন্দ্রাচার্য বলেছেন, "গচ্ছ" শব্দের অর্থ "বৃক্ষ"। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জৈনাচার্যদের প্রদত্ত "গচ্ছের" সংখ্যা বিপুল। নিম্নে ঐ বিপুল সংখ্যক "গচ্ছের" তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি গচ্ছের নাম উদ্ধৃত করা হলো। যথা, কোটিকগচ্ছ, খরতরগচ্ছ, অঞ্চলগচ্ছ, লোংকাগচ্ছ, ব্রাহ্মণগচ্ছ, বিজয়গচ্ছ, বাহরগচ্ছ, ঘোঘেরাগচ্ছ, সাগরগচ্ছ, সিদ্ধপুরগচ্ছ, বারোদিয়া-গচ্ছ, গণধরগচ্ছ, বেলিয়াগচ্ছ, ত্রৈগালিয়াগচ্ছ, জিথরগচ্ছ ইত্যাদি। বামনগাছি, জ-গাছা, জয়গাছি, বাহিরগাছি, ঘাঘরগাছি, সাগরগাছি, বড়গাছি, বারোদি, গণকর, টাঙ্গাইল, জিরাট ইত্যাদি গ্রাম নামগুলির সংগে উপরোক্ত গচ্ছগুলির কোনো কোনোটির নামের সাদৃশ্য বড় লক্ষনীয়। জৈন "গচ্ছ"গুলি থেকে ঐ সমস্ত গ্রামগুলির উৎপত্তি হয়েছে একথা অবশ্যই বলবো না। কিন্তু ভবিষ্যতে ঐসব গ্রাম থেকে কোন জৈন স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কৃত হ'লে বলতে দ্বিধা হবে না যে ঐ গ্রামগুলিতে এককালে জৈন গচ্ছগুলির অধিষ্ঠান ছিল।

বাংলার জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা প্রসংগে কোন কোন লেখক মন্তব্য করেছেন যে দেউল নাম বিশিষ্ট গ্রামগুলি জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির স্মৃতিতে স্মৃতিময়। আদি ও অন্তে দেউল শব্দযুক্ত গ্রামের অভাব নেই বঙ্গদেশে। শুধু "দেউলভিড়্যা" নামে তিনটি গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে বাঁকুড়া জেলায়। তাছাড়া "দেউলেশ্বর", "দেউলগড়", "দেউলটী", "দেউলী", "সাতদেউলিয়া", "দেউলিয়া" প্রভৃতি নামে গ্রাম রয়েছে বাংলার বিভিন্ন জেলায়। "সাতদেউলিয়া", "দেউলভিড়্যা" প্রভৃতি গ্রামে জৈন সম্প্রদায়ের বহু স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। "দেবালয়" শব্দ থেকে "দেউল" শব্দের উৎপত্তি। জৈনদের "দেবালয়" চিহ্নিত গ্রামগুলি "দেউল" অভিধাযুক্ত হয়ে হিন্দুদের দ্বারা যুগ যুগ ধরে পূজিত হ'য়ে এসেছে বঙ্গদেশ থেকে জৈনধর্মের অবলুপ্তির পর। "দেউল" নামধারী গ্রামে জৈন স্মৃতিচিহ্নের প্রাচুর্য গ্রাম-গুলির অতীত জৈন সংশ্রবের নীরব সাক্ষী।

কূর গড়ূক
[জৈন কথানক]

কূর গড়ূক আবার একটা নাম? না, তারও একটা সুন্দর নাম ছিল; কূর গড়ূক তার নাম ছিল না। কিন্তু কূর গড়ূক বলে বলে এই নামটিই তার লোকের মুখে বসে গিয়েছিল। আর তার আসল নামটিই লোকে ভুলে গিয়েছিল

কূর গড়ূক বিশালার রাজপুত্র ছিল। বয়স দশ কি বারো। কিন্তু একদিন গুরুর মুখে ধর্মের উপদেশ শুনে সে রাজ্য সংসার সব পরিত্যাগ করে তাঁর কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করল।

কূর গড়ূক রাজপুত্র হলে কি হয়, তার মন ছিল ভারী সরল। তাই সে প্রথম দিনই গুরুকে এসে বলল, ভন্তে, আমি শ্রমণ দীক্ষা নিয়েছি কারণ আপনার উপদেশ আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু না খেয়ে আমি থাকতে পারি না। আমি তাই উপবাস তপস্যা করতে পারব না। তা সত্ত্বেও কি আমার কল্যাণ হবে?

গুরু বললেন, কেন হবে না? কারণ উপবাস করাইত একমাত্র তপস্যা নয়। সন্তোষ, সেবা, স্বাধ্যায়, ধ্যান, ক্ষমা এসবও তপস্যা। তুমি যদি আর কিছু না পার তবে শুধু ক্ষমার সাধনা কর। জীবনে ক্ষমাকে যদি সত্য করতে পার, তবে আর আর তপস্যায় যে ফল হয়, তোমারো সেই ফল হবে।

কূর গড়ূক গুরুর আদেশ মাথায় করে ক্ষমার সাধনায় প্রবৃত্ত হল ও ক্ষুধা শান্তির জন্য সূর্যোদয়ের পর এক গড়ূক (মাপ) কূর (ভাত) এনে খেতে লাগল। আর তার এই ভোজন বিলাসের জন্য লোকে তাকে কূর গড়ূক বলে ডাকতে লাগল।

কূর গড়ূক তাতে রাগ করে না। রাগ সে করতে পারে না। রাগ হলেই ক্রোধ। ক্রোধে ক্ষমা ভাব থাকে না।

এমনি দিন যায়।

গুরুর অনেক শিষ্য। তাদের অনেকেই বড় বড় তপস্বী। কেউ এক মাসের উপবাস করে। কেউ দু'মাসের। এমন কি যারা বয়সে ছোট, কূর গড়ূকের মত, তারাও হেসে খেলে দু-দশ দিনের উপবাস করে। বিশেষ করে পর্ব দিনে ত করেই।

যারা বেশী উপবাস করে, তারাই কূর গড়ূককে উপহাস করে। বলে, ভোজন ভট্ট, নিত্যভোজী, এমনি আরো কত কি!

কিন্তু কূর গড়ূক এসব গায়ে মাখে না। আগে তা একটু লাগত, এখন আর নয়। ভাবে, এ'রা ত ঠিকই বলছেন। আমি উপবাস করতে পারি না, আমি মন্দভাগ্য, ও'রাই ধন্য যে কত সহজে উপবাস করেন।

এমনি আরো দিন যায়। যত দিন যায় ক্ষমার সাধনায় কূর গড়ূকের মন তত সহজ হতে থাকে, নির্মল হতে থাকে।

এর মধ্যে কে আবার রটিয়ে দেয়, কূর গড়ূক অচিরেই কৈবল্য লাভ করবে। এর কারণ বোধ হয় গুরু যে বলেছিলেন, আর আর তপস্যায় যে ফল হয় ক্ষমার সাধনায় তোমারো সেই ফল হবে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে সে সেকথা বলে ফেলেছিল।

সেকথা শুনে সবাই হাসে। বলে, তবেই হয়েছে। ও যদি কৈবল্য লাভ করবে তবে কুকুর বেড়ালও কৈবল্য লাভ করবে।

কূর গড়ূক সে সব কথাও শোনে, কিন্তু তা এখন আর তাকে বিচলিত করে না।

সেদিন পর্যুষণ পর্ব তিথি ছিল। এই তিথিতে ছোট বড় সবাইকে উপবাস করতে হয়। সেদিনও গুরুর আদেশ নিয়ে কূর গড়ূক এক গড়ূক ভাত নিয়ে এসেছে। সেই ভাত গুরুর সামনে রেখে বিধি অনুযায়ী সবাইকে আমন্ত্রণ করছে। তারপর গুরুর আদেশ পেলে নিভৃতে গিয়ে সে সেই অন্ন গ্রহণ করবে।

কিন্তু সেদিন যাঁর চার মাসের উপবাস ছিল, তিনি এই অনাচার সহ্য করতে পারলেন না। গুরুর উপস্থিতিতেই বিনয় ভঙ্গ করে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, ধৃষ্ট কোথাকার! আজ পর্যুষণ তিথিতেও উপবাস করলি না তার উপর ভিক্ষে নিয়ে এসে আমাদের দেখাতে এসেছিস। থুঃ—থুঃ। যা চলে যা এখান থেকে।

কূর গড়ূক ভর্ৎসিত হয়েও গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তাঁর আদেশের অপেক্ষায়। গুরুর ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন, বৎস, তুমি কি একদিনের জন্যও উপবাস করতে পার না? যাও খাওগে।

কূর গড়ূক খাবার পাত্র তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর নিভৃতে বসে সেই অন্ন খেতে লাগল। থুঃ-থুঃ করবার সময় চার মাসের তপস্বীর থুথুর ছিঁটা হয়ত তার পাত্রে এসে পড়েছিল। কিন্তু কূর গড়ূকের তার জন্য মনে কোন বিকার হয় না। সে সেই ভাত খেতে লাগল ও ভাবতে লাগল—সত্যিই সে ধৃষ্ট। তাঁরা কত কত তপস্যা করেন। আর সে? সে একবেলাও না খেয়ে থাকতে পারে না।

কুর গড়ুকের চোখ ছাপিয়ে জল নেবে এল।

কুর গড়ুক ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার চিতি শক্তি জাগ্রত হয়ে ঊর্দ্ধারোহণ করতে লাগল। কুর গড়ুকের অহংকার বলে কিছু ছিল না। এখন চেতনার ঊর্দ্ধারোহণে তার আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হতে লাগল। সে সেইখানে বসে উৎক্রান্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করে কৈবল্য লাভ করল।

কুর গড়ুক কৈবল্য লাভ করতেই আকাশে দেবদুন্দুভী বেজে উঠল। দেবতারা তাকে বন্দনা করতে এলেন।

গুরু ও গুরু শিষ্যরাও কুর গড়ুকের কৈবল্য লাভে কম বিস্মিত হলেন না। তাঁরাও তখন তাকে বন্দনা নমস্কার করলেন।

সত্যিই, তপস্যা বাইরের নয়, ভেতরের। সে তপস্যা ক্রোধ বিজয়ে, অহংকার বিজয়ে, অসীম ক্ষমাশীলতায়।

ব্রাহ্মণ ও জৈন সংস্কৃতির ধারা

পূরণ চাঁদ সামসুখা

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ভারতবর্ষে দুই প্রকার সংস্কৃতির ধারা চলিয়া আসিতেছে। এই দুইটি ধারার কোনটি পূর্বেকার এবং কোনটিই বা পরের তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবও নয় ও এস্থলে তাহার প্রয়োজনও নাই। এই দুইটি ধারার মধ্যে একটি ইহলোকের সুখ ও ভোগোপভোগের সামগ্রী পাইবার চেষ্টাকে লক্ষ্য ধরিয়া লইয়া সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পুরুষার্থ নিয়োজিত করে, অপরটি ইহলোক ও পরলোকের সুখাদিকে অল্পস্থায়ী ও তুচ্ছ মনে করিয়া শাশ্বত সুখ প্রাপ্তিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে পুরুষার্থ নিয়োজিত করিতে থাকে। সংস্কৃতির প্রথোমক্ত ধারাকে ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয়টীকে শ্রমণ সংস্কৃতি বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকের সুখের উপকরণ আহরণ করিতে ও মৃত্যুর পর স্বর্গে আরও অধিকতর সুখ পাইতে চেষ্টা করে আর শ্রমণ সংস্কৃতি ইহলোকের সুখাদি ত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখকেও অনিত্য ও তুচ্ছ মনে করিয়া মুক্তির অনন্ত আনন্দ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সংস্কৃতির ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া এবং একে অন্যের প্রভাবে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াও দুইটী স্রোতস্বিনীর ধারার ন্যায় সেই স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথক্ পৃথক্ চলিয়া আসিতেছে। জৈন সংস্কৃতি এই শ্রমণ সংস্কৃতিরই একটি ধারা। শ্রমণ সংস্কৃতিরই একটী ধারা বৌদ্ধ সংস্কৃতি। আরও কয়েকটী ধারা উদ্ভূত হইয়াছিল কিন্তু কাল প্রভাবে সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিশাল উদরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

জৈন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহলোক ও পরলোকের ভৌতিক সুখকে তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিয়া শাশ্বত আত্মিক পরম সুখ প্রাপ্তির দিকে পুরুষার্থ প্রয়োগ করাই শ্রমণ সংস্কৃতির ধ্যেয়। জৈন সংস্কৃতিও তদ্রূপ ভৌতিক সুখকে নগণ্য বলিয়া ত্যাগ করিয়া আত্মিক পরমানন্দ প্রাপ্তির দিকেই পুরুষার্থ প্রয়োগ করে এবং সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। যে সমস্ত সাধনার দ্বারা এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারা যায় সেই সমস্ত সাধনাই জৈন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। অহিংসা, সংযম ও তপস্যাই সেই সাধনা। বস্তুতঃ অহিংসার ভিত্তির উপরই জৈন সংস্কৃতির উচ্চ সৌধ নির্মিত হইয়াছে। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ পালন না করিলে সম্পূর্ণরূপে অহিংসা পালন করা যায় না বলিয়া জৈন সংস্কৃতিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটী ব্রত নির্দিষ্ট হইয়াছে—এই পাঁচটীকেই

পঞ্চ মহাব্রত বলে। আবার মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত না করিলে অহিংসা পালন করা সম্ভব নয় এবং তপস্যার অভাবে সংযম পালন করা যায় না বলিয়া অহিংসা, সংযম ও তপস্যাকে জৈন সংস্কৃতিতে এক কথায় ধর্ম বলা হয়।

জৈন সংস্কৃতিতে যে সমস্ত অনুশাসন, যে সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বা যে সমস্ত আদর্শ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তৎসমস্ত অহিংসা, সংযম ও তপস্যাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত। জৈন সংস্কৃতির অহিংসা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াই যজ্ঞে অনুষ্ঠিত পশুবলি প্রথা আজ ভারত হইতে চির নির্বাসিত করিয়াছে। জৈনগণ অহিংসাকে এত অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন যে সামান্য কীট, পতঙ্গ পিপিলীকাদি নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে পশু পক্ষী ও মনুষ্য পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, মৈত্রী ও সমভাব পোষণ করিতে জৈন শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পশু, পক্ষী হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করা, প্রহার করা, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তী কাজ করাইয়া লওয়া, অর্থাৎ তাহার মন, বচন ও কায়াকে কোনও প্রকার কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ। জৈন সংস্কৃতিতে অহিংসার ভাবনা এত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে যে জৈনগণের ধার্মিক আচারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে—

ক্ষামেমি সব্বে জীবে সব্বে জীবা ক্ষমন্তু মে।
মিত্তী মে সব্বভূএসু, বৈরং মজ্ঝং ন কেণই॥

এই শ্লোকটি প্রতিদিন পাঠ করিতে হয়। ইহার অর্থ—আমি সমস্ত প্রাণীকে ক্ষমা করিতেছি, সমস্ত প্রাণী আমাকে ক্ষমা করুক, আমার সকলের সহিত মৈত্রী ভাব আছে কাহারও সহিত বৈরভাব নাই। ইহাই জৈন সংস্কৃতিব প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের যে যে স্থানে জৈনগণ আছেন তৎতৎ স্থানেই গবাদি পশুর রক্ষা ও পালন করিবার জন্য যে সমস্ত পশুশালা বা পিংজরাপোল স্থাপিত আছে দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমস্তই জৈন অহিংসা ও দয়া ভাবনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পুত্র উৎপাদন করা এক প্রধান কর্তব্য কিন্তু জৈন সংস্কৃতিতে পুত্রোৎপাদন সেরূপ আবশ্যক নয়। যে কোন ব্যক্তি বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত যে কোন অবস্থায়, বৈরাগ্যের দ্বারা প্রভাবিত থাকিলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণ ধর্ম অবলম্বন করিতে পারে, পুত্রোৎপাদন না হইয়া থাকিলে তাহা তাহার মুক্তি-প্রাপ্তির পক্ষে বাধক হইতে পারে না।

তপস্যা জৈন সংস্কৃতির একটী বৈশিষ্ট। জৈন সাহিত্য তপস্যার বর্ণনা ও উদাহরণের দ্বারা পরিপূর্ণ। শেষ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর স্বয়ং ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সাড়ে বার বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ সাধক অবস্থায় ইনি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ও বহু শারীরিক নির্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন তাহা

বিস্ময় ও সম্ভ্রম উৎপাদন করে। আজও জৈন সাধু ও শ্রাবক (গৃহস্থ) এত কঠোর তপস্যা করেন যাহা সাধারণতঃ অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিতে সর্বোচ্চ বর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণেরই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার পর ধর্মোপদেশকের পদে আরূঢ় হইবার অধিকার আছে—শূদ্রগণের পক্ষে এই সমস্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিবার মার্গ রুদ্ধ। কিন্তু জৈন সংস্কৃতিতে এইরূপ কোন বিধিনিষেধ নাই। যে কোন ব্যক্তি—সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি চণ্ডাল পর্যন্ত যে কোন জাতি-বর্ণেরই হউক না কেন—বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাধুমার্গ অবলম্বন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে ধর্মোপদেশকের পদে উন্নীত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে এবং উচ্চ জাতির গৃহস্থগণ তাহার পাদ বন্দন করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করে না। চণ্ডাল বংশোদ্ভূত হরিকেশী বল নামক সাধুর চারিত্রিক উৎকর্ষের কথা জৈন শাস্ত্রে সসম্ভ্রমে বর্ণিত আছে।

একই দেশে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সংস্কৃতির উৎপত্তি, অতএব ইহা স্বাভাবিক যে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্বেও জৈন সংস্কৃতি তাহার বৈশিষ্টের ধারা এই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

জিজ্ঞাসিত হয়ে সংজয়ন্ত পূর্বজন্মের বৈরই এর কারণ রূপে নির্দেশিত করলেন ও তাঁদের ধর্মোপদেশ দিয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলেন।

বিদ্যাধর রাজেরা তখন ধরণেন্দ্রের পায়ে পতিত হয়ে তাঁদের বিদ্যা তাঁদের আবার ফিরিয়ে দিতে বললেন। ধরণেন্দ্র তখন বললেন—যন্ত্রণা সহ্য করেই এখন হতে তোমাদের বিদ্যার্জন করতে হবে ও শ্রমণ, জিনালয় ও স্বামীর নিকটে স্থিতা নারীর মর্যাদা যে লঙ্ঘন করবে তার বিদ্যা তখনি নষ্ট হয়ে যাবে। বজ্রদৃঢ়ের কুলে কোনো পুরুষ আর বিদ্যা অর্জন করতে পারবে না। কেবল মেয়েরাই তা পারবে ও তাও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। দেবতা, মুনি বা মহাপুরুষের সন্দর্শনে যন্ত্রণার লাঘব হয়ে সহজেই বিদ্যা সিদ্ধ হবে। এই বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন।

দেব, যেখানে সংজয়ন্ত কেবল জ্ঞান লাভ করেছিলেন এই সেই স্থান। এই খানে এসে আমাদের বিদ্যা সিদ্ধ করতে হয়। কুলবৃদ্ধাদের কাছে আমি যেমন শুনেছিলাম তা আপনাকে নিবেদন করলাম। আপনার উপস্থিতি আমার যন্ত্রণার লাঘব ও বিদ্যাসিদ্ধি তরান্বিত করে দেয়।

তারপর একটু থেমে বালচন্দ্রা আবার বলতে আরম্ভ করল—

দেব, আমাদের কুলে অনেকদিন আগে নয়নচন্দ্র নামে এক রাজা হন। কেতুমতী নামে তাঁর এক কন্যা ছিল। বিদ্যাসিদ্ধ করতে গিয়ে সেও আমারই মত বিপন্না হয় ও পূর্ববর্তী এক বসুদেব তাকে সেই বিপন্নাবস্থা হতে উদ্ধার করেন। কেতুমতী তাঁকে আত্মদান করে। দেব, আমিও সেরূপে আপনাকে আত্মদান করছি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। এখন বলুন আপনার আমি আর কি প্রিয় করতে পারি?

আমি বললাম, তুমি যদি সত্যিই আমার কিছু প্রিয় করতে চাও ত তোমার অর্জিত বিদ্যার দুটি বেগবতীকে দান কর।

বালচন্দ্রা মাথা ঈষৎ নত করে আমার আদেশ গ্রহণ করল। তারপর আমাকে প্রদক্ষিণ করে বেগবতীর হাত ধরে আকাশে উঠে পড়ল। আমি চেয়ে দেখলাম নীল ও রক্তকমল যেন নভঃপথ দিয়ে উড়ে চলেছে।

তারা উড়ে যাবার পর আমি দক্ষিণের দিকে নদী ও শৈলশ্রেণী দেখতে পেয়ে সেই দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পরও দেখলাম আমি একটুও ক্লান্ত হইনি। এ সমস্ত বালচন্দ্রার স্নেহ জন্যই বলে আমার মনে হল।

অনেক দূর যাবার পর আমি এক আশ্রম দেখতে পেলাম। সেই আশ্রমে প্রবেশ করতেই মুনিরা আমায় স্বাগত জানালেন। আমিও তাঁদের তপশ্চর্যা নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হতে লাগল। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন—

শ্রাবস্তী নামে এক নগর আছে। সেখানে এণীপুত্র নামে রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর মেয়ের নাম প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী। সে নব প্রস্ফূটিত প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের মতোই মনোহরা। দেহবর্ণ চম্পকতুল্য। আকৃতি নয়ন ও মনের আনন্দদায়ী। সেই তরুণীকে সাক্ষাৎ শ্রীদেবী বলেই ভ্রম হয়। তার পিতা যাতে তার অভিমত বর সে চয়ন করতে পারে তার জন্য স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। স্বয়ম্বর সভায় বিভিন্ন দেশ হতে রাজন্যবর্গ উপস্থিতও হন কিন্তু প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী কাউকেই বরণ না করে সমুদ্র প্রত্যাহত নদীর মত অন্তঃপুরে ফিরে যায়। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে রাজন্যবর্গ এণীপুত্রকে বলেন, আমাদের মধ্যে এমন একজনও রাজন্য নেই যাঁকে রাজকন্যা বরণ করতে পারতেন? একে কি আমরা আমাদের পরাজয় ও অপমান বলে ধরে নেব?

রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন, আমিই প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীকে স্বয়ম্বরা হতে বলি তাই তাকে বাধ্য করার প্রশ্ন ওঠে না। সে যদি কাউকে বরণ না করে থাকে তবে তাতে অপমানের প্রশ্নই বা কোথায়?

সে কথা শুনে রাজারা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন আপনি অন্যায় কথা বলছেন। শেষে শক্তিরই জয় হবে। আমরা তাকে আমাদের মধ্য হতে কাউকে বরণ করতে বাধ্য করব।

রাজা বললেন শক্তির জয় হবে কিনা তা যুদ্ধক্ষেত্রেই নির্ধারিত হবে। অকারণে যদি আপনারা বিক্ষুব্ধ হন তবে আপনাদের যেরূপ ইচ্ছে করুন। এই বলে রাজা নগরে ফিরে গেলেন ও নগরদ্বার বন্ধ করে দিলেন।

রাজারা তখন প্রস্তুত হয়ে নগর আক্রমণ করলেন। এণীপুত্রও নিজ সৈন্য নিয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীকে পবার জন্য রাজন্যবর্গ অদম্য শক্তিতে যুদ্ধ করতে লাগলেন কিন্তু এণীপুত্র প্রবল বাতাস যেমন মেঘপুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় সেইরূপ সেই রাজন্যবর্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন।

পরাজিত ও অপমানিত হয়ে সেই রাজন্যবর্গের অনেকে পর্বত শিখর হতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন, অনেকে অপর ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং আমরা ৫০০ জন যারা পরস্পরের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলাম তাপস ধর্ম গ্রহণ করি। সংসারে বিরক্ত হয়ে তাই এখন আমরা এখানে অবস্থান করছি, এখন বলুন আপনি কে? আপনাকে স্বর্গের অধিবাসী বলেই আমাদের মনে হচ্ছে। আপনি আমদের ধর্মোপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করুন।

আমি তাঁদের ধর্মোপদেশ দিলাম। তাঁরাও আমায় সম্মানিত করলেন। তারপর তাঁদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে আমি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে হতে এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। গ্রামটীকে আমার সমৃদ্ধ বলেই মনে হল। সেই গ্রামের অধিবাসীরাও দেবতা জ্ঞানে আমার আদর আপ্যায়ন ও পূজা করল। আমিও তাদের আতিথ্য গ্রহণ করে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলাম।

বাপী, উদ্যান ও হর্ম্যাদি শোভিত শ্রাবস্তীকে মর্ত্যের অমরাবতী বা কুবেরের অলকা বলে অভিহিত করা যায়। আমি সেই নগরে বিচরণ করতে করতে এক মন্দিরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। মন্দিরটীর রচনা অভিনব ছিল। আমি তাই সেই মন্দিরে প্রবেশ করলাম ও চিন্তা করতে লাগলাম এই মন্দিরটী কার?

মুখ্য প্রবেশ পথের সম্মুখেই ১০৮টী স্তম্ভ সমন্বিত সভাগৃহ দেখলাম। সভাগৃহের কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কাঠের ছিল। সেই খান হতেই আমি অলিন্দে অবস্থিত এক মহিষ দেখতে পেলাম যার তিনটী মাত্র পা ছিল। তার শরীর রক্তমণি প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হয়ে ছিল, শিঙ্ সূর্যরাজ নীলার, চোখ দুটী ছিল লোহিতাক্ষ প্রস্তর নির্মিত। খুর ছিল কমলরাগ মণি চর্চিত ও স্কন্ধদেশ ছিল মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণঘন্টীযুক্ত।

সেই সময় সেই মন্দিরে এক ব্রাহ্মণকে প্রবেশ করতে দেখে আমি তাঁকে এই মহিষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, ভগবন্, বহুমূল্য প্রস্তরাদির অভাবই কি এর ত্রিপাদের কারণ না অন্য কিছু? আমি দূর দেশাগত তাই জানতে ইচ্ছে করি।

তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, ভদ্র, এর কারণ আছে যদি শুনতে ইচ্ছে কর তবে আমি বলতে পারি।

আমরা তখন একস্থানে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন বলতে আরম্ভ করলেন—

ভদ্র, এই নগরেই আমি জন্মগ্রহণ করি। মৃগদৃঢ় সম্পর্কে যে গাথা চারণদের মুখে আমি বারবার শুনেছি সেই গাথা তোমায় আমি শোনাচ্ছি।

এক সময় জিতশত্রু নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর মৃগদৃঢ় নামে এক পুত্র ছিল। মৃগদৃঢ় যেমন বিনয়ী ছিল তেমনি সাহসী, বুদ্ধিমান, উদার ও প্রজাবৎসল।

সেই সময় কুণাল দেশে কামদেব নামে এক বণিক বাস করতেন। কামদেব মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ধনরত্ন ভূমিক্ষেত্র ছাড়াও তাঁর বিরাট একটী গো-বাথান ছিল। একবার শরৎকালে তিনি সেই গো-বাথান পরিদর্শন করতে যান। পরিদর্শন অন্তে তিনি যখন আহারাদির পর সপ্তপর্ণ তরুতলে বিশ্রাম করছিলেন তখন দণ্ডপ অদূরবর্তী এক মহিষকে ডাক দিয়ে বলল, ভদ্রগ, এদিকে এস, আমাদের স্বামী এসেছেন। সেকথা শোনামাত্র সেই মহিষ কামদেবের নিকটে উপস্থিত হল।

কামদেবের পরিজনদের ভয় পেতে দেখে দণ্ডপ বলল, আপনারা ভয় পাবেন না। মহিষটী ভদ্রজাতীয়, ও কারু অনিষ্ট করে না। মহিষটী তখন জানু পেতে শ্রেষ্ঠীর চরণে নিজের মাথা রেখে দিল।

কামদেব তখন দণ্ডগকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও কেন এইরূপ করছে? ও কি বলতে চায়?

দণ্ডগ প্রত্যুত্তরে বলল, দেব, মুনিদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করে ও মৃত্যু ভয়ে ভীত। আমি ওকে অভয় দান করেছি। আপনার কাছেও ও সেই অভয় চায়।

শ্রেষ্ঠী মনে মনে চিন্তা করলেন, ও যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই ও নিজের পূর্ব জন্ম জানতে পেরেছে। শ্রেষ্ঠী তাই তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান কর। কেউ তোমাকে কষ্ট দেবে না।

ভদ্রগ তখন উঠে সেই বাথানে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে লাগল।

তিন দিন পর শ্রেষ্ঠী যখন নগর প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করলেন তখন ভদ্রগ তাঁর অনুসরণ করল। শ্রেষ্ঠীর অনুচরেরা তাকে বাধা দিতে গেল কিন্তু শ্রেষ্ঠী তাদের নিবারিত করে বললেন, ও যদি নগরে আসতে চায় ত আসতে দাও! তোমরা কেবল দেখো কেউ যেন ওর অনিষ্ট না করে।

এভাবে ভদ্রগ শ্রেষ্ঠীর ঘরে এসে বাস করতে লাগল।

একবার শ্রেষ্ঠী রাজসন্দর্শনে যাবার জন্য যখন ঘর হতে বার হচ্ছিলেন তখন ভদ্রগ তাঁর অনুসরণ করল। রাজসকাশেও সে পূর্বের মত জানু পেতে মাথা মাটিতে রেখে দিল।

রাজা শ্রেষ্ঠীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রেষ্ঠী প্রত্যুত্তরে বললেন, দেব ও আপনার কাছে অভয় প্রার্থনা করছে।

রাজা ভদ্রগের ব্যবহারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠলেন—ওর এই বিবেক সত্যিই প্রশংসার্হ। তারপর তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি এই নগরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পার। কেউ তোমার অনিষ্ট করবে না। তারপর মন্ত্রীকে ডেকে নগরে এই ঘোষণা করাতে বললেন যে ভদ্রগের অনিষ্ট করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

ভদ্রগ তখন রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল।

নগরের অধিবাসীরা যখন দেখল যে ভদ্রগ কারুর অনিষ্ট করে না তখন তারাও তাকে নানাভাবে আপ্যায়িত করতে লাগল। ভদ্রগ এভাবে সমস্ত দিন নগরে বিচরণ করে শ্রেষ্ঠীর গৃহে পুত্রের মত বাস করতে লাগল।

একবার কুমার মৃগদৃঢ় উদ্যান হতে পরিজনসহ প্রাসাদে ফিরছিলেন। পথে ভদ্রগকে যদৃচ্ছ বিচরণ করতে দেখে তিনি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ও তরবারি দিয়ে তার পায়ে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে ভদ্রগের এক পা কেটে গেল। কুমার

আবার তরবারি তুলে যেই তাকে আঘাত করতে যাবেন সেই সময় তাঁর অনুচরেরা তাঁকে নিবারিত করল। বলল, কুমার ভদ্রগ অবধ্য কারণ মহারাজ ওকে অভয় দিয়েছেন।

কুমার মৃগদৃঢ় রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন ও ভদ্রগও কোনমতে তিন পায়ে চলতে চলতে অনাথ স্তম্ভের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। ভদ্রগের এক পা কর্তিত দেখে লোকে সমবেদনা প্রকট করতে লাগল ও রাজপুরুষেরা যথাতথ্য অবগত হয়ে রাজাকে গিয়ে নিবেদন করল, দেব, কুমারের অনুচরেরা ভদ্রগের এক পা কেটে ফেলেছে। ভদ্রগ অনাথ স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য আমি কুমারের মৃত্যু দণ্ড দিলাম।

মন্ত্রী সেকথা শুনে বললেন, দেব, মহাদেবী কুমারকে অলংকৃত করতে চান বলে আদেশ পাঠিয়েছেন কিন্তু আপনার আদেশও অলঙ্ঘনীয়। তাই প্রথমে কুমারকে মহাদেবীর কাছে যেতে দিন। পরে আপনার কাছে তাকে উপস্থিত করব।

রাজা বললেন বেশ, তাই করো।

মন্ত্রী তখন রাজকুমারকে ডেকে সমস্ত কথা বললেন ও সে যে জঘন্য পাপ করেছে তাও তার মনে বসিয়ে দিলেন। তারপর তার মাথা মুণ্ডিত করিয়ে সাধু বেশ পরিয়ে হাতে রজঃহরণ ও ভিক্ষা পাত্র দিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত করলেন।

রাজা মুনি বেশে মৃগদৃঢ়কে প্রথমতঃ চিনতে পারলেন না। ভাবলেন এই মুনিবর কেন এখানে আসছেন!

সেই সময় মন্ত্রী রাজার পায়ে পতিত হয়ে বললেন, দেব, এখন বলুন মুনির কি প্রাণদণ্ড দেওয়া যায়?

রাজার চোখ দিয়েও তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি মন্ত্রীকে তুলে আলিঙ্গন বদ্ধ করে বললেন, তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে না অথচ বুদ্ধি বলে কুমারের প্রাণ রক্ষা করে নিলে।

রাজা তখন মৃগদৃঢ়কে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, পুত্র, প্রথমেই তুমি সংযম ভার গ্রহণ করেছ। এখন এই রাজ্য ভার গ্রহণ কর।

মৃগদৃঢ় বলল, পিতা, আমি সংসারের অসারতা বুঝতে পেরেছি। আমার রাজ্য বা কামভোগে কোনো আকর্ষণ নেই। আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত। আমায় আদেশ দিন আমি সাধুমার্গ অবলম্বন করি।

রাজা বললেন, পুত্র এখন তোমার নূতন বয়েস। তাই প্রথমে রাজ্য সুখ ভোগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো।

মৃগদৃঢ় বলল, পিতা, জীবন যখন অনিশ্চিত, যখন জানি না কতদিন বাঁচব তখন ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। তাই আপনি আদেশ দিন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

রাজা যখন কোন ভাবেই মৃগদৃঢ়ের মত পরিবর্তন করাতে সমর্থ হলেন না তখন বললেন, পুত্র তাহলে তোমার প্রব্রজ্যা উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন করি।

মৃগদৃঢ় তখন বলল, পিতা, তারও কোন প্রয়োজন নেই কারণ আমি নাম খ্যাতি আদির অভিলাষী নই।

রাজা তখন বললেন, পুত্র, ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের অনুরূপই তোমার প্রত্যুত্তর হয়েছে তবুও আমি মহোৎসবের আয়োজন করব। এই বলে তিনি অনুচরদের ডেকে উৎসবের আয়োজন করতে বললেন।

স্নান ও অভিষেকাদির পর পালকীতে করে কুমারকে প্রিয়কর উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সীমন্ধর মুনি অপেক্ষা করছিলেন। রাজা কুমারকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

মৃগদৃঢ়ের দীক্ষান্তে রাজা, কামদেব, মন্ত্রী ও পুরবাসীরা নগরে ফিরে এলেন। মন্ত্রী তখন ভদ্রগের নিকটে গেলেন ও তাকে ধর্ম শোনালেন ও কুমারকে ক্ষমা করতে বললেন। কুমার তাঁর দুষ্কর্মের জন্য চারিত্র গ্রহণ করেছেন সে কথাও বললেন। সে কথা শুনে ভদ্রগের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে মন্ত্রীর পায়ে মাথা নত করে দিল।

মন্ত্রী তখন তাকে পণ্ডিত মরণের জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করতে বললেন। ভদ্রগ স্বীকৃতি দিলে তিনি তাকে পঞ্চ ব্রত দিলেন। ভদ্রগ তা গ্রহণ করল। তারপর মন্ত্রী তাকে পঞ্চ পরমেষ্ঠী মন্ত্র শোনালেন। সেই মন্ত্র শুনে সে স্থির হয়ে গেল। মন্ত্রী তাকে দৃঢ় রূপে ব্রত পালন করতে বলে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

মন্ত্রী চলে যাবার পর সেইখানে কামদেবের অনুচরেরা এল। তারা তার ঘা পরিষ্কার করে প্রলেপ দিল ও খাবারে জন্য যবাদি রাখল। কিন্তু সে আহার্য গ্রহণ করল না। তখন তারা তাকে ফুল ও গন্ধাদি দিয়ে সম্মানিত করল। নগর বাসীরাও তার পূজো করতে আরম্ভ করল। কামদেব নিজেও প্রতিদিন সেখানে এসে তাকে ধর্ম কথা শোনাতে লাগলেন। এভাবে ১৮ দিন অনশনে থাকবার পর সে দেহত্যাগ করল।

ওদিকে মুনি মৃগদৃঢ় ২২ দিনের দিন কেবলজ্ঞান লাভ করলেন। দেবদুন্দুভি নিনাদিত হল। দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করলেন। মৃগদৃঢ় কেবল জ্ঞান লাভ করছেন জেনে রাজা জিতশত্রুও তাঁর বন্দনা করতে এলেন।

ভদ্রগ মৃত্যুর পর স্বর্গে লোহিত যক্ষ রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিল। সেও সেখানে কেবলীর বন্দনা করতে এল।

কথা প্রসঙ্গে মৃগদৃঢ় ভদ্রগ ও তাঁর নিজের পূর্ব জীবনের বৈরের উল্লেখ করলেন যার জন্য তিনি তার পা কেটে ফেলেছিলেন।

রাজা জিতশত্রুর মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি কনিষ্ঠপুত্র সিংহজয়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

লোহিত যক্ষ কামদেবের হাতে বিপুল অর্থ দিয়ে মৃগদৃঢ়র মন্দির নির্মাণ করতে বললেন। সেখানে তিন পায়ের ভদ্রাঙ্গের মহিষ মূর্তিও থাকবে।

কামদেব তাঁর নির্দেশ মত এই মন্দির নির্মাণ করান। মহিষের তিন পা হবার এই কারণ।

এই ঘটনার পর আটপুরুষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কামদেবের বংশে যিনি এখন বর্তমান তাঁর নামও কামদেব। তাঁর বন্ধুমতী নামে এক কন্যা আছে যার রূপের তুলনা হয় না। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে অনেকে তার পাণি প্রার্থনা করে কিন্তু শ্রেষ্ঠী বলেন তিনি তার সঙ্গে বন্ধুমতীর বিবাহ দেবেন যাঁর প্রতি তাঁর পূর্বপুরুষ কামদেবের প্রত্যাদেশ হবে। তুমি যদি এই প্রাসাদ ও মৃগদৃঢ়ের মূর্তি দেখতে চাও তবে এখানে অপেক্ষা কর। শীঘ্রই পূজার জন্য কামদেব এখানে আসবেন—এই বলে সেই ব্রাহ্মণ চলে গেলেন।

কৌতূহলপরবশ হয়ে তার পূর্বেই আমি মন্ত্র বলে সেই মন্দিরের কুলুপ খুলে তাতে প্রবেশ করলাম। ধূপ গন্ধে আমোদিত সেই প্রাসাদকে মণি দীপের আলোয় দেববিমান বলেই আমার মনে হচ্ছিল। আমি মৃগদৃঢ়কে প্রণাম জানালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে শ্রেষ্ঠীর অনুচরদের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আমি তখন কামদেবের মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তার পর মুহূর্তেই দরজা খুলে গেল। বাইরের এবং ভেতরের আলোর তফাৎ করা কঠিন ছিল। আমি সেই আলোয় কামদেবের মতই সুন্দর কামদেবকে দেখতে পেলাম। তিনি সামান্য হলেও বহুমূল্য অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ধারণ করে ছিলেন।

তিনি শ্বেতপুষ্পে দেবতাদের অর্চনা করে পিতামহের মূর্তির কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন, পিতামহ, আপনি দয়া করে বলুন বন্ধুমতীর বিবাহ কার সঙ্গে হবে?

সেই মুহূর্তে পদ্মকোরক তুল্য আমার হাত আমি বাড়িয়ে দিলাম। কামদেব মুহূর্তেই আমার হাত ধরে ফেললেন। তাঁর মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি বাইরে গিয়ে বললেন যে দেবতারা বন্ধুমতীর বর প্রেরণ করেছেন।

তিনি তারপর আমার নিকটে এসে আমায় রথে আরোহণ করতে বললেন। আমি রথে আরোহণ করলে তিনিও রথে আরোহণ করলেন।

কামদেবের অনুচর ও নগরবাসীরা আমার প্রশংসা করতে লাগল। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা, নয়ত বিদ্যাধর। এত রূপ মানুষ সম্ভব নয়। এভাবে তাদের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমি কামদেবের গৃহে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমায় দেখে মেয়েরা বলে উঠল, বন্ধুমতী সত্যিই ভাগ্যবতী যে এমন নয়নের আনন্দ বর লাভ করল।

আমি রথ হতে অবতরণ করলে তারা আমায় এক সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে আমায় বর বেশে সাজান হল। বহুমূল্য অলঙ্কার পরিহিতা এয়ো স্ত্রীরা

ক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর বধূবেশে সজ্জিতা বন্ধুমতীকে সেখানে নিয়ে আসা হল।

বন্ধুমতী দুর্বাগ্রথিতকুসুমদাম ধারণ করেছিল, চূড়ামণির প্রভায় তার কৃষ্ণ কেশ রাজি চিক চিক করছিল সেই পদ্মাননার চোখ দুটি ছিল অবর্ণনীয়। বাহুদুটি ছিল মৃণাল তুল্য। স্তনের বিস্তারের জন্য তার কটিদেশ স্বভাবতঃই ক্ষীণ দেখাচ্ছিল। নিতম্বের গুরুভার জন্য পদ্মতুল্য তার চরণ সেই ভার বহন করতে যেন অসমর্থ হয়ে পড়েছিল।

সেই সময় ব্রাহ্মণও এসে পড়লেন। তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়ে আমাদের বিবাহ দিলেন। সপ্তপদী অন্তে আমরা কেলিগৃহে প্রবেশ করলাম। সেই রাত্রি বন্ধুমতীর সঙ্গে আমার আনন্দে ব্যতীত হল।

তারপর এক শুভদিনে পালকীতে করে বন্ধুমতী সহ আমি রাজপ্রাসাদে গেলাম। পথে লোকে আমার রূপের প্রশংসা করতে লাগল।

প্রাসাদে উপস্থিত হলে সভাসদেরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি উঠে আমাদের স্বাগত জানালেন। তিনি আমাদের বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিলেন। কামদেব রাজার প্রসাদ বলে তা গ্রহণ করলেন। তারপর আমরা কামদেবের ঘরে ফিরে এলাম।

একদিন যখন আমি বন্ধুমতী সহ অলিন্দে বসেছিলাম তখন সুন্দর বস্ত্রাভূষণে ভূষিতা কয়েকজন যুবতী সেখানে এসে উপস্থিত হল।

বন্ধুমতী তাদের দিকে চেয়ে বলল, দেব এরা সকলেই প্রিয়ঙ্গু সুন্দরীর নাটক মণ্ডলীর সদস্যা।

তারা আমায় প্রণাম করলে তোমরা সুখী হও, সমৃদ্ধিশালিনী হও বলে আমি আশীর্বাদ দিলাম। তখন তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি কিন্নরী, আমি ময়ূরকিরিয়া, আমি হাসপট্টলিয়া, আমি রাজসেনিয়া, আমি কৌমুদী, আমি পদ্মিনী। এভাবে আটজন তাদের নাম বলল। নাম বলবার সময় তাদের পদ্মের মত মুখ আনন্দে বিকসিত হয়ে উঠল।

তারপর তারা বন্ধুমতীকে প্রণাম করল। বন্ধুমতী তাদের আলিঙ্গন দিল। তারা সকলেই বচন-পটিয়সী। হাসতে হাসতে বন্ধুমতী তাদের বলল, হলা, তোমাদের আমি বহুদিন পরে দেখছি। আমার প্রতি তোমাদের কি ভালবাসা নেই?

পরিহাসছলেই তারা উত্তর দিল, সেকথা সত্যি কিন্তু আমাদের স্বামিনী তোমাকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। নূতন প্রেমিক পেলেই কি পুরাতন, যার প্রতি ভালবাসা রয়েছে, তাকে ভুলে যেতে হয়?

কিছুক্ষণ পর বন্ধুমতী বলল, দেব আমি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর কাছে যাচ্ছি আমি তাকে অনেকদিন দেখিনি।

বন্ধুমতী চলে গেলে সেই নটিনীরা আমায় এক উদ্যানে নিয়ে গেল। সেখানে মুরজ মুরলী মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র দেখলাম। এসব পূর্বায়োজিত বলে মনে হল। তারা সেই যন্ত্রগুলি হাতে তুলে নিয়ে বলল, বন্ধুমতীর বিরহ যাতে আপনার অসহনীয় না হয় তার জন্য এই সামান্য আয়োজন করেছি। এই বলে তারা গান করতে আরম্ভ করল যার অর্থ হল—

একদল সার্থবাহ বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। পথে বন পড়ে। সেখানে সিংহের ভয়। সন্ধ্যা হওয়ায় বণিকেরা সেখানে তাঁবু ফেলল। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তারা সতর্ক হয়ে রইল। যথা সময়ে সিংহ এসে উপস্থিত হল। তারা এতে ভীত হল। এমন সময় সেখানে এক শৃগালী এল। সেই সিংহ সেই শৃগালীর সঙ্গে রমণ করতে লাগল। বণিকেরা তখন সিংহকে আক্রমণ করল। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, অনর্থক পশুহত্যা করে কি লাভ? শৃগালীকে যে রমণ করে তাকে কি সিংহ বলা যায়? বণিকদের তাতে সাহস ফিরে এল।

তারা উচ্ছল হয়ে সেই গান গাচ্ছিল। কিন্তু তাদের আশয় বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হল না। গানের লক্ষ্য আমি। আমি সিংহ আর বন্ধুমতী শৃগালী। আমি তাই মাঝ খানেই বলে উঠলাম, দেখ দেখ এই চতুরিকাদের! ওরা কি অভব্য গান গাইছে।

সেকথা শুনে তারা লজ্জিত হল ও অন্য গান গাইতে আরম্ভ করল। তারা নৃত্য-গীতে আমায় যথেষ্ট আনন্দ দিল। আমি তখন তাদের হাসতে হাসতে বললাম, ওগো সুতনুকার দল, আমি তোমাদের একটি বর দেব, তোমরা যা চাইবে তাই পাবে।

যদি তাই হয় তবে বলুন আপনি এখানে কোথা হতে এসেছেন?

আমি বললাম, বেগবতী হতে বিযুক্ত হয়ে।

তার আগে?

মদনবেগার কাছ হতে।

তারো আগে?

তারো আগে? একের পর এক সোমশ্রী, রত্নাবলী, পৌণ্ড্রা, অশ্বসেনা, পদ্মা, কাবিলা, মিত্রশ্রী, ধনশ্রী, সোমশ্রী, নীলযশা, গন্ধর্বদত্তা, শ্যামলী, বিজয়সেনা, শ্যামার কাছ হতে।

কিন্তু তারো আগে?

সৌরপুর নগর হতে যেখানে সমুদ্র বিজয় ও দশ দশার্হ বাস করেন। তাঁরা সকলে অন্ধক বৃষ্ণির পুত্র। সকলেই কুবেরের মত ঐশ্বর্যশালী এবং আমি তাঁর দশম পুত্র। রাজকীয় কর্তব্য হতে মুক্ত করায় বিদ্যাধরদের সঙ্গে পৃথিবী পর্যটন করছি। পর্যটন করতে করতে আমি এখানে এসেছি।

এভাবে তারা হাসতে হাসতে ঠেলাঠেলি করতে করতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমার মুখ দিয়ে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়ে নিল। আমার তখন মনে হল প্রিয়ঙ্গু-সুন্দরী বন্ধুমতীর স্বামী কে, সে কি ধরণের লোক, কোথা হতে এসেছে এসব জানবার জন্য এদের প্রেরণ করেছে। আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

এভাবে সমস্ত দিন অতীত হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় পরিচারিকাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বন্ধুমতী ফিরে এল। নটিনীরাও তখন আমায় প্রণাম জানিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেল।

অসাধারণ রত্নালঙ্কার ও বিচ্ছিন্ন মেখলায় বন্ধুমতীকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল।

বন্ধুমতী সুখে উপবিষ্ট হলে তার দিন কিভাবে ব্যতীত হল জিজ্ঞাসা করলাম।

সে তখন বলতে আরম্ভ করল—

রাজপ্রাসাদে গিয়ে প্রথমেই আমি রাজা ও রাণীকে আমার প্রণাম জানালাম। তারপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলাম। সেখানে শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা দুজন সাধ্বীকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁদের প্রণাম করে তাঁদের কাছে বসলাম, তাঁরা সেখানে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। উপদেশ অন্তে তাঁরা চলে গেলে আমি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর কাছে গেলাম। আমায় দেখে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও এসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আলিঙ্গন দিল।

আমি সুখাসনে তার নিকট উপবিষ্ট হলে সে অর্দ্ধ নিমিলিত চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, সখি, আমার প্রিয়তম কেমন আছে ?

আমি তার কি প্রত্যুত্তর দেব ভেবে পেলাম না। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সে নিজের পরিচারিকাকে ডাক দিল। পরিচারিকারা আমায় স্নান বিলেপন করিয়ে আনলে সে নিজের হাতে অলঙ্কার দিয়ে আমায় সাজিয়ে দিল। এই সপ্তনরী মেখলা ঢিলা হওয়ায় আমার নিতম্বে অতিরিক্ত ক্ষৌমবস্ত্র জড়িয়ে তা পরিয়ে দিয়ে আমায় আলিঙ্গন করে আমায় বিদায় দিল। আমি রাজা ও রাণীকে প্রণাম করে ফিরে এলাম।

এরপর বন্ধুমতী আনন্দে শীৎকার করতে করতে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগল।

এর কয়েকদিন পর রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষক আমার সঙ্গে দেখা করল ও অশোক বনের একান্তে নিয়ে গিয়ে আমায় প্রণাম করে বলল—

দেব, রাজা এণীপুত্রের প্রধান দ্বাররক্ষকের নাম ছিল গঙ্গাপালিত। আমি তাঁর পুত্র নাম গঙ্গা রক্ষিত। আমার মায়ের নাম ভদ্রা।

আমার তখন বয়স অল্প। আমি শ্রাবস্তীর পথের ধারে বসে আমার মিত্র বীণা-

দত্তের সঙ্গে গল্প করছিলাম। এমন সময় গণিকা রঙ্গপতাকার দাসী এসে বীণাদত্তকে ডাক দিল। বলল রঙ্গপতাকা ও রাজসেনিয়ার মোরগে মোরগে লড়াই হবে তাই স্বামিনী তোমাকে এখুনি ডেকেছেন।

বীণাদত্ত আমার দিকে চাইল। সেই দাসী তখন বলে উঠল, যে গণিকালয়ে একবারও যায়নি সে ওখানকার আকর্ষণের কী জানবে?

সে কথায় অপমানিত বোধ করায় আমি বীণাদত্তের সঙ্গে রঙ্গপতাকার ঘরে গেলাম। সেখানে গন্ধদ্রব্য ও মাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থিত হলাম। এক কোটি কার্ষাপণের বাজী রাখা হল। বীণাদত্ত রঙ্গ পতাকার মোরগ ধরেছিল। সেই মোরগটি জিতল। রাজসেনিয়াকে এক কোটি কার্ষাপণ দিতে হল। এবার দশগুণ বাজী ধরা হল। আমি রাজসেনিয়ার মোরগ ধরলাম। রাজসেনিয়া এবারে জিতল।

রাজসেনিয়া আমার ঘরে ফিরতে দিল না। তাই আমি সেইখানেই রয়ে গেলাম। তারপর কতদিন মাস বর্ষ অতীত হয়ে গেল আমি জানি না। একদিন রাজসেনিয়ার অনুচরেরা করুণ ক্রন্দন করায় আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল আমার পিতার নাকি মৃত্যু হয়েছে। আমি সেকথা শুনে ঘরে ফিরে গেলাম।

পথে লোক আমায় দেখিয়ে বলতে লাগল, দেখ, পিতার মৃত্যুতে বারো বছর পর ও ঘরে ফিরছে।

সেকথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত ও আহত হলাম। ঘরে গিয়ে দুঃখার্তা মাকে সান্ত্বনা দিলাম ও পিতৃকৃত্য শেষ করে মার কাছেই রয়ে গেলাম। কোন মতে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

একদিন আমার বাল্যবন্ধু মার্কণ্ডেয়র স্ত্রী মাকে রাজার প্রাধান দ্বার রক্ষকের মা বলে অভিনন্দন জানাল। মা সেকথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কিন্তু সেই সময় মার্কণ্ডেয় এসে আমায় অভিনন্দিত করে বলল, রাজা তোমায় ডাকছেন। আমি তার সঙ্গে প্রাসাদে গেলাম। রাজা আমায় দ্বার রক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন। আমি সেই পদ গ্রহণ করলাম।

একদিন আমি পরিচারিকা উৎপলমালাকে অবিনয় দেখাবার জন্য শাসন করলাম। তাতে সে বলল, তোমাকে আমি শেষ করে দেব।

তার একটু পরেই মার্কণ্ডেয় এসে আমায় বলল, উৎপলমালা যখন অঙ্গ প্রদর্শন করছিল তখন তুমি তাকে শাসন করলে তা রাজা প্রাসাদ বাতায়ন হতে দেখেছেন। তিনি এতে খুসী হয়েছেন ও তোমাকে ডাকছেন।

আমি তাই মার্কণ্ডেয়র সঙ্গে রাজার কাছে গেলাম ও তাঁকে অভিবাদন করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজা আমায় পুরস্কৃত করলেন ও প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষক পদে নিযুক্ত করে দিলেন।

একবার আমি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর কক্ষে গেলাম। তখন মধ্যাহ্ন। প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী আমায় খেতে বললেন।

তাঁর পরিচারিকারা তখন আমায় চারদিক হতে ঘিরে নিল। পরিহাসছলে তারা আমার হাত ধরল ও আমায় জোর করে খেতে বসিয়ে দিল। কৌমুদী বলল, জ্ঞানী-ব্যক্তিরা কি ভাবে খান আজ আমরা দেখব। তা আমরা শিখব।

জ্ঞানীর মত খেতে হবে বলে আমি সমস্ত এক সঙ্গে মেখে নিলাম ও দলা পাকিয়ে গহ্বরে ফেলার মত সেই দলা মুখে ফেললাম। তাই দেখে পরিচারিকারা সব হেসে উঠল। বলল গণিকাদের সঙ্গে মিশে খাবার কলা আমি ভালোভাবে অধিগত করে নিয়েছি।

খেয়ে উঠবার পর তারা আমার ছুরিকা দেখতে চাইল। তাদের একজন আমার তরবারী নিয়ে নিল। তারা বলল, তোমার ত বেত্র ধারণ করার, তুমি কেন এসব রেখেছ?

আমি বললাম, সংসারে তিন রকমের লোক রয়েছে: উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম ব্যক্তি দৃষ্ট হলেই মন্দ কর্ম হতে নিবৃত্ত হয়। যে মধ্যম তাকে বললে বা বেত্রাস্ফালন করলে নিবৃত্ত হয় কিন্তু যে মন্দ তাকে প্রহার করতে হয়, প্রয়োজনে অস্ত্রের ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া সংসারে তিন রকমের মানুষ আছে: মিত্র, শত্রু ও নিরপেক্ষ।

তারা বলল, গঙ্গারক্ষিত, মিত্র ও শত্রুতে পার্থক্য কি?

আমি বললাম, যে মিত্র সে শুভকারী হয়, যে শত্রু সে অনিষ্টকারী। যে নিরপেক্ষ সে ভালোও করে না, মন্দও করে না।

তুমি, আমরা, আমাদের স্বামিনী শত্রু, মিত্র না নিরপেক্ষ?

আমি বললাম, আমিত স্বামিনীর সেবক।

তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, তুমি না এই মাত্র বললে সংসারে তিন ধরণের লোক আছে। এখন বলছ তুমি সেবক। তুমি কি চতুর্থ ধরণের?

আমার মাথা কেমন যেন ঘুলিয়ে গেল। আমি কি ভুল বলেছি। তখন একটু ভেবে বললাম, আমি মিত্র।

তারা নিজেদের মধ্যে হাসতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বলত, মিত্র সব সময় ভালো করে না কখনো কখনো মন্দও করে?

না, সে সব সময়েই ভাল করে, এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করেও।

তখন তারা আমার মাথা ধরে বলল, তুমি যদি স্বামিনীর মিত্র হও তবে তুমি তাঁর জন্য মাথা দিতে পার?

আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই।

তবে তোমার মাথা আমাদের কাছে বন্ধক রইল। যথা সময়ে তোমার মাথা আমরা নেব।

অন্য একদিনের কথা। সেদিনো তাঁর কক্ষে গেছি। তাঁর গলায় যে হার ছিল সেই হার দেখে আমি বললাম, স্বামিনী, এই হারটী খুবই সুন্দর।

এই হারটি তুমি নিতে পার।

তাই কি কখনো হয়?

কৌমুদী বলল, কেন নয়?

এ আমার নেবার নয়, রক্ষা করবার –বলে আমি চলে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে এলে মা বললেন, এ তুমি কি করেছ?—বলে আমায় সেই হার দেখালেন।

জিজ্ঞেস করলাম, এ হার তুমি কি করে পেলে?

কৌমুদী রেখে গেছে।

আমি তখুনি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর প্রাসাদে গেলাম ও তাঁর পায়ে পড়ে সেই হার ফিরিয়ে নিতে বললাম।

তিনি বললেন, গঙ্গারক্ষিত ভয়ের কিছু নেই, ও হার তোমার কাছেই থাক।

এর কিছু দিন পর কিন্নরী একদিন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরে আমার কাছে এসে মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করতে লাগল। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বেত্র তুললে সে ছুটে ভিতরে পালিয়ে গেল। আমি তাকে ধরবার জন্য তার পেছনে পেছনে ভিতরে প্রবেশ করলে সে বলে উঠল আমাকে ধরবার আগে তুমি কোথায় এসেছ তার যেন খেয়াল থাকে।

তখুনি আমি সামনে প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী আমার পায়ে পতিত হয়ে বললেন, গঙ্গারক্ষিত তুমি আমায় জীবন দান কর।

আমি তরবারি নিষ্কাশিত করলাম।

প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী বললেন, আমি জীবিত থেকেও প্রায় মৃত।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০ ।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 3 Sraman July 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73
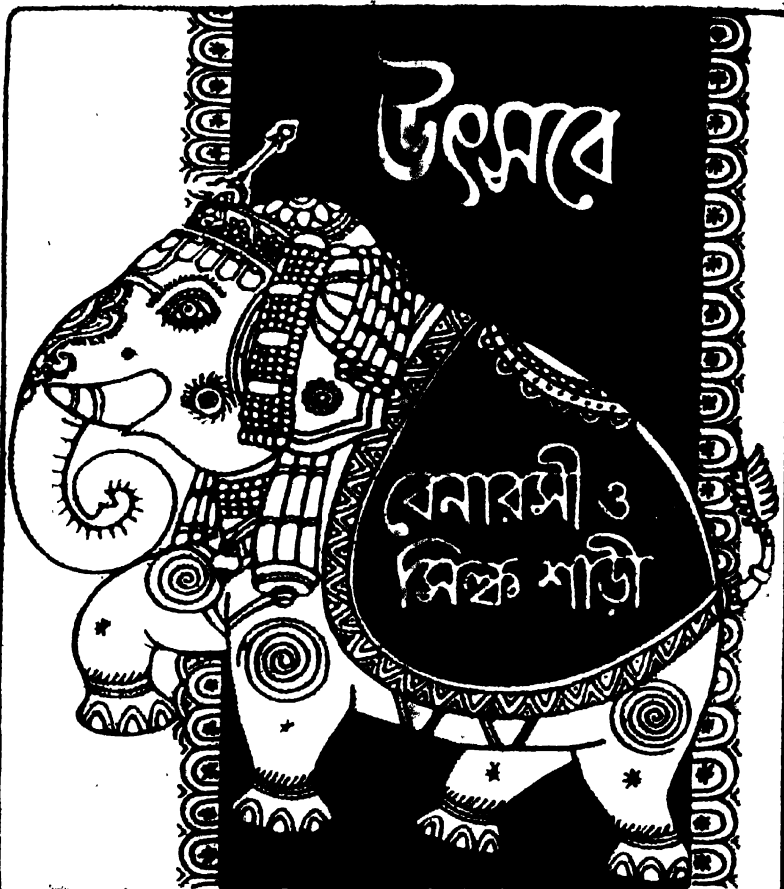
শ্রমণ

জৈন ভবন

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮৭ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

জৈন সরস্বতী

কল্যাণ মন্দির স্তোত্র

আচার্য কুমুদচন্দ্র

কল্যাণ-মন্দিরমুদারমবদ্য-ভেদি

ভীতাভয়-প্রদমনিন্দিতমঙ্‌ঘ্রি-যুগ্মম্ ।

সংসার-সাগর-নিমজ্জদশেষ-জন্তু-

পোতায়মানমভিনম্য জিনেশ্বরস্য ॥ ১

ভগবান জিনেশ্বরের চরণযুগল কল্যাণের মন্দির, উদার ও সর্বপাপনাশক, ভয়ভীতকে অভয়দানকারী, নির্দোষ ও সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান জীবোদ্ধারের জন্য তরণী রূপ। তাঁকে নমস্কার করে—

যস্য স্বয়ং সুরগুরুর্গরিমাম্বুরাশেঃ

স্তোত্রং সুবিস্তৃত-মতির্ন বিভুর্বিধাতুম্ ।

তীর্থেশ্বরস্য কমঠ-স্ময়-ধূমকেতো

স্তস্যাহমেষ কিল সংস্তবনং করিষ্যে ॥ ২ ॥

যে ভগবান পার্শ্বনাথের গুণগাথা সমুদ্রতুল্য, বিশাল বুদ্ধিশালী সুরগুরুও স্বয়ং যার বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না ও যিনি কমঠের মান মর্দন করেছেন আমি সেই জিনেশ্বরের স্তব করছি।

সামান্যতোঽপি তব বর্ণয়িতুং স্বরূপ-

মস্মাদৃশঃ কথমধীশ ভবন্ত্যধীশাঃ ।

ধৃষ্টোঽপি কৌশিক-শিশুর্যদি বা দিবান্ধো

রূপং প্ররূপয়তি কিং কিল ধর্মরশ্মেঃ ॥ ৩

হে প্রভো, আমার মত মানুষ কি সামান্য রূপেও তোমার স্বরূপ বর্ণনা করতে সমর্থ? ধৃষ্ট হয়েও কি দিবান্ধ উলূক অংশুমালীর রূপ বর্ণনা করতে পারে?

মোহ-ক্ষয়াদনুভবন্নপি নাথ মর্ত্যো

নূনং গুণানৃগণয়িতুং ন তব ক্ষমেত ।

কল্পান্ত-বান্ত-পয়সঃ প্রকটোঽপি যস্মা-

ন্মীয়েত কেন জলধের্ননু রত্নরাশিঃ ॥ ৪

হে নাথ, যার মোহ বিনষ্ট হয়েছে ও যে অনুভব করছে সেও কি আবার তোমার গুণ বর্ণনা করতে পারে? প্রলয় কালে সমুদ্রের জল যখন উপচে পড়ে ও সমুদ্র গর্ভস্থ রত্নরাজি দেখা যায় তখনো কি সেই রত্নরাজি কেউ গুণতে সমর্থ?

অভ্যুদ্যতোঽস্মি তব নাথ জড়াশয়োঽপি
কর্তুং স্তবং লসদসংখ্য-গুণাকরস্য।
বালোঽপি কিং ন নিজ-বাহু-যুগং বিতত্য
বিস্তীর্ণতাং কথয়তি স্বধিয়াম্বুরাশেঃ ॥ ৫

হে নাথ, তবুও জড় বুদ্ধি আমি অসংখ্য শোভনীয় গুণের খনিরূপ তোমার স্তব করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। বালক যেমন বাল্যোচিত বুদ্ধিতে দুহাত প্রসারিত করে সমুদ্রের বিস্তার দেখাবার চেষ্টা করে ঠিক সেই রকম।

যে যোগিনামপি ন যান্তি গুণাস্তবেশ
বক্তুং কথং ভবতি তেষু মমাবকাশঃ।
জাতা তদেবমসমীক্ষিত-কারিতেয়ং
জল্পন্তি বা নিজ-গিরা ননু পক্ষিণোঽপি ॥ ৬

হে প্রভো, আপনার যে গুণ তা যোগীজনও বর্ণনা করতে সক্ষম নয়। তাই সেখানে আমার গতি কি করে সম্ভব? বলতে হয় আমার এই কাজ অবিচারিতই হয়েছে। অথবা পাখী ত নিজের মতো করে বলবার চেষ্টা করে।

আস্তামচিন্ত্য-মহিমা জিন সংস্তবস্তে
নামাপি পাতি ভবতো ভবতো জগন্তি।
তীব্রাতপোপহত পান্থ-জনান্নিদাঘে
প্রীণাতি পদ্ম-সরসঃ সরসোঽনিলোঽপি ॥ ৭

হে প্রভো, তোমাকে স্তব করার মহিমা অচিন্ত্য। তাই স্তব ত অনেক দূর তোমার নাম মাত্রই সংসার হতে জীবকে রক্ষা করতে সমর্থ। নিদাঘকালে তীব্র তাপ পীড়িত পান্থকে যেমন কমল সরোবরের সরস বায়ুই প্রসন্ন করতে সক্ষম ঠিক সেই রকম।

হৃদ্বর্তিনি ত্বয়ি বিভো শিথিলীভবন্তি
জন্তোঃ ক্ষণেন নিবিড়া অপি কর্ম-বন্ধাঃ।
সদ্যো ভুজঙ্গমময়া ইব মধ্য-ভাগ-
মভ্যাগতে বন-শিখণ্ডিনি চন্দনস্য ॥ ৮

হে প্রভো, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করলে জীবের কর্মবন্ধন যদি নিবীড়ও থাকে তবে তা মুহূর্তে শিথিল হয়ে যায়। বন ময়ূরের উপস্থিতিতে চন্দনবৃক্ষের গায়ে জড়ানো সাপ মুহূর্তে যেমন অদৃশ্য হয়ে যায়।

মুচ্যন্ত এব মনুজাঃ সহসা জিনেন্দ্র
রৌদ্রৈরুপদ্রব-শতৈস্ত্বয়ি বীক্ষিতেঽপি।
গো-স্বামিনি স্ফুরিত-তেজসি দৃষ্টমাত্রে
চৌরৈরিবাশু পশবঃ প্রপলায়মানৈঃ ॥ ৯

হে জিনেন্দ্র, তোমাকে দেখামাত্র মানুষ হাজার হাজার ভয়ানক উপদ্রবের হাত হতে রক্ষা পায়, পরাক্রমী রাজাকে দেখামাত্র পশুকুল যেমন পলায়মান তস্করের হাত হতে রক্ষা পায়।

ত্বং তারকো জিন কথং ভবিনাং ত এব
ত্বামুদ্বহন্তি হৃদয়েন যদুত্তরন্তঃ।
যদ্বা দৃতিস্তরতি যজ্জলমেষ নূন-
মন্তর্গতস্য মরুতঃ স কিলানুভাবঃ ॥ ১০

[তোমার বীতরাগত্বের জন্য] প্রশ্ন হতে পারে তুমি কি করে সংসারী জীবের তারক হতে পার? [তার উত্তর এরূপ] তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করে তারা সংসার সাগর সেই ভাবে পার হয় যেমন মশক তার ভেতরে ভরা বায়ুর প্রভাবে জলরাশি উত্তীর্ণ হয়।

যস্মিন্হর-প্রভৃতয়োঽপি হত-প্রভাবাঃ
সোঽপি ত্বয়া রতি-পতিঃ ক্ষপিতঃ ক্ষণেন।
বিধ্যাপিতা হুতভুজঃ পয়সাথ যেন
পীতং ন কিং তদপি দুর্ধর-বাড়বেন ॥ ১১

যে কামদেবের মহাদেবাদি দেবতারাও প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন সেই কামদেবকে তুমি মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়েছ। ঠিকই ত যে জল অগ্নিকে নির্বাপিত করে সেই জল কি বাড়বানল পান করে যায় না?

স্বামিন্ননল্প-গরিমাণমপি প্রপন্না-
স্ত্বাং জন্তবঃ কথমহো হৃদয়ে দধানাঃ।
জন্মোদধিং লঘু তরন্ত্যতিলাঘবেন
চিন্ত্যো ন হন্ত মহতাং যদি বা প্রভাবঃ ॥ ১২

হে দেব এবড় আশ্চর্য যে তোমার মত গরিয়ান (সেজন্য ভারী) পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করে জীব সহজেই শীঘ্র সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। [কিন্তু এতে আশ্চর্যের কি আছে?] মহান পুরুষের প্রভাবই অচিন্ত্য।

ক্রোধস্ত্বয়া যদি বিভো প্রথমং নিরস্তো
ধ্বস্তাস্তদা বদ কথং কিল কর্ম-চৌরাঃ।
প্লোষত্যমুত্র যদি বা শিশিরাপি লোকে
নীল-দ্রুমাণি বিপিনানি ন কিং হিমানী ॥ ১৩

হে প্রভো, তুমি যদি ক্রোধকেই প্রথমে বিনষ্ট করে দিলে তবে বল কর্মরূপী তস্করকে তুমি কি করে নষ্ট করলে? [এতেই বা আশ্চর্যের কি আছে?] কারণ সংসারে হিম শীতল হওয়া সত্বেও কি সবুজ বনানীকে বিনষ্ট করে না?

ত্বাং যোগিনো জিন সদা পরমাত্মরূপ-
মন্বেষয়ন্তি হৃদয়াম্বুজ কোষ-দেশে।
পূতস্য নির্মল-রুচের্যদি বা কিমন্য-
দক্ষস্য সম্ভব-পদং ননু কর্ণিকায়াঃ ॥ ১৪

হে জিনেন্দ্র, যোগীরা সব-সময় পরমাত্মারূপ তোমাকে তাঁদের হৃদয় কমলে খুঁজে বেড়ান। সে ঠিকই কারণ পবিত্র ও নির্মলকান্তি সম্পন্ন কমল বীজের উৎপত্তিস্থল ত কমল কোষ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না?

ধ্যানাজ্জিনেশ ভবতো ভবিনঃ ক্ষণেন
দেহং বিহায় পরমাত্ম-দশাং ব্রজন্তি।
তীব্রানলাদুপল-ভাবমপাস্য লোকে
চামীকরত্বমচিরাদিব ধাতু-ভেদাঃ ॥ ১৫

হে প্রভো, তোমাকে ধ্যান করে সংসারী জীব মুহূর্তে এই শরীর ত্যাগ করে পরমাত্মা স্বরূপ হয়ে যায় যেমন সুবর্ণ-পাষাণ তীব্র অগ্নির সম্পর্কে এসে পাষাণত্ব পরিত্যাগ করে সোনায় রূপান্তরিত হয়।

অন্তঃ সদৈব জিন যস্য বিভাব্যসে ত্বং
ভব্যৈঃ কথং তদপি নাশয়সে শরীরম্।
এতৎস্বরূপমথ মধ্য-বিবর্তিনো হি
যদ্বিগ্রহং প্রশময়ন্তি মহানুভাবাঃ ॥

হে জিনেশ, ভব্যজীব যে শরীরে তোমাকে ধারণ করে সেই শরীর কেন তারা নষ্ট করে দেয়? তার কারণ মধ্যস্থ মহানুভবের স্বরূপই এই যে তিনি বিগ্রহ শরীরকে শান্ত করে দেন।

আত্মা মনীষিভিরয়ং ত্বদভেদ-বুদ্ধ্যা-
ধ্যাতো জিনেন্দ্র ভবতীহ ভবৎপ্রভাবঃ।
পানীয়মপ্যমৃতমিত্যনুচিন্ত্যমানং
কিং নাম নো বিষ-বিকারমপাকরোতি ॥ ১৭

হে দেব, মনীষিরা যখন 'তোমা হতে অভিন্ন' এই বুদ্ধিতে আত্মার ধ্যান করেন তখন সেই আত্মা তোমার মত প্রভাবশালী হয়ে যায়। ঠিকইত—জলকে যদি এ অমৃত বলে ভাবা যায় তবে কি বিষ বিকারকে তা দূর করে দেয় না?

ত্বামেব বীত-তমসং পরবাদিনোঽপি
নূনং বিভো হরি-হরাদি-ধিয়া প্রপন্নাঃ।
কিং কাচ-কামলিভিরীশ সিতোঽপি শংখো
নো গৃহ্যতে বিবিধ-বর্ণ-বিপর্যয়েণ ॥ ১৮

হে দেব, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার রহিত তোমাকেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীরা হরিহরাদি নামে অভিহিত করেন। কারণ রঙীন কাচের মাধ্যমে বা কামলা রোগগ্রস্ত যখন শ্বেত বর্ণ শংখকে দেখে তখন বিপর্যয়ের জন্য ভিন্ন বর্ণই ত দেখে থাকে।

ধর্মোপদেশ-সময়ে সবিধানুভাবা-
দাস্তাং জনো ভবতি তে তরুরপাশোকঃ।
অভ্যুদ্‌গতে দিনপতৌ সমহীরুহোঽপি
কিংবা বিবোধমুপযাতি ন জীব-লোকঃ ॥ ১৯

ধর্মোপদেশ দেবার সময় তোমার সামীপ্যের প্রভাবে মানুষ ত দূর বৃক্ষও অশোক [শোকরহিত] হয়ে যায়। [এতে আশ্চর্যের কি আছে ?] সূর্য উদিত হলে বৃক্ষ সহিত সমস্ত জীবলোকই ত বোধ প্রাপ্ত হয়। [পার্শ্বনাথের চৈত্যবৃক্ষ অশোক।]

চিত্রং বিভো কথমবাঙ্‌মুখ-বৃন্তমেব
বিষ্বকৃপতত্যবিরলা সুর-পুষ্প-বৃষ্টিঃ।
ত্বদ্‌গোচরে সুমনসাং যদি বা মুনীশ
গচ্ছন্তি নূনমধ এব হি বন্ধনানি ॥ ২০

হে প্রভো, আশ্চর্য ! দেবতারা যখন পুষ্প বৃষ্টি করেন তখন সুমন বা পুষ্পের বন্ধন [বৃন্ত] নিম্নাভিমুখী হয়ে পতিত হয়। তা উচিতই কারণ হে মুনীশ, তোমার সমীপবর্তী হওয়া মাত্র সুমন বা সজ্জনের বন্ধন ওই প্রকার নিম্নাভিমুখী হয়ে পতিত হয়। [অর্থাৎ তারা বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়।]

স্থানে গভীর-হৃদয়োদধি সম্ভবায়াঃ
পীযূষতাং তব গিরঃ সমুদীরয়ন্তি।
পীত্বা যতঃ পরম-সম্পদ-সঙ্গ-ভাজো
ভব্যা ব্রজন্তি তর সাপ্যজরামরত্বম্ ॥ ২১

গভীর হৃদয়রূপ সমুদ্র হতে উৎপন্ন তোমার বাণীকে যে লোকে অমৃতময়ী বলে সে ঠিকই কারণ তা পান করে ভব্য জীব অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়ে অজরামরত্ব লাভ করে।

স্বামিন্নসুদূরমবনম্য সমুৎপতন্তো
মন্যে বদন্তি শুচয়ঃ সুর চামরৌঘাঃ।
যেঽস্মৈ নতিং বিদধতে মুনি-পুঙ্গবায়
তে নূনমূর্ধ্ব-গতয়ঃ খলু শুদ্ধ-ভাবাঃ ॥ ২২

হে দেব, দেবতারা যে তোমার চামর বীজন করে সেই চামর অনেকখানি নীচে নেমে ওপরে ওঠে। সেই প্রক্রিয়া যেন এই কথাই বলতে চায় যে যে এই মুনিশ্রেষ্ঠের চরণে নমস্কার করে সে অবশ্যই শুদ্ধ ভাব লাভ করে উচ্চ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

[ক্রমশঃ

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ওপরে চব্বিশ জন তীর্থংকরের স্তুতি করা হয়েছে। এই চব্বিশ জন তীর্থংকরের সময়ে বার জন চক্রবর্তী, নয় জন অর্দ্ধ চক্রবর্তী (বাসুদেব), নয় জন বলদেব, নয় জন প্রতিবাসুদেব হন। এঁরা সকলে এই অবসর্পিনী কালে, এই ভরতক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁদের ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়। এঁদের কয়েকজন মোক্ষরূপ লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়েছেন, কয়েকজন ভবিষ্যতে হবেন। এরূপ শলাকা পুরুষত্ব সম্পন্ন মহাত্মাদের চরিত্র আমি বর্ণন করব। কারণ মহাত্মাদের চরিত্রকীর্তন কল্যাণ ও মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ।

প্রথমে ভগবান ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণন করব। যে জীবনে তিনি সম্যকত্ব লাভ করেন সেই জীবন হতে কথারম্ভ করছি। তাকেই তাঁর প্রথম জীবন বলে উল্লেখ করছি।

জম্বুদ্বীপ নামে এক বৃহৎ দ্বীপ আছে যার চারদিকে একের পর এক অসংখ্য বলয়াকৃতি সমুদ্র ও দ্বীপ রয়েছে। জম্বুদ্বীপ বজ্রবেদিকার প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ও নদী, ক্ষেত্র ও বর্ষধর পর্বত দ্বারা সুশোভিত। ঠিক এর মাঝখানে সুবর্ণ ও রত্ন জড়িত মেরু পর্বত বর্তমান। মেরু পর্বতকে জম্বুদ্বীপের নাভি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এই মেরু পর্বত এক লক্ষ যোজন উঁচু ও তিন মেখলা দ্বারা সুশোভিত। (প্রথম মেখলায় নন্দন বন, দ্বিতীয় মেখলায় সোমনস বন ও তৃতীয় মেখলায় পাণ্ডুক বন। এর চূলিকা চল্লিশ যোজন বিস্তৃত ও বহু জিনালয়ে শোভিত।

মেরু পর্বতের পশ্চিমে বিদেহ ক্ষেত্র। সেখানে ক্ষিতি প্রতিষ্ঠানপুর নামে এক নগর ছিল। সেই নগরকে ভূমণ্ডলের অলঙ্কার স্বরূপ বলা যায়।

সেই নগরে প্রসন্নচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর ঐশ্বর্য ইন্দ্রতুল্য ছিল ও ধর্মকর্মে তিনি সর্বদা জাগরূক ছিলেন।

সেই সময়ে সেই নগরে ধন নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদীর আশ্রয় তিনি সেরূপ সমস্ত সম্পত্তির আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁর যশও ছিল বহু দূর বিস্তৃত। সেই মহত্তাকাঙ্ক্ষী শ্রেষ্ঠীর কাছে এত দ্রব্য ছিল যে যার কল্পনা করাও অন্যের পক্ষ কঠিন। চাঁদের চন্দ্রিকার মত সেই দ্রব্য অন্যের উপকারের

জন্য নিয়োজিত হত। বলা যায় ধন শ্রেষ্ঠী রূপ পর্বত হতে সদাচাররূপ নদী প্রবাহিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে পবিত্র করত। তিনি সকলের সেব্য ছিলেন। তাঁতে যশঃরূপী বৃক্ষের উদারতা, গম্ভীরতা ও ধৈর্যরূপ উত্তম বীজ ছিল। তাঁর ঘরে রাশীকৃত ধান্যের মত রত্ন পড়ে থাকত ও বস্তার গাদির মত দিব্য বস্ত্র। যেমন জল-জন্তুর দ্বারা সমুদ্রের শোভা বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ ঘোড়া, খচ্চর, উট আদি বাহনে তাঁর গৃহের শোভা বর্দ্ধিত হত। শরীরে যেমন প্রাণবায়ু মুখ্য তেমনি ধনী, গুণী ও যশস্বীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন মুখ্য। যেমন মহাসরোবরের নিকটস্থ ভূমি ঝরণার জলে আপ্লুত হয় তেমনি শ্রেষ্ঠীর নিকটস্থ কর্মচারীরা ধনৈশ্বর্যে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ তাঁর অধীনস্থ কেউই আর দরিদ্র ছিল না।

একবার শ্রেষ্ঠী পণ্যদ্রব্য নিয়ে বসন্তপুর যাওয়া স্থির করলেন। সে সময় মূর্তিমান উৎসাহ বলে তাঁকে মনে হচ্ছিল। তিনি সমস্ত নগরে এই ঘোষণা করালেন : 'ধন শ্রেষ্ঠী বসন্তপুর যাবেন। যাঁর ইচ্ছে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। যাঁর কাছে পাত্র নেই তিনি তাঁকে পাত্র দেবেন, যাঁর কাছে বাহন নেই তিনি তাঁকে বাহন দেবেন, যাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হবে তাঁকে তিনি সাহায্য দেবেন, যাঁর কাছে পাথেয় নেই তাঁকে তিনি পাথেয় দেবেন। পথে চোর, ডাকাত ও হিংস্র পশুর হাত হতে তিনি তাঁদের রক্ষা করবেন, ও যিনি অশক্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তাঁর তিনি নিজের ভাই-এর মত সেবা শুশ্রূষা করবেন।

তারপর কুলবধূরা যখন কল্যাণকারী মাঙ্গলিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করল তখন তিনি রথে আরোহণ করে শুভ মুহূর্তে গৃহ হতে যাত্রা করে নগরের বাইরে এসে উপস্থিত হলেন।

যাত্রার পূর্বে তূর্য বাদন করা হল। তূর্যের শব্দকে যাত্রার সংকেত মনে করে যাঁদের বসন্তপুর যাবার ছিল তাঁরা সহরের বাইরে এসে একত্রিত হলেন।

ঠিক সেই সময় সাধুচর্যা ও ধর্মে পৃথিবীকে পবিত্র করে ধর্মঘোষ আচার্য শ্রেষ্ঠীর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ সূর্যের মত প্রদীপ্ত দেখাচ্ছিল।

তাঁকে দেখে শ্রেষ্ঠী উঠে দাঁড়ালেন ও বিধি পূর্বক করজোড়ে তাঁর বন্দনা করে তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

আচার্য বললেন, আমরা তোমার সঙ্গে বসন্তপুর যাব।

সে কথা শুনে শ্রেষ্ঠী বললেন, ভগবন্ আজ আমি ধন্য হলাম। যেরূপ ধর্মাত্মা আমার সঙ্গে নেবার প্রয়োজন ছিল সেরূপ ধর্মাত্মা আপনি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। আপনি সহর্ষে আমাদের সঙ্গে চলুন।

তারপর তিনি পাচকদের ডেকে বললেন, তোমরা এঁদের জন্য সর্বদা অন্নজল প্রস্তুত রাখবে।

আচার্য বললেন, সাধু ত মাত্র সেই রকম অন্নজল গ্রহণ করেন যা তাঁদের জন্য প্রস্তুত করা হয় নি, করানো হয় নি বা করবার সঙ্কল্প করা হয় নি। কূপ, বাপী ও সরোবরের জলও অগ্নি আদি দ্বারা অ-চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধু গ্রহণ করেন না। জৈন শাসনের এই বিধান।

সেই সময় কে একজন এক থালা আম শ্রেষ্ঠীর সম্মুখে এনে উপস্থিত করল। সেই পাকা আমের রঙ ছিল সন্ধ্যাবেলার সূর্যের রঙলাগা মেঘের মত।

শ্রেষ্ঠী আনন্দিত মনে আচার্য্যকে বললেন, ভগবন্, আপনি এই ফল গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

আচার্য বললেন, হে শ্রদ্ধাবান শ্রেষ্ঠী, এরূপ স-চিত্ত ফল খাওয়া ত দূরের, স্পর্শ করাও সাধুদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

শ্রেষ্ঠী বললেন, ভগবন্, আপনি কোন মহান কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন। এরূপ কঠিন ব্রত চতুর মনুষ্যও যদি প্রমাদী হয় তবে এক দিনও পালন করতে সক্ষম হবে না। তবুও আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে সেই আহার দেব যা আপনার গ্রহণীয় হবে। এই বলে বন্দনা করে তিনি আচার্যকে বিদায় দিলেন।

জোয়ারের সময় চঞ্চল ঊর্মিমালায় সমুদ্র যেমন অগ্রসর হয় শ্রেষ্ঠীও সেই রকম বেগবান অশ্ব, উট, শকট, বলদ সহ অগ্রসর হলেন। আচার্যও শিষ্য পরিবার সহ তাঁর সঙ্গ নিলেন। আচার্য সহ শিষ্যদের মূর্তিমান মূলগুণ ও উত্তরগুণ বলে মনে হচ্ছিল।

সংঘের আগে ধন শ্রেষ্ঠী যাচ্ছিলেন ও পিছনে তাঁর মিত্র মণিভদ্র, দু'দিকে অশ্বারোহী সৈন্য। শ্বেত ছত্র ধারণের জন্য আকাশকে কোথাও কোথাও শরৎকালীন শুভ্রমেঘমালা মণ্ডিত ও কোথাও কোথাও ময়ূর পুচ্ছের ছত্রের জন্য বর্ষা কালীন মেঘমালাবৃত বলে মনে হচ্ছিল। ব্যবসায়ের জন্য নীত পণ্যদ্রব্য উট, বলদ, গর্দভ এভাবে বহন করছিল যেমন ঘনবাত পৃথিবীকে বহন করে।

দ্রুত যাবার জন্য উটের পা কখন ভূমি স্পর্শ করছিল ও কখন উঠছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। এতে তাদের হরিণ বলে ভ্রম হচ্ছিল। খচ্চরের পীঠে রাখা থলে উৎক্ষীপ্ত হয়ে এভাবে দু'দিকে বিস্তৃত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন উড়ন্ত পাখীর ডানা।

বড় বড় শকট যাতে বসে যুবকেরা খেলাধূলো করতে পারে যখন যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন বড় বড় অট্টালিকা হেঁটে চলেছে।

জল বহনকারী বৃহৎস্কন্ধ মহিষদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন আকাশের মেঘই পৃথিবীতে নেমে এসেছে ও পিপাসিতদের তৃষ্ণা নিবারিত করছে।

পণ্যদ্রব্য পূর্ণ চলন্ত গাড়ী চলবার সময় এরূপ আওয়াজ করছিল যেন মনে হচ্ছিল তাদের ভারে পিষ্ট হয়ে পৃথিবী চীৎকার করছে।

বলদ, উট ও ঘোড়ার পায়ে উত্থিত ধূলোয় আকাশ এভাবে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল যে দিনকেও সূচিভেদ্য বলে মনে হচ্ছিল।

বলদের গলার বাঁধা ঘণ্টার শব্দে দিগ্‌মুখও যেন বধির হয়ে গিয়েছিল। চমরীমৃগ সেই শব্দে ভয় পেয়ে শাবক সহ কান উঁচু করে কোথা হতে ওই শব্দ আসছে দূর হতে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

অত্যধিক ভার নিয়ে চলছিল বলে উটেরা নিজের ঘাড় বাঁকিয়ে গাছের অগ্রভাগ বার বার চেটে নিচ্ছিল।

যাদের পীঠে পণ্যভরা থলে রাখা ছিল সেই গর্দভেরা কানে খাড়া করে ও ঘাড় সোজা করে চলবার সময় একে অন্যকে কেটে নিচ্ছিল ও পেছিয়ে পড়ছিল।

অস্ত্রধারী রক্ষকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রেষ্ঠী এভাবে যাচ্ছিলেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি বজ্র নির্মিত পিঞ্জরে বসে যাচ্ছেন।

মণিধারী সর্প হতে লোক যেমন দূরে সরে থাকে তস্কর ও ডাকাতেরাও সেই রকম বহু ধন ও পণ্যবাহী সেই সার্থ হতে দূরে সরে ছিল।

শ্রেষ্ঠী ধনী নির্ধন সকলের যোগ-ক্ষেম সমানভাবে বহন করছিলেন এবং সকলের সঙ্গে এভাবে যাচ্ছিলেন যেন হস্তীযূথের সঙ্গে যূথপতি হস্তী চলেছে। সমস্ত লোক আনন্দপুলকিত চোখে তাঁর আদর সৎকার করছিল। সূর্যের মত প্রতিদিন তিনি আরও এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

এভাবে এগিয়ে যেতে যেতে রাত্রিকে যে ছোট করে ও নদ, নদী ও সরোবরকে বিশুষ্ক, সেই দুঃসহ ও পর্যটকদের পক্ষে ক্লেশকর ভীষণ গ্রীষ্ম কাল এসে উপস্থিত হল। বড় বড় উনোনের আগুনের মত অসহ্য গরম হাওয়া প্রবাহিত হতে লাগল। অঙ্গারের মত রোদ সূর্য চারদিকে বিস্তারিত করতে লাগলেন। সার্থ চলতে চলতে পথের দু ধারের গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। যারা জল খাওয়াচ্ছিল তাদের কাছে জল খেয়ে মানুষ গাছের তলায় খানিক ঘুমিয়ে নিতে লাগল। মহিষদের জীভ এভাবে মুখ হতে বার হতে লাগল যেন নিঃশ্বাসই তাদের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। যারা তাদের চালাচ্ছিল তাদের মারের ভয় না করে তারা কাদা ও পঙ্কলে নেমে যেতে লাগল। সারথী চাবুক দিয়ে পিটলেও তা উপেক্ষা করে বলদেরা দূরবর্তী বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। গরম লৌহ শলাকা স্পর্শে মোম যেমন গলতে থাকে সেই রকম সূর্যের উত্তপ্ত কিরণ স্পর্শে মানুষের শরীর হতে স্বেদধারা প্রবাহিত হতে লাগল। আগুনে তপ্ত লৌহশলাকার মত সূর্য নিজের কিরণ জাল উত্তপ্ত করতে লাগলেন। পথের ধূলো অগ্নিকুণ্ডের ছাইয়ের মত উষ্ণ হয়ে উঠল। সার্থের সঙ্গে যে সব মেয়েরা যাচ্ছিল তারা পথে জলাশয় দেখলেই তাতে নেমে স্নান করতে লাগল ও মৃণাল তুলে গলায় জড়িয়ে নিতে লাগল। ঘামে পরিধান

বস্ত্র ভিজে গিয়ে তাদের গায়ে এভাবে সেঁটে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল এইমাত্র স্নান করে তারা যেন আদ্র বস্ত্রেই হেঁটে চলেছে। মানুষ ঢাক, তাল, হিংতাল, কমল ও কদলী পত্রের পাখা দিয়ে বাতাস করে শরীরের ঘাম শুকোতে লাগল।

গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্মের মতই পথের বিঘ্নকর বর্ষা ঋতুর আর্বিভাব হল। যক্ষের মত বিরাট ধনুক ও বারিধারা রূপ শর নিয়ে মেঘ আকাশে উঠে এল। সার্থের সমস্ত লোক ভয়ভীত চোখে সেইদিকে চেয়ে রইল। বালক যেমন আধজলা কাঠি ঘুরিয়ে ভয় দেখায় মেঘও তেমনি বিদ্যুৎ ঝলকে তাদের ভয় দেখাতে লাগল। বর্ষার জলে ফে'পে ওঠা বারি রাশি নদীর পাড়ের মত পথিক চিত্তকেও ভেঙে দিয়ে গেল। বৃষ্টির জলে মাটির উঁচু নীচু সব সমান হয়ে গিয়েছিল। সত্যিইত বলা হয় জল যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন তার বিবেক থাকে না। (ভিন্যার্থ—মূর্খ উন্নতি করলেও তাতে বিবেক উৎপন্ন হয় না।)

জল কাদা ও কাঁটার জন্য পথ দুর্গম হয়ে গিয়েছিল। তাই এক যোজন পথ অতিক্রম করলে মনে হচ্ছিল যেন একশ যোজন পথ অতিক্রম করে এসেছি। মানুষ এক হাঁটু জলে এভাবে ধীরে ধীরে হাঁটছিল যেন এইমাত্র তারা কয়েদ খানা হতে মুক্ত হয়ে এসেছে। (পায়ে ভারী ভারী বেড়ী থাকার জন্য কয়েদীরা জোরে হাঁটতে পারে না, ধীরে ধীরে হাঁটে।) সমস্ত পথে জল এভাবে বিস্তারিত হয়ে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল কোন দুষ্ট দেবতা পথিকদের পথ অবরুদ্ধ করার জন্যই যেন চারদিকে নিজের হাত বিস্তারিত করে দিয়েছে। গাড়ী কাদায় এভাবে বসে যেতে লাগল যে মনে হল রথের চাকা দিয়ে তাকে পিষ্ট করার জন্য ধরণী রথচক্রকে গ্রাস করে নিয়েছেন। উটেদের পা উঠছিল না। আরোহিরা তাই নীচে নেমে তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে লাগল কিন্তু কাদার জন্য তারা পা তুলতে পারল না কেবল পড়ে পড়ে যেতে লাগল।

বর্ষার জন্য পথ চলা দুষ্কর দেখে ধন শ্রেষ্ঠী সেই বনেই থাকা স্থির করলেন। একটু উঁচুমত জায়গা দেখে তাঁবু ফেললেন। তাঁর দেখাদেখি সার্থের অন্য লোকেরাও সেখানে তাঁবু ফেলল বা কুটীর নির্মাণ করল। ঠিকইত বলা হয়, যে দেশ ও কালানুরূপ আচরণ করে সে সুখী হয়।

[ক্রমশঃ

সীতা জন্মের বিবিধ কথানক

শ্রীগণেশপ্রসাদ জৈন

ভারতীয় বাঙ্‌ময়ে সীতার বিশিষ্ট স্থান রয়েছে অথচঅতি প্রাচীন কাল হতেই সীতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বিবাদও রয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা দুই বিভিন্ন সীতার বিবরণ পাই যার উল্লেখ ঋগ্বেদ হতে নিয়ে সম্পূর্ণ বৈদিক সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে। লাঙ্গল পদ্ধতির চর্চা ত অনেক স্থানেই পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে সীতার মনুষ্য রূপে চিত্রন করা হয়নি। ঋগ্বেদ হতে নিয়ে গৃহ্যসূত্র পর্যন্ত সীতা সম্পর্কিত বিষয়ের অধ্যয়ন করলে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি সীতার ব্যক্তিত্ব শতাব্দী ধরে কৃষিজিবী আর্যদের ধার্মিক চেতনাতে জীবিত ছিল।

ঋগ্বেদের সূক্ত প্রায় একই দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত। কিন্তু যে সূক্তে সীতার উল্লেখ পাই সেখানে কৃষি সম্পর্কিত অনেক দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। সম্ভবতঃ এই প্রার্থনা অনেক স্বতন্ত্র মন্ত্রের অবশেষ যা কোন এক সূক্তে গ্রথিত হবার পর চতুর্থ মণ্ডলের অন্তর্গত করা হয়। উক্ত ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম ছন্দে দেবী সীতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে:

হে সৌভাগ্যবতী, (কৃপাদৃষ্টিতে) আমাদের প্রতি উন্মুখ হও। হে সীতে, তোমার আমরা বন্দনা করি যাতে তুমি আমাদের সুন্দর ফল ও ধনদাত্রী হও।

ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ কর। পূষা (সূর্য) তার সঞ্চালন কর। সে যেন জলপূর্ণ হয়ে (সীতা) প্রত্যেক বছর আমাদের (ধান্য) প্রদান করতে থাকে।

ঋগ্বেদের (তিন) সূক্তেও 'কৃষি কর্মারিপ' পরিচ্ছেদে উক্ত সূত্রের উল্লেখ হয়েছে। সীতার নামে যে অন্য প্রার্থনা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় তা 'সীতা পুংজতি' মন্ত্রের অংশ। এই মন্ত্র যজুর্বেদ সংহিতায় ও অথর্ব বেদেও আছে।

বৈদিক সাহিত্যে যে দেবতাদের উল্লেখ আছে তাদের অধিকাংশতঃ প্রকৃতি দেবতা অর্থাৎ প্রভাবশালী প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্বার কল্পনা করা হয়েছে। কার্য ক্ষেত্র অনুসারে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ (১) দ্যুলোকের, (২) অন্তরিক্ষের, (৩) পৃথিবীর। এদের অতিরিক্ত অন্য প্রকার দেবতার কল্পনা করা হয়েছে যাদের কার্যক্ষেত্র অনেক সীমিত। এদের মধ্যে ক্ষেত্রপতি, বাস্তোষ্পতি (ঘরের দেবতা) সীতা ও উর্বরা (শস্য প্রদান কারী) ভূমিই প্রধান। ঋগ্বেদের সব চাইতে প্রাচীন অংশে (২-৭ মণ্ডল) কেবল একটী মাত্র সূক্তে কৃষি সম্পর্কিত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে

এবং সেই সূক্তও দশম মণ্ডলের সময়ের বলে বলা হয়। (৪-৫৭) ঋগ্বেদের এই একমাত্র স্থল যেখানে সীতায় ব্যক্তিত্ব ও দেবত্বের আরোপ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সীতার পরিচয় আমরা কেবল তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হই যেখানে সীতা সাবিত্রী 'সূর্যপুত্রী'। সেখানে সোম রাজার আখ্যান বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদেও এই আখ্যান পাওয়া যায়।

কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সীতা ও সাবিত্রীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ তাতে দেবত্বের আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তার উল্লেখ পরবর্তীকালে নিরন্তর হয়ে এসেছে।

আভিধানিকেরা সীতা শব্দের অর্থ করেছেন (১) জমি চাষ করবার সময় মাটিতে লাঙ্গলের ফলায় যে রেখা পড়ে সেই রেখা, (২) লাঙ্গলের নীচের লোহার ফলা, (৩) মিথিলার রাজা 'সীরধ্বজ' জনকের কন্যা যিনি রামচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন, (৪) বৈদেহী, জানকী।

বৈদিক গ্রন্থানুসারে সীতা বস্তুতঃ জনককন্যা ছিলেন না, তিনি তাঁকে যে ভাবেই প্রাপ্ত হোন না কেন সংযোগ বশতঃই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জৈন কথাকারেরা কিন্তু তাঁকে জনকের ঔরস কন্যা বলেই বলেন। বৌদ্ধজাতকে সীতা দশরথ কন্যা, রামের বোন ও পত্নী।

ডাঃ রেভরেণ্ড ফাদার কামিল বুল্কে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'রাম কথা'য় সীতার জন্ম কথানককে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা (১) জনকাত্মজা, (২) ভূমিজা, (৩) রাবণাত্মজা, (৪) দশরথাত্মজা। এ সমস্ত বিভাজন সীতা জন্মের প্রারম্ভিক তথ্যের অভাবের জন্য নানা প্রকারের কিম্বদন্তীর ওপর নির্ভর করেই করা হয়েছে যখানে কথাকারেরা জনক, রাবণ ও দশরথকে সীতার পিতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ডাঃ বুল্কে সীতাজন্মের কথা গ্রন্থের বিভাজন এভাবে করেছেন :

(১) জনকাত্মজা—মহাভারত, হরিবংশ, পউমচরিঅ, আদি রামায়ণ।

(২) ভূমিজা— (ক) বাল্মীকি রামায়ণ ও অধিকাংশ রাম কথা।
(খ) দশরথ ও মেনকার মানস পুত্রী। (বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরীয় পাঠ)
(গ) বেদবতী ও লক্ষ্মীর অবতার।

(৩) রাবণাত্মজা—(ক) গুণভদ্রাচার্যকৃত উত্তরপুরাণ (৯ম শতক), মহাভারত পুরাণ।
(খ) কাশ্মীরী রামায়ণ।
(গ) তিব্বতী রামায়ণ।
(ঘ) সরেতকাণ্ড সেরী সমকাপাতানী পাঠ।

(৩) রামজিয়েন (রে আমকের ?)

সীতা ও লঙ্কা সম্বন্ধিত—পদ্মজা, রক্তজা, অগ্নিজা।

(ক) পদ্মজা—দশাবতার চরিত (১১ শতক), গোবিন্দরাজের বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ।

(খ) রক্তজা—অদ্ভূত রামায়ণ (১৫ শতক), সিংহল দ্বীপের রামকথা।

(গ) অগ্নিজা—আনন্দ রামায়ণ (১৫ শতক), পাশ্চাত্য বৃত্তান্ত।

(৪) দশরথাত্মজা—দশরথ জাতক, জাভার রাম কলিঙ্গ, মালয়ের সেরী রাম ও হিকায়তরাম।

জনকাত্মজার চার রাম কথা পাওয়া যায়। কিন্তু অযোনিজা সীতার অলৌকিক জন্ম বিষয়ে কোথাও নির্দেশ করা হয়নি। সর্বত্র জনকাত্মজা রূপেই বলা হয়েছে। রামোপাখ্যানের প্রারম্ভেই লেখা হয়েছে—'বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্যাত্মজা বিভো ॥' হরিবংশের রাম কথাতেও সীতার অলৌকিক জন্মের কোন উল্লেখ নেই। পউম চরিয়ে স্পষ্টতঃই সীতাকে জনকের ঔরস কন্যা বলা হয়েছে। প্রাচীন গাথায় ও আদি রামায়ণেও জনক পুত্রীকে ঔরসপুত্রীই বলা হয়েছে: 'জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা। সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীনামুত্তমা বধূ ॥' (বালকাণ্ড)

বিষ্ণুপুরাণ (৪-৫-৩০) ও বায়ু পুরাণে যজ্ঞের ক্ষেত্র ঠিক করবার সময় জনক তিনটি নব জাতক শিশু প্রাপ্ত হন তাদের দু'জন পুত্র একজন কন্যা।

পউমচরিয়ে সীতার জন্ম কথা এইরূপ। এই গ্রন্থটি বিক্রম সম্বৎ ৬০এ আচার্য বিমল সূরি কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়। এই গ্রন্থানুসারে সীতা মহারাজ জনকের ঔরস কন্যা। মহারাজ জনকের ভার্যা পৃথ্বীদেবীর গর্ভে যুগল সন্তান এক পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রকে পূর্বজন্মের বৈরী সোরগৃহ হতে হরণ করে নিয়ে যায়। কন্যার লালন পালন পৃথ্বী দেবী নিজে করেন। কন্যা যুবতী হলে তার বিবাহ দশরথ পুত্র রামের সঙ্গে দেওয়া হয়।

ভূমিজা: প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণে ভূমিজা সীতার জন্ম বর্ণনা দুবার বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। একদিন যখন রাজা জনক যজ্ঞভূমি তৈরী করার জন্য হল চালনা করছিলেন তখন এক ছোট্ট কন্যা মাটি হতে বার হয়। ওকে তিনি তুলে নেন ও কন্যারূপে পালন করেন। তার নাম দেন—সীতা।

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে জনক পুত্রার্থ যজ্ঞভূমি তৈরী করছিলেন। পদ্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডের বঙ্গীয় পাঠে জনক দ্বারা পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞের ভূমি তৈরীর কথা আছে। এই পাঠে এও রয়েছে যে ওই ভূমি হতে তিনি এক স্বর্ণ ধনুক প্রাপ্ত হন। ধনুক খুলতে তিনি এক শিশুকন্যা প্রাপ্ত হন যার নাম তিনি সীতা দেন।

গৌড়ীয় ও পশ্চিম পাঠে ভূমিজা সীতার জন্মকথা এই ভাবে আছে ঃ রাজা জনকের কোন সন্তান ছিল না। একদিন তিনি যখন যজ্ঞভূমির জন্য হল চালাচ্ছিলেন তখন আকাশে লাবণ্যময়ী অপ্সরা মেনকাকে দেখতে পান। মেনকাকে দেখে সন্তানার্থ তিনি মনে মনে তার সাহচর্য কামনা করেন। সেই সময় আকাশে দৈববাণী হয়, 'মেনকার দ্বারা তিনি এক কন্যা প্রাপ্ত হবেন যে রূপে তার মা মেনকার মত হবে।' একটু অগ্রসর হতে তিনি ভূমি হতে উত্থিতা কন্যাকে দেখতে পান। আবার দৈববাণী হয় ঃ 'মেনকায়াঃ সমুৎপন্না কন্যেয়ং মানসী তব।' অর্থাৎ মেনকা হতে উৎপন্ন এই কন্যা তোমার মানস কন্যা।

বাল্মীকি উত্তর কাণ্ডে সীতার পূর্বজন্মের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়তে এক কাহিনী এইভাবে দিয়েছেন ঃ ঋষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে পাবার জন্য হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন। তার পিতারও এই ইচ্ছা ছিল যে সে নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করুক। ইতিমধ্যে কোন রাজা কুশধ্বজের কাছে তাঁর কন্যাকে পত্নীরূপে পাবার প্রার্থনা জানান। কুশধ্বজ সেই প্রার্থনা অস্বীকার করলে তিনি তাঁকে হত্যা করেন। একদিন রাবণ তপনিরতা বেদবতীকে দেখতে পান ও তার উপর মোহিত হন। তিনি তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কেশ আকর্ষণ করেন। বেদবতীর হাতই কৃপাণ হয়ে যায় ও সেই কৃপাণ দিয়ে সে নিজের কেশ কর্তন করে রাবণের হাত হতে মুক্ত হয়। সে রাবণকে এই অভিশাপ দেয় যে 'তোমার মৃত্যুর জন্য আমি পুনরায় অযোনিজারূপে জন্মগ্রহণ করব।' এই বলে সে অগ্নি প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করে। এই বেদবতীই জনকের যজ্ঞভূমির মাটি হতে কন্যারূপে উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত গল্পটি সামান্য পরিবর্তনসহ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত পুরাণ, (৯-১৬) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ড (অ. ১৪)-তে পাওয়া যায়। সেই গল্পটি এই ধরণের ঃ কুশধ্বজ ও তাঁর পত্নী মালবতী লক্ষ্মীর উপাসনা করে তাঁকে তাঁদের কন্যা রূপে প্রাপ্ত হবার বর লাভ করেন, জন্ম নিতেই নবজাতা কন্যা (লক্ষ্মী) বৈদিক মন্ত্রের গান করতে আরম্ভ করলে তার নাম রাখা হয় বেদবতী। যুবতী হবার পর বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করে। রাবণ কর্তৃক অপমানিতা হয়ে সে তাকে শাপ দেয় ও ভূমি হতে উৎপন্ন হয়ে সীতারূপে সেই শাপ পূর্ণ করে।

রাবণাত্মজা ঃ সীতা জন্মের গল্পের মধ্যে সব চাইতে প্রাচীন কাহিনীতে সীতাকে রাবণের কন্যা বলা হয়েছে। ভারত, তিব্বত, খোটান (পূর্ব তুর্কিস্থান) ইন্দোনেশিয়া ও শ্যাম দেশে এই কাহিনী আমরা পাই। ভারতবর্ষে এই কথার প্রাচীনতম রূপ পাই আমরা গুণভদ্রাচার্য কৃত উত্তর পুরাণে। গল্পটী এই ঃ

অলকাপুরীর রাজা অমিতবেগের কন্যা মণিমতী বিজয়ার্দ্ধ পর্বতে তপস্যা করছিল।

রাবণ তাকে প্রাপ্ত হবার ইচ্ছা করেন। তপস্যায় ব্যাঘাত হওয়ায় মণিমতী ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সময় এই ইচ্ছা করে যে সে যেন রাবণের কন্যা হয়ে জন্মায় ও তাঁকে ধ্বংস করে। মন্দোদরীর গর্ভে তার জন্ম হয়। তার জন্ম সময়ে লঙ্কায় ভূমিকম্প আদি অনেক বিপর্যয় হয়। জ্যোতিষীরা বলে এই কন্যা ভবিষ্যতে রাবণের মৃত্যুর কারণ হবে। রাবণ সেকথা শুনে মন্ত্রী মারীচকে তাকে কোন দূর দেশে মাটিতে পুঁতে আসতে বলে। মন্দোদরী পরিচয়াত্মক এক পত্র, সামান্য অর্থ ও কন্যাকে একটী মঞ্জুষায় রেখে মারীচকে দেন। মারীচ সেই মঞ্জুষা মিথিলায় নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে আসে। কৃষকেরা সেই মঞ্জুষা সেই দিনই প্রাপ্ত হয় ও রাজা জনকের কাছে নিয়ে যায়। মাটি হতে প্রাপ্ত দ্রব্যের রাজাই অধিকারী হন। মঞ্জুষায় জনক এক কন্যা প্রাপ্ত হন। সেই কন্যাকে রাণী বসুধা নিজের কন্যার মত লালন পালন করেন। (উত্তর পুরাণ, পর্ব ৬৮)

মহাভাগবত-দেবী পুরাণে (১০-১১ খৃষ্টাব্দ) এর উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে :

সীতা মন্দোদরী গর্ভে সংভূতা চারুরূপিণী।
ক্ষেত্রজা তনয়াপ্যসা রাবণস্য রঘূত্তম ॥ অধ্যায় ৪২।৬২

সোমসেন কৃত জৈন রামপুরাণে সীতাকে রাবণের ঔরস পুত্রী বলা হয়েছে। মিথিলায় তাকে পোঁতা হয়। জনকের রাণীর নবপ্রসূত পুত্র যেদিন দেবতা কর্তৃক অপহৃত হয় সেই দিনই সেই মঞ্জুষা (যাতে নবজাতা রাবণ কন্যা ছিল) জনক প্রাপ্ত হন।

সীতা জন্মের কিছু গল্প এরূপও পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে মন্দোদরীর গর্ভে উৎপন্ন হবার পর তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। কাশ্মীরী রামায়ণ অনুসারে রাবণের অনুপস্থিতিতে মন্দোদরীর এক কন্যা হয়। জন্মকুণ্ডলী অনুসারে এই কন্যা বিবাহিত হবার পর বনবাসী হয়ে পিতৃকুলধ্বংস করবে শুনে মন্দোদরী নবজাত শিশুর গলায় প্রস্তর বেঁধে নদীতে প্রবাহিত করিয়ে দেন।

অন্য একটী গল্প অনুসারে রাবণ নিজেই মঞ্জুষায় বন্ধ করে কন্যাকে সমুদ্রে ফেলে দেন। জনক তাকে সমুদ্রতটে প্রাপ্ত হন।

জাভার 'সরেতকাণ্ড'-এর গল্পটী এই প্রকার :

মন্দোদরীর গর্ভে শ্রীদেবী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মন্দোদরীকে পূর্বাহ্নেই জ্যোতিষীরা বলে দিয়েছিল যে এই গর্ভে যে কন্যার জন্ম হবে রাবণ তার ওপর আসক্ত হবে। মন্দোদরী তাই কন্যার জন্ম হলে তাকে সমুদ্র জলে প্রবাহিত করিয়ে দিলেন। মংতিলীবাসী কল নামক ঋষি তাকে প্রাপ্ত হন ও তার লালন পালন করেন।

পদ্মজা—শ্যামদেশের 'রামজিয়েন'-এর গল্পটী এইরূপ :

দশরথের যজ্ঞপায়েসের এক অষ্টমাংশ মন্দোদরী প্রাপ্ত হন যা খেয়ে তিনি এক কন্যার জন্ম দেন। এই কন্যা বাস্তবে লক্ষ্মীর অবতার ছিল। (আনন্দ রামায়ণ অনুসারে এক শ্যেন পক্ষী কৈকেয়ীর হাতের পায়েস ছিনিয়ে নিয়ে যায় ও সেই পায়েস অঞ্জনী পর্বতে ফেলে দেয়।) জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণী শুনে রাবণ ভয়ে ভীত হন ও নবজাত কন্যাকে ঘটে ভরে বিভীষণ দ্বারা নদীতে ফেলিয়ে দেন। নদীতে কমল উৎপন্ন হয়ে সেই ঘট ধারণ করে। লক্ষ্মী নিজের দিব্যশক্তি প্রভাবে সেই ঘট জনকের কাছে পৌঁছে দেন। জনক সেই সময় সেই নদীতটে তপস্যানিরত ছিলেন। জনক ঘটটীকে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এক গাছের তলায় রেখে প্রার্থনা করেন যদি এই কন্যার নারায়ণের অবতারের সঙ্গে বিবাহ হবার থাকে তবে মাটিতে কমল ফুল উৎপন্ন হয়ে তার প্রমাণ দিক। সেই মুহূর্তে সেইখানে এক কমল ফুল উৎপন্ন হয়। জনক সেই কমলের ওপর সেই ঘট রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে পুনরায় তপস্যা করতে চলে যান। তপস্যায় আনন্দ না পাওয়ায় ১৬ বছর পর তিনি সেই গাছের তলায় ফিরে গিয়ে ঘটের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু ঘট প্রাপ্ত হন না। তখন নিজের সৈন্যদের ডেকে ঘটের অনুসন্ধান করান। তবুও ঘট পাওয়া যায় না। তাই নিরাশ হয়ে তিনি ফিরে যান। পরে একদিন হল চালাবার সময় আপনা হতেই তিনি সেই ঘট প্রাপ্ত হন। ঘটের মধ্যে কমলাসীনা এক যুবতীকে দেখতে পান। হলের ফালে প্রাপ্ত হন বলে তার নাম দেন সীতা।

রক্তজা—অদ্ভুত রামায়ণের গল্প এই ধরণের :

দণ্ডকারণ্যে গৃৎসমদ নামে এক ঋষি বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর এই ইচ্ছা ছিল যে তার গর্ভে লক্ষ্মী অবতরিত হোন। তাই ঋষি তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য প্রতিদিন সামান্য দুধ অভিমন্ত্রিত করে তাকে এক ঘটে একত্র করতে থাকেন। একদিন রাবণ কর আদায়ের জন্য সেই ঋষির আশ্রমে আসেন। রাজস্বরূপে সেই ঋষির শরীরে বাণবিদ্ধ করে করে রক্ত বার করে সেই ঘটে ভরে নেন। সেই ঘট মন্দোদরীকে দিয়ে তিনি বলেন এই ঘটের রস হলাহলের চাইতেও তীব্র। তাই সাবধানে একে রক্ষা করবে। রাবণের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে মন্দোদরী মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছায় সেই দুধ মিশ্রিত রক্ত নিজে পান করেন। কিন্তু মন্দোদরীর মৃত্যু হয় না, তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। পতির অনুপস্থিতিতে গর্ভবতী হয়ে যাওয়ায় ভয়ভীত হয়ে মন্দোদরী সেই গর্ভ কুরুক্ষেত্রে গিয়ে মাটীতে পুঁতে আসেন। হল চালনা করতে গিয়ে জনক কন্যা রূপে তা প্রাপ্ত হন। জনকের স্ত্রী তার লালন-পালন করেন ও তার নাম রাখেন সীতা। (সর্গ ৮) এই গল্পের আশয়ও সিংহলীয় কথার অনুরূপ।

এক ভারতীয় কাহিনী অনুসারে মন্দোদরী কৌতূহল বশতঃ সেই ঘটের রক্ত পান

করেন। ফলে তিনি এক কন্যার জন্ম দেন। রাবণ কুপিত হবার ভয়ে তিনি নবজাতা কন্যাকে সেই ঘটে পুরেই সমুদ্রে ফেলিয়ে দেন। ঘট জনকের রাজ্যে পৌঁছলে কৃষকেরা তা প্রাপ্ত হয় ও রাজা জনককে নিয়ে গিয়ে দেয়।

অগ্নিজা—আনন্দ রামায়ণ অনুসারে রাজা পদ্মাক্ষ লক্ষ্মীর উপাসনা করে তাঁকে কন্যারূপে লাভ করেন। কন্যার নাম পদ্মজা রাখা হয়। কন্যার স্বয়ংবরে পিতা যুদ্ধে নিহত হন। কন্যা তখন অগ্নিতে প্রবেশ করে। একদিন সেই কন্যা যখন অগ্নি হতে বার হচ্ছে সেই সময় রাবণ সেখানে এসে পড়েন। রাবণকে দেখে সেই কন্যা অগ্নিতে পুনঃ প্রবেশ করে। রাবণ অগ্নিকে নির্বাপিত করেন। কিন্তু নির্বাপিত অগ্নিতে তিনি সেই কন্যা পান না তার পরিবর্তে ৫টী রত্ন পান। রাবণ সেই রত্ন একটী কৌটয় রেখে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। কৌটো এতো ভারী হয় যে লঙ্কার বীরেরা তা তুলতে পারেন না। কৌটো খুলতেই মন্দোদরী তার মধ্যে এক যুবতীকে দেখতে পান ও তৎক্ষণাৎ তার মুখ বন্ধ করে সেই কৌটো মিথিলার মাটিতে পুঁতিয়ে দেওয়ান। এক ব্রাহ্মণের জমি চাষ করবার সময় এক শূদ্র তা প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধন রাজধন বলে তা জনককে দিয়ে আসেন। সেই কৌটো খুলতে জনক এক যুবতী কন্যা প্রাপ্ত হন ও তাকে কন্যার মত লালন-পালন করতে আরম্ভ করেন।

দক্ষিণ ভারতের এক কাহিনী অনুসারে লক্ষ্মী এক ফল হতে উৎপন্ন হন। বেদ মুনি সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হন ও তার নাম রাখেন সীতা। সীতা সমুদ্র তটে তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। সীতার রূপের প্রশংসা শুনে রাবণ সেখানে আসেন। রাবণ তাকে ধরতে গেলে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন। সীতার দেহভস্ম বেদমুনি এক স্বর্ণ যষ্টিতে তুলে রাখেন। সেই যষ্টি রাবণ প্রাপ্ত হয়ে নিজের কোষাগারে রেখে দেন। পরে সেই যষ্টি হতে শব্দ নিঃসৃত হতে শুনে তাকে খোলা হয়। খুলতেই এক রূপসী কন্যা তা হতে বার হয়। জ্যোতিষীদের মুখে এই কন্যা লঙ্কা বিনাশের কারণ হবে শুনে রাবণ ভয়ভীত হয়ে সেই কন্যাকে স্বর্ণ মঞ্জুষায় রেখে জলে প্রবাহিত করিয়ে দেন। মঞ্জুষা কৃষকেরা প্রাপ্ত হয়ে জনককে নিয়ে গিয়ে দেয়। সম্ভবতঃ যে ফল হতে সীতার জন্ম হয় তা সীতাফল ছিল যার জন্য ঋষি তার নাম রাখলেন সীতা।

দক্ষিণ ভারতের অন্য এক কাহিনী অনুসারে ঈশ্বর যোগীর রূপ ধারণ করে লঙ্কায় অবস্থান করেন ও নানা প্রকার উপদ্রব করেন। একদিন তিনি নগরদ্বারে ছাই একত্রিত করলে তা হতে একটি গাছ উৎপন্ন হয়। যোগী তখন চলে যান। রাবণ সেই গাছটী কাটিয়ে তার চার ভাগ করে জলে ভাসিয়ে দেন। সেই গাছের এক ভাগ জনকের রাজ্যে গিয়ে ঠেকে। মন্ত্রী সেই কাঠ যজ্ঞের আগুনে ফেললে অগ্নি

হতে সীতা ও একটা ধনুক বার হয়। ধনুকের গায়ে লেখা থাকে এই ধনুক যে ভাঙবে সে এই কন্যাকে লাভ করবে।

দশরথজাতক ঃ জাতক বৌদ্ধধর্মের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনটী জাতকে রাম কথা পাওয়া যায়। দশরথ জাতক, অনামক ও দশরথ কথানক। এদের মধ্যে রাম কথার জন্য সব চাইতে মহত্বপূর্ণ জাতক হচ্ছে দশরথ জাতক। সেই জাতক অনুসারে—মহারাজ দশরথ বারাণসীর রাজা ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ মহিষীর তিন সন্তান ছিল ঃ দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদের নাম রাম পণ্ডিত ও লক্ষ্মণ, কন্যার নাম সীতা। জ্যেষ্ঠ মহিষীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রাণী ভরতকুমারের জন্ম দিলেন। ভরতের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রাজা দশরথ ভরতের মাকে দুটো বর দেবেন বলেন। ভরত মাতা সেই বর তখন তখনই নেন না ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেন। ভরতের যখন সাত বছর বয়স হয় তখন ভরতকে যৌবরাজ্য দেবার জন্য তিনি আগ্রহ করেন। রাজা মৌনাবলম্বন করে থাকেন। ভরতমাতার আগ্রহ তীব্র হতে তীব্রতর হয়। রাজা এর পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে অনুমান করে রামপণ্ডিত ও লক্ষ্মণকে ডেকে সমস্ত কথা খুলে বলেন। আরো বলেন যে তাদের জীবন এখানে নিরাপদ নয়। তারা যেন অন্য কোনো সুরক্ষিত জায়গায় চলে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে এসে তারা যেন তাদের রাজ্য অধিকার করে নেয়।

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে রাজার জীবন ১২ বছর অবশেষ রয়েছে জানা যায়। তাই দুই ভাই ও বোন সীতা বারাণসী পরিত্যাগ করে হিমালয়ে গিয়ে আশ্রম বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করেন। নবম বছরে দশরথের মৃত্যু হয় কিন্তু ভরত রাজদণ্ড গ্রহণ করেন না। অমাত্যেরাও রাণীর ইচ্ছার বিরোধ করেন। ভরত রাম পণ্ডিতকে ফিরিয়ে আনার জন্য সসৈন্যে হিমালয়ে যান। ভরতকুমার যখন আশ্রমে পৌঁছান তখন রাম পণ্ডিত একেলাই ছিলেন। ভরত রামকে পিতার মৃত্যুর সমাচার দিলেন। সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে ফিরে এসে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে অধীর হয়ে উঠলেন। রাম পণ্ডিত তাঁদের সংসারের অনিত্যতার উপদেশ দিলেন। তাঁদের মোহ বিগত হল।

ভরতকুমার রাম পণ্ডিতকে বারাণসী ফিরে যেতে ও রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন। রাম পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে বললেন যে পিতা তাঁদের ১২ বছর বারাণসী না যেতে বলেছিলেন। এখনো তিন বছর বাকী আছে। তাই তিনি তিন বছর পর বারাণসী যাবেন। ভরত কুমার তখন রাম পণ্ডিতের তৃণ পাদুকা ও সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বারাণসী ফিরে গেলেন।

সিংহাসনে পাদুকা স্থাপন করে ভরতকুমার মন্ত্রী রূপে রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করলেন। অনুচিত কার্য বা নির্ণয় হলে পাদুকা নিজেদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত আরম্ভ

করত। তিন বছর পর রাম পণ্ডিত বারাণসী ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। সীতার (বোন) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৬000 বছর রাজ্য শাসন করে তিনি স্বর্গে গমন করেন।

উপসংহার : মহারাজ শুদ্ধোধন সেই সময় রাজা দশরথ, বুদ্ধ মাতা মায়া দেবী রাম পণ্ডিতের মা, যশোধরা সীতাদেবী, আনন্দ ভরতকুমার ও স্বয়ং বুদ্ধ রাম পণ্ডিত ছিলেন।

তথাগত বুদ্ধ এই রাম কথা (জাতক) জেত বনে কোন গৃহী ভক্তকে পিতার মৃত্যুর পর শোকাভিভূত হয়ে সে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করলে উপদেশ রূপে শোনান। বলেন, প্রাচীনকালে পিতার মৃত্যুর পর লোকে কিঞ্চিৎমাত্র শোক করত না। বারাণসী রাজ দশরথের মৃত্যুতে রাম পণ্ডিত শোক না করে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন সেইভাবে আমাদেরো ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

এভাবে সীতা জন্মের বিবিধ কাহিনী প্রাচীন কালের সাহিত্যে পাওয়া যায়।

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমি তাঁকে তুলে ধরলাম।

তিনি বললেন, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর।

আমার হাত কাঁপতে লাগল।

এমন সময় কৌমুদী বলে উঠল, গঙ্গারক্ষিত, তরবারি রাখ, স্বামিনী যা বলেন তাই কর। তুমি বলেছিলে জীবন দিয়ে মিত্র ভালো করে—এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে—

কিন্নরী বলল, স্বামিনী যা বলেন তাই কর। বন্ধুমতীর স্বামীকে এখানে নিয়ে এস। তিনি না এলে স্বামিনী বাঁচবেন না। তিনি না বাঁচলে তোমারো মৃত্যু নিশ্চিত জেনো।

দেব, তাই আমি এখানে এসেছি। এখন আমার স্বামিনী ও আমার জীবন আপনার হাতে।

আমি তখন গঙ্গারক্ষিতকে বললাম, এ বিষয়ে একটু চিন্তা করে বলব।

গঙ্গারক্ষিত তখন আমায় নমস্কার করে চলে গেল।

সে বিষয়ে তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম। আমার তখুনি মনে হল উচ্চকুল-জাতের পক্ষে এ উচিত হয় না। তাছাড়া আমার বিপদও ঘটতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাই অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করা হতে বিরত থাকতে বলেন। রাজকন্যার সঙ্গে গোপনে সংসর্গ করা তাই আমার উচিত হবে না।

সেই দিন বিকেলে দলবল নিয়ে বহুরূপ নামে এক নট এল। সে পুরুহুত-বাসব নামক পরস্ত্রী সংসর্গ না করার ওপর রচিত এক নাটকের অভিনয় করে দেখাল। নাটকের বিষয় ছিল নিম্নপ্রকার :

বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণার্দ্ধে রত্নসঞ্চয় নামে এক নগর ছিল। সেখানে ইন্দ্রকেতু নামে এক বিদ্যাধররাজ রাজত্ব করতেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। নাম পুরুহুত ও বাসব।

বাসব একদিন ছদ্মবেশে ঐরাবতের পিঠে ওঠে আকাশ ভ্রমণে বেরুলেন। আকাশ ভ্রমণ করতে করতে তিনি গৌতমপত্নী অহল্যাকে দেখতে পেলেন। তাকে দেখে তার সঙ্গে সংসর্গ করবার বাসনায় তিনি মাটীতে নেবে এলেন।

গৌতমের পূর্ব নাম ছিল কাসব। তিনি ঋষিদের নেতা ছিলেন। কিন্তু যখন

গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন তখন অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে তুলে অন্ধকূপে ফেলে দেন। কাসবের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন কোনো দেবতা তা দেখতে পেয়ে বৃষরূপ ধারণ করে তাঁর ল্যাজ সেই কূপে নামিয়ে দেন ও কাসব সেই ল্যাজ ধরে ওপরে উঠে আসেন। তাই তাঁর নাম হয় গোতম বা অন্ধ গোতম।

সেই দেবতা তখন তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। গোতম সেই বরে বিশ্বশ্রবা ও মেনকার কন্যা অহল্যাকে প্রার্থনা করেন। দেবতার বরে গোতম অহল্যাকে লাভ করেন।

বাসব যখন অহল্যার কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন তখন গোতম গৃহে ছিলেন না। ফল ফুল সংগ্রহের জন্য বনে গিয়েছিলেন। সেই অবসরে বাসব অহল্যাকে ভোগ করেন। গোতম ফিরে আসতে বাসব অহল্যাকে পরিত্যাগ করে বৃহৎ শরীর ধারণ করেন কিন্তু গোতম তাঁকে নিহত করতে সমর্থ হন।

এই নাটক দেখে আমার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু মধ্যরাত্রে কার কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক দেবী। তিনি অঙ্গুলি সঞ্চালনে আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি অশোক বনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হলে তিনি আমায় বলতে লাগলেন ঃ

বৎস, চন্দনপুর নগরে অমোঘদর্শন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল চারুমতী। পুত্রের নাম চারুচন্দ্র। বসুমিত্রের পুত্র সুসেন তাঁর মন্ত্রী ছিল। বসুমিত্র ও সুসেন দু'জনেই রাজাকে রাজকার্যে সাহায্য করত।

চন্দনপুরে রাজার রক্ষিতা এক গণিকা বাস করত। তার নাম ছিল অনঙ্গসেনা। অনঙ্গসেনার কামপতাকা নামে এক কন্যা ছিল। সমস্ত চন্দনপুরে সৌন্দর্য ও কলায় কামপতাকার মত অন্য কোনো একটিও মেয়ে ছিল না। রাজা এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুমুহ নামে এক ভৃত্যকে নিযুক্ত করেন।

একদিন কামপতাকা যখন রাজপ্রাসাদ হতে বেরিয়ে আসছে তখন দুমুহ কামপতাকাকে দেখতে পায় ও তাকে শয়ন কক্ষে যেতে বলে। কামপতাকা অস্বীকার করলে সে তাকে জড়িয়ে ধরে। কামপতাকা তখন পরমেষ্ঠী মন্ত্র স্মরণ করে। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে দুমুহকে স্তম্ভিত করে দি। কামপতাকা নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে যায়। দুমুহ এরজন্য কামপতাকার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

একসময় বাড়ব, সান্দিল্য ও উদয়বিন্দু ঋষি রাজসকাশে এসে উপস্থিত হন ও বলেন যে তাঁদের আশ্রমে তাঁরা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। তিনি যেন তাঁদের রক্ষা করেন।

সেকথা শুনে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজপুত্র চারুচন্দ্রকে তাঁদের যজ্ঞ রক্ষার্থে প্রেরণ করেন।

যজ্ঞস্থলে চিত্রসেনা, কলিঙ্গসেনা, অনঙ্গসেনা ও কামপতাকার নৃত্যাভিনয়েরও আয়োজন করা হয়। বহুবিধ নৃত্যের মধ্যে ছিল সূচিনৃত্যও। সূচিনৃত্যে সূঁচের অগ্রভাগের ওপর পা ফেলে নৃত্য করতে হয়। কামপতাকা নৃত্য করতে উঠলে পূর্ব ক্রোধের জন্য দুমুহ সেই সূঁচের অগ্রভাগে বিষ মাখিয়ে দেয়। কামপতাকা সেকথা জানতে পারে ও পরমেষ্ঠী মন্ত্র স্মরণ করে বলে সে যদি এই বিপদ হতে রক্ষা পায় তবে সে জিন মন্দিরে অষ্টাহ্নিকা উৎসব করবে। আমি তখন সেই বিষ মাখানো সূঁচ সরিয়ে নেই। কামপতাকার নৃত্য এত সুন্দর হয় যে চারুচন্দ্র তাতে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের অলঙ্কারাদি খুলে ছত্র ও চামর সহ সেসব তাকে দান করে।

যজ্ঞান্তে চারুচন্দ্র প্রাসাদে ফিরে এলে অলঙ্কার অভাবে তার দেহ কান্তিহীন দেখে রাজা তার অনুচরদের তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

তারা প্রত্যুত্তরে বলে, দেব, কুমার সে সমস্ত কামপতাকাকে দান করেছেন। কামপতাকা জিন মন্দিরে অষ্টাহ্নিকা উৎসব পালন করছে।

রাজা সেকথা রাণীকে বলেন। জিজ্ঞাসা করেন, কামপতাকা কি জিনোপাসিকা?

রাণী প্রত্যুত্তর দেন, তার আমি কি জানি? আপনি অনঙ্গসেনাকে তা জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা অনঙ্গসেনাকে ডেকে সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, মহারাজ, শুনুন—

এই নগরে স্বামীদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করেন। তিনি জিনোপাসক। তাঁকে দেখে কামপতাকা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। আমি তাই তাঁকে ডাকিয়ে কামপতাকাকে তাঁকে দিতে চাই কিন্তু তিনি কামপতাকাকে নিতে অস্বীকার করেন। তারপর তাঁকে খাবার দিলে উপবাস রয়েছে বলে তিনি তাও গ্রহণ করেন না। আমরা তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতে বলি। তিনি ধর্মোপদেশ দেন। সেই ধর্মোপদেশ শুনে আমরা জিনোপাসিকা হয়ে পড়ি।

অনঙ্গসেনা তারপর দুমুহের কথা রাজাকে জানায়—কিভাবে সে কামপতাকাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল, তাতে অসমর্থ হলে কী ভাবে সূঁচে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল।

রাজা সমস্ত শুনে দুমুহের মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

এর কিছুদিন পর উদয়বিন্দু আদি ঋষিরা রাজার কাছে এলেন ও রাজাকে বিল্বফল উপহার দিয়ে বললেন, মহারাজ, কামপতাকার নৃত্য দেখে গুরু সুনকচ্ছেদ তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন, আপনি তাই কামপতাকাকে তাঁকে দান করুন। তিনি যদি কামপতাকাকে না পান তবে বিরহানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন।

রাজা বললেন, কামপতাকাকে আমি কুমারকে দান করেছি। তাই তাকে দেওয়া আর সম্ভব নয়। আপনারা যদি অন্য কোনো কন্যা চান তবে তা আমি আপনাদের দিতে পারি।

তাঁরা বললেন, আমাদের অন্য কন্যার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু রাজা কামপতাকাকে দিতে সম্মত হলেন না। তখন তাঁরা ফিরে গেলেন।

তাঁরা চলে যেতে সেখানে রাণী এলেন। তিনি সেই বিল্বফল দেখে তুষ্ট হলেন ও সেইফল আরো আনিয়ে দিতে বললেন।

ইতিমধ্যে কামপতাকার সঙ্গে কুমারের বিবাহ হয়ে গেল।

রাজা ভাবলেন রাণী হয়ত এতদিনে বিল্বফলের কথা ভুলে গিয়েছেন কিন্তু রাণী তা ভোলেন নি। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে তাই রাজা সসৈন্যে যে উদ্যানে সেই বিল্বফল ধরেছিল সেই উদ্যানে গেলেন। ফল সংগ্রহের সময় রাজ সৈন্যরা উদ্যানটিকে নষ্ট করে দিল।

সেই উদ্যানের অধিকারী ছিলেন মুনিদের অগ্রণী চণ্ড কৌশিক। তিনি তাঁর উদ্যান বিনষ্ট দেখে রাজাকে এই বলে অভিশাপ দিলেন—রে দুষ্ট, তুই আমার উদ্যান নষ্ট ও ভ্রষ্ট করেছিস। আমি তাই তোকে এই অভিশাপ দিচ্ছি যে তুই যেই রমণী সংভোগ করতে যাবি তোর মাথা শতধা চূর্ণ হয়ে যাবে।

রাজা এই অভিশাপে, ভয় পেলেন। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে রাণী ও ধাত্রী মঞ্জুলা সহ মুনি ধর্ম অঙ্গীকার করলেন।

একদা রাজার বীর্য তাঁর বল্কল বসনে লেগে থাকে। সেই বস্ত্র রাণী পরিধান করায় তিনি গর্ভবতী হন ও কালে এক কন্যা প্রসব করেন। সেই কন্যার নাম রাখা হয় ঋষিদত্তা।

রাজা রাণী ধাত্রী তিন জনে মিলে সেই কন্যাটীকে পালন করতে থাকেন। ঋষিদত্তা ক্রমে বড় হয়ে যৌবন প্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে রাণীর মৃত্যু ঘটে।

সেই আশ্রমে একদিন রাজার বোনের ছেলে শীলাউহ এসে উপস্থিত হন। রাজা শীলাউহর সঙ্গে ঋষিদত্তার বিবাহ দেন।

কিছুদিন সেখানে বাস করবার পর শীলাউহ· নিজের রাজ্যে ফিরে যান। ঋষিদত্তা সেই আশ্রমেই থাকে। বিষফল খাবার ফলে ইতিমধ্যে মঞ্জুলারও মৃত্যু হয়।

কালে ঋষিদত্তা এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। প্রসবের যন্ত্রণায় ঋষিদত্তার মৃত্যু হয়।

ঋষিদত্তার মৃত্যুতে রাজা অন্ধকার দেখতে আরম্ভ করলেন। সেই শিশুকে তিনি কি করে পালন করবেন?

ঋষিদত্তা মৃত্যুর পর ব্যন্তর দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সে হরিণীর রূপ ধরে রাজার কুটীরে যায় ও শিশুকে নিজের দুগ্ধ পান করাতে আরম্ভ করে। শিশু এভাবে হরিণীর দুগ্ধ পান করে বড় হতে থাকে।

একদিন রাজার অবর্তমানে সেই শিশুকে এক সর্প দংশন করে। সেই হরিণী শিশুর নিকটে গিয়ে ক্ষতস্থান হতে বিষ চুষে নেয়। এভাবে শিশুর জীবন রক্ষা পায়।

বৎস, সেই হরিণী আমিই ছিলাম—পূর্ব জন্মের ঋষিদত্তা। আমি দেবী রূপ ধারণ করে সেই সর্প চণ্ড কৌশিককে ভৎর্সনা করি, ওরে ও দুষ্ট চণ্ড কৌশিক এখনো তোর ক্রোধ উপশান্ত হল না।

আমার কথা শুনে চণ্ডকৌশিকের পূর্বজন্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সে আত্ম সমালোচনা করে অনশন গ্রহণ করে ও মৃত্যুর পর দেবরূপে উৎপন্ন হয়।

ওদিকে শ্রাবস্তীতে পিতার মৃত্যুর পর শীলাউহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমি তখন পরিব্রাজিকা রূপ ধারণ করে শিশুকে নিয়ে শীলাউহের কাছে যাই ও সেই শিশুকে তাঁকে দিয়ে বলি, এ তোমারই পুত্র। কিন্তু শীলাউহ সেকথা বিশ্বাস করেন না। আমি তখন সেই শিশুকে সেখানে রেখে রাজসভা হতে বেরিয়ে আসি। সেই সময় দৈববাণী হয়ঃ এই শিশু অমোঘদর্শনের পৌত্র, ঋষিদত্তার পুত্র ও তোমার বীর্যে উৎপন্ন আপন সন্তান।

সে কথা শুনে রাজার পূর্বকথা স্মরণ হয়। তিনি সেই শিশুকে গ্রহণ করে সেই পরিব্রাজিকা কোথায় অনুসন্ধান করতে করতে অমোঘদর্শনের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। সেখানে ঋষিদত্তাকে দেখে তিনি আনন্দিত হন।

আমি তখন দৈবীরূপ ধারণ করে সকলকে ধর্মোপদেশ দি। অমোঘদর্শন সেইখানেই কেবল জ্ঞান লাভ করেন। যাঁদের বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় আমি তাঁদের অষ্টাপদে নিয়ে যাই। তাঁরা মুনি শান্তবেগ ও প্রশান্তবেগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বৎস, সেই শিশুই এণীপুত্র যিনি এখন শ্রাবস্তীর রাজা।

এই এণীপুত্র উদ্যানে আমার এক মন্দির নির্মাণ করে দেয়। এবং তার প্রতি প্রীতি বশতঃ আমি এই উদ্যানে বাস করতে থাকি।

একবার কন্যা সন্তানের কামনায় এণীপুত্র তিনদিন উপবাস করে আমার আরাধনা করে। আমি তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা হোক বলে বর দি।

সেই বরের প্রভাবে এণীপুত্রের প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের মত এক সুন্দরী কন্যা হয়। সেই কন্যাই প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী।

প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী যৌবন প্রাপ্ত হলে এণীপুত্র তার স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী আমায় জিজ্ঞাসা করে সে সেই স্বয়ম্বর সভায় যাবে কিনা? আমি তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করি।

প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী কাউকে বরমাল্য না দেওয়ায় স্বয়ম্বরে উপস্থিত রাজারা ক্ষিপ্ত হয়ে এণীপুত্রকে আক্রমণ করে। আমার প্রভাবে এণীপুত্র তাদের সকলকে পরাজিত করে দেয়।

এণীপুত্র আমায় জিজ্ঞাসা করে, প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী কেন পতি নির্বাচন করল না?

আমি তখন এণীপুত্রকে এই প্রত্যুত্তর দেই যে অর্দ্ধচক্রীর পিতা বাসুদেব প্রিয়ঙ্গু-সুন্দরীর ভাবী পতি। তিনি এখনো এখানে আসেন নি। তিনি এলে আমি তোমাকে জানাব।

বৎস, বন্ধুমতী সহ তুমি যখন প্রাসাদে এলে তখন তোমাকে দেখে প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী কাম পীড়িতা হয়। সে তিনদিন উপবাস করে আমার আরাধনা করে। আমি তাই গঙ্গারক্ষিতকে তোমার কাছে পাঠাই। কিন্তু তুমি গঙ্গারক্ষিতকে আমল দিলে না। তাই আমায় আসতে হল। বৎস, তুমি তাই নির্ভয়ে গঙ্গারক্ষিতের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ কর। আমি সমস্ত বিষয় রাজাকে অবগত করাব। বৎস, দেবদর্শন কখনো ব্যর্থ হয় না। তুমি আমার কাছে যে কোন একটী বর প্রার্থনা কর।

আমি তখন দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে বললাম, মা যখন প্রয়োজন হবে তখন স্মরণ করলে তুমি উপস্থিত হবে আমি এই বর প্রার্থনা করি।

দেবী তথাস্তু বলে চলে গেলেন।

পরদিন ভোর বেলায় গঙ্গারক্ষিত এসে উপস্থিত হল। বলল, দেব এর পূর্বে যখন আমি এসেছিলাম তখন আপনি বলেছিলেন যে চিন্তা করে তার প্রত্যুত্তর দেবেন। যদি আপনার চিন্তা করা হয়ে থাকে তবে প্রত্যুত্তর দিলে বাধিত হব।

আমি বললাম, উদ্যানেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

আমি সন্ধ্যাবেলা যে উদ্যানে সেই দেবীর মন্দির ছিল সেই উদ্যানে গেলাম। প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীও সেই উদ্যানে এল। গঙ্গারক্ষিত দরজায় পাহারা দিতে লাগল।

আমি গান্ধর্বমতে প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীকে বিবাহ করলাম ও তার সঙ্গে যৌবন সুখ ভোগ করতে লাগলাম।

গঙ্গারক্ষিত এসে বলল, দেব এবার রাজকুমারীকে যেতে দিন।

প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী বলল, আর্যপুত্র, আমি যতক্ষণ না পরিতৃপ্ত হচ্ছি ততক্ষণ আপনি আমায় বিতাড়িত করবেন না।

ক্ষণিক বাদে গঙ্গারক্ষিত আবার এল। বলল, দেব, অন্তঃপুরে ফিরে যাবার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। যদি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর সঙ্গে থাকতে চান তবে স্ত্রীবেশ পরিধান করে অন্তঃপুরে যান। রাজকুমারী দেবী পূজার জন্য এখানে এসেছিলেন। এত দেরী তাই উচিত হয় না।

আমি উপায়ান্তর না থাকায় স্ত্রী বেশ পরিধান করে প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর সঙ্গে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলাম।

পরদিন সকালে গঙ্গরক্ষিত প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর কাছে এসে বলল, দেবী, এবার আপনি ওঁকে যেতে দিন।

প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী গঙ্গারক্ষিতের পায়ে পড়ে বলল, গঙ্গারক্ষিত, তুমি আমায় সাতদিন সময় দাও।

গঙ্গারক্ষিত ভয় পেয়ে বলল, ঘুণাক্ষরেও যদি রাজা একথা জানতে পারেন তবে মৃত্যু নিশ্চিত।

সাতদিন পর গঙ্গারক্ষিত আবার এসে সেই অনুরোধ জানাল। প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী আবার সাতদিনের সময় নিল।

সাতদিন পর গঙ্গারক্ষিত এলে এবার কৌমুদিকা বলে উঠল, আমরা কি গঙ্গার জলে ভেসে এসেছি। যতদিন সময় তুমি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীকে দিয়েছ ততদিন সময় আমাদেরও দিতে হবে।

এ ভাবে একুশ দিন এক মুহূর্তের মত ব্যতীত হয়ে গেল।

গঙ্গারক্ষিত ভয়ে কাঠ হয়ে এল। সে আমাকে বলল, দেব, একথা কেবল অন্তঃপুরেই নয় অমাত্য মহলে এমন কি নগরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। কোন শৃগাল এসে রাজকুমারীর অন্তঃপুরে বাস করছে।

কৌমুদিকা বলল, একথা যদি জানাজানি হয়ে গিয়ে থাকে তবে ওঁকে এখানেই থাকতে দাও।

গঙ্গারক্ষিতের দয়নীয় স্থিতি দেখে আমি তাকে বললাম, গঙ্গারক্ষিত তুমি ভয় পেয়ো না। তুমি রাজাকে গিয়ে বল যে দেবী ঋষিদত্তা আপনাকে বলেছেন যে যা বলেছিলাম সত্য হয়েছে। রাজকুমারীর স্বামী অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন।

গঙ্গারক্ষিত সেই কথা রাজাকে গিয়ে বলল।

খানিকবাদে কৌমুদিকা হাসতে হাসতে এসে বলল, রাজা তাকে পুরস্কৃত করেছেন।

গঙ্গারক্ষিত আমার পায়ে এসে পতিত হল। তার হাত অঙ্গদের ভারে ভারী হয়ে উঠেছিল। যে হেতু সে প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর বন্ধু আমি তাকে আলিঙ্গন দিলাম।

রাজা বিবাহোৎসবের অনুষ্ঠান করলেন। বিবাহের পর আমি উভয় পত্নী নিয়ে সুখে সেখানে বাস করতে লাগলাম। তারুণ্যে ও সৌন্দর্যে প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর মত নারী সেই নগরে একটীও ছিল না। তাই যাদের পাইনি তাদের জন্য হা-হুতাশ না করে আমি প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর সঙ্গে সেইখানেই অবস্থান করব স্থির করলাম।

[এখানে ১৯ ও ২০ লম্বক পাওয়া যায় না]

একদিন রাত্রে যখন প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীর সঙ্গে আমি শুয়েছিলাম তখন প্রভাবতী এল ও আমায় সোমশ্রীর কাছে নিয়ে গেল।

আমাকে সেখানে লুকিয়ে রাখা হল। কিন্তু একদিন মানসবেগ আমায় দেখতে পেয়ে আমায় বন্দী করে ফেলল।

বেগবতী ও অন্যান্যরা আমাকে মুক্ত করে দেবার জন্য তাকে অনুনয় বিনয় করল : কেন আমায় বন্দী করেছে তার কারণ জিজ্ঞেস করল।

মানসবেগ বলল, ও আমার বোনকে বিবাহ করেছে সেজন্য।

আমি বললাম তুমি যে আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে এনেছ তার ?

তাকে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি—সে বলল। যদি চাও তাহলে এর বিচার করাতে পার।

বিচারের জন্য আমরা বৈজয়ন্তীর বলসিংহের কাছে আবেদন করলাম।

একদিকে মানসবেগ, অঙ্গারক, হেফগ ও নীলকণ্ঠ অন্যদিকে একা আমি। প্রভাবতী প্রদত্ত পন্নপ্তি বিদ্যার প্রভাবে আমি চার জনকেই পরাস্ত করতে সমর্থ হলাম।

আমি মানস বেগকে ততক্ষণ ধরে রাখলাম যতক্ষণ না সে সোমশ্রীর কাছে নিজের জীবন ভিক্ষা করল।

তার মাও তাকে ছেড়ে দেবার জন্য আমার কাছে অনুরোধ জানাল। সেজন্য ও সোমশ্রীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবার জন্য তার সামান্য রক্ত ক্ষরণ করিয়ে তাকে আমি মুক্ত করে দিলাম।

এভাবে পরাজিত হয়ে সে আমার ভৃত্যের মত সেবা করতে লাগল।

এক সময় সোমশ্রী আমায় বলল, চল আমরা মহাপুরে যাই।

আমরা মানসবেগ নির্মিত বিমানে মহাপুর গেলাম।

আমি একদিন যখন অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করছিলাম তখন হেফগ আমায় অপহরণ করে নিয়ে গেল। আমি তার মস্তকে আঘাত করলে সে আমায় ফেলে দিল। আমি পড়তে পড়তে এক সরোবরে এসে পতিত হলাম।

আমি পাড়ে উঠে ভাবতে লাগলাম এ কোন জায়গা ? ঠিক সেই সময় পাহাড়ের গা দিয়ে শ্বেতপক্ষ পক্ষীর মত দুজন চারণ মুনিকে নেমে আসতে দেখলাম।

আমি তাঁদের নিকটে গেলাম ও তাঁদের প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলাম। তারপর তাঁদের সঙ্গে নিকটস্থ আশ্রমে গেলাম।

আশ্রমবাসী অগস্ত্য, কৌশিক আদি মুনিরা তাঁদের স্বাগত জানালেন। তাঁরা কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে চলে গেলেন।

আমি সেই আশ্রমে এক নব যৌবনা নারীকে দেখতে পেলাম। তার গলায়

হাড়ের মালা ছিল। তার শরীর রোগগ্রস্ত থাকায় হিমপীড়িত কমলের মত আমার তাকে মনে হল।

আমি তার কথা মুনিদের জিজ্ঞাসা করলাম। সে কেনই বা ব্রতাচরণ করে শরীরকে নিপীড়িত করছে?

মুনিরা বললেন, শোন—

বসন্তপুর নগরে জিতশত্রু নামে রাজা রাজত্ব করেন। মগধের রাজা জরাসন্ধের কন্যা ইন্দ্রসেনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

রাজা জিতশত্রু যোগী সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিলেন। এরজন্য যোগী শংখ ও সেই সম্প্রদায়ের অন্যান্য যোগীরা অবাধে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করতেন।

সুরসেন নামে এক যোগী যাঁকে জিতশত্রুও শ্রদ্ধা করতেন একবার তাঁর অন্তঃপুরে আসেন। তিনি মন্ত্র বলে ইন্দ্রসেনাকে তাঁর বশীভূত করে নেন। সুরসেন যখন জানতে পারলেন যে রাজা ইন্দ্রসেনার তাঁর প্রতি আসক্তির কথা জানতে পেরেছেন তখন ইন্দ্রসেনাকে এক গভীর বনে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রসেনা তার হৃদয় যোগীকে দান করেছিল। সে তাই তার বিরহে উন্মাদ হয়ে গেল ও বলতে লাগল, আমাকে আমার প্রিয়তমের কাছে যেতে দাও।

রাজা ও লোকেরা ভাবল কোন পিশাচ তার ওপর ভর করেছে। তাই তারা তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখল, অত্যাচার করতে লাগল, ধুঁয়ো দিতে লাগল, ওষধি খাওয়াতে লাগল কিন্তু কিছুতেই তাকে পিশাচের হাত হতে মুক্ত করতে পারল না।

জরাসন্ধ যখন সেকথা জানতে পারলেন তখন তাকে কষ্ট দিতে নিষেধ করলেন ও কোনো আশ্রমে রেখে দিতে বললেন। সেখানে ও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাবে।

মহারাজ জরাসন্ধের নির্দেশ মত তাকে মুক্ত করে দেওয়া হল। সুরসেনের হাড় দেখিয়ে বলা হল এই তোমার প্রিয়তম। সে তখন সেই হাড়ের মালা গেঁথে গলায় পরল।

রাজ অনুচরেরা তখন তাকে এই আশ্রমে ছেড়ে দিয়ে গেল। সেই হতে ও এখানে আছে। বললেও কিছু খায় না। তাই ওর এই অবস্থা হয়েছে।

তোমাকে ঋদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে। দেখ তুমি যদি ওকে ব্যাধি মুক্ত করতে পার। তা আমাদের ও রাজার আনন্দের কারণ হবে

আমি বললাম, আপনারা যদি চান তবে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।

তাঁরা আনন্দিত হয়ে রাজাকে এই সংবাদ দিলেন।

রাজা অনুচর পাঠিয়ে ইন্দ্রসেনা ও আমাকে রাজপ্রাসাদে আনিয়ে নিলেন। আমি ইন্দ্রসেনার চিকিৎসা করলাম। সে ভালো হয়ে গেল।

রাজা এতে পরিতুষ্ট হয়ে তাঁর বোন কেতুমতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন।

আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেলে কেতুমতী একদিন আমাকে আমার পরিবার পরিজনের কথা জিজ্ঞেস করল। আমি যখন তাকে সমস্ত কথা বললাম তখন তার আয়ত নয়ন আনন্দে আরো আয়ত হয়ে উঠল।

এভাবে সেখানে আমি আনন্দে বাস করতে লাগলাম।

একদিন জিতশত্রু আমার কাছে এলেন ও বললেন, ভদ্র, তাঁর কন্যাকে যে রোগমুক্ত করেছে মহারাজ জরাসন্ধ তাকে দেখতে চান। তিনি বহুবারই সে কথা আমায় লিখে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আমিই তোমাকে জানাইনি। কারণ তুমি এখান হতে যাও তা আমি চাই না। কিন্তু এবার বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন। বলেছেন, তাকে শীঘ্র প্রেরণ কর। তাতেই তোমার মঙ্গল।

আমি বললাম, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি অবশ্যই যাব।

কেতুমতী বলল, তুমি চলে গেলে আমি একা কি ভাবে থাকব ?

আমি বললাম, প্রিয়ে, তার জন্য তুমি চিন্তা করো না। আমিত আবার শীঘ্রই ফিরে আসছি।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য 50 পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.00।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 4 Sraman August 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮৭ ॥ পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

পর্যুষণ পর্বে মাথায় করে কল্পসূত্র নিয়ে
যাওয়া হচ্ছে

মহাবীর-বাণী

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার

[১৯৪৩-৪৪ সালে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে থাকা কালে পণ্ডিত বেচর দাস দোশী সংকলিত ও হিন্দীতে অনূদিত 'মহাবীর-বাণী'র বঙ্গানুবাদ করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। ধারাবাহিক ভাবে সেই অনুবাদ এখানে প্রকাশিত করা হচ্ছে।

—সম্পাদক]

॥ ১ ॥

মঙ্গল সূত্র

নমস্কার

অর্হৎদের নমস্কার।

সিদ্ধদের নমস্কার।

আচার্যদের নমস্কার।

উপাধ্যায়দের নমস্কার।

বিশ্বের সমস্ত সাধুদের নমস্কার।

এই পঞ্চ নমস্কার সমস্ত পাপ বিনাশ করে এবং সমস্ত মঙ্গলের মধ্যে প্রথম (প্রধান) মঙ্গল।

মঙ্গল

অর্হতেরা মঙ্গল স্বরূপ।

সিদ্ধেরা মঙ্গল স্বরূপ।

সাধুরা মঙ্গল স্বরূপ।

কেবলী কথিত ধর্ম মঙ্গল স্বরূপ।

লোকোত্তম

অর্হতেরা সংসারে শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধেরা সংসারে শ্রেষ্ঠ।

সাধুরা সংসারে শ্রেষ্ঠ।

কেবলী কথিত ধর্ম সংসারে শ্রেষ্ঠ।

শরণ

অর্হৎদের শরণ গ্রহণ করি।

সিদ্ধদের শরণ গ্রহণ করি।

সাধুদের শরণ গ্রহণ করি।

কেবলী কথিত ধর্মের শরণ গ্রহণ করি।

॥ ২ ॥

ধর্ম সূত্র

১। ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। অহিংসা, সংযম ও তপ (সেই ধর্ম)। যাঁহার মন উক্ত ধর্মে সর্বদা সংলগ্ন থাকে দেবতারাও তাঁহাকে নমস্কার করেন।

২। অহিংসা, সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী মহাব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি জিন উপদিষ্ট ধর্মের আচরণ করেন।

৩। ছোট বড় কোনও প্রাণীর হিংসা না করা, অদত্ত (না দেওয়া বস্তু) গ্রহণ না করা, বিশ্বাসঘাতী অসত্য না বলা—এইগুলি আত্মনিগ্রহী সৎপুরুষের ধর্ম।

৪। জরা ও মৃত্যুর প্রবল প্রবাহে ভাসমান প্রাণীদের জন্য ধর্মই একমাত্র দ্বীপ, প্রতিষ্ঠা, গতি ও উত্তম আশ্রয়।

৫। যে পথিক পাথেয় না লইয়া দূর পথের যাত্রা করে পথিমধ্যে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে।

৬। সেইরূপ যে মানব ধর্মাচারণ না করিয়া পরলোক গমন করে সে সেখানে নানা প্রকার আধি ও ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে।

৭। যে পথিক পাথেয় লইয়া দূর পথের যাত্রা করে পথিমধ্যে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত না হইয়া অত্যন্ত সুখী হয়।

৮। সেইরূপ যে মানব ইহলোকে উত্তম ধর্মাচরণ করিয়া পরলোক গমন করে সে সেখানে কর্মক্ষয় জন্য পীড়া রহিত হইয়া অত্যন্ত সুখী হয়।

৯। মূর্খ শকট চালক যে প্রকারে জানিয়া শুনিয়া পরিষ্কার রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বিষম (উঁচু নীচু) পথে শকট লইয়া যায় ও গাড়ীর চাকা ভাঙিয়া গেলে শোক করে,

১০। সেই প্রকার মূর্খ মানবও ধর্ম পথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম পথে ধাবিত হয় ও অনন্তকাল মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া অবলম্বন হীন হইয়া শোক করে।

১১। তিন জন বণিক কিছু মূলধন লইয়া অর্থোপার্জনের জন্য গৃহ হইতে নির্গত হয়। উহাদের একজন লাভ করিল, অন্যজন মূলধন বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিল।

১২ তৃতীয় মূলধন বিনষ্ট করিয়া ফিরিয়া আসিল। ইহা একটী সাধারণ উপমা। ধর্ম সম্বন্ধেও এই উপমা প্রযোজ্য।

১৩। মানব জন্ম মূল ধন। অর্থাৎ মানবজন্ম হইতে পুনরায় মানব জন্ম লাভ করা হইল মূল ধন ফিরাইয়া আনা। দেব জন্ম লাভ—লাভ করা। আর যে নারক বা তীর্যক গতি লাভ করে সে মূলধন বিনষ্টকারীর মতই মূর্খ।

১৪। যে রাত্রি ও দিন একবার অতীত হইয়া যায় তাহা আর কখনই ফিরিয়া আসে না। যে অধর্মাচরণ (পাপ) করে তাহার দিবারাত্র নিষ্ফল ব্যতিক্রান্ত হয়।

১৫। যে রাত্রি ও দিন একবাব অতীত হইয়া যায় তাহা আর কখনই ফিরিয়া আসে না। যে ধর্মাচরণ করে তাহার দিবারাত্র সফল হয়।

১৬। যতদিন না বার্দ্ধক্য আসে, যতদিন না ব্যাধি পীড়িত করে, যতদিন না ইন্দ্রিয় অশক্ত হয়, ততদিন ধর্মের আচরণ করা উচিত। পরে কিছুই হইবার নহে।

১৭। হে রাজন্! এই মনোহর কায়িক ভোগ সুখ ছাড়িয়া আপনি যখন পরলোকে যাত্রা করিবেন তখন একমাত্র ধর্মই আপনাকে রক্ষা করিবে। হে নরদেব! ধর্ম ব্যতিরেকে আর কেহই আপনাকে রক্ষা করিবে না।

॥ ৩ ॥

অহিংসা সূত্র

১৮। ভগবান মহাবীর বলিয়াছেন অষ্টাদশ ধর্ম স্থানের মধ্যে অহিংসাই প্রথম। সর্বজীবে সংযম রক্ষা করাই অহিংসা। এই অহিংসাই সর্ব সুখদায়ক।

১৯। এই সংসারে স্থাবর বা জঙ্গম যত প্রাণী আছে, কি জ্ঞাত সারে কি অজ্ঞাত সারে, নিজে হত্যা করিবে না বা অন্যের দ্বারা করাইবে না।

২০ যে স্বয়ং জীব হিংসা করে, অন্যের দ্বারা করায় বা হিংসাকারীর অনুমোদন করে সংসারে সে নিজের প্রতি বৈরই বৃদ্ধি করে।

২১। সংসার স্থিত স্থাবর বা জঙ্গম যে কোন প্রাণীর উপর মন বচন বা কায়া দ্বারা কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিবে না।

২২। জীব মাত্রই বাঁচিতে চাহে মরিতে কেহ চাহে না। এইজন্য নির্গ্রন্থ (জৈন সাধু) প্রাণী বধ রূপ ঘোর (নিষ্ঠুরতা) সর্বথা পরিত্যাগ করেন।

২৩। ভয় ও বৈর হইতে নিবৃত্ত সাধক জীবনের প্রতি মোহ ও মমতাযুক্ত সমস্ত জীবকে সর্বত্র আত্মবৎ মনে করিয়া যেন কখনই তাহাদের হিংসা না করেন।

২৪। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু ও তৃণ, বৃক্ষ বীজ আদি বনস্পতি-কায়িক জীব অতি সূক্ষ্ম। বাহ্যতঃ একই আকার দেখা গেলেও ইহাদের সকলের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব আছে।

২৫। উপরোক্ত পাঁচ প্রকার স্থাবর কায়িক জীব ছাড়াও অন্য জঙ্গম জীব রহিয়াছে। এই ছয় প্রকার জীবকে 'ষড়জীবনিকায়' বলা হয়। সংসারে যত প্রকার জীব আছে সকলেই এই ছয় বিভাগের অন্তর্গত। এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোন প্রকার জীবনিকায় নাই।

২৬। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমস্ত প্রকারে উক্ত ছয় জীবনিকায় সম্পর্কে যেন সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত করে ও সকল জীবই দুঃখে কাতর হয় জানিয়া যেন তাহাদের কাহাকেও দুঃখ না দেয়।

২৭। জ্ঞানীর লক্ষণই এই যে তিনি কখনো কাহারো হিংসা করেন না। অহিংসা সমত্ব (সমভাব)—ইহাই এক মাত্র জানিবার।

২৮। সম্যক বোধ যে প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিংসা হইতে উৎপন্ন বৈর বর্দ্ধক মহাভয়ঙ্কর দুঃখকে জ্ঞাত হইয়া পাপ কর্ম হইতে নিজেকে যেন রক্ষা করে।

২৯। সংসারের সমস্ত প্রাণীর প্রতি—সে শত্রুই হউক বা মিত্র সমভাব রাখা ও আজীবন ছোট বা বড় সমস্ত প্রকার হিংসা পরিত্যাগ করা বাস্তবে বড় দুষ্কর।

[ক্রমশঃ

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রেষ্ঠীর মিত্র মণিভদ্রও জীবজন্তু হীন ভূমিতে উপাশ্রয়ের মত একটী কুটীর তৈরী করিয়ে দিলেন। সাধুসহ আচার্য সেইখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

সঙ্গে লোক অনেক ছিল ও অনেক দিন সেখানে বাস করতে হল বলে ওদের সঙ্গে যে পাথেয় ও তৃণাদি ছিল তা শেষ হয়ে এল। তাই ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তারা ইতর তপস্বীদের মত কন্দ মূলাদির সন্ধানে এদিকে ওদিকে বিচরণ করতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রেষ্ঠীর মিত্র মণিভদ্র সঙ্গীদের দুর্দশার কথা শ্রেষ্ঠীকে গিয়ে নিবেদন করলেন। সেই কথা শুনে শ্রেষ্ঠী তাদের দুঃখে এরূপ নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন যেমন বাতাস পড়ে গেলে সমুদ্র নিশ্চল হয়ে যায়। সেই চিন্তায় শ্রেষ্ঠী সেইভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠিকইত বলা হয় অতি দুঃখ বা সুখ নিদ্রার প্রধান কারণ।

রাত্রির শেষ যামে অশ্বশালার শুভ চিন্তক এক প্রহরী এই বলে শ্রেষ্ঠীর গুণগান করছিল:

আমাদের যিনি স্বামী তাঁর যশ চারিদিকে প্রসারিত। যদিও এখন দুঃখের সময় এসেছে তবুও তিনি তাঁর আশ্রিতদের ভালো ভাবে ভরণ-পোষণ করছেন।

সেকথা শ্রেষ্ঠী ধনের কানে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কে আমার ভর্ৎসনা করল? আমার সঙ্গে কে দুঃখী? আরে হঁ্যা। আমার সঙ্গে যে আচার্য ধর্ম ঘোষ এসেছেন। তিনি ত মাত্র সেই রকম ভিক্ষা গ্রহণ করেন যা তাঁর জন্য তৈরী হয়নি বা তৈরী করানো হয়নি। তিনি ত কন্দমূল ফলাদি স্পর্শ মাত্র করেন না। এই দুঃসময়ে না জানি তাঁর কি অবস্থা হয়েছে? যাঁকে পথের সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমি করব বলে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তাঁকে আজ পর্যন্ত আমি একবার মনেও করিনি। এখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে কি করে আমার মুখ দেখাব? তবুও আজ আমি তাঁর কাছে যাব ও তাঁর দর্শন করে নিজের পাপ প্রক্ষালিত করব। কারণ এছাড়া সমস্ত রকম বাসনা পরিত্যাগকারী সেই মহাত্মার আমি কি ভাবেই বা সেবা করতে পারি?

এভাবে বিচার করার পর দর্শনের জন্য আগ্রহী শ্রেষ্ঠীর রাত্রির চতুর্থ যামকেও দ্বিতীয় যাম বলে মনে হতে লাগল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হল। শ্রেষ্ঠী তখন নূতন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আচার্যের কুটীরে গেলেন। কুটীর পর্ণপত্রে আচ্ছাদিত ছিল। তৃণের দেওয়াল ছিল। বুনানী এরূপ ছিল যে মনে হচ্ছিল কাপড়ে সুতোর কাজ করা হয়েছে। যে ভূমির উপর সেই কুটীর নির্মিত হয়েছিল তা জীবহীন ছিল।

সেখানে তিনি ধর্মঘোষ আচার্যকে দেখলেন। দেখে তাঁর মনে হল আচার্য পাপ রূপ সমুদ্রকে প্রশমিত করেছেন, মোক্ষের তিনি মার্গ স্বরূপ, ধর্মের মণ্ডপ, তেজের আশ্রয়, কষায়রূপ গুল্মের জন্য হিমরূপ, কল্যাণ লক্ষ্মীর কণ্ঠাভরণ, সংঘের অদ্বৈত ভূষণ, মুমুক্ষু-দের নিকট কল্পবৃক্ষরূপ, তপস্যার প্রত্যক্ষ অবতার, মূর্তিমান আগম ও তীর্থ পরিচালন-কারী তীর্থংকর স্বরূপ।

আচার্যের কাছে আরো অনেক মুনি অবস্থান করছিলেন। তাঁদের কেউ ধ্যানে নিরত ছিলেন, কেউ মৌন ধারণ করেছিলেন, কেউ কায়োৎসর্গে অবস্থিত ছিলেন, কেউ আগমের অধ্যয়ন করছিলেন, কেউ পাঠ দিচ্ছিলেন, কেউ ভূমি প্রমার্জন করছিলেন, কেউ গুরুর সেবা করছিলেন, কেউ ধর্ম কথা শোনাচ্ছিলেন, কেউ শ্রুত হতে উদাহরণ দিচ্ছিলেন, কেউ অনুজ্ঞা দিচ্ছিলেন কেউ বা তত্ব বোঝাচ্ছিলেন।

শ্রেষ্ঠী প্রথমে ধর্মঘোষ আচার্যকে ও পরে অন্যান্য মুনিদের বন্দনা করলেন। আচার্য শ্রেষ্ঠীকে ধর্ম প্রাপ্ত হও বলে আশীর্বাদ দিলেন।

তারপর শ্রেষ্ঠী আচার্যের চরণ কমলে রাজহংসের মত প্রসন্নতা পূর্বক বসলেন ও বললেন, হে ভগবন্! আমি আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব বলেছিলাম কিন্তু আমার সেই বাক্য শরৎকালের মেঘাড়ম্বরের মতই মিথ্যা ও আড়ম্বর মাত্রই ছিল। কারণ সেদিন হতে আজ পর্যন্ত না আমি আপনার দর্শন করেছি, বন্দনা করেছি বা অন্ন জল ও বস্ত্রদানে সৎকার করেছি। জেগেও আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আপনার অবজ্ঞা করেছি ও নিজের বাক্য ভঙ্গ করেছি। হে ভগবন্, আমার এই প্রমাদের জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন। সর্বদা সমস্ত কিছু সহ্য করেন বলেই মহাত্মারা পৃথিবীর মত সর্বংসহ হন।

প্রত্যুত্তরে আচার্য বললেন, হে সার্থবাহ, তুমি আমাদের পথে হিংস্র পশু ও চোর ডাকাতদের হাত হতে রক্ষা করেছ। এভাবে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সম্মান দেখিয়েছ। তোমার সঙ্গের লোকেরাই আমাদের অন্ন জল দিয়েছে। তাই আমাদের কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। তাই তুমি মনে একটুও ক্ষোভ রেখো না।

শ্রেষ্ঠী বললেন, সৎ পুরুষেরা সর্বত্র গুণই দেখে থাকেন। তাই দোষী হওয়া সত্বেও আপনি আমাকে এরূপ বলছেন। কিন্তু আমি আমার প্রমাদের জন্য সত্যিই খুব

লজ্জিত। এখন আপনি প্রসন্ন হয়ে আমার ওখান হতে ভিক্ষা নেবার জন্য মুনিদের প্রেরণ করুন। আমি আপনাদের ইচ্ছানুকূল অন্ন জল দেব।

আচার্য বললেন, তুমি ত জানো আমরা সেই অন্ন জলাদি গ্রহণ করি যা আমাদের জন্য করা হয়নি বা করানো হয়নি এবং যা জীব রহিত।

আমি সেইরূপ অন্ন জলই মুনিদের দেব বলে আচার্যকে প্রণাম করে শ্রেষ্ঠী নিজের আবাস স্থানে ফিরে গেলেন।

মুনিরা তখন ভিক্ষা নেবার জন্য শ্রেষ্ঠীর আবাসে গেলেন। কিন্তু দৈব বশতঃ শ্রেষ্ঠীর আবাসে এমন কিছু পাওয়া গেল না যা মুনিরা গ্রহণ করতে পারেন। শ্রেষ্ঠী তখন এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। সহসা তাঁর চোখ তাঁর নির্মল অন্তঃকরণের মত তাজা ঘীয়ের ওপর পতিত হল।

শ্রেষ্ঠী তখন মুনিদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই ঘী কি তাঁদের কাজে লাগতে পারে?

মুনিরা পারে বলে তাঁদের ভিক্ষাপাত্র শ্রেষ্ঠীর সম্মুখে রেখে দিলেন।

আমি ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম, কৃতকৃত্য হলাম চিন্তা করতে করতে শ্রেষ্ঠীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি নিজের হাতে সেই ঘী মুনিদের পাত্রে ঢেলে দিলেন। তারপর সাশ্রুনেত্রে তাঁদের বন্দনা করলেন যেন সেই আনন্দাশ্রুতে পুণ্যরূপ অঙ্কুর অঙ্কুরিত করলেন। মুনিরাও সমস্ত কল্যাণ সিদ্ধির সিদ্ধমন্ত্র রূপ ধর্ম প্রাপ্ত হও বলে আশীর্বাদ দিয়ে নিজেদের কুটীরে ফিরে গেলেন। ধন শ্রেষ্ঠী মোক্ষরূপ বৃক্ষের দুর্লভ বোধ বা সম্যকত্বরূপ বীজ প্রাপ্ত হলেন। সন্ধ্যা বেলা শ্রেষ্ঠী পুনরায় মুনিদের নিবাস স্থানে গেলেন ও আচার্যকে বন্দনা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে যুক্ত করে তাঁর সম্মুখে উপবেশন করলেন। ধর্ম ঘোষ সূরি শ্রুত কেবলীর মত মেঘ মন্দ্র স্বরে তাঁকে বললেন:

ধর্মই উৎকৃষ্ট মঙ্গল। ধর্ম স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করে ও সংসার রূপ অটবী অতিক্রম করতে পথ দেখায়। ধর্ম মায়ের মত পোষণ করে, পিতার মত রক্ষা করে, মিত্রের মত প্রসন্ন করে, বন্ধুর মত আনন্দ দেয়, গুরুর মত উজ্জ্বল গুণে ভূষিত করে উচ্চ স্থান দেয় ও প্রভুর মত প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম সুখের প্রাসাদ, শত্রুব্যূহে কবচতুল্য, শীতোৎপন্ন জড়তা বিনষ্ট করতে আতপ ও পাপের মর্মজ্ঞাতা। ধর্মপ্রভাবে জীব রাজা হয়, বলদেব হয়, অর্দ্ধচক্রী (বাসুদেব) হয়, চক্রবর্তী হয়, দেবতা হয়, ইন্দ্র হয়, গ্রৈবেয়ক ও অনুত্তর বিমানে (স্বর্গে) অহমিন্দ্র হয় ও ধর্ম প্রভাবেই তীর্থংকর হয়। ধর্ম হতে এমন কি আছে যা পাওয়া যায় না?

দুর্গতিতে পতিত জীবকে যা ধারণ করে তার নাম ধর্ম। ধর্ম চার প্রকারের। যথা: দান, শীল, তপ ও ভাবনা।

দান তিন প্রকারের। যথা : জ্ঞানদান, অভয়দান ও ধর্মোপগ্রহ দান।

যে ধর্ম জানে না তাকে যে উপদেশ দেওয়া হয় বা জ্ঞানার্জনের সাধন দেওয়া হয় তার নাম জ্ঞানদান। জ্ঞানদানে জীব নিজের হিতাহিত জানতে পারে। হিতাহিত জেনে জীবাদি তত্ত্ব অবগত হয়ে সে বিরতি বা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানদানে জীব উজ্জ্বল কেবল জ্ঞান লাভ করে ও সমস্ত লোকের কল্যাণ সাধন করে লোকাগ্রভাগস্থিত সিদ্ধশীলায় আরূঢ় (মোক্ষপ্রাপ্ত) হয়।

অভয় দানের অর্থ কায়মনোবাক্যে জীব হত্যা না করা, না করানো এবং যদি কেউ করে তার অনুমোদন না করা।

জীব দুই প্রকার : স্থাবর ও ত্রস। তাদেরো দুটী ভেদ : পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত।

পর্যাপ্ত ছয় প্রকারের : আহার, শরীর, ইন্দ্রিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস, ভাষা ও মন।

একেন্দ্রিয় জীবের প্রথম চার পর্যাপ্তি থাকে, বিকলেন্দ্রিয় অর্থাৎ দুই হতে চার ইন্দ্রিয় পর্যন্ত জীবের প্রথম পাঁচ পর্যাপ্তি ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ছটি পর্যাপ্তি থাকে।

একেন্দ্রিয় স্থাবর জীব পাঁচ প্রকার : পৃথ্বী, অপ তেজ, বায়ু ও বনস্পতি। এদের প্রথম চারটির সূক্ষ্ম ও বাদর এই দুই ভেদ। বনস্পতি কায়ের দুই ভেদ : প্রত্যেক ও সাধারণ। সাধারণ বনস্পতির আবার দুই ভেদ : সূক্ষ্ম ও বাদর।

ত্রস জীবের চার ভেদ : দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরেন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

পঞ্চেন্দ্রিয় জীব দুই প্রকার : সঙ্গী ও অসঙ্গী।

যে মন ও প্রাণকে প্রবৃত্ত করে শিক্ষা, উপদেশ ও বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারে সে সঙ্গী, যে এর বিপরীত সে অসঙ্গ।

ইন্দ্রিয় পাঁচটি : ত্বক (স্পর্শ), রসনা (জিহ্বা), নাসিকা (ঘ্রাণ), চক্ষু ও শ্রোত্র (কান)।

ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ স্পর্শ করা, রসনার স্বাদ গ্রহণ, নাসিকার আঘ্রাণ নেওয়া, চক্ষুর দর্শন ও শ্রোত্রের শ্রবণ।

কীট, শঙ্খ, কেঁচো, জোঁক, কপার্দিকা, সুতুহী নামক জল জীব আদির বিভিন্ন ভেদ দ্বীন্দ্রিয়।

উকুন, ছারপোকা, পিঁপড়ে আদি ত্রীন্দ্রিয় জীব।

পতঙ্গ, মাছি, ভ্রমর, মশা আদি প্রাণী চতুরেন্দ্রিয়।

জলচর (মাছ, মকর আদি), স্থলচর (গো-মহিষাদি), খেচর (পায়রা, তিতির, কাক আদি) নারক (নরকে উৎপন্ন), দেব (স্বর্গে উৎপন্ন) ও মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়।

উপরোক্ত জীবদের হত্যা করা, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ দেওয়া হিংসা। হত্যা না করা অভয়দান। যে অভয়দান দেয় সে চার পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) দান দেয়। কারণ জীবিত প্রাণী চার পুরুষার্থ প্রাপ্ত করতে পারে। জীব মাত্রের

রাজ্য সাম্রাজ্য, এমন কি দেবরাজ্য অপেক্ষা নিজের জীবন অধিক প্রিয়। এজন্য কর্দমের কীট ও স্বর্গের ইন্দ্রের প্রাণনাশের ভয় সমান। সুবুদ্ধি পুরুষের তাই উচিত সর্বদা সাবধান হয়ে অভয়দানের ইচ্ছা করা। অভয় দান দিলে মানুষ পরজন্মে মনোহর দেহ, দীর্ঘ আয়ু, স্বাস্থ্য, কান্তি, শ্রী ও শক্তি লাভ করে।

ধর্মোপগ্রহদান পাঁচ প্রকারের : দায়ক (যে দান দেয়) শুদ্ধ হবে, গ্রাহক (যে দান গ্রহণ করে) শুদ্ধ হবে, দেয় (যা দান দেওয়া হয়) শুদ্ধ হবে, কাল (যে সময়ে দান দেওয়া হয়) শুদ্ধ হবে, ভাব (দান দেবার সময় মনের ভাবনা) শুদ্ধ হবে।

দানকারী সেই শুদ্ধ যার ধন ন্যায়োপার্জিত, যার বুদ্ধি উত্তম, যে কোন প্রত্যাশা নিয়ে দান দেয় না, যে জ্ঞানী (কেন দান করছে তা সে জানে) ও দেবার পর যে পশ্চাত্তাপ করে না। যে মনে করে এরূপ চিত্ত (যাতে দান দেবার ইচ্ছা হয়েছে) এরূপ বিত্ত (ন্যায়োপার্জিত ধন) ও এরূপ পাত্র (শুদ্ধ দান গ্রহণ কারী) আমি পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।

দান গ্রহণকারী সেই শুদ্ধ যে পাপ রহিত, তিন গৌরব (স্বাদ ললুপতা, ঐশ্বর্য ললুপতা ও সুখ ললুপতা) রহিত, তিন গুপ্তিধারী (কায় মন ও বাক্য যার সংযমিত) ও পাঁচ সমিতি পালনকারী (যে চলা ফেরার সময়, বলবার সময়, আহার নেবার সময়, কোন জিনিষ তুলবার বা রাখবার সময় ও শৌচাদি করবার সময় সাবধানতা রক্ষা করে যাতে জীব হত্যা না হয়)। সে রাগদ্বেষ হীন হয়, নগর গ্রাম স্থান উপকরণ ও শরীরে মমত্বহীন হয়, আঠারো হাজার শীলাঙ্গ ধারণকারী ও রত্ন ত্রয়ের (সম্যকজ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র) অধিকারী হয়। সে ধীর হয়, লোহা ও সোনায় সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, ধর্ম ও শুক্লধ্যানে নিরত থাকে, জিতেন্দ্রিয় ও কুক্ষি সম্বল (আবশ্যকতানুসারে ভোজনকারী) হয়। সে সর্বদা ছোট বড় তপস্যানিরত থাকে, সতেরো রকম সংযম অখণ্ডরূপে পালন করে, আঠারো রকম ব্রহ্মচর্য ব্রতী হয়। এরূপ শুদ্ধ দান গ্রহণ কারীকে যে দান দেওয়া হয় তাকে 'গ্রাহক শুদ্ধদান' বা 'পাত্র দান' বলা হয়।

দেয় শুদ্ধ বিয়াল্লিশ প্রকার : দোষ রহিত অশন (ভোজন, লুচি, মিঠাই আদি), পান (জল, দুধ, রস আদি), খাদিম (ফল, বাদাম, কিসমিস আদি), স্বাদিম (লবঙ্গ, এলাচ আদি), বস্ত্র ও সংথারা (শোবার মত কম্বল)। এরূপ দানকে শুদ্ধদান বলা হয়।

যোগ্য সময়ে পাত্রকে দান দেওয়া 'পাত্রশুদ্ধদান' ও কামনা রহিত হয়ে দান দেওয়াকে 'ভাবশুদ্ধদান' বলা হয়।

শরীর ছাড়া ধর্মের আরাধনা হয় না ও অন্নাদি ছাড়া দেহ ধারণ করা সম্ভব নয়। এজন্য ধর্মোপগ্রহ (যাতে ধর্ম সাধনায় সহায়তা হয়) দান দেওয়া উচিত। যে

ব্যক্তি অশনপানাদি ধর্মোপগ্রহদান সুপাত্রকে দেয় সে তীর্থকে স্থির থাকতে সাহায্য করে ও পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

যে প্রবৃত্তিবশে প্রাণী হত্যা হয় সেরূপ প্রবৃত্তি না করাকে শীল বলে। শীলের দুই ভেদ : দেশ বিরতি ও সর্ব বিরতি।

দেশ বিরতি বারো প্রকার : পাঁচ অণুব্রত, তিন গুণব্রত, চার শিক্ষাব্রত।

স্থূল অহিংসা, স্থুল সত্য, স্থূল অস্তেয় (অচৌর্য), স্থূল ব্রহ্মচর্য ও স্থূল অপরিগ্রহ এই পাঁচ অণুব্রত।

দিক্‌বিরতি, ভোগোপভোগ বিরতি ও অনর্থদণ্ড বিরতি তিন গুণব্রত।

সামায়িক, দেশাবকাশিক, পোষধ ও অতিথি সংবিভাগ চার শিক্ষাব্রত।

এই ধরণের দেশবিরতিগুণযুক্ত শুশ্রূষু (যার ধর্ম শুনবার ইচ্ছা রয়েছে), যতি (সাধু), ধর্মের অনুরাগী, ধর্মপথ্য ভোজী (এরূপ ভোজনকারী যাতে ধর্মাচরণ করা সম্ভব হয়), শম (নির্বিকার শান্তি), সংবেগ (বৈরাগ্য), নির্বেদ (নিস্পৃহতা), অনুকম্পা (দয়া) ও আস্তিক্য (শ্রদ্ধা) বুদ্ধি সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি, অজ্ঞান ও সর্বপ্রকার ক্রোধ রহিত গৃহস্থ চারিত্র মোহনীয় কর্মনাশে সক্ষম হয়।

স্থাবর ও ত্রস জীবের হিংসা হতে সর্বথা দূরে থাকাকে সর্ববিরতি বলা হয়। এই সর্ববিরতি রূপ শীল সিদ্ধশিলারূপ প্রাসাদে আরোহণের সোপান। যে স্বভাবতঃ অল্প কষায়ী, সাংসারিক সুখে বিরক্ত ও বিনয়াদি গুণে ভূষিত সে এই সর্ববিরতিরূপ শীললাভ করে।

যা কর্মকে তাপিত বা বিনষ্ট করে তাকে তপ বলা হয়। তপের দুই ভেদ : বাহ্য ও আভ্যন্তর। অনশনাদি বাহ্য তপ, প্রায়শ্চিত্তাদি আভ্যন্তর।

বাহ্য তপের ছয় ভেদ : অনশন (উপবাস, একাহার, আয়ম্বিল আদি), ঊনোদরী (কম খাওয়া), বৃত্তি সংক্ষেপ (প্রয়োজন কম করা), রসত্যাগ (ছটি রসের প্রতিদিন কোনো একটীর পরিত্যাগ), কায়ক্লেশ (কেশোৎপাটন আদি শারীরিক দুঃখ), সংলীনতা (ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করা)।

আভ্যন্তর তপও ছয় প্রকার : প্রায়শ্চিত্ত (কৃত অতিচার বা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য আলোচনা ও তার জন্য আবশ্যক তপ), বৈয়াবৃত্ত (ত্যাগব্রতী ও ধর্মাত্মার সেবা), স্বাধ্যায় (ধর্মশাস্ত্রের পঠন শ্রবণ মনন), বিনয় (নম্রতা), কায়োৎসর্গ (শারীরিক সমস্ত কর্মের পরিত্যাগ ও শুভধ্যান (ধর্ম ও শুক্লধ্যানে চিত্ত নিয়োগ)।

জ্ঞান দর্শন ও চারিত্ররূপ রত্ন ধারণ কারীর ভক্তি করা, তাঁর কাজ করা, শুভ বিচার ও সংসারের অসারত্ব চিন্তা ভাবনা।

এই চতুর্বিধ (দান, শীল, তপ ও ভাবনারূপ) ধর্ম মোক্ষফল প্রাপ্তির সাধন। এজন্য সংসার ভ্রমণ ভয়ে ভীত ব্যক্তির সাবধান হয়ে এর সাধনা করা উচিত।

ধর্মোপদেশ শুনে ধন শ্রেষ্ঠী বললেন—এরূপ ধর্ম কথা আমি কখনো শুনিনি তাই এতদিন আমি আমার কর্মের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছি। তারপর তিনি উঠে আচার্য ও অন্য মুনিদের বন্দনা করে নিজেকে ধন্য ভাবতে ভাবতে আবাস স্থানে ফিরে গেলেন। ধর্মশ্রবণের আনন্দে শ্রেষ্ঠীর সেই রাত্রি এক মুহূর্তের মত ব্যতীত হল।

সকালে তিনি যখন গাত্রোত্থান করলেন তখন ভাটের শংখের মত উদাত্ত ও মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন :

ঘনান্ধকারে মলিন পদ্মিনীর শোভা অপহরণকারী ও মনুষ্য ব্যবহার নিরুদ্ধকারী রাত্রি বর্ষাঋতুর মত ব্যতীত হয়েছে। তেজস্বী ও প্রচণ্ড রশ্মিরথী সূর্য উদিত হয়েছে। কাজকর্মের সুহৃদ প্রভাতকাল শরদ ঋতুর মতই উপস্থিত। তত্ত্ববোধে বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয় যেমন নির্মল হয় সেরূপ শরতের আবির্ভাবে সরোবর ও সরিতার জল নির্মল হয়েছে। আচার্যের উপদেশে গ্রন্থ যেমন সংশয় রহিত ও সরল হয়ে যায় সূর্যকিরণে শুষ্ক ও কর্দমরহিত পথ সেইরূপ সরল হয়ে গেছে। পথের মাঝখান দিয়ে যেমন গাড়ীর সমূহ চলে নদীও সেইরূপ তটের মধ্যবর্তী হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। পথের দুধারের শষ্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শ্যামক, নীবার, বালুঙ্ক, কুবলয় আদি শষ্য ও ফল ভারে পথ যেন পথিকদের অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হয়েছে। শরৎকালের বাতাসে আন্দোলিত ইক্ষুবৃক্ষের শব্দ যেন ডাক দিয়ে বলছে, হে পথিকগণ, তোমরা আপন আপন যান বা বাহনে আরোহণ কর। পথ চলবার সময় হয়েছে। মেঘ এখন সূর্য কিরণে তপ্ত পথিকদের জন্য ছাতার কাজ করছে। সার্থের বৃষরা নিজেদের কুন্ড দিয়ে ভূমি সমতল করছে যাতে পথ চলতে পথিকদের কোন কষ্ট না হয়। পূর্বে পথের ওপর জল বেগে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হচ্ছিল এখন বর্ষা ঋতুর মেঘের মত তা অদৃশ্য হয়েছে। ফলাবভারনত লতা ও পদে পদে প্রবাহিত নির্মল জলের ঝরণায় বিনা পরিশ্রমে পথিকদের জন্য পথ পাথেয় পূর্ণ হয়েছে। উৎসাহী ও উদ্যমী ব্যক্তিরা রাজহংসের মত দূর দেশে যাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

শ্রেষ্ঠী ভাটের মুখের এই মঙ্গলপাঠ শুনে বুঝতে পারলেন যে সে তাঁকে যাত্রার সময় হয়েছে এই সূচনা দিচ্ছে। তিনি তখন যাত্রার ভেরী নিনাদ করবার আদেশ দিলেন। সেই ভেরীনাদে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ লোক আপূরিত হল। গোপের শৃঙ্গধ্বনি শুনে যেমন গাভী সমূহ চলতে আরম্ভ করে, সেই সার্থও সেই রকম সেই ভেরী ধ্বনি শুনে চলতে আরম্ভ করল।

যেমন কিরণ জালে আবেষ্টিত হয়ে সূর্য চলে তেমনি ভব্য জীবরূপী কমলকে বোধ দিতে প্রবীণ ধর্মঘোষ আচার্য মুনিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে চলতে লাগলেন। সার্থের রক্ষার জন্য সামনে পেছনে দক্ষিণে ও বামে রক্ষী নিযুক্ত করে শ্রেষ্ঠীও চলতে

আরম্ভ করলেন। সার্থ যখন সেই মহারণ্য অতিক্রম করে এল তখন আচার্য শ্রেষ্ঠীর অনুমতি নিয়ে অন্যদিকে প্রব্রজন করলেন।

নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে গমন করে তেমনি ধন শ্রেষ্ঠীও সকুশল সমস্ত পথ অতিক্রম করে বসন্তপুর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে আনীত পণ্য বিক্রয় করলেন ও নূতন পণ্য ক্রয় করলেন। তারপর মেঘ যেমন সমুদ্র হতে জলপূর্ণ হয় সেই রকম ধনশ্রেষ্ঠীও ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠিত পুরে ফিরে এলেন। এর কয়েক বছর পর আয়ু শেষ হলে তাঁর মৃত্যু হল।

[ক্রমশঃ

কল্যাণ মন্দির স্তোত্র

আচার্য কুমুদচন্দ্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্যামং গভীর-গিরমুজ্জ্বল-হেম-রত্ন-
সিংহাসনস্থমিহ ভব্য-শিখণ্ডিনস্ত্বাম্ ।
আলোকয়ন্তি রভসেন নদন্তমুচ্চৈঃ
চামীকরাদ্রি শিরসীব নবাম্বুবাহম্ ॥ ২৩

হে দেব, তোমার বর্ণ শ্যাম ও বাণী গম্ভীর। নির্মল স্বর্ণ ও রত্ন জড়িত সিংহাসনে তুমি বসে রয়েছ। তাই ভব্য জীব তোমার দিকে সমুৎসুক হয়ে সেইভাবে চেয়ে রয়েছে যেভাবে বনময়ূর মেরু শিখরে আরূঢ় জলদমন্দ্রকারী নবোদিত মেঘমালার দিকে চেয়ে থাকে।

উদ্গচ্ছতা তব শিতি-দ্যুতি-মণ্ডলেন
লুপ্ত-চ্ছদ-চ্ছবিরশোক-তরুর্বভূব ।
সান্নিধ্যতোঽপি যদি বা তব বীতরাগ
নীরাগতাং ব্রজতি কো ন সচেতনোঽপি ॥ ২৪

হে বীতরাগ! তোমার ভামণ্ডল নিঃসৃত উজ্জ্বল দ্যুতিতে অশোক বৃক্ষের কিশলয় রাগ লুপ্ত হয়ে গেছে। তা ঠিকই কারণ বীতরাগীর সামীপ্যে সচেতন প্রাণী মাত্রই যে রাগ রহিত হয়ে যায়।

ভো ভোঃ প্রমাদমবধূয় ভজধ্বমেন-
মাগত্য নির্বৃতি-পুরীং প্রতি সার্থবাহম্ ।
এতন্নিবেদয়তি দেব জগৎত্রয়ায়
মন্যে নদন্নভিনভঃ সুরদুন্দুভিস্তে ॥ ২৫

হে দেব, আকাশে যে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হচ্ছে তা যেন ত্রিলোকবাসীকে ডাক দিয়ে বলছে, হে ভব্য জীব, সমস্ত প্রমাদ পরিত্যাগ করে তোমরা এই সার্থবাহের শরণ নাও। ইনি সকলকে মোক্ষপুরে নিয়ে যেতে সমর্থ।

উদ্দ্যোতিতেষু ভবতা ভুবনেষু নাথ
তারান্বিতো বিধুরয়ং বিহতাধিকারঃ ।
মুক্তাকলাপ-কলিতোরুসিতাতপত্র
ব্যাজাৎত্রিধা ধৃত-তনুর্ধ্রুবমভ্যুপেতঃ ॥ ২৬

হে নাথ, তুমি ত্রিলোককে প্রকাশিত করেছ। তাই বেচারা চাঁদ অধিকারচ্যুত হয়ে তারকা সহিত তিন শরীর ধারণ করে তোমার সুন্দর শ্বেতছত্ররূপে শোভিত হচ্ছে। [অর্থাৎ তোমার মাথার ওপর চাঁদের মত সুন্দর তিনটী ছত্র রয়েছে। সেই ছত্র হতে যে মুক্তোমালা ঝুলছে তা তারকার সমূহ বলে মনে হচ্ছে।]

স্বেন প্রপূরিত-জগৎত্রয়-পিণ্ডিতেন
কান্তি-প্রতাপ-যশসামিব সংচয়েন।
মাণিক্য-হেম রজত-প্রবিনির্মিতেন
সালত্রয়েণ ভগবন্নভিতো বিভাসি॥ ২৭

হে ভগবন্, তোমার চারদিকে তিনটি প্রাকার রয়েছে যা মাণিক্য, সুবর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত। তা দেখে মনে হচ্ছে এ তিনটি যেন ত্রিলোকব্যাপী তোমার কান্তি, প্রতাপ ও যশের সমূহ। [তীর্থংকরের উপদেশ সভার জন্য ইন্দ্র যে সমবসরণ রচনা করেন তার মাণিক্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত তিনটী প্রাকার থাকে।]

দিব্য-স্রজো জিন নমৎত্রিদশাধিপানা
মুৎসৃজ্য রত্ন-রচিতানপি মৌলি-বন্ধান্।
পাদৌ শ্রয়ন্তি ভবতো যদি বাপরত্র
ত্বৎসঙ্গমে সুমনসো ন রমন্ত এব॥ ২৮

হে জিনেশ, তোমাকে নমস্কার করার সময় ইন্দ্রের রত্ন জড়িত মুকুট পরিত্যাগ করে দিব্য সুমন [পুষ্পমালা] তোমার চরণে আশ্রয় নেয়। তা ঠিকই কারণ তোমার সমাগম হলে সুমন বা সজ্জনগণ অন্যত্র যাবার ইচ্ছা করেন না।

ত্বং নাথ জন্ম-জলধের্বিপরাঙ্‌মুখোঽপি
যত্তারয়স্যসুমতো নিজ-পৃষ্ঠ-লগ্নান্।
যুক্তং হি পার্থিব-নিপস্য সতস্তবৈব
চিত্রং বিভো যদসি কর্ম-বিপাক-শূন্যঃ॥ ২৯

হে নাথ, সংসাররূপ সমুদ্র হতে বিমুখ হয়েও তুমি তোমার যে পৃষ্ঠলগ্ন তাকে পারে নিয়ে যাও তা মৃন্ময় কলসের মত উচিতই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তুমি কর্ম বিপাকশূন্য [আর কলস কর্ম বিপাক উৎপন্ন। অর্থাৎ কলস আগুনে পোড়ালেই পারে নিতে সমর্থ হয় কিন্তু তুমি কর্ম বিপাক রহিত হয়েও পারে নিয়ে যাও।]

বিশ্বেশ্বরোঽপি জন-পালক দুর্গতস্ত্বং
কিং বাক্ষর-প্রকৃতিরপ্যলিপিস্ত্বমীশ।
অজ্ঞানবত্যপি সদৈব কথঞ্চিদেব
জ্ঞানং ত্বয়ি স্ফুরতি বিশ্ব-বিকাস-হেতু॥ ৩০

হে জীবপালক, তুমি বিশ্বেশ্বর হয়েও দুর্গত, অক্ষর স্বভাব হয়েও লিপি রহিত,

বিশ্ব প্রকাশক জ্ঞান তোমাতে সদা স্ফুরিত হলেও অজ্ঞান। [এই পদে বিরোধাভাস নামক অলংকারের প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে যে কথা বলা হয়েছে তা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু শব্দের শ্লেষে সেই বিরোধ নষ্ট হয়ে যায়। এই পদটীর অর্থ এরূপ—তুমি বিশ্বের ঈশ্বর তাই দুর্গমতায় তোমায় জানা যায় অর্থাৎ তোমাকে জানা খুব সহজ নয়। তুমি অক্ষর বা অবিনশ্বর স্বভাব হয়েও লিপি রহিত অর্থাৎ নিরাকার। অজ্ঞানীর রক্ষক হলেও তোমার মধ্যে জ্ঞান নিত্য বর্তমান।]

প্রাগ্‌ভার-সম্ভৃত-নভাংসি রজাংসি রোষাদ
উত্থাপিতানি কমঠেন শঠেন যানি।
ছায়াঽপি তৈস্তব ন নাথ হতা হতাশো
গ্রস্তস্ত্বমীভিরয়মেব পরং দুরাত্মা ॥ ৩১

হে নাথ, দুষ্ট কমঠ ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার ওপর ধূলো বৃষ্টি করেছিল যাতে সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা তোমার ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। বরং সেই ধূলি জালে সেই দুরাত্মাই গ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যদ্‌গর্জদূর্জিত-ঘনৌঘমদভ্র-ভীম-
ভ্রশ্যত্তডিন্মুসল-মাংসল ঘোর ধারম্।
দৈত্যেন মুক্তমথ দুস্তর-বারি দধ্রে
তেনৈব তস্য জিন দুস্তর-বারি কৃত্যম্ ॥ ৩২

হে জিনেশ! তারপর সেই দৈত্য কমঠ ভীষণ গর্জন করতে করতে বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করল ও মুসলধারে বারিবর্ষণ করে ধরণী প্লাবিত করে দিল। তুমি সেই বর্ষা ও বিদ্যুৎ সহন করলে কিন্তু সেই বর্ষা ও বিদ্যুৎই তার নিকট তীক্ষ্ণ তরবারির মত হয়ে গেল।

ধ্বস্তোর্দ্ধ্ব-কেশ-বিকৃতাকৃতি-মর্ত্য-মুণ্ড-
প্রালম্বভৃদ্‌ভয়দবক্ত্র-বিনির্যদগ্নিঃ।
প্রেতব্রজঃ প্রতি ভবন্তমপীরিতো যঃ
সোঽস্যাভবৎপ্রতিভবং ভব-দুঃখ-হেতুঃ ॥ ৩৩

সেই কমঠ তোমার কাছে প্রেতের দল পাঠাল যাদের চুল [কাঁটার মত] খাড়া, ভয়ঙ্কর যাদের আকৃতি, যাদের গলায় মুণ্ডমালা ও যাদের মুখ হতে অগ্নি নির্গত হচ্ছিল। কিন্তু সেই পিশাচেরা জন্ম জন্মান্তরে সেই অসুরেরই সাংসারিক দুঃখের কারণ হল।

ধন্যাস্ত এব ভুবনাধিপ যে ত্রিসন্ধ্য-
মারাধয়ন্তি বিধিবদ্বিধুতান্য-কৃত্যাঃ।

ভক্ত্যোল্লসৎপুলক-পক্ষ্মল-দেহ-দেশাঃ
পাদ-দ্বয়ং তব বিভো ভুবি জন্মভাজঃ ॥ ৩৪

হে লোকনাথ, যে প্রাণী ত্রিসন্ধ্যায় অন্য সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে ভক্তি ভাবে রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে বিধিপূর্বক তোমার চরণ যুগলের আরাধনা করে সেই পৃথিবীতে ধন্য।

অস্মিন্নপার-ভব-বারিনিধৌ মুনীশ
মন্যে ন মে শ্রবণ-গোচরতাং গতোঽসি।
আকর্ণিতে তু তব গোত্র-পবিত্র-মন্ত্রে
কিং বা বিপদ্বিষধরী—সবিধং সমেতি ॥ ৩৫

হে মুনীশ, আমার মনে হচ্ছে যে এই অপার সংসার সমুদ্রে আমার কান তোমার নাম পর্যন্ত শোনেনি। কারণ তোমার নামরূপ মন্ত্র যে শোনে তার কাছে বিপত্তিরূপ নাগিনী কি কখনো যায় ?

জন্মান্তরেঽপি তব পাদ-যুগং ন দেব
মন্যে ময়া মহিতমীহিত-দান-দক্ষম্।
তেনেহ জন্মনি মুনীশ পরাভবানাং
জাতো নিকেতনমহং মথিতাশয়ানাম্ ॥ ৩৬

হে দেব, আমার মনে হচ্ছে পূর্ব পূর্ব জন্মেও আমি তোমার অভিষ্টদানকারী চরণযুগলের পূজা করিনি। তাই মুনিবর ইহজন্মে আমি হৃদয়কে মথনকারী তিরস্কারের পাত্র হয়েছি।

নূনং ন মোহ-তিমিরাবৃত-লোচনেন
পূর্বং বিভো সকৃদপি প্রবিলোকিতোঽসি।
মর্মাবিধো বিধুরয়ন্তি হি মামনর্থাঃ
প্রোদ্যৎপ্রবন্ধ-গতয়ঃ কথমন্যথৈতে ॥ ৩৭

হে প্রভো, একথা নিশ্চিত যে মোহরূপ অন্ধকারে আবৃত থাকার জন্য আমার চোখ এর আগে একবারও তোমাকে দেখেনি। তা নইলে মর্মভেদী ও অতিশয় বলবান অনর্থ আমায় কেন পীড়া দেবে ?

আকর্ণিতোঽপি মহিতোঽপি নিরীক্ষিতোঽপি
নূনং ন চেতসি ময়া বিধৃতোঽসি ভক্ত্যা।
জাতোঽস্মি তেন জন-বান্ধব দুঃখপাত্রং
যস্মাৎক্রিয়াঃ প্রতিফলন্তি ন ভাব-শূন্যাঃ ॥ ৩৮

হে জনবান্ধব, [এও হতে পারে] যে আমি তোমার নাম শুনেও, পূজা করেও তোমাকে দেখেও ভক্তিপূর্বক হৃদয়ে ধারণ করিনি। তাই দুঃখ পাত্র হয়েছি। কারণ ভাবহীন ক্রিয়া ফলদায়ক হয় না।

ত্বং নাথ দুঃখি-জন-বৎসল হে শরণ্য
কারুণ্য-পুণ্য-বসতে বশিনাং বরেণ্য।
ভক্ত্যা নতে ময়ি মহেশ দয়াং বিহায়
দুঃখাঙ্কুরোদ্দলন-তৎপরতাং বিধেহি ॥ ৩৯

হে নাথ, হে আর্তজন বৎসল, হে অশরণ শরণ, হে দয়ার পবিত্র মন্দির, হে জিতেন্দ্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হে মহেশ, ভক্তাবনত আমার ওপর দয়া করে দুঃখোৎপত্তির কারণনাশে তৎপর হও।

নিঃসংখ্য-সার-শরণং শরণং শরণ্য-
মাসাদ্য সাদিত-রিপু-প্রথিতাবদাতম্।
ত্বৎপাদ-পঙ্কজমপি প্রণিধান-বন্ধ্যো
বন্ধ্যোঽস্মি তদ্ভুবন-পাবন হা হতোঽস্মি ॥ ৪০

হে ত্রিলোক পবিত্রকারী, হে সখা, তুমি আদিরহিত, মানবের সারভূত আশ্রয়, শরণাগত রক্ষক, কর্ম রূপ শত্রুবিনষ্টকারী তাই প্রসিদ্ধ মহিমাসম্পন্ন। তোমার চরণ কমল প্রাপ্ত হয়েও ধ্যান না করার জন্য আমি অভাগাই রয়ে গেলাম। হা হুতাশ করাই এখন সার।

দেবেন্দ্র-বন্দ্য বিদিতাখিল-বস্তুসার
সংসার-তারক বিভো ভুবনাধিনাথ।
ত্রায়স্ব দেব করুণাহ্রদ মাং পুনীহি
সীদন্তমদ্য ভয়দ-ব্যসনাম্বুরাশেঃ ॥ ৪১

হে দেবেন্দ্র বন্দ্য, হে সমস্ত পদার্থের সারজ্ঞাতা, হে সংসার উদ্ধারকারী, হে ত্রিলোকনাথ, হে দেব, হে দয়ালু, আজ আমার মত পীড়িতকে ভয়ঙ্কর দুঃখ সমুদ্র হতে বাঁচাও ও পবিত্র কর।

যদ্যস্তি নাথ! ভবদঙ্ঘ্রি-সরোরুহাণাং
ভক্তেঃ ফলং কিমপি সন্তত-সঞ্চিতায়াঃ
তন্মে ত্বদেক শরণস্য শরণ্য ভূয়াঃ
স্বামী ত্বমেব-ভুবনেঽত্র ভবান্তরেঽপি ॥৪২

হে নাথ, হে শরেণ্য, যদি তোমার চরণকমলে চিরকাল হতে সঞ্চিত ভক্তির কিছু মাত্র ফল থাকে তবে তুমিই যেন আমার একমাত্র শরেণ্য হও। ইহলোকে বা পরলোকে তুমিই আমার একমাত্র স্বামী।

ইত্থং সমাহিত-ধিয়ো বিধিবজ্জিনেন্দ্র
সান্দ্রোল্লসৎপুলক-কঞ্চুকিতাঙ্গ-ভাগাঃ ।
ত্বদ্বিম্ব-নির্মল মুখাম্বুজ-বদ্ধলক্ষ্যা
যে সংস্তবং তব বিভো রচয়ন্তি ভব্যাঃ ॥৪৩

হে জিনেন্দ্র, এভাবে যে ভব্য জীব ধী সমাহিত করে উল্লাস প্রকটিত রোমাঞ্চ পুলকিত শরীর হয়ে তোমার মুখ কমলে দৃষ্টি রেখে বিধি পূর্বক তোমার স্তব করে—

জন-নয়ন-'কুমুদচন্দ্র'-প্রভাস্বরাঃ স্বর্গ-সম্পদো ভুক্ত্বা
তে বিগলিত-মল-নিচয়া অচিরান্মোক্ষং প্রপদ্যন্তে ॥৪৪

সে, হে কুমুদ চন্দ্র, (মানুষের নেত্র রূপ শ্বেত কমলকে বিকসিত করতে যে চন্দ্রমা তুল্য), স্বর্গের উৎকৃষ্ট সম্পদ ভোগ করেও শেষে কর্ম মল বিনষ্ট করে শীঘ্রই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

চতুর্বিংশতি জিন স্তবন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য বিরচিত চব্বিশ জন তীর্থংকরের স্তুতির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় শ্রমণ অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায়। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে ছন্দে আবদ্ধ করেছেন বন্ধুবর কবি শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। সেগুলি এখানে প্রকাশিত করা হল।
—সম্পাদক]

সেই সে অর্হৎদের আমি মানি, আমি করি সদা ধ্যান,
মোক্ষলক্ষ্মী নিবাস স্বরূপ যাঁহারা দীপ্তিমান।
স্বর্গমর্তপাতাল লোকের তাঁরা হন ঈশ্বর,
সে-অর্হৎদের যে মানে পায় যে চিরবাঞ্ছিত বর ॥

আমি উপাসনা করি তাহাদের, সেই সে অর্হৎজন
যারা পবিত্র করেই চলেছে নিখিল বিশ্বভুবন।
সর্বকালের ভূত-ভবিষ্য এবং বর্তমান
নাম ও স্থাপনা, দ্রব্য ও ভাবে যারা করে ফলবান ॥

সেই সে ঋষভদেবের আমি যে সর্বদা করি স্তব—
যিনি পৃথিবীর পতিদের মাঝে প্রথম এবং সব।
তীর্থংকর তাঁরেই তো মানি, পরম প্রধান তিনি,
বিশ্বে সকল ত্যাগব্রতীদের মধ্যে প্রথম যিনি ॥

সেই সে অর্হৎ পরম পূজ্য—যেজন অজিতনাথ,
বিশ্বকমল সরোবরে যাঁর প্রভাই সুপ্রভাত।
যিনি নির্মল কেবল জ্ঞানের মেলে দেন দর্পণ,
প্রতিবিম্বিত যেখানে সতত চরাচর ত্রিভুবন ॥

সম্ভবনাথ মুখনিঃসৃত জলধারারূপ বাণী—
যশস্বী হয়ে ছড়াক বিশ্বে স্নিগ্ধ অমৃতখানি।

ভব্য এ জীব উদ্যানে প্রাণ ছড়াক জগৎপতি
শ্রীসম্ভবনাথ যেন থাকে সিঞ্চনে সদা ব্রতী।

সে-অনেকান্ত রূপ সমুদ্রে যে আনেন উল্লাস,
চন্দ্রতুল্য যেজন স্বয়ং চন্দ্রকান্ত বাস,
সেই ভগবান অভিনন্দন আনন্দদায়ী হোন
আনন্দরূপে ভরাক ধরার হৃদয় এবং মন ॥

দেবতাগণের মুকুটমণির প্রভায় দীপ্ত যাঁর
চরণখর, সেই ভগবানে জানাই নমস্কার।
মনের বাসনা মিটাতে ধরেন বর.ভয় যাঁর হাত,
আশা তোমাদের পূর্ণ করুন সেই সে সুমতিনাথ ॥

কামক্রোধাদি সে-রিপুগণ প্রতি যিনি সদা বিদ্রোহী
কোপপ্রবলতা শরীরে যাঁহার জাগে সদা রহি রহি,
অরুণবর্ণ ধারণ করেছে যাঁর পবিত্র দেহ,
পদ্মপ্রভ সে জীবকল্যাণে রাখুন তাঁহার স্নেহ ॥

চতুর্বিধ সংঘ আকাশে যিনি দেদীপ্যমান,
ভাস্বর সেই সূর্যের তেজে তিনি যে বিত্তবান।
ইন্দ্র যাঁহার চরণপূজায় মতি রাখে অনিবার,
সেই সুপার্শ্বনাথের চরণে জানাই নমস্কার ॥

জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল যিনি রূপে যে চন্দ্রপ্রভা,
মূর্তিমন্ত শুক্রবারের মূর্তিমতী যে শোভা—
সেই মূর্তিই কল্যাণ হয়ে ঘুচাক দুঃসময়,
তোমাদের জ্ঞানলাভের মুখ্য কারণ সে যেন হয় ॥

সেই করামলকবৎ জ্ঞানে যে ধরণীকে দেখে থাকে,
কেবল-জ্ঞানের প্রভাবে নিজেকে সদা সচেতন রাখে,
অচিন্তনীয় প্রভাব-আধারে যে করেন স্বাদ শোধ,
সেই সে সুবিধিনাথই তোমাদের প্রদান করুন বোধ ॥

অমৃততুল্য বর্ষণে যিনি সিক্ত করেন ধরা,
যাঁর আনন্দ-অঙ্কুরে ঘোচে প্রাণীমাত্রেরই জরা,
সুশীতল তাঁর সিঞ্চনে থাক স্নেহের দৃষ্টিপাত,
বিশাল বিশ্ব শীতল করুন সেই সে শীতলনাথ ॥

রোগের যাতনা ভুগতেই লোক সংসারে নেয় ঠাঁই
তাদেরও দেখেন বৈদ্যের মতো একজন জানি তাই।
নিঃশ্রেয়রূপে মোক্ষলক্ষ্মীপতি বলে যার স্থান,
সেই শ্রেয়াংসনাথ যেন করে তোমাদের কল্যাণ ॥

যিনি সমস্ত বিশ্বের এক কল্যাণকরী নাম,
তীর্থংকর সুমহান তিনি, নামেও সিদ্ধকাম।
সুরাসুরনর বন্দিত তিনি, অপার মহিমা তাঁর,
সে বাসুপূজ্য এই বসুধার লউন রক্ষাভার ॥

জগৎজনের চিত্তই যদি বারির তুল্য হয়,
সে-নির্মাল্যচূর্ণ তবেই আবিলতা করে ক্ষয়।
যিনি নির্মল করেন, জাগুন সেই সে বিমলনাথ,
বিমল বাণীই তাঁহার ঘটাক নির্মল বারিপাত ॥

যার করুণার বারি সমুদ্রজলের শক্তি ধরে,
স্বয়ম্ভূরমণনামক সমুদ্রটিকে স্পর্দ্ধা করে,
সেই অনন্তনাথই যেন হন দানেতে পূজ্য ভূপ,
প্রদান করুন লক্ষ্মীকে—যিনি ধরেন মোক্ষরূপ ॥

বন্দনা করি সে-স্বামীরে যিনি স্বয়ং ধর্মনাথ,
কল্পতরুর মতন যাঁহার দানশীল দুটি হাত।
যিনি দেন তপ-শীল-ভাবরূপ ধর্মের উপদেশ,
ধর্মনাথের ধর্মকে পেলে থাকে না কিছুতে ক্লেশ ॥

যাঁর বাণীরূপ চন্দ্রিকা সব দিক নির্মল করে,
মৃগলাঞ্ছন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে হরে,

শান্তি আনুক তোমাদের লাগি সেই সে শান্তিনাথ,
তাঁর করুণায় বিদূরিত হোক অন্ধ তামস রাত ॥

যিনি অতিশয় ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, শীর্ষে যাঁহার স্থান
সুরাসুরনর-ইন্দ্রের কাছে একক যিনি প্রধান,
সেই শ্রী কুন্থুনাথের কৃপাই যেন সহায়ক হয়
কল্যাণরূপা লক্ষ্মীপ্রদানে যাঁর হাতে বরাভয় ॥

কালচক্রের চতুর্থ অর-রূপ সে অকাশে যার
মার্তণ্ডের দিগ্‌মণ্ডল করে থাকে বিস্তার,
ভগবান সেই অরনাথ যেন লক্ষ্মী পাঠান ঘরে—
যে লক্ষ্মী বিলান শেষ পুরুষার্থ মোক্ষ সবার তরে ॥

নবীন মেঘের সঞ্চার আনে হর্ষ ময়ূরপ্রাণে,
সুরাসুরনরপালও তারে দেখে হর্ষ মনেতে মানে।
মত্ত হস্তীসম যে কর্মঅটবীরে করে কাত,
আমার স্তবেতে প্রসন্ন হোন সেই শ্রী মল্লীনাথ ॥

মোহনিদ্রায় প্রসুপ্ত থাকে জগতের যত প্রাণী,
প্রভাত জানায় তাদের মধ্যে একেরই সত্যবাণী।
মুনিসুব্রত স্বামীর তাই যে করে যাই আমি স্তব,
বাণী তাঁর যেন সার্থক করে জাগার মহোৎসব ॥

প্রণামের কালে যাঁহার চরণ-নখপ্রভা পড়ে শিরে
নিখিল জনের হৃদয়টি ভরে নির্মল ধারা-নীরে,
সেই সে চরণনখজ্যোতি যেন ঘুচায় সকল শোক,
তোমাদের তাই রক্ষা করুক, তৃপ্ত হউক লোক ॥

ও যদুবংশ সমুদ্র লাগি চন্দ্রমা তিনি হন,
কর্মঅটবী লাগি বটে তাঁকে হতে হয় হুতাশন।
অরিষ্ট যাহা তোমাদের বুকে হানছে ব্যথার সুর,
সেই অরিষ্টনেমি ভগবান করুন তাহাই দূর ॥

কমঠ এবং ধরণেন্দ্র সে নিজকাজে মতিমান,
কিন্তু দুয়ের প্রতি মন যার একই, তিনি ভগবান।
সেই ভগবান পার্শ্বনাথকে জানাই নমস্কার,
তিনি তোমাদের কল্যাণপথে আশিস রাখুন তাঁর ॥

অপরাধী যেবা—তারও প্রতি তাঁর নয়ন করুণাময়,
সুন্দর ওই আঁখিপল্লবে অশ্রুর আশ্রয়।
ভগবান যিনি—তাঁর চোখে পর নয় তো আর্তজন,
শ্রীমহাবীরের দুচোখ করুক কল্যাণ বর্ষণ ॥

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

এর কয়েকদিন পর লোকজন ও দেহরক্ষী সৈন্য নিয়ে আমি, মগধ যাত্রা করলাম। তারপর গ্রাম নগর বন উপবন দেখতে দেখতে একসময় মগধের প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে উপস্থিত হলাম। রাত্রের জন্য সেখানেই আমাদের স্কন্ধাবার ফেলা হল।

পরদিন সকালে রথ নিয়ে জরাসন্ধের দূত এল। বলল, মহারাজ আজই আপনাকে দেখতে চান তাই এই রথে আরোহণ করুন। আমি রথে আরোহণ করলে সেও রথে আরোহণ করল। সেই রথ ত্বরিত গতিতে আমাদের রাজগৃহের দিকে নিয়ে চলল।

নগরের বাইরে এক উদ্যানে সে সেই রথ রাখল। সেই রথ হতে নামবার সময় সেখানে ১৬জন মল্লকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তারা আমায় প্রণাম করে দূরে সরে দাঁড়াল।

দূত আমায় বলল, দেব, আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি মহারাজকে খবর দি। তারপর মন্ত্রীবর এসে আপনাকে এখান হতে নিয়ে যাবেন। এই বলে সে চলে গেল।

রথ হতে নেমে সামনে এক সরোবর দেখতে পেলাম। আমি সেই সরোবরের কূলে গিয়ে বসলাম। সেই উদ্যানের জীর্ণ দশা দেখে সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি বলল উদ্যানের যিনি স্বামী তিনি এখন আর এখানে থাকেন না তাই এর এই দশা হয়েছে।

আমি যখন অনুচরদের সঙ্গে কথা বলছিলাম সেই সময় চারজন মল্ল এগিয়ে এল। দু'জন আমার পা ও দুজন আমার হাত ধরল। বাকী বারোজন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমায় ঘিরে দাঁড়াল।

আমি বললাম, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যার জন্যে তোমরা আমায় বাঁধছ।

তারা বলল, মহারাজের আদেশেই এরূপ করা হচ্ছে। কারণ মহারাজকে কোন গণৎকার বলেছে যে, যে তাঁর মেয়ে ইন্দ্রসেনাকে পিশাচমুক্ত করবে তার পুত্র তাঁকে হত্যা করবে। এই তোমার অপরাধ।

আমি বললাম, আমার পুত্র তাঁর শত্রু, আমি ত নয়।

তুমি না হতে পার কিন্তু তুমিই যদি না থাক তবে তোমার পুত্র আসবে কোথা হতে। তাই তোমাকে এই পোড়ো উদ্যানে নিয়ে আসা হয়েছে।

তবে মর বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের একজনের মাথায় মুষ্ট্যাঘাত করলাম ও তরবারি বার করে আর একজনকে মারতে উদ্যত হলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন আমায় উপরে তুলে নিল। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম মিত্র ভাবাপন্ন কোনো দেবী হবেন। তিনি অনেক দূরে নিয়ে আমায় মাটিতে নামিয়ে দিলেন।

বিদ্যুতের মত হিরণ্ময়ী এক বৃদ্ধাকে আমি দেখলাম বা ফেনাবৃতা গঙ্গার মত। মরালচিত্রিত শ্বেত দুকূল তিনি পরিধান করেছিলেন।

আমি ভাবলাম, ইনি তাহলে আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন। আমি তাই তাঁকে বললাম, দেবী, আপনি কে তাকি আমি জানতে পারি? আপনি আমায় জীবন দান দিয়ে যেমন অনুগৃহীত করেছেন তেমনি আপনার পরিচয় দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করুন।

তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও। শোন, বৈতাঢ্য পর্বতের দক্ষিণার্দ্ধে বৈজয়ন্তী নামে এক গন্ধর্ব নগর আছে। সেখানে নরসিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করেন। আমি তাঁর স্ত্রী। আমার নাম ভাগিরথী। আমার পুত্র বলসিংহ এখন রাজকার্য দেখে। আমার কন্যার নাম অমিতপ্রভা। পুষ্কলাবতীর রাজা গন্ধারের সঙ্গে অমিতপ্রভার বিবাহ দি। তাদের যে কন্যা হয় তার নাম প্রভাবতী। প্রভাবতী তাই আমার নাতনী। সে তোমার কথা সর্বদাই চিন্তা করে ও তোমার অভাবে দুঃখিতা হয়ে থাকে। আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে সে সমস্ত কথা খুলে বলে। আমি তাই তার পিতামতাকে সব জানিয়ে এখানে আসি। বল তোমাকে এখন আমি কোথায় নিয়ে যাই!

আমি বললাম, দেবী, প্রভাবতী আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্না ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী। আপনি যদি আমার প্রতি সদয় থাকেন তবে সেখানে নিয়ে চলুন।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমায় পুষ্কলাবতীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে এক কুঞ্জবিতানে আমায় নামিয়ে দিয়ে রাজাকে আমার উপস্থিতি জানাবার জন্য এক মালীকে প্রেরণ করলেন।

খানিক বাদেই সেখানে রাজানুচরেরা এসে উপস্থিত হল ও আমায় স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া রথে করে নগরে নিয়ে গেল। আমার রূপ দেখে নগরবাসীরা আমার রূপের প্রশংসা করতে লাগল। রাজপ্রসাদে প্রবেশ করলে আমায় যথোচিত সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে সভাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে মন্ত্রী পরিবৃত হয়ে রাজা গন্ধার বসে ছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি উঠে আমায় হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন। শিষ্টাচারের পর তিনি আমায় অন্তঃপুরে প্রেরণ করলেন। সেখানে প্রভাবতীর সঙ্গে আমার দেখা হল। তার চোখে কাজল ছিল না ও গাল দুটী একটু পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল। শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা ও সঙ্গিনী পরিবৃতা তাকে ক্ষমা পরিবৃতা মূর্তিমতী করুণার মত মনে হচ্ছিল।

তার অত্যধিক ভালবাসার জন্য সে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলল, কুমার, তুমি যে অক্ষত অবস্থায় মৃত্যুর মুখ হতে ফিরে এসেছ তা আমাদের আনন্দের কারণ হয়েছে।

আমি বললাম, সত্যি বলতে কি মহারাণীকে প্রেরণ করে তুমিই আমায় জীবন দান দিয়েছ।

ধাত্রী তখন এগিয়ে এসে প্রভাবতীকে আমায় মাল্য চন্দনাদি দিতে বলল। বলল, কুমার যা অমঙ্গল তার বিনাশ হয়েছে এখন শুধু মঙ্গলই মঙ্গল।

আমি প্রভাবতীর হাত হতে মাল্য চন্দনাদি গ্রহণ করলাম।

প্রভাবতী চলে গেলে আমি আহারাদি শেষ করলাম। সন্ধ্যাবেলা নাটকের অভিনয় দেখলাম।

তারপর এক শুভদিনে প্রভাবতীর সঙ্গে আমার বিবাহ হল।

প্রভাবতীর সঙ্গে যৌবনের আনন্দ ভোগ করে সেখানে আমি সুখে বাস করতে লাগলাম।

একদিন গীত বাদ্যাদির পর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সহসা ঘুম ভাঙতেই দেখি কে যেন আমায় নিয়ে যাচ্ছে। শীতল বাতাস আমার শরীর স্পর্শ করছিল। ভাবলাম এ আমায় কোথায় নিয়ে এসেছে? চোখ তুলতেই দেখি এক নারী যার মুখ গর্দভের মত আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমার তখন মনে এল এই নারীর ছদ্ম রূপে কেউ আমায় দক্ষিণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদি মরতে হয়, এর সঙ্গেই মরব কিন্তু এর আকাঙ্খা পূর্ণ হতে দেব না। এই কথা ভেবে তার কপালে আঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যাধর হেপহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার পরপরই আমি এক জলাশয়ে এসে পতিত হলাম। আমি ভাবলাম আমি কোন সমুদ্রে এসে পড়েছি। কিন্তু তা নয়, তা নদী ছিল। আমি সাঁতার দিয়ে উত্তর কূলে উঠলাম।

সেই রাত্রি আমি নদীতীরে ব্যতীত করলাম। সকাল হতে সূর্যালোকে সামনে এক আশ্রম দেখতে পেলাম। কুটীর হতে যজ্ঞ-ধূম উঠছিল। গোবৎসরা কুটীর দ্বারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ছিল। পাখীর কাকলীতে সে স্থান মুখরিত হয়ে উঠেছিল। পিয়াল, ইঙ্গুদী ও নীবার সেখানে রাশীকৃত পড়ে ছিল।

আমি সেই আশ্রমে গেলে কুলপতি আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কুশলাদি প্রশ্নের পর আমি সেই স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি সেকথা শুনে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি কি আকাশবাসী যে এই জায়গাটীর নাম জান না। এই নদী গোদাবরী ও দেশ শ্বেত। চল আশ্রমবাসীদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।

তাপসদের মধ্যে আমি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে আঙুল দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিল। আমাকে দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠল, আমায় নমস্কার

জানাল ও নিজের মনেই কি ভাবতে ভাবতে আমার অনুসরণ করতে লাগল। মঞ্জরিত সহকার বৃক্ষের তলায় গিয়ে বসলে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল ও বলল, দেব, শাস্ত্র দৃষ্টে আমি বলতে পারি যে আপনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আপনার জ্ঞান গরিমা অসাধারণ যা পৃথিবী রক্ষা করতে সমর্থ। আমার এক সমস্যা রয়েছে। তার যদি সমাধান করে দেন তবে তার জন্য আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

কুলপতি তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন, ভদ্র. এ'র নাম সুচিত্ত। ইনি পোতনপুর রাজ্যের মন্ত্রী। ইনি ধর্মপরায়ণ, প্রজাপালক ও বিশ্বস্ত। এ'র সমস্যার সমাধান করে বাধিত করুন।

আমি বললাম, সমস্যাটি জানলেই আমি বলতে পারব তার সমাধান আমি করতে পারব কিনা।

সুচিত্ত তখন বললেন, দেব, শুনুন :

আমি শ্বেত দেশের রাজা বিজয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে বড় হই। একবার পোতন পুরে এক ধনী সার্থবাহ আসেন। তাঁর দুই স্ত্রী ও এক পুত্র ছিল। সেই সার্থবাহের এখানে মৃত্যু হয়। এখন দুই স্ত্রীর মধ্যে সার্থবাহের সম্পদ নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ হয় এবং দু'জনেই সেই পুত্রের মা বলে দাবী করে। এ নিয়ে তারা রাজ দরবারে অভিযোগ করে।

রাজা এর বিচারের ভার আমার ওপর দেন। আমি শ্রেষ্ঠীদের সামনে তাদের জিজ্ঞাসা করি এই পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে ?

তারা প্রত্যুত্তর দেয়, না। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে তার দুই মা-ই তাকে সমান ভালবাসে। তাই সে বলতে পারে না কে তার আসল মা।

তাই সত্য নির্ণয় করতে না পেরে তখনকার মত তাদের বিদায় দি। বলি এ বিষয়ে আমি ভেবে বলব। কিন্তু আমি এর কিছুই কিনারা করতে পারলাম না। কিছুদিন পর তারা আবার রাজ দরবারে আসে। এতে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় বলেন তুমি কেমন মন্ত্রী যে এর মিমাংসা করতে পারছ না। যদি শীঘ্র এর মীমাংসা করতে না পার তবে আমায় মুখ দেখিও না।

রাজার কৃপা ও বিরাগ ভাগ্যদেবী ও যমের কৃপা ও বিরাগের মত। তাই ভয় পেয়ে আমি এই আশ্রমে লুকিয়ে বাস করছি। এখন বলুন আমি কি করব ?

আমি বললাম এতে ভাববার কিছু নেই। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদে এর সমাধান সম্ভব।

সুচিত্ত তখন বলল, দেব, তবে নগরে চলুন।

আমি সম্মত হলাম ও গোদাবরী অতিক্রম করে পরপারে এলাম। তারপর অশ্ব-পৃষ্ঠে পোতনপুরে প্রবেশ করলাম।

আমায় দেখে লোকে আমার প্রশংসা করতে লাগল। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা, নয়ত বিদ্যাধর।

সেদিন আমি মন্ত্রী নিলয়ে বাস করলাম। পরদিন সকালে ন্যায়ালয়ে গেলাম। সেখানে সার্থবাহের দুই স্ত্রী ও শ্রেষ্ঠীরা উপস্থিত ছিল।

আমি সার্থবাহের দুই স্ত্রীর ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম ও একটি করাত আনতে বললাম। তারপর উচ্চাসনে বসে বললাম, তোমাদের বিবাদের যখন নির্ণয় করা যাচ্ছে না তখন সার্থবাহের সম্পত্তি সমান ভাবে ভাগ করে তোমাদের দু'জনকে দিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটীকেও কেটে তোমাদের দু'জনকে সমান সমান দেওয়া হবে।

তাদের একজন একথা শুনে এতে সম্মত হল। অন্য আর একজন এত মর্মাহত হল যে সে কোন প্রত্যুত্তরই দিতে পারল না।

ততক্ষণে করাত এসে গিয়েছিল। ছুতোর দড়ি ফেলে ছেলেটীর শরীরে মধ্য-রেখা টেনে দিল। ছেলেটী ভয়ে কাঁদতে লাগল কিন্তু আমি তার ক্রন্দন উপেক্ষা করে চেঁচিয়ে বললাম এবার করাত চালাও।

ছেলেটীর মাথায় করাত বসান হল। আমি দেখলাম যে সম্মত হয়েছিল সে এতে শিশুর মৃত্যু হবে জেনেও একটুও দুঃখিত হল না। সার্থবাহের অর্দ্ধেক সম্পদ লাভ করবে বলে তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর একজন যে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে উঠল, ওকে কাটবেন না। ও আমার ছেলে নয়, ওর ছেলে। শুধু ওকে মারবেন না।

আমি তখন ছেলের মাথার ওপর হতে করাত সরিয়ে নিতে বললাম। উপস্থিত শ্রেষ্ঠীদের সম্বোধন করে বললাম, আপনারা সমস্ত দেখলেন। একজন কেবল অর্থ চায়, শিশুর প্রতি তার একটুও মমতা নেই। আর একজন অর্থের ওপর দাবী সরিয়ে নিল সে চাইল শিশু কেবল বেঁচে থাকুক। যে শিশুর প্রতি এই মমতা দেখাল বাস্তবিক সেই ওর মা। যার মনে শিশুর প্রতি একটুও মমতা নেই সে কখনোও ওর মা হতে পারে না।

লোকে আমার এই সুবিচারের প্রশংসা করতে লাগল। এরকম ভাবে সত্য নির্ণয় আর কেউই করতে পারত না।

মন্ত্রী তখন শিশুর মাকে বললেন, তুমিই সার্থবাহের ধনের অধিকারিনী। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে ওই দুষ্টাকে ভরণ পোষণের অর্থ দিতে পার। এই বলে তিনি তাদের বিদায় দিলেন।

আমার ন্যায় বিচারের জন্য পোত্তনপুরের রাজা ও পুরোহিত আমায় সম্বর্দ্ধিত করলেন।

আমি মন্ত্রীর আবাসেই বাস করতে লাগলাম। সেখানে একদিন দুই তরুণীকে

সোনার কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখলাম। তারা কে জিজ্ঞাসা করায় পরিচারিকা বলল, দেব ওদের একজন মন্ত্রীর কন্যা ও আর একজন পুরোহিতের কন্যা। নাম ভদ্রমিত্রা ও সত্যরক্ষিতা। একসঙ্গেই ওরা দুজন বড় হয়ে উঠেছে। ওদের উভয়ের শীঘ্রই আপনার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে।

সত্যিই তারপর এক শুভদিনে তাদের সঙ্গে আমার বিবাহ হল।

আমি ভদ্রমিত্রা ও সত্যরক্ষিতার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে সুখে কাল ব্যতীত করতে লাগলাম।

[ক্রমশঃ

নিয়মাবলী

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 5 Sraman September 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৮৭ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সরাবদের মিলন স্থল, দাপুনিয়ার মন্দির

সীমান্ত বাংলার সরাক সংস্কৃতি

শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী

পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেলাকে যদি উত্তর দক্ষিণে দু'ভাগে ভাগ করা হয় তবে দেখা যাবে যে দক্ষিণের বাবমুণ্ডি, বলরামপুর; ঝালদা অঞ্চলে যেমন মাহান্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রয়েছে ঠিক তেমনি উত্তরাঞ্চলের কাশীপুর, রঘুনাথপুর, পাড়া, হুড়া, নেতুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সরাক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রয়েছে। সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের অভাবে পশ্চিম বাংলার পণ্ডিত মানুষদের মনে বেশ কিছু ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে। অনেকের মতে সরাক জাতির মানুষেরা কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং এদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু এদের সংখ্যা অল্প নয় বরং বলা যায় পঞ্চকোট অঞ্চলে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা ও সম্প্রদায়গত একতার অভাবে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বৃহত্তর মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অথচ এদের যা ঐতিহ্য আছে পুরুলিয়া জেলার আর কোন মানব গোষ্ঠীর তা নেই।

সরাক সম্প্রদায় এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। খৃষ্ট পূর্ব ৫০০ থেকে ৬০০ বৎসর আগে এই মানভূম অঞ্চল ছিল এক বিশাল অরণ্যভূমি। কোল, ভীল, সাঁওতাল জাতির মানুষ ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের সন্ধান এখানে পাওয়া যেত না। এই আদিবাসী মানুষেরা ছিল বজ্রের মত কঠিন এবং বিপদজনক সম্প্রদায়। এই কারণে আদিবাসীদের বলা হত বজ্র ভূমিজ।

এই সময় থেকেই জৈন ধর্মের প্রচারকরা এই অঞ্চলে এসে নতুন এক সভ্য সমাজ গড়ে তুলার চেষ্টা করেন। জৈন ধর্মাবলম্বী এই সম্প্রদায়ের মানুষদের বলা হত সুধী ভূমিজ। এই সুধী ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই অঞ্চলে সরাক নামে পরিচিতি লাভ করে। সরাক শব্দটি শ্রাবক শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শ্রোতা। বৈদিক যুগে ঋষিরা যেমন করে অনার্যদের সরিয়ে দিয়ে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এক নতুন সভ্যতার আলো জেলে ছিলেন ঠিক তেমনি সরাকেরাও এই অঞ্চলে বন কেটে মন্দির বানিয়ে সাধন ভজনের এক পবিত্র স্থান গড়ে তুলে ছিল। মিস্টার ডাব্লিউ ডাব্লিউ হাণ্টারের ভাষায় বলা যায়—"The early Jain devotees, like the primitive Rishis of the Vedic period, went out and established hermitage in the jungles, which became the centre of a colony of Jain worshippers." মেজর টিকেল এক সময় বলেছিলেন—

"Singhbhum passed into the hands of the Surawaks." কথাটার সত্যতা স্বীকার করেছেন মিস্টার ভি বল সাহেব। প্রাচীনকালে সিংভূম অঞ্চলটা তাম্র শিল্পে খুব উন্নত ছিল। মিস্টার ভি বল এক সময় তামার খনির অনুসন্ধানের কাজে নেমে পড়েছিলেন। তিনি সিংভূম জেলায় অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন যে বহু তামার খনির নিদর্শন রয়েছে সিংভূম জেলায়। পাহাড়ে, পর্বতে, ধানের ক্ষেতে, মাঠে, ময়দানে তিনি বহু প্রাচীন তামার খনির নিদর্শন তাঁর *On the Ancient Copper Miners of Singhbhum* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কিন্তু কারা এই সব তামার খনি থেকে তামা সংগ্রহ করে দেশকে তাম্র শিল্পে উন্নত করেছিল? এর যথার্থ উত্তর দিয়েছেন মিস্টার ভি বল নিজেই। তিনি লিখেছেন'—"...the more adventurous Seraks having alone penetrated the jungles where they were rewarded with the discovery of copper..."

পরবর্তী কালে সরাকেরা ভাস্কর্য শিল্পে অতি দক্ষ হয়ে উঠে। ছড়রা, তেলকূপী, পাক বিড়রা, দেউল ঘাটা, দালমা, পবনপুর, বোরাম, বলরামপুর, প্রভৃতি অঞ্চল মন্দির নির্মাণ করে সরাক সংস্কৃতির ভিত্তিকে পাকা করে নেয়। এই সব স্থানে সরাকদের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন আজও বজায় রয়েছে। মন্দিরগুলো পুরুলিয়ার এক গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কথা মনে রেখে মিস্টার কুপল্যাণ্ড সরাকদের 'archaic community' বলে সম্বোধন করেছেন। দেউল ঘাটার সরাকদের মন্দির গুলোকে অনেকে হিন্দু মন্দির বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা করছেন। তাঁরা অনেকেই মানভূম থেকে সরাক সংস্কৃতিকে মুছে দিতে চান। কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। এখানের তিনটি মন্দির প্রসঙ্গে মিস্টার ডাব্লিউ ডাব্লিউ হাণ্টার বলেছেন—"These three temples are all of the same type and are no doubt correctly ascribed by the people to the Seraks."

এই অঞ্চলের সরাক সংস্কৃতির গতিপথ সোজা পথে চলেনি। প্রথম দিকে আদিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে বন কেটে বসতি বসাতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-বাদের ধারক ও বাহক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও গোঁড়া হিন্দুরা সরাক সংস্কৃতিকে এই অঞ্চল থেকে মুছে ফেলতে সরাক বিতাড়নের পবিত্র কাজ আরম্ভ করে। জৈন মন্দির থেকে সরাকদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সরিয়ে দিয়ে তাতে হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। এই কাজে তারা হিন্দু রাজাদের সমর্থন লাভ করে। সরাকদের একটা বড় অংশ উড়িষ্যার উদয় গিরি-খণ্ডগিরি অঞ্চল পালিয়ে গিয়ে সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। মানভূম অঞ্চলেও অনেকে ধর্মান্তরিত হয়ে পড়ে। এমনকি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন ধরণের শিল্প কর্মে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হয়। সরাকদের এই অবক্ষয়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে স্যার হারবার্ট রিশলে তাঁর "ভারতের জনগণ" গ্রন্থে লিখেছেন—"They have split up into endogamous. groups based partly on locality and partly on the fact that some of them have taken to the degraded occupation of weaving and they now form a Hindu caste of the ordinary type "

কিন্তু যে জাতির ইতিহাস আছে সে জাতি মরে না। সরাকেরা শিল্পীর জাত। পারিপার্শ্বিকতার চাপে বস্ত্র শিল্পে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হলেও তারা অল্প দিনের মধ্যেই বয়ন শিল্পে দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠল। সরাকেরা তখনকার দিনে মোটা কাপড় বা সুতোর কাপড় বুনত না; তারা নেত বা পাটের শাড়ি বুনত।

সরাকেরা যে মধ্য যুগে দক্ষ বস্ত্র শিল্পী ছিল তার সত্যতা স্বীকার করেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—

সরাক বসে গুজরাটে, জীব জন্তু নাহি কাটে
সর্বকাল করে নিরামিষ
পাইয়া ইনাম বাড়ি, বুনে নেত পাট শাড়ি
দেখি বড় বীরের হরিষ।

সেকালে বস্ত্র শিল্পে দক্ষতা দেখিয়ে বাড়ি পুরস্কার পাবার যোগ্যতা একমাত্র সরাকদেরই ছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা সরাক বস্ত্র শিল্পীদের ভাল চক্ষে দেখত না। তারা সময় সময় সরাকদের জোলা বলে উপহাস করত। এরই নিদর্শন পাওয়া যাবে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'। সরাকেরা কাপড় বুনত বলে 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের' রচয়িতা সরাকদের জোলা বলে অভিহিত করেছেন। সে সময় জোলারাও কাপড় বুনত। তবে জোলারা মোটা কাপড় বুনত। অর্থাৎ খুঞার কাপড়। কিন্তু সরাকেরা মোটা কাপড় বুনত না। তারা ছিল তসর শিল্পী। এই পাট আর তসরের কাপড় পরত দেশের সব বড় মানুষেরা। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র মন্তব্য বিভ্রান্তি মূলক।

দীর্ঘ দিন ধরে ব্রাহ্মণ ও গোঁড়া হিন্দু সমাজের মানুষদের কাছ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের ভূমিজ রাজাদের অনুগ্রহে বসবাস করার একটা প্রবণতা এসে গিয়েছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগ থেকে বর্গী আগমনের কাল পর্যন্ত সরাকেরা বিভিন্ন রাজাদের আশ্রয়ে বসবাস করে এসেছে। ধলভূমে রাজা মানসিংহের আশ্রয়ে বহু সরাক প্রজা বাস করত। রাজা মানসিংহের সঙ্গে সরাকদের

সম্বন্ধটা খারাপ ছিল না ; তবে এক সময় রাজা মানসিংহ সরাক পরিবারের কোন এক মেয়ের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করায় সরাকেরা রাজা মানসিংহের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদে মুখর হয়ে দলে দলে সিংভূম ত্যাগ করে পাঁচেত অঞ্চলে পালিয়ে আসতে আরম্ভ করে। সরাকদের একটা ইতিহাস আছে। তাদের রক্তের মধ্যে আছে সৎ ও নিষ্ঠার বীজ। তারা অন্যায় যেমন করে না তেমনি অন্যায় সহ্যও করে না। এই ঘটনায় সরাকদের এই মানসিকতাই প্রমাণ করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মিস্টার কুপল্যাণ্ড লিখেছেন—"They (Saraks) first settled near Dhalbhum in the estate of a certain Man Raja. They subsequently moved in a body to Panchet in consequence of an outrage contemplated by Man Raja on a girl belonging to their caste."

ধলভূম থেকে পালিয়ে আসা সরাকদের এই শাখা পঞ্চকোট রাজার শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। এখানে তাদের নব জন্ম হয়। অর্থাৎ তারা জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। তারা এখানে হিন্দুদের মত পদবী, গোত্র এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করে।

সারাকদের এই জৈন ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরের পশ্চাতে এক চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। এই সময়টা ছিল বাংলায় বর্গী আগমনের কাল। তখন কাশীপুরের রাজাদের রাজধানী ছিল পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে। বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত রাজ-পরিবারের কোন এক শিশুপুত্রকে নাকি সরাক সমাজের কোন একজন লুকিয়ে রেখে প্রাণে বাঁচিয়ে ছিল। তারপর একটু বড় হলে এই ছেলেকে তারা রাজ পরিবারে ফেরৎ দিয়েছিল। এরই প্রতিদানে সরাকেরা হিন্দুদের মত মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে। চাষযোগ্য বহু জমি দিয়ে রাজ পরিবারের লোকেরা সরাকদের প্রগতিশীল এবং দক্ষ চাষীতে রূপান্তরিত করেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার কুপল্যাণ্ডের অভিমত হল—"In Manbhum it is said that they were not served by Brahmins of any kind until they were provided with a priest by a former Raja of Panchet as a reward for a service rendered to him by a Sarak who concealed him when his country was invaded by the Bargis i.e. the Marhattas."

সরাক সম্প্রদায়ের পদবীগুলো নাকি সবই রাজাদের দেওয়া। যেমন—মাঝী, মণ্ডল, নায়েক, পাত্র, বৈষ্ণব, সিংহ প্রভৃতি। তাদের গোত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি গোত্র জৈন তীর্থংকরদের নামানুসারে এসেছে আবার বেশ কয়েকটি গোত্র হিন্দুদের কাছ থেকে

এসেছে। এগুলো সম্ভবতঃ রাজাদের দেওয়া। সরাকদের গোত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আদিদেব, ঋষিদেব, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, অনন্তদেব, ভরদ্বাজ, গৌতম এবং ব্যাস। গৌতম এবং ব্যাস বীরভূমের সরাকদের মধ্যে বেশি প্রচলিত।

পরবর্তীকালে পঞ্চকোটে আগত সরাকেরা চারভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যারা পঞ্চকোটের রাজাদের দেওয়া জমিজমা নিয়ে মাটি আঁকড়ে পঞ্চকোট অঞ্চলেই পড়ে রইল তাদের বলা হল "পঞ্চকোটিয়া", যারা দামোদর নদীর ওপারে অর্থাৎ বর্ধমান জেলায় চলে গেল তারা হল "নদী পারিয়া", যারা বীরভূমে চলে গেল তাদেরকে বলা হল "বীরভূমীয়" আর যারা রাঁচী জেলার তামার পরগণায় চলে গেল তারা হল "তামারীয়"। এ ছাড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের সরাকেরা এই সময় বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত ছিল বলে তাদের বলা হত "সরাকী তাঁতী"। পরবর্তীকালে সরাকেরা আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এদের মধ্যে আশ্বিনী তাঁতী, পাত্র, উত্তরকুপি এবং মান্দারাণী উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল পরগণার সরাকদের এই সময় বলা হত "ফুল সরাকী", "শিখরিয়া", "কান্দালা" এবং "সরাকী তাঁতী"। সরাকেরা কোন দিনই জাতের দিক দিয়ে তাঁতী ছিল না বা হিন্দু তাঁতী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিলনা। তবে যে সকল সরাক তাঁত শিল্পে নিযুক্ত ছিল তাদের পেশাগত কারণে সরাকী-তাঁতী বলা হত। পাঁচেত অঞ্চলের সরাকেরা দীর্ঘ দিন থেকেই কৃষি কর্ম নিযুক্ত রয়েছে।

সরাক সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার নিখুঁত নিদর্শন রয়েছে পাঁচেত অঞ্চলে। এখানের সরাকেরা খুব রক্ষণশীল বলে প্রাচীন সরাক সংস্কৃতিকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও এখানকার সরাকদের যে সব বৈশিষ্টগুলো সব সম্প্রদায়ের মানুষকে আকর্ষণ করে তা হল—

১। সরাকেরা সম্পূর্ণ ভাবে নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। সরাক মেয়েরা রান্নার সময় 'কাটা' শব্দটি পর্যন্ত ব্যবহার করে না।

২। সরাক সমাজের কোন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করে না।

৩। নিজেদের কোনরূপ নীচ কাজে বা অমর্যাদাপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত করে না।

৪। সরাকদের কোন মানুষ কোনরূপ ঘৃণ্য অপরাধের জন্য কোর্ট থেকে কোনরূপ শাস্তি পায় নি। অর্থাৎ এদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প বা না বললেই চলে।

৫। মেয়েরা খুব রক্ষণশীল। বাইরে কোন ক্রমেই—অন্য কোন জাতের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করে না বা রাত্রি কাটায় না। এ ছাড়া তারা চামড়ার জুতো পায়ে দেয় না।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ দিন ধরে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের আকর্ষণীয় করে

তুলেছে। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত বিভিন্ন পণ্ডিতগণের রচনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্থান লাভ করে সরাকদের সামাজিক মর্যাদাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিস্টার ই টি ডাল্টন পুরুলিয়ার সরাক প্রভাবিত গ্রাম ঝাঁপড়া পরিদর্শন করেন। তিনি সরাক সমাজের মানুষদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন —"They called themselves Saraks and they prided themselves on the fact that under our Government not one of their community had ever been convicted of a heinous crime." তিনি আরও তাদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রশংসা করে লিখেছেন—"...who (Saraks) struck me as having a very respectable and intelligent appearance."

সরাকেরা তাদের সেদিনের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছে। তারা একটা সুশৃঙ্খল জাত। সরাকেরা আইন মাথা পেতে নিয়ে বাস করতে ভালবাসে। কোন কারণেই তারা কোন দিন সরকারের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। মিস্টার ডাল্টনের ভাষায় বলা যায়—"They are essentially a quiet and law-abiding community, living in peace among themselves and with their neighbours." রাজনীতি নাকি একটা ময়লা খেলা। অন্যায় আর মিথ্যাচার না করলে নাকি রাজনীতি করা যায় না। তাই সরাকেরা রাজনীতি করে না। মিথ্যাচার নয়; মানুষকে গড়ে তোলাই তাদের ধর্ম। তাই সরাকেরা শিক্ষকতার কাজটাকেই বরণ করে নিয়েছে। পাঁচেত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে যে সব শিক্ষকেরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই হলেন সরাক সম্প্রদায়ের।

সরাক মেয়েদের রীতিনীতির কথা বলতে গিয়ে মিস্টার হারবার্ট রিশলে সরাকদের রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন। তিনি সরাকদের অহিংসা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আর সততার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—"Their name is a variant of Sravaka (Sanskrit hearer), the designation of the Jain laity; they are strictly vegitarians never eating flesh and on no account taking life and if in preparing their food any mention is made of the word "cutting" the omen is deemed so disastrous that everything must be thrown away."

যা রক্তের মত লাল তা সরাকেরা খেতে পছন্দ করে না। লাল পুঁই, গাজর, লাল সীম প্রভৃতি খেতে তাদের মানা আছে। এ ছাড়া ব্যাঙের ছাতা, ডুমুর প্রভৃতিও তাদের রান্নাঘরে ঢোকে না। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ছড়া আছে। লোক গীতির অংশ স্বরূপ এই ছড়াটিতে বলা হয়েছে—

উমুর ডুমুর পুড়ুং ছাতি,
তিন খায়না সরাক জাতি।

সরাকদের সামাজিক উৎসব বিবাহের রীতি নীতগুলো বেশ বিচিত্র। এদের বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে ফুলশয্যা বা বাসর জাগানোর কোন রীতি নেই। সম্ভবতঃ বিয়ের পর কয়েকটা মাস তারা বর ও কনেকে একটু দূরে দূরে রাখতে চায়। এই সময়টা হল স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের প্রস্তুতির কাল। তাই তাদের সমাজে দ্বিরাগমনের প্রথা খুব জনপ্রিয়।

বিয়ের সময় বরের মাথায় টোপর থাকে না। বরের মাথায় থাকে পাগড়ী ও কাগজের মোড়। বিয়ের আগের দিন গায়ে হলুদ অর্থাৎ গন্ধাধিবাস। সে দিন বরকে বরের বাড়িতে এবং কনেকে কনের বাড়িতে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বরের হাতে যাঁতি এবং কনের হাতে কাজললাতা তুলে দেওয়া হয়। বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের রাত্রে কেবল মাত্র কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠানটিই অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সকাল বেলায় বর কনে বিদায় করা হয় না। সে দিন বর কনের বাড়িতেই থাকে। সেদিন বরকন্যা বন্দনার দিন। মেয়ে পক্ষের সব বন্ধু বান্ধবেরা সেদিনই বন্দনা বা বাঁদানী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন। বাঁদানী অনুষ্ঠানে মেয়ে জামাইকে সাজিয়ে ছাঁদনা তলায় বসান হয়। মেয়ের মা বা দিদিমা স্থানীয়া কোন মহিলা বর কনেকে ধান দুর্বা দিয়ে বন্দনা করেন। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সেই সময় তাঁদের যৌতুক দ্রব গুলো মেয়ের মায়ের বা দিদিমায়ের হাতে তুলে দেন। আগে সেই দিনে জলোৎসবের রীতি ছিল। এই উৎসবে রঙ খেলা হত। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি অবলুপ্তির পথে নেমে গিয়েছে।

পরের দিন সকাল বেলায় মেয়ে জামাইকে বিদায় দেওয়া হয়। বর কনে বরের বাড়ি পৌঁছালে সেখানেও উৎসবের ধুম পড়ে যায়। আগে সেদিনও জলোৎসবের রীতি ছিল। এছাড়া বর কনে নাচের রীতি ছিল। বর্তমানে বর কনে নাচের রীতিও বড় একটা আর দেখা যায় না।

এর পরের দিন বরের বাড়িতে বন্দনা বা বান্দানী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন বরের বাড়ির নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বর কনের বন্দনা বা বাঁদানী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে সরাকদের জাতীয় দেবতা হলেন শিব। বিবাহের সময় শিবের নামে বাধ্যতামূলক ভাবে চাঁদা দেওয়ার রীতি আছে। এ ছাড়া সামাজিক মিলন ক্ষেত্রও রচিত হয় শিবমন্দির প্রাঙ্গণে। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের কাছে দাপুনিয়া গ্রামে সরাক সমাজের শিব মন্দির আছে। মন্দিরটি পাথর দিয়ে তৈরী। সামনে একটি ছোট পাহাড় আর ইসৃরার পুকুর। এই পুকুর পাড়ে ইসৃরা দেবীর মন্দির আছে।

এখানে সরাকদের তিন থেকে ছয় মাসের ছেলে মেয়েদের মানসিক (মানত) শোধ করা হয় ও মন্দিরে পূজো দেওয়া হয়। এই স্থানটা প্রকৃতির এক সুন্দর লীলা-ক্ষেত্র। গাছে গাছে অজস্র পাখিদের আস্তানা। সরাক মেয়েরা প্রকৃতির এই লীলাক্ষেত্রে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যায়।

সরাক মেয়েদের ধর্মীয় ও লোক উৎসবগুলোর মধ্যে জিতাষ্টমী ও ভাদু উৎসব বেশ ধুমধাম করে পালন করা হয়। জিতাষ্টমী ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। অবাঙ্গালী মেয়েরা এই উৎসবকে জিউতিয়া বা জীবিত-পুত্রিকা বলে থাকে। এই উৎসব আবার জীমূত-বাহনের ব্রতের সঙ্গেও যুক্ত। এই উৎসবে চুল বাঁধার সময় আমলা বাসাল নামে এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য সরাক মেয়েরা ব্যবহার করে থাকে। এটা তৈরী করা হয় আমলা, হলুদ, মেথি এবং বাসাল নামে এক প্রকার গন্ধ দ্রব্যের শেকড় মিশিয়ে। এর গন্ধ খুব পবিত্র। আগে বিয়ের সময় এই গন্ধদ্রব্য দিয়ে সরাক কনেদের চুল বাঁধা হত। এছাড়া চুল গরম মোম ঢেলে চুল বাঁধার রীতিও ছিল। পুরানো দিনের সরাকদের বিয়ের ফর্দগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সে সময় এই সব গন্ধদ্রব্য ও মোম প্রচুর পরিমাণে কেনা হত। বর্তমানে জিতাষ্টমী ছাড়া বর্ণহিন্দুদের সমস্ত বার, ব্রত ও দেব দেবীর উৎসব সরাক মেয়েরা পালন করে থাকে।

যুগে যুগে সরাক জাতির মানুষরা ইতিহাস সৃষ্টি করে এসেছে। বর্তমানে তারা আত্ম বিস্মৃত। তবু তাদের ইতিহাস সৃষ্টির কাজ যেন শেষ হয়নি। পুরুলিয়ার লোক সাহিত্যেও তাদের মেয়েদের অবদান কম নয়। ভাদু পূজার ইতিহাসের অতীতের পৃষ্ঠাগুলোকে তাদের মেয়েরাই আজও তুলে ধরতে পারে।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচিত ভাদু গানের যে খণ্ড খণ্ড অংশগুলো বিকৃত অবস্থায় বিভিন্ন লোক সাহিত্যের গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ ও মার্জিতরূপ পেতে হলে সরাক মেয়েদের কাছে আমাদের আসতেই হবে। ভাদু উৎসব সরাক মেয়েদের কাছে একটি ধর্মীয় ব্রত উৎসব। সরাক মেয়েদের ভাদু গানের আসর গুলো যেন এই অঞ্চলের লোক সাহিত্যের এক একটি আড্‌ডাখানা। এই সব লোক সাহিত্যের আসরে ভাদু গানের বহু পালা গীত হয়ে থাকে। তবে এই আসরে পুরুষদের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ থাকে। সরাক মেয়েদের কণ্ঠ থেকে নেওয়া ভাদু গানের "মা কল্যাণীর ঘাট" পালা গানের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

চল চান করিতে,—
চাননা দহে আলোর মালা
পড়েছে যে জলেতে
চল চান করিতে···(ধুয়া)

মা কল্যাণী চান করিছেন গো,
চালনা দহের ঘাটেতে।
শঙ্খ বামুন পার হইছেন,
পসরা লয়ে মাথাতে
চল চান করিতে…
কি বটে কি বটে বামুন হে…
কি হে তোমার মস্তকে
জাতে আমরা শঙ্খ বামুন,
শঙ্খ আছে মাথাতে
চল চান করিতে…
নামাও শঙ্খ নামাও শঙ্খহে,—
নামাও চালনার ঘাটেতে।
জোড়া শঙ্খ বাইছে পরাও,
উচিত মূল্য করিতে
চল চান করিতে…
দশ পাঁচ নয় মাতা গো,
এবই আমার কথাতে,
পরিবে তো পর মা গো,
পঞ্চ টাকা হয় দিতে—
চল চান করিতে…

ভাদু নাকি বাউরীদের লোক-উৎসব। কিন্তু পুরুলিয়ার পাঁচেত অঞ্চলে সামান্য অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে এই অঞ্চলে সব থেকে ধুমধাম করে ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সরাকদের বাড়িতে। সরাক মেয়েরা একদিকে যেমন ভাদুর পুরানো দিনের গানগুলো আজও বাঁচিয়ে রেখেছে ঠিক তেমনি ভাদুর পুরানো দিনের মূর্তিটিও অক্ষুণ্ণ রাখতে ভাদুমূর্তির শিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছে। পাঁচেত অঞ্চল রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত সরাক প্রভাবিত গ্রাম দুন্দমুটের মৃৎ শিল্পীরা আজও পুরানো রীতিতে ভাদুমূর্তি নির্মাণ করে থাকেন। তাঁদের পুরানো রীতিতে তৈরী ভাদু মূর্তির সব চেয়ে বড় খদ্দের হল সরাক মেয়েরা। সরাক মেয়েদের কাছে ভাদু পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান বলে তারা ভাদুমূর্তিতে একটা দেবী ভাব বজায় রাখতে চায়। দুন্দমুট গ্রামের ভাদুশিল্পীরাও পুরানো রীতিতে তৈরী ভাদু মূর্তিকে "সরাক্যাভাদু" বলে থাকেন।

কেবলমাত্র সরাকদের বাড়িতেই যে পুরানো রীতিতে ভাদু পূজা হয় তা নয়,

এই অঞ্চলে অনেক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায়ের বাড়িতেও ভাদু পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠানরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বাউরী বা নিম্ন সম্প্রদায়ের ভাদু পূজাতে কোনরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না কিন্তু সরাক সম্প্রদায়ের বাড়িতে ভাদুর সন্ধ্যারতি হয়। জাগরণের দিন ভোর রাত্রে ঝিঙ্গে বলি দেওয়া হয়। আর সারা রাত ধরে ভাদুর পাঁচালি জাতীয় পুরানো দিনের গান গাওয়া হয়। এদের মেয়েরা ভাদুর আসর ফুল দিয়ে সাজায়। অজস্র শালুক ফুল দিয়ে ঘর ভর্তি করে দেয়। ভাদুর পায়ের তলায় মেঝেতে নাককাটা (দোপাটি জাতীয় ফুল), জবা প্রভৃতি ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে ফুলের আলপনা তৈরী করা হয়। ফুলের আলপনা তৈরীতে এদের মেয়েরা বেশ দক্ষতা দেখিয়ে থাকে।

এরা ভাদুর আসরে ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই ভাদুর পায়ের তলায় রাখে। রঙ-বেরঙের খাজা-গজাও থাকে। এসব হল ভাদুর "শিতল" অর্থাৎ ভোগ। তাছাড়া ভাদুর আসরে থাকে বড় আয়না, চিরুনী, আলতা, সিঁদুর, গন্ধতেল, আতর, চন্দন ও আমলা বাসাল। মেয়েরা ভোর রাত্রে গান গাওয়ার অবসরে প্রসাধনের কাজটাও সেরে নেয়।

সরাক সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রীতি প্রায় নেই বললেই চলে। হাল আমলে কিছু কিছু মেয়ে স্কুল কলেজে পড়ছে। আগে মেয়েরা লেখা পড়া একেবারেই জানত না। তবু সরাকদের মেয়েরা ভাদু পূজার বড় বড় পালা গান-গুলো কেমন করে কণ্ঠে ধারণ করে রেখেছে তা ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়। প্রাচীন ঐতিহ্য, বংশগত প্রতিভা আর রক্ষণশীলতা সরাক মেয়েদের এক উন্নত ধরণের সামাজিক মর্যাদা দান করেছে। তাই সমাজ, জাতি, ধর্ম সব কিছু অবক্ষয়ের পথে নেমে গেলেও এদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। খালি পায়ে আর খালি গায়ে এরা শয়তানেরও মন জয় করে নিতে পারে। কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য দেশের মানুষ এদের কথা জানবার চেষ্টা করেনি।

আগেই বলেছি সরাকদের মধ্যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করে না। আবার এদের মধ্যে কেউ প্রশাসনিক দায়িত্বে নেই। এদের সমাজে ডক্তার ইঞ্জিনিয়ার, বিচারক প্রভৃতি উচ্চ পদাধিকারীদের বিরাট অভাব। তাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এরা অনগ্রসর। পুরুলিয়ার সরাকদের মধ্যে যেমন ক্ষেতমজুর বা কল মজুর খুব কম তেমনি ডাক্তার বা বিচারকের সংখ্যাও নগণ্য। তবে শিক্ষক আছেন। এখানের সরাকেরা শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছে। তাছাড়া জেলার প্রগতিশীল চাষী রূপেও এদের বেশ নাম ডাক আছে।

সরাক সমাজের মধ্যে বেশি শিল্প শ্রমিক রয়েছে বর্ধমান জেলায়। এখানের সরাকদের আর্থিক অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল। এই জেলার সরাক পরিবারের শতকরা ৪০টিরও বেশি সদস্য দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্পাঞ্চল ও কয়লাখানিতে

চাকরী করে। অপর দিকে বাঁকুড়ায় শতকরা মাত্র ১০ জন আর সাঁওতাল পরগণায় শতকরা ২২ জন চাকুরীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাঁকুড়া জেলার ও সাঁওতাল পরগণা জেলার সরাকদের চাষের আয় আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। কৃষি কাজে বেকারী বেড়ে যাওয়ার ফলে পরিবার পিছু যে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আগে ছিল ৩০ কুইন্টাল তা আজ কমে গিয়ে ১৮ কুইন্টালে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথা পিছু কৃষি জমির পরিমাণও কমে গিয়েছে। এই কারণে এখানের সরাকদের চাকুরী করার প্রবণতা বাড়ছে। আমি বাকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার সরাকদের জন সংখ্যা ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিসংখ্যান তুলে দিলাম—

জেলার নাম	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা	শিক্ষিতের হার	মাথা পিছু বার্ষিক আয়
বর্ধমান	৪১১	৪২০৫	১৭০২	৫[illegible]১ টাকা
বাঁকুড়া	৬৩২	৭২১৬	১৬০৪	৩২৬ টাকা
সাঁওতাল পরগণা	২৫৪	২৬০৭	১০৭৪	৪৫১ টাকা

পরিসংখ্যানে দেখা যাবে বর্ধমান জেলায় সরাকদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যেমন বেশি ঠিক তেমন মাথা পিছু আয়ও বেশি। অপর দিকে বাঁকুড়ার সরাকদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণা এই তিন জেলাতে সরাকদের মোট জনসংখ্যার ৩৫ ভাগ মানুষ বাস করে। পুরুলিয়ায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আর বীরভূম, মেদিনীপুর ও রাঁচী-সিংভূম অঞ্চলে মোট সরাকদের মাত্র ১৫ ভাগ মানুষ বাস করে। এই সব স্থানের একটা সাধারণ জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেবার চেষ্টা করছি—

জেলার নাম	পুরুষ	নারী	শিশু	মোট
পুরুলিয়া (ধানবাদের সামান্য অঞ্চলসহ)	৬৯৪৪	৫৮২৩	৪৭৫৫	১৭৫২২
বাঁকুড়া	২৬৯০	২১৩৫	২০৯১	৭২১৬
বর্ধমান	১৫১৪	১৫৭৭	১১১৪	৪২০৫
সাঁওতাল পরগণা	৯৬১	৭৮৫	৯৪১	২৬৮৭
মোট	১২১০৯	১০৩২০	৯২০১	৩১৬৩০
বীরভূম	—	—	—	১৪৬
মেদিনীপুর	—	—	—	৪১৬
রাঁচী ও সিংভূম	—	—	—	৩৭৮৯
				মোট ৩৫৯৮১

১৯৬২ সালে সরাক সমাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক বেসরকারীভাবে সরাক সমাজের জনগণনার কাজ চালিয়েছিলেন। তাঁদের গণনাকে ভিত্তি করে বলা যায় যে সরাকদের মোট জনসংখ্যা হল ৩৫৯৮১ জন।

আর একটী লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই যে বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলা থেকে সরাকেরা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই সব স্থানে অনেকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতের সঙ্গে তারা মিশে গিয়েছে।

বর্ধমান জেলার সরাকেরা আবার নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকে মনে রেখে সমাজকে নতুন করে গড়ার চেষ্টা করছে। এই জেলার পূঁচড়া অতীত যুগে জৈনদের একটি তীর্থ ক্ষেত্র ছিল। পূঁচড়া নামটি সম্ভবতঃ মন্দিরের পাঁচটি চূড়া থেকে এসেছে। মনে হয় পূঁচড়া নামটির সঙ্গে জৈনদের পঞ্চস্তূপী সম্প্রদায়ের কিছু যোগ আছে। পূঁচড়ায় কিছু তীর্থংকরের বিগ্রহ ও কিছু রহস্যময় স্থাপত্যের অংশ তাদের নীরব ঐতিহ্য নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

জৈনদের তথা সরাকদের শিল্পকলা মন্দিরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আজ সরকারের। পুরুলিয়াজেলায় বহু জৈন মন্দির আজ অবলুপ্তির পথে। একটা ঐতিহ্য মণ্ডিত জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি আজ ধ্বংস হতে চলেছে। এসবকে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ দেশের জনপ্রিয় সরকারকেই নিতে হবে।

যে জাতির ইতিহাস আছে সে জাতি নাকি মরে না। অতীতের শত অত্যাচার অবিচার সহ্য করেও সরাকেরা তাদের মন্দিরগুলোর মতই এখনও টিকে আছে। আশা করি সরাকদের অস্থ বিস্মৃতির অন্ধকার কেটে যাবে। তারা আবার অতীতের আলোয় পথ দেখে বাঁচার পথ খুঁজে পাবে।

যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য পেয়েছি—

১ Statistical Account of the District of Manbhum—W.W. Hunter.
২ On the Ancient Copper Miners of Singhbhum (Geological Survey of India)--Mr V. Ball.
৩ Statistical Account of the District of Manbhum—W.W. Hunter.
৪ The People of India—Sir Herbert Risley (London, 1938), pp. 77-78
৫ Gazetteer of Manbhum District—Mr. G. Coupland.
৬ Notes on a Tour in Manbhum in 1864-65—Lt Col. E T. Dalton.
৭ Gazetteer of Singhbhum District—L.S.S. O.Malley
৮ চণ্ডীমঙ্গল—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
৯ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ।

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্ত]

মুনিকে দান দেবার জন্য ধনশ্রেষ্ঠী উত্তর কুরু ক্ষেত্রে যুগলরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে সব সময় সুষম অর বর্তমান থাকে। সেই স্থান সীতানদীর উত্তর তটে ও জম্বু বনের পূর্বভাগে। সে স্থানে যুগলদের আয়ু তিন পল্যোপম ও ওদের শরীর তিন ক্রোশ দীর্ঘ হয়। ওদের পিঠে দু শ' ছাপ্পান্ন অস্থি থাকে। তারা অল্প কষায় সম্পন্ন ও মমতা রহিত হয়। তারা তিন দিনে একবার মাত্র খাবার ইচ্ছা করে। আয়ু শেষ হয়ে এলে স্ত্রীযুগলটী একবার মাত্র গর্ভ ধারণ করে ও তার যুগল (পুত্র ও কন্যা) উৎপন্ন হয়। তারা উনচল্লিশ দিনের হলে (পিতামাতা) যুগলের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়। সেখান হতে তারা দেবলোকে যায় (অর্থাৎ কোন স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে।) উত্তর কুরুক্ষেত্রের মাটি স্বভাবতঃই শর্করার মত মিষ্ট, জল শরৎকালীন চন্দ্রমার মত নির্মল ও ভূমি রমণীয় হয় সেই ভূমিতে দশ প্রকারের কল্প বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই কল্প বৃক্ষ বিনা পরিশ্রমে যুগলদের তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করে।

মদ্যাংগ নামক কল্পবৃক্ষ তাদের সুরা দেয়, ভৃঙ্গাংগ পাত্রাদি দেয়, তুর্যাংগ বিবিধ রাগরাগিণী যুক্ত বাদ্যযন্ত্র দেয়, দীপশিখাংগ ও জ্যোতিষ্কাংগ অদ্ভুত আলোক দেয়, চিত্রাংগ নানাবিধ ফুল ও মাল্য দেয়, চিত্ররস খাদ্য দেয়, মণ্যংগ অলঙ্কারাদি দেয়, গেহাকার গৃহরূপ নিবসস্থান দান করে ও অনগ্ন দিব্যবস্ত্র দেয়। এই সব কল্পবৃক্ষ তাদের নিয়ত ও অনিয়ত উভয় প্রকার দ্রব্য দান করে এ ছাড়া সেখানে অন্য কল্পবৃক্ষও থাকে যা অভিপ্সিত বস্তু দান করে। সেখানে সমস্ত রকম ইচ্ছিত বস্তু পাওয়া যায় বলে ধন শ্রেষ্ঠী যুগল জীবনে স্বর্গের মতই বিষয় সুখ ভোগ করতে থাকেন।

যুগল আয়ু পূর্ণ হলে ধনশ্রেষ্ঠী পূর্ব জন্মে দত্ত দানের জন্য সৌধর্ম দেব লোকে দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন।

দেব আয়ু পূর্ণ হলে সেখান হতে চ্যুত হয়ে তিনি পশ্চিম মহাবিদেহ ক্ষেত্রে গন্ধিলাবতী বিজয়ে বৈতাঢ্য পর্বতের উপর গান্ধার দেশের গন্ধসমৃদ্ধ নগরে বিদ্যাধর শিরোমণি শতবল রাজার চন্দ্রকান্তা নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হলেন। তিনি মহাবিক্রমশালী হওয়ায় তাঁর নাম মহাবল রাখা হয়। বৈভবের মধ্যে পালিত পোষিত হয়ে ও রক্ষকের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে মহাবল কুমার বৃক্ষের মত বর্দ্ধিত হতে লাগলেন।

ক্র'ম চন্দ্রের মত সমস্ত কলায় পূর্ণ হয়ে সেই মহাভাগ্যশালী সমস্ত লোকের আনন্দদায়ক হলেন। উচিত সময়ে মাতাপিতা মূর্তিমতী বিনয়লক্ষ্মী স্বরূপ বিনয়বতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। ক্রমে তিনি কামদেবের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত, কামিনীদের বশীকরণ-রূপ ও রতির ক্রীড়াক্ষেত্র তুল্য যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তাঁর পা ছিল কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু, পদতল সমান, মধ্যভাগ সিংহের মধ্যভাগকে তিরস্কারকারী (অর্থাৎ ক্ষীণ-কটি)। বক্ষদেশ ছিল পর্বত শিলাবৎ, দুই স্কন্ধ ছিল বৃষভ স্কন্ধের মত সুন্দর ও ভুজদ্বয় শেষ নাগের ফণায় সুশোভিত। তাঁর ললাটদেশ ছিল অর্দ্ধোদিত পূর্ণিমা চন্দ্রের মত অভিরাম। ও'র স্থির আকৃতি মণির মত দন্ত পংক্তিতে, নখরে ও সোনার মত কান্তিময় শরীরে মেরুলক্ষ্মীকেও নিন্দিত করছিল।

একদিন সুবুদ্ধি, পরাক্রমী ও তত্ত্বজ্ঞ বিদ্যাধরপতি শতবল একান্তে বসে চিন্তা করতে লাগলেন, এই শরীর স্বভাবতঃই অপবিত্র। এই অপবিত্রতাকে নিত্য নূতনভাবে সাজিয়ে আর কতদিন ঢেকে রাখা? নানাভাবে নিত্য যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও যদি কখনো একটু আধটু অযত্ন হয়ে যায় তবে দুষ্ট পুরুষের মত শরীর বিকৃত হয়ে পড়ে। কফ, বিষ্ঠা, মূত্রাদি শরীর হতে নির্গত হলে মানুষ তাদের ঘৃণা করে কিন্তু যখন তা শরীরে থাকে তখন তাদের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। জীর্ণ বৃক্ষ-কোটরে যেমন সর্প, বৃশ্চিক আদি ক্রূর প্রাণী বাস করে তেমনি এই শরীর যন্ত্রণাদায়ী অনেক রোগ উৎপন্ন হয়। শরৎকালীন মেঘের মত এই শরীর স্বভাবতঃই নাশবান। যৌবনরূপ লক্ষ্মী দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ প্রভার মত বিলীন হয়ে যায়। আয়ু ধ্বজার মত চপল। বৈভব তরঙ্গের মত তরল। ভোগ সুখ ভুজঙ্গের মত বক্র ও সংগম স্বপ্নের মত মিথ্যা। শরীরস্থিত আত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীর মত কাম ক্রোধাদিরূপ অগ্নির তাপে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছে। কি দুর্দৈব! মহা দুঃখদায়ী বিষয়কে সুখদায়ী মনে করে বিষ্ঠোৎপন্ন কীটের মত মানুষ কখনো বৈরাগ্য লাভ করে না। পরিণামে দুঃখদায়ী বিষয়ের স্বাদ আবদ্ধ হয়ে সে অন্ধ যেমন সম্মুখস্থিত কূপ দেখতে পায় না সেই রকম শিয়রস্থিত মৃত্যুকে দেখতে পায় না। মধুর বিষয় বিষের প্রথম আক্রমণেই আত্মা মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। তাই কিসে তার মঙ্গল-সে কথা সে চিন্তা করতে পারে না। চার পুরুষার্থ যদিও সমান তবুও আত্মা পাপরূপী অর্থ ও কাম পুরুষার্থে লীন হয়ে যায়। ধর্ম ও মোক্ষ পুরুষার্থের প্রযত্ন করে না। এই দুস্তর সংসার সমুদ্রে জীবের পক্ষে মনুষ্য দেহরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করা খুবই কঠিন। যদিও বা মনুষ্য শরীর লাভ হয় তবু অনেক ভাগ্যোদয়েই ভগবান অর্হৎ ও নির্গ্রন্থ সুসাধুর সান্নিধ্য পাওয়া যায়। যদি আমি মনুষ্যদেহ ধারণ করেও এর উত্তম ফল গ্রহণ না করি তবে আমার দশা তার মত হবে নগরে বাস করা সত্ত্বেও যার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে যায়। এখন তাই আমি কবচধারী মহাবল কুমারকে রাজ্যভার দিয়ে আত্ম কল্যাণে নিযুক্ত হই।

এই কথা চিন্তা করে রাজা শতবল মহাবল কুমারকে ডেকে পাঠালেন ও বিনয় গুণ সম্পন্ন কুমারকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন। মহাবল কুমার পিতৃ আজ্ঞা স্বীকার করে নিলেন। কারণ মহাত্মারা গুরুজনের আজ্ঞা অমান্য করতে ভয় পান।

তখন রাজা শতবল মহাবল কুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যাভিষেক করে নিজের হাতে মঙ্গল তিলক অঙ্কিত করলেন। কুন্দ পুষ্পের মত শুভ্র মঙ্গল তিলকে নবীন রাজা উদয়াচলে আরূঢ় চন্দ্রমার মত সুশোভিত হলেন। শরৎকালীন মেঘাবৃত গিরিরাজকে যেমন সুন্দর দেখায় তাঁকেও হংস ধবল পিতার শ্বেতছত্রে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মেঘপংক্তি উড্ডীয়মান বলাকা যুগ্ম যেমন শোভিত হয় তেমনি তিনি দুদিকের চামর বীজনে শোভিত হচ্ছিলেন। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন মন্দ্রিত হয় তেমনি অভিষেক কালীন মঙ্গলধ্বনিতে আকাশ মন্দ্রিত হতে লাগল। সামন্ত ও মন্ত্রীরা মহাবল কুমারকে রাজা শতবলের রূপান্তর জ্ঞানে অভিবাদন করলেন ও তাঁর আদেশ পালনের শপথ নিলেন।

এভাবে পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে রাজা শতবল আচার্যের নিকটে গিয়ে চারিত্ররূপ সাম্রাজ্য গ্রহণ করলেন (অর্থাৎ প্রব্রজিত হলেন)। তিনি অসার বিষয় পরিত্যাগ করে সার রূপ ত্রিরত্ন (সম্যক জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র) ধারণ করলেন। (রাজ বৈভব পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হলেও) তিনি সমভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই জিতেন্দ্রিয় ক্রোধমানাদি কষায়কে এভাবে উৎখাৎ করলেন যেভাবে নদীর প্রবাহ তীরস্থিত বৃক্ষকে উৎপাটিত করে। সেই শক্তিশালী মহাত্মা মনকে আত্মস্বরূপে লীন করে বাণীকে নিয়মে রেখে ও শরীরকে নিয়মিত করে দুঃসহ পরিষহ সহ্য করতে লাগলেন। (মৈত্রী, করুণাদি মাধ্যস্থ) ভাবনায় যাঁর ধ্যান-সন্তাত বর্দ্ধিত হয়েছে সেই শতবল রাজর্ষি মহানন্দে এভাবে অবস্থান করতে লাগলেন যেন তিনি মোক্ষানন্দে অবস্থান করছেন। ধ্যান ও তপস্যা নিরত সেই মহাত্মা আয়ু অবসানে স্বর্গে লীলামাত্রে দেবতারূপে উৎপন্ন হলেন।

মহাবল কুমার বলবান বিদ্যাধরদের সহায়তায় ইন্দ্রের মত পৃথিবীর অখণ্ড শাসন করতে লাগলেন। হংস যেমন কমলিনী বনে আনন্দে ক্রীড়া করে তেমনি তিনিও রমণীদের সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে আনন্দে ক্রীড়া করতে লাগলেন। তাঁর রাজধানীতে নিয়ত সঙ্গীতের ঝংকার উঠত যা বৈতাঢ্য পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে এরূপ মনে হত যে গিরি কন্দরগুলি সেই সঙ্গীতের অভ্যাস করছে। সামনে পেছনে আশে পাশে রমণী পরিবৃত হয়ে তিনি সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসের মত সুশোভিত হতেন। স্বচ্ছন্দভাবে বিষয় ক্রীড়ায় মগ্ন হওয়ায় তাঁর দিন ও রাত্রি বিষুবরেখাস্থিত দিবারাত্রের মত সমভাবে ব্যতীত হতে লাগল।

একদিন সামন্ত ও মন্ত্রীদের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে মহাবল কুমার মণিস্তম্ভের মত

সভাস্থলে বসেছিলেন। অন্যান্য সভাসদরাও নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা মহাবল কুমারকে একদৃষ্টিতে এভাবে দেখছিলেন যেন যোগ সাধনার জন্য তাঁরা ধ্যান করতে যাচ্ছেন। স্বয়ংবুদ্ধ, সংভিন্নমতি, শতমতি ও মহামতি নামে চার মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বয়ংবুদ্ধ মন্ত্রী প্রভুভক্তিতে অমৃতসাগরবৎ, বুদ্ধিরত্নে রোহনাচল পর্বতবৎ ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এ দুঃখের বিষয় যে আমাদের বিষয়াসক্ত রাজাকে ইন্দ্রিয়রূপী দুষ্ট অশ্ব আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধিক্কার যে আমরা এর উপেক্ষা করছি। বিষয়ের আনন্দে আসক্ত আমাদের প্রভুর জীবন ব্যর্থ নষ্ট হচ্ছে দেখে যেমন অল্প জলে মীন দুঃখী হয় আমি সেরূপ দুঃখিত। যদি আমাদের মত মন্ত্রী রাজাকে সৎ মার্গে না নিয়ে যায় তবে আমাদের ও বিদূষক মন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তাই আমাদের উচিত রাজার বিষয়ে আসক্তি হ্রাস করিয়ে সৎপথে নিয়ে আসা। কারণ রাজা জল প্রণালীর মত মন্ত্রীরা যে পথে তাঁকে নিয়ে যায় সেই পথে চলেন। যারা স্বামীর বাসনের দ্বারা নিজের নির্বাহ করে তারা হয়ত এতে ক্রুদ্ধ হতে পারে কিন্তু আমার উচিত তাঁকে সৎযুক্তি দেওয়া। কারণ মৃগের ভয়ে কি ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হতে আমরা নিরস্ত থাকব?

বুদ্ধিমানদের মধ্যে অগ্রণী স্বয়ংবুদ্ধ মন্ত্রী এরূপ চিন্তা করে যুক্তকরে রাজা মহাবলকে বললেন মহারাজ, এই সংসার সমুদ্রের মত। যেমন নদীর জলে সমুদ্র তৃপ্ত হয়না, সমুদ্রের জলে বাড়বানল, জীবের দ্বারা যমরাজ, ইন্ধনে অগ্নি সেইরকম সংসারে বিষয় সুখভোগে আত্মা কখনো তৃপ্ত হয় না। নদীতীরের ছায়া, দুর্জন লোকের সঙ্গ, বিষ, বিষয় ও সর্পাদি প্রাণীর অধিক সান্নিধ্য সর্বদা দুঃখদায়ীই হয়। উপভোগের সময় কামোপভোগ সুখদায়ী বলে মনে হয় কিন্তু পরিণামে তা বিরস। চুলকোলে যেভাবে দাদ বর্দ্ধিত হয় সেই প্রকার কামোপভোগ সেবন অসন্তোষই বর্দ্ধিত করে। কামদেব নরকের দূত, বাসনের সাগর, বিপত্তিরূপ লতার অঙ্কুর, ও পাপরূপ বৃক্ষের বর্দ্ধনকারী। কামদেবের মদে মাতাল মানুষ সদাচাররূপ মার্গ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভব সংসার রূপ গহ্বরে পতিত হয়। ইঁদুর যখন গৃহে প্রবেশ করে তখন সে স্থানে স্থানে গর্ত তৈরী করে সেই প্রকার কামদেবও যখন শরীরে প্রবেশ করেন তখন তিনি অর্থ ধর্ম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থে স্থানে স্থানে ছিদ্র করে দেন (অর্থাৎ বিনষ্ট করে দেন)।

স্ত্রীরা বিষাক্ত লতার মত দেখবার, স্পর্শ করবার ও উপভোগ করবার সময় ব্যামোহের সৃষ্টি করে। ওরা কালরূপী ব্যাধের জালের মত। এজন্য মনুষ্যরূপ হরিণের মহা-অনিষ্টকারী। যারা বিলাস ব্যসনের মিত্র তারা কেবল পান, ভোজন ও স্ত্রী বিলাসের মিত্র। এজন্য তারা কখনো নিজের প্রভুর পরলোকের হিত চিন্তা করে না। সেই স্বার্থ পরায়ণের দল নীচ, তোষামদকারী ও লম্পট হয় ও নিজের প্রভুকে সর্বদা

স্ত্রী-কথা, নাচ, গান ও বিনোদের কথা বলে খুসী করে। বদরী বৃক্ষের সঙ্গে থাকলে যেমন কদলী বৃক্ষ ভালো ফল দেয় না সেইরূপ কুসংগতিরক্ত কুলীন ব্যক্তিরও কখনো উত্থান হয় না। এজন্য হে কুলীন স্বামী, আপনি প্রসন্ন হোন, বিচার করুন। আপনি নিজেও জ্ঞানী। আপনি তাই মোহে পতিত হবেন না। আসক্তি পরিহার করুন ও ধর্মে চিত্ত সংলগ্ন করুন। ছায়াহীন বৃক্ষ, জলহীন সরোবর, সুগন্ধহীন ফুল, দন্তহীন হাতী, লাবণ্যহীন রূপ, মন্ত্রীহীন রাজা, বিগ্রহীন চৈত্য, চন্দ্রহীন রাত্রি, চরিত্রহীন সাধু, শস্ত্রহীন সৈন্য, নেত্রহীন মুখ যেমন শোভা দেয়না তেমনি ধর্মহীন পুরুষ শোভা দেয় না। চক্রবর্তী রাজাও যদি অধর্মী হন তবে তিনি সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন যেখানে কদন্ন রাজ্যসম্পদার তুল্য মূল্য। মহাকুলে উৎপন্ন হয়ে যে ধর্ম চরণ করে না সে নূতন জন্মে কুকুরের মত অন্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে জীবন ধারণ করে। ব্রাহ্মণও যদি ধর্মহীন হয় তবে সে পাপ সঞ্চয় করে ও বিড়ালের মত কুক্রিয়াকারী হয়ে ম্লেচ্ছ যোনিতে উৎপন্ন হয়। ভব্যজীবও যদি ধর্মহীন হয় ত বিড়াল, সাপ, সিংহ, বাঘ শকুনি আদি তীর্যক যোনিতে কয়েক জন্ম ব্যতীত করে নরকে যায়। সেখানে বৈরের দ্বারা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মত পরম ধার্মিক দেবতাদের দ্বারা নানারূপ নির্যাতিত হয়। সীসা যেমন আগুনে গলে সেরূপ অনেক বাসনের আগুনে অধার্মিক ব্যক্তির শরীর গলে থাকে। এজন্য এরূপ অধার্মিক ব্যক্তিদের ধিক্কার! ধর্ম পরম বন্ধুর মত সুখ দেয় ও নৌকার মত বিপদরূপ নদী পার হতে সাহায্য করে। যিনি ধর্ম উপার্জন করেন তিনি মানুষের মধ্যে শিরোমণি হন ও লতা যেমন গাছকে আশ্রয় করে সেইরূপ সম্পদ তাঁকে আশ্রয় নেয়। আধি ব্যাধি বিরোধ আদি দুঃখের হেতু। এগুলি জলে যেমন আগুন নির্বাপিত হয় সেইরকম ধর্মের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সমস্ত শক্তি দ্বারা কৃত ধর্ম অন্য জন্মে কল্যাণ ও সম্পত্তি প্রাপ্তির ন্যাস রূপ হয়। হে স্বামী, অধিক আর আমি কি বলব। যে প্রকারে মইয়ের সাহায্যে প্রাসাদ শিখরে ওঠা যায় সেই প্রকারে ধর্মের সাহায্যে লোকাগ্রভাগ স্থিত মোক্ষধামে যাওয়া যায়। ধর্মের দ্বারাই আপনি বিদ্যাধর দর রাজা হয়েছেন। এজন্য এর চাইতেও বেশী লাভের জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন।

স্বয়ংবুদ্ধ মন্ত্রীর সেকথা শুনে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের মত অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের খনিরূপ ও বিষরূপ বিষমমতি সম্পন্ন সংভিন্নমতি নামক মন্ত্রী বললেন, সাবাস স্বয়ং-বুদ্ধ সাবাস! উদগারে আহার্যের অনুমান করা যায় সেরূপ তোমার বাক্যের দ্বারা তোমার মনোভাব জানা যায়। সর্বদা আনন্দে বাসকারী স্বামীর সুখের জন্য তোমার মত মন্ত্রীই এরূপ বলতে পারে, অন্যে নয়। কোন কঠোর-স্বভাব উপাধ্যায়ের কাছে তুমি শিক্ষালাভ করেছ যে অসময়ে বজ্রপাতের মত স্বামীকে তুমি এরূপ কঠোর বচন বলতে সক্ষম হয়েছ? সেবক যখন নিজে নিজের ভোগের জন্য স্বামীর সেবা করে তখন সে স্বামীকে এরূপ কেমন করে বলতে পারে যে আপনি ভোগ করবেন না। যে ইহজন্মে

প্রাপ্ত ভোগ উপেক্ষা করে পরলোকের জন্য যত্ন করে সে করতলস্থিত লেহ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে কনুই চাটবার মত মূর্খতার পরিচয় দেয়। ধর্মের দ্বারা পরলোকে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সে কথা বলাও ভুল। কারণ পরলোকে যারা বাস করে তাদেরই অভাব। আর যখন বাসিন্দাদেরই অভাব তখন পরলোকই আসে কোথা হতে? যেভাবে গুড়, ময়দা ও জলে মাদক শক্তি উৎপন্ন হয় সেইভাবে পৃথ্বী, অপ, তেজ ও বায়ু হতে চেতনশক্তি উৎপন্ন হয়। শরীর হতে ভিন্ন অন্য কোনো শরীরধারী নেই যে ইহলোক পরিত্যাগ করে পরলোকে যায়। এজন্য নিঃসংকোচে বিষয় সুখ ভোগ করা উচিত। আর নিজের আত্মাকে ঠকানোও উচিত নয়। স্বার্থ নষ্ট করা মূর্খতা মাত্র, ধর্মাধর্মের শঙ্কা করাও উচিত নয়। কারণ তা সুখে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। আর ধর্মাধর্মের ত গাধার সিংএর মত অস্তিত্বই নেই। এক প্রস্তর খণ্ডকে স্নান, বিলেপন, পুষ্প ও বস্ত্রালঙ্কারে লোকে পূজা করে, অন্য প্রস্তর খণ্ডর ওপর বসে মূত্র ত্যাগ। বলত, সেই প্রস্তরদ্বয় কি পুণ্য করেছিল বা পাপ? যদি জীবমাত্র কর্মের জন্য জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তবে জলে যে বুদ্বুদ ওঠে সে কোন কর্ম জন্য ওঠে ও নষ্ট হয়? যে যে-পর্যন্ত ইচ্ছা সহ প্রযত্ন করে সে সে-পর্যন্ত চেতন নামে অভিহিত হয়। বিনষ্ট চেতনের পুনর্জন্ম হয় না। একথা বলা নিতান্ত যুক্তিহীন যে যে প্রাণী মরে তা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সে কেবল কথার কথা মাত্র। আমাদের প্রভু শিরীষ কুসুম তুল্য কোমল শয্যায় শয়ন করুন, রূপলাবণ্যময়ী রমণীদের সঙ্গে নিঃসংকোচে ক্রীড়া করুন, অমৃত তুল্য ভোজ্য ও পেয় পদার্থের আস্বাদন করুন। যে এর বিরোধ করে তাকে প্রভুদ্রোহী বলা যায়। হে প্রভু আপনি কর্পূর, অগরু, কস্তুরী ও চন্দনাদি সর্বদা বিলেপন করুন যাতে আপনাকে সুগন্ধের সাক্ষাৎ অবতার বলে মনে হোক। হে রাজন, উদ্যান, বাহন, দুর্গ ও চিত্রশালা আদি যা নয়নকে আনন্দ দেয় তার বার বার অবলোকন করুন। হে স্বামী, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ আদির ধ্বনি ও তৎসহ গীত মধুর গান আপনার কর্ণকুহরের জন্য রসায়ন রূপ হোক। যতদিন জীবন ততদিন বিষয় সুখ সেবন করুন। ধর্মকার্যের নামে অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করবেন না। সংসারে ধর্ম অধর্মের কোনো ফল নেই।

[ক্রমশঃ

মহাবীর-বাণী

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৪ ॥

সত্যসূত্র

৩০। সদা অপ্রমাদী এবং সাবধান থাকিয়া অসত্য ত্যাগ করিয়া হিতকারী সত্য কথাই বলা উচিত। এইরূপ সত্য কথা বলা বড়ই কঠিন।

৩১। নিজের অথবা অন্যের স্বার্থের জন্য ক্রোধে অথবা ভয়ে, কোন সময়েই, অন্যে দুঃখ পায় এরূপ অসত্য কথা, নিজেও বলিবেই না, অপরের দ্বারাও বলাইবে না।

৩২। মিথ্যা ভাষণ সংসারের সমস্ত সৎপুরুষের দ্বারাই নিন্দিত হইয়াছে এবং প্রাণীমাত্রই মিথ্যাকে অবিশ্বাস করে। সেজন্য মিথ্যাভাষণ সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।

৩৩। নিজের অথবা অন্যের স্বার্থের জন্য অথবা উভয়ের জন্য, জিজ্ঞাসিত হইয়াও পাপযুক্ত, নিরর্থক ও মর্মভেদী বাক্য বলিবে না।

৩৪। পাপকারী, নিশ্চয়কারী (ইহাই একমাত্র সত্য এরূপ) ও অপরের দুঃখদায়ী বাক্য সাধু যেন না বলেন। সৎপুরুষ এইভাবে ক্রোধ, লোভ, ভয় কিম্বা পরিহাসেও যেন পাপকারী বাক্য না বলেন। পরিহাসেও পাপকারী বাক্য বলা উচিত নয়।

৩৫। আত্মসাধনার্থী সাধকের দৃষ্ট, পরিমিত, অসংদিগ্ধ, পরিপূর্ণ, স্পষ্ট, অনুভূত বাচালতাহীন এবং অন্যের মনে যাহা উদ্বেগ সৃষ্টি করে না এরূপ বাক্য বলা উচিত।

৩৬। ভাষার গুণ ও দোষ উত্তমরূপে জানিয়া যিনি দূষিত ভাষা পরিহার করেন, যিনি ছয় প্রকার জীবের প্রতি সর্বদা সংযত ও সাধুধর্ম পালনে যিনি তৎপর এরূপ বুদ্ধিমান সাধক কেবলমাত্র হিতকারী মধুর বাক্যই বলিবেন।

৩৭। শ্রেষ্ঠ ধীর পুরুষ নিজে জানিয়া বা গুরুজনদের নিকট শুনিয়া যেন প্রজার হিতকারী ধর্মের উপদেশ দেন। যে আচরণ নিন্দনীয়, সঙ্কল্প মূলক সেরূপ আচরণ যেন কখনো না করেন।

৩৮। বচন শুদ্ধির জ্ঞান উত্তমরূপে প্রাপ্ত করিয়া বিচারশীল মুনির দূষিত বাক্য সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত ও সুচারু রূপে বিবেচনা করিয়া পরিমিত ও নির্দোষ বাক্য বলা উচিত। এই প্রকার বলিলে সৎপুরুষদের মধ্যে তাঁহারা প্রশংসিত হন।

৩৯। অন্ধকে অন্ধ, নপুংসককে নপুংসক, রোগীকে রোগী ও চোরকে চোর বলা যদিও সত্যভাষণ তবুও এরূপ বলা উচিত নয়। (কারণ ইহাতে তাহারা দুঃখপ্রাপ্ত হয়।)

৪০। মূলতঃ অসত্য কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সত্য এরূপ বাক্য ভুলেও যদি কেহ বলিয়া ফেলে—সেও যখন পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়না তখন যে জানিয়া শুনিয়া অসত্য বলে সে যে পাপ করে তাহা বলাই বাহুল্য।

৪১। যে ভাষা কঠোর ও অন্যকে দুঃখ দেয় তাহা সত্য হইলেও বলা উচিত নয়। কারণ তাহাতেও পাপ স্পর্শ করে।

॥ ৫ ॥

অস্তেনকসূত্র

৪২-৪৩। পদার্থ সচেতন হউক বা অচেতন, অল্প মূল্য হউক বা বহুমূল্য, এমন কি তাহা দাঁত খুঁটাইবার কাঠিই হউক না কেন, যাহা গৃহস্থের অধিকারে থাকে, সেই গৃহস্থের অনুমতি না লইয়া পূর্ণ সংযমী সাধক তাহা নিজে গ্রহণ করেন না, অন্যকে গ্রহণ করিতে বলেন না বা এইরূপ ভাবে যে গ্রহণ করে তাহার অনুমোদন করেন না।

৪৪। উপরে, নীচে, মধ্যভাগে যে কোনও খানে ত্রস বা স্থাবর জীব থাকে তাহাদের নিজের হাত, পা বা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা দুঃখ দেওয়া উচিত নয় এবং অন্যের দ্বারা অপ্রদত্ত বস্তু চুরি করিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়।

৪৫। যে নিজের সুখের জন্য ত্রস বা স্থাবর জীবের ক্রূরতা পূর্বক হিংসা করে ও ও নানাভাবে কষ্ট দেয়, যে অন্যের দ্রব্য অপহরণ করে, যে উত্তম ব্রতের সামান্য মাত্রও পালন করে না (তাহাকে ভয়ঙ্কর ক্লেশ পাইতে হয়।)

৪৬। দাঁত খুঁটাইবার কাঠি আদি তুচ্ছ বস্তুও না দিলে চুরি করিয়া লইবে না। (মহার্ঘ বস্তুর চুরি করিয়া লইবার প্রশ্নই কোথায়?) নির্দোষ এবং গ্রহণযোগ্য আহার, জল আদি দাতা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া গ্রহণ করা বড়ই দুষ্কর।

॥ ৬ ॥

৪৭। যে একবার কামোপভোগের রসাস্বাদ করিয়াছে তাহার পক্ষে অব্রহ্মচর্য ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য মহাব্রত ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

৪৮। যে মুনি সংযম বিনাশী দোষ হইতে দূরে থাকেন তিনি সংসারে থাকিলেও দুঃসেব্য প্রমাদরূপ ভয়ঙ্কর অব্রহ্মচর্যের কখনো সেবন করেন না।

৪৯। অব্রহ্মচর্য অধর্মের মূল, মহাদোষের আকর। এজন্য নির্গ্রন্থ মুনি মৈথুন সর্বদা পরিত্যাগ করেন।

৫০। আত্মশোধক সাধকের পক্ষে দেহ সজ্জা, স্ত্রী সঙ্গ, পৌষ্টিক ও সুস্বাদু আহারাদি তালপুট বিষের মত ভয়ঙ্কর।

৫১। শ্রমণ তপস্বী স্ত্রীলোকের রূপ, লাবণ্য, বিলাস, হাস্য মধুর বাক্য, কামচেষ্টা ও কটাক্ষাদির বিষয়ে মনে চিন্তা করিবে না ও ইহাদের দেখিবার কখনো প্রয়াস করিবে না।

৫২। অনুরাগ সহকারে স্ত্রীলোকদের দেখা, তাহাদের অভিলাষ করা, তাহাদের চিন্তা করা বা তাহাদের বিষয়ে কথা বলা ব্রহ্মচারী পুরুষের কখনো উচিত নয়। ব্রহ্মচর্য ব্রতে যাহারা সর্বদা রত থাকিতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্য এই নিয়ম অত্যন্ত হিতকর ও উত্তম ধ্যান প্রাপ্ত হইবার সহায়ক।

৫৩। ব্রহ্মচর্য অনুরক্ত ভিক্ষুর বৈষয়িক, আনন্দদায়ী ও কামভোগে আসক্তি বৃদ্ধিকারী স্ত্রী বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫৪। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা ও তাহাদের বারবার পরিচয় প্রাপ্ত করা সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫৫। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর স্ত্রীলোকের সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি, দৃষ্টির বিকার উৎপন্নকারী হাব ভাবের প্রতি বা স্নেহপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়।

৫৬। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর স্ত্রীলোকের কূজন, রোদন, গীত, হাস্য, শীৎকার বা করুণ ক্রন্দন—যাহা শুনিয়া বিকার উৎপন্ন হয়, শ্রবণ করা কখনো উচিত নয়।

৫৭। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর পূর্বানুভূত স্ত্রীলোকের হাস্য, ক্রীড়া, রতি, দর্প, সহসা বিত্রাসন আদি কার্য কখনো স্মরণ করা উচিত নয়।

৫৮। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর দ্রুত বাসনাবর্দ্ধনকারী পুষ্টিকর আহার ও পান সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫৯। ব্রহ্মচর্যরত স্থিরচিত্ত ভিক্ষুর সংযম পালনের জন্য সর্বদা ধর্মানুকূল বিধিতে প্রাপ্ত পরিমিত আহার্য ভোজন করাই উচিত। ক্ষুধা যেমনই হউক না কেন লালসা বশে অধিকমাত্রায় কখনো ভোজন করা উচিত নয়।

৬০। যেমন বহু ইন্ধন পূর্ণ অরণ্যে পবন দ্বারা উত্তেজিত দাবাগ্নি শান্ত হয় না সেইরূপ মর্যাদার অতিরিক্ত ভোজনকারী ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয়াগ্নিও শান্ত হয় না। অধিক ভোজন কাহারো হিতকর নহে।

৬১। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর শারীরিক শোভাবৃদ্ধির জন্য বা নিজেকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য কোনও প্রকার শৃংগার মূলক কার্য করা উচিত নয়।

৬২। ব্রহ্মচর্যরত ভিক্ষুর শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার কাম গুণ সর্বদার জন্য পরিত্যাগ করা উচিত।

৬৩। স্থিরচিত্ত ভিক্ষু দুর্জয় কামভোগ যেন সর্বদার জন্য পরিত্যাগ করেন। শুধু ইহাই নহে, যেসব স্থানে ব্রহ্মচর্য পালনে সামান্যও ক্ষতি হইতে পারে সেইসব শংকামূলক স্থানও পরিত্যাগ করা উচিত।

৬৪। দেবলোক সহিত সমস্ত সংসারে কামভোগের বাসনাই দুঃখের মূল কারণ; যে সাধক এই বিষয়ে বীতরাগ তিনি শারীরিক ও মানসিক সমস্ত প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হন।

৬৫। যে মানব এই প্রকার দুষ্কর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন তাঁহাকে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরাদি সকলে নমস্কার করে।

৬৬। এই ব্রহ্মচর্য ধর্ম ধ্রুব, নিত্য, শাশ্বত ও জিনোপদিষ্ট। ইহার দ্বারা অতীতে বহু জীব সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বর্তমানে হইতেছেন, ভবিষ্যতেও হইবেন।

[ক্রমশঃ

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

কোল্লাপুর নগর দেখবার বাসনা হওয়ায় আমি একদিন কাউকে কিছু না বলে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করলাম। গ্রাম নগর দেখতে দেখতে কোল্লাপুরে এসে উপস্থিত হলাম। কোল্লাপুর বনদেবতা সোমনসের নামে উৎসর্গীকৃত ছিল ও এখানে যাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছিল।

বিশ্রাম নেব বলে আমি অশোক বনে প্রবেশ করলাম। মালীরা ফুল তুলছিল। তারা আমাকে দেখে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করল। তারপর আমায় কাছে এসে বলল, দেব আদেশ করুন। আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?

আমি বললাম, আমি এখানে কেবল বিশ্রাম করতে চাই। আমি বিদেশাগত।

তারা আমায় উদ্যান গৃহে নিয়ে গেল। সেখানে স্নান ও আহারাদির পর সুখে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

সেখানে এক কুমারী মেয়েকে দেখলাম। সে মালাকরদের তাড়াতাড়ি পুষ্পমালা তৈরী করে দিতে বলছিল।

আমি সেই মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, মালা কার জন্য?

সে বলল, রাজকন্যা পদ্মাবতীর জন্য।

আমি তখন তাকে আমার কাছে নানা বর্ণের ফুল নিয়ে আসতে বললাম। আমি তাকে মালা তৈরী করে দেব।

শুনে সে খুসী হল ও নানা বর্ণের ফুল নিয়ে এসে উপস্থিত করল। আমি সেই ফুল দিয়ে একটি সুন্দর মালা তৈরী করে দিলাম।

সেই মালা নিয়ে সে চলে গেল।

খানিক পরে সে ফিরে এসে আমার পায়ে পড়ল। বলল, দেব, আপনার গাঁথা মালা পেয়ে রাজকন্যা আজ ভারী খুসী হয়েছেন।

আমি বললাম, কি রকম?

আমি গিয়ে সেই মালা দিলে তিনি অনেকক্ষণ ধরে সেই মালা দেখলেন। তারপর আমায় বললেন, এ মালা কে তৈরী করেছে?

আমি বললাম, আমাদের উদ্যানে এক অতিথি এসেছেন। তিনি এই মালা তৈরী করেছেন।

তিনি তখন আমায় প্রশ্ন করলেন, তিনি দেখতে কি রকম? তাঁর বয়স কত?

আমি বললাম, এ'র মত মানুষ আমি এর আগে এখানে কখনো দেখিনি। হয় তিনি কোনো দেবতা, নয় বিদ্যাধর। তাঁর এখন পূর্ণ যৌবন।

সেকথা শুনে তাঁর শরীর আনন্দে কণ্টকিত হয়ে উঠল। তিনি আমায় বস্ত্র ও এক জোড়া অঙ্গদ দিয়ে বিদায় দিলেন। বললেন, তোমার অতিথি যাতে এখানে সুখে থাকেন তার ব্যবস্থা আমি করছি।

সন্ধ্যাবেলা রাজা পদ্মরথের মন্ত্রী এলেন। তিনি আমায় রথে বসিয়ে তাঁর আবাসে নিয়ে গেলেন। সেখানে সেই রাত্রি আমি বাস করলাম।

পরদিন সকালে যখন আমি বসে ছিলাম তখন তিনি আমায় হরিবংশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যা জানতাম তা তাঁকে শোনালাম। তা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন।

এভাবে কয়েকদিন আমার সেখানে ব্যতীত হল। তারপর এক শুভদিনে রাজা তাঁর কন্যা আমায় দান করলেন।

ইন্দ্র যেমন শচীর সঙ্গে আনন্দে বিহার করেন আমিও তেমনি পদ্মাবতীর সঙ্গে আনন্দে বিহার করে সেখানে অবস্থান করতে লাগলাম।

একদিন আমি পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কুলশীল জিজ্ঞাসা না করে কি করে তোমার পিতা তোমাকে আমায় দান করলেন?

সে হাসতে হাসতে বলল, ভ্রমরকে কি প্রস্ফুটিত চন্দন বৃক্ষের পরিচয় দিতে হয়? তাছাড়া এর কারণ আছে। একবার আমার বাবা এক গণৎকারকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার কন্যা কি মনোভিমত স্বামী লাভ করবে?

তিনি গণনা করে বলেন, সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কন্যা পৃথিবীপতিকে স্বামীরূপে লাভ করবে।

আমার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তিনি কোথায় আছেন? কি করে তাঁকে আমরা জানব?

তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, তিনি শীঘ্রই এখানে আসবেন ও একটি সুন্দর মাল্য রচনা করে আপনার কন্যাকে প্রেরণ করবেন ও হরিবংশের ইতিহাস বিবৃত করবেন।

বাবা তখন আমায় বলে দেন আমি যদি কারু কাছ হতে মাল্য পাই তবে যেন মন্ত্রীকে সংবাদ দেই। তারপর যা ঘটেছে সে তুমি জানই।

একদিন প্রমোদ উদ্যানে আমি ও পদ্মাবতী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে কদলী বন সন্নিহিত এক সরোবরের কাছে এলে পদ্মাবতী আমায় বলল, প্রিয়, এসো আমরা এই সরোবরে জলকেলি করি। এই বলে সে আমায় তুলে নিল।

আমি তখন ভাবলাম পদ্মাবতী নিশ্চয়ই কোন বিদ্যার অধিকারিণী তা না হলে কি করে এত সহজে ও আমায় তুলে নিল।

তারপর কিছু বুঝবার আগেই সে আমায় জলাশয়ের ওপর দিয়ে অনেকদূর নিয়ে গেল। তখন আমার মনে হল, ও নিশ্চয়ই পদ্মাবতী নয়। পদ্মাবতীর রূপ ধরে আমাকে ছলনা করে নিয়ে যাচ্ছে। এই ভেবে তার মাথায় আঘাত করলাম। মুহূর্তে সে হেপহে পরিবর্তিত হয়ে গেল ও আমায় সেখানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

আমি এক কুঞ্জ বিতানের ওপর এসে পতিত হলাম। আমার তখন মনে হল ও নিশ্চয়ই পদ্মাবতীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। যদি নাও নিয়ে গিয়ে থাকে তবে আমার বিরহে সে বাঁচবেই বা কি করে? আমি তখন তার দুঃখে কাঁদতে লাগলাম ও বলতে লাগলাম, হে চক্রবাক, তুমি কি সেই সুন্দরীকে দেখেছ যে তোমার প্রিয়ার মত সুন্দরী? হে মরাল, সেই মরালগামিনী কোথায় তুমি কি জান? হে মৃগ, সেই মৃগাক্ষীর সংবাদ কি তুমি আমায় দিতে পার?

এইভাবে সেই বন আমি পরিভ্রমণ করতে লাগলাম। কখনো বৃক্ষে আরোহণ করে, কখনো টীলার ওপর চড়ে তার অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

পদ্মগন্ধা পদ্মাবতী তুমি কোথায়? পদ্মের মতই তোমার মুখ, পদ্মের মতই তোমার গায়ের রং! তুমি কেন আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছনা?

আমার সেই দশা দেখে বনবাসীরা চোখের জল ফেললেন তারপর কোথায় যেন চলে গেলেন। কিন্তু খানিক বাদেই তাঁরা ফিরে এলেন ও আমায় বললেন, আমাদের সঙ্গে এস তোমাকে পদ্মাবতীর কাছে নিয়ে যাব।

আমি তাঁদের সঙ্গে গ্রামে গেলাম। তাঁদের কথা আমার অমৃতের মত মনে হয়েছিল।

গ্রামে গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লোক জড় হয়েছে। উৎসবের আয়োজন চলছে। গ্রামবাসীরা আমার রূপের প্রশংসা করতে লাগল। বলল, নিশ্চয়ই ইনি কোন দেবতা, গন্ধর্ব বা বিদ্যাধর।

তারপর তারা আমায় রাজ প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে একটি মেয়েকে দেখিয়ে বলল, ওই দেখ পদ্মাবতী।

ও পদ্মাবতী ভেবে আমার হৃদয় প্রথমে আনন্দে নৃত্য করে উঠল। তার পরেই দেখলাম, ও পদ্মাবতীর মত হলেও পদ্মাবতী নয়!

তার সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া হল। আমি তখন সেখানে বাস করতে লাগলাম।

একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রিয়ে, যে তোমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও যে উন্মাদের মত ব্যবহার করছিল তার সঙ্গে তোমার পিতা তোমার কি করে বিবাহ দিলেন?

সে বলল,, প্রিয় শোন—

কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমার পিতামহ এই বন দুর্গে এসে আশ্রয় নেন। সেই হতে আমরা এখানে বাস করছি।

আমি বড় হয়ে উঠলে আমার রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়াতে থাকে। অনেক সামন্ত নৃপতি আমায় বিবাহ করতে চান কিন্তু এখানে কেউই তাঁকে আক্রমণ করতে আসবে না বলে পিতা আমাকে কাউকেই সমর্পণ করেন না।

এক গণৎকার বলে যে পৃথিবীপতির সঙ্গে আমার বিবাহ হবে। আমাদের লোক একবার কোল্লাপুরে যায় ও তোমাকে সেখানে দেখে। তারপর তোমাকে পদ্মাবতীর বিরহে উন্মাদের মত ভ্রমণ করতে দেখে তারা পিতাকে তোমার সংবাদ দেয় ও তোমাকে এখানে নিয়ে আসে। তাই তুমি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে না। মেয়েরা আমায় ঠাট্টা করে তখন কি বলেছিল জানো বলেছিল, পদ্মশ্রী, পদ্মরথ রাজার মেয়ে পদ্মাবতীর প্রেমিককে তুই পাবি। ধন্য তোর যৌবন।

পদ্মশ্রীর গর্ভে আমার জরা নামে এক পুত্র হয়।

একদিন সেই বনদুর্গ পরিত্যাগ করে আমি বেরিয়ে পড়ি ও হাঁটতে হাঁটতে কাঞ্চনপুর নগরে এসে উপস্থিত হই। সেখানে উদ্যানে এক সাধুকে বদ্ধাসনে বসে ধ্যান করতে দেখি।

অনেকক্ষণ পর তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি আমায় স্বাগত জানালেন ও পুরুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে অনেক তত্ত্বালোচনা করলেন। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর আশ্রমে এলেন। সেখানে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তাঁর নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

আমার নাম সুমিত্র। আমি সকলেরই মিত্র, বিশেষ করে যারা ধর্মনিষ্ঠ তাদের। কিন্তু এখন যা বলব তার সঙ্গে মুনি জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

নিকটেই ললিতশ্রী নামে এক গণিকা কন্যা বাস করে। তার শরীর সর্ব সুলক্ষণ ও শুভ চিহ্নযুক্ত, বাণী শ্রুতিসুখকর। গতি মরালকেও লজ্জা দেয়। বেশবাস সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীর মত, বিদ্যায় সে সরস্বতী। গণৎকারেরা বলেছে সে পৃথিবী পতির পত্নী হবে। কিন্তু সে পুরুষদ্বেষিনী। সে প্রায়ই আমার এখানে আসে ও আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, মা, তোমার এই নূতন বয়স। এই বয়সে তোমার পুরুষ দ্বেষ শোভা পায় না। প্রত্যুত্তরে সে বলল, কাকা, শুনুন—যে কথা আজ আপনাকে বলছি তা ইতিপূর্বে আর কাউকেই বলি নি।

পূর্বজন্মে আমি হরিণী ছিলাম। আমার যে স্বামী ছিল তার পীঠ সোণার রঙের ছিল। সে আমায় খুব ভালবাসত। আমার কিসে সুখ হয় আনন্দ হয় সে তা সর্বদা দেখত।

একবার সেই বনে শিকারীরা আসে। আমরা প্রাণ ভয়ে এদিক ওদিক পালাতে আরম্ভ করি। আমার স্বামী আমায় পরিত্যাগ করে দ্রুত পালিয়ে গেলেন।

আমি গর্ভবতী থাকায় ছুটতে পারিনি তাই ধরা পড়লাম। শিকারীরা তীর মেরে আমায় হত্যা করল।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এক ছোট হরিণশিশুকে রাজোদ্যানে ক্রীড়া করতে দেখে আমার পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তখন আমার মনে হয় সমস্ত পুরুষই এমনি। তারা কেবল ভালবাসার অভিনয় করে পরে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যায়। আমার হরিণ যদি আমায় ভালবাসত তবে কি সে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকে পেছনে ফেলে পালাতে পারত! তাই সেদিন মনে মনে সঙ্কল্প করলাম কোন পুরুষ মানুষকে ভালবাসব না। তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখব না। তাই কাকা, আমি পুরুষ বিদ্বেষী।

তুমি কি তাকে সুখী করতে পার ?

একটু ভেবে বললাম, বোধ হয় পারি। আমায় এক টুকরো কাপড় দিন আমি একটী ছবি আঁকব। সেই ছবি দেখলে সে ব্যাধিমুক্ত হবে।

তপস্বী কেবল কাপড়ই নয়। রঙ ও তুলিকাও এনে দিলেন।

আমি সেই রঙ ও তুলিকা দিয়ে সেই বন আঁকলাম। দেখালাম—হরিণযূথকে শিকারীরা আক্রমণ করেছে—একটী হরিণ যার পিঠ সোণার মত ছুটতে ছুটতে বারবার ফিরে ফিরে চাইছে কিন্তু তার হরিণীকে দেখতে না পেয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দাবাগ্নিতে আত্ম বিসর্জন করছে।

আমি ছবিটি আঁকা হলে সেই ছবিটি সামনে রেখে বসে রইলাম।

খানিক বাদেই ললিতশ্রীর দাসী এল। ছবিটি দেখে ফিরে গেল। কিন্তু খানিক বাদেই সে আবার ফিরে এল। বলল, দেব, ওই ছবিটি কি কিছুক্ষণের জন্য আমায় দেবেন। আমার স্বামিনী তা দেখতে চান।

আমি বললাম, এ আমার নিজের জীবনেরই চিত্র। তবে তোমার স্বামিনী যখন দেখতে চাইছেন তখন স্বচ্ছন্দ এনে নিয়ে যেতে পার।

এখুনি আবার ফিরিয়ে দেব বলে সে সেই ছবিটি নিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে সেই দাসী এল। আমায় প্রণাম করে বলল, দেব, আমি সেই ছবিটি নিয়ে গিয়ে আমার স্বামিনীকে দিলাম ও বললাম, ভদ্র এতে নিজের জীবনই চিত্রিত করেছেন। তাই অক্ষত অবস্থায় একে ফিরিয়ে দিতে হবে।

তিনি ছবিটি বিছিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তিনি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে দিয়ে অশ্রু বিগলিত হয়ে তাঁর কপোল ও বক্ষদেশ ভিজিয়ে দিল।

আমি তাঁকে বললাম, দেবী, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার প্রতি কি কেউ অবিনয় প্রকাশ করেছে ?

তিনি তখন চোখ মুছে বললেন, মিত্তা, মেয়েদের মন বড় ছোট। কি উচিত কি অনুচিত তা তারা জানে না। যারা আমার প্রিয়জন, তারা আমার প্রতি অন্যায় করেছে ভেবে দুঃখিত হয়েছিলাম কিন্তু দেখছি তাদের স্নেহ আমার প্রতি অপরিসীম। আচ্ছা বলত, যিনি এই চিত্র এঁকেছেন তাঁর বয়স কত ?

আমি বললাম, এখন তাঁর নবীন যৌবন। রূপে তিনি কামদেব।

তখন ওতেই হবে বলে তিনি আমায় নিশ্চুপ করে দিলেন। তারপর তাঁর মাকে গিয়ে বললেন, মা, সুমিত্র কাকার ওখানে এক অতিথি এসেছেন, তাঁকে সকালে আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ করব।

তাঁর মা এতে সহর্ষ অনুমতি দিলেন এবং আমি তাই আপনাকে তাঁর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

আমি বললাম, এ বিষয়ে পূজ্য তপস্বীই হাঁ বা না বলতে পারেন।

[ক্রমশঃ

চিঠিপত্র

[সীতার জন্ম প্রসঙ্গে]

মহাশয়,

……সীতার জন্ম কথা প্রসঙ্গে [ভ্রমণ, শ্রাবণ ১৩৮০] লেখক যে সব রামায়ণের উল্লেখ করেছেন তাছাড়াও ভারতীয় লোক জীবনে আরও কিছু রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। আদিবাসী প্রভাবিত অঞ্চলেও রামায়ণের কথা প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় যে মুণ্ডারী রামায়ণ ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি মানুষের কাছে প্রিয় গ্রন্থ। এই রামায়ণের সীতার জন্ম কথা আরও বিচিত্র।

মুণ্ডারী রামায়ণ মতে রাজা জনক একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন। এক সময় তিনি এক বৃদ্ধকে কিছু ঋণ দিয়েছিলেন। বেচারা গরীব বৃদ্ধ চাষীটি সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে পারে নি। তাই তাকে রাজাদেশে এক ভাঁড় নিজ শরীরের রক্ত দিতে হয়েছিল। এই রক্তপূর্ণ ভাঁড় রাজা জনক ধানের ক্ষেতে পুঁতে রেখেছিলেন।

এই অত্যাচারের ফলে দেশে নেমে এল এক বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এলো অনাবৃষ্টি। মড়ক লাগল দেশে। প্রজারা রাজা জনকের কাছে ছুটে গিয়ে বলল—

বলুন বলুন জনক রাজা করব মোরা কি ?
অন্ন জল উধাও, তোমার কাছে এসেছি।
দেশ জুড়ে এই দেখুন কেমন পড়েছে আকাল।
এখন রাজা নিজের হাতে ধরুন সোনার হাল।

[অনুবাদ]

প্রজাদের অনুরোধে রাজা জনক সোনার হাল নিয়ে মাঠে গেলেন আর সেই মাটির ভাঁড়ের রক্ত থেকে জাত সীতাদেবী উঠে এলেন হালের ফলায়। দেশে অনাবৃষ্টি দূর হল।

এই ধরণের বহু বিচিত্র কথা বিভিন্ন লোক রামায়ণে পাওয়া যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী
আদরা, পুরুলিয়া

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট,
ডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট,

WB/NC-120
Vol. VIII No. 6 Sraman October 1980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

জৈন ভবন

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮৭ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

গণেশ লালওয়ানী

মহেনজোদাড়োর প্রাপ্ত মুদ্রা নম্বর ৪২০

ঋষভদেব কী সিন্ধুসভ্যতার আরাধ্য দেবতা

শ্রীজ্ঞানস্বরূপ গুপ্তা

মহেনজোদাড়ো ও হড়প্পা বিশ্বের সব চাইতে প্রাচীন নগর, সব চাইতে প্রাচীন সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার আদি কেন্দ্র। খৃষ্ট জন্মের ৩000 হাজার বছর পূর্বে এদুটী নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই দুটী নগরের অধিবাসীদের সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনৈতিক রূপ কি ছিল তা আজও রহস্যাবৃত যদিও পুরাতত্ত্ববেত্তাদের প্রয়াসে এখান হতে প্রায় আড়াই হাজার মাটির তৈরী আগুনে পোড়ানো মুদ্রা পাওয়া গেছে যার ওপর বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরণের দৃশ্য ও ছবি আঁকা রয়েছে। এই সব মুদ্রা হতে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ধার্মিক চিহ্ন ওঁ, স্বস্তিক, নবগ্রহ ও সেই চিহ্ন যা দশেরা বা দীপাবলীতে সমস্ত উত্তর ভারতে আটা বা গোবরে তৈরী করে পূজা করা হয় ও যাকে অযোধ্যার প্রতীক বলা হয়, বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

এতদসত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা এই সভ্যতাকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতার মূল আধার বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না কারণ এই সমস্ত মুদ্রায় অঙ্কিত চিহ্ন বা দৃশ্য পরস্পর সম্বন্ধান্বিত বলে মনে হয়নি। তাঁদের ধারণা এই সভ্যতা কোন স্বতন্ত্র সভ্যতা যা খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকে বাহিরাগত আর্যজাতি বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু এখন এমন কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে এই সমস্ত মুদ্রাচিহ্নের পুনরধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত মুদ্রায় অঙ্কিত চিত্র গুলির অনেক গুলিতে ভগবান বিষ্ণুর অবতার ও জৈনধর্মের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের জীবন সম্পর্কিত অনেক ঘটনা যেমন ঋষভদেবের চিত্র, ঋষভদেবের কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির পর উপদেশ সভা বা সমবসরণের চিত্র, ঋষভপুত্র সম্রাট ভরতের বাল্যকালের চিত্র প্রভৃতি অঙ্কিত রয়েছে। ঋষভ জীবনের সঙ্গে এদের মিলিয়ে দেখলে এই সভ্যতার রহস্য যেমন উদ্ঘাটিত হয় তেমনি তা ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগের ওপর আলোকপাত করে।

ঋষভদেবের চিত্র – ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এতদিন এই ধারণা ছিল যে বৈদিক যুগের হিংসার প্রতিবাদে দয়া প্রেরিত হয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। তাই এই দুই ধর্ম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর চাইতে প্রাচীন নয় ধরে নিয়ে তাঁরা সিন্ধুসভ্যতার আরাধ্য দেবতাকে শিব বা রুদ্র বলে ধরে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই মুদ্রা গুলিতে অন্য কোন চিত্র শিব বা রুদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত পাওয়া যায়নি বা এই সূত্রে অন্য চিত্রকে গ্রথিত করা সম্ভব হয়নি। এখন যে তথ্য আমাদের সম্মুখে আসছে যাতে উপরোক্ত মুদ্রাও

রয়েছে, তাতে বলা যায় যে ঋষভদেব বা তাঁর আরাধনাই প্রাচীন ভারতের ধর্ম ছিল। সেই ধর্ম খৃষ্টপূর্ব শতকে এসে মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধের অনুযায়ীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর তা বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। সেই ধর্মের স্থান বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে যার পূজ্য দেবতা হচ্ছেন বামনাবতার অদি'তির পুত্র ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, জন ভাষায় যাঁকে বিক্রমাদিত্য বলা হয়। এভাবে ধর্মের ক্রমিকতা স্বীকার করলে জৈন ধর্ম প্রাচীন হয়ে যায় যার মূল সিদ্ধান্ত সিন্ধুঘাঁটি সভ্যতার উৎকীর্ণিত মুদ্রায় এক সূত্রে গ্রথিত দেখা যায়।

সিন্ধুঘাঁটি সভ্যতার ক্ষেত্র হতে বার করা মুদ্রার মধ্যে মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত মুদ্রা নম্বর ৪২০ (Mackey : Further Excavation at Mohenjodaro) এই রহস্যের চাবিকাঠি। তাই এই মুদ্রাকেই ভিত্তি করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই মুদ্রায় এক দিব্য পুরুষের আকৃতি অঙ্কিত যাঁর মাথায় কোন বস্ত্র বা কবচ রয়েছে। তা তালপত্রও হতে পারে। দেখলে পরে এঁর মুখ কিছু বিচিত্র বলে মনে হয়। স্যর জন মার্শালের (যিনি হড়প্পা ও মহেনজোদাড়োর উৎখণন কার্য পরিচালনা করেন) মতে এই পুরুষের তিনটি মুখ রয়েছে। কেদারনাথ শাস্ত্রী (যিনি হড়প্পার উৎক্ষণক ছিলেন) বলেন যে এই মুখ কোন পশু মুখ, সম্ভবতঃ মহিষের। দেখতে তা পশুমুখ বলেই মনে হয় তবে মহিষের না হয়ে তা বৃষেরও হতে পারে। এই পুরুষকে যে আসনে বসানো হয়েছে তার তিনটি বা চারটি পায়া। এই আসনের নীচে দুটো হরিণ সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পেছনে ঘুরে দেখছে। এ ভাবে অঙ্কিত এই মূর্তির একদিকে গণ্ডার ও মহিষ ও অন্যদিকে হাতী ও শার্দূল ও এক মানুষের প্রতিকাত্মক চিত্রন। এই পুরুষকে স্যর জন মার্শাল পশুপতিনাথ বা শিব বলে অভিহিত করেছেন। কেদার নাথ শাস্ত্রীর মতে ইনি শিব না হয়ে বেদবর্ণিত রুদ্র।

এই মূর্তি বা এই সভ্যতার প্রাণ তাকে জানবার জন্য তার আলোচনার আবারো প্রয়োজন। প্রথমে এই মূর্তির শিঙ-এর মত মুকুট দেখা যাক। ৪২০ নং মুদ্রায় যে মুকুট দেখা যাচ্ছে সেই মুকুটের সঙ্গে অন্যান্য মুদ্রায় অঙ্কিত মুকুটের যদি তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে এই মুকুট অপূর্ণ। মহেনজোদাড়োয় পাওয়া মুদ্রা নম্বর ৩০এ এই মুকুটের পূর্ণরূপ দেখা যায়। সেখানে এই ত্রিশূলকার মুকুটের নীচে এক পুষ্পাকৃতি বস্তু মূর্তির বাঁদিকে বা দর্শকের ডান দিকে ঝুলতে দেখা যায়। যদি আমরা এই মুকুটকে স্বতন্ত্র করে নেই তবে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যাবে। কারণ বার করার পর একে যদি ৯০ ডিগ্রী কোন বাঁ দিকে মুড়ে দেওয়া যায় তবে হিন্দুদের সব চাইতে পবিত্র ওঁ চিহ্ন পাওয়া যাবে। হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সমস্ত ধার্মিক চিহ্নই সিন্ধুঘাঁটি সভ্যতায় আমরা পাই। তাই একে ওঁ বলে স্বীকার করায় কোনরূপ বৈমনস্য হওয়া

উচিত নয়। ওঁ রূপ প্রতীক কে মস্তকে ধারণ করার জন্যই এই ব্যক্তি দিব্য পুরুষ। ইনি কে তা ভালো ভাবে বোঝবার জন্য পৌরাণিক কথা অধ্যয়ন করে তার সাহায্য আমাদের নেওয়া উচিত। আমাদের পৌরাণিক গাথায় ওঁ এর সঙ্গে সম্পর্ক বিষ্ণুর সঙ্গে শিব বা বুদ্ধের সঙ্গে নয়। তাই বলা যায় যে এই পুরুষই কালান্তরে বিষ্ণুর অবতার বলে মান্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে ষোল মানবাতারে যিনি ঋষি ও যাঁর সঙ্গে বৃষর সম্পর্ক রয়েছে এরূপ দুজন মাত্র ব্যক্তি দেখা যায়। এক সঙ্কর্ষণ বলরাম, দ্বিতীয় ঋষভ। বলরামের চিহ্ন হল ও ঋষভের বৃষ। তাই এখন নিশ্চিত করতে হবে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনি কে? দুজনেই প্রাচীন পৌরাণিক ব্যক্তি। যদি আমরা এই মুদ্রাকে ভালো ভাবে দেখি তবে দেখব এই ব্যক্তির নীচে এক জোড়া হরিণ অঙ্কিত রয়েছে। যদি গৌতম বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায় তবে সেখানেও দেখা যাবে তাঁর মূর্তির তলায় যুগ্ম হরিণ রয়েছে। জৈনদের ২৪ জন তীর্থংকর হয়েছেন ও তাঁদের সমস্ত মূর্তির নীচেই যুগ্ম হরিণ এক বিশিষ্ট প্রতীক। দিগম্বর থাকা ও সমস্ত জীবের প্রতি দয়া ও মিত্রতা জৈনধর্মের মূল আধার। তাই এই মূর্তি ঋষভদেবের যিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ও জৈনদের প্রথম তীর্থংকর হওয়াই সম্ভব। অপর দিকে এই ব্যক্তি উর্দ্ধাঙ্গে এমন এক বস্ত্র পরিধান করে রয়েছেন যা তালপত্র। তালপত্র বলরামের প্রতীক যার জন্য তাঁকে তালধ্বজ বলা হয়। এর অতিরিক্ত মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত একটী সীলে এধরণে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে যাঁর আসনের নীচে যুগ্ম হরিণ ও ওঁ এর মুকুট রয়েছে ও দুদিকে হাঁটু গেড়ে বসা দুই ব্যক্তি তাঁকে দুটো প্রতীক উপহার দিচ্ছে। ওদের পেছনে দুই সর্প ফণা বিস্তারিত করে রয়েছে। বলরামকে শেষ নাগের অবতার বলা হয়। ওই দুই ব্যক্তি বাস্তবে যদি সর্প হয় তবে এঁকে বলরামের অবতার বলতে হয়। পৌরাণিক কথানুসারে সর্প যদি কারু মাথায় ফণা ধরে থাকে তবে তাকে রাজাও বলা যেতে পারে। তাই এই দুই ব্যক্তি যদি রাজা হন তবে এঁরা হড়প্পা ও মহেনজোদাড়োর তৎকালীন রাজা যাঁরা কোন ধার্মিক আচার্যকে নমস্কার করছেন। আবার এমনো মুদ্রা আছে যার একদিকে এক বিচিত্র প্রতীক অঙ্কিত রয়েছে অন্যদিকে এক ব্যক্তি এক হাঁটু গেড়ে বসে বৃক্ষকে প্রতীক উৎসর্গ করছে। এই বিচিত্র প্রতীক সেই ধরণের যে ধরণের প্রতীক আজোও সমস্ত উত্তর ভারতে বিজয়া দশমী বা দীপাবলীর দিন আটা বা গোবর দিয়ে তৈরী করে পূজা করা হয়। এই প্রতীক অযোধ্যার এর সমর্থন অথর্ব বেদেও পাওয়া যায়। অপরদিকে যে ধরণের প্রতীক হাঁটু গেড়ে বসা লোকটি বৃক্ষকে উৎসর্গ করছে তা সেই ধরণের প্রতীক যা পূর্বোক্ত মুদ্রায় দিব্য পুরুষকে উৎসর্গ করতে দেখানো হয়েছে। একই ধরণের প্রতীক দিব্য পুরুষ ও বৃক্ষকে উৎসর্গ করার বিশেষ তাৎপর্য আছে।

এতে এই প্রমাণিত হয় যে এই বৃক্ষটি উক্ত দিব্য পুরুষেরও প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রায় আমরা যে এই ধরণের বৃক্ষ দেখি তা এই দিব্য পুরুষের দিকে যে ইঙ্গিত করে সে কথা আমরা বলতে পারি।

ঋষভদেবের নির্বাণ অযোধ্যায়[১] —সেই দিব্য পুরুষের আসনের তলায় যে ধরণের যুগ্ম হরিণ দেখা যায় ঠিক সেই ধরণের যুগ্ম হরিণ সেই বৃক্ষের দুই দিকে দেখা যায়। এতে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত আরো পরিপুষ্ট হয়। এই সব মুদ্রার সঙ্গে সেই দিব্য পুরুষের সম্পর্ক থাকায় একথা আরো বলা যায় যে সেই দিব্য পুরুষ অযোধ্যার সঙ্গে সম্বন্ধিত। পৌরাণিক কথায় আমরা দেখেছি যে ঋষভের নির্বাণ অযোধ্যায় হয়েছিল এবং এও আমরা দেখেছি যে মহাপুরুষের প্রতীক রূপ বৃক্ষের নির্দেশ চিরকাল হতে হয়ে এসেছে। এও আমরা জানি গৌতম বুদ্ধের প্রতীক রূপে বোধি বৃক্ষ অঙ্কিত হয়ে গোড়ার দিকে পূজিত হত। মূর্তি অনেক পরে তৈরী হতে আরম্ভ হয়। তাই বলা যায় যে সেই দিব্যপুরুষ বলরাম না হয়ে ঋষভ দেবই।

জৈন সমবসরণের সংকেত—মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত মুদ্রা নং ১৩-র তিন দিক আছে। এক দিকে বৃক্ষ রয়েছে যার দুদিকে হরিণ। এতে বলা যায় এই বৃক্ষটি সেই দিব্যপুরুষের প্রতীক। দ্বিতীয় দিকে একশিঙা, হাতী ও গণ্ডারের মিছিল যা সেই দিব্য বৃক্ষের দিকে যাচ্ছে। তৃতীয় দিকে এক বৃক্ষে যার মগ ডালে এক ব্যক্তি বসে রয়েছে। তার নীচে এক বাঘ পেছনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য অধিক মুদ্রায় পাওয়া যায়। মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত মুদ্রা নম্বর ১৪-র ও তিন দিক রয়েছে। এক দিকে বৃক্ষ রয়েছে যার দুদিকে যুগ্ম হরিণ ও একটা তিন মাথার এক পশু। অন্য দুদিকে দশটি পশুর শোভাযাত্রা। এই শোভা যাত্রায় দুটো মকর রয়েছে যারা তাদের মুখে এক একটি মাছ নিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মাছ মাটিতে চলতে পারে না বলে মকর তাদের নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত ৪৮৮ মুদ্রায় চার পশু তিন মকর ও তিন পশুর শোভাযাত্রা দেখানো হয়েছে। মকর মাছ মুখে নিয়ে যাচ্ছে ও মাছেরাও পরম নিশ্চিন্ততায় যাচ্ছে। এই তিন মুদ্রায় পশুদের শোভাযাত্রা সেই দিব্য পুরুষের দিকে শ্রদ্ধা ভরে যাচ্ছে। এর কি অর্থ হতে পারে? এতে মনে হয় দিব্য পুরুষের জীবনের এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত যাতে সমস্ত জীব এমন কি পশুপক্ষী সম্মিলিত হয়েছে। তাই বলা যায় এখানে তারা সেই দিব্য পুরুষকে দেখতে ও তাঁর বাণী শুনতে যাচ্ছে। হিন্দু পৌরাণিক কথায় এমন কোন উল্লেখ নেই যেখানে পশুপক্ষীও দিব্য পুরুষের কাছে গিয়েছিল কিন্তু জৈন কথায় তার

১ লেখক অযোধ্যাকে ঋষভদেবের নির্বাণস্থল বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু জৈন মান্যতা অনুসারে তাঁর জন্মস্থান অযোধ্যা, নির্বাণ ভূমি অষ্টাপদ বা কৈলাস। —সম্পাদক

উল্লেখ আছে। ঋষভ, যিনি প্রথম তীর্থংকর, তিনি যখন কেবল জ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁর উপদেশ শোনার জন্য এক বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। জৈন মান্যতায় এই সভার নাম সমবসরণ যেখানে তীর্যক প্রাণী সহ দেব মানব তাঁর উপদেশ শুনতে গিয়েছিল। হয়ত সেই সমবসরণের চিত্র এই মুদ্রায় প্রদর্শিত করা হয়েছে। এ যদি সত্য হয় তবে সেই দিব্য পুরুষ ঋষভদেব ও সিন্ধুঘাটীর সভ্যতা জৈন সভ্যতা।

ঋষভ পুত্র সম্রাট ভরত—হড়প্পায় প্রাপ্ত মুদ্রা নম্বর ৩০৮-এ এক ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে যার দুদিকে বাঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত চার মুদ্রায় পাওয়া যায়। হিন্দু পুরাণে বাল্যকাল হতেই ভরতের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তবে সে ভরত শকুন্তলার পুত্র। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যিনি চক্রবর্তী সম্রাট হন তিনি ঋষভের পুত্র ভরত। তাই মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর খৃষ্ট পূর্ব শতাব্দীতে জৈন ধর্ম যখন বিলুপ্ত প্রায় ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রারম্ভ তখন ভরতের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক জনমানসে অঙ্কিত থাকায় যেজন্য জন মানস হতে জৈন রাজাদের ইতিবৃত্ত মুছে দিতে হবে সেজন্য শকুন্তলার পুত্র ভরতের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হয়। তাই আমাদের বলতে হয় এই মুদ্রা গুলিতে যাকে দেখানো হয়েছে তিনি ঋষভ পুত্র ভরত।

অন্য চিত্র—কিছু অন্য মুদ্রায় অন্য ধরণের চিত্র পাওয়া যায় যার অর্থ ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। দিব্য পুরুষের প্রতীক বৃক্ষের সব চাইতে নীচের শাখায় এক মানুষ বসে রয়েছে যার নীচে এক বাঘ পেছনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত মুদ্রা ৩৫৭ ও ৫২২ ও হড়প্পায় প্রাপ্ত মুদ্রা নং ২৪৮ ও ৩০৮-এ পাওয়া যায়। অন্য মুদ্রায় এই দৃশ্য অন্য দৃশ্যের সঙ্গে পাওয়া যায় যেমন মহেন-জোদাড়োর ১,১৩, ২০ ও হড়প্পার প্রাপ্ত মুদ্রা নং ৩০৩। এক দিব্য পুরুষ ওম-আকৃতি মুকুট পরে পিপল গাছের মাটি হতে বেরুনো দুই শাখার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর সামনে অন্য এক দিব্য পুরুষ ওম-রূপী মুকুট পরে বসে রয়েছে ও তাঁর পূজো করছে এবং সেই বসে থাকা লোকটির সামনে বা পেছনে এক অদ্ভুত জানোয়ার দেখানো হয়েছে যার শরীর ভিন্ন ভিন্ন জানোয়ারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে তৈরী। এর সঙ্গে কোন মুদ্রায় সাতটী মানুষ, কোন মুদ্রায় পাঁচটি দেখানো হয়েছে। কোন মুদ্রায় আবার একটীও দেখানো হয়নি। এই দৃশ্য মহেনজোদাড়োয় প্রাপ্ত মুদ্রা নং ৩১৬ ও ৩১০-এ পাওয়া যায়। এঁরা মনে হয় যুগ্ম দিব্য পুরুষ যেমন পৌরাণিক কথায় পাওয়া যায়। যথা নর নারায়ণ, কৃষ্ণ বলরাম বা ঋষভ ও ভরত। ঋষভের জীবন কালেই ভরত সম্রাট হন। অন্য এক দৃশ্য যা অধিক মুদ্রায় পাওয়া গেছে সে এক পশুর যার বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন পশুর অঙ্গের দ্বারা নির্মিত কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রায়

অঙ্গ গুলি ভিন্ন ভিন্ন। মনে হয় এর দ্বারা একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে সমস্ত জীবে একই আত্মা বিরাজ করে যা জৈন ধর্মের মুখ্য বক্তব্য।

সিন্ধুঘাটি সভ্যতা কি জৈন সভ্যতা ?—এভাবে আমরা দেখছি সিন্ধুঘাটি সভ্যতা যা আজ হতে ৫০০০ বছর পূর্বে পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়েছিল অথচ যে সভ্যতাকে আজ পর্যন্ত আমরা বুঝে উঠতে পারিনি সেই সভ্যতাকে যদি ভারতীয় সংস্কৃতির আধার রূপে দেখা যায় ত তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা এও দেখছি ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম জৈন ধর্ম এই সভ্যতায় বিকসিত ও পল্লবিত হয় যার পরিচয় এর মুদ্রায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনদের ২৪ সংখ্যক তীর্থংকর মহাবীর স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। যদি দুই তীর্থংকরের মধ্যের ব্যবধান ১৫০ বছর ধরা হয় তবে ঋষভদেবের কাল খৃষ্ট পূর্ব ৪০০০ বছর। এবং সেইটিই সিন্ধুঘাটি সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল। এতে এই কথা সমর্থিত হয় যে ঋষভদেবই সিন্ধুঘাটি সভ্যতার দিব্য পুরুষ ও তাঁর জীবন গাথাই এই মুদ্রা গুলিতে চিত্রিত। যে সব দৃশ্য বুঝতে পারছিনা তা তাঁর জীবনের বা তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত অন্য ব্যক্তির জীবনের যার কথা আমরা ভুলে গেছি। এতে এও স্পষ্ট হয় যে সিন্ধুঘাটি সভ্যতার ধর্ম জৈন ধর্ম ছিল। এবং এই কারণেই যখন খৃষ্ট পূর্ব ৫৬ অব্দে বৈষ্ণব ধর্ম নবীন ভারতের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হল তখন ঋষভদেবকে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

মহাবীর-বাণী

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৭ ॥
অপরিগ্রহ সূত্র

৬৭। প্রাণীমাত্রের সংরক্ষক জ্ঞাতপুত্র (ভগবান মহাবীর) বস্ত্রাদি স্থূল পদার্থকে পরিগ্রহ বলেন নাই। বাস্তবিক পরিগ্রহ তিনি পদার্থের প্রতি মমত্বকেই বলিয়াছেন।

৬৮। পূর্ণ সংযমীর ধন, ধান্য, ভৃত্য আদি সমস্ত প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিতে হয়। সমস্ত পাপ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বথা মমত্বহীন হওয়া আরও দুষ্কর।

৬৯। যে সংযমী জ্ঞাতপুত্রের বাক্যে রত তিনি বিট, সৈন্ধবাদি লবণ, তেল, ঘী, গুড় আদি কোন বস্তুই সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করেন না।

৭০। পরিগ্রহহীন মুনি যে বস্ত্র, পাত্র, কম্বল, ও রজোহরণ আদি বস্তু নিজের কাছে রাখেন তাহা সংযম রক্ষার জন্য ও সেই জন্যেই তাহাদের ব্যবহার করেন। (ইহাদের প্রতি তাঁহার একটু ও মমত্ব নাই।)

৭১। জ্ঞানী পুরুষ সংযম-সাধক উপকরণ গ্রহণ বা রক্ষার সময় তাহাদের প্রতি কোন প্রকার মমত্ব রাখেন না। অন্যত দূর, নিজেদের শরীরের প্রতিও তাঁহাদের মমত্ব নাই।

৭২। সংগ্রহ করায় অন্তরস্থিত লোভই প্রকাশিত হয়। অতএব আমি মনে করি যে সাধু মর্যাদা বিরুদ্ধ কোন কিছু সংগ্রহ করার যে বাসনা করে সে সাধু নয়, গৃহস্থ।

॥ ৮ ॥
অরাত্রি ভোজন সূত্র

৭৩। সূর্য উদয় হইবার পূর্বে ও সূর্য অস্ত যাইবার পরে নিগ্রন্থ মুনির সমস্ত প্রকার ভোজন পানাদির মনে মনেও ইচ্ছা করা উচিত নহে।

৭৪। সংসারে অনেক প্রকার ত্রস ও স্থাবর জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে— তাহাদের রাত্রে দেখা যায় না। তাই রাত্রি ভোজন কি করিয়া করা যাইতে পারে?

৭৫। মাটিতে কোথাও জল পড়িয়া থাকে কোথাও বীজ, কোথাও বা কীট পতঙ্গাদি। দিনের বেলায় তাহাদের দেখিয়া বাঁচানো যাইতে পারে কিন্তু রাত্রি বেলা তাহাদের বাঁচাইয়া কি করিয়া আহার করা সম্ভব ?

৭৬। এই রূপে সর্ব প্রকার দোষ দেখিয়াই জ্ঞাতপুত্র বলিয়াছেন, নির্গ্রন্থ মুনি রাত্রিবেলা কোনও প্রকার ভোজন করিবে না।

৭৭। অন্ন আদি চার প্রকারের আহারই রাত্রি বেলা করা উচিত নহে। শুধু তাহাই নহে, পরদিনের জন্য রাত্রিবেলা খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখা নিষিদ্ধ। অরাত্রি ভোজন বাস্তবেই দুষ্কর।

৭৮। হিংসা, মিথ্যা, চুরি, মৈথুন, পরিগ্রহ ও রাত্রি ভোজন হইতে যে জীব বিরত থাকে সে অনাস্রব হয়। (আত্মায় পাপ কর্ম প্রবেশের দ্বারকে আস্রব বলে, তাহার অভাব অনাস্রব।)

॥ ৯ ॥

বিনয় সূত্র

৭৯। বৃক্ষের মূল হইতে সর্বপ্রথম স্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে শাখা, শাখা হইতে অন্য ছোট ছোট প্রশাখা বাহির হয়। ছোট ছোট প্রশাখা হইতে পাতা ও তাহার পর ক্রমশঃ ফুল, ফল ও রস উৎপন্ন হয়।

৮০। এই প্রকার ধর্মের মূল বিনয়, মোক্ষ তাহার অন্তিম রস। বিনয়ের দ্বারা মনুষ্য অতিশীঘ্র শাস্ত্রজ্ঞান ও কীর্তি লাভ করে। পরিশেষে ইহার দ্বারা নিশ্রেয়স (মোক্ষ)ও প্রাপ্ত হয়।

৮১। অভিমান ক্রোধ, প্রমাদ, কুষ্ঠাদি ব্যাধি ও আলস্য—এই পাঁচটি কারণে মনুষ্য প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে না।

৮২-৮৩। নিম্ন লিখিত আটটি কারণে মানুষকে শিক্ষাশীল বলা যায়—যদি সে সর্বদা পরিহাসশীল না হয়; সর্বদা ইন্দ্রিয় নিগ্রহী না হয়, অন্যের মর্ম ভেদী বাক্য প্রয়োগ না করে, সুশীল হয়, দুরাচারী না হয় রস লোলুপ না হয়, সত্যে রত থাকে, ক্রোধী না হয়, ও শান্ত হয়।

৮৪। যে গুরুর আজ্ঞা পালন করে, তাঁহার নিকটে থাকে, তাঁহার আকার ও ইঙ্গিত জানে সেই শিষ্যকে বিনীত বলা হয়।

৮৫-৮৮। নিম্নলিখিত পনেরটী কারণে বুদ্ধিমান মানুষকে সুবিনীত বলা হয়—যে উদ্ধত নয়, নম্র, চপল নয় স্থির, মায়াবী নয় সরল, কৌতুহলী নয় গম্ভীর, যে কাহাকেও তিরস্কার করে না, যে ক্রোধ অধিক সময় পর্যন্ত পোষণ করে না, শীঘ্র শান্ত হইয়া যায়, নিজের প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার কারীর প্রতি

পূর্ণ সদ্ভাব রক্ষা করে, যে শাস্ত্রোধ্যয়নের গর্ব করে না, যে অন্যের দোষ প্রদর্শন করে না, মিত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না, অপ্রিয় মিত্রেরও যে অজ্ঞাতে উপকারই করে, যে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ করে না, যে বুদ্ধিমান, অভিজাত অর্থাৎ কুলীন, লজ্জাশীল ও একাগ্র।

৮৯। যে গুরুর আজ্ঞা পালন করে না, তাঁহার নিকটে থাকে না, যে তাঁহার সহিত শত্রুবৎ আচরণ করে, ও যে বিবেকশূন্য তাহাকে অবিনীত বলা হয়।

৯০-৯২। যে বার বার ক্রোধ করে, যাহার ক্রোধ শীঘ্র শান্ত হয় না, যে মিত্রবৎ আচরণ কারীকেও তিরস্কার করে, যে শাস্ত্র অধ্যয়নের গর্ব করে, যে কেবল অন্যের দোষই প্রদর্শন করে, যে নিজের মিত্রদের উপর ক্রুদ্ধ হয়, যে নিজের প্রিয়তম মিত্রের অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করে, যে বাচাল হয়, যে প্রিয়জনের প্রতিও দ্রোহ করে, যে অহঙ্কারী হয়, লোভী হয়, যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে না যে সকলের অপ্রিয় সে অবিনীত।

৯৩। শিষ্যের উচিত যে-গুরুর নিকট সে ধর্ম শিক্ষা লাভ করে তাঁহার সর্বদা বিনয় ও ভক্তি করা, অঞ্জলিবদ্ধ হাত মস্তকে রাখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, যে প্রকারেই হউক না কেন সেই প্রকারের কায় মনোবাক্যে সর্বদা তাঁহার সেবা করা।

৯৪। যে শিষ্য অভিমান বশতঃ বা ক্রোধ, মদ বা প্রমাদ বশতঃ গুরুর বিনয় (ভক্তি) করে না সে পতিত হয়। বাঁশের ফল যেমন তাহার বিলোপের কারণ হয় সেই রূপ অবিনীতের জ্ঞানবলও তাহার বিনাশের কারণ হয়।

৯৫। অবিনীত বিপত্তি প্রাপ্ত হয় ও বিনীত সম্পত্তি—যে এই দুইটী বাক্য ভালভাবে জানিয়া লয় সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

[ক্রমশঃ

শীলাবতী

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

শীলাবতী শিলাময় প্রান্তর পেরিয়ে
এসেছ কি সন্ন্যাসিনী হয়ে ?
দিগন্তের সীমা হারিয়ে
স্মৃতির হীরকচূর্ণ লয়ে—
আরো দূরে মায়াময় গিরিময় দেশে
অশ্রু তব নীরব প্রণামে
কেবলীর স্বপ্ন নিয়ে অর্হৎ-এর ধ্যান স্পর্শে এসে
মরু বলে সুপ্তি আনে নিশীথের যামে ।
মধুগতি শীলাবতী শিলাময়ী নয়
শীলের রত্নসম লহরের কণা,
এখানে হৃদয় দৃপ্ত জীবনের জয়
কেবলীর অনন্ত ভাবনা ।

শীলাবতী ভবন
ঘাটাল, মেদিনীপুর ।
৫।১০।৮০

বসুদেব হিণ্ডী

[পূর্বানুবৃত্তি]

সে তখন সুমিত্রকে প্রণাম করে বলল, দেব, ললিতশ্রী আপনার অতিথিকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সে কথা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন ও হবন শেষ হলে নিজেই আমাকে ললিতশ্রীর গৃহে নিয়ে গেলেন।

সুমিত্র যেমন ললিতশ্রীর বর্ণনা করেছিলেন, তাকে ঠিক তেমনি দেখলাম। সে ও তার মা আমাদের সাদরে গ্রহণ করল।

দেখতে দেখতে আর আর গণিকারা সেখানে এসে উপস্থিত হল। ললিতশ্রীর মনোভাব জানতে পেরে তারা ললিত শ্রী ও আমাকে দিয়ে স্নানাদি ও মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়ে শয়ন গৃহে পাঠিয়ে দিল। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় তপস্বী সুমিত্র সেখান হতে বিদায় নিলেন। আর আমি সেইখানে অবস্থান করে ললিতশ্রীর সঙ্গে যৌবন সুখ উপভোগ করতে লাগলাম।

কথা প্রসঙ্গে ললিতশ্রীকে যখন আমার পরিচয় দিলাম সে তখন আমার আরও অনুগত হয়ে পড়ল।

একবার আমি ললিতশ্রীকে কিছু না বলে বিদেশ যাত্রা করলাম ও কোশল দেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

সেখানে এক দেবতা অদৃশ্য থেকে আমায় বললেন, বৎস বসুদেব, আমি রোহিনীকে তোমাকে দান করেছি তাই তাকে দেখে তুমি তুর্য বাদন করবে।

আমি সম্মত হলাম। আমি রিষ্টপুরে উপনীত হলাম। সেখানে যন্ত্র বাদকেরা রাজন্যদের মনোরঞ্জন করছিল। আমি যন্ত্রবাদনকারীদের মধ্যে বসে পড়লাম।

সেখানে ঘোষণা করা হল—কাল সকালে রুধির রাজার কন্যা রোহিনীর স্বয়ম্বর হবে। রাজন্যরা যেন সেখানে উপস্থিত থাকেন।

পরদিন সকালে সূর্যোদয় হলে পদ্মবন যখন প্রস্ফুটিত হল তখন রাজন্যরা একে একে গিয়ে স্বয়ম্বর সভা অলঙ্কৃত করলেন। আমিও যন্ত্র বাদকদের সঙ্গে তুর্য নিয়ে সভায় উপস্থিত হলাম ও একটী আসন অধিকার করে নিলাম।

যথা সময়ে রাজকন্যা রোহিনী পুরললনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হল। তাকে সাক্ষাৎ রতির মত মনে হচ্ছিল।

ভাট তাকে রাজাদের পরিচয় দিতে লাগল। ইনি জরাসন্ধ পুত্রসহ বসে

রয়েছেন। ইনি কংস, উনি পাণ্ডু, উনি দামঘোষ, উনি দন্তবক্র, ঐখানে দ্রুপদ, শল্য, সোমগ, সঞ্জয়, চন্দ্রাভ বসে রয়েছেন। ঐ দিকে পুণ্ড্র, কাবিল, পদ্মরথ, শ্রীদেব। এঁরা সকলেই উচ্চ কুলোৎপন্ন, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও রূপবান।

রোহিনী শুনল। যদিও সমস্ত রাজাদের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তার দৃষ্টি কারু উপর নিবদ্ধ হল না। সেই সময় তুর্যধ্বনি করে আমি তাকে জাগিয়ে দিলাম। মেঘ গর্জন শুনে ময়ূরী যেমন আনন্দিত হয় সেও সেই রকম আনন্দিত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল ও আমার গলায় বরমাল্য অর্পণ করল।

তাই দেখে রাজন্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল : ও কার গলায় মালা দিল ? কে যেন প্রত্যুত্তর দিল : তুর্য বাদকের গলায়।

তা শুনে রাজা দন্তবক্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ও রোহিনীর পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ রুধির, আপনার পরিজনের উপর যদি আপনার অধিকার না থাকে তবে এখানে উচ্চকুলজাত পৃথিবীপতি রাজন্যদের আপনি কেন আমন্ত্রিত করলেন ?

রুধির প্রত্যুত্তর দিলেন—কন্যা যখন স্বয়ম্বরা হয় তখন তার মনোনুকূল পতি নির্বাচনের অধিকার হয়। এর জন্য আমি দায়ী নই। তাছাড়া সে যখন এখন অন্যের পত্নী হয়েছে তখন উচ্চকুলজাত আপনারা এখন কেন চিন্তা করছেন ?

দন্তবক্র বললেন, যদিও আপনি আপনার কন্যাকে স্বয়ম্বরা করেছেন তার অর্থ এই নয় যে আপনি বর্ণ ধর্ম অতিক্রম করবেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্য হতেই ওকে কাউকে বরণ করতে হবে।

আমি তখন বলে উঠলাম—বক্রের মত আপনি কি বক বক করছেন। অধ্যয়ন ও কলাভিজ্ঞতা কি ক্ষত্রিয়ের জন্য নিষিদ্ধ ? আমার হাতে তুর্য দেখেই কি আপনি ধরে নিলেন আমি ক্ষত্রিয় নই ?

দামঘোষ বললেন, যার কুলশীল আমাদের অজ্ঞাত তাকে এই কন্যা দেওয়া যেতে পারে না। ওর কাছে হতে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে আর কাউকে দেওয়া হোক।

বিদুর তখন বাধা দিয়ে বললেন, এভাবে কথা বলা উচিত নয় ; ওকে ওর কুলের কথা জিজ্ঞাসা করা হোক।

আমি তখন বললাম, আলোচনায় আমার কুল নির্ণিত হবে না। বাহু বলে তার নির্ণয় হোক।

আমার সে কথা শুনে জরাসন্ধ বললেন, ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। রুধির ও তার পুত্র হিরণ্যনাভকে আক্রমণ কর।

রুধির তখন পুত্র, কন্যা ও আমাকে নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। তারপর সৈন্য সজ্জিত করে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

অরিঞ্জয় পুরের বিদ্যাধররাজ দধিমুখ সেই সময় আমার সাহায্যার্থে সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি রথে আরোহণ করলে তিনি আমার সারথ্য গ্রহণ করলেন।

নগরের বাইরে ততক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সেই যুদ্ধে রুধির ও তাঁর পুত্র হিরণ্যনাভ ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা পরাজিত হলেন।

আমাকে তখন একা যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে দেখে ক্ষত্রিয় রাজারা বলতে আরম্ভ করলেন—ও নিজেকে এত পরাক্রমশালী মনে করছে যে একা যুদ্ধ করতে আসছে।

রাজা পাণ্ডু তখন বললেন, আমাদের উচিত হয় না ওকে একাকে আমরা সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করি।

জরাসন্ধ তখন বললেন আমাদের এক এক জন ওর সঙ্গে যুদ্ধ করব। যে জয়ী হবে সে রোহিনীকে পাবে।

সেই মত শত্রুঞ্জয়, দন্তবক্র, কালামুখ আদি একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। একে একে আমি তাদের সকলকে পরাজিত করলাম। তখন তারা আমার অগ্রজ সমুদ্রবিজয়কে যুদ্ধ করতে বললেন। সমুদ্রবিজয় তখন আমার ওপর শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আমি তাঁর শর নিবারিত করতে লাগলাম কিন্তু তাঁকে আক্রমণ করলাম না। দেখলাম তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আরো তীব্র ভাবে আমায় আক্রমণ করতে লাগলেন। আমি তখন এক শরের অগ্রভাগে আমার নাম লিখে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিলাম। তিনি আমার নাম পাঠ করে অস্ত্রত্যাগ করলেন।

আমি তখন রথ হতে নেমে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। তিনিও তাঁর রথ হতে নেমে আমায় আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন। ক্ষত্রিয়রা যখন জানতে পারলেন যে আমি দশার্হদের একজন তখন সকলে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। সকলে আমায় সম্বর্দ্ধিত করতে লাগলেন। রাজা রুধিরও সে কথা জানতে পেরে সেখানে এলেন। ক্ষত্রিয়রা তখন তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করে বললেন যে আপনি ভাগ্যবান যে হরিবংশোদ্ভূত বসুদেবকে জামাতারূপে লাভ করেছেন।

সমস্ত ক্ষত্রিয়রাই তখন বধূর জন্য উপহারাদি প্রেরণ করলেন।

বিবাহোৎসব সম্পন্ন হলে ক্ষত্রিয়রা একে একে নিজেদের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি রোহিনীর সঙ্গে সেইখানে বাস করতে লাগলাম।

এক বছর পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুধিরের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। বধূ সহ আমরা বসুদেবকে স্বরাজ্যে ফিরে পেতে ইচ্ছা করি। আমায় বলে পাঠালেন, তোমার ভ্রমণ এবার শেষ কর। স্বরাজ্যে ফিরে এসো। তোমার বিবাহিত পত্নীরাই বা কেন পিতৃগৃহে বাস করবে? তুমি আর আমাদের পরিত্যাগ করে যেও না।

আমিও বলে পাঠালাম, আপনি যেমন আদেশ করবেন সেইরূপই করব। আমার মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে আপনাদের যে পীড়া দিয়েছি তা যেন আপনারা ক্ষমা করেন।

কিন্তু রুধির তখন তখুনি আমায় যেতে দিলেন না। তিনি আরো কিছুকাল পরে বিদায় দেবেন বললেন।

একদিন আমি রোহিনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রিয়ে, সমস্ত ক্ষত্রিয়দের অমান্য করে তুমি কেন আমার গলায় বরমাল্য দিয়েছিলে ?

রোহিনী বলল, আমি এক বিদ্যাদেবীর আরাধনা করতাম। স্বয়ম্বরের সময় আমি তাঁকে নিবেদন করি—সৌন্দর্যের দিকেই সাধারণতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বংশ ও চরিত্র নিরূপণ করা যায় না। তাই এমন কিছু বলুন যাতে আমি প্রতারিত না হই।

দেবী বললেন, দশম দশার্হ বসুদেবের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে। তোমার স্বয়ম্বর সভায় সে তূর্য বাদকের রূপে আসবে।

এর কিছুদিন পর রোহিনী চারটী মহাস্বপ্ন দেখল। সে আমায় তার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করল।

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, প্রিয়ে, তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ তার ফলে মহাপ্রভাবশালী পুত্র তুমি জন্ম দেবে।

নয়মাস পর রোহিনী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল যার গায়ের রঙ ছিল শঙ্খ, কুন্দ বা চাঁদের মত শুভ্র। বুকে ছিল শ্রীবৎস চিহ্ন। পরিজনদের সম্মতিতে তার নাম রাখলাম রাম।

একদিন রাত্রে আমি যখন শুয়ে ছিলাম তখন সহসা কার আহ্বানে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই দেখি আমার সামনে এক দেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাঁর নিকটে যেতে তিনি বললেন, আমি বালচন্দ্রার পিতামহী। বৎস, বেগবতী বিদ্যা সিদ্ধ করেছে। বালচন্দ্রা তোমায় প্রণাম জানাচ্ছে। সে তোমার দর্শনা-কাঙ্ক্ষিনী।

তাঁর হাতে প্রমাণপত্র ছিল। আমি তা দেখে তাঁকে বললাম তবে আমায় সেখানে নিয়ে চলুন।

তিনি মুহূর্তে আমায় বৈতাঢ্য পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গগননন্দন নগরে আমি বালচন্দ্রা ও বেগবতীকে দেখতে পেলাম। তারা আমায় দেখে আনন্দিত হল। বালচন্দ্রাকে বালচন্দ্রের মতই অপরূপ দেখাচ্ছিল।

তারপর বেগবতী ও ধনবতীর সম্মতিতে রাজা চণ্ডাভ ও রাণী মিনকা

বালচন্দ্রাকে আমায় দান করলেন। বিবাহে প্রচুর উপঢৌকন ও যৌতুক পেলাম।

বিবাহের পর একদিন আমি বালচন্দ্রা ও বেগবতীকে বললাম যে আমার অগ্রজেরা আমায় বলেছেন যে আমি যেন আর অন্তর্ধান না করি, তাঁদের সঙ্গে একত্রে বাস করি। আর যতদিন আমি জীবিত আছ ততদিন আমার পত্নীরা যেন পিতৃগৃহে না থাকে। তাই আমাদের এখন সৌরীপুরে যাওয়া উচিত।

সে কথা শুনে তারা আনন্দিত হল। বলল, প্রিয়, তুমি যদি তাই স্থির করে থাক তবে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে? আমাদের সপত্নীরা যারা বিদ্যাধর লোকে পিতৃগৃহে বাস করছে তারা এখানে এসে মিলিত হোক। তারা এখানে এলে আমরা সৌরীপুর যাত্রা করব।

আমি তখন পত্র লিখে রাণী ধনবতীর হাতে দিলাম। এর কিছুদিন পর একে একে শ্যামলী, নীলযশা, মদনবেগা ও প্রভাবতী সানুচর সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা এলে বালচন্দ্রা নির্মিত বিমানে আমরা সৌরীপুর যাত্রা করলাম।

আমার অগ্রজ সমুদ্রবিজয় সাদরে আমাদের গ্রহণ করলেন। তাঁর নির্দিষ্ট প্রাসাদে আমরা প্রবেশ করলাম। তারপর তাঁর আদেশ নিয়ে আমি শ্যামা, বিজয়সেনা, গন্ধর্বদত্তা, সোমশ্রী, ধনশ্রী, কপিলা, পোমা অশ্বসেনা, পৌণ্ড্রা, রক্তবতী, প্রিয়ঙ্গুসুন্দরী, সোমশ্রী, বন্ধুমতী, প্রিয়দর্শনা, কেতুমতী, বন্ধুমিত্রা, সত্যরক্ষিতা, পদ্মাবতী, পদ্মশ্রী, ললিতশ্রী ও রোহিনীকে সেখানে আনিয়ে নিলাম। তারপর সমস্ত পুত্র কলত্রাদি নিয়ে আমি সুখে সেখানে বাস করতে লাগলাম।

সমাপ্ত

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

সংভিন্নমতির কথা শুনে স্বয়ংবুদ্ধ বললেন, সেই নাস্তিকদের ধিক্ যারা নিজেকে এবং অন্যকে অন্ধ যেমন তার অনুযায়ী ব্যক্তিদের কূপে নিক্ষেপ করে সেই রকম এভাবে আকর্ষিত করে দুর্গতিতে নিক্ষেপ করে। যে প্রকারে সুখদুঃখ স্বসংবেদনে জানা যায়, সেই প্রকার আত্মাও স্বসংবেদনে জ্ঞাতব্য। স্বসংবেদনে কোথাও বাধা নেই তাই আত্মার নিষেধ কারু পক্ষে করা সম্ভব নয়। 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' এরূপ অবাধিত প্রতীতি আত্মা ভিন্ন আর কারু হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ জ্ঞানে স্বশরীরে আত্মা যখন সিদ্ধ হয় তখন অনুমানে অন্যের শরীরেই আত্মা থাকা সিদ্ধ হয়। যে প্রাণী মরে সে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে তাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে চেতনার পরলোকও আছে। যে ভাবে চেতনা বাল্য হতে যৌবন প্রাপ্ত হয়, যৌবন হতে বার্দ্ধক্য সেইরূপ চেতনা এক জন্ম হতে অন্য জন্মও প্রাপ্ত হয়। পূর্ব জন্মের স্মৃতি ছাড়া সদ্যজাত শিশু শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়ে কি ভাবে মাতৃস্তন্য পান করতে পারে? এই জগতে যেরূপ কারণ সেরূপ কার্য দেখা যায়। তা হলে অচেতন ভূত (পৃথ্বী, অপ্, তেজ ও বায়ু) হতে চেতনা কি ভাবে উৎপন্ন হতে পারে? হে সংভিন্নমতি, বল, চেতনা প্রত্যেক ভূত হতে উৎপন্ন হয়, না তাদের সমবায়ে? যদি একথা বল যে প্রত্যেক ভূত হতে চেতনার উদ্ভব হয় তবে যে কটি ভূত আছে ততটি চেতনা হওয়া উচিত। আর যদি বল যে সমস্ত ভূতের সমবায়ে চেতনার উদ্ভব হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব যুক্ত ভূত হতে একস্বভাব সম্পন্ন চেতনা কি ভাবে উৎপন্ন হয়? এসমস্তই বিচারণীয়। পৃথ্বী রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ গুণযুক্ত। জল রূপ স্পর্শ ও রস গুণ যুক্ত; তেজ রূপ ও স্পর্শ গুণ যুক্ত; বায়ু কেবল স্পর্শগুণ যুক্ত। এভাবে ভূতের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব সকলের পরিজ্ঞাত। যদি তুমি বল জল হতে ভিন্নগুণ যুক্ত মুক্তো যেমন উৎপন্ন হয় সেরূপ অচেতন ভূত হতে চেতনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এরূপ বলা ঠিক নয়। কারণ মুক্তোয় জল থাকে। দ্বিতীয়তঃ মুক্তো ও জল দুইই পৌদ্গলিক। পুদ্গল হতে উৎপন্ন তাই তাদের মধ্যে পার্থক্য নেই। তুমি গুড়, ময়দা ও জল হতে উৎপন্ন মাদক শক্তির উদাহরণ দিয়েছ কিন্তু সেই মাদক শক্তিও অচেতন। তাই চেতনায় সেই দৃষ্টান্ত দেওয়া কি করে সম্ভব? দেহ ও আত্মা এক একথা কোনো সময়েই বলা যায় না। এক প্রস্তর খণ্ড লোকে পূজো করে অন্য প্রস্তর খণ্ডে মূত্রত্যাগ এদৃষ্টান্তও অসত্য। কারণ প্রস্তর

অচেতন। এজন্য তার সুখ দুঃখাদির অনুভব কি ভাবে হতে পারে? তাই এই শরীর হতে ভিন্ন পরলোকগামী আত্মা আছে ও ধর্ম অধর্মও আছে। (কারণ পরলোকগামী আত্মাই ইহ জন্মের ভালমন্দ ফল নিয়ে যায় ও সেখানে তা ভোগ করে।) যে ভাবে আগুনের উত্তাপে মাখন গলে যায় সেরূপে স্ত্রীলোকের বশীভূত হওয়ায় পুরুষের বিবেক বিনষ্ট হয়। অনর্গল ও অধিক রসযুক্ত আহার গ্রহণে মানুষ পশুর মত উন্মত্ত হয়ে উচিত কার্য বিস্মৃত হয়। চন্দন অগরু কস্তুরী ও জাফ্রানের সুগন্ধে কামদেব সর্পের মত মনুষ্যকে আক্রমণ করেন। যেমন কাঁটায় কাপড় আটকে গেলে মানুষের গতি রুদ্ধ হয় সেরূপ রমণীরূপে আটকে গেলে পুরুষের গতি স্খলিত হয়। যেরূপ ধূর্তব্যক্তির মিত্রতা অল্প সময়ের জন্য সুখদায়ক হয় সেইরূপ মোহ উৎপন্নকারী সংগীতও বার বার শ্রবণ করলে তা দুঃখের কারণ হয়। এজন্য হে প্রভু! পাপের মিত্র, ধর্মের বিরোধী নরকের দ্বার প্রশস্তকারী বিষয়কে দূর হতেই পরিত্যাগ করুন। একজন সেব্য ত একজন সেবক, একজন দাতা ত একজন যাচক, একজন আরোহী ত একজন বাহন, একজন অভয়দাতা ত একজন অভয় যাচক—এতেই ইহলোকে ধর্ম ও অধর্মের ফল পরিদৃষ্ট হয়। এসমস্ত দেখেও যে স্বীকার করে না তার মঙ্গল হোক। আর আমি কি বলতে পারি? রাজন্, আপনার অসত্য বচনের মত দুঃখদায়ী অধর্ম পরিত্যাগ করে সত্য বচনের মত সুখের অদ্বিতীয় কারণ রূপ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

এই সমস্ত কথা শুনে শতমতি নামক মন্ত্রী বললেন, প্রতি মুহূর্তে ভঙ্গুর পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা নেই। বস্তুতে স্থিরতা বিষয়ক যে বুদ্ধি-তা বাসনারই পরিণাম। তাই পূর্ব ও অপর মুহূর্তের বাসনারূপ একতা বাস্তবিক, মুহূর্তের একতা বাস্তবিক নয়।

তখন স্বয়ংবুদ্ধ বললেন, কোন বস্তুই অন্বয় বা পরম্পরা রহিত নয়। যেমন গাভী হতে দুধ পাবার জন্য তাকে জল ঘাস খাওয়াবার কল্পনা করা হয়, সেই রূপ আকাশ-কুসুমের মত বা কচ্ছপের মত ইহ সংসারে অন্বয় রহিত কোন বস্তুই হয় না। এজন্য ক্ষণ ভঙ্গুরতার কথা বলা বৃথা। যদি বস্তু ক্ষণভঙ্গুর হয় ত সন্তান পরম্পরাকেও ক্ষণ ভঙ্গুরই বলতে হয়। যদি সন্তানের নিত্যতা স্বীকার করি তবে অন্য পদার্থকে ক্ষণিক কিভাবে বলতে পারি? যদি সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক বলি তবে গচ্ছিত ধন পুনরায় চাওয়া, যা ঘটে গেছে তাকে স্মরণ করা, অভিজ্ঞান (চিহ্ন) তৈরী করা কি করে সম্ভব হয়? জন্মের পর মুহূর্তেই জাতক যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তবে তার পর মুহূর্তে তাকে মাতা পিতার সন্তান বলা যাবে না বা বালক মাতা পিতাকে মাতা পিতা বলবে না। তাই সমস্ত বস্তুকে ক্ষণ ভঙ্গুর বলা অসংগত। বিবাহের মুহূর্তে এক পুরুষ ও নারীকে পতি পত্নী বলা হয়। তারা যদি ক্ষণ নাশবান হয় তবে পর মুহূর্তে পতি পতি

থাকে না, বা পক্ষী পক্ষী থাকে না। এভাবে বস্তুকে ক্ষণভঙ্গুর বলা মহা মূঢ়তা। এক মুহূর্তে যে কুকর্ম করে অন্য মুহূর্তে সে ভিন্ন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাই সে তার ফল ভোগ করে না, অন্য ব্যক্তি সেই ফল ভোগ করে। যদি এরূপ হয় তবে কৃতের নাশ ও অকৃতের আগমন এরূপ দুটি দোষ উৎপন্ন হয়।

তখন মহামতি মন্ত্রী বললেন, এ সমস্তই মায়া। তত্বতঃ এসব কিছুই নেই। যে সমস্ত বস্তু আমরা দেখছি তা স্বপ্ন বা মৃগতৃষ্ণার মত মিথ্যা। গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র, ধর্ম অধর্ম, আপন পর এ সমস্ত ব্যবহার মাত্র ; তত্বতঃ এরা কিছুই নয়। এক শৃগাল এক টুকরো মাংস নিয়ে নদী তীরে এসেছিল। সে জলে মাছ ভাসতে দেখল। সে তখন মাংসখণ্ড ফেলে দিয়ে সেই মাছ ধরতে গেল। মাছ গভীর জলে পালিয়ে গেল। সে তখন সেই মাংসের টুকরো তুলতে গেল। সে দেখল সেই মাংসের টুকরোটি চিলে নিয়ে গেছে। এভাবে যে প্রাপ্ত বৈষয়িক সুখ পরিত্যাগ করে পরলোকের সুখের পেছনে দৌড়য় সে ইতঃ নষ্ট ততঃ ভ্রষ্ট হয়ে আত্মাকেই প্রবঞ্চিত করে। ধর্মধ্বজীদের মন্দ উপদেশ শুনে লোকে নরকের ভয়ে ভীত হয় ও মোহ গ্রস্ত হয়ে ব্রতাদি পালন করে শরীরকে কষ্ট দেয়। নরক গমনের ভয়ে ওদের তপস্যা সেই রকম হয়—যেমন লাবক পক্ষী মাটীতে পড়ে যাবে বলে এক পায়ে নৃত্য করে।

স্বয়ংবুদ্ধ তখন বললেন, যদি বস্তু সত্য না হয় তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের কর্তা কি ভাবে বলা যায়? যদি সমস্ত মায়া হয় তবে স্বপ্নে প্রাপ্ত হাতী (প্রত্যক্ষের মত) কেন ব্যবহারে আসে না? যদি তুমি পদার্থের কার্যকারণতাকে অস্বীকার কর তবে বজ্র পতনে কেন ভয় পাও? যদি কিছুরি অস্তিত্ব না থাকে তবে তুমি আমি— বাচ্য বাচক এই ভেদই থাকে না ও ব্যবহার প্রবর্তক ইষ্ট প্রাপ্তি কি করে সম্ভব? হে রাজন্, বিতণ্ডাবাদে পণ্ডিত, শুভপরিণামবিমুখ ও বিষয়কামী ব্যক্তিদের দ্বারা ভ্রমিত হবেন না। বিবেকের দ্বারা বিচার করে বিষয় দূর হতেই পরিত্যাগ করুন ও ইহলোক ও পরলোকে সুখ দান কারী ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন।

এভাবে মন্ত্রীদের পৃথক পৃথক মতবাদ শুনে স্বাভাবিক নির্মলতার জন্য কান্তি সম্পন্ন মহারাজ মহাবল বললেন, হে বুদ্ধিমান স্বয়ংবুদ্ধ তুমি খুব ভালো কথা বলেছ। তুমি ধর্মের আশ্রয় নিতে বলেছ তা উচিতই। আমিও ধর্মদ্বেষী নই। কিন্তু যেমন যুদ্ধেই মন্ত্রাস্ত্র গ্রহণ করা হয় তেমনি সময় হলেই ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। অনেক দিন পর আগত মিত্রের মত যৌবনকে যথোচিত উপভোগ না করে কে উপেক্ষা করে? তুমি যে ধর্মের উপদেশ দিলে তা অসাময়িক। যখন মধুর বীণা বাদিত হয় তখন বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ শোভা দেয় না। ধর্মের ফল পরলোক। সে সন্দেহাস্পদ। এজন্য তুমি ইহলোকের সুখভোগে কেন নিষেধ করছ?

মহারাজ মহাবলের কথা শুনে স্বয়ংবুদ্ধ যুক্ত করে বললেন, মহারাজ, আবশ্যক

ধর্মের ফলে কখনো শঙ্কা করা উচিত নয়। আপনার কি মনে আছে বাল্যকালে একদিন যখন আমরা নন্দন বনে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে এক কান্তিসম্পন্ন দেবতার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। সেই দেবতা প্রসন্ন হয়ে আপনাকে বলে ছিলেন, আমি তোমার পিতামহ। আমার নাম অতিবল। আমি ভীত হয়ে অসৎ বন্ধুর মত বিষয় সুখে বিরক্ত হই ও রাজ্য তৃণবৎ পরিত্যাগ করে রত্নত্রয় গ্রহণ করি। অন্তিম সময়েও ব্রতরূপী প্রাসাদের কলশরূপী ত্যাগ ভাব স্বীকার করে সেই শরীর পরিত্যাগ করি। তার জন্য আমি লান্তকাধিপতি দেবতা হই। এজন্য তুমিও এই অসার সংসারে প্রমাদী হয়ে থাকবে না। এই কথা বলে, তিনি বিদ্যুতের মত স্বীয় প্রভায় আকাশ আলোকিত করে প্রস্থান করলেন। এজন্য হে রাজন্, আপনি আপনার পিতামহের কথা বিশ্বাস করে পরলোক আছে তা স্বীকার করুন। কারণ যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণই রয়েছে সেখানে অন্য প্রমাণের আবশ্যকতাই বা কি?

মহাবল বললেন, তুমি আমায় পিতামহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তা খুব ভালো করেছ। এখন আমি ধর্ম অধর্ম যার কারণ সেই পরলোক স্বীকার করছি।

রাজার আস্তিক্য যুক্ত বাক্য শুনে মিথ্যা দৃষ্টি মানবের বাণীরূপ রজের জন্য জলদ-রূপ স্বয়ংবুদ্ধ অবসর পেয়ে বললেন, মহারাজ, অনেক আগে আপনার বংশে কুরুচন্দ্র নামে এক রাজা হন। তাঁর কুরুমতি নামে স্ত্রী ও হরিশ্চন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ক্রূর প্রকৃতির ছিলেন ও সর্বদা বড় বড় আরম্ভ সমারম্ভ করতেন। তিনি অনার্য কার্যের নেতা, দুরাচারী, ভয়ংকর ও যমরাজের মত নির্দয় ছিলেন। তিনি অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন কারণ পূর্ব জন্মে উপার্জিত ধর্মের ফল অদ্বিতীয় হয়। শেষে তিনি অত্যন্ত দূষিত ধাতু রোগে আক্রান্ত হন। সেই সময় তুলোর নরম তোষকও তাঁর কাছে কাঁটার মত মনে হত। মধুর স্বাদযুক্ত খাবার নীমের মত তিক্ত ও কটু লাগত। চন্দন অগরু কস্তূরী আদি সুগন্ধি বস্তু ও দুর্গন্ধ যুক্ত লাগত। স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়জন শত্রুর মত এবং সুন্দর মধুর গান গর্দভ, উট বা শিয়ালের চীৎকারের মত প্রতিভাত হত। বলাই হয়—

যখন পুণ্যের নাশ হয় তখন সমস্ত বস্তু বিপরীত ধর্মী হয়ে যায়।

কুরুমতি ও হরিশ্চন্দ্র গোপনে পরিণামে দুঃখদায়ী কিন্তু অল্পসময়ের জন্যও সুখকর নানাবিধ বিষয়োপচারে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। পরিশেষে কুরু-চন্দ্রের শরীরে এরূপ জ্বালা উৎপন্ন হল যেন অঙ্গারই তাঁকে দগ্ধ করছে। এভাবে দুঃখে পীড়িত হয়ে রৌদ্র ধ্যানে তিনি অবশেষে ইহলোক পরিত্যাগ করলেন।

কুরুচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র পিতার অগ্নিসংস্কারাদি করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আচরণে তিনি সদাচার রূপ পথের পথিক ছিলেন। তিনি বিধিবৎ

ভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। পাপের জন্য পিতার দুঃখদায়ী মৃত্যু দেখে তিনি ধর্মের সেবা করতে লাগলেন। গ্রহের মধ্যে যেমন সূর্য মুখ্য সেরূপ সমস্ত পুরুষার্থে ধর্মই মুখ্য।

সুবুদ্ধি নামে এক জিনোপাসক তাঁর বাল্য মিত্র ছিল। হরিশ্চন্দ্র তাকে বললেন তুমি তত্বজ্ঞের নিকট ধর্মের অবধারণ করে আমায় ধর্ম শোনাবে। সুবুদ্ধিও তদনুরূপ তাঁকে ধর্ম কথা শোনাতে লাগলেন। বলাই হয় মনোনুকূল আদর্শ সৎপুরুষের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। পাপ ভয়ে ভীত হরিশ্চন্দ্র রোগ ভয়ে ভীত মানুষ যেমন ওষুধে শ্রদ্ধা রাখে সেরূপ সুবুদ্ধি কথিত ধর্মে শ্রদ্ধা রাখতে লাগলেন।

একবার সেই নগরোদ্যানে শীলন্ধর নামক এক মহামুনি কেবল জ্ঞান লাভ করলেন। তাঁকে বন্দনা করবার জন্য দেবতাদের আগমন হল। সে কথা সুবুদ্ধি হরিশ্চন্দ্রকে বললেন। নির্মল অন্তঃকরণ হরিশ্চন্দ্র সে কথা শুনে ঘোড়ায় করে মুনির নিকটে গেলেন ও মুনিকে বন্দনা করে তাঁর সামনে বসলেন। মুনি কুমতিরূপ অন্ধকার দূর করবার জন্যে চন্দ্রিকা তুল্য ধর্মোপদেশ দিলেন। উপদেশ অন্তে হরিশ্চন্দ্র করযোড়ে মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মন্, মৃত্যুর পর আমার পিতা কোন গতি লাভ করেছেন ?

ত্রিকালদর্শী মুনি বললেন, হে রাজন্, আপনার পিতা সপ্তম নরকে গমন করেছেন, তাঁর মত লোকের আর কোথাও স্থান হতে পারে না।

সে কথা শুনে হরিশ্চন্দ্রের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হল। তিনি মুনিকে বন্দনা করে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে সুবুদ্ধিকে বললেন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। তুমি আমাকে যেমন ধর্মকথা শোনাতে একেও তেমনি শোনাতে থাকবে।

সুবুদ্ধি বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আমার পুত্র তোমার পুত্রকে ধর্ম কথা শোনাবে।

এভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও সুবুদ্ধি কর্মরূপ পর্বতকে বিনষ্টকারী বজ্ররূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন ও দীর্ঘদিন মুনিধর্ম পালন করে মোক্ষ লাভ করলেন।

স্বয়ংবুদ্ধ আবার বললেন, দেব, আপনার বংশে দণ্ডক নামে অন্য এক রাজা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি শত্রুর নিকট যমরাজতুল্য ছিলেন। তাঁর মণিমালী নামে এক পুত্র ছিল। মণিমালী সূর্যের মত তেজস্বী ছিলেন। দণ্ডক পুত্র মিত্র স্ত্রী ধনরত্ন সুবর্ণ আদিতে আসক্তি পরায়ণ ছিলেন এবং এদের তিনি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশী ভাল বাসতেন। আয়ুশেষে আর্তধ্যানে তাঁর মৃত্যু হয় ও সে জন্য অজগর যোনি প্রাপ্ত হয়ে নিজের কোষাগারে উৎপন্ন হন ও সেই খানেই বাস করতে থাকেন। সেই সর্বভক্ষী ও ক্রুর অজগর যে কেউ সেই কোষাগারে প্রবেশ

করত তাকে গিলে ফেলত। একবার সেই অজগর মণিমালীকে সেই কোষাগারে প্রবেশ করতে দেখল। পূর্বজন্মজ্ঞানে সে যখন জানতে পারল যে মণিমালী তার পুত্র তখন সে এত শান্ত হয়ে গেল যে স্নেহ যেন মূর্তিমান হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তাই দেখে মণিমালী বুঝতে পারলেন যে এই অজগর তাঁর পূর্বজন্মের কোন আত্মীয় বা বন্ধু। মণিমালী কোন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন সেই অজগর তাঁর পিতা। তিনি তখন সেই অজগরকে জিনধর্মের উপদেশ দিলেন। অজগরও সেই ধর্ম গ্রহণ করে ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করল ও শুভধ্যানে মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে দেবতারূপে উৎপন্ন হল। সেই দেবতা এসে মণিমালীকে এক দিব্য মুক্তোমালা উপহার দিলেন। সেই মালা আপনি গলায় ধারণ করে আছেন। আপনি হরিশ্চন্দ্রের বংশধর। আমি সুবুদ্ধির বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। এজন্য আপনার ও আমার সম্বন্ধ বংশ পরম্পরা-গত। আমি তাই নিবেদন করছি যে আপনি ধর্ম সংলগ্ন হন। অসময়ে আমি ধর্মাচরণের কথা কেন বলেছি তারও কারণ আছে। আজ নন্দন বনে আমি দুজন চারণ মুনিকে দেখি। তাঁরা দুজন জগৎ-প্রকাশক ও মহামোহরূপী ঘনান্ধকার বিনষ্ট-কারী চন্দ্রসূর্যের মত প্রতিভাত হচ্ছিলেন। অপূর্ব জ্ঞানসম্পন্ন তাঁরা দুজন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। সেই সময় আমি তাঁদের আপনার আয়ু কত জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা বলেন যে আপনার আয়ু এখন মাত্র একমাস অবশেষ রয়েছে। সে জন্য হে রাজন্, আমি আপনাকে শীঘ্র ধর্মকার্যে সংলগ্ন হবার অনুরোধ করছি।

মহাবল বললেন, হে স্বয়ংবুদ্ধ, হে বুদ্ধির সমুদ্র, আমার একমাত্র বন্ধু ত তুমিই। তুমিই আমার হিত চিন্তায় সর্বদা তৎপর রয়েছ। বিষয়াসক্ত ও মোহনিদ্রায় নিদ্রিত আমাকে তুমি জাগ্রত করে খুব ভাল কাজ করেছ। এখন আমায় বল আমি কি ভাবে ধর্মের সাধনা করি? আয়ু কম। এত অল্প সময়ে আমি কতটুকু ধর্মারাধনা করতে সক্ষম হব? আগুন লাগলে পর কূয়ো খনন করে আগুন নির্বাপিত করা কি ভাবে সম্ভব?

স্বয়ংবুদ্ধ বললেন, মহারাজ, পরিতাপ করবেন না। দৃঢ় হন। আপনি পরলোকের মিত্ররূপ যতি ধর্মের আশ্রয় নিন। একদিন যতি ধর্ম পালনকারী মোক্ষপ্রাপ্ত হতে পারে, স্বর্গের ত কথাই কি?

মহাবল দীক্ষা গ্রহণ করবেন স্থির করে নিজের পুত্রকে এভাবে সিংহাসনে বসালেন যেন মন্দিরে প্রতিমা স্থাপিত করলেন। দীন ও অনাথদের অনুকম্পা বশে তিনি এত দান দিলেন যে সেই নগরে একজনও দীন ও অনাথ রইল না। দ্বিতীয় ইন্দ্রের মত তিনি সমস্ত চৈত্যে বিচিত্র বস্ত্রাদি, মাণিক্য, স্বর্ণ ও পুষ্পে অর্হৎদের পূজা করলেন। তারপর স্বজন ও পরিজনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তিনি মুনিদের নিকট মোক্ষকামীর সখীরূপ দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সমস্ত রকম দোষ পরিহার করে সেই রাজর্ষি চতুর্বিধ আহারও

পরিত্যাগ করলেন। তিনি সমাধিরূপ অমৃত নির্ঝরে সর্বদা লীন হয়ে কমলিনী খণ্ডের মত একটুও ম্লান হলেন না। সেই মহাসত্ববান এরূপ অক্ষীণকান্তি হতে লাগলেন যে মনে হল তিনি উৎকৃষ্ট আহারাদি গ্রহণ করছেন। বাইশ দিন অনশনের পর পঞ্চ-পরমেষ্ঠি স্মরণ করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

সঞ্চিত পুণ্যবলে ধনশ্রেষ্ঠীর জীব সেই মুহূর্তেই দুর্লভ ঈশান কল্পে (দ্বিতীয় স্বর্গলোকে) অশ্বের সমান বেগে গিয়ে পৌঁছুল ও সেখানে শ্রীপ্রভ নামক বিমানে শয়ন সম্পুটে মেঘে যেমন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেরূপ ভাবে উৎপন্ন হল। সেখানে দিব্য আকৃতি, সমচতস্র সংস্থান, সপ্তধাতু রহিত শরীর, শিরীষ পুষ্পের মত কোমলতা, দিক সমূহের অন্তর্ভাগকে দেদীপ্যমান করার মত কান্তি, বজ্রের সমান কায়া, অদম্য উৎসাহ, সমস্ত রকম পুণ্য লক্ষণ, ইচ্ছানুরূপ রূপ, অবধিজ্ঞান, সমস্ত বিজ্ঞানে পারংগতত্তা, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির প্রাপ্তি, নির্দোষতা ও বৈভব এরূপ সমস্ত গুণ সহিত ললিতাংগ নামে সার্থক নামা দেবতা হলেন। তিনি পায়ে রত্নের মঞ্জীর, কোমরে কটিভূষণ, হাতে কংকণ, ভুজায় ভুজবন্ধ, বক্ষদেশে হার, গলায় গ্রৈবেয়ক, কানে কুণ্ডল, মাথায় পুষ্পমালা ও মুকুটাদি ভূষণ, দিব্য বস্ত্র ও সমস্ত অঙ্গের ভূষণরূপ যৌবন উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হলেন। সেই সময় প্রতিধ্বনিতে দিক সূমহকে নিনাদিত কারী দুন্দুভি বাদিত হল ও মঙ্গল পাঠক ভাট বলে উঠল, হে দেব জগতকে আনন্দিত করুন ও জয়ী হন। গীতবাদিত্রের ধ্বনিতে বন্দীজনের (চারণদের) কোলাহলে মুখরিত সেই বিমান মনে হচ্ছিল নিজের স্বামীকে প্রাপ্ত হবার আনন্দে যেন গর্জন করছে। ললিতাংগদেব এ ভাবে উঠে বসলেন যেন প্রসুপ্ত মানুষ ঘুম ভাঙ্গলে উঠে বসে। মঙ্গল পাঠকের উপরোক্ত উক্তি শুনে তিনি ভাবতে লাগলেন, একি ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন না মায়া? এসব কি? এই নৃত্য গীত আমার জন্য কেন হচ্ছে? এই বিনীত লোকগুলি আমাকে প্রভু বলার জন্য কেন আতুর? আর এই লক্ষ্মীর মন্দির রূপ, আনন্দের আলয় রূপ, বাসযোগ্য, প্রিয় ও রমনীয় ভবনে আমি কোথা হতে এলাম?

এই সব ভাব যখন তাঁর মনে উদিত হচ্ছিল সেই সময় প্রতিহারী তাঁর নিকটে এল ও যুক্ত করে বলল, দেব, আপনার সমান প্রভু পেয়ে আমরা সনাথ হয়েছি, ধন্য হয়েছি। আপনি বিনয়ী সেবকদের ওপর কৃপা দৃষ্টিতে অমৃত বর্ষণ করুন। এটি ইশান নামক দ্বিতীয় দেব লোক, অচঞ্চলা লক্ষ্মীর নিবাসরূপ ও সর্ব সুখের আকর। এখানে যে বিমানকে আপনি সুশোভিত করছেন তার নাম শ্রীপ্রভ। পুণ্য বলে এই স্বর্গ আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন আর এরা সকলে সামানিক দেবতা ও আপনার সভার অলঙ্কার রূপ। এঁদের সঙ্গে এই বিমানে আপনি এক হয়েও অনেক রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। হে দেব এঁদের ত্রায়স্ত্রিংসক পুরোহিত দেবতা বলা হয়। এঁরা মন্ত্রের স্থানরূপ ও আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এঁদের আপনি সময়োচিত আদেশ দিন।

আর এঁরা হলেন এই পরিষদের নর্মসচিব বা বিদূষক। আনন্দ ক্রীড়ায় প্রধান। লীলা বিলাসের গল্প করে এঁরা আপনার মনোরঞ্জন করবেন।

এঁরা আপনার শরীর রক্ষক দেবতা যাঁরা সর্বদা কবচ ও ছত্রিশ প্রকার প্রহরণ ধারণ করে প্রভুর রক্ষায় তৎপর থাকবেন।

আর এঁরা আপনার নগরের (বিমানের) রক্ষণকারী লোকপাল দেবতা।

আর এঁরা আপনার সৈন্য বাহিনীর চতুর সেনাপতিগণ।

আর এঁরা পুর বা দেশবাসী প্রকীর্ণক দেবতা যাঁরা আপনার প্রজাতুল্য। আপনার সামান্য আদেশকেও এঁরা মস্তকে ধারণ করবেন।

আর এঁরা হলেন আভিযোগ্য দেবতা যাঁরা দাসের মত আপনার সেবা করবেন।

আর এঁরা কিল্বিষক দেবতা যাঁরা আপনার মলিন কর্ম করবেন।

এইটী আপনার রত্নজড়িত প্রাসাদ, সুন্দরী রমণী পূর্ণ অঙ্গন যুক্ত ও চিত্ততোষ কারী।

এগুলি স্বর্ণ কমলের খনিরূপ বাপী সমূহ।

রত্ন ও স্বর্ণের শিখর যুক্ত এগুলি আপনার ক্রীড়া পর্বত।

আনন্দদানকারী ও নির্মল জল পূর্ণ এগুলি ক্রীড়া তটিনী।

নিত্য পুষ্প ও ফলদানকারী এগুলি ক্রীড়া উদ্যান।

আর নিজ কান্তিতে দিক-মুখকে প্রকাশিত করা সূর্য মণ্ডলের সমান স্বর্ণ ও মাণিক্য রচিত এটি আপনার সভামণ্ডপ।

আর এই বারাঙ্গনারা চামর, পাখা ও দর্পণ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এঁরা আপনার সেবাকেই মহামহোৎসব বলে মনে করে।

আর চার প্রকার বাদ্যে প্রবীণ এই গন্ধর্ব কুল আপনাকে সংগীত শোনাবার জন্য এখানে উপস্থিত।

প্রতিহারীর সেই কথা শুনে ললিতাঙ্গ দেব চেতনার উপযোগ শক্তি বলে অবধি জ্ঞানে নিজের পূর্ব জন্মের কথা এভাবে স্মরণ করতে লাগলেন যেন সে সমস্ত কাল ঘটিত হয়েছে।

আমি পূর্ব জন্মে বিদ্যাধরদের রাজা ছিলাম, আমার ধর্মবন্ধু স্বয়ংবুদ্ধ আমায় জিন ধর্মের উপদেশ দেয়। তার ফলে আমি দীক্ষা গ্রহণ করে অনশন ব্রত গ্রহণ করি। যার জন্য এই সমস্ত বৈভব আমি প্রাপ্ত হয়েছি। সত্যই ধর্মের প্রভাব অচিন্ত্য।

পূর্ব জন্মের কথা এভাবে স্মরণ করে সেই মুহূর্তেই তিনি সেখান হতে উঠে প্রতিহারীর হাতে হাত রেখে সিংহাসনে গিয়ে উপবেশন করলেন। সেই সময় চারদিকে তাঁর জয়ধ্বনি উঠল। দেবতারা তাঁর অভিষেক করল। চামর ব্যজিত হতে লাগল ও গন্ধর্বরা মধুর স্বরে মঙ্গল গীত গাইতে আরম্ভ করল।

তারপর ভক্তিপ্লুত মন নিয়ে ললিতাঙ্গ দেব সেখান হতে উঠে চৈত্যে গিয়ে শাশ্বত অর্হৎ প্রতিমার পূজো করলেন ও তিন গ্রাম ও স্বরে মধুর কণ্ঠে মঙ্গলময় গীত সহ বিবিধ স্তোত্রে জিনেন্দ্রের স্তুতি করলেন, জ্ঞানের জন্য প্রদীপ রূপ ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করলেন ও মণ্ডপের স্তম্ভে রক্ষিত অর্হতের অস্থির অর্চনা ও পূজা করলেন।

তারপর ছত্র ধারণ করায় পূর্ণিমার শশাঙ্কের মত দীপ্যমান হয়ে তিনি ক্রীড়া ভবনে প্রবেশ করলেন, সেখানে তিনি স্বয়ংপ্রভা দেবীকে দেখলেন যে নিজ প্রভায় বিদ্যুতের প্রভাকেও লজ্জিত করছিল। তার চোখ মুখ ও পা অত্যন্ত কোমল ছিল যার জন্য তাকে লাবণ্য সিন্ধু স্থিত কমল বাটিকা রূপ মনে হচ্ছিল। অনুক্রমে স্থূল বর্তুল জংঘা এরূপ মনে হচ্ছিল যেন কামদেব সেখানে নিজের মস্তক ন্যস্ত করেছেন। স্বচ্ছ দুকূলে আবৃত নিতম্বে সে এরূপ শোভা পাচ্ছিল যেমন রাজহংস পরিব্যাপ্ত তটে নদী শোভা পায়। সুপুষ্ট উন্নত স্তনভার বহন করার জন্য কৃশ উদর ও কটি বজ্রের মধ্য ভাগের মত মনে হচ্ছিল। এতে তার সৌন্দর্য আরো প্রকটিত হয়েছিল। তার তিন রেখা যুক্ত ও সুন্দর কণ্ঠ কামদেবের জয় ঘোষকারী শংখের মত প্রতীত হচ্ছিল। বিম্ব ফলকে তিরস্কারকারী ওষ্ঠে ও নেত্ররূপ কমলের মৃণালরূপ নাসিকায় তাকে অপরূপ সৌন্দর্য প্রদান করেছিল। পূর্ণিমার দ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের সমস্ত সৌন্দর্য লক্ষ্মী অপহরণ কারী তার সুন্দর স্নিগ্ধ ললাট মনকে মুগ্ধ করছিল। তার কর্ণ যুগল কামদেবের হিন্দোল লীলাকেও লজ্জিত করছিল, তার ভ্রুকুটী ছিল পুষ্পধন্বার ধনুকের শোভা অপহরণ কারী ও মুখ রূপ কমলের পেছনে গুঞ্জায়মান ভ্রমরের মত কেশ ছিল স্নিগ্ধ ও কজ্জল বর্ণ। সমস্ত অঙ্গে রত্নজড়িত ভূষণে তাকে সঞ্চরমান কাম লতার মত মনে হচ্ছিল। হাজার হাজার অপ্সরা বেষ্টিত সেই মনোহর পদ্মাননা বহু নদী বেষ্টিত গঙ্গার মত প্রতিভাত হচ্ছিল।

ললিতাঙ্গ দেবকে নিজের কাছে আসতে দেখে স্বয়ংপ্রভা স্নেহ ভরে উঠে দাঁড়াল ও তাঁর সৎকার করল। তখন শ্রীপ্রভ বিমানের অধিপতি ললিতাঙ্গদেব স্বয়ংপ্রভাকে নিয়ে পালঙ্কে উপবেশন করলেন। একই আলবালে বৃক্ষ ও লতা যেমন শোভা পায় সেরূপ উভয়ে শোভা পেতে লাগলেন। এক শৃঙ্খলে বাঁধা নিবিড় অনুরাগে উভয়ের চিত্ত উভয়ে লীন হয়ে গেল। যেখানে প্রেমের সৌরভ অবিচ্ছন্ন সেই শ্রীপ্রভ বিমানে ললিতাঙ্গদেব স্বয়ংপ্রভার সঙ্গে নর্ম ক্রীড়ায় দীর্ঘ কাল ব্যতীত করলেন যা মুহূর্তের মত ব্যতীত হয়ে গেল। তারপর বৃক্ষ হতে যেমন পাতা ঝরে পড়ে সেরূপ আয়ু পূর্ণ হওয়ায় স্বয়ংপ্রভা দেবী সেই বিমান হতে চ্যুত হয়ে অন্য গতি প্রাপ্ত হল। সত্যিই আয়ুকর্ম নিঃশেষ হয়ে গেলে ইন্দ্রও স্বর্গ হতে চ্যুত হন।

প্রিয়ার অভাবে ললিতাংগ দেব এভাবে মূর্ছিত হয়ে গেলেন যেন তিনি পর্বত হতে পতিত হয়েছেন বা বজ্রাহত হয়েছেন। খানিক পরে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল

তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তার প্রতিধ্বনিতে এরূপ মনে হল যেন সমস্ত শ্রীপ্রভ বিমানই ক্রন্দন করছে। বন-উদ্যান তাঁর মনকে শান্ত ও বাপী-তড়াগ শীতল করতে পারল না। ক্রীড়া পর্বতেও তিনি শান্তি লাভ করলেন না, না নন্দন বন তাঁকে আনন্দ দিতে পারল। হায় প্রিয়ে! হায় প্রিয়ে! তুমি কোথায়? বলে ক্রন্দন করতে করতে তিনি সমস্ত জগৎ স্বয়ংপ্রভাময় দেখতে দেখতে চারিদিকে বিচরণ করতে লাগলেন।

ওদিকে স্বয়ংবুদ্ধ মন্ত্রী মহাবলের মৃত্যুতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়ে শ্রীসিদ্ধাচার্য নামক আচার্যের কাছে দীক্ষিত হলেন। তিনি দীর্ঘ কাল অতিচারহীন মুনি ধর্ম পালন করে আয়ু শেষে ঈশান দেবলোকে ইন্দ্রের দৃঢ়ধর্মা নামক সামানিক দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

সেই উদার বুদ্ধি সম্পন্ন দৃঢ়ধর্মের মনে পূর্বভবের সম্বন্ধের জন্য ললিতাঙ্গ দেবের প্রতি বন্ধু প্রেম উৎপন্ন হল। তিনি নিজ বিমান হতে ললিতাঙ্গ দেবের নিকট এলেন ও তাঁকে ধৈর্য প্রদান করবার জন্য বললেন, হে মহাসত্ব, আপনি স্ত্রীর জন্য কেন এত ব্যাকুল হয়েছেন? ধীর ব্যক্তি নিজের মৃত্যু সময়েই এত ব্যাকুল হন না।

ললিতাঙ্গ দেব বললেন, হে বন্ধু, এ তুমি কি বলছ? নিজের প্রাণ বিয়োগের দুঃখ সহ্য করা যায় কিন্তু কান্তা বিরহের দুঃখ সহ্য করা যায় বলাও হয়েছে।

এই সংসারে এক মৃগনয়নীই সার। যার অভাবে সমস্ত বৈভবই অসার।

ললিতাঙ্গ দেবের এই প্রকার বেদনাপূর্ণ উক্তি শুনে ঈশানেন্দ্রের সামানিক দেব দৃঢ়ধর্মা দুঃখিত হলেন। তারপর অবধি জ্ঞান প্রয়োগ করে তিনি বললেন, হে মহানুভব আপনি দুঃখ করবেন না। আমি জ্ঞান বলে জ্ঞাত হয়েছি আপনার প্রিয়া এখন কোথায়। তাই ধৈর্য ধরে শ্রবণ করুন:

মর্ত্য লোকে ধাতকী খণ্ডের পূর্ব বিদেহ ক্ষেত্রে নন্দী নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে নাগিল নামে এক দরিদ্র গৃহস্থ বাস করে। পেট ভরবার জন্যে ভূতের মত সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায় তবু তার পেট ভরে না। খিদে নিয়েই সে শোয়, খিদে নিয়েই সে ওঠে। দরিদ্রের ক্ষুধার মত নাগশ্রী নামে তার এক পত্নী আছে যাকে মন্দ কপালীদের প্রমুখা বলা যায়। দাদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত তার এক এক করে ছয় কন্যা হয়। গ্রামের শূকরীদের মত তারা বহু ভোজী, কুৎসীৎ ও সকলের নিন্দার্হ ছিল। এর পরও তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হল। ঠিকইত বলা হয় প্রায়শঃ দরিদ্রের ঘরেই বহুপ্রসবা স্ত্রী দেখা যায়।

নাগিল তখন ভাবতে লাগল কোন কর্ম ফলে মনুষ্যলোকে বাস করেও আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমার জন্ম সময় হতে জাত ও যার প্রতিকার করা অসম্ভব এই দারিদ্র্য আমায় এভাবে জীর্ণ করে দিয়েছে যেমন উঁই পোকা গাছের

পুঁড়িকে জীর্ণ করে দেয়। প্রত্যক্ষ অলক্ষ্মীর মত, পূর্ব জন্মের বৈরীর মত, মূর্তিমান অশুভ লক্ষণের মত এই কন্যারা আমার দুঃখের কারণ হয়েছে। এবারো যদি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে তবে এই পরিবার পরিত্যাগ করে আমি বিদেশে গমন করব।

এই প্রকার ভাবতে ভাবতে নাগিল একদিন শুনল তার স্ত্রী আবার কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সেই কথা তার কানে সুঁচের মত বিদ্ধ হল। অধম বলদ যেমন ভার পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায় সেই রকম সে তখন নিজের পরিবার পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল। পতির বিদেশ গমনের সংবাদ প্রসব বেদনায় পীড়িতা নাগশ্রীর নিকট ঘায়ের ওপর লবণ নিক্ষেপের মত মনে হল। দুঃখিনী নাগশ্রী তাই সেই কন্যার কোনো নাম রাখল না। তাই লোকে তাকে নির্নামিকা বলে ডাকতে লাগল। নাগশ্রী তাকে ভালভাবে লালন পালন করল না, তবুও সে দিন দিন বড় হতে লাগল। ঠিকইত বলা হয়, বজ্রাহত হলেও যদি আয়ু থাকে তবে তার মৃত্যু হয় না। সেই অভাগী মায়ের দুঃখের কারণ হয়ে অন্যের ঘরে টুকিটাকি কাজ করে কোন মতে দিন ব্যতীত করতে লাগল।

একদিন সে কোন ধনীর ছেলের হাতে মোদক দেখল। সে তাই দেখে তার মায়ের কাছে মোদক চাইল। তার মা রাগে দাঁত ঘ'ষতে ঘ'ষতে বলল, তোর কি বাপ আছে যে তুই মোদক খেতে চাচ্ছিস? যদি মোদক খাবার এতই সখ তবে দড়ি নিয়ে অম্বর তিলক পাহাড়ে যা ও সেখান হতে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

মার কুণ্ডীর আগনের মত জ্বালাময়ী বাণী শুনে নির্নামিকা দড়ি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অম্বর তিলক পাহাড়ের দিকে গেল। সেই সময় সেই পর্বত শিখরে এক রাত্রি প্রতিমা ধারণকারী মুনি যুগন্ধর কেবল জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে দেবতারা তাঁর কেবল জ্ঞান উৎসব পালনের জন্য সেখানে সমবেত হলেন। সেকথা অবগত হয়ে নিকটবর্তী গ্রাম ও নগরের নরনারীরাও পর্বত শিখরে যেতে আরম্ভ করল। নানা ধরণের বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত নরনারীদের যেতে দেখে নির্নামিকা বিস্মিত হয়ে চিত্রলিখিতবৎ তাদের দিকে চেয়ে রইল। যখন সে তাদের পর্বত শিখরে যাবার কারণ অবগত হল তখন সেও দুঃখ ভারের মত মাথার কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে পর্বত শিখরে উঠে গেল। কারণ তীর্থ সকলের জন্যই সমান। মুনির চরণ কমলকে কল্পবৃক্ষ মনে করে পুলকিত চিত্তে তার বন্দন ও নমস্কার করল। ঠিকই বলা হয়—বুদ্ধি ভাগ্যের অনুরূপই হয়ে থাকে।

মহামুনি তখন গম্ভীর স্বরে লোকহিতকারী ও আনন্দকারী ধর্মোপদেশ দিলেন:

কাঁচা সুতোয় বোনা পালঙ্কে শয়নকারী মানুষ যেমন মাটিতে এসে পড়ে সেরূপ বিষয় সেবনকারী মানুষও সংসার রূপ মাটিতে এসে পড়ে। সংসারে পুত্র মিত্র ও পত্নী আদির সেই সমাগম [পান্থশালায়] এক রাত্রির জন্য মিলিত পথিকদের স্নেহ

সমাগমের মত। চৌরাসী লক্ষ জীব যোনিতে পরিভ্রমণকারী জীব যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করে তা তার নিজের কর্মানুরূপ।

তখন করজোড়ে নির্নামিকা জিজ্ঞাসা করল, হে ভগবন্, রাজা ও দরিদ্রে আপনি সমভাবাপন্ন তাই আমি জিজ্ঞেস করছি। আপনি বললেন সংসার দুঃখের ঘর কিন্তু আমার চাইতে দুঃখী কি সংসারে আর কেউ আছে?

কেবলী প্রত্যুত্তর দিলেন, হে দুঃখিনী বালিকা, তোমার এমন কি দুঃখ? তোমার চাইতে অনেক বেশী দুঃখী জীব আছে। তাদের কথা বলি শোন—যে জীব নিজের মন্দ কর্মের জন্য নরক গতি প্রাপ্ত হয় তাদের অনেকের শরীর ভেদন করা হয়, অনেকের ছেদন করা হয়, অনেকের দেহ হতে মস্তক পৃথক করা হয়। অনেক জীব পরমাধামী দেবতাদের দ্বারা ঘানীতে তিলের মত পিষ্ট হয়, অনেককে কাঠের মত তীক্ষ্ণ করাতে চেরা হয়। কাউকে লোহার বাসনের মত হাতুড়ী দিয়ে পেটানো হয়। সেই অসুরেরা অনেককে শূলের বিছানায় শোয়ায়, কাউকে পাথরের ওপর কাপড়ের মত কাঁচে, আবার অনেককে শাকের মত কুচি কুচি করে কাটে। কিন্তু তাদের শরীর বৈক্রিয় শরীর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে যুড়ে যায়। সেজন্য পরমাধামীরা পুনরায় তাদের সেই প্রকার দুঃখ দেয়। এরূপ দুঃখ ভোগ করতে করতে তারা করুণ স্বরে চীৎকার করে। সেখানে যারা জল চায় তাদের তপ্ত শিশার রস পান করতে দেওয়া হয়, যারা ছায়া চায় তাদের অসিপত্র বৃক্ষের নীচে বসানো হয়। তারা পূর্ব কর্ম স্মরণ করতে করতে এক মুহূর্তের জন্যও দুঃখ রহিত হয় না। হে বৎসে সেই নপুংসক নারকী জীবের যে দুঃখ তার বর্ণনা মানুষকে কম্পিত করে দেয়।

এ সমস্ত নারক জীবের কথাত দূর, যে সমস্ত জলচর স্থলচর, ও খেচর জীবকে সদা সর্বদা আমরা দেখতে পাই তারাও পূর্বজন্মের কর্মোদয়ে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে। জলচর জীবের মধ্যে কিছু জলচর জীবকে অন্য জলচর জীব ভক্ষণ করে, অন্যকে ধীবর জালে আবদ্ধ করে নেয়, কিছু বকের ভক্ষ্য হয়। চামড়ার জন্য মানুষ তাদের চামড়া ছাড়ায়, মাংসের জন্য ভোজন বিলাসীরা ভাজে ও চর্বির জন্য পাক করে।

স্থলচর জীবে মাংসাশী বলবান সিংহ আদি দুর্বল হরিণ আদিকে হত্যা করে, শিকারার্থীরা মাংসের জন্য অথবা কেবলমাত্র শিকারের আনন্দের জন্য তাদের বধ করে। বলদ আদি পশুরা ক্ষুধা পিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করে অনেক ভার বহন করে ও কশা অংকুশ আদির আঘাত সহ্য করে।

আকাশচারী জীবে তিতির, টিয়া, পায়রা আদি পাখীকে মাংসভোজী বাজ, গৃধ্র, সিংচান আদি পাখীরা ধরে খেয়ে নেয়, পাখীধরারা নানাপ্রকারে তাদের ধরে ও নানাভাবে নির্যাতন করে হত্যা করে। তীর্থক পাখীদের শস্ত্রাদি, জল আদিরও ভয় থাকে। পূর্বকর্মের বন্ধন এরূপ যে তার বিপাক ঠেকানো যায় না।

যে জীব মনুষ্য যোনিতে জন্ম নেয় তাদের মধ্যে অনেকে জন্ম হতেই অন্ধ, কালা, পঙ্গু, খঞ্জ, ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনেকে চুরী ও পরস্ত্রীগামী হয়ে দণ্ডিত হয় ও নারক জীবের মত দুঃখভোগ করে। অনেকে নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়ে নিজের পুত্রদের দ্বারাও উপেক্ষিত হয়। চাকর, ক্রীতদাসের মত অনেকে বিক্রীত হয়ে খচ্চরের মত স্বামী কর্তৃক দণ্ডিত ও অপমানিত হয়। অনেকে ভার বহন করে, ক্ষুৎ-পিপাসার দুঃখ সহ্য করে।

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে হেরে গিয়েও নিজের স্বামীর অধীন থাকায় দেবতারাও সর্বদা দুঃখী। স্বভাবে দারুণ ও অপার সমুদ্রে জলজন্তু যেমন অপার সেইরূপ সংসার রূপ সমুদ্রে দুঃখরূপী অপার জলজন্তু রয়েছে। ভূতপ্রেতের স্থানে যেমন মন্ত্রাক্ষর রক্ষক সেরূপ জিনোপদিষ্ট ধর্ম সংসাররূপ দুঃখ হতে আমাদের রক্ষা করে। অত্যধিক-ভারে পোত যেমন সমুদ্রে ডুবে যায়, সেরূপ হিংসারূপ ভারে জীব নরকরূপ সমুদ্রে ডুবে যায়। এজন্য কখনো হিংসা করা উচিত নয়। মিথ্যা সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ মিথ্যা ভাষণে জীব সংসারে এভাবে ভ্রমিত হয় যেমন ঘূর্ণিবাত্যায় তৃণ। চুরি করা উচিত নয়। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কখনো কোনো জিনিষ নেওয়া উচিত হয় না। কারণ চৌর্যের দ্বারা বস্তু অপহরণকারী সেইরূপ কষ্ট পায় যে প্রকার বিছুটি গাছ স্পর্শকারী মানুষ চুলকাতে চুলকাতে কষ্ট পায়। অব্রহ্মচর্য (সম্ভোগ সুখ) সর্বদা পরিহার করা কর্তব্য। কারণ যে ব্রহ্মচর্যহীন সে সেপ্রকারে নরকে যায় যে প্রকারে আরক্ষী দুষ্কৃতকারীকে নিয়ে যায়। পরিগ্রহ সঞ্চয় করাও অনুচিত। কারণ বহু ভারের জন্য বলীবর্দ যে প্রকারে কর্দমে আটকে যায় সেই প্রকারে পরিগ্রহধারী পরিগ্রহভারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। যারা হিংসাদি পাঁচ অব্রত সামান্য রূপেও পরিত্যাগ করে তারা উত্তরোত্তর কল্যাণ সম্পত্তির পাত্র হয়।

কেবলী ভগবানের মুখে উপদেশ শুনে নির্নামিকার বৈরাগ্য উৎপন্ন হল। লোহার গুটিকার মত তার কর্ম গ্রন্থী বিদ্ধ হল। সে মহামুনির নিকট হতে সম্যকত্ব সম্যকরূপে গ্রহণ করল। সর্বজ্ঞ কথিত শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করল ও পরলোকের পাথেয় রূপ পঞ্চ অণুব্রত ধারণ করল। তারপর মহামুনিকে প্রণাম করে নিজেকে কৃত কৃত্য ভেবে সে কাঠের বোঝা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। সেদিন হতে সেই বুদ্ধিমতী নির্নামিকা নিজের নামানুরূপ যুগন্ধর মুনির উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে নানা প্রকার তপ করতে আরম্ভ করল। ক্রমে সে তারুণ্য প্রাপ্ত হল কিন্তু কেউ তাকে বিবাহ করল না। যেমন কটু লাউ সেদ্ধ হলেও কেউ গ্রহণ করে না সেরূপ কেউ তাকে গ্রহণ করল না। তখন বিশেষ বৈরাগ্য ভাবে নির্নামিকা যুগন্ধর মুনির নিকট অনশন ব্রত গ্রহণ করল। হে ললিতাঙ্গদেব, তার এখন মৃত্যু আসন্ন। তুমি এখন ওর

নিকটে যাও ও তাকে দেখা দাও যাতে সে তোমাতে অনুরক্ত হয়ে মৃত্যুর পর আবার তোমার পত্নী হয়। বলাও হয়—অন্তে যেরূপ মতি হয় সেরূপ গতি হয়।

ললিতাঙ্গদেব সেইরূপই করলেন। ললিতাঙ্গ দেবে অনুরাগবতী হয়ে মৃত্যুর পর নির্নামিকা পুনরায় স্বয়ংপ্রভা হয়ে সেই বিমানে উৎপন্ন হল। প্রণয় কোপে দূরগতা স্ত্রীর পুনরায় আসার মত সেই প্রিয়াকে লাভ করে ললিতাঙ্গ দেব তার সঙ্গে আনন্দে ক্রীড়া করতে লাগলেন। কারণ আতপ ক্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ছায়া অত্যন্ত প্রিয় ও সুখদায়ী হয়।

এই প্রকার ক্রীড়া করতে করতে অনেক কাল ব্যতীত হল। ললিতাঙ্গ দেবের নিকট ক্রমে তাঁর স্বর্গ হতে পতনের চিহ্ন সকল প্রকটিত হতে লাগল। স্বামীর বিয়োগ নিকট জেনে তাঁর রত্নাভরণ নিস্তেজ, মুকুটের মালা ম্লান ও তাঁর অঙ্গ বস্ত্র মলিন হল। বলাও হয়েছে, যখন দুঃখ নিকটবর্তী হয় তখন লক্ষ্মী বিষ্ণুকেও পরিত্যাগ করে যায়। সেই সময় ললিতাঙ্গ দেবের মনে ধর্মের প্রতি অনাদর ও ভোগের বিশেষ লালসা উৎপন্ন হল। যখন অন্তঃসময় নিকটবর্তী হয় তখন প্রাণীর প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়েই থাকে। তার পরিজনের মুখ হতে যা ঘটবে তদনুরূপ বাক্যই নির্গত হয়।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 7 Sraman November '980
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ ॥ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী

অলংকরণ, জৈন মন্দির, বরাকর

ছবি : যুধিষ্ঠির মাজী

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি ও প্রাচীন সরাক সংস্কৃতি

শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সারা পুরুলিয়া অঞ্চলটাই ছিল জঙ্গলময়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের বসবাস ছিল না এখানে। সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি নদ-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলো ছিল প্রকৃতির এক সুন্দর লীলা ক্ষেত্র। এক বিশেষ ধরণের আশ্রম সভ্যতা গড়ে তোলার পক্ষে এই স্থানটা ছিল অতি উত্তম। এই কারণে জৈন ধর্মের প্রচারকরা এখানে এসে অহিংস আশ্রম সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানের আদিবাসীরা ছিল খুব হিংস্র ও বিপদজনক প্রকৃতির মানুষ। তাই তাদের বলা হত বজ্র ভূমিজ। আব তাদের বাসভূমিকে বলা হত Terrible land। অপর দিকে জৈন ধর্মের প্রচারকরা ছিলেন নম্র এবং অহিংস। তাই তাঁদের বলা হত সুধী ভূমিজ। এঁরা ছিলেন শ্রাবক। পরবর্তীকালে এঁরা সরাক নামে এই অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেন।

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির প্রথম ধাপটা তৈরী হয়েছিল এই সরাক বা সুধী ভূমিজদের হাতে। তাঁরা এই অঞ্চলের ছড়রা, বলরামপুর, পাকবিড়রা, পাড়া, দেউলঘাটা, তেলকূপী, বরাকর প্রভৃতি স্থানে আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। এইসব স্থানে তাঁরা মন্দির এবং পাথর কেটে জৈন তীর্থঙ্করদের বিগ্রহ নির্মাণ করে গিয়েছেন। এইসব প্রাচীন মন্দির এবং অমূল্য শিল্পকলা অবহেলা ও অনাদরে অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নিষ্ঠুর মহাকাল আর ধর্মীয় বিকারগ্রস্ত মানুষের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যেটুকু এখনও বেঁচে আছে তা নিয়েও পুরুলিয়াবাসী আজ গর্ব করতে পারেন।

পুরুলিয়া থেকে চার মাইল উত্তর পূর্বে ছড়রা নামে একটি গ্রাম আছে। সমস্ত গ্রামটি একটু নীচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অবশ্য দূর থেকে এই পাহাড় দেখা যাবে না। তবে গ্রামে গেলেই দেখা যাবে গ্রামের সমস্ত ঘর বাড়ি গুলোই পাহাড়ের শক্ত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯০১ সালে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ১.৫৩২ জন। আর বর্তমানে তা প্রায় চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই ছড়রা গ্রামের বুকে লুকিয়ে আছে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির এক গৌরবময় ইতিহাস। এর মাটিতে আছে বহু প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন।

ছড়রা এক কালে জৈন ধর্মের কেন্দ্র ছিল বলে মনে করা হয়। এর পাশেই রয়েছে ঝাঁপড়া, পাড়া, কেলাহি, জবড়রা প্রভৃতি সরাক প্রভাবিত গ্রাম গুলো।

এখানে সরাক জৈনদের সাতটি পাথরের মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। বহু মূল্যবান পাথরের জৈন বিগ্রহ দিয়ে এই মন্দিরগুলো সাজানো হয়েছিল। মন্দির গুলোকে দেউল বলা হত। এই মন্দির গুলো পাঁচ থেকে নয় ফুট লম্বা এবং দুই থেকে আড়াই ফুট চওড়া গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। দুইটি পাথরের মিলন স্থলে সিমেণ্ট জাতীয় কোন রূপ পদার্থ ব্যবহার করা হয়নি। এ গুলো স্টোন কার্পেণ্টারী পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল। উচ্চতায় এই মন্দিরগুলো প্রায় ত্রিশ ফুটের মত। এখানের এই ধরণের সাতটি মন্দিরের মধ্য বর্তমানে মাত্র একটি অবহেলায় অনাদরে পরিত্যক্ত বাড়ির মত টিকে আছে। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে আরও একটি মন্দির ছিল। কিন্তু সেটিও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এই সব মূল্যবান পাথরের মন্দিরগুলো মহাকালের কালো হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হয়তো আরও কয়েকটা শতাব্দী টিকে থাকতে পারত কিন্তু ধর্মীয় বিকারগ্রস্ত লোভী মানুষের নিষ্ঠুর হাতের আক্রমণ এরা সহ্য করতে পারেনি। তাই মন্দির গুলোর মূল্যবান পাথর গুলো বর্তমানে এখানের বড় মানুষদের বড় বড় বাড়ি গুলোর দেওয়ালে চাপা পড়ে নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করছে। ছড়রা গ্রামের বড় মানুষদের এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে এইসব জৈন মন্দিরের মূল্যবান পাথর না লাগান হয়েছে। শুধু মাত্র ছড়রা গ্রামের মানুষেরাই নয়; অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও মন্দির ভেঙে পাথর ও বিগ্রহ নিয়ে চলে গিয়েছে।

এখানের বড় বড় জৈন বিগ্রহগুলো এখন কোথায় আছে তা কেউ জানে না। তবে বিগ্রহগুলোর পদ্মাসন এখনও এখানে ওখানে ভাঙা চোরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় একটি বিরাট পদ্মাসন বর্তমানে ধর্মরাজ ঠাকুর রূপে পূজা পাচ্ছে। এই পদ্মাসনে যে নয় দশ ফুট উঁচু জৈন বিগ্রহ ছিল তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

এখানের বড় বড় জৈন বিগ্রহগুলোর কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও ছোট খাটো প্রায় শতাধিক জৈন তীর্থঙ্করদের বিগ্রহ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এখানের মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে। কিছু কিছু মহাবীরের বিগ্রহ শিব মন্দিরে, বাসন্তী মন্দিরে, দুর্গামন্দিরে ও ধর্মঠাকুরের মেলায় স্থান লাভ করে কিছুটা অক্ষত থাকতে পেরেছে।

ছড়রায় মহাবীর মহাদেব হয়েছেন। শিবের সঙ্গে নিত্য পূজো চলছে মহাবীরের। কোন কোন স্থানে আবার তিনি ঠিক শিব লিঙ্গের পাশেই অবস্থান করছেন। মন্দিরগুলো ভেঙে যখন গ্রামের লোকেরা মূল্যবান পাথর গুলো বাড়ি তৈরীর জন্য

নিয়ে যায় তখন বিগ্রহগুলো ভাঙা মন্দিরে, পুকুরের জলে বা জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়। এই সব বিগ্রহগুলো শিব মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্য গ্রামের অল্প শিক্ষিত মানুষরা কুড়িয়ে এনে শিব মন্দিরে স্থান করে দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার চালায় যে এগুলো বিশ্বকর্মার তৈরী। শিব ঠাকুর এখানে বাঘ ছাল খুলে দিগম্বর হয়েছেন।

ছড়রার বাসন্তী মন্দিরে যে জৈন বিগ্রহটি রাখা হয়েছে সেটার নিত্য পূজা হয়না

পাড়ার এই সুন্দর জৈন মন্দিরটি
এখন ধ্বংসের মুখে
ছবি : যুধিষ্ঠির মাজী
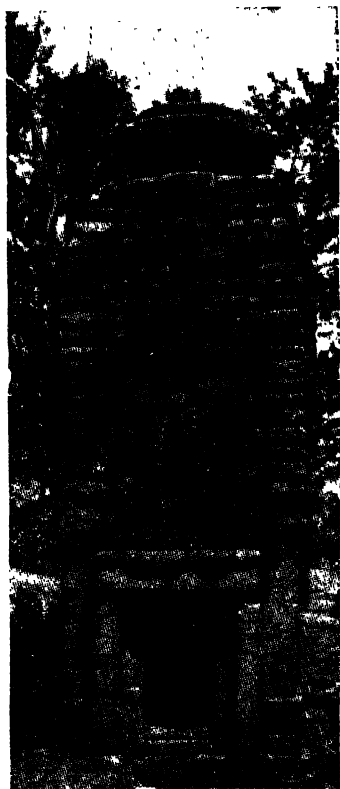
সাতটির মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট
ছড়রার সরাক জৈন মন্দির
ছবি : অমল ত্রিবেদী

ঘটে, তবে বাসন্তী পূজার দিন এই বিগ্রহটিও ফুল বেল পাতা থেকে বঞ্চিত হয়না। ধর্মমেলার পাশে একটি ঘরে বেশ কিছু জৈন বিগ্রহের কাটা মুণ্ড রাখা আছে। এগুলো গ্রামের লোকের কাছে শিব মুণ্ড। প্রতিদিন এগুলো ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করা হয়। মহাবীরের যে বিরাট পদ্মাসনটি বর্তমানে ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর রূপে পূজা পাচ্ছে তার পাশেই আছে দুটি জৈন মন্দিরের মডেল (Miniature Temple)। বেশ শক্ত পাথর দিয়ে এগুলো তৈরী হয়েছে বলে আজও বেশ অক্ষত আছে। এই মিনি মন্দির গুলো একটি মাত্র পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। এগুলো প্রায় দুই ফুট উচ্চ এবং ছয় থেকে আট ইঞ্চি চওড়া। এই ধরণের একটি মিনি জৈন মন্দির বরাহভূম পরগণার পবন পুরে পাওয়া গিয়েছিল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে কোন সময় এই মিনি মন্দিরটি ভারতীয় মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুঞ্চা থেকে দু'মাইল পূর্বে এবং পুরুলিয়া থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বাগদা পরগণার পাকবিড়রা নামক স্থানে বেশ কিছু প্রাচীন জৈন শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার বিখ্যাত জৈন বিগ্রহটি রয়েছে। এই জৈন বিগ্রহটি সাড়ে সাত ফুট উঁচু শক্ত পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। বর্তমানে এই বিখ্যাত বিগ্রহটি মহাকাল ভৈরব রূপে পূজা পাচ্ছে। ছড়রায় যে ধরণের পদ্মাসন ধর্মঠাকুর রূপে পূজা পাচ্ছে ঠিক সেই রূপ পদ্মাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এই বিগ্রহটি। পদ্মাসনটি মূর্তিটির তুলনায় বেশ ছোট। এছাড়া এখানে আরও বেশ কিছু ছোট খাটো জৈন বিগ্রহ ও ইঁট দিয়ে তৈরী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপ রয়েছে। এখানের শিল্প কলায় বেশ কিছু জীব-জন্তুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব জীব জন্তুর মধ্যে সিংহ,ষাঁড়,ভেড়া প্রভৃতিউল্লেখযোগ্য।

জয়পুর থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত বোরাম একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে তিনটি প্রাচীন মন্দিরেব নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দির গুলো ইঁট দিয়ে তৈরী। দক্ষিণ দিকের মন্দিরটি সব চেয়ে বড়। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। গর্ভগৃহ নয় বর্গফুট। মন্দিরটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা বার ইঞ্চি চওড়া আর মাত্র দুই ইঞ্চি পুরু ইঁট দিয়ে সুন্দর করে বানানো হয়েছে। ইঁট গুলো এত সুন্দর এবং নিখুঁত যে দেখলে মনে হয় যেন এগুলো কোন মেসিন দিয়ে তৈরী হয়েছে।

মন্দির শিল্পের দিক দিয়ে এই মন্দিরগুলো সকলের মনকেই আকর্ষণ করে। মন্দির গায়ের অপরূপ শিল্পকলা দেখে আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। এক কালে এই মন্দিরগুলো পুরাকীর্তির দিক দিয়ে এক অমূল্য সম্পদ রূপে পুরুলিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু দেশের মানুষ তখন শিল্পকলার মূল্য বুঝতে পারেনি। ফলে অবহেলা আর অনাদরে মন্দির গুলোর উপরের দিকের বেশ কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এখনও এই সব মন্দিরের সংস্কার সাধন করে সুরক্ষিত রাখলে এই অমূল্য সম্পদকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

মন্দিরগুলো নিঃসন্দেহে জৈন মন্দির। মন্দিরগুলোর পাশে একটি ভাঙ্গা শিব মন্দিরে এবং কূপে বেশ কিছু ভাঙ্গা চোরা জৈন বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সব জৈন বিগ্রহগুলোকে মন্দির থেকে সরিয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এক কালে পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈন মন্দিরকে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরে রূপান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলেছিল। সেই সময় অনেক জৈন বিগ্রহকে বিকৃত করে কালী ও মহাকাল ভৈরব নামে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই সব অপকর্মের কালো হাতের ছাপ পড়েছিল এই মন্দিরগুলোতে। কিছু হিন্দু বিগ্রহও মন্দির গাত্রে প্রোথিত করে এগুলোকে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরে রূপান্তরিত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তবু মন্দিরগুলো যে জৈন মন্দির তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ জৈন মন্দিরের মত এগুলোর দুয়ারও রয়েছে পূর্বমুখে। তাই মিষ্টার ই. টি. ডাল্টন সাহেব পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে মন্দিরগুলো জৈন মন্দির এবং এগুলো তৈরী হয়েছে সরাকদের হাতে।

পুরুলিয়া শহরের তের মাইল দক্ষিণে পাসমা আর একটি নাম করা গ্রাম। এখানের একটি শিব মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে একটি বিশাল মস্তক বিহীন জৈন বিগ্রহ দেখা যায়। এই তীর্থঙ্করের মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। মূর্তিটির মাথা থাকলে এর উচ্চতা হত প্রায় নয় ফুট। খুব একটা শক্ত পাথর দিয়ে মূর্তিটি তৈরী হয়নি। তাই সহজেই অবক্ষয়ের পথে নেমে গিয়েছে। এছাড়া এই মন্দিরের দেওয়ালে প্রোথিত দুটি ছোট আকারের জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। সম্ভবতঃ এই দুইটি মূর্তির মধ্যে একটি ঋষভনাথের। এছাড়া মূল জৈন মূর্তিটির দু'পাশে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে।

পুরুলিয়া জেলায় জৈন শিল্পকলার উপর যে এককালে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ জৈন বিগ্রহকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল শিব পুকুরের জলে। পরবর্তীকালে পুকুর থেকে তুলে আনা এইসব বিগ্রহ স্থান পেয়েছে মন্দির গাত্রে। পাড়া থানার পাড়া গ্রামেও এই একই দৃশ্য দেখা যায়। এখানে রঘুনাথজীর মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি তীর্থঙ্করের প্রাচীন মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি পাশের গ্রামের একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল। দেড় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মূর্তিটি ঋষভ-নাথের। মূল মূর্তিটির দু'পাশে দুটি করে মোট চারটি তীর্থঙ্করের মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে। এক কালে মূর্তিটির কিছু রূপান্তর ঘটিয়ে একে হনুমান সাজাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালান হয়েছিল। এছাড়া পাড়াতে সরাক জৈনদের তৈরী একটি পাথরের প্রাচীন মন্দিরও রয়েছে। মন্দিরটি আকারে ছড়রার মন্দিরটির চাইতে অনেক বড়। এটিও সম্ভবতঃ গ্র্যানাইট ষ্টোন দিয়ে তৈরী হয়েছিল। মন্দির গাত্রে বহু অলঙ্করণ ছিল কিন্তু বর্তমানে পাথরের খোদাই করা অংশ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে।

পাড়ার এই সুন্দর মন্দিরটি এখন ধ্বংসের মুখে। এই সব অমূল্য পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ভার কি সরকার নিতে পারেন না ?

ভাঙ্গা চোরা বেশ কিছু সরাক জৈন মূর্তি স্তূপীকৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে নাংটীর স্থানে। এখানের সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তিটি সম্ভবতঃ আদিনাথ বা ঋষভ নাথের। খোদিত পাথরটি চওড়ায় প্রায় ২৬" ইঞ্চি এবং উচ্চতায় প্রায় ৫৫" ইঞ্চি। মূল মূর্তিটি একটি পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূর্তিটির দুই পাশে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। এ ছাড়া মূর্তিটির মস্তকের দু'পাশে উড্ডীয়-মান গন্ধর্বমূর্তিও রয়েছে। দু' সারি তীর্থঙ্করের মূর্তির নীচে দুইটি নারী মূর্তি প্রণামের ভঙ্গীতে উপবেশন করে আছে। এখানের দ্বিতীয় মূর্তিটি ৪৬" ইঞ্চি লম্বা এবং ২৩" ইঞ্চি চওড়া পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছে। মূল জৈন মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ৩০॥" ইঞ্চি। এই মূর্তিটির দু'পাশে দু'টি দণ্ডায়মান নারী মূর্তি। এই নারীদের হাতে চামর রয়েছে। এ ছাড়া এখানে আর একটি ঋষভনাথের মূর্তি রয়েছে। অবশ্য মূর্তিটির উপরের অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে। ঐই সব মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে অতুলনীয়। সেকালের জৈন সরাকেরা যে কি অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা এই সব অমূল্য শিল্পকলা দেখেই বোঝা যায়। কতকাল ধরে যে এই সব শিল্পকলা অবহেলায় আর অনাদরে পড়ে রয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। আর কত দিনই বা এমনি করে পড়ে পড়ে অবক্ষয়ের পথে নেমে চলবে তাও কেউ জানে না কিন্তু শিল্পকলার এই অবক্ষয় তো জৈন সরাকদের ক্ষতি নয় ; এটা যে সারা দেশের ক্ষতি! .

পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মহাদেব বেড়ায় একটি সুন্দর জৈন পুরাক্ষেত্র রয়েছে। এখানে ধানবাদ জেলার সরাকেরা একটি আধুনিক মন্দিরও নির্মাণ করেছেন। এখানের সব চেয়ে বড় মূর্তিটি দেওয়ালের মাঝখানে গাঁথা রয়েছে। মূর্তিটির উচ্চতা ৪'ফুট ৬ "ইঞ্চি এবং চওড়ায় প্রায় ২ 'ফুট। পাকবিড়রার মূর্তিটির মত এই মূর্তিটির পদ্মাসনটিও বেশ ছোট। এই মূর্তির পিছনের দিকে সপ্তমুখী সাপের আচ্ছাদন রয়েছে। এ ছাড়া মূল মূর্তির দু'পাশে প্রায় চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি দণ্ডায়মান রয়েছে। পদ্মাসনের নীচ থেকে দুইটি সর্প লীলায়িত ভঙ্গীতে উপরে উঠে এসেছে। এই সর্প দ্বয়ের মুখে দুইটি নারী মূর্তি করজোড়ে দণ্ডায়মানা। বেশ কিছু জৈন শিল্পকলার মধ্যেই এই সর্প কন্যাদের দেখা যায়। এরা পাকবিড়রায় যেমন রয়েছে তেমনি বরাকরের পাথরের মন্দিরেও রয়েছে।

দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত তেলকূপী এককালে জৈন ধর্মের প্রচার স্থল ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তেলকুপী গভীরভাবে জড়িত। রাজা বিক্রমাদিত্য নাকি এখানে দামোদরে স্নানের আগে গায়ে তেল মাখতেন তাই এর নাম হয়েছে তেলকুপী

সরাক জৈন বিগ্রহের এই পদ্মাসন এখন ধর্মরাজরূপে পূজা পাচ্ছে
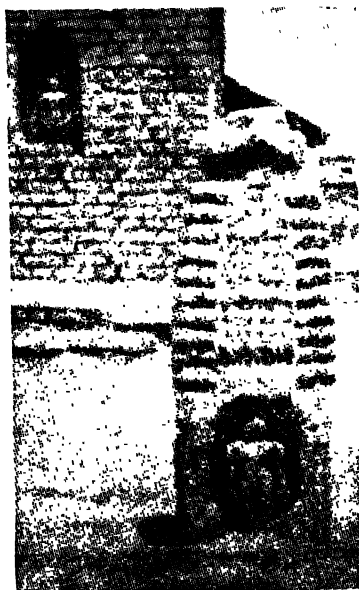
সরাক জৈন মন্দিরের মণ্ডপ

ক্ষয়ে যাওয়া একটী সরাক বিগ্রহ

ছবি : অমল ত্রিবেদী

বা তৈল কাম্পী। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনায় তৈল কাম্পীর নাম পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ পাতকুম রাজ্যের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। সুবর্ণ রেখা নদীর তীরে দিয়াপুর দালমীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের দুর্গ ছিল।

তেলকূপীর মন্দিরটি বর্তমানে ডি, ভি, সি'র বাঁধের জলের তলায়। ছড়রার মন্দিরের মত একই প্রথায় তৈরী হয়েছিল এই মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ নিঃসন্দেহে সরাক জৈনদের তৈরী তীর্থঙ্করের মূর্তি। পাকবিড়রার মত এখানের জৈন বিগ্রহটিও বিখ্যাত হিন্দু দেবতা ভৈরব নাথে রূপান্তরিত হয়েছে। বারুণী তিথিতে আগে এখানে খুব বড় মেলা বসত। জেলার প্রাচীন মেলাগুলোর মধ্যে বারুণীর মেলার স্থান ছিল দ্বিতীয়।

স্থানীয় জন সাধারণের ধারণা মন্দিরটি নাকি বিশ্বকর্মার তৈরী। কথিত আছে, যে বিশ্বকর্মা এই পথ দিয়েই পুরীধাম গিয়েছিলেন। তাঁর যাত্রা পথের ধারে তিনি মন্দির নির্মাণ করে গিয়েছেন। কিন্তু এখানের সরাক জৈনরা যে বিশ্বকর্মার জাত সেটা আনকেরই অজানা। আধুনিক পণ্ডিতরাও জৈনদের কথা তুললেও সরাকদের কথাটি ভুলেও উচ্চারণ করেন না।

এখানের মূল জৈন বিগ্রহ ছাড়া বেশ কিছু হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ পাওয়া যায়। এই সব বিগ্রহ গুলোর মধ্যে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, দূর্গা, মহিষাসুর, কামদেব, রতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব কারণে অনেকে তেলকূপীর ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এই হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহগুলো পরবর্তী কালে তৈরী হয়েছিল। এখানেও জৈন মন্দিরের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ ঢুকিয়ে জৈন তথা সরাক সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তাছাড়া সরাক জৈনদের প্রচেষ্টায় এখানে একটি নগরও নির্মাণ করা হয়েছিল। তেলকূপী প্রাচীন কালে একটি সুরক্ষিত নগর এবং শিল্প কেন্দ্র ছিল। তমলুক থেকে ঘাটাল, ছাতনা, রঘুনাথপুর হয়ে একটি রাস্তা তেলকূপী পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। পরে এই রাস্তা আবার দামোদর পার হয়ে রাজগীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই রাস্তা দিয়ে পাটানা পর্যন্ত যাওয়া যেত। বর্ষার দিনে তেলকূপী শহর ছিল এই রাস্তার মস্তবড় সরাইখানা। এই কারণে তেলকূপীতে তীর্থঙ্করদের পাশাপাশি হিন্দু দেব-দেবীরাও অবাধে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছেন।

কাঁসাই নদীর তীরে বুধপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের উত্তর দিকে চারটি সরাক জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও কিছু প্রাচীন সরাক জৈন মন্দিরকে হিন্দু মন্দির রূপে পরিমার্জিত করে তৈরী করা হয়েছে। এখানের মাটিতে শক্ত পাথর দিয়ে তৈরী কিছু থাম (Pillar) ও অন্যান্য শিল্পকলার নিদর্শনও পাওয়া যায়। ছড়রার প্রস্তর শিল্পকলার সঙ্গে এখানের শিল্পকলার বেশ

শিবাসনে প্রতিষ্ঠিত সম্যক জৈন মূর্তি
শিবের সঙ্গে নিত্য পূজা পাচ্ছে

নিত্য না হলেও বাসন্তী পূজার সময় এই
জৈন বিগ্রহটী পূজা পেয়ে থাকে

ছবি : অগস্ত্য ত্রিবেদী
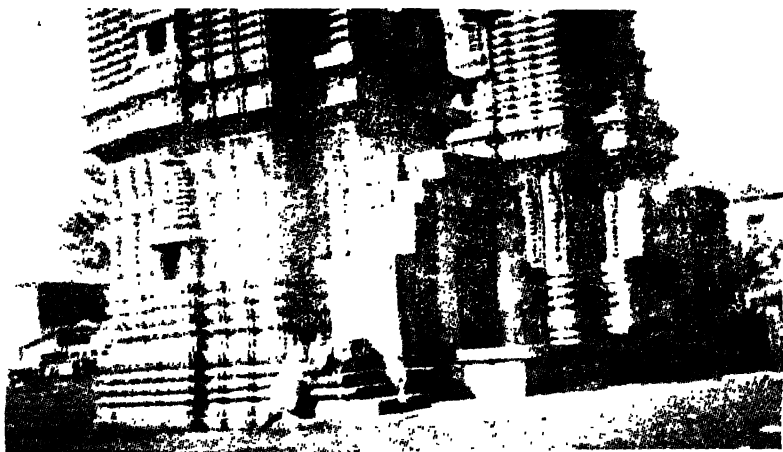
পুরুলিয়া, বর্দ্ধমান ও ধানবাদ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত জৈন মন্দিরের
সম্মুখ ভাগ। বরাকরের এইসব মন্দির বেশ সুরক্ষিত রয়েছে

ছবি : যুধিষ্ঠির মাজী

কিছু মিল রয়েছে। এখানেও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রভাব কাল ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে মহাদেবের প্রভাবে পরিণত হয়েছে। জেলার সব চাইতে প্রাচীন এবং সব চাইতে বড় গাজন মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় বুধপুর গ্রামে। আগে চড়ক পূজার সময় বুধপুরের মেলার বড় আকর্ষণ ছিল পিঠের চামড়া ফুটো করে তাতে দড়ি বেঁধে ভক্ত৷ ঘোরার অনুষ্ঠান (Swinging Festival)। মেলার দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল শ্যামা পাখি। হাজার হাজার শ্যামা পাখির বাচ্চাকে রাজমহলের পাহাড় থেকে ধরে এনে এখানের মেলায় বিক্রি করা হত। সারা দেশের পাখি ব্যবসায়ীরা বুধপুরের মেলায় সমবেত হতেন পাখির বাচ্চা কিনতে।

পুরুলিয়া, বর্ধমান আর ধানবাদ (বিহার) এই তিনটি জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল বরাকর। এখানে চারটি সরাক জৈন মন্দির বেশ সুন্দর এবং সুরক্ষিত ভাবে বরাকর নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে মন্দিরগুলির গর্ভদেশে শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কবে এবং কাদের দ্বারা এই সব শিব লিঙ্গ মন্দিরগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা বলা বেশ শক্ত। তবে কিছু কিংবদন্তী এবং কিছু দলিল পত্রে দেখা যায় যে ১৪৫৯ সালের কোন সময় হরিপ্রিয়া নামে কোন রাজরানী মন্দির গুলোতে শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

ছড়রায় জৈন সরাকদের তৈরী যে সব মন্দিরের মডেল (miniature temple) পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে বরাকরের মন্দির গুলো প্রায় মিলে যায়। এই সব মন্দির গাত্রে কোন রূপ হিন্দুদেব-দেবীর বিগ্রহ বা দেব-দেবীর মূর্তি নেই। সেকালের জৈন শিল্পকলার মূল বৈশিষ্ট ছিল লীলায়িত সর্পের মুখে নারী। বরাকরের এই সব মন্দির গাত্রেও এই সব সর্প কন্যাদের দেখা যায়। তাছাড়া মন্দির গুলো যে ধরণের মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে শিব লিঙ্গ গুলো তার চাইতে অনেক নিকৃষ্ট পাথর (degraded stone) দিয়ে বানানো হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয় যে এগুলো পরে বসানো হয়েছে। আগে এই সব মন্দিরে সরাকদের তৈরী জৈন মূর্তি ছিল। এই মূর্তি গুলো পরে নষ্ট করা হয়েছে।

বরাকরের চতুর্থ মন্দিরটির প্রাঙ্গণে কিছু ভাঙ্গা চোরা জৈন বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন বিগ্রহই অক্ষত নেই। মূর্তি গুলোর নীচের দিকের অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তবু এই সব ভাঙ্গা চোরা বিগ্রহ গুলোই যে এক কালে বরাকরের মন্দির গুলোর গর্ভদেশ আলো করে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতীতের সরাকেরা বিশ্বকর্মার জাত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন নাম করা ভাস্কর। সরাক শিল্পীদের প্রভাব জেলার ইতিহাসে খুব কম ছিল না। আগেই বলেছি যে পুরুলিয়ায় মহাবীর মহাদেব হয়েছেন। সারা বাংলা যখন তান্ত্রিকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কালী আর দুর্গার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন পুরুলিয়ার মানুষ সরাক

জৈনদের প্রভাবে মহাবীরকে মহাদেব বানিয়ে শৈব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। এখানে পশুবলির মাত্রাও কমে গিয়েছিল। যদিও মহাকাল ভৈরবের মূর্তির সামনে পশুবলি দেওয়ার প্রথা ছিল তবু কোন শিব মন্দিরেই পশুবলি হয় না। পুরুলিয়া জেলাতে এমন বহু সরাক প্রভাবিত গ্রাম আছে যেখানে দুর্গাপূজা এবং কালী পূজাতেও পশুবলি হয় না। তাই কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যেখানে লিখেছেন—

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগ জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥

সেখানে পুরুলিয়া অঞ্চলের ঝুমুরিয়ারা তাঁদের ঝুমুর গানে লিখেছেন—

ভ্রাতৃভাবে মিলি, ভরিয়া অঞ্জলি, রক্ত চন্দন জবায় রে।
ওরে জয় দুর্গা বলি, দিব পুষ্পাঞ্জলি, দিব রাঙা জবা রাঙা পায় রে।

পুরুলিয়া অঞ্চলের এই অহিংসা ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে সরাক জৈন সংস্কৃতির প্রভাবে।

সরাকেরা পুরুলিয়া জেলায় যে পুরাকীর্তির নিদর্শন রেখে গিয়েছেন সেই সব পুরাকীর্তির অনুকরণে পরবর্তী কালে বহু মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁদের শিল্প জ্ঞান বর্তমান যুগেও বহু শিল্পীকে কারিগরির সুক্ষ্ম নিপুণতা দান করেছে। সরাক জৈন মন্দিরে বা তীর্থঙ্করদের মূর্তির পাশে যে সর্প কন্যা বা নাগ কন্যার নিদর্শন পাওয়া যায় তার লীলায়িত ভঙ্গী লোক শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের বহু দেওয়াল চিত্রে এই ধরণের নাগ কন্যাদের দেখা যায়। তাছাড়া এই অঞ্চলের অতীতের ইতিহাসকে জানার একমাত্র উপাদান হল সরাক জৈনদের এই সব পুরাকীর্তির নিদর্শন। সরাকদের ভাস্কর্য শিল্পই এই অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পদ। এই সম্পদকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করা উচিত।

মহাবীর-বাণী

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

চতুরঙ্গীয় সূত্র

৯৬। মানব জন্ম, ধর্ম শ্রবণ, শ্রদ্ধা ও সংযমে পুরুষার্থ—এই চারিটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ (জীবন বিকাশের সাধন) লাভ করা সংসারে জীবের পক্ষে দুষ্কর।

৯৭। সংসারের মোহ মায়ায় আবদ্ধ মূর্খ প্রাণী বহুবিধ পাপ কর্ম করিয়া নানা গোত্র সম্পন্ন জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। সমস্ত বিশ্ব এই সব জাতিতে পরিপূর্ণ।

৯৮। জীব কখনো দেবলোকে, কখনো নরক লোকে কখনো অসুর লোকে গমন করে। যে যেরূপ কর্ম করে সেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

৯৯। কখনো সে ক্ষত্রিয় হয় কখনো চণ্ডাল, কখনো বা বর্ণ শঙ্কর। কখনো কীট পতঙ্গ হয় কখনো কুন্থু বা পীপিলিকা।

১০০। পাপ কর্মকারী প্রাণী এই প্রকার নূতন নূতন যোনিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করে। দুঃখময় রাজ্যে ক্ষত্রিয় যেমন খিন্ন হয় না সেইরূপ এই দুঃখময় সংসারে তাহারা কখনো খিন্ন হয় না।

১০১। যে প্রাণী কাম বাসনায় বিমূঢ় সে ভয়ংকর দুঃখ ও বেদনা ভোগ করিতে করিতে মনুষ্যেতর যোনিতে ঘুরিতে থাকে।

১০২। সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখনো অনেককাল পরে যদি পাপকর্মের বেগ ক্ষীণ হয় ও তাহার ফল স্বরূপ অন্তরাত্মা ক্রমশঃ শুদ্ধতা লাভ করে তবেই মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১০৩। মনুষ্য জন্ম লাভ করিলেও সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ। সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়াই মনুষ্য তপ, ক্ষমা ও অহিংসা স্বীকার করে।

১০৪। সৌভাগ্য বশে সে যদি কখনো সদ্ধর্ম শ্রবণও করে তবু সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। কারণ অনেকে ন্যায় মার্গ—সত্য সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াও দূরে থাকে। সত্য সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী হয় না।

১০৫। সদ্ধর্ম শ্রবণ ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইলেও তদনুরূপ পুরুষার্থ করা আরও কঠিন। কারণ সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহারা সদ্ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াও তদনুরূপ আচরণ করে না।

১০৬। কিন্তু যে তপস্বী মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া সদ্ধর্ম শ্রবণ করে, সদ্ধর্মে শ্রদ্ধাপন্ন হয় ও তদনুরূপ পুরুষার্থ করে সে আস্রব রহিত হয় ও আত্মায় সংলগ্ন কর্মরজঃ দূর করে।

১০৭। যে মনুষ্য নিষ্কপট ও সরল হয়, তাহার আত্মা শুদ্ধ হয়। যাহার আত্মা শুদ্ধ হয় তাহার নিকট ধর্ম অবস্থান করে। ঘৃত দ্বারা সিঞ্চিত অগ্নি যেরূপ পূর্ণ প্রকাশিত হয় তদনুরূপ সরল ও শুদ্ধ সাধকই পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

১০৮। কর্মোৎপত্তি কারক কারণ গুলিকে খুঁজিয়া বাহির কর ও তাহাদের উচ্ছেদ কর। তৎপর ক্ষমাদি গুণ দ্বারা অক্ষয় যশ প্রাপ্ত হও। এইরূপ আচরণকারী মনুষ্য পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উচ্চ ও শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে।

১০৯। যে ব্যক্তি উপরোক্ত চারিটি অঙ্গ দুর্লভ জানিয়া সংযম মার্গ স্বীকার করে সে তপস্যার দ্বারা কর্ম বিনষ্ট করিয়া সর্বদার জন্য সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়।

॥ ১১ ॥

অপ্রমাদ সূত্র

১১০। জীবন অসংস্কৃত—অর্থাৎ একবার বিনষ্ট হইলে তাহাকে পুনরায় জীবিত করা যায় না। অতএব মুহূর্তের জন্য প্রমাদ করিও না। প্রমাদ, হিংসা ও অসংযমে অমূল্য যৌবন কাল ব্যতীত করিলে পর যখন বৃদ্ধাবস্থা উপনীত হইবে তখন কে তোমার রক্ষা করিবে? কাহার শরণ লইবে? একথা খুব ভালভাবে চিন্তা কর।

১১১। যে ব্যক্তি অনেক পাপাচরণের দ্বারা বৈর ও বিরোধ বর্দ্ধিত করিয়া অমৃত স্থানে ধন সংগ্রহ করে সে অন্তঃকালে কর্মের দৃঢ় পাশে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি এই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়া নরক গতি প্রাপ্ত হয়।

১১২। প্রমত্ত পুরুষ ধনের দ্বারা না ইহলোকে, না পরলোকে নিজের রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তবু ধনের অসীম মোহে মূঢ় মনুষ্য প্রদীপ নিভিয়া গেলে যেমন পথ দেখা যায় না সেই রূপ ন্যায় মার্গকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

১১৩। চোর যেমন সিঁদ কাটিতে গিয়া সিঁদের মুখে ধরা পড়িয়া নিজের দুষ্কর্মে জন্য বিদারিত হয় সেই প্রকার পাপকর্মকারী ইহ তথা পরলোক, উভয় স্থানেই ভয়ংকর দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কেন না কৃতকর্মের ফল ভোগ ব্যতিরেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

১১৪। সংসারী মনুষ্য নিজ প্রিয়জনের জন্য হীনতম পাপ কর্ম করিয়া থাকে কিন্তু সেই দুষ্কর্মের ফল ভোগের যখন সময় হয় তখন একেলাই ফল ভোগ করে। কোন প্রিয়জনই তখন তাহার দুঃখের ভাগী বা সহায়ক হয় না।

১১৫। মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত সংসারী প্রাণীর মধ্যে বাস করিয়াও আশুপ্রজ্ঞ পণ্ডিত পুরুষের সর্বদিকে সর্বদা জাগরুক থাকা উচিত। কাহাকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। কাল নির্দয় ও শরীর দুর্বল এই কথা জ্ঞাত হইয়া সর্বদা ভারণ্ড পক্ষীর মত অপ্রমত্ত ভাবে বিচরণ করিবে।

১১৬। সংসারে ধন জন আদি যাবতীয় পদার্থকে বন্ধন রূপ জানিয়া মুমুক্ষু অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিবে। যতদিন শরীর সশক্ত ততদিন তাহাকে সংযম ধর্মের সাধনায় নিয়োগ করা উচিত। পরে যখন তাহা একেবারে অশক্ত হইয়া যায় তখন কোন প্রকারে মোহ মমতা না রাখিয়া লোষ্ট্রবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

১১৭। শিক্ষিত ও কবচ যুক্ত অশ্ব যুদ্ধে যেরূপ জয় লাভ করে সেইরূপ বিবেকী মুমুক্ষু জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে মুনি দীর্ঘ-কাল অপ্রমত্ত রূপে সংযম ধর্মের আচরণ করেন তিনি শীঘ্রাতিশীঘ্র মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।

১১৮। শাশ্বত বাদীরা কল্পনা করেন সৎকর্ম করার এত কি তাড়া পরে করিলেই হইবে। কিন্তু এ রূপ কল্পনা করিতে করিতে ভোগ বিলাসেই তাহাদের জীবন ব্যতীত হইয়া যায় ও একদিন মৃত্যু তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্তিম সময়ে কিছুই আর হইয়া ওঠে না, তখন মূর্খ মনুষ্যের ভাগ্যে অনুতাপই শেষ রহিয়া যায়।

১১৯। আত্ম বিবেক শীঘ্র লাভ করা যায় না। ইহার জন্য কঠিন সাধনার প্রয়ো-জন। মহর্ষিগণ ত অনেক পূর্ব হইতেই সংযম পথে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কাম ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সমত্ব পূর্বক স্বার্থপর সংসারের বাস্তবিকতা বুঝিয়া নিজ আত্মাকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে করিতে সর্বদা অপ্রমাদী রূপে বিচরণ করেন।

১২০। মোহ গুণের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া বিজয়প্রাপ্তকারী শ্রমণকে নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থারও বহুবার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু ভিক্ষু যেন তাহাতে একটুও ক্ষুব্ধ না হন ও শান্তভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

১২১। শ্রমণ জীবন হইতে চ্যুতকারী কাম ভোগ অত্যন্ত লোভনীয় বলিয়া মনে

হয়। কিন্তু সংযমী পুরুষ সেইদিকে নিজের মনকে একটুও যেন আকৃষ্ট না হইতে দেন। আত্মশোধক সাধকের কর্তব্য তিনি যেন ক্রোধকে দমন করেন, অহংকার দূর করেন, মায়া সেবন না করেন ও লোভ পরিত্যাগ করেন।

১২২। যে মনুষ্য সংস্কারহীন, তুচ্ছ, পরনিন্দাকারী, রাগদ্বেষ যুক্ত সে সর্বদা অধর্মাচরণ করিয়া থাকে। এই রূপ বিচার পূর্বক দুর্গুণের ঘৃণা করিতে করিতে মুমুক্ষু শরীর বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যেন একমাত্র সদ্‌গুণেরই কামনা করেন।

[ক্রমশঃ

কল্যাণ মন্দির স্তোত্র

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জিনেশ্বরের ও পদযুগল কল্যাণ-মন্দির,
উদার সর্বপাপনাশী, সেথা ভয়ে ভীত সুস্থির।
এই সংসার-সাগরে অদোষী—ডুবন্ত দশা যার,
তারে যে বাঁচাতে তরণীস্বরূপ, সে-দেবে নমস্কার ॥

সমুদ্রসম গুণগাথা যার, বিশাল বুদ্ধিমান—
যে-সুরগুরুও যার বর্ণনা করিতে পারে না দান,
কমঠের মান মর্দন করে' যে হন পূজ্যবর,
স্তুতি করি সেই পার্শ্বনাথকে—পরম জিনেশ্বর ॥

হে প্রভু, আমার মতো কী মানুষ সামান্য রূপ নিয়ে
তোমার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাটি রাখে হিয়ে ?
ধৃষ্ট হলেও যে উলুক রয় দিবসে অন্ধ হয়ে,
অংশুমালীর রূপ বর্ণনা সে কী যেতে পারে কয়ে ?

হে নাথ, যাহার মোহ বিনষ্ট এবং যে তাহা বোঝে,
এগোয় কী আর ওই ও তোমার গুণ বর্ণনা খোঁজে ?
প্রলয় কালেতে সমুদ্রজল যখন উপছে পড়ে,
ভিতরের সেই রত্নরাজিকে গোণার শক্তি ধরে ?

হে নাথ, তুমি যে গুণের আকর অসংখ্য শোভনীয়,
আমি এক জড়বুদ্ধি তবুও স্তবই তব মানি প্রিয়।
এ যেন, কেমন সাগর বুঝাতে দুহাতের প্রসারণ—
বালক দেখায়, বালকের মাঝে তারই বালোচিত মন ॥

যোগীজনও যার গুণবর্ণনে হয়ে থাকে অক্ষম,
সেখানে আমি কী, কিসেরই বা দাম ধরা এই উদ্যম ?

মূঢ়তাই যদি হয়ে থাকে তবু মনে তো একথা মানি,
পাখির কণ্ঠে পাখিই শুনাবে যা তার আপন বাণী ॥

তোমার স্তবের মহিমা তো জানি অচিন্তনীয় প্রভু,
তার আগে নাম, তাতেই সিদ্ধি বহুদূর থেকে তবু।
নিদাঘ বেলায় তীব্র তাপেতে পীড়িত পথিকজন—
পদ্মপুকুর দেখলেই, তার হাওয়া যে ভরায় মন ॥

জীবের কর্মবন্ধন যদি ঘন হয়ে দেহ ধরে,
তোমাকে হৃদয়ে ধরলেই প্রভু তারা শ্লথ হয়ে পড়ে।
চন্দনগাছ জড়িয়ে সাপেরা থাকে বড় নির্ভয়,
বন-ময়ূরের উদয় ঘটলে সব অদৃশ্য হয় ॥

হাজার হাজার উপদ্রবে যে মানুষ জর্জরিত,
ওগো জিনেন্দ্র তোমাকে দেখলে তারা আর নয় ভীত।
পলায়মান তস্কর হতে পশুদেরও মেলে ত্রাণ—
তারা যদি দেখে সামনে রাজাকে অতিশয় বলবান ॥

তুমি যদি হও বীতরাগ তবে প্রশ্নও স্বাভাবিক :
এই সংসারী জীবের তারক তুমি তবে কিসে ঠিক ?
ভরা বায়ু ভরে মশকও তো দেখি জলরাশি পার হয়,
তোমাকে ভরলে হৃদয়ে—এভব-সাগরেও সেই জয় ॥

মহাদেবআদি দেবতাও যার প্রভাবে বুদ্ধিছাড়া,
সেই কামদেবটিকে মুহূর্তে তুমি করো জ্ঞানহারা।
অগ্নি নিবায় যে জল, তারই কী থাকে না তেমন গুণ—
পান করে নাকি বাড়বানলকে কঠোর যে নিদারুণ ?

হে দেব, যখনি মনে ভাবি, লাগে বড় বেশি বিস্ময়,
তোমার মতন গুরুভারটীকে হৃদয়ে বইতে হয়।
হৃদয়েতে ধরে' জীব সংসার-সাগর যে হয় পার,
মহান পুরুষ যিনি, অচিন্ত্য প্রভাবও যে বড় তার ॥

ক্রোধকেই যদি নষ্ট করলে ওগো প্রভু আগে ভাগে,
তবে বলো কিসে কর্মরূপী ও-চোরকে আনলে বাগে ?
আশ্চর্যের কী আছে—এই তো হিমেরই শীতল হাওয়া
সবুজ বনানী নষ্ট করতে শুরু করে নাকি ধাওয়া ?

ওগো জিনেন্দ্র, যোগীরা তো দেখি সকল সময়ে চায়—
পরম আত্মা তোমাকেই, যারে হৃদয়-কমলে পায় ।
পূত-নির্মল কমলবীজের কোথা মেলে সন্ধান ?
কমলকোষই তো জানে তাহা ঠিক, সে তাহার ধরে প্রাণ ॥

হে প্রভু, তোমাকে ধ্যান করে করে সংসারী জীব—সেও
মুহূর্তে নিজ দেহ ছেড়ে নেয় পরমাত্মার দেহ ।
সুবর্ণ সেই পাষাণও যে মোটে থাকে না পাষাণ আর,
তীব্র অগ্নিসংযোগে নেয় স্বর্ণের রূপ তার ॥

হে জিনেশ, কেন নাশ করে সেই আপন শরীরটাকে—
যেখানে ভব্যজীবেরা তোমাকে ধারণ করেই থাকে ?
কারণ একটি, মাঝখানে যিনি তিনি বড় সুমহান,
কোনো বিগ্রহ-শরীর পেলেই শান্তি করেন দান ॥

তোমা হতে তারা অভিন্ন—এই জ্ঞানেতে শক্তিমান
মনীষী যে বসে ধ্যানে, তার হয় আত্মাও বলীয়ান ।
জলকে যে ভাবে অমৃতস্বরূপ, তারই হতে পারে জয়,
বিষের বিকার দূর করে' জল তারে করে নির্ভয় ॥

হে বীততমস, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রুচিধর,
কেউ বলে হরি—দেবতা তোমায়, কেউ বলে থাকে হর ।
কামলা রোগী বা রঙীন কাচই তো ঘটায় বিপর্যয়,
শ্বেত শংখ সে শংখই থাকে, বর্ণ ভিন্ন নয় ॥

ধর্মোপদেশ দেবার সময় মানুষ তো কোন্ ছার,
বৃক্ষও হয় অশোক—নিকটে এলেই তুমি যে তার ।

সূর্য উদিত হলে তো তখন শুধুই বৃক্ষ নয়,
সারা জীবলোক—সকলে মিলেই বিবোধপ্রাপ্ত হয় ॥

হে প্রভু, যখন দেবতারা মিলে পুষ্পবৃষ্টি করে,
পুষ্পবৃন্ত নিম্নাভিমুখী হয়েই লুটিয়ে পড়ে।
হে মুনীশ, তাই হওয়াই উচিত, তব কাছে সজ্জন
নিম্নাভিমুখী পড়ে—সুমনের কাটে যেন বন্ধন ॥

গম্ভীর হৃদয়-সমুদ্র হতে তোমার যে বাণী ওঠে,
তারে যারা কয় অমৃতবর্ষী—মিথ্যা বলে না মোটে।
এই এ অমৃত পান করে হয় অনন্ত তারা সুখী,
হয় যে অজর-অমর, যাহারা ভব্য জীবনমুখী ॥

হে দেব, তোমাকে দেবতারা যেই চামর বীজন করে—
নামে তা প্রথমে বহু নিচে, ওঠে উপরে তাহার পরে।
তার মানে বুঝি, যে প্রণত হয় মুনিশ্রেষ্ঠের পায়,
শুদ্ধ ভাবটি লাভ করে উঁচু মোক্ষপদে সে যায় ॥

[ক্রমশঃ

ত্রিষষ্টি শলাকাপুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

জন্ম হতে প্রাপ্ত লক্ষ্মী ও লজ্জারূপ প্রিয়া তাঁকে সেভাবে পরিত্যাগ করল যেভাবে লোক অপরাধীকে পরিত্যাগ করে। পিঁপড়ের যেমন মৃত্যুর সময় পাখা গজায় সেই রকমই অদীন ও নিদ্রারহিত ললিতাঙ্গ দেব দীন ও নিদ্রাধীন হলেন। হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর সন্ধিবন্ধ শিথিল হতে লাগল। মহাবলবান পুরুষও তাঁর যেসব কল্পবৃক্ষ নড়াতে পারত না তারা কাঁপতে লাগল। তাঁর নিরোগ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধি ভবিষ্যৎ দুঃখের শঙ্কায় ভগ্ন হতে লাগল। অন্যের স্থায়ীভাব দেখতে অসমর্থ এরূপ তাঁর চোখ বস্তুকে দেখতে অসমর্থ হল। গর্ভবাসের দুঃখের ভয় প্রাপ্ত হয়েছে এরূপভাবে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। ওপরে অঙ্কুশ নিয়ে বসা মাহুতের জন্য যেরূপ হস্তী স্বস্তিলাভ করে না সেরূপ ললিতাঙ্গ দেবেরও রম্য ক্রীড়া-পর্বত, সরিতা, বাপী দীর্ঘিকা ও উদ্যানে আনন্দলাভ হল না।

তাঁর এই অবস্থা দেখে দেবী স্বয়ংপ্রভা বলল, হে প্রিয়, আমি এমন কি অন্যায় করেছি যেজন্য আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

ললিতাঙ্গ দেব বললেন, হে সুভ্রূ, তুমি কোনো অপরাধ করোনি। অপরাধ আমারই যে আমি কম পুণ্য, কম তপস্যা করেছি। পূর্বজন্মে আমি বিদ্যাধরদের রাজা ছিলাম। তখন ভোগ কার্যে রত ও ধর্মকার্যে প্রমাদী ছিলাম। আমার সৌভাগ্যের দূতের মত স্বয়ংবুদ্ধ নামক মন্ত্রী আমার আয়ু অল্প রয়েছে জেনে আমায় জৈন ধর্মের উপদেশ দিলেন। আমি তা স্বীকার করলাম। সেই সামান্য সময়ের জন্য কৃত ধর্মের প্রভাবে আমি এতদিন শ্রীপ্রভ বিমানের অধীশ্বর রইলাম। কিন্তু এখন আমায় এখান হতে যেতে হবে। কারণ অলভ্য বস্তু কখনো পাওয়া যায় না।

সেই সময় ইন্দ্রের আজ্ঞায় দৃঢ়ধর্মা নামক দেবতা তাঁর নিকটে এলেন ও বললেন, "আজ ঈশান কল্পের অধীশ্বর নন্দীশ্বরাদি দ্বীপে জিনেন্দ্র প্রতিমা পূজা করবার জন্য যাবেন। ওঁর আজ্ঞা আপনিও ওঁর সঙ্গে যান।

সে কথা শুনে ললিতাঙ্গ দেব আনন্দিত হলেন। সৌভাগ্য বশে আজ্ঞা সময়ানুকূল প্রাপ্ত হয়েছি সে কথা ভাবতে ভাবতে স্বয়ংপ্রভাকে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন।

নন্দীশ্বর দ্বীপে গিয়ে তিনি শাশ্বতী অর্হৎ প্রতিমার পূজা করলেন। সেই পূজা হতে প্রাপ্ত আনন্দে তিনি তাঁর নিজের পতন কালও ভুলে গেলেন। নির্মল মনা সেই দেবতা যখন অন্য তীর্থের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর আয়ু সমাপ্ত হয়ে গেল ও তিনি অল্প তৈলাবশিষ্ট প্রদীপের মত পথেই নির্বাপিত হয়ে গেলেন অর্থাৎ দেব যোনি হতে ভ্রষ্ট হলেন।

পঞ্চম ভব

জম্বুদ্বীপে সমুদ্রের নিকটে পূর্ব বিদেহ ক্ষেত্র অবস্থিত। সেখানে সীতা নামক মহানদীর উত্তর তটে পুষ্কলাবতী নামে এক বিজয় (প্রান্ত) আছে। সেই বিজয়ে লোহর্গলা নামে এক বৃহৎ নগর আছে। সেই নগরের রাজার নাম স্বর্ণধ্বজ। তাঁর পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে ললিতাংগ দেব পুত্র রূপে উৎপন্ন হলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর মাতা পিতা তাঁর নাম দিলেন বজ্রজংঘ।

স্বয়ং প্রভা দেবীও ললিতাঙ্গ দেবের বিয়োগে দুঃখী হয়ে ধর্ম কার্যে দিন ব্যতীত করতে লাগল ও কিছুকাল পরে সেখান হতে চ্যুত হয়ে সেই বিজয়ের পুণ্ডরিকিনী নগরীর রাজা বজ্রসেনের পত্নী গুণবতীর গর্ভে কন্যা রূপে উৎপন্ন হল। দেখতে সে খুব সুন্দরী ছিল যেজন্য তার মাতা পিতা তার নাম রাখলেন শ্রীমতী। মালীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে লতা যেমন বর্দ্ধিত হয় সেই রকম পরিচারিকাদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে শ্রীমতী বর্দ্ধিত হতে লাগল। তার শরীর কোমল ও করতল নবীন কিশলয়ের মত প্রভা সম্পন্ন ছিল। রত্ন জড়িত হয়ে অঙ্গুরীয়ক যেরূপ শোভা দেয় সেই রকম নিজের স্নিগ্ধ কান্তিতে পৃথিবীকে আনন্দিত করতে করতে শ্রীমতী যৌবন প্রাপ্ত হয়ে শোভা দিতে লাগল। সন্ধ্যাকালীন অভ্রমালা যেরূপ পর্বত শীর্ষে আরূঢ় হয় সেরূপ সে একদিন নিজের সর্বতোভদ্র নামক প্রাসাদ শীর্ষে আনন্দের সঙ্গে আরোহণ করল। সেখান হতে সে সেদিক দিয়ে দেব বিমান যেতে দেখল। মনোরম নামক উদ্যানে কোন মুনির কেবলজ্ঞান হওয়ায় দেবতারা তাঁর নিকটে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখে শ্রীমতীর মনে হল যে সে এরূপ আগে কোথাও দেখেছিল। ভাবতে ভাবতে রাত্রে দৃষ্ট স্বপ্নের মত তার পূর্ব জন্মের কথা মনে হতে লাগল। পূর্ব জন্ম জ্ঞানের ভার বহন করতে অসমর্থ হয়ে সে মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সখীরা চন্দনাদি দিয়ে তার চেতনা ফিরিয়ে আনলে সে ভাবতে লাগল—পূর্বভবে ললিতাঙ্গ দেব আমার পতি ছিলেন। তিনি স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে যান—জানিনা এখন তিনি কোথায়? হায়! সেই জন্যই আমার মন দুঃখ ভারক্রান্ত। আমার হৃদয় তিনিই একমাত্র অধিকার করে আছেন। তিনিই আমার প্রাণেশ্বর। সত্যিইত কর্পূর পাত্রে কে লবণ নিক্ষেপ করে? যদি আমি আমার প্রাণপতির সঙ্গেই কথা না বলতে

পারি তবে অন্যের সঙ্গে কথা বলেই বা কি লাভ! এই কথা চিন্তা করে সে মৌন ধারণ করল।

যখন সে কথা বলা বন্ধ করে দিল, তখন তার সখীরা দৈব দোষ মনে করে মন্ত্র তন্ত্র দিয়ে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করল। কিন্তু নানা উপচার সত্বেও তারা তার মৌন ভঙ্গ করতে পারল না। কারণ এক রোগের ওষুধ অন্য রোগ ভালো করতে পারে না। প্রয়োজন মত লিখে বা হস্তাদির ইসারায় সে নিজের প্রয়োজনের কথা পরিজনদের বিজ্ঞাপিত করতে লাগল।

একদিন শ্রীমতী নিজের ক্রীড়োদ্যানে গেল। সেখানে নিরালা পেয়ে পণ্ডিতা নামে তার এক দাসী তাকে বলল, হে রাজকন্যা, তুমি আমার প্রাণের মত প্রিয় এবং আমি তোমার মায়ের মত। এজন্য আমাদের একের অন্যের ওপর অবিশ্বাস রাখা উচিত নয়। তুমি যে কারণে মৌন ধারণ করেছ সেই কারণ আমায় বল ও আমাকে তোমার দুঃখের অংশীদার করে নিজের দুঃখ লাঘব কর। তোমার দুঃখের কারণ জেনে তার নিরাকরণ করবার চেষ্টা করব। কারণ রোগ না জেনে তার নিরাকরণ কী করে সম্ভব?

তখন শ্রীমতী নিজের পূর্বজন্মের কথা পণ্ডিতাকে এ ভাবে বলল যেমন শিষ্য প্রায়শ্চিত্তের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট যথাযথ তথ্য বিবৃত করে। পণ্ডিতা তদনুরূপ এক চিত্র পট অঙ্কিত করল ও সেই চিত্র পট নিয়ে সেখান হতে প্রস্থান করল।

সেই সময় চক্রবর্তী বজ্রসেনের জন্মদিন নিকটবর্তী হওয়ায় সেই উপলক্ষে অনেক রাজা ও রাজপুত্র সেখানে আসছিলেন। শ্রীমতীর মনোভাব ব্যক্তকারী সেই চিত্রপট নিয়ে পণ্ডিতা যে রাজপথ দিয়ে তাঁরা আসবেন সেই রাজ পথের ধারে দাঁড়িয়ে গেল। যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাঁরা আগমার্থানুরূপ চিত্রিত নন্দীশ্বর দ্বীপ আদি দেখে তার স্তুতি করতে লাগলেন। অনেকে শ্রদ্ধায় মাথা নাড়তে নাড়তে চিত্রপট অঙ্কিত অর্হৎ মূর্তির বিশদ্ বর্ণনা করতে লাগলেন। কলা অভিজ্ঞেরা সূক্ষ্ম রূপে অঙ্কিত রেখা আদির বাস্তবিকতার প্রশংসা করতে লাগলেন। অন্য কেউ সন্ধ্যাভ্রের মত চিত্রপটে চিত্রিত কাল, সাদা, হলুদ, নীল, লাল অদি রঙের বর্ণনা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নামানুরূপ গুণযুক্ত দুর্দর্শন নামক রাজার দুর্দান্ত নামক পুত্র সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে কিছুক্ষণ চিত্রপট দেখল ও মাটিতে পড়ে মূর্ছার ভান করল। তারপর সংজ্ঞা ফিরে পাবার ভান করে ধীরে ধীরে উঠে বসল। লোকে তার অজ্ঞান হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে মিথ্যা করে বলল—

এই পটে কেউ আমার পূর্ব জন্মের কথা চিত্রিত করেছে। তাই পট দেখে আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ হয়। এই আমি ললিতাঙ্গদেব, আর এই আমার

দেবী স্বয়ংপ্রভা। এভাবে সে সেখানে যে যে ঘটনা চিত্রিত ছিল তা বর্ণন করল।

পণ্ডিতা বলল যদি তাই হয় তবে চিত্রে চিত্রিত স্থান গুলির অঙ্গুলি সঙ্কেতে নাম বল।

দুর্দান্ত বলল, এটি সুমেরু পর্বত আর এটি পুণ্ডরিকীনী নগরী।

পণ্ডিতা বলল, এই মুনির নাম কি ?

সে বলল, মুনির নাম আমি ভুলে গেছি।

পণ্ডিতা আবার জিজ্ঞাসা করল, মন্ত্রী পরিবৃত এই রাজার নাম কি আর এই তপস্বিনীই বা কে ?

দুর্দান্ত বলল, আমি ওদের নাম জানি না।

এতেই পণ্ডিতা বুঝতে পারল যে লোকটি যথার্থ ললিতাঙ্গ দেব নয়। সে তখন হাসতে হাসতে বলল, বৎস, তোমার কথনানুরূপ এ তোমার পূর্ব জন্মেরই বিবরণ। তুমি ললিতাঙ্গ দেব আর এই তোমার পত্নী স্বয়ংপ্রভা কর্ম দোষে এখন পঙ্গু হয়ে নন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছে। তার পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ায় এই চিত্র পটে সে নিজের পূর্ব জন্ম চিত্রিত করায়। আমি যখন ধাতকী খণ্ডে যাই তখন সে আমাকে এই চিত্র পট দেয়। সেই পঙ্গুর ওপর আমার দয়া হওয়ায় আমি তোমাকে খুঁজে বার করলাম এখন তুমি আমার সঙ্গে চল। ধাতকী খণ্ডে আমি তোমাকে তার নিকটে পৌঁছে দেই। বৎস, দারিদ্র্য পীড়িতা তোমার পত্নী তোমার বিরহে দুঃখে জীবন ব্যতীত করছে। তাই তুমি তার নিকটে গিয়ে তোমার পূর্ব জন্মের বল্লভাকে আশ্বস্ত কর।

এই কথা বলে পণ্ডিতা চুপ করলে দুর্দান্তের বন্ধু বান্ধবেরা পরিহাস করে বলল, বন্ধু, তুমি স্ত্রীরত্ন লাভ করায় মনে হচ্ছে তোমার পুণ্যোদয় হয়েছে। তাই তুমি গিয়ে ওই পঙ্গু স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর ও আজীবন তার পালন পোষণ কর।

মিত্রদের সেই পরিহাস শুনে দুর্দান্ত কুমার লজ্জিত হল ও বিক্রয়ার্থ আনীত বস্তুর মধ্যে যা অবশেষ পড়ে থাকে তার মত মুখ করে সেখান হতে বিদায় নিল।

এর কিছু পরেই লোহর্গলাপুর হতে আগত বজ্রজংঘ কুমার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি চিত্রপটে অঙ্কিত চিত্র দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। পাখা দিয়ে বীজন করা হল ও চোখে মুখে জলের ছিটা দেওয়া হল। তখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। সেই মুহূর্তে যেন এইমাত্র স্বর্গ হতে অবতরণ করেছেন এরূপ ভাবে তাঁর জাতি স্মরণ জ্ঞান হল।

পণ্ডিতা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কুমার এই চিত্রপট দেখে তুমি কেন মূর্ছিত হয়ে গিয়েছিলে ?

বজ্রজংঘ প্রত্যুত্তর দিলেন, ভদ্রে. আমার পূর্বজন্মের কথা আমার স্ত্রী সহিত এই চিত্রপটে অঙ্কিত আছে। তা দেখে আমি মূর্ছাগ্রস্ত হই। এইটী ঈশানকল্প। এর মধ্যে এইটী শ্রীপ্রভ বিমান। এই আমি ললিতাঙ্গ দেব আর এই আমার দেবী স্বয়ং-প্রভা। ধাতকীখণ্ডের নন্দীগ্রামে মহাদরিদ্রের ঘরে জাত নির্নামিকা অম্বরতিলক পর্বত শিখরে এই দাঁড়িয়ে। ও যুগন্ধর নামক মুনির নিকট অনশনব্রত গ্রহণ করছে। এখানে ও যাতে আমাতে আসক্ত হয় সেজন্য আমি তাকে দেখা দিচ্ছি। ওখনে ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে স্বয়ংপ্রভা নামে আমার দেবী হয়ে জন্ম গ্রহণ করছে। এখানে আমি নন্দীশ্বর দ্বীপের অর্হৎ প্রতিমার পূজা ও বন্দন নিরত। আর এখানে অন্য তীর্থে যাবার সময় আমি চ্যুত হই। একাকিনী দীন ও দরিদ্রের মত স্বয়ংপ্রভা এখানে জন্ম গ্রহণ করেছে—এই আমার অনুমান। ও-ই আমার পূর্ব ভবের প্রিয়া ও এখানেই আছে। আমার বিশ্বাস জাতি স্মরণ জ্ঞানে ও-ই এই চিত্রপট অঙ্কিত করিয়েছে। কারণ অনুভব ছাড়া অন্যের এসব জানার কথা নয়।

সমস্ত স্থান নির্দেশ করে বজ্রজংঘ যা বলল তা শুনে পণ্ডিতা বলল, বৎস, তোমার কথা সত্য।

তখন পণ্ডিতা শ্রীমতীর নিকটে গেল ও হৃদয়ের দুঃখ দূরকারী ঔষধের মত সমস্ত কথা শ্রীমতীকে বলল।

মেঘের শব্দ শুনে বিদুর পর্বতের ভূমি যেমন রত্নে অঙ্কুরিত হয় তেমনি শ্রীমতী নিজের প্রিয় পতির কথা শুনে রোমাঞ্চিত হল। তারপর সে পণ্ডিতাকে দিয়ে সমস্ত কথা পিতাকে বলে পাঠাল, কারণ স্বচ্ছন্দ না হওয়া কুলীন কন্যাদের ধর্ম।

পণ্ডিতার কথা শুনে বজ্রসেন, মেঘধ্বনি শুনে ময়ূর যেমন আনন্দিত হয় তেমনি আনন্দিত হলেন। তিনি তখন বজ্রজংঘ কুমারকে ডেকে বললেন, আমার কন্যা শ্রীমতী পূর্বজন্মের মত এ জন্মেও তোমার পত্নী হোক।

বজ্রজংঘ স্বীকৃত হলেন। সমুদ্র যেমন লক্ষ্মীর বিষ্ণুর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন সেইরকম বজ্রসেনও স্বীয় কন্যা শ্রীমতীর বজ্রজংঘের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তারপর চন্দ্র ও চন্দ্রিকার মত একরূপ পতি ও পত্নী উজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিধান করে রাজার আজ্ঞা নিয়ে লোহর্গলাপুরে গমন করলেন। সেখানে যোগ্যাবস্থা লাভ করছে দেখে সুবর্ণজংঘও পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

এদিকে চক্রবর্তী বজ্রসেনও স্বীয় পুত্র পুষ্করপালকে রাজ্যভার দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন ও তীর্থংকর হলেন।

বজ্রজংঘ নিজ প্রিয়ার সঙ্গে সংভোগ করতে করতে রাজ্যভার, হস্তী যেরূপ কমল বহন করে সেইভাবে বহন করলেন। গঙ্গা ও সমুদ্রের মত কখনো

তাঁরা বিযুক্ত হলেন না। নিরন্তর সুখভোগ করতে করতে সেই দম্পতীর এক পুত্র হল।

অহিকুলের উপমা সেবনকারী ও মহাক্রোধী সামন্ত রাজারা পুষ্করপালের বিরোধী হলেন। সর্পের মত তাদের বশ করতে পুষ্করপাল বজ্রজংঘকে ডেকে পাঠালেন। শক্তিশালী বজ্রজংঘ তাঁর সাহায্যার্থ গমন করলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে যেমন ইন্দ্রাণী যায় সেই প্রকার অচল ভক্তিমতী শ্রীমতীও স্বামীর সঙ্গে গেলেন। অর্দ্ধপথ যেতে না যেতেই অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রিকার ভ্রম উৎপন্নকারী এক বিস্তৃত কাশবন তাঁরা দেখতে পেলেন। পথিকেরা বলল ঐপথে দৃষ্টিবিষ সাপ থাকে। সে কথা শুনে তিনি ভিন্ন পথে গমন করলেন কারণ নীতিবান পুরুষ উপস্থিত কার্যেই তৎপর হন।

পুণ্ডরীক সদৃশ বজ্রজংঘ পুণ্ডরিকীনী নগরীতে উপস্থিত হলেন। তাঁর শক্তিবলে সমস্ত সামন্ত নৃপতিরা পুষ্করপালের অধীন হল। বিধিজ্ঞাতা পুষ্করপাল গুরুজনদের যেমন সম্মান করা হয় সেইরূপ বজ্রজংঘ রাজার সম্মান করলেন।

কিছুদিন পর পুষ্করপালের নিকট বিদায় নিয়ে বজ্রজংঘ শ্রীমতীকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে যেমন লক্ষ্মীপতি যান সেরূপে প্রস্থান করলেন। শত্রুনাশকারী সেই রাজা যখন সেই কাশ বনের নিকটে এলেন তখন মার্গদর্শক চতুর ব্যক্তিরা বলল, সম্প্রতি এই বনে দুই মুনির কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এখানে দেবতারা এসেছেন। তাঁদের দ্যুতিতে দৃষ্টিবিষ সাপ নির্বিষ হয়ে গেছে। সেই দুই মুনি সাগরসেন ও মুনি সেন সূর্য ও চন্দ্রের মত এখনো এখানে অবস্থান করছেন। সংসার সম্পর্কে তাঁরা সহোদর ভাই। সে কথা শুনে বজ্রজংঘ আনন্দিত হলেন ও বিষ্ণু যেমন সমুদ্রে নিবাস করেন তেমনি তিনিও সেখানে নিবাস করতে লাগলেন। দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত ও ধর্মোপদেশ দান রত সেই দুই মুনিকে ভক্তিভরে আনত হয়ে রাজা শ্রীমতী সহ বন্দনা করলেন। উপদেশ অন্তে তিনি অন্ন জল বস্ত্রাদি মুনিদের দান করলেন। তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন ধন্য এই মুনি যুগলকে যাঁরা সহোদর সম্পর্কে সমান, কষায়রহিত, মমতা রহিত ও পরিগ্রহ রহিত। আমি এরূপ নই, তাই অধন্য। ব্রতগ্রহণ কারীরা পিতার সন্মার্গের অনুসরণকারী হয়, তাই তাদের পিতার ঔরসপুত্র বলা হয়। কিন্তু আমি তা হয় নি তাই ক্রীত পুত্রের মত। এ সত্বেও আমি যদি এখন ব্রত গ্রহণ করি তবে তা উচিৎই হবে। কারণ দীক্ষা, প্রদীপের মত গ্রহণ মাত্রই অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করে। এজন্য আমি এখান হতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে পুত্রকে রাজ্য ভার দেব এবং হংস যেমন হংস গতি প্রাপ্ত হয় আমিও তেমনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

শ্রীমতীর এতে আপত্তি থাকলেও, এক মন হয়ে উভয়ে লোহর্গলা নগরে ফিরে

এলেন। সেখানে রাজ্যলোভে তাঁর পুত্র ধনদানে মন্ত্রীদের নিজের বশীভূত করে নিয়েছিল। কারণ জলের নিকট যেমন কোনো কিছু অভেদ্য নেই তেমনি ধনের নিকটও কোনো কিছু অভেদ্য নেই।

শ্রীমতী ও বজ্রজংঘ পরদিন সকালে পুত্রকে সিংহাসন দেবেন ও নিজেরা দীক্ষা গ্রহণ করবেন সে কথা চিন্তা করতে করতে শুয়ে গেলেন। সেই সময় সুখসুপ্ত রাজ দম্পতীকে মারবার জন্য রাজপুত্র সেই ঘরে বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রয়োগ করল। গৃহের আগুনের মত তাকে নিবারিত করতে কে সমর্থ? প্রাণকে চিমটের মত ধরে বার করে নেওয়া সেই ধোঁয়া রাজা ও রাণীর নাকে প্রবেশ করল। সেইভাবে সেখানে তাঁদের দেহান্ত হল।

ষষ্ঠ ভব

বজ্রজংঘ ও শ্রীমতীর জীব উত্তর কুরুক্ষেত্রে যুগল রূপে উৎপন্ন হল। ঠিকই বলা হয়েছে সমান বিচারকারী মৃত্যু পথ যাত্রীর গতি একই প্রকার হয়।

সপ্তম ভব

সেখান হতে আয়ু শেষে তাঁরা সৌধর্ম দেবলোকে স্নেহশীল দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন ও সেখানে দীর্ঘকাল স্বর্গ সুখ ভোগ করলেন।

অষ্টম ভব

দেব আয়ু সমাপ্ত হলে গরমে যেমন বরফ গলে সেই প্রকার বজ্রজংঘের জীব সেখান হতে বিগলিত হয়ে জম্বুদ্বীপের বিদেহ ক্ষেত্রে ক্ষিতি প্রতিষ্ঠিত নগরে সুবিধি বৈদ্যের ঘরে পুত্র রূপে উৎপন্ন হল। তার নাম জীবানন্দ রাখা হল। সেই দিন সেই নগরে ধর্মের শরীর ধারী চার অঙ্গের মত অন্য চার বালক জন্ম গ্রহণ করল। প্রথম ঈশান চন্দ্র রাজার ঘরে কনকবতী নামক রাণীর গর্ভে মহীধর নামক পুত্র হল। দ্বিতীয় সুনাসীর মন্ত্রীর ঘরে লক্ষ্মী নামক স্ত্রীর গর্ভে সুবুদ্ধি নামক পুত্র হল। তৃতীয় সাগর দত্ত শ্রেষ্ঠীর ঘরে অভয়মতী স্ত্রীর গর্ভে পূর্ণভদ্র নামে পুত্র হল। চতুর্থ ধন শ্রেষ্ঠীর ঘরে শীলমতী স্ত্রীর গর্ভে শীলপুঞ্জের মত গুনাকর নামে পুত্র হল। ধাত্রীদের দ্বারা সযত্নে পরিপালিত ও রক্ষিত হয়ে এই চারটী বালক যেমন একটি অঙ্গের চারটি প্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ সমান রূপে বর্দ্ধিত হতে লাগল। সর্বদা এক সঙ্গে খেলা করে তারা বৃক্ষ যেমন মেঘ বারি সমরূপে গ্রহণ করে সেইরূপ সমস্ত কলা অধিগত করল।

শ্রীমতীর জীবও দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে সেই নগরে ঈশ্বর দত্ত শ্রেষ্ঠীর ঘরে

পুত্র রূপে উৎপন্ন হল। তার নাম কেশব রাখা হল। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনের মত সেই ছয় মিত্র সমস্ত দিন প্রায় এক সঙ্গেই থাকত।

এদের মধ্যে সুবিধি বৈদ্যের পুত্র জীবানন্দ পিতার নিকট ঔষুধ ও রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের জ্ঞাতা হল। হাতীর মধ্যে যেমন ঐরাবত, নব গ্রহের মধ্যে যেমন সূর্য অগ্রণী তেমনি সেও বৈদ্যদের মধ্যে জ্ঞানবান, নির্দোষ বিদ্যার জ্ঞতা ও অগ্রণী হল। সেই ছয় মিত্র সহোদরের মত নিরন্তর সঙ্গে সঙ্গে থাকত ও একে অন্যের ঘরে মিলিত হত।

একদিন তারা বৈদ্যপুত্র জীবানন্দের ঘরে বসেছিল। সেই সময় সেখানে এক মুনি ভিক্ষা গ্রহণ করতে এলেন। ইনি পৃথ্বীপাল রাজার পুত্র ছিলেন। নাম গুণাকর। গুণাকর ময়লার মত রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করে শম সাম্রাজ্য অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীষ্ম কালে যেমন নদী শুষ্ক হয়ে যায়, সেই রূপ তপস্যায় তাঁর শরীরও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। অসময়ে ও অপথ্য ভোজনে তাঁর কৃমি কুষ্ঠ নামক রোগ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে সেই রোগ প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। তবুও সেই মহাত্মা কখনো ঔষধ ভিক্ষা করেননি। বলাও হয় মুমুক্ষু কখনো শরীরের পরিচর্যা করেন না।

গোমূত্রিকা বিধানে গৃহে গৃহে ভিক্ষাকারী সেই সাধুকে দুদিনের উপবাসের পর পারনের জন্য অন্ন জল নেবার জন্য তার আঙিনায় তারা আসতে দেখল। তাঁকে দেখে সংসারে অদ্বিতীয় মহীধর কুমার বৈদ্য জীবানন্দকে পরিহাস করে বলল, তোমার রোগের জ্ঞান আছে, ঔষধের জ্ঞান আছে, চিকিৎসাও তুমি ভালই কর কিন্তু তোমাতে দয়া একটুও নেই। ধন ছাড়া গণিকা যেমন কারু মুখের দিকে তাকায় না তুমিও সেই রূপ ধন ছাড়া পরিচিত দুঃখী ব্যক্তি প্রার্থনা করলেও তার দিকে চেয়ে দেখ না। বিবেকী মনুষ্যের কেবল ধনের লোভ করাই উচিত নয়। কোন সময় ধর্মের কথা মনে করেও চিকিৎসা করা উচিত। তোমার রোগের নিদান ও চিকিৎসা জ্ঞানকে ধিক্কার যে তুমি এমন সৎপাত্র অসুস্থ মুনির দিকে তাকাচ্ছ না।

সেকথা শুনে বিজ্ঞান রত্নের রত্নাকর তুল্য জীবানন্দ বলল, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ, বাস্তবে—

সংসারে প্রায়শই ব্রাহ্মণ জাতি দ্বেষ রহিত হয় না, বণিক জাতি অবঞ্চক হয় না, মিত্রমণ্ডলী ঈর্ষ্যাহীন হয় না, শরীর ধারী নিরোগ হয় না, বিদ্বান ধনবান হয় না, গুণবান নিরভিমানী হয় না, স্ত্রী অচপল হয় না ও রাজপুত্র উত্তম চরিত্রের হয় না।

এই মুনি চিকিৎসার যোগ্য কিন্তু বর্তমানে আমার কাছে ঔষধের উপকরণ নেই। এই এর অন্তরায়। এই ব্যাধি দূর করবার জন্য লক্ষ পাক তৈল, গোশীর্ষ চন্দন

ও রত্নকম্বলের প্রয়োজন। আমার কাছে লক্ষ পাক তৈল আছে কিন্তু অন্য দুই বস্তু নেই। সেই বস্তু তোমরা এনে দাও।

ওই দুই বস্তু আমরা আনব বলে পাঁচ বন্ধু বাজারে গেল। মুনিও নিজের নিবাস স্থানে ফিরে গেলেন।

সেই পাঁচ মিত্র বাজারে গিয়ে এক বৃদ্ধ বণিককে বলল, আমাদের গোশীর্ষ চন্দন ও রত্নকম্বলের প্রয়োজন আছে। মূল্য নিয়ে সেই বস্তু আমাদের দিন।

সেই বণিক প্রত্যুত্তর দিলেন, এ দুটি বস্তুর প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। অর্থাৎ উভয় বস্তুর মূল্য দুই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। মূল্য নিয়ে এসে বস্তু নিয়ে যাও। কিন্তু তার আগে বল এগুলির তোমাদের কেন প্রয়োজন হয়েছে ?

তারা বলল যা মূল্য লাগে তা নিন ও বস্তু দু'টী আমাদের দিন। এক মহাত্মার চিকিৎসার জন্য এদু'টীর প্রয়োজন।

সেকথা শুনে বণিক আশ্চর্যান্বিত হলেন। আনন্দে তাঁর চোখে জল ভরে এল ও শরীর রোমাঞ্চিত হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, কোথায় উন্মাদ আনন্দ ও তারুণ্য ভরা এদের যৌবন-আর কোথায় বয়োবৃদ্ধের মত এদের বিবেক ও বিচার শক্তি! যে কাজ আমার মত বার্দ্ধক্য জর্জর ব্যক্তির করা উচিত সে কাজ এরা করছে ও অদম্য উৎসাহে তা পূর্ণ করতে অগ্রসর হয়েছে।

এরূপ বিবেচনা করে সেই বৃদ্ধ বণিক তাদের বললেন, হে বিবেকশালী যুবকেরা, গোশীর্ষ চন্দন ও রত্নকম্বল তোমরা নিয়ে যাও। মূল্য দেবার প্রয়োজন নেই। এদের মূল্য রূপে ধর্ম রূপ অক্ষয় নিধি আমি প্রাপ্ত করব। তোমরা আমাকে সহোদর ভাইয়ের মত ধর্ম কার্যে অংশীদার করেছ সেজন্য ধন্যবাদ। এই বলে সেই বস্তু দুটী সেই বণিক তাদের দিলেন। তারপর সেই শুদ্ধান্তঃকরণ বণিক দীক্ষা নিয়ে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হলেন।

ঔষধ নিয়ে মহাত্মাদের মধ্যে অগ্রণী সেই মিত্ররা বৈদ্য জীবানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মুনির নিকটে গেল। সেই মুনি কায়োৎসর্গ করে এক বট বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে বট গাছের পা বলেই মনে হচ্ছিল। মুনি মহারাজকে বন্দনা করে সেই মিত্ররা বলল, হে ভগবন্, চিকিৎসা কার্যে আজ আমরা আপনার তপস্যায় বিঘ্ন করব। আপনি আজ্ঞা দিন ও পুণ্য প্রদানে আমাদের অনুগৃহীত করুন।

মুনি চিকিৎসার জন্য সম্মতি দিলেন। তখন তারা সদ্য মৃত এক গাভী নিয়ে এল। কারণ সদ্‌বৈদ্য কখনো বিপরীত (পাপযুক্ত) চিকিৎসা করে না। তারপর তারা মুনির সমস্ত শরীরে লক্ষপাক তৈল মালিশ করল। সেই তৈল খালের জল যেমন ক্ষেত্রের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় সেরূপ মুনির প্রত্যেক শিরায় উপশিরায় প্রবিষ্ট হল।

দেহে তাপ উৎপন্ন করা সেই তৈলের গরমে মুনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শক্ত অসুখে উগ্র ঔষধই কার্যকরী হয়।

বল্মীকে জল নিক্ষেপ করলে যেমন তাহতে উ'ই নির্গত হয় সেই উত্তাপে আতুর হয়ে মুনির শরীর হতে সেইরূপ কুষ্ঠ কৃমি নির্গত হতে লাগল। তখন জীবানন্দ চাঁদ যেমন নিজের চন্দ্রিকায় গগন আচ্ছাদিত করে সেইরূপ মুনির শরীর রত্নকম্বলে আচ্ছাদিত করে দিল। রত্নকম্বলে শীতলতা ছিল। সেজন্য শরীর হতে নির্গত কুষ্ঠ কৃমি গ্রীষ্মের দিনে দ্বিপ্রহরে মাছেরা যেমন শীতলতার জন্য শৈবালে আশ্রয় নেয় সেইরূপ সেই রত্নকম্বলে আশ্রয় নিল। তখন সে সেই রত্নকম্বলটিকে না নেড়ে ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে তার সমস্ত কীট মৃত গাভীর উপরে ফেলে দিল। বলাও হয় সৎপুরুষের সমস্ত কাজে অদ্রোহই প্রকাশ পায়। তারপর জীবানন্দ অমৃতরস তুল্য জীব মাত্রকে প্রাণদানকারী গোশীর্ষ চন্দন তাঁর সর্বাঙ্গে লেপন করল। এতে শরীরে প্রশান্তি এল। এভাবে প্রথমে চর্মের ভেতরের কীট নিষ্কাশিত করল। তারপর আবার শতপাক তৈল মর্দন করল। তাতে উদান বায়ুতে যেমন রস নির্গত হয় সেই প্রকারে মাংসের ভেতর হতে কুষ্ঠ কৃমি নির্গত হল। পূর্বের মত রত্নকম্বলে তাঁর শীর আবৃত করা হল। এতে দু'তিন দিনের দধির কীট যেভাবে লাক্ষাসিক্ত কাপড়ে ভেসে ওঠে সেভাবে কুষ্ঠকৃমি সেই রত্নকম্বলে ভেসে এল। জীবানন্দ এবারো তাদের গাভীর মৃত শরীরে ফেলে দিল। ধন্য বৈদ্যের এই চতুরতা! পুনরায় জীবানন্দ গ্রীষ্মকালে পীড়িত হস্তীকে মেঘ যেমন শান্ত করে তেমনি গোশীর্ষ চন্দন রসে মুনিকে শান্ত করল। এর কিছুক্ষণ পর সে লক্ষপাক তৈল মালিশ করল। এতে হাড়ে যে কুষ্ঠ কৃমি ছিল তারাও বেরিয়ে এল। কারণ বলবান ব্যক্তি যদি রোষ করে তবে বজ্রের পিঞ্জরও তাকে রক্ষা করতে পারে না। সেই কৃমিও পূর্বের মত রত্নকম্বলে এনে মৃত গাভীর দেহের ওপর ফেলে দেওয়া হল। ঠিকই বলা হয় মন্দের জন্য মন্দ স্থানই প্রয়োজন। তারপর সেই বৈদ্য শিরোমণি পরমা ভক্তির সঙ্গে যেমন দেব দেহে বিলেপন করা হয় সেই প্রকার গোশীর্ষ চন্দন রস মুনির সর্বাঙ্গে বিলেপন করল। এই প্রকার চিকিৎসায় সেই মুনি নিরোগ ও কান্তি সম্পন্ন হলেন ও মার্জিত স্বর্ণ মূর্তির মত শোভাসম্পন্ন হলেন। পরিশেষে মিত্ররা সেই ক্ষমাশ্রমণের নিকট ক্ষমা যাচনা করল। মুনিও সেখান হতে বিহার করে অন্যত্র চলে গেলেন। কারণ ওই প্রকার সাধুপুরুষ কখনো একস্থানে অবস্থান করেন না।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয় । প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০ ।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 8 Sraman December 1980
Registered with Tne Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

জৈন ভবন

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮৭ ॥ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

পার্শ্বনাথ, পালযুগ

বাঙলায় জৈন যুগের স্মৃতি

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

জৈন সাহিত্য আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে যে জৈনদের শেষ তীর্থংকর ভগবান মহাবীর প্রচারের জন্য লাঢ়, সুহ্ম (পশ্চিম বঙ্গ) প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে প্রথমদিকে তিনি বাধা পেয়েছেন। এমন কি বহু নির্যাতন ভোগও তাঁকে করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

মহাবীরের পরে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে বিখ্যাত জৈন আচার্য অন্তিম শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহুর বাঙলায় জৈন ধর্ম প্রচার উল্লেখ যোগ্য। ভদ্রবাহু দেবকোটে জন্ম গ্রহণ করেন। দেবকোটকে কোটিবর্ষ বলা হত। কোটিবর্ষ উত্তর বঙ্গের মধ্যে এবং বর্তমান দিনাজপুর জেলার বানগড়।

ভদ্রবাহু ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ধর্ম প্রচারক। কথিত আছে তিনি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরুস্থানীয় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন ভদ্রবাহুর প্রভাবে ও প্রেরণায়।

ভদ্রবাহু রচিত কল্প সূত্রে গোদাস গণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে গোদাস গণের যে কয়টী শাখার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে চারটি বাঙলাদেশের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত। যথা : তাম্রলিপ্তিয়া তমলুক সহর, কোটিবর্ষিয়া দিনাজপুরের নিকটস্থ বানগড়, পুণ্ড্রবর্দ্ধনিয়া বগুড়ার নিকটস্থ মহাস্থান গড় ও দাসী খর্বটিয়া মেদিনীপুরের নিকটস্থ খর্বট। এ হতে বলা যায় যে মহাবীর ও তৎ শিষ্য-প্রশিষ্যদের প্রচারের ফলে সারা বাঙলায় এককালে জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মনে হয় পার্শ্বনাথের কালেও এসকল অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এই ধারণার কারণ বাঙলার বিভিন্ন স্থান হতে যে সকল জৈন তীর্থংকরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে পার্শ্বনাথেরই আধিক্য। খৃষ্টপূর্ব কাল হতে দীর্ঘকাল জৈন ধর্মের প্রচারের ফলে পূর্ব ভারতের এই অংশে বা বাঙলায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন বা ঐ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। তাঁদের দ্বারা বহু জৈন মঠ, মন্দির ও তীর্থংকরদের মূর্তি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন মৌর্য রাজারা যে সময় পাটলীপুত্র হতে বঙ্গ দেশ শাসন করতেন সে সময় এদেশে জৈন ধর্ম এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে পরবর্তী বহু শতক পর্যন্ত তার প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষিত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের কালে চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণে আসেন। তিনি এদেশে দীর্ঘকাল বাস করেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলা হয়েছে—হর্ষবর্দ্ধন শৈব হলেও জৈন ধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঐ সময় বাঙলায় বিশেষভাবে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বহু নিগ্রর্ন্থ জৈন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন ধর্ম অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাঙ্‌লাদেশে পাল রাজাদের শেষ যুগ হতে জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং সেন রাজাদের আমলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে বাঙ্‌লাদেশে বহু জৈন সংস্কৃতির নিদর্শন গুলি ভূগর্ভে নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উহা এমন শোচনীয় ভাবে ঘটে যে প্রাচীন জৈন সাহিত্য পাঠ ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে জানা যায় না যে বঙ্গদেশে এককালে বহু শতাব্দীব্যাপী জৈন ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব ও অস্তিত্ব ছিল ও এদেশেই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল বা অনুরাগী ছিল।

বর্তমান কালে গবেষণা, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় বাঙ্‌লার পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে জীর্ণ ভগ্ন অবহেলিত অবস্থায় থাকা প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠ, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতির মধ্যে অনেকগুলি জৈনদের তা জানা গিয়েছে। ইতি পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল ঐগুলি বৌদ্ধদের। এই বিষয়ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

প্রসঙ্গতঃ প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাঁকুড়া জেলার। এই জেলায় সকল স্থানই জৈন সাহিত্যে বর্ণিত লাঢ় সীমার মধ্যে তীর্থংকর মহাবীরের সময়ে ছিল এবং তাঁকে এই রাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচার কালে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় সেই স্থানেই পরে জৈন ধর্ম বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া, হাড়মাসরা, শালতোড়, ধরাপাট, মৌলবনি, অম্বিকানগর, সোনাতোপাল প্রভৃতি হতে এত সংখ্যক জৈন মঠ, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও তীর্থংকর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে বা আবিষ্কৃত হয়েছে যে সেগুলি বাঙ্‌লার অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক মনে হয়। বহুলাঢ়া (বহুলাড়া) পল্লীর সিদ্ধেশ্বরের বলে বর্তমানে খ্যাত মন্দিরটি আদিতে জৈন তীর্থংকরের ছিল সে ধারণা বর্তমানের বহু মনীষী করেন। এই মন্দিরে গর্ভ গৃহের সম্মুখে শিবলিঙ্গ; তার পশ্চাতে গণেশ ও দশভূজা হিন্দুদেবতাদের মধ্যে বা বিশিষ্ট স্থানে জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের ৪ ফুট উচ্চ মূর্তি বিরাজ করছে। এ দেখে মনে হয় না তিনি নিরাশ্রয় হয়ে এই মন্দিরে স্থান পেয়েছিলেন বরং এই ধারণাই হয় যে তাঁরই একক এই মন্দিরে পরবর্তী কালে হিন্দু দেবতারা অনুপ্রবেশ করেছেন। এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পুস্তকে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করছি—'শৈব ধর্মীদের প্রাধান্যের পূর্বে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীরাও

এখানে বহুলাড়ায় প্রভুত্ব করে গেছেন মনে হয়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মধ্যে আজও যে মূর্তি পূজিত হচ্ছে তা জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মূর্তি। এই মন্দিরের কাছে ভূগর্ভ হতে কয়েকটা স্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ঐগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাধি বা শারীরিক চৈইয। কিন্তু এস্থলে মন্তব্য যায়—জৈনদের মধ্যেও ঐরূপ কারণে সমাধি স্তূপ গঠন করা হত। স্তূপ পূজা বা আরাধনা জৈনরা বৌদ্ধদের পূর্বে আরম্ভ করেছিলেন। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতে জৈন বা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্বেও স্তূপ পূজা প্রচলিত ছিল দেবতার প্রতীক কিংবা ভক্তিভাজন পরলোকগত ব্যক্তির সমাধি হিসেবে।'

পরেশনাথ পল্লীর নাম থেকে এর সঙ্গে এককালে জৈন সম্পর্ক ছিল সে ধারণা হয়। পরেশনাথ পল্লী থেকে প্রস্তরের ওপর খোদাই করা বহু জৈন তীর্থংকরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল এ স্থানের পার্শ্বনাথের ৬ ফুট প্রস্তরের মূর্তি।

হাড়মাসরা পল্লী হতে সামান্য অনুসন্ধানে একটি জৈন তীর্থংকরের মূর্তি ও একটি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

শালতোড়া গ্রামের কিছু দূরে বিহারীনাথ পাহাড়ের সানুদেশে একটি প্রাচীন মন্দিরে একটি বিচিত্র বিগ্রহ আছে। উহাতে বিষ্ণুর ও জৈন তীর্থংকরের মিশ্রিত রূপ দেখা যায়। মনে হয় এ জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য কালে তীর্থংকর মূর্তির উপর বিষ্ণুর মুখমণ্ডল ও তাঁর দেহের অপর দু'একটি অংশ খোদিত করে জৈন মূর্তিকে হিন্দুমূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এরূপ অন্যত্রও দেখা যায়।

ধরাপাট পল্লীতে একটি জৈন তীর্থংকরের মূর্তি হিন্দুরীতি অনুসারে পূজিত হয় এবং একটি মন্দিরের মধ্যে প্রাচীরে জৈন তীর্থংকরের প্রস্তর খোদিত মূর্তি আছে। আদিতে এটি জৈনদের উপাসনা কেন্দ্র ছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের পূজাস্থলে পরিণত হয়েছে। মৌলবনি পল্লীর মল্লেশ্বর শিব মন্দিরের নিকটে ও অপর দু'এক স্থানে জৈন নিদর্শন বহু সংখ্যায় দেখা যায়।

সোনাতোপাল গ্রামে যে প্রাচীন মন্দিরটি আছে তার মধ্যে বিগ্রহ না থাকলেও স্থানীয় লোকদের মধ্যে বংশ পরম্পরায ধারণা প্রচলিত আছে উহা জৈনদের একটি পূজাস্থান। এ গ্রামের বহুস্থান হতে কয়েকটি জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পরে সেগুলি প্রাচীন মূর্তি ব্যবসায়ীদের দ্বারা অপসারিত হয়েছে।

পাহাড়পুর (প্রাচীন নাম সোমপুর) রাজসাহী জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশে) অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ঐ স্থানের ভূগর্ভের প্রথম স্তর হতে বৌদ্ধ ও দ্বিতীয় স্তর হতে জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যার দ্বারা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়—আদিকালে পাহাড়পুরে জৈনদের একটি ধর্মকেন্দ্র বা তীর্থস্থান ছিল।

পরে ওই স্থান বৌদ্ধরা অধিকার করে। সেই সময় ঐ স্থানে বৌদ্ধ বিহারটি সোমপুর বিহার নামে সুবিখ্যাত হয়। পাহাড়পুরের দ্বিতীয় স্তর হতে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হতে জানা যায়—ঐ স্থানের এক ব্রাহ্মণ দম্পতী ১৫৯ গুপ্তাব্দে বা খৃষ্টীয় ৪৭৮-৭৯ সালে) বটগোহালী নামক পল্লীতে নিগ্রর্ন্থদের (জৈনদের) মঠ নির্মাণের জন্য জৈন শ্রমণ (আচার্য) গুহনন্দীকে ভূমিদান করেন।

পাহাড়পুরের ভূগর্ভ হতে ২৯টি বিভিন্ন আকারের ইঁটের স্তুপও আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐগুলি জৈনদের হওয়াই সম্ভব।

মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থেকে সম্প্রতি জৈন ধর্ম সংস্কৃতির কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একটি পোড়ামাটির ফলক উল্লেখযোগ্য। তার উপর হংস মূর্তি খোদিত। জৈনদের স্থাপত্য শিল্পে হংসের চিত্র প্রায়ই দেখা যায়।

কাশিমবাজার মহাজন টুলিতে জৈন তীর্থংকর নেমিনাথের মূর্তি আছে। হিন্দু বিধানে তা পূজিত হয়। পুরুলিয়া জেলার পাকবিড়রা গ্রামে অষ্টম জৈন তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভদেবের ৭।। ফুট উচ্চ সুন্দর মূর্তি দেখা যায়। উহা খৃষ্টীয় নবম শতকে নির্মিত তাও জানা গিয়েছে।

বর্দ্ধমান জেলায় মেমারীর নিকট সাতদেউলিয়া এবং বরাকর পল্লী দুটিতেই জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও ভগ্ন অবস্থায় জৈন ধর্ম সংস্কৃতির বহু নিদর্শন দেখা যায়।

বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা নগরের (কালনার) অম্বিকা দেবীটি আদিতে জৈন দেবী। ইনি বর্তমানে দেবী দুর্গা বিশ্বাসে পূজিত হন। এঁর স্বরূপ বিষয়ে শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পুস্তকে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করছি—'আসলে অম্বিকা হলেন জৈন ধর্মীদের বিখ্যাত উপাস্য দেবী পরে বাংলার পলিমাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন।'[১]

চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ প্রান্তিক অংশ বা সুন্দরবন সীমার মধ্য হতে জৈন ধর্ম সংস্কৃতির বহু নিদর্শন (বন হাসিলের পর গত শতকে) দেখা গিয়েছে, সে সকলের বিষয় বিবৃত করার পূর্বে দু'একটী কথা বলার প্রয়োজন। বর্তমান সুন্দরবন সীমার মধ্যে বহু স্থান পূর্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও অরণ্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ জনপদপূর্ণ এবং এর অংশ বিশেষ রাঢ় ও পুণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মধ্যে প্রায় দুর্গম পল্লীতে দুটী প্রাচীন ধ্বংস স্তূপ (গত শতকে বন হাসিলের পর থেকে) দেখা যায়। ঐ দুটিই স্থানীয়

১ দ্রষ্টব্য: 'Iconography of the Jain Goddess Ambika', U. P. Shah, *Journal of the Review of Bombay*, vol. 9, part 2, 1940.

লোকদের নিকট 'মঠবাড়ী' বলে পরিচিত। প্রথমটি ঘোষের চকের মধ্যে বাইশহাটা নামে পল্লীর প্রান্তে ধানক্ষেতের মধ্যে বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। কিছুকাল পূর্বেও এর উচ্চতা ছিল প্রায় বিশ ফুট। বর্তমানে কিছু হ্রাস পেয়েছে। এই বাইশহাটার মঠ বাড়ীর কয়েক মাইল দূরে দ্বিতীয় মঠবাড়ী নলগোড়া নামে পল্লীর কাছে এবং বর্তমানে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট পরিচিত 'জটার দেউল' হতে ৪।৫ মাইলের মধ্যে। বর্তমানে এই নলগোড়ার মঠবাড়ীর সকল চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে স্থানীয় লোকদের এ হতে ইঁট অপসারণ কারণে। স্বর্গীয় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্ত মহাশয় মঠ বাড়ী দুটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন উক্ত ধ্বংসাবশেষ দুটি জৈন মঠের হওয়াই সম্ভব। কারণ এই অঞ্চল হতে বহু জৈন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এক্ষেত্রে ঐ স্থানের ইতিহাস বিখ্যাত জটার দেউলের উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেন উক্ত জটা পল্লীর প্রাচীন ও বিরাট মন্দির বা জটার দেউলটি জৈনদের ছিল। এই অনুমানের সমর্থনে বলা যায়—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সুন্দরবন অরণ্যমুক্ত করতে উদ্যোগী হয় সেই সময় এই মন্দিরটি প্রকাশ পায়। সে সময়ে ইংরেজ সার্ভেয়ার মিঃ স্মিথ যে বিবরণী রচনা করেন তার মধ্যে আছে তিনি জটা নামক অঞ্চলের মন্দিরের মধ্যে একটি ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় মূর্তি দেখেছিলেন। মূর্তিটি দণ্ডায়মান। পরবর্তীকালে বা বর্তমানে স্মিথ সাহেব বর্ণিত মূর্তিটি উক্ত মন্দিরে দেখা যায় না তবে অনুমান করা যেতে পারে যে মূর্তিটি কোন জৈন তীর্থংকরের ছিল। জটার দেউল বা বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে। এ দুটিই রেখ দেউল এবং নির্মাণকাল প্রায় একই সময়। বহুলাড়ার মন্দির সম্বন্ধে বহু আলোচনা গবেষণা হয়েছে। কয়েকজন ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন জৈন মন্দির বলে, কিন্তু জটার দেউল সম্বন্ধে বেশী গবেষণা হয়নি। গবেষণা কার্যের জন্য নির্ভরযোগ্য উপাদানও পাওয়া যায়নি। বন হাসিল কালে প্রাপ্ত ফলক থেকে জানা গিয়েছে উক্ত মন্দিরটি রাজা জয়ন্তচন্দ্র দ্বারা ৮৯৭ শকে বা স্থিরভাবে কিছু মন্তব্য করা না গেলেও খৃষ্টাব্দ ৯৫৭ সালে নির্মিত। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি জৈনদের বলে বহু গবেষক মন্তব্য করেছেন। জটার দেউলের সঙ্গে তার বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ও জটা অঞ্চল থেকে জৈন নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান করা যায় জটার দেউলটি জৈনদের ছিল। তীর্থংকর মহাবীরের সময় হতে ভদ্রবাহুর সময় পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) জৈন ধর্মের প্রচার স্থানগুলির মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে। এই জটার মন্দির পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে ছিল তাম্রলিপি হতে জানা যায়।

এই স্থান হতে প্রায় ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে সুন্দর বনের সীমার মধ্যে

দেলবাড়ী বা দেউলবাড়ী জঙ্গলে যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি জৈন মন্দির ছিল বলে কোন কোন অনুসন্ধানী গবেষক অনুমান করেন। 'দেউল' শব্দের অর্থ মন্দির—তা হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়—দেউল বা দেউলযুক্ত প্রাচীন গ্রাম হতে অতীত কালের যে সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই জৈন ধর্ম সংস্কৃতির পরিচায়ক। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বর্দ্ধমান জেলার সাতদেউলিয়া, পুরুলিয়ার দেউলে (বা দেউলী)।

চব্বিশ পরগণা জেলার পরম্পর হতে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত কয়েকটি পল্লীতে জৈনধর্ম সংস্কৃতির নিদর্শন দেখা যায়। সে কারণে অনুমান করা যেতে পারে জৈনধর্মের প্রাধান্য যুগে ঐ অঞ্চলে একটি জৈন সমাজ বা ধর্মকেন্দ্র ছিল। গ্রামগুলি যথাক্রমে করঞ্জলি, কাঁটাবেনিয়া, ঘাটেশ্বর। মিঃ ডেভিড ম্যাককাচ্চন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস সহ ঐ অঞ্চলে ভ্রমণকালে যে জৈন নিদর্শন দেখেছি তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

করঞ্জলি (এমন বিশুদ্ধ ভাষার পল্লীর নাম সাধারণতঃ শোনা যায় না, এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে এককালে এ গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল, বর্তমানে সাধারণ পল্লী) গ্রামে জনৈক ভূস্বামীর গৃহে কয়েকটি পুরাবস্তু রক্ষিত আছে। সে সবই ঐ অঞ্চল হতে সংগৃহীত। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি জৈন সংস্কৃতির নিদর্শন দেখা যায়। এই গ্রামের একটি পুষ্করিণীর ধারে দুটি বৃহৎ আকারের স্তম্ভ বা মন্দিরের থাম দেখা যায়। উহাতে খোদিত অলঙ্করণ লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করা যায় ঐগুলি জৈন শিল্পের নিদর্শন এবং স্তম্ভ দুটী কোন জৈন মন্দিরের যা ঐ গ্রামের ভূগর্ভে চলে গেছে। কাঁটাবেনিয়া গ্রাম হতে কিছু দূরে একটী পল্লীতে তীর্থংকর পার্শ্বনাথের একটি সুন্দর ও অক্ষত প্রায় ৪ ফুট উচ্চ মূর্তি সযত্নে মন্দিরে রক্ষিত আছে। নিত্যপূজাও হয়ে থাকে তবে লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ বিশ্বাসে। আগে এ মন্দিরে ছাগ বলিও হত।

কিছুদূরে অবস্থিত ঘাটেশ্বর পল্লীতে আদিনাথ বা জৈন ধর্মের প্রবর্তক ঋষভদেবের মূর্তি আছে।

ঘাটেশ্বর গ্রামের আদিনাথের মূর্তি জীর্ণ হলেও লক্ষণ, লাঞ্ছন ও শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করা যায় উহা ঋষভনাথের। পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান, মাথায় মুকুটাকারে জটাজুট, পার্শ্বে উড্ডীয়মান গন্ধর্ব, লাঞ্ছন বৃষ একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ক্যানিং শহর হতে কিছু দূরে মাতলা থানার অধীন বোলবাউল পল্লীতে অতি জীর্ণ অবস্থায় প্রায় ৫ ফুট উচ্চ যে জৈন মূর্তিটি দেখা যায় সেটি পার্শ্বনাথের। দক্ষিণ বারাসাতে ঐরূপ জীর্ণ অবস্থায় একটী পার্শ্বনাথের মূর্তি উন্মুক্ত স্থানে একেবারে অবহেলিত অবস্থায় দেখা যায়।

সুন্দর বনের সীমার মধ্য হতে কয়েকটি জৈন চৌখুপী মন্দিরের ক্ষুদ্র অনুকৃতি পাওয়া গেছে ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি উচ্চ, তার মধ্যে দুটি প্রস্তরের অপরগুলি পোড়া-মাটির। চৌখুপী গুলো চতুষ্কোণ। এর চারদিকে জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি খোদিত বা উদ্গত। চৌখুপী শব্দ চৌমুখ থেকে এসেছে। জৈন শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য চতুর্মুখ বা চৌমুখ মূর্তি।[২]

বঙ্গে সরাক নামে পরিচিত এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহারা জীব হিংসা করেন না, নিরামিষ আহার করেন। বর্তমানে হিন্দু সমাজ ভুক্ত হলেও আচার আচরণের মধ্যে জৈন প্রভাব দেখা যায়।

'সরাক' শব্দ শ্রাবক শব্দ হতে উৎপন্ন। গৃহী জৈনদের বলা হয়। রাঢ় অঞ্চলে সরাক সম্প্রদায়ের এখনো বেশ প্রাধান্য দেখা যায়। ময়ূর ভঞ্জের রানীবাঁধ অঞ্চলের সরাকেরা বর্তমানেও তীর্থংকর মহাবীরের মূর্তি পূজা করে থাকেন হিন্দু ও জৈন মিশ্রিত বিধানে।

বর্দ্ধমান জেলার নাম যে তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীরের নাম অনুসারে হয়েছে সে কথা বহু মনীষী অনুমান করেন। শ্রী বিনয় ঘোষ ঐ অনুমান সমর্থন করেন তা তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি হতে জানা যায়।

বাঙলার অবধূতদের ধর্মীয় আচার-আচরণ গুলির মধ্যে জৈন প্রভাব দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নগ্ন থাকেন। কিন্তু জৈন সন্ন্যাসীদের মত কৃচ্ছ্র সাধন করেন না। এমন কি সংসার ধর্মও পালন করে থাকেন।

অমৃত, ১২, ১, ৭১

২ "...মূর্তি নির্মাণ শিল্পে জৈনদের আর একটী অবদান চতুর্মুখ বা চৌমুখ মূর্তি। মাঝখানে চৈত্যবৃক্ষ বা মন্দির। তার চার দিকে চারজন তীর্থংকরের মূর্তি। এই সর্বতোভদ্র প্রতিমা নির্মাণের আদর্শের পেছনে রয়েছে জৈন সমবসরণ অর্থাৎ উপদেশ সভার আদর্শ যেখানে তীর্থংকর মাঝখানে বসেন। সেই দিক ছাড়া অন্য তিন দিকে তাঁর প্রতিকৃতি রাখা হয়, যতে সকলেরই তীর্থংকর দর্শন হতে পারে।" ইন্দ্র দুগার, 'স্থাপত্য ও সাহিত্যে জৈন প্রভাব'।

সিদ্ধার্থ

শ্রীরামজীবন আচার্য

সিদ্ধার্থ!
কৃতার্থ তুমি পুত্র লভি বর্ধমান জিন।
গৃহে গৃহে মানুষেরা আপন স্বার্থের লাগি
ব্যস্ত অবিরত,
সকলের হিত ব্রতে সুত তব সাধি মহাব্রত
পুণ্য তব করেছে বর্দ্ধিত।
ধন্য হল ধরণী ধূলির।
নিখিল জনককুল মহাবীর বর্দ্ধমান হতে
পুত্র-লাভ-পুলকে আকুল।
যত দিন যাবে
স্থাবর জঙ্গম লাগি তোমার তনয়-প্রেম
কস্তুরী গন্ধের মতো জগৎ ভরিবে:
হিংসার ঝটিকা মাঝে এ বিশ্বাস এখনো বিরাজে।
সিদ্ধার্থ! কৃতার্থ তুমি॥

মহাবীর-বাণী

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

: ১১-২ :

অপ্রমাদ সূত্র

১২৩। যেমন শীত ঋতুর রাত্রি শেষে বৃক্ষের পাতা পীত বর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে সেইরূপ মনুষ্য জীবনও আয়ুঃশেষ হইলে সহসা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১২৪। যেমন শিশির বিন্দু কুশাগ্রের ওপর অল্পক্ষণই অবস্থান করিতে পারে সেইরূপ মনুষ্য জীবনও স্বল্পস্থায়ী—শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১২৫। নানা প্রকার বিঘ্নযুক্ত অত্যন্ত অল্প আয়ু এই মানব জন্মে পূর্ব সঞ্চিত কর্ম রজকণার মত ঝাড়িয়া ফেল। অতএব হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১২৬। দীর্ঘকাল পরেও প্রাণীদের মনুষ্য জন্মলাভ দুর্লভ। কারণ কৃতকর্মের বিপাক অত্যন্ত প্রগাঢ়। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১২৭। এই জীব পৃথিবীকায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অসংখ্যকাল থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১২৮। এই জীব অপ্‌কায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অসংখ্যকাল থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১২৯। এই জীব তেজস্কায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অসংখ্যকাল থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩০। এই জীব বায়ুকায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অসংখ্যকাল থাকে। হে গৌতম। ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩১। এই জীব বনস্পতিকায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অনন্তকাল থাকে। ইহা শেষ করা খুবই শক্ত। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩২। এই জীব দ্বীন্দ্রিয়কায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অনন্তকাল থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৩। এই জীব ত্রীন্দ্রিয়কায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অনন্তকাল থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৪। এই জীব চতুরিন্দ্রিয়কায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অনন্তকাল থাকে। হে গৌতম। ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৫। এই জীব পঞ্চেন্দ্রিয় কায় ধারণ করে ও সেখানে উৎকৃষ্ট অনন্তকাল থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৬। প্রমাদ বহুল জীব নিজ শুভাশুভ কর্মের জন্য এই প্রকার অনন্তবার ভব চক্রে এদিক হইতে ওদিকে ঘুরিতে থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৭। মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইলেই বা কি? আর্যত্ব প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনেক জীব মনুষ্য দেহ লাভ করিলেও দস্যু ও ম্লেচ্ছ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৮। আর্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও পঞ্চেন্দ্রিয় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনেক লোক আর্য ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেও বিকলেন্দ্রিয়। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৩৯। পঞ্চেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইলেও উত্তম ধর্ম শ্রবণ কঠিন। অনেক লোক পাষণ্ড (দুরাচারী) গুরুর সেবা করে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪০। উত্তম ধর্ম শ্রবণ করিলেও সেই ধর্মে শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। বহু লোক জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যাত্বের (অজ্ঞানের) উপাসনায় নিরত থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪১। ধর্মে শ্রদ্ধা হইলেও জীবনে ধর্মের আচরণ করা কঠিন। সংসারে অনেক ধর্মে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি কামভোগে রত থাকে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪২। তোমার শরীর প্রতিদিন জীর্ণ হইতেছে। মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইতেছে। অধিক কি শারীরিক ও মানসিক সমস্ত প্রকার শক্তি কমিয়া যাইতেছে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৩। অরুচি, ফোঁড়া, বিসূচিকা আদি নানা প্রকার ব্যাধি শরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার জন্য তোমার শরীর ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইতেছে। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৪। কমল যেমন শরৎকালের নির্মল জলকেও স্পর্শ করে না পৃথক ও অলিপ্ত থাকে, সেই প্রকার তুমিও সংসার হইতে সমস্ত আসক্তি দূর কর ও সর্ব

প্রকারের স্নেহ বন্ধন রহিত হও। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৫। স্ত্রী ও ধন পরিত্যাগ করিয়া তুমি মহান অনাগার পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব উদ্গীর্ণ বস্তু পুনর্বার আহার করিও না। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৬। বিপুল ধনরাশি ও মিত্র বান্ধবদের একবার স্বেচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখন পুনরায় তাহাদের খবরাখবর গ্রহণ করিও না। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৭। আঁকা-বাঁকা বিষম মার্গ পরিত্যাগ করিয়া তুমি সোজা ও পরিষ্কার পথে চল। বিষম পথে ভ্রমণকারী নির্বল ভার বাহকের মত পরে অনুতাপ করিও না। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৮। তুমি বিশাল সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ। এখন কূলে আসিয়া কেন ইতস্ততঃ করিতেছ। অপর পারে উঠিবার জন্য যতদূর সম্ভব শীঘ্রতা কর। হে গৌতম! ক্ষণমাত্রও প্রমাদ করিও না।

১৪৯। ভগবান মহাবীরের এই প্রকার অর্থপূর্ণ সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রী গৌতম স্বামী রাগদ্বেষ ছিন্ন করিয়া সিদ্ধগতি প্রাপ্ত হইলেন।

ঃ ১২ ঃ

প্রমাদ-সূত্র স্থান

১৫০। প্রমাদকে কর্ম বলা হইয়াছে ও অপ্রমাদকে অকর্ম, অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি প্রমাদ যুক্ত তাহা কর্ম বন্ধন কারী এবং যে প্রবৃত্তি প্রমাদ রহিত তাহা কর্মবন্ধন কারী নয়। প্রমাদ থাকিলে মূর্খ, না থাকিলে পণ্ডিত বলা হয়।

১৫১। যে প্রকারে বক ডিম হইতে এবং ডিম বক হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার মোহ তৃষ্ণা হইতে ও তৃষ্ণা মোহ হইতে উৎপন্ন হয়।

১৫২। রাগ ও দ্বেষ—এই দুইটী কর্ম বীজ। এই জন্য কর্মকে মোহের উৎপাদক বলা হয়। কর্ম সিদ্ধান্তের বিশেষজ্ঞেরা বলেন সংসারে জন্ম মৃত্যুর মূল কারণ কর্ম এবং জন্ম ও মৃত্যুই একমাত্র দুঃখ।

১৫৩। যাহার মোহ নাই তাহার দুঃখ শেষ হইয়াছে। যাহার তৃষ্ণা নাই তাহার মোহ বিগত হইয়াছে, যাহার লোভ নাই তাহার তৃষ্ণার অবসান হইয়াছে, যাহার নিকট লোভ করিবার মত পদার্থের সংগ্রহ নাই তাহার লোভ চলিয়া গিয়াছে।

১৫৪। দুগ্ধ ও দধির মত রস সঞ্চারক খাদ্য অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিতে নাই, কারণ

রস মনুষ্যে এক মাদকতার সৃষ্টি করে। স্বাদু ফল যুক্ত বৃক্ষের দিকে যেরূপ পক্ষী ধাবিত হয় সেই প্রকার মত্ত মানুষের দিকে কাম বাসনা ধাবিত হয়।

১৫৫। যে মূর্খ মানব সুন্দর রূপের প্রতি তীব্র আসক্তি রাখে সে অকালেই বিনষ্ট হয়। দীপ শিখা দেখিবার লালসায় যে প্রকারে পতঙ্গের মৃত্যু হয় সেই প্রকারে রাগাতুর ব্যক্তির রূপ দর্শনের লালসায় মৃত্যু হয়।

১৫৬। রূপে আসক্ত মনুষ্য কখনো কোথা হইতে কিঞ্চিৎমাত্রও সুখ প্রাপ্ত হয় না। খেদ এইজন্য মানুষ যাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে তাহার উপভোগে কিঞ্চিৎমাত্র সুখ প্রাপ্ত না হইয়া কেবলমাত্র ক্লেশ ও দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৫৭। যে মনুষ্য কুৎসিত রূপের প্রতি দ্বেষ পোষণ করে সে ভবিষ্যতে অসীম দুঃখ পরম্পরার ভাগী হয়। দ্বেষভাবাপন্ন চিত্তের দ্বারা এই রূপ পাপ কর্ম সঞ্চিত হয় যাহা ফলপ্রদানকালে ভয়ঙ্কর দুঃখ রূপ ধারণ করে।

১৫৮। রূপ বিরক্ত মানবই প্রকৃত শোক রহিত। যেমন কমল পত্র জলে লিপ্ত হয় না সেইরূপ সেও সংসারে বাস করিয়াও দুঃখ প্রবাহ হইতে অলিপ্ত থাকে।

১৫৯। উপরোক্ত ইন্দ্রিয় তথা মনের বিষয় ভোগই অনুরাগী ব্যক্তির দুঃখের কারণ হয় কিন্তু তাহারা বীতরাগী ব্যক্তিকে কোন প্রকারে একটুও দুঃখ দিতে সমর্থ হয় না।

১৬০। কাম ভোগ নিজ হইতে কোন মনুষ্যে সমভাব উৎপাদন করে না বা রাগদ্বেষ বিকৃতির সৃষ্টি করে না। স্বয়ং মানুষই তাহাদের প্রতি রাগদ্বেষ মূলক জল্পনা করিয়া মোহের দ্বারা বিকার গ্রস্ত হয়।

১৬১। অনাদিকাল হইতে উৎপন্ন সমস্ত প্রকার সাংসারিক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার এই মার্গই জ্ঞানী পুরুষগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। যে জীব সেই মার্গের অনুসরণ করে সে ক্রমশঃ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সুখী হয়।

[ক্রমশঃ

কল্যাণ মন্দির স্তোত্র

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

হে দেব, তোমার বর্ণটি শ্যাম, বাণী তব গম্ভীর
হেম-রত্নের সিংহাসনেতে বসে আছ তুমি স্থির।
ভব্যজীব সে দেখে তোমা, দেখে বনশিখী যথা ধীরে—
জলদমন্দ্রকারী নবোদিত মেঘমালা মেরু শিরে ॥

ওগো বীতরাগ, উজ্জ্বল দ্যুতি যা তব ভামণ্ডলে,
অশোকবৃক্ষ-কিশলয়রাগ তাতেই তো দেখি টলে।
এ কথাও ঠিক, বীতরাগী যদি সম্মুখে হয় নীত,
অতি সচেতন—সে প্রাণীও রাগ থেকে হয় বর্জিত ॥

দেবদুন্দুভি আকাশে বাজছে, হে দেব, সে যেন হাঁকে—
ত্রিলোকবাসীকে ডাক দিয়ে দিয়ে এই কথা বলে থাকে ঃ
হে ভব্যজীব, সকল প্রমাদ ত্যাগ করো, ত্যাগ করো।
মোক্ষপুরে যে নিয়ে যাবে সেই সার্থবাহকে ধরো ॥

হে নাথ, ত্রিলোক প্রকাশিত তুমি করেছ বলেই তাই—
নিজ অধিকার হারিয়ে ও-চাঁদ তারায় নিয়েছে ঠাঁই।
তিন দেহ—চাঁদ সে শোভে তোমার শ্বেত ছত্রটি হয়ে—
যেখানে মুক্তামালাগুলি জ্বলে তারাদেরই রূপ লয়ে ॥

ওগো ভগবন্, চারিদিকে তব তিনটি প্রাকার দেখি ঃ
যা হয়েছে গড়া মাণিক্য-সোনা-রোপ্যের দ্বারা এ কি!
ত্রিলোক ব্যাপিয়া এ তিন তোমার—ভাবতে আনে সাহস,
তিন যেন তারা ঃ তোমার কান্তি, তোমার প্রতাপ, যশ ॥

নতিকালে দামী ইন্দ্রমুকুটও ওর কাছে কিছু নয়,
হে জিনেশ, নেয় দিব্য সুমন তব পদে আশ্রয়।

রীতি তো ইহাই, তব আগমনে সুমন বা সজ্জন
তব পদ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার রাখে না মন ॥

সংসাররূপ সমুদ্র হতে তুমি নিয়ে যাও পারে,
পৃষ্ঠলগ্ন হয়েছে তোমার হে নাথ—এমন তারে।
তুমি মৃণ্ময় কলস তো নও—জন্ম বিপাকে যার,
কর্ম বিপাক রহিত তবুও তুমি করে দাও পার ॥

হে জীবপালক বিশ্বেশ্বর, ক'জন তোমাকে বোঝে ?
তোমাকে বুঝতে ক'জন চলেছে দুর্গমতার খোঁজে ?
অক্ষরগুণে গুণী তুমি তবু লিপিহীন নিরাকার,
অজ্ঞান-ই বটে, বিশ্বপ্রকাশে স্ফূরিত চেতনা যার ॥

দুষ্ট কমঠ তোমা পরে নাথ করেছিল ধূলিবৃষ্টি,
আকাশ আঁধার করে তুলেছিল, ক্রুদ্ধ কী তার দৃষ্টি !
কিন্তু তোমার ছায়াও পারেনি ঢাকতে সে ধূলিহস্ত,
বরং সেই সে দুরাত্মাজনই হয়েছে বিপদগ্রস্ত ॥

তারপর সেই দুষ্ট কমঠ করেছিল সে কী গর্জন,
বিদ্যুৎ হেনে বারিবর্ষণে করেছিল সে কী তর্জন !
হে জিনেশ, তুমি সইলে সকলই—বিদ্যুৎ আর বিঘ্ন,
তারই কাছে শেষে ফিরে গেল তারা তরবারি হয়ে তীক্ষ্ণ ॥

তারপর সেই কমঠ পাঠালো প্রেতের দলকে শেষে,
খাড়া চুল আর ভীষণ আকৃতি—দাঁড়ালো সবাই এসে
গলায় মুণ্ডমালা, মুখ থেকে আগুন যে হয় বার,
সেই অসুরেরা ভবদুঃখের কারণই হল যে তার ॥

ওগো লোকনাথ, এই পৃথিবীতে তারেই ধন্য মানি—
ত্রিসন্ধ্যাকালে সব কাজ ছেড়ে এগিয়ে আসে যে প্রাণী।
ভক্তিভাবে যে বিধিপূর্বক রোমাঞ্চ কলেবর—
তোমার চরণযুগলের ধ্যানে হয়ে থাকে তৎপর ॥

এই সংসার সাগর অপার—হেথা মানি মনে তাই,
হে মুনীশ, মোর কান যে তোমার নামটিও শোনে নাই।
কারণ তোমার নামরূপ সেই মন্ত্র কানে যে পায়—
বিপত্তিরূপ নাগিনী কী তার নিকটে কখনো যায় ?

আগের আগের জন্মেও মানি ঘটেছে হে দেব ত্রুটি,
পূজিনি তোমার অভিষ্টদানকারী ও চরণ দুটি।
তাই মুনিবর এই জন্মেতে মিলেছে তিরস্কার,
হৃদয় নিয়েছে হৃদয় মথনকারী যন্ত্রণা-ভার ॥

মোহরূপ এই অন্ধকারেতে আবৃত চক্ষুদ্বয়,
তাই প্রভু আগে দেখিনি তোমায়, এ কথা সুনিশ্চয়।
মর্মভেদী ও অতিবলবান অনর্থ দেয় দুখ,
অন্যথা হলে জানি নিশ্চয় দিতে মোরে প্রভু সুখ ॥

জনবান্ধব, আমি যে তোমার নাম শুনে পূজা করে'
তোমাকে দেখেও ভক্তিভরেতে রাখিনি হৃদয় ধরে।
তাই দুঃখের পাত্র হয়েছি—সন্দেহ নেই তার,
ভাবহীন ক্রিয়া সুফলদায়ক হয় না কখনো হায় ॥

হে নাথ, আর্তবৎসল বশীবর হে মহেশ ধীর,
ওগো অশরণ-শরণ, দয়ার পবিত্র মন্দির,
ভক্ত্যাবনত যে তোমার, তারে করো দয়া দয়াময়,
তার দুঃখের হেতুটুকু যেন স্থায়ী না কখনো হয় ॥

ত্রিলোকপুণ্যকারী রিপুনাশী হে সখা হে আদিহীন,
তুমি সারভূত আশ্রয়, বোঝে শরণাগত যে দীন।
প্রথিত-মহিমা, তোমার চরণ পেয়েও ধারিনি ধার,
করিনিক, ধ্যান অভাগ্য আমি, হা-হুতাশই আজ সার ॥

ওগো দেবেন্দ্রবন্দ্য, সকল পদার্থ সারজ্ঞাতা,
ভুবনাদিনাথ হে দেব দয়ালু, তুমি সংসারত্রাতা।

ভয়ঙ্কর এ দুঃখসাগরে আমি যে পীড়িত বড়,
উদ্ধার করে বাঁচাও আমারে, মোরে পবিত্র করো ॥

তোমার চরণকমলে আমার ভক্তির কিছু ফল
চিরটা কালের যদি জমে থাকে—সেই হোক সম্বল ।
ওগো নাথ মোর, ওগো শরেণ্য, তুমি শরণ্য হও,
ইহলোকে বা ও-পরলোকে তুমি স্বামী হয়ে মোর রও ॥

ওগো জিনেন্দ্র, সমাহিতজ্ঞানসহ যে ভব্য জীব
উল্লাসময় রোমাঞ্চকর-দেহ হয়ে উদগ্রীব
তোমার বদন কমলে সতত আপন দৃষ্টি রাখে
বিধিপূর্বক স্তব করে করে তোমাকেই সে যে ডাকে ।

কুমুদচন্দ্র তুমি বটে ঠিক (শ্বেতপদ্ম এ চোখ
তারে বিকশিত করতে চাঁদের মতো যার উদ্যোগ)
স্বর্গের সেরা সম্পদ-ভোগ ভব্যজীবেই করে,
কর্মমলটি বিনষ্ট করে মোক্ষপদ সে ধরে ॥

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

তারপর সেই বুদ্ধিমানেরা অবশিষ্ট গোশীর্ষ চন্দন ও রত্নকম্বল বিক্রয় করে স্বর্ণ ক্রয় করল। সেই স্বর্ণ ও যে অর্থ দিয়ে তারা গোশীর্ষ চন্দন ও রত্নকম্বল ক্রয় করতে চেয়েছিল সেই অর্থ দিয়ে স্বর্ণ ক্রয় করে মেরুর শিখরের মত এক জিনালয় নির্মাণ করল। জিন প্রতিমার পূজা ও গুরুর উপাসনা করে তারা কর্মক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কাল ব্যতীত করল। তারপর একসময় তাদের মনে সংবেগ উৎপন্ন হল। তখন তারা মুনি মহারাজের নিকটে গিয়ে জন্মবৃক্ষের ফলরূপী দীক্ষা গ্রহণ করল। নবগ্রহ যেমন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করে এক রাশি হতে অন্য রাশিতে যায় তারাও সেইরূপ গ্রাম নগর বনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করে অন্যত্র বিহার করতে লাগল। উপবাস, ছয় দিনের উপবাস, আট দিনের উপবাস রূপ তপস্যায় তারা চারিত্র রূপ রত্নকে উজ্জ্বল করতে লাগল। আহার দানকারীকে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়ে কেবল প্রাণ ধারণের জন্য তারা মাধুকরী বৃত্তিতে পারণের দিন মাত্র ভিক্ষা গ্রহণ করত। বীর যেমন শস্ত্র প্রহার সহ্য করে তারাও সেই প্রকরে ধৈর্য সহকারে ক্ষুধা পিপাসা গ্রীষ্মাদি পরিসহ সহ্য করত। মোহরাজের চার সেনাপতি রূপ চার কষায়ক তারা ক্ষমাদি শস্ত্রে জয় করল। তারপর তারা দ্রব্য ও ভাবে সংলেখনা গ্রহণ করে কর্ম রূপ পর্বতকে নাশ করতে বজ্ররূপ অনশন ব্রত গ্রহণ করল। সমাধি ধারণ করে পঞ্চ পরমেষ্ঠী স্মরণ করতে করতে তারা নিজ শরীর ত্যাগ করল। বলাই হয় মহাত্মা পুরুষের নিজ দেহেও মোহ থাকে না।

দশম ভব

সেই ছয় মহাত্মা সেখানকার আয়ু শেষ করে অচ্যুত নামক দেবলোকে ইন্দ্রের সামানিক দেব হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। কারণ ওই প্রকার তপস্যার ফল সামান্য হয় না। সেই বাইশ সাগরোগম আয়ু পূর্ণ করে তারা আবার চ্যুত হল। মোক্ষ ছাড়া অন্য কোন স্থানই অচ্যুত নয়।

একাদশ ভব

পূর্বাবিদেহে পুষ্কলাবতী নামক বিজয়ে লবণ সমুদ্রের তীরে পুণ্ডরিকিনী নামে এক নগর ছিল। সেই নগরের রাজার নাম ছিল বজ্রসেন। তাঁর ধারিণী নামক পত্নীর

গর্ভে তাদের পাঁচজন পুত্ররূপে উৎপন্ন হল। সেই পাঁচ পুত্রের মধ্যে জীবানন্দের জীব চতুর্দশ মহাস্বপ্ন সূচিত বজ্রনাভ নামে প্রথম পুত্র হল। রাজপুত্র মহীধরের জীব সুবাহু নামে দ্বিতীয়, মন্ত্রীপুত্র সুবুদ্ধির জীব সুবাহু নামে তৃতীয়, শ্রেষ্ঠীপুত্র পূর্ণভদ্রের জীব পীঠ নামক চতুর্থ এবং সার্থবাহপুত্র পূর্ণ ভদ্রের জীব মহাপীঠ নামক পঞ্চম পুত্ররূপে উৎপন্ন হল। কেশবের জীব সুযশ নামে অন্য রাজপুত্র হল। সুযশ বাল্যকাল হতেই বজ্রনাভের সন্নিকটে থাকতে আরম্ভ করল। পূর্ব ভবের স্নেহ সম্বন্ধ এই ভবেও স্নেহ সম্বন্ধ উৎপন্ন করে।

ছয় বর্ষধর পর্বত যেন মনুষ্যদেহ ধারণ করেছে সেই প্রকার সেই পাঁচ রাজপুত্র ও সুযশ ক্রমশঃ বড় হতে লাগল। সেই মহাপরাক্রমী রাজপুত্ররা যখন রাজপথে অশ্ব ধাবিত করত তখন তাদের সূর্যপুত্র রেবন্তের মত মনে হত। কলাশিক্ষাদানকারী আচার্যেরা সাক্ষীমাত্রই ছিলেন। কারণ মহাত্মাদের গুণ নিজে হতেই উৎপন্ন হয়। তারা নিজের হাতে বড় বড় পর্বতকেও শিলাখণ্ডের মত তুলে নিত। এজন্য তাদের যা বাল্যক্রীড়া তা আর কেউ-ই করতে সক্ষম ছিল না।

একদিন লোকান্তিক দেবতারা এসে বজ্রসেনকে বললেন, হে প্রভু, ধর্মতীর্থ প্রবর্তন করুন, ধর্মতীর্থ আরম্ভ করুন।

বজ্রসেন তখন বজ্রের মত পরাক্রমী বজ্রনাভ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে এক বছর দান দিয়ে লোকেদের এভাবে তৃপ্ত করলেন মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে পৃথিবীকে জলময় করে দেয়। তারপর দেবতা, অসুর ও মনুষ্যের অধিপতিরা বজ্রসেনের প্রব্রজ্যা গ্রহণ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বার করল। চন্দ্রমা যেমন আকাশ সুশোভিত করে সেই প্রকার বজ্রসেন নগর বাইরের উদ্যানকে সুশোভিত করলেন। সেইখানে স্বয়ংবুদ্ধ তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনঃ পর্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হল। তারপর আত্মস্বভাবে রমণ করে, সমভাবধারী, মমতাহীন নিষ্পরিগ্রহী তিনি নানাবিধ অভিগ্রহ ধারণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

ওদিকে বজ্রনাভ নিজের প্রত্যেক ভাইকে পৃথক পৃথক রাজ্য দিলেন। সেই চার ভাই তাঁর সেবায় সর্বদা তৎপর রইলেন। এতে তিনি লোকপালে যেমন ইন্দ্র শোভা পান সেইরূপ শোভা পেতে লাগলেন। অরুণ যেমন সূর্যের সারথী সেইরকম সুযশ তাঁর সারথী হল। মহারথী পুরুষের সারথী নিজের অনুরূপই করা উচিত।

বজ্রসেনের ঘাতিকর্মরূপ মলিনতা দূর হলে দর্পণের মলিনতা দূরে যেমন উজ্জ্বল হয় সেইরূপ উজ্জ্বল কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

সেই সময় বজ্রনাভ রাজার আয়ুধশালায় সূর্যমণ্ডলকে তিরস্কারকারী চক্ররত্ন উৎপন্ন হল। বাকী তের রত্নও তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হলেন। বলাও হয়—কমলিনী যেমন জলানুরূপ উঁচু হয় সেইরূপ পুণ্যানুসারে সম্পত্তিও প্রাপ্ত হয়। সুগন্ধে

আকৃষ্ট হয়ে যেমন ভ্রমরকুল আসে সেই প্রকার প্রবল পুণ্যে আকৃষ্ট হয়ে নবনিধিও এসে তাঁর গৃহে সেবা করতে লাগল।

তারপর তিনি সমগ্র পুষ্কলাবতী বিজয় জয় করে নিলেন। এতে সেখানকার সমস্ত রাজন্যরা তাঁকে চক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত করল। ভোগোপভোগ উপভোগকারী রাজার ধর্মবুদ্ধিও এভাবে অধিকাধিক বর্দ্ধিত হতে লাগল যেন তা বর্ধমান আয়ুর প্রতিস্পর্দ্ধা করছে। অধিক জলে যেমন লতা বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ সংসার বৈরাগ্যের সম্পত্তিতে তাঁর ধর্মবুদ্ধিও বর্দ্ধিত হতে লাগল।

একবার সাক্ষাৎ মোক্ষরূপ আনন্দ উৎপন্নকারী ভগবান বজ্রসেন প্রব্রজন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সমবসরণে চৈত্যবৃক্ষের নীচে বসে তিনি কর্ণের জন্য অমৃত তুল্য ধর্ম দেশনা দিতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে চক্রবর্তী বজ্রনাভ বন্ধুবর্গের সঙ্গে রাজহংসের মত সমবসরণে এলেন ও সানন্দে তিন প্রদক্ষিণা দিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করে ইন্দ্রের পশ্চাতে অনুজ ভ্রাতার মত উপবেশন করলেন। তারপর ভব্যজীবের মনরূপী শুক্তিতে বোধরূপী মুক্তো উৎপন্ন করা স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির সমান তাঁর দেশনা সেই শ্রাবকশ্রেণী শুনতে লাগলেন। মৃগ যেমন গীতধ্বনি শুনে উৎসুক হয় তিনিও তেমনি তাঁর সুমধুর বাণী শুনে হর্ষান্বিত হয়ে বিচার করতে লাগলেন—এই সংসার অপার সমুদ্রের মত দুস্তর। একে উত্তীর্ণ করে ত্রিলোকনাথ হয়েছেন আমার পিতাই। পুরুষকে অন্ধকারের মত যা অন্ধ করে সেই মোহ, সূর্যের মত সর্ব প্রকারে যিনি ভেদ করেছেন তিনি এই জিনেশ্বরই। চিরকাল সঞ্চিত এই কর্ম সমূহ মহাভয়ঙ্কর অসাধ্য রোগের মত। এর চিকিৎসক আমার পিতাই। অধিক আর কি বলার আছে? করুণারূপ অমৃতের সাগর তুল্য ইনিই দুঃখের নাশ ও অদ্বিতীয় সুখের উৎপন্নকারী। এরূপ জিনেশ্বর বর্তমান থাকতেও আমি মোহের দ্বারা প্রমাদী হয়ে লোকের মধ্যে যা প্রধান সেই নিজ আত্মাকে ধর্ম হতে অনেককাল বঞ্চিত রেখেছি।

এই রূপ বিচার করে সেই চক্রবর্তী ধর্মচক্রবর্তী কেবলীকে ভক্তি গদ-গদ কণ্ঠে নিবেদন করলেন, হে প্রভু, দর্ভ যেমন ক্ষেত্রকে কদর্থিত করে সেইরূপ অর্থসাধন প্রতিপন্ন কারী নীতি শাস্ত্র আমার বুদ্ধিকে কদর্থিত করেছে। বিষয় লোলুপ হয়ে আমি (নেপথ্য কর্মে) বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এই আত্মাকে নটের মত দীর্ঘকাল নৃত্য করিয়েছি। আমার এই সাম্রাজ্য অর্থ ও কামের জন্যই। এর মধ্যে ধর্মের যে অনুচিন্তন করা হয় তাও পাপানুবন্ধীই হয়। আমি আপনার মত পিতার পুত্র হয়ে যদি সংসার সুমুদ্রে পথভ্রষ্ট হই তবে আমাতে ও অন্য সামন্য মনুষ্যে পার্থক্য কী? এজন্য আমি যেমন আপনা কর্তৃক প্রদত্ত রাজ্য পালন করেছি সেইরূপ এখন সংযমরূপী সাম্রাজ্যও আমায় দিন। আমি তারও পালন করব।

নিজের বংশরূপী আকাশে সূর্যসমান সেই চক্রবর্তী বজ্রজংঘ নিজের পুত্রকে রাজ্য দিয়ে ভগবানের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে ব্রত গ্রহণ করেছেন সেই ব্রত বাহু আদি ভাইয়েরাও গ্রহণ করল। কারণ তাদের কুলরীতি এই-ই ছিল। সুযশ সারথীও ধর্মের সারথী তুল্য ভগবানের কাছে নিজের প্রভুর সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করল। সেবক প্রভুর অনুকরণকারীই হয়।

বজ্রনাভ মুনি অল্পদিনের মধ্যেই শাস্ত্র সমুদ্র অতিক্রম করলেন। এতে তিনি এক অঙ্গ শরীরে প্রত্যক্ষ দ্বাদশাঙ্গী তুল্য মনে হতে লাগলেন। বাহু আদি অন্য মুনিরা এগারো অঙ্গ অধিগত করলেন। ঠিকই বলা হয় ক্ষয়োপশমে প্রাপ্ত বিচিত্রতার জন্য গুণ-সম্পত্তিও বিচিত্রই হয়। যদিও তিনি সন্তোষ রূপ ধনে ধনী ছিলেন তবুও তীর্থংকরের চরণ সেবা ও দুষ্কর তপ করেও অসন্তুষ্টই ছিলেন। মাসাবধির তপস্যা উপবাস করেও তিনি নিরন্তর তীর্থংকরের বাণীরূপ অমৃতের পান করার জন্য কখনো গ্লানি অনুভব করতেন না। তারপর ভগবান বজ্রসেন উত্তম শুক্লধ্যানে নির্বাণ পদ প্রাপ্ত হলেন। দেবতারা তাঁর নির্বাণোৎসব পালন করলেন।

বজ্রনাভ মুনি ধর্মের ভ্রাতার মত নিজের সঙ্গে ব্রত ধারণ কারী মুনিদের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। অন্তরাত্মায় যেমন পাঁচ ইন্দ্রিয় সনাথ হয় সেই রকম বজ্রনাভ স্বামীর দ্বারা বাহু আদি· চার ভাই ও সারথী এই পাঁচ মুনি সনাথ হলেন। চন্দ্রের চন্দ্রিকায় যেমন পর্বতে ওষধি প্রকটিত হয় সেইরূপ যোগের প্রভাবে তাঁদের নিম্নোক্ত যোগ লব্ধি প্রাপ্ত হল।

লব্ধি নিম্ন প্রকার—

(১) শ্লেষ্মৌষধি লব্ধি—এরূপ লব্ধি সম্পন্ন মুনির সামান্য থুতু যদি কুষ্ঠ রোগাক্রান্তের শরীরে লেপন করা হয় তবে কোটি রসে (সুবর্ণ তৈরীর রসে) যেমন তাম্র সুবর্ণ বর্ণ হয় সেরূপ তার শরীর স্বর্ণ কান্তি হয়।

(২) জল্লৌষধি লব্ধি—এরূপ লব্ধি সম্পন্ন মুনির কানের খোল, চোখের পিচুটি ও শরীরের ময়লা সমস্ত রোগের নাশকারী, ও কস্তুরির সমান সুগন্ধ যুক্ত হয়।

(৩) আমর্শৌষধি লব্ধি—অমৃত স্নানে যেমন রোগীর রোগ দূরীভূত হয় সেরূপ এরূপ লব্ধি সম্পন্ন মুনির শরীর স্পর্শে সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়।

(৪) সর্বৌষধি লব্ধি—বৃষ্টির বা নদীর জল এরূপ লব্ধি সম্পন্ন মুনির শরীর স্পর্শ করলে পর সূর্যের তেজ যেমন অন্ধকার নষ্ট করে সে রকম সমস্ত রোগ নাশ করে। গন্ধ হস্তীর মদ গন্ধে যেমন অন্য হস্তীরা পালিয়ে যায় সেই রকম তাঁর শরীর স্পর্শ কারী পবন বিষাদির সমস্ত দোষ দূর করে দেয়। যদি বিষ মিশ্রিত অন্নাদি পদার্থ ওঁর মুখে বা পাত্রে এসে যায় তবে তাও অমৃতের মত নির্বিষ হয়ে যায়। বিষ নামানোর মন্ত্রাক্ষরের মত তাঁর বাণীর স্মরণে মহাবিষের জন্য দুঃখ গ্রস্ত মানুষের

দুঃখ দূর হয়ে যায় ও স্বাতী নক্ষত্রে জল শুক্তিতে পড়লে যেমন তা মুক্তো হয় সেরূপ তাঁর নখ, চুল, দাঁত ও তাঁর শরীর হতে উৎপন্ন সমস্ত বস্তু ঔষধি হয়ে যায়।

(৫) অণুত্ব শক্তি—সুতোর মত সূঁচের ছিদ্র দিয়ে নিজের শরীর বার করতে পারেন।

(৬) মহত্ব শক্তি—এর দ্বারা নিজের শরীর এত বড় করা যেতে পারে যে মেরু পর্বত তাঁর হাঁটুর কাছাকাছি আসে।

(৭) লঘুত্ব শক্তি—এর দ্বারা শরীর বাতাসের চাইতেও হাল্কা করা যায়।

(৮) গুরুত্ব শক্তি—ইন্দ্রাদি দেবতাও যা সহ্য করতে পারে না এরূপ বজ্রের চাইতেও ভারী শরীর করার শক্তি।

(৯) প্রাপ্তি শক্তি—পৃথিবীতে থেকেও বৃক্ষ পত্রের মত মেরুর অগ্রভাগ ও গৃহাদিকে স্পর্শ করার শক্তি।

(১০) প্রাকাম্য শক্তি—জলের উপর মাটির মত চলবার ও মাটিতে জলের মত নিমজ্জন করবার শক্তি।

(১১) ঈশত্ব শক্তি—চক্রবর্তী ও ইন্দ্রের বৈভব বিস্তার করবার শক্তি।

(১২) বশিত্ব শক্তি—স্বতন্ত্র, ক্রুরতম প্রাণীকেও বশ করবার শক্তি।

(১৩) অপ্রতিঘাতী শক্তি—পর্বতের মধ্য দিয়ে ছিদ্রের মত অবাধ বেরিয়ে যাবার শক্তি।

(১৪) অপ্রতিহত অন্তর্ধান শক্তি—পবনের মত সর্বত্র অদৃশ্য রূপ ধারণ করার শক্তি।

(১৫) কামরূপত্ব শক্তি—একই সময়ে অনেক প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে লোক পূর্ণ করার শক্তি।

(১৬) বীজ বুদ্ধি—এক বীজ হতে যেমন অনেক বীজ উৎপন্ন হয় সেরূপ এক অর্থ হতে বহুবিধ অর্থ করার বুদ্ধি বা শক্তি।

(১৭) কোষ্ঠ বুদ্ধি—কোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত ধান্য যেমন যথাবৎ থাকে সেরূপ স্মরণ না করেও পূর্ব শ্রুত বিষয় স্মৃতিতে ধারণ করার শক্তি।

(১৮) পদানুসারিণী লব্ধি—আদি, অন্ত বা মধ্যের যে কোন একটী পদ শুনে সমস্ত গ্রন্থ অবধারণ করার শক্তি।

(১৯) মনোবল লব্ধি—কোন একটি বিষয় অবগত হয়ে মুহূর্তে সমস্ত আগম সাহিত্যে অবগাহন করার শক্তি।

(২০) বাগবল লব্ধি—মুহূর্তে মূলাক্ষরের মত সমগ্র আগম সাহিত্য আবৃত্তি করার শক্তি।

(২১) কায়বল লব্ধি—এতে অনেক কাল কায়োৎসর্গ করে প্রতিমা ধারণ করলেও এতটুকু ক্লান্তি আসে না।

(২২) অমৃতক্ষীরমধ্বাজ্যাস্রাবি লব্ধি—এতে পাত্রে পরিবেশিত কুৎসীৎ কদন্নেও অমৃত ক্ষীর মধু ঘী-এর আস্বাদ উৎপন্ন করার শক্তি। এরূপ লব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির বাণী দুঃখপীড়িত মানুষের নিকট অমৃত ক্ষীর মধু ও ঘী এর মত শান্তিদায়ক হয়।

(২৩) অক্ষীণ মহানসী লব্ধি—পাত্রস্থিত অন্নাদি যতই দান করা যাক না কেন তা পূর্ববৎ থাকে শেষ হয় না।

(২৪) অক্ষীণ মহালয় লব্ধি—এই শক্তি বলে তীর্থংকর সভার মত অল্পস্থানে অসংখ্য প্রাণীকে বসাবার শক্তি।

(২৫) সংভিন্ন শ্রোত লব্ধি—এর দ্বারা এক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা করা সম্ভব।

(২৬) জংঘাচারণ লব্ধি—এই লব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি একই পদক্ষেপে জম্বুদ্বীপ হতে রুচক দ্বীপ যেতে পারে ও ফেরার সময় এক পদক্ষেপে নন্দীশ্বর দ্বীপ ও দ্বিতীয় পদক্ষেপে যেখান হতে সে যাত্রা করেছিল সেই জম্বুদ্বীপে ফিরে আসতে পারে। যদি উপরের দিকে যাবার থাকে তবে এক পদক্ষেপে মেরুপর্বতস্থিত পাণ্ডুক বনে যেতে পারে ও ফেরার সময় এক পদক্ষেপে নন্দন বন ও দ্বিতীয় পদক্ষেপে যেখান হতে যাত্রা করেছিল সেখানে ফিরে আসতে পারে।

(২৭) বিদ্যাচারণ লব্ধি—এই লব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এক পদক্ষেপে মানুষোত্তর পর্বত ও দ্বিতীয় পদক্ষেপে নন্দীশ্বর দ্বীপ ও তৃতীয় পদক্ষেপে যাত্রাস্থানে ফিরে আসতে পারে। যদি উর্দ্ধাকাশে যাবার থাকে তবে মধ্যলোকের অনুরূপ যাতায়াত করতে পারে।

এই সমস্ত লব্ধি বজ্রজংঘাদি মুনিরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর অতিরিক্ত আসীবিষ লব্ধি ও ক্ষতিকারক ও লাভদায়ক আরো কয়েকটী লব্ধি তাঁরা লাভ করেন। কিন্তু এই সমস্ত লব্ধির ব্যবহার তাঁরা কখনো করেন নি। সত্যত এই যে যে মুমুক্ষু সে প্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা রাখে না, তার ব্যবহার করে না।

এরপর বজ্রনাভ স্বামী বিশ স্থানকের আরাধনা করে দৃঢ় তীর্থংকর নামক গোত্র-কর্ম উপার্জন করলেন। সেই বিশ স্থানকের বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) অরিহংত পদ—অরিহংত ও অরিহংত প্রতিমার পূজা করলে ও অরিহংতদের অর্থযুক্ত স্তুতি করলে ও যেখানে তাঁদের নিন্দা হয় তার নিরাকরণ করলে অরিহংত পদের আরাধনা করা হয়।

(২) সিদ্ধপদ—সিদ্ধিপ্রাপ্ত সিদ্ধদের ভক্তিতে রাত্রি জাগরণাদি উৎসব করলে ও যথার্থ রীতিতে সিদ্ধতার কীর্তন ভজন করলে সিদ্ধপদের আরাধনা হয়।

(৩) প্রবচন পদ—বালক, অসুস্থ, নবদীক্ষিত শিষ্যাদি ব্যক্তিদের ওপর অনুগ্রহ

করলে ও প্রবচন অর্থাৎ চতুর্বিধ সংঘ বা জৈন শাসনের ওপর বাৎসল্য স্নেহ রাখলে প্রবচন পদের আরাধনা করা হয়।

(৪) আচার্যপদ—সমাদরের সঙ্গে আহার্য, ঔষধ বস্ত্রাদি দ্বারা গুরুর প্রতি বাৎসল্য বা ভক্তি দেখালে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(৫) স্থবির পদ—কুড়ি বছরের দীক্ষাপর্যায় সম্পন্নকে পর্যায় স্থবির, ষাঠ বছরের বয়ঃ সম্পন্নকে বয়ঃস্থবির ও সমবায়াঙ্গ সূত্রজ্ঞাতাকে শ্রুত স্থবির বলা হয়। এঁদের ভক্তি করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(৬) উপাধ্যায় পদ—নিজের থেকে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে তাঁর প্রতি বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করলে এই পদের আরাধনা হয়।

(৭) সাধুপদ—উৎকৃষ্ট তপস্যাকারী সাধুদের ভক্তি করে তাঁদের সুখ সুবিধা দিয়ে তাঁদের প্রতি বাৎসল্য দেখালে এই পদের আরাধনা হয়।

(৮) জ্ঞানপদ—প্রশ্ন ও বাচনাদি দ্বারা দ্বাদশাঙ্গ শ্রুতের অধ্যাপন করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(৯) দর্শনপদ—শংকা আদি দোষ রহিত, স্থিরতা আদি গুণ ভূষিত ও শমাদি লক্ষণযুক্ত সম্যক দর্শন প্রাপ্ত হলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১০) বিনয় পদ—জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র ও উপচার এরূপ চার প্রকার কর্মের কারক বিনয় সম্পন্ন হলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১১) চারিত্রপদ—ইচ্ছা-মিথ্যা-করণাদি দশ প্রকার সামাচারী যোগ ও আবশ্যক কর্মে অতিচার রহিত হয়ে যত্ন করলে চারিত্রপদের আরাধনা করা হয়।

(১২) ব্রহ্মচর্যপদ—অহিংসাদিমূলগুণ ও সমিতি আদি উত্তর গুণে অতিচার রহিত হয়ে প্রবৃত্ত হলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৩) সমাধিপদ—প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে প্রমাদ পরিহার করে শুভধ্যানে লীন থাকলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৪) তপ পদ—মন ও শরীরের যাতে কষ্ট না হয় এরূপ যথাশক্তি তপস্যা করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৫) দানপদ—মন বচন ও কায়শুদ্ধি পূর্বক তপস্বীদের যথাশক্তি দান দিলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৬) বৈয়াবৃত্য বা বৈয়াবচ্চ পদ—আচার্যাদি দশবিধ মুনিদের অন্ন জল ও আসনাদি দ্বারা ভক্তি করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৭) সংযম পদ—চতুর্বিধ সংঘের সমস্ত বিঘ্ন দূর করে সন্তোষ উৎপন্ন করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৮) অভিনবজ্ঞান পদ—প্রতিদিন নূতন নূতন সূত্র ও অর্থ প্রযত্ন পূর্বক গ্রহণ করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(১৯) শ্রুত পদ—শ্রদ্ধায় শ্রুতজ্ঞানের স্পষ্টীকরণ, প্রকাশন ও নিন্দাবাদের নিরাকরণ করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

(২০) তীর্থ পদ—বিদ্যা, নিমিত্ত, কবিতা, বাদ ও ধর্ম কথার দ্বারা শাস্ত্রের প্রচার করলে এই পদের আরাধনা করা হয়।

এই কুড়িটি পদের এক একটী পদের আরাধনাও তীর্থংকর নাম কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু বজ্রনাভ মুনি এই কুড়িটী পদের আরাধনা করে তীর্থংকর নাম কর্মের বন্ধন করেছিলেন।

বাহুমুনি সাধুদের সেবা করে চক্রবর্তীর ভোগোপভোগ প্রাপ্ত হবার কর্ম বন্ধন করলেন।

তপস্বী মুনিদের বিশ্রাম ও সেবাসুশ্রুষা করে সুবাহু অমিত বাহুবল লাভ করবার কর্ম বন্ধন করলেন।

বজ্রনাভ মুনি তখন বললেন বাহু ও সুবাহুই ধন্য যারা সাধুদের বৈয়াবৃত্য ও সেবাসুশ্রুষা করছেন।

সেই প্রশংসা শুনে পীঠ ও মহাপীঠ মুনিদ্বয় ভাবলেন যারা লোকের উপকার করে লোকে তাদের প্রশংসা করে, আমরা দুজনে আগমের অধ্যয়ন ও ধ্যানে নিমগ্ন রইলাম এজন্য কারু কোনো উপকার করতে পারলাম না, এজন্য কে আমাদের প্রশংসা করবে? মানুষ তাদের সম্মান দেয় যারা তাদের উপকার করে।

এভাবে মায়া মিথ্যাত্বর জন্য ঈর্ষা করে ও এই মন্দ কর্মের আলোচনা না করে তারা স্ত্রী নাম কর্মের বন্ধ করলেন।

সেই ছয় মহর্ষি চতুর্দশ লক্ষ পূর্ব অতিচারহীন অসিধারার মত সংযম পালন করলেন। তারপর ধীর সেই ছয় মুনি দুইপ্রকারের সংলেখনা পূর্বক পাদোপগমন অনশন অঙ্গীকার করে সেই দেহ পরিত্যাগ করলেন।

দ্বাদশ ভব

সেই ছয়জনই সর্বার্থসিদ্ধি নামক পঞ্চম অনুত্তর বিমানে তেত্রিশ সাগরোপমের আয়ু নিয়ে দেবতা হলেন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয় সর্গ

এই জম্বূদ্বীপের পশ্চিম মহাবিদেহে শত্রুর দ্বারা যা কখনো বিজিত হয়নি এরূপ অপরাজিতা নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে ঈশানচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি নিজ বাহুবলে জগৎকে পরাজিত করেছিলেন ও ঐশ্বর্যের জন্য ঈশানেন্দ্রর সমান প্রতীত হতেন।

ওই নগরে চন্দনদাস নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। ওঁর অনেক ধন ছিল। তিনি ধর্মাত্মাদের মধ্যে অগ্রণী ও পৃথিবীকে সুখী করতে চন্দন তুল্য ছিলেন।

ত'ার সাগরচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। তাকে দেখলে সকলের চোখ জুড়িয়ে যেত। সমুদ্র যেমন চন্দ্রমাকে আনন্দিত করে তেমনি সেও পিতাকে আনন্দিত করত। স্বভাবে সে সরল, ধার্মিক ও বিবেকী ছিল। এজন্য সে সমস্ত নগরীর তিলকস্বরূপ ছিল।

একদিন সাগরচন্দ্র রাজসভায় গেল। সেখানে রাজা সিংহাসনে বসেছিলেন। ত'ার সেবার জন্য উপস্থিত সামন্তরাও যথাস্থানে বসেছিলেন। রাজা সাগরচন্দ্রকে তার পিতার মতই আসন, তাম্বূলদান আদি দিয়ে সৎকার করলেন ও স্নেহ প্রদর্শন করলেন।

সেই সময় এক চারণ রাজসভায় এল ও শঙ্খ বিনিন্দিত কণ্ঠে বলল, মহারাজ আজ আপনার উদ্যানকে উদ্যানপালিকার মতো পুষ্প সম্ভারে সুশোভিত করে বসন্ত লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে। এজন্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুগন্ধে দিক আমোদিতকারী সেই উদ্যানকে ইন্দ্র যেমন নন্দনবন সুশোভিত করেন সেরূপ আপনিও সুশোভিত করুন।

চারণের কথা শুনে রাজা দ্বারপালকে আদেশ দিলেন নগরে ঘোষণা কর কি কাল সকালে সকলেই যেন রাজোদ্যানে যায়। তারপর তিনি সাগরচন্দ্রকেও বললেন, তুমিও কাল সকালে উদ্যানে এস। স্নেহ এইভাবেই অভিব্যক্ত হয়।

রাজার নিকট বিদায় নিয়ে সাগরচন্দ্র আনন্দিত মনে ঘরে ফিরে গেল ও নিজ মিত্র অশোক দত্তকে রাজার আদেশ শোনাল।

দ্বিতীয় দিন সকালে রাজা সপরিবারে উদ্যানে গেলেন। নগরের লোকও সেখানে উপস্থিত হল। প্রজাত রাজার অনুকরণই করে। যেমন মলয় পবন সহ বসন্ত ঋতুর আগমন হয় সেরূপ সাগরচন্দ্রও নিজ মিত্র অশোকদত্তের সঙ্গে উদ্যানে গেল। সেখানে সকলে কামদেবের অধীন হয়ে পুষ্প আহরণ করে নৃত্য গীতাদি ক্রীড়া করতে লাগল। স্থানে স্থানে ক্রীড়ারত জনতাকে কামদেবের অনুচরদের মতই মনে হচ্ছিল। পদে পদে গীত ও বাদ্যের ধ্বনি এভাবে উত্থিত হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল তা অন্য ইন্দ্রিয় বিষয়ের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করবার জন্যই উত্থিত হচ্ছে।

সেই সময় নিকটস্থ কোন বৃক্ষের অন্তরাল হতে স্ত্রীকণ্ঠোত্থিত 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ধ্বনি শোনা গেল। শোনা মাত্র সাগরচন্দ্র সেদিকে আকৃষ্ট হল ও কি হল, বলে ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল নেকড়ে বাঘ যেমন হরিণীকে ধরে নেয় সে রকম দুবৃত্তরা পূর্ণভদ্র শ্রেষ্ঠীর কন্যা প্রিয়দর্শনাকে ধরে রেখেছে। সাগরচন্দ্র তাদের একজনের হাত হতে ছুরি এভাবে কেড়ে নিল যেমন সাপের ঘাড় মুড়ে মণি বের করে নেওয়া হয়। তার এই সাহসিকতা দেখে অন্য দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেল। জ্বলন্ত আগুণ দেখলে বাঘও পালিয়ে যায়।

সাগরচন্দ্র প্রিয়দর্শনাকে এভাবে মুক্ত করল যেভাবে আম্রলতাকে কাঠুরেদের হাত হতে মুক্ত করা হয়। সে সময় প্রিয় দর্শনা ভাবতে লাগল, পরোপকারই যাদের ব্যসন তাদের মধ্যে অগ্রণী ইনি কে? এ ভালই হল যে আমার ভাগ্যোদয়ে আকৃষ্ট হয়ে এই সৎপুরুষ এখানে এলেন। কামদেবের মত রূপবান এই ব্যক্তি যেন আমার পতি হন। এরূপ ভাবতে ভাবতে সে ঘরে ফিরে গেল। সাগরচন্দ্রও মূর্তি যেভাবে স্থাপিত করা হয় সেভাবে নিজের হৃদয় মন্দিরে প্রিয়দর্শনার মূর্তি স্থাপিত করে মিত্র অশোক দত্তের সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

ক্রমে চন্দনদাস এ কথা জানতে পারলেন। এরূপ কথা গোপনই বা থাকতে পারে কি রূপে? চন্দনদাস মনে মনে ভাবলেন সাগরচন্দ্রের প্রিয়দর্শনার প্রতি যে প্রেম হয়েছে তা উচিতই। কারণ কমলিনীর মিত্রতা রাজহংসের সঙ্গেই হয়। কিন্তু ও যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা অনুচিত হয়েছে। কারণ পরাক্রমী হলেও শ্রেষ্ঠীর নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করা উচিত নয়। তাছাড়া সাগরচন্দ্র সরল স্বভাবের। ওর মিত্রতা কপট অশোক দত্তের সঙ্গে হয়েছে তা উচিত হয় নি। বদরীগাছের সঙ্গে কদলী গাছের সান্নিধ্য যেমন অহিতকর এও সেরূপ। এভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি সাগরচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন ও মাহুত যেমন হস্তীকে শিক্ষা দেয় সেভাবে তিনি সাগরচন্দ্রকে মিষ্ট কথায় উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন—

পুত্র, সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করায় তুমি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা ভালভাবেই জান। তবুও আমি তোমায় কিছু বলছি। আমরা বণিক। আমাদের কলা কৌশলে ব্যবসায় নির্বাহ করতে হয়। তাই আমাদের সৌম্য স্বভাবযুক্ত ও মনোহর বেশে থাকতে হয়। এভাবে থাকলেই আমাদের নিন্দা হয় না। এজন্য যৌবনেও তোমাকে গুপ্ত পরাক্রমী হতে হবে। বণিকদের সামান্য অর্থের জন্যও শঙ্কাশীল-বৃত্তির বলা হয়। স্ত্রীলোকের শরীর যেমন আচ্ছাদিত থাকলেই ভাল দেখায় সেরূপ আমাদের সম্পত্তি, বিষয় ক্রীড়া বা দান গুপ্তভাবে করলেই তা ভালো দেখায়। উটের পায়ে বাঁধা কঙ্কণ যেমন শোভা দেয় না তেমনি আমাদের জাতের অযোগ্য (পরাক্রম) প্রদর্শনও আমাদের শোভা দেয় না। এজন্য হেপুত্র, কুলপরম্পরাগত যোগ্য

ব্যবহারকারী হয়ে তুমি ধনের মত গুণকেও গুপ্ত রাখ এবং স্বভাবে যে কুটিল এরূপ দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ কর। কারণ দুর্জনের সঙ্গ উন্মত্ত কুকুরের বিষের মত. সময়ে অনিষ্ট সাধন করে। হে বৎস, তোমার মিত্র অধিক পরিচয়ে তোমাকে এভাবে নষ্ট করবে যেমন কুষ্ঠ রোগ বর্দ্ধিত হয়ে সমস্ত শরীরকে নষ্ট করে দেয়। কপট অশোক দত্ত বেশ্যার মত মনে এক প্রকার চিন্তা করে, মুখে আর এক প্রকার বলে, কাজে অন্য প্রকার করে।

শ্রেষ্ঠী এভাবে আদর সহিত উপদেশ দিয়ে চুপ করলে সাগরচন্দ্র. মনে মনে ভাবতে লাগল, বাবা যখন এরূপ উপদেশ দিচ্ছেন তখন বোঝা যাচ্ছে প্রিয়দর্শনা সংক্রান্ত ব্যাপার ইনি অবগত হয়েছেন। এও বোঝা যাচ্ছে যে আমার মিত্র অশোক দত্তের সাহচর্যও ওঁর মনঃপুত নয়। এরূপ উপদেশ দানকারী গুরুজন যারা ভাগ্যহীন তাদের হয় না।। যা হোক এ'র কথা মত আমার চলা উচিত। এরূপ খানিকক্ষণ চন্তা করে সাগরচন্দ্র বিনীতভাবে নম্রস্বরে বলল, বাবা, আপনি যেমন আদেশ করছেন সেইভাবেই আমি চলব। কারণ আমি আপনার পুত্র। যে কাজ করলে গুরুজনের আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন হয় সেই কাজ করা উচিত নয়। কিন্তু কখনো কখনো দৈববশতঃ অকস্মাৎ এরূপ কার্য এসে পড়ে যার জন্য বিচার বিমর্শের সামান্য সময়ও পাওয়া যায় না। যেমন মূর্খ ব্যক্তির নিজেকে শুচি করতে করতেই আরাধনা কাল ব্যতীত হয়ে যায় সেরূপ এমন কিছু কাজ উপস্থিত হয় যা বিচার করে করতে গেলে বিনষ্ট হয়ে যায়। তবুও বাবা, আজ হতে জীবন সঙ্কটাপন্ন হলেও এমন কোন কাজ করব না যাতে আপনাকে লজ্জিত হতে হয়। আর অশোকদত্ত সম্পর্কে যা বললেন, আমি তার দোষে দূষিতও নই, বা গুণে গুণান্বিত। একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খেলাধূলা, বারবার দেখা সাক্ষাৎ, সমান জাতি, সমান বিদ্যা, সমান শীল, সমান বয়স, পরোক্ষে উপকার ও সুখ দুঃখে ভাগ নেওয়া আদি কারণে আমার তার সঙ্গে মিত্রতা হয়েছে। আমি ত তার মধ্যে কোন কপট দেখতে পাই না। ওর সম্বন্ধে কেউ আপনাকে মিথ্যা করে বলেছে। কারণ দুষ্ট ব্যক্তিরা অন্যের দুঃখদায়ীই হয়। যদি সে কপটই হয় তবুও সে আমার কি ক্ষতি করতে পারে? কারণ একসঙ্গে রাখলেও কাঁচ কাঁচই থাকবে, মণি মণিই।

সাগর চন্দ্র সেকথা বলে চুপ করলে শ্রেষ্ঠী বললেন পুত্র, যদিও তুমি বুদ্ধিমান তবুও আমাকে বলতেই হচ্ছে কারণ অন্যের মনোভাব জানা অত্যন্ত কঠিন।

পুত্রের মনোভাবের জ্ঞাতা চন্দন দাস পূর্ণভদ্র শ্রেষ্ঠীর নিকট নিজ পুত্রের জন্য শীল সম্পন্না প্রিয়দর্শনাকে প্রার্থনা করলেন। পূর্ণভদ্র শ্রেষ্ঠীও আপনার পুত্র উপকারের দ্বারা প্রথমেই আমার কন্যাকে কিনে নিয়েছে বলে তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করলেন।

শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে মাতা পিতা সাগর চন্দ্রের প্রিয়দর্শনার সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

ইচ্ছিত দুন্দুভি নাদিত হলে যেমন আনন্দ হয় সেরূপ ঈপ্সিত বিবাহ হওয়ায় বরবধূ উভয়ের আনন্দ হল। সমান অন্তঃকরণ হওয়ায় একাত্মার মত তাদের প্রেম সারস পক্ষীর মত বাড়তে লাগল। চন্দ্রের দ্বারা যেমন চন্দ্রিকা শোভিত হয় সেরূপ হাস্য-ময়ী সৌম্যাকৃতি প্রিয়দর্শনা সাগরচন্দ্রের দ্বারা শোভিত হতে লাগল। দীর্ঘকাল পর দৈবযোগেই শীলবান রূপবান ও সরল স্বভাবী দম্পতীর যোগ হল। একে অন্যকে বিশ্বাস করত তাই তাদের মধ্যে অবিশ্বাস উৎপন্নই হল না। কারণ সরল বিশ্বাসীদের মনে বিপরীত শঙ্কার উদয়ই হয় না।

একবার সাগর চন্দ্র যখন বাইরে গিয়েছিল তখন অশোক দত্ত তার ঘরে এল ও প্রিয়দর্শনাকে বলল সাগর চন্দ্র সর্বদা ধনদত্ত শ্রেষ্ঠীর স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে দেখা করে এর ক ণ কী ?

স্বভাব সরলা প্রিয়দর্শনা বলল, এর কারণ আপনার মিত্র জানে বা তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আপনি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদের একান্তে কৃত কার্যের বিষয়ে আর কারো জানবার কথা নয়। তিনিই বা ঘরে তার কেন আলোচনা করবেন ?

অশোক দত্ত বলল, তোমার পতি একান্তে যে তার সঙ্গে দেখা করে তার অভি-প্রায় আমি জানি কিন্তু তা তোমাকে বলা যায় না।

প্রিয়দর্শনা বলল, কেন বলা যায় না। বলুন সেকি অভিপ্রায় ?

অশোক দত্ত বলল, হে শুভ্রু, যে অভিপ্রায়ে আমি তোমার কাছে আসি সেই অভিপ্রায়।

অশোক দত্ত এভাবে বললেও সরল স্বভাবা প্রিয়দর্শনা তার অর্থ গ্রহণ করতে পারল না। বলল, আমার কাছে আপনি কি অভিপ্রায়ে আসেন ?

সে বলল, হে সুভ্রু, তোমার পতি ছাড়া আর কি কোন রসজ্ঞ পুরুষের তোমাকে প্রয়োজন নেই ?

অশোকদত্তের বাসনা পূর্ণ সেই বাক্যে প্রিয়দর্শনার কান সূচিবৎ বিদ্ধ হল। সে অসন্তুষ্ট হল ও মাথা নীচু করে বলল, নরাধম, নির্লজ্জ, তুমি এমন কি করে ভাবলে ? যদি ভাবলে ত তাকে কি করে প্রকাশ করলে ? মূর্খ, ধিক তোমার এই দুঃসাহসকে ! দুষ্ট তুমি কিনা আমার মহামনা পতিকে তোমার মত হবার সম্ভাবনার কথা আমায় বলছ। মিত্র হয়ে শত্রুর কাজ করছ। পাপী এই মুহূর্তে তুমি এই স্থান পরিত্যাগ কর। দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমাকে দেখলেও পাপ হয়।

এভাবে অপমানিত হয়ে অশোক দত্ত চোরের মত সেখান হতে বার হল। গোহত্যা করার মত পাপরূপী অন্ধকারে মলিন মুখ অশোক দত্ত রাগে গরগর করতে করতে চলে যাচ্ছিল। সেই সময় সামনে হতে সাগর চন্দ্র আসছিল। তাকে দেখে সহজ স্বভাব সাগর চন্দ্র বলল, বন্ধু তোমাকে এত দুঃখান্বিত কেন দেখাচ্ছে ?

পর্বততুল্য কপটী অশোক দত্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ও মহা দুঃখে পীড়িত এরূপ ঠোঁট উঁচিয়ে বলল, হিমালয়ের নিকট যে থাকে শীতার্ত হবার কারণ যেমন তার কাছে অজানা নয় সেরূপ সংসারে যে থাকে তার কাছেও দুঃখের কারণ অজানা নয়। তবুও গুপ্ত স্থানে হওয়া ফোঁড়ার মত এই দুঃখ না গোপন রাখা যায় না প্রকট করা যায়।

এভাবে বলে চোখে জল ভরে নানা কপট করে সে চুপ হয়ে গেল। তখন অকপট সাগর চন্দ্র ভাবতে লাগল—ওঃ সত্যিই সংসার অসার। এতে এমন ব্যক্তিকেও হঠাৎ দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। ধুঁয়ো যেমন আগুনের সূচনা দেয় তেমনি ধৈর্য দ্বারা যা সহন করা যায় না সেরূপ এর আন্তরিক দুঃখকে অশ্রুই প্রকটিত করছে।

কিছুক্ষণ এভাবে চিন্তা করে তার দুঃখে দুঃখী সাগর চন্দ্র পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাকে বলল, বন্ধু যদি বলার মত হয় তবে তুমি এই সময়ই আমায় তোমার দুঃখের কারণ বল ও আমাকে তোমার দুঃখের অংশ দিয়ে নিজের দুঃখ লাঘব করো।

অশোক দত্ত বলল, বন্ধু তুমি আমার প্রাণের সমান। তোমার নিকট যখন অন্য কথা গোপন রাখা যায় না তখন একথাও বা কি করে গোপন রাখি। তুমিত জানই সংসারে মেয়েরা অমাবস্যা যেমন ঘনান্ধকার সৃষ্টি করে তেমনি অনর্থই উৎপাদন করে।

সাগরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ভাই এখন তুমি কালনাগিনীর মত কোন স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়েছ ?

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫0 পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.00 ।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় ।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত ।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 9 Sraman January 1981
Registered with The Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৮৭ ॥ দশম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সরস্বতী

শ্রীচিন্তামণি জৈন মন্দির, বীকানের

শ্রী চিন্তামণি জৈন মন্দির, বীকানের স্থিত জৈন ধাতু প্রতিমা

শ্রী প্রকাশচন্দ্র ভার্গব

বীকানের নগরীর স্থাপনা রাও বীকা (১৪৬৫-১৫০৪ খৃষ্টাব্দ) দ্বারা বৈশাখ শুক্লা ২য়া বিক্রম সম্বৎ ১৫৪৫-এ (২১ এপ্রিল, ১৪৯৮ খৃঃ) হয়।[১] কিম্বদন্তী অনুসারে যে শুভ মুহূর্তে শ্রীআদিনাথ মুখ্য চতুর্বিংশতি জিনালয়ের শিলান্যাস হয় সেই মুহূর্তে বীকানেরের পুরনো কেল্লারও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।[২]

এই মন্দিরের এক ভূমিগৃহে মন্ত্রীশ্বর করমচাঁদ বচ্ছাওৎ দ্বারা আনীত প্রতিমা রাখা আছে যা সময়ে সময়ে বিশেষ উপলক্ষ্যে বার করা হয় ও অষ্টাহ্নিকা মহোৎসব, শান্তি স্তোত্রাদির সঙ্গে পূজো করে শুভ মুহূর্তে পুনরায় রেখে দেওয়া হয়। বিগত ১৯৮৭, ১৯৯৫, ২০০০, ২০১৮ ও সর্বশেষ ২০৩৩ সম্বতে এদের বার করা হয়। ২০৩৩ সম্বতে সর্বপ্রথম আমি এই ধাতু প্রতিমা গুলিকে দেখি ও জৈন মূর্তিকলার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করি। তারই পরিণাম রূপে সেই ধাতু প্রতিমার সর্বপ্রথম আলোচনা এখানে উপস্থিত করছি যা ভারতীয় জৈনকলার গবেষকদের নিকট লাভপ্রদ হবে বলে মনে করি।[৩]

সম্বৎ ১৬৩৯ আষাঢ় শুক্লা একাদশী বৃহস্পতিবার রাজা রায় সিং ১০৫০টি প্রতিমা নিজের আবাস স্থানে আনেন। সেই প্রতিমা ভূমিগৃহে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও সময়ে সময়ে প্রতিমা ও জৈন যন্ত্র এখানে রাখার ফলে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে এখন ১১০৪ হয়েছে। অবশ্য দুইটী প্রতিমা খণ্ডিত হবার জন্য দুই জায়গায় পৃথক

---

১ পনরৈ সৈ পৈতালেব সুদ বৈশাখ সুমের।
থাবর বীজ থরপিয়ো বীকে বীকানের।

২ নাহটা অগরচন্দ, বীকানের লেখ সংগ্রহ, পৃঃ ২৪। এই মন্দিরের শিলালেখে রাজা বীকার উপাধি পাওয়া গেছে। তাই এই মন্দির বীকার সমকালীন হতে পারে না। কারণ রাজা রায় সিংহকে রাজার উপাধি মুঘল সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এর পূর্বে বীকানেরের কোনো উপাধি ছিল না।

৩ এই প্রতিমাগুলিকে বিক্রম সম্বৎ ২০৩৩ (জুন, ১৯৭৬) রাজস্থান রাজ্য সরকারের প্রযত্নে বার করা হয় এবং এদের সূচী তৈরীর কাজ আমাকে প্রদান করা হয়। এদের দেখবার এই সুযোগের জন্য আমি রাজস্থান সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ।

পৃথক রূপে গণনা করার ফলে ১১০৮ বলা হয়, নইলে বাস্তব সংখ্যা ১১০৬।[8] এই সব প্রতিমার সময় লেখ, শিল্প ও শৈলীদৃষ্টিতে নিরূপিত করা হয়েছে যা এই প্রকার :

ক্রম সংখ্যা	খৃষ্টীয় শতক	প্রতিমার সংখ্যা
১	৭ম শতক	৩
২	৭ম শতক	১
৩	৮ম শতক	১
৪	৯ম শতক	২
৫	৯ম-১০ম শতক	২
৬	১০ম শতক	৬
৭	১১ শতক	৯
৮	১২ শতক	৩৩
৯	১৩ শতক	১১১
১০	১৪ শতক	৩৫৮
১১	১৫ শতক	৫৩৩
১২	১৫ শতক	২ (পাষাণের)
১৩	১৬ শতক	২৪
১৪	১৭ শতক	১
১৫	১৮ শতক	৬
১৬	১৮-১৯ শতক	৪
১৭	১৯ শতক	২
১৮	জৈনধাতুযন্ত্র	৮
		১১০৬

এভাবে দেখা যায় সর্বাধিক প্রতিমা ১৫ শতকের ; ১৩ হতে ১৫ শতকের প্রতিমা শিল্প দৃষ্টিতে সাধারণ তাই তার বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয়। গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ছায়া চিত্র সহ এই সব প্রতিমার বিবরণ বার করা প্রয়োজন। স্থানাভাবের জন্য আমি এখানে কেবলমাত্র কয়েকটী প্রমুখ প্রতিমার বিবরণ লিপিবদ্ধ করব। এই সব প্রতিমার একসেসন নাম্বার অঙ্কিত করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে এদের মিল করে নেওয়া যেতে পারে।

৪ সম্বৎ ১৬৩৩-এ তুরসম খান সিরোহী লুণ্ঠনের সময় এই ১০০০টী প্রতিমা প্রাপ্ত হন ও ফতেপুর সিক্রীতে সম্রাট আকবরকে তা অর্পণ করেন। ভাগ্যবশতঃ এদের নষ্ট করা হয় নি। পরে বীকানেরের রাজা রায় সিং শ্রাবকদের জন্য এই প্রতিমা প্রাপ্ত করে নিজ আবাসে নিয়ে আসেন।

১। শ্রীআদিনাথ প্রতিমা (প্রতিমা সংখ্যা ১)[৫] —২১ সে. মি. × ৩৩সে. মি.।

শ্রী আদিনাথ (ঋষভনাথ) পদ্মাসনে ধ্যানমুদ্রায় বিকসিত পূর্ণদল কমলের ওপর সজ্জাযুক্ত বস্ত্রালংকৃত উচ্চ সিংহাসনে বসে রয়েছেন। বস্ত্রে গোল গোল চক্রের মধ্যে কমল অঙ্কিত। সিংহাসনের উচ্চ পীঠিকার ওপর মধ্যভাগে দুই মৃগের মধ্যে বিকসিত কমলের ওপর ধর্মচক্র অঙ্কিত করা হয়েছে।[৬] পীঠিকায় তীর্থংকরের লাঞ্ছনের অভাব উল্লেখযোগ্য।

শ্রী আদিনাথের স্কন্ধে মাথার চুল ছড়িয়ে রয়েছে। ললাট উন্নত, নাসিকা দীর্ঘ ও সমুন্নত। আকৃতি গোলাকৃতি যা হতে সৌম্যত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। চোখ বড় বড়, ঠোঁট পাতলা তাতে নীচের দিকের ঠোঁট পুরু। শরীর স্থূল, পীঠিকার অগ্রভাগের ডান পা ভগ্ন। এই প্রতিমার দুই দিকে যক্ষ ও যক্ষীর প্রতিমা থেকে থাকবে কারণ তার থাকবার জায়গা রয়েছে। প্রতিমার পেছনে ১ লাইন লেখা রয়েছে যা পড়বার চেষ্টা করা হচ্ছে। কলা বিচারে বসন্তগড়ে প্রাপ্ত প্রতিমার সঙ্গে এর সাম্য রয়েছে। সম্ভবতঃ প্রতিমাটি ৭ম শতকের।

২। তীর্থংকর প্রতিমা (প্রতিমা সংখ্যা ২)—২০ সে. মি. × ৭সে. মি.।

খড়্গাসন স্থিত এটি একটি তীর্থংকর প্রতিমা। কোন সময় পীঠিকার ওপর স্থিত ছিল কিন্তু বর্তমানে পীঠিকা নেই। পীঠিকায় সংযুক্ত করবার জন্য ডান পায়ে হুক লাগানো রয়েছে। অধোবস্ত্রের চিহ্ন প্রতিমায় স্পষ্টতঃ উৎকীর্ণ। চেহারা গোল ও ভরাট। কলা দৃষ্টিতে ৭ম শতকের মনে হয়।

৩। চতুর্মুখ সমবসরণ (প্রতিমা সংখ্যা ৪)—২১ সে. মি. × ১৯ সে. মি.।

এটি একটি চৌমুখ প্রতিমা যার চারদিকে দুইটী স্তম্ভের মধ্যে এক একটী ধ্যানস্থ তীর্থংকর প্রতিমা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তিন দিকে এক একটী প্রতিমা রয়েছে, এক দিকে নেই। পূর্বে শিখরে ধ্বজা ছিল। পীঠিকায় কুবের ও অম্বিকা অবস্থিত। ওপরে এক কোণে সুন্দরভাবে একটী হস্তী অংকিত। কলা দৃষ্টিতে প্রতিমা ১১ শতকের।

৪। শ্রীপার্শ্বনাথ ত্রিতীর্থী (প্রতিমা সংখ্যা ১৭)—২৪ সে. মি. × ১৯ সে. মি.।

এক উচ্চ পীঠিকার ওপর সিংহাসনে ধ্যানমুদ্রায় তীর্থংকর পার্শ্বনাথ বসে রয়েছেন। পেছনে পঞ্চফণা সর্প ছত্রের আকার ধারণ করে রয়েছে। দুই পাশে অন্য দুই তীর্থংকর কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। পরিকরে বিদ্যাধর অঙ্কিত। পীঠিকায় কুবের ও

৫ এই প্রতিমার বসন্তগড়ের প্রতিমা নং ৫ এর সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

৬ ডাঃ উমাকান্ত প্রেমানন্দ সাহ, ব্রঞ্জ হোর্ড ফ্রম বসন্তগড়, ললিত কলা নং ১-২, পৃঃ ৫৮, প্লেট ১১ চিত্র ৫।

অম্বিকা সহ অষ্টগ্রহও অংকিত। একদিকে চক্রেশ্বরী, অন্যদিকে অবশ্যই কোনো দেবী ছিলেন কিন্তু এখন তা ভগ্ন। প্রতিমা ৭-৮ শতকের মনে হয়।

৫। সরস্বতী[৭] (প্রতিমা সংখ্যা ৬১)—১৩.৭ সে. মি. × ৬.৪ সে. মি.।

এই সমবাহু প্রতিমা সমভংগ অবস্থায় দণ্ডায়মান। ডান হাতে সনাল কমল, বাঁ হাত নীচে ঝুলে রয়েছে। সেই হাত দিয়ে পুস্তক ধারণ করে আছেন। মাথার চুল কবরী আকারে সম্বদ্ধ ও সন্মুখভাগে ছোট মুকুট। পেছনের প্রভামণ্ডল খণ্ডিত। খণ্ডিত অংশ দৃষ্টে মনে হয় তা অলংকরণ হীন ছিল। প্রতিমার ললাট বিস্তৃত, সোজা দীর্ঘ নাসিকা, ছোট স্থূল ঠোঁট, লম্বা চোখ ও ভরাট গোলাকৃতি মুখ—অনেকটা বসন্তগড়ে প্রাপ্ত সরস্বতী প্রতিমার[৮] মত। স্থানীয় ভক্তেরা চোখে রূপোর পাত বসিয়ে প্রতিমাকে কুরূপ করে দিয়েছে। দেবীর কানে গোল গোল কুণ্ডল যা স্কন্ধ স্পর্শ করছে। গলায় মণি গ্রথিত একাবলী ও উত্তর সূত্র যা উন্নত পয়োধরের মধ্য দিয়ে বাঁ দিকে নেমে গিয়েছে। নীচের বস্ত্র বসন্তগড়ের প্রতিমার মত ধারণ করে রয়েছেন, দুই পায়ের মধ্যে একটী তরঙ্গায়িত বস্ত্র রয়েছে। উত্তরীয় দুই স্কন্ধ হয়ে গোড়ালী পর্যন্ত তরঙ্গায়িত শিখাকারে চলে গিয়েছে। প্রতিমার ডানদিকের উত্তরীয় খণ্ডিত কিন্তু খণ্ডিত ভাগ স্কন্ধ ও গোড়ালিতে দেখা যাচ্ছে। দেবীর হাতে ভুজবন্ধ ও কঙ্কণ, পায়ে নুপুর। কলা ও মূর্তি বিকাশের দৃষ্টিতে প্রতিমাটি ৮ম শতাব্দীর ও পশ্চিম ভারতীয় শৈলীর প্রথম পাদের।[৯]

৬। জৈন তীর্থংকর (প্রতিমা সংখ্যা সী ৪)—৪৭ সে. মি × ১৪ সে মি. (পীঠিকা ছাড়া): ৫৭ সে. মি. × ১৪ সে. মি. (নব পীঠিকা সহ)।

এই প্রতিমা উত্তর রাজস্থানে প্রাপ্ত প্রতিমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কারণ এটি বসন্তগড় পিণ্ডবাড়ায় প্রাপ্ত দুইটি দণ্ডায়মান জৈন তীর্থংকরের প্রতিমার অনুরূপ।[১০]

---

৭ পশ্চিম রাজস্থানে এপর্যন্ত এই প্রতিমার অতিরিক্ত তিনটী মর্মর প্রস্তরের সরস্বতী প্রতিমা ও একটী ধাতু প্রতিমা পাওয়া গেছে। মর্মর প্রস্তরের তিনটী প্রতিমার ২টী বীকানেরের মহারাণা গঙ্গা সিংহের সময় কার্যরতঃ ডাঃ লুইসী পি. প্রোঃ টেসীটরী পল্লু হতে আনয়ন করেন। এদের একটী রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয়, দিল্লী ও দ্বিতীয়টী রাজকীয় সংগ্রহালয় বীকানেরে প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় প্রতিমা সুবোধকুমার অগ্রবাল কর্তৃক লাডনুর দিগম্বর জৈন মন্দির হতে আনীত হয়।

৮ সাহ, ডাঃ উমাকান্ত প্রেমানন্দ, ব্রঞ্জ হোর্ড ফ্রম বসন্তগড়, ললিতকলা নং ১২ (এপ্রিল ১৯৫৫-মার্চ ১৯৫৬), পৃঃ ৬১, প্লেট ১৫ প্রতিমা নং ১৫।

৯ প্রকাশচন্দ্র ভার্গব, এ নিউলী ডিসকাভার্ড জৈন সরস্বতী ফ্রম বীকানের, জর্নল অব ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, নং ৩০-৩১, (১৯৭৪-৭৫). পৃঃ ৭৯-৮০, চিত্র নং ১৮০।

১০ সাহ, ডাঃ উমাকান্ত প্রেমানন্দ, ব্রঞ্জ হোর্ড ফ্রম বসন্তগড়, ললিতকলা নং ১-২ (এপ্রিল ১৯৫৫-মার্চ ১৯৫৬), পৃঃ ৫৬, প্লেট ৯ প্রতিমা নং ১, ২।

এই প্রতিমা শ্রীচিন্তামণি জৈন মন্দিরের গর্ভস্থ প্রতিমার সঙ্গে ছিল না! সম্ভবতঃ এটিও তুরসম খান দ্বারা সিরোহী লুণ্ঠনের সময় আনীত হয়। প্রতিমায় লাঞ্ছন না থাকায় বলা শক্ত এটি কোন তীর্থংকরের।

তীর্থংকর ধ্যানস্থ অবস্থায় কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই প্রতিমায় যেভাবে বস্ত্র অঙ্কিত করা আছে তা বসন্তগড়-পিণ্ডবাড়ায় প্রাপ্ত প্রতিমার অনুরূপ। ললাট উন্নত, নাসিকা দীর্ঘ, চেহারা ভরাট। চোখ লম্বা ও বড়। মাথায় কোঁকড়ান চুল ও উষ্ণীষ রয়েছে। প্রতিমা সুন্দর তবুও গুপ্তকালীন প্রতিমার সেই ওজঃস্বিতা এখানে নেই। প্রতিমার হাত দীর্ঘ যাকে আজানুবাহু বলা হয় এবং মহাপুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। তীর্থংকরের কানও লম্বা দেখান হয়েছে—যা আবার মহাপুরুষের চিহ্ন। ওষ্ঠ ছোট। স্থানীয় ভক্তেরা চোখে কৃত্রিম চোখ বসিয়ে প্রতিমাটিকে কুরূপ করে দিয়েছেন। দুজন ভক্ত প্রতিমায় নূতন লোহার পাঠিকা সংযোজিত করেছেন।

বসন্তগড়ে প্রাপ্ত প্রতিমার শিল্পী শিবনাগের। সম্বৎ ৭৪৪ (৬৮৭ খৃঃ)-এর লেখ হতে জানা যায় যে তিনি দুটী প্রতিমা নির্মাণ করেন। ডাঃ উমাকান্ত পি. সাহ সেখানে প্রাপ্ত দুই প্রতিমাকে শিবনাগ নির্মিত বলছেন। এই প্রতিমাকেও সমকালীন বলা যায় কারণ এর শিল্পকর্ম ঠিক ঐরূপই।

এভাবে আমরা দেখছি যে শ্রীচিন্তামণি জৈন মন্দির, বীকানেরের ভাণ্ডারস্থ ও সুরক্ষিত জৈন ধাতু প্রতিমার কয়েকটী উত্তর রাজস্থান ও পশ্চিমভারতীয় কলার এক মহত্বপূর্ণ সংযোগ সেতু। এদের পূর্ণ প্রকাশন ভারতীয় কলার ক্রম বিকাশের ইতিহাসকে জানবার সহায়ক হবে।

জৈন জ্যোতিষ সাহিত্য

শ্রীনেমীচন্দ্র জৈন

জ্যোতিষাং সূর্যাদিগ্রহাণাং বোধকং শাস্ত্রং—যে শাস্ত্র সূর্যাদি গ্রহ ও কালের বোধ করায় তাকে জ্যোতিষ বলা হয়। আকাশ মণ্ডল অনেক প্রাচীন কাল হতেই মানুষের কৌতূহলের বিষয়। সূর্য ও চন্দ্রের পরিচয় লাভ করার পর মানুষ নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহর জ্ঞানও প্রাপ্ত করেছে। জৈন শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে আজ হতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে কর্মভূমির যখন প্রারম্ভ হয় তখন প্রথম কুলকর প্রতিশ্রুতির সময় প্রথম যখন চন্দ্র ও সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় তখন মানুষেরা এত ভয়ভীত হয়ে পড়ে যে তারা শঙ্কা নিবারণের জন্যে প্রতিশ্রুতি নামক কুলকর বা মনুর নিকট যায়। প্রতিশ্রুতি তাদের সৌরজগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ও তাঁর নিকট হতে মানুষ প্রথম সৌরমণ্ডলের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও সেই জ্ঞান জগতে জ্যোতিষ নামে প্রসিদ্ধ হয়। আগমিক পরম্পরা অনবচ্ছিন্নরূপে অনাদি হলেও এই যুগে জ্যোতিষ সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস এখান হতে আরম্ভ হয়। অবশ্য যে জ্যোতিষ সাহিত্য আজ আমরা পাই তা কুলকর প্রতিশ্রুতির লক্ষ লক্ষ বছর পরে লিখিত।

জৈন জ্যোতিষ সাহিত্যের উত্থান ও বিকাশ—

আগমিক দৃষ্টিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিকাশ বিদ্যানুবাদাঙ্গ ও পরিকর্ম হতে হয়। সমস্ত গণিত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ পরিকর্মে লিখিত ছিল ও অষ্টাঙ্গ নিমিত্তের আলোচনা বিদ্যানুবাদাঙ্গে করা হয়েছিল। ষট্‌খণ্ডাগমের ধবলাটীকায়[১] রৌদ্র, শ্বেত, মৈত্র, সারভট, দৈত্য, বৈরোচন, বৈশ্বদেব, অভিজিৎ, রোহণ, বল, বিজয়, নৈঋত্য, বরুণ, আর্যমন ও ভাগ্য এই পনেরটি মুহূর্তের নামোল্লেখ করা হয়েছে। মুহূর্তের নামাবলী বীরসেন স্বামীর নিজস্ব নয়, পূর্বপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তাই বলা যায় মুহূর্ত বিষয়ক আলোচনা অনেক প্রাচীন।

প্রশ্ন ব্যাকরণে নক্ষত্রের মীমাংসা কয়েক দৃষ্টিতে করা হয়েছে। সমস্ত নক্ষত্রকে কুল, উপকুল ও কুলোপকুলে বিভাজিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনা প্রণালী জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিকাশে এক মহত্বপূর্ণ স্থান রাখে। ধনিষ্ঠা, উত্তরাভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্য, মঘা, উত্তরাফাল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, মূল এবং উত্তরাষাঢ়া এই নক্ষত্র কুল সংজ্ঞক, শ্রবণ, পূর্বভাদ্রপদ, রেবতী, ভরণী, রোহিণী, পুনর্বসু, আশ্লেষা, পূর্বা ফাল্গুনী, হস্ত, স্বাতি, জ্যেষ্ঠা এবং পূর্বাষাঢ়া উপকুল সংজ্ঞক ও

১ ধবলা টীকা, ভাগ ৪, পৃঃ ৩১৮

অভিজিৎ, শতভিষা, আর্দ্রা ও অনুরাধা কুলোপকুল সংজ্ঞক। এই কুলোপকুলের বিভাজন পূর্ণিমার নক্ষত্রের আধারে করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে শ্রাবণ মাসের নক্ষত্র ধনিষ্ঠা, শ্রবণ ও অভিজিৎ, ভাদ্রমাসের উত্তরা ভাদ্রপদ, পূর্বাভাদ্রপদ ও শতভিষা, আশ্বিন মাসের অশ্বিনী ও রেবতী, কার্তিক মাসের কৃত্তিকা ও ভরণী, অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ মাসের মৃগশিরা ও রোহিণী, পৌষ মাসের পুষ্য, পুনর্বসু ও আর্দ্রা, মাঘমাসের মঘা ও আশ্লেষা, ফাল্গুনমাসের উত্তরা ফাল্গুনী ও পূর্বাফাল্গুনী, চৈত্রমাসের চিত্রা ও হস্ত, বৈশাখ মাসের বিশাখা ও স্বাতি, জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা, মূল ও অনুরাধা এবং আষাঢ় মাসের উত্তরাষাঢ়া ও পূর্বাষাঢ়া।[২] প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমার প্রথম নক্ষত্র কুল সংজ্ঞক, দ্বিতীয় উপকুল সংজ্ঞক ও তৃতীয় কুলোপকুল সংজ্ঞক। এই বর্ণনা সেই মাসের ফল নিরূপণের জন্য করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ঋতু, অয়ন, মাস, পক্ষ ও তিথি সম্পর্কিত আলোচনাও পাওয়া যায়।

সমবায়াঙ্গ সূত্রে নক্ষত্র, তারা ও তাদের দিশাদ্বার আদির বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে কত্তি-আইয়া সত্তণমবত্তা পুব্বদারিআ। মহাইয়া সত্তণমবত্তা দাহিণদারিআ। অণুরাহা-ইয়া সত্তণকৃখত্তা অবরদারিআ। ধণিট্ঠাইয়া সত্তণকৃখত্তা উত্তর দারিআ।[৩] অর্থাৎ কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্য ও আশ্লেষা এই সাতটি নক্ষত্র পূর্বদ্বার, মঘা, পূর্বাফাল্গুনী, উত্তরা ফাল্গুনী, হস্ত, চিত্রা, স্বাতি ও বিশাখা এই সাতটী নক্ষত্র দক্ষিণদ্বার, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূল, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া অভিজিৎ ও শ্রবণ এই সাতটী নক্ষত্র পশ্চিমদ্বার এবং ঘনিষ্ঠা, শতভিষা পূর্বাভাদ্রপদ, উত্তরাভাদ্র পদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী এই সাতটী নক্ষত্র উত্তর দ্বার। সমবায়াঙ্গ ১।৬, ২।৪, ৩।২, ৪।৩, ৫।৯এ বর্ণিত জ্যোতিষ চর্চা উল্লেখযোগ্য।

ঠাণাঙ্গ সূত্রে চন্দ্রের সঙ্গে স্পর্শ যোগকারী নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে—যথা কৃত্তিকা, রোহিণী, পুনর্বসু, মঘা, চিত্রা, বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা এই আট নক্ষত্র চন্দ্রের সঙ্গে স্পর্শ যোগকারী। এই যোগের ফল তিথি অনুসারে বিভিন্ন হয়। এভাবে নক্ষত্রের অন্য সংজ্ঞা ও উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব দিক হতে চন্দ্রের সঙ্গে যোগদান-কারী নক্ষত্রের নাম ও তাদের ফল বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। ঠাণাঙ্গে অঙ্গারক, কাল, লোহিতাক্ষ, শনি, কনক, কনক-কনক, কনক বিতান, কনক সংতানক, সোমহিত, আশ্বাসন, কজ্জোবগ, কর্বট, অয়স্কর, দুংদুয়ন, শংখ, শংখবর্ণ, ইন্দ্রাগ্নি, ধূমকেতু, হরি, পিঙ্গল, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, রাহু, অগস্ত্য, ভানবক্র, কাশ, স্পর্শ, ধুর, প্রমুখ, বিকট বিসন্ধি, বিমল, পপিল, জটিলক, অরুণ, অগিল, কাল, মহাকাল, স্বস্তিক, সৌবাস্তিক,

২ প্রশ্নব্যাকরণ, ১০, ৫

৩ সমবায়াঙ্গ, স., ৭ সূত্র ৫

বর্দ্ধমান, পুষ্পমানক, অংকুশ, প্রলম্ব, নিত্যালোক, নিত্যোদয়িত, স্বয়ংপ্রভ, উসম, শ্রেয়ংকর, প্রেয়ংকর, আয়ংকর, প্রভংকর, অপরাজিত, অরজ, অশোক, বিগতশোক, নির্মল, বিমুখ বিতত, বিত্রস্ত, বিশাল, শাল, সুব্রত, অনিবর্তক, একজটী, দ্বিজটী করকরীক, রাজগল, পুষ্পকেতু এবং ভাবকেতু আদি ৮৮ গ্রহের নাম বলা হয়েছে।[৪] সমবায়াঙ্গেও উপরোক্ত ৮৮ গ্রহের নাম এসেছে। 'এগমেগস্সণং চংদিম সুরিয়স্স অট্ঠাসীই মহগ্গহা পরিবারো।"[৫] অর্থাৎ এক এক চন্দ্র ও সূর্যের পরিবারে ৮৮।৮৮ মহাগ্রহ আছে। প্রশ্ন ব্যাকরণাঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি রাহু ও কেতু বা ধূমকেতু এই নয়টী গ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সমবায়াঙ্গে গ্রহণের কারণের আলোচনা পাওয়া যায়।[৬] এতে রাহু দু রকমের বলা হয়েছে—নিত্য রাহু ও পর্ব রাহু। নিত্যরাহুকে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের কারণ ও পর্বরাহুকে চন্দ্রগ্রহণের কারণ বলা হয়েছে। কেতু যার ধ্বজ দণ্ড সূর্যের ধ্বজদণ্ডের সমান উঁচু, ভ্রমণ সময় সূর্যগ্রহণের কারণ হয়।

বড় ও ছোট দিন সম্বন্ধেও সমবায়াঙ্গে বিচার বিনিময় করা হয়েছে। সূর্য যখন দক্ষিণায়নে নিষধ পর্বতের অভ্যন্তর মণ্ডল হতে বার হয়ে ৪৪ সংখ্যক মণ্ডল গগনমার্গে আসে সেই সময় ৬১।৮৮ মুহূর্ত দিন ছোট হয় ও রাত্রি বড় হয়। এই সময় ২৪ ঘটীর দিন ও ২৬ ঘটীর রাত্রি হয়। উত্তর দিকে ৪৪ সংখ্যক মণ্ডল গগন মার্গে সূর্য যখন আসে তখন ৬১।৮৮ মুহূর্ত দিন বড় হতে আরম্ভ করে ও এভাবে সূর্য যখন ৯৩ সংখ্যক মণ্ডলে যায় তখন দিন সর্বাপেক্ষা বড় হয়ে ৩৬ ঘটীর হয়। এই অবস্থা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় ঘটিত হয়।[৭]

এভাবে জৈন আগমগ্রন্থে ঋতু, অয়ন, দিনমান, দিনের হ্রাস বৃদ্ধি, নক্ষত্রমান, নক্ষত্রের বিবিধ সংজ্ঞা, গ্রহমণ্ডল, বিমানের স্বরূপ, বিস্তৃতি, গ্রহের আকৃতি আদির নানা স্থানে বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও আগমগ্রন্থের সংগ্রহ কাল খৃষ্টীয় প্রথম বা তার পরের বলে পণ্ডিতেরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন কিন্তু জ্যোতিষের উপরোক্ত আলোচনা তার চাইতে অনেক প্রাচীন। এই মৌলিক মান্যতার জন্য জৈন জ্যোতিষের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রাক্-যাবনিক (গ্রীক) সিদ্ধ করা হয়েছে।[৮]

---

৪ ঠাণাঙ্গ, পৃঃ ৯৮-১০০
৫ সমবায়াঙ্গ, স. ৮৮।১
৬ সমবায়াঙ্গ, স. ১৫।৩
৭ বহিয়াও উত্তরাওণং কট্ঠাও সূরিএ পঢমং ছম্মাসং অয়মাণে চোয়ালিস ইমে মংডলগতে অট্ঠাসীতি এগসট্ঠি ভাগে মুহুত্তস্স দিবসখেত্তস নিবুড়্ঢেত্তা রয়ণিখেত্তস্স অভিনিবুড়্ঢেত্তা সূরিএ চারং চরই, স০ ৮৮।৪
৮ চন্দাবাঈ অভিনন্দন গ্রন্থের অন্তর্গত গ্রীকপূর্ব জৈন জ্যোতিষ বিচার ধারা শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৬২

ঐতিহাসিক বিদ্বানেরা গণিত জ্যোতিষের চাইতেও ফলিত জ্যোতিষকে বেশী প্রাচীন বলেন। তাই বলা যায় যে কার্যসিদ্ধির জন্য সময় শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আদিম মানবেরও হয়ে থাকবে। এইজন্যই জৈন আগম গ্রন্থে ফলিত জ্যোতিষের বীজ—তিথি নক্ষত্র, যোগ, করণ, বার, সময়শুদ্ধি, দিনশুদ্ধি আদির বর্ণনা পাওয়া যায়।

জৈন জ্যোতিষ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন পরিচয়ের জন্য তাকে নিম্নলিখিত চারভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করলে বোঝা সহজ হবে।

আদিকাল, ঈশাপূর্ব ৩০০ হতে ৬০০ অবধি।

পূর্ব মধ্যকাল—৬০১ খৃষ্টাব্দ হতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ।

উত্তর মধ্যকাল—১০০১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ।

আধুনিক কাল—১৭০১ খৃঃ হতে—

আদিকালের রচনায় সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, অঙ্গবিজ্জা, লোকবিজয়যন্ত্র এবং জ্যোতিষ করণ্ডক আদি উল্লেখযোগ্য।

সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত একটী প্রাচীন গ্রন্থ। এর ওপর মলয়গিরির সংস্কৃত টীকা রয়েছে। এটী খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে গৃহীত হয়। এতে ৫ বছরে এক যুগ ধরে তিথি নক্ষত্রাদির বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান মহাবীরের শাসন তিথি শ্রাবণ-কৃষ্ণা প্রতিপদ হতে যখন চন্দ্র অভিজিৎ নক্ষত্রে থাকে যুগারম্ভ ধরা হয়েছে।

সূর্য প্রজ্ঞপ্তিতে সূর্যের গমন পথ, আয়ু, পরিবার, আদির প্রতিপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ বর্ষাত্মক যুগের অয়নের নক্ষত্র, তিথি ও মাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তির বিষয় প্রায় সূর্য প্রজ্ঞপ্তির মতই। তবে বিষয়ের দিক দিয়ে এটি সূর্য প্রজ্ঞপ্তি অপেক্ষা বেশী মহত্বপূর্ণ। এতে সূর্যের প্রতিদিনের যোজন ব্যাপী গতি নিরূপণ করা হয়েছে ও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বীথির পৃথক পৃথক বিস্তার বার করে সূর্য ও চন্দ্রের গতি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর চতুর্থ প্রাভৃতে চন্দ্র ও সূর্যের সংস্থান ও তাপক্ষেত্রের সংস্থান বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এতে সমচতস্র, বিষমচতস্র আদি বিভিন্ন আকারের খণ্ডন করে ষোল বীথিতে চন্দ্রের সমচতস্র গোলাকৃতি বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে সুষমা সুষমাকালের আদিতে শ্রাবণকৃষ্ণা প্রতিপদের দিন জম্বুদ্বীপের প্রথম সূর্য পূর্ব দক্ষিণ অগ্নিকোণে ও দ্বিতীয় সূর্য পশ্চিমোত্তর বায়ব্যকোণে যেতে আরম্ভ করে। এই প্রকার প্রথম চন্দ্র পূর্বোত্তর ঈশান কোণে ও দ্বিতীয় চন্দ্র পশ্চিম দক্ষিণ নৈঋত কোণে যায়। অতএব যুগাদিতে সূর্য ও চন্দ্রের সমচতস্র-সংস্থান, কিন্তু উদয় হবার সময় এই গ্রহ বর্তুলাকার বার হয় সেজন্য চন্দ্র ও সূর্যের আকার অর্দ্ধ-পীঠ অর্দ্ধ সমচতস্র গোল।[১]

---

১ তা অবড্ঢপোরিসাণং ছায়া দিবসস্স কিং গতে সে সে বা তা তিভাগে গএ বা তা সে সে বা,

চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তিতে ছায়াকে সাধন করা হয়েছে ও ছায়া প্রমাণে দিন মানও বার করা হয়েছে। জ্যোতিষের দৃষ্টিতে এই বিষয়টী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যখন অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ ছায়া হয়, সেই সময় কতখানি দিন ব্যতীত হয়েছে ও কতখানি অবশেষ রয়েছে? এর উত্তর দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ছায়ার এই স্থিতিতে দিনমানের তৃতীয়াংশ মাত্র অতীত হয়েছে বুঝতে হবে। এখানে বিশেষ এই যে যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে অর্দ্ধপুরুষ প্রমাণ ছায়া হয় তবে দিনের তৃতীয় ভাগ গত ও দুই তৃতীয়াংশ অবশেষ ও দ্বিপ্রহরের পরে যদি অর্দ্ধপুরুষ প্রমাণ ছায়া হয় তবে দুই তৃতীয়াংশ প্রমাণ দিন গত ও এক ভাগ প্রমাণ দিন অবশেষ রয়েছে বুঝতে হবে। পুরুষ প্রমাণ ছায়া হলে দিনের এক চতুর্থ ভাগ গত ও তিন চতুর্থ ভাগ অবশেষ, দেড়পুরুষ প্রমাণ ছায়া হলে দিনের পঞ্চম ভাগ গত ও চার পঞ্চম ভাগ অবশেষ রয়েছে বুঝতে হবে।

এই গ্রন্থে গোল, ত্রিকোণ, দীর্ঘ ও চৌকোণ বস্তুর ছায়া দ্বারা দিনমান নির্ণয় করা হয়েছে। চন্দ্রের সঙ্গে তিরিশ মুহূর্ত পর্যন্ত যোগদান কারী নক্ষত্রের নাম শ্রবণ, ধনিষ্ঠা, পূর্বাভাদ্রপদ রেবতী, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশির, পুষ্য, মঘা, পূর্বাফাল্গুনী, হস্ত, চিত্রা, অনুরাধা, মূল ও পূর্বাষাঢ় এই পনেরটী নক্ষত্র বলা হয়েছে। পঁয়তালিশ মুহূর্তকাল পর্যন্ত চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নক্ষত্রের নাম উত্তরা ভাদ্রপদ, রোহিণী, পুনর্বসু উত্তরাফাল্গুনী, বিশাখা ও উত্তরাষাঢ়া এই ছ'টি বলা হয়েছে ও পনের মুহূর্ত চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নক্ষত্রের নাম সতভিষা, ভরণী, আর্দ্রা, আশ্লেষা, স্বাতি ও জ্যেষ্ঠা এই ছ'টি বলা হয়েছে।

চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির ১৯ প্রাভৃতে চন্দ্রকে স্বতঃ প্রকাশিত বলা হয়েছে ও এর হ্রাস বৃদ্ধির কারণও দেওয়া হয়েছে। ১৮ প্রাভৃতে পৃথিবী হতে সূর্যাদি গ্রহের দূরত্ব বলা হয়েছে।

জ্যোতিষ করণ্ডক একটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অয়নাদি সহ নক্ষত্রের লগ্নও নিরূপণ করা হয়েছে। এই লগ্ন নিরূপণ প্রণালী সর্বথা নবীন ও মৌলিক।

লগ্‌গং চ দক্‌খিণায় বিসুবে সুবি অস্‌স উত্তরং অয়ণে।
লগ্‌গং সাঈ বিসুবেসু পংচসু বি দক্‌খিণে অয়ণে॥

অর্থাৎ অশ্বিনী ও স্বাতি নক্ষত্রকে বিষুবের লগ্ন বলা হয়েছে। যে প্রকারে নক্ষত্রের বিশিষ্ট অবস্থাকে রাশি বলা হয় সেই প্রকারে এখানে নক্ষত্রের বিশিষ্ট অবস্থাকে লগ্ন বলা হয়েছে।

এই গ্রন্থে কৃত্তিকাদি, ধনিষ্ঠাদি, ভরণ্যাদি, শ্রবণাদি ও অভিজিত আদি নক্ষত্র গণনার বিবেচনা করা হয়েছে।

পোরিসাণং ছায়া দিবস্‌স কিং গএ বা সে সে বা জাব চউভাগ গএ সে সে বা, চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি, প্রঃ ৯ ৫

জ্যোতিষ করণ্ডকের রচনা কাল খৃ. পূ. ৩০০ অব্দ। বিষয় ও ভাষার দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ মহত্বপূর্ণ।

অঙ্গ বিজ্জার রচনা সময় কুষাণ ও গুপ্তযুগের সন্ধি কাল। শরীরের লক্ষণে বা অন্যপ্রকারের নিমিত্ত বা চিহ্নে কারু শুভাশুভ ফল বলা এই গ্রন্থের বিষয়। এই গ্রন্থে মোট ষাঠটী অধ্যায় আছে। দীর্ঘ অধ্যায়গুলিকে 'পটলে' বিভাজিত করা হয়েছে। প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলিতে অঙ্গ বিদ্যার উৎপত্তি, স্বরূপ, শিষ্যের গুণদোষ, অঙ্গ বিদ্যার মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ের বিবেচন করা হয়েছে। গৃহপ্রবেশ, যাত্রারম্ভ, বস্ত্র, যান, ধান্য, চর্যা, চেষ্টা আদি দ্বারা শুভাশুভ বলা হয়েছে। প্রবাসী ঘরে কবে ও কিভাবে ফিরে আসবে এর বিচার ৪৫ অধ্যায়ে করা হয়েছে। ৫২ অধ্যায়ে রামধনু, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, উদয় অস্ত, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, মণ্ডল, বীথি, যুগ, সম্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, ক্ষণ এবং মুহূর্ত, উল্কাপাত, দিশাদাহ আদি নিমিত্ত দ্বারা ফল কথন করা হয়েছে। ২৭ সংখ্যক নক্ষত্র ও তার দ্বারা কৃত শুভাশুভ ফলও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। সংক্ষেপে এই গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ নিমিত্তের বিস্তারপূর্বক ও বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়েছে।[১০]

লোকবিজয় যন্ত্রও একটী প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ। এটি প্রাকৃত ভাষায় ৩০টী গাথায় রচিত। মুখ্যতঃ সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ, আদির কথা বলা হয়েছে। প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করবার সময় বলা হয়েছে—

পণমিয় পয়ারবিংদে তিলোয়নাহস্স জগপঈবস্স।
পুচ্ছামি লোয়বিজয়ং জংতং জংতূণ সিদ্ধিকয়ং ॥

জগৎপতি নাভিরাজের পুত্র ত্রিলোকনাথের চরণ কমলে প্রণাম করে জীবের সিদ্ধির জন্য লোক বিজয় যন্ত্রের বর্ণনা করছি।

এতে ১৪৫ হতে আরম্ভ করে ১৫৩ পর্যন্ত ধ্রুবাংক বলা হয়েছে। এই ধ্রুবাংক হতে নিজস্থানের শুভাশুভ ফল প্রতিপাদন করা হয়েছে। কৃষি শাস্ত্রের দৃষ্টিতেও এই গ্রন্থটী মহত্বপূর্ণ।

কালকাচার্য—ইনিও নিমিত্ত ও জ্যোতিষের প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন। ইনি নিজের প্রতিভা বলে শককুলের সাহীদের নিজের অনুগত করেন ও গর্দভিল্লকে দণ্ড দেন। জৈন পরম্পরায় জ্যোতিষ প্রবর্তকদের মধ্যে এঁর স্থান সর্বোচ্চ। যদি ইনি নিমিত্ত ও সংহিতার নির্মাণ না করতেন তবে পরবর্তী জৈন লেখকেরা জ্যোতিষকে পাপ শ্রুত বলে তার আলোচনাই হয়ত করতেন না।

বরাহমিহির বৃহজ্জাতকে কালক সংহিতার উল্লেখ করেছেন।[১১] নিশীথচূর্ণি, আবশ্যক চূর্ণি আদি গ্রন্থের দ্বারাও এঁর জ্যোতিষজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১০ অঙ্গ বিজ্জা, পৃঃ ২০৬-২০৯
১১ ভারতীয় জ্যোতিষ, পৃঃ ১০৭

উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রে জৈন জ্যোতিষের মূল সিদ্ধান্ত নিরূপণ করেছেন। এঁর মতে গ্রহদের কেন্দ্র সুমেরু পর্বত। গ্রহ নিত্য গতিশীল হয়ে মেরু প্রদক্ষিণা করে। চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রহ, নক্ষত্র, প্রকীর্ণক ও তারার বর্ণনা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে হলেও এঁর আলোচনা জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিতে মূল্যবান।

এভাবে আদিকালে অনেক জ্যোতিষ গ্রন্থ লেখা হয়। স্বতন্ত্র গ্রন্থের অতিরিক্ত অন্য বিষয়ক ধার্মিক গ্রন্থ, আগম গ্রন্থের চূর্ণি, বৃত্তি ও ভাষ্যে জ্যোতিষের মূল্যবান তথ্য লিখিত হয়। তিলোয়পন্নত্তিতে জ্যোতির্মণ্ডলের সুন্দর বর্ণনা আছে। জ্যোতির্লোকাকারে অয়ন, গমনমার্গ, নক্ষত্র এবং দিনমান আদির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

পূর্ব মধ্যকালে গণিত ও ফলিত দুইপ্রকার জ্যোতিষের যথেষ্ট বিকাশ হয়। এই সময়ে ঋষিপুত্র, মহাবীরাচার্য, চন্দ্রসেন, শ্রীধর প্রভৃতি জ্যোতির্বিদেরা নিজের অমূল্য রচনা দ্বারা এই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

ভদ্রবাহুর নামে অর্হচ্চূড়ামণি সার নামক একটী প্রশ্ন সম্পর্কিত ৭৪ প্রাকৃত গাথার গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই রচনা চতুর্দশ পূর্বধর ভদ্রবাহুর তাতে সন্দেহ রয়েছে। আমার মনে হয় এই ভদ্রবাহু বরাহ মিহিরের ভাই ছিলেন। তাই মনে হয় এর লেখক দ্বিতীয় ভদ্রবাহুই হবেন। গোড়াতে বর্ণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অ ই এ ও—এই চারটি স্বর ও ক চ ট ত প য শ গ জ ড দ ব ল স—এই চৌদ্দটী ব্যঞ্জন আলিঙ্গিত সংজ্ঞক। এদের সুভগ, উত্তর ও সঙ্কট নামও আছে। আ ঈ ঐ ঔ—এই চার স্বর ও খ ছ ঠ থ ফ র ষ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ—এই চোদ্দটী ব্যঞ্জন অভিধূমিত সংজ্ঞক। এদের মধ্য, উত্তরাধর, বিকট নামও আছে। উ ঊ ং ঃ এই চার স্বর ও ঙ ঞ ণ ণ ম এই পাঁচ ব্যঞ্জন দগ্ধ সংজ্ঞক। এদের বিকট সঙ্কট, অধর ও অশুভ নামও আছে। প্রশ্নে যদি সমস্ত অক্ষর আলিঙ্গিত হয় তবে প্রশ্নকর্তার কার্য সিদ্ধ হবে। প্রশ্নাক্ষর দগ্ধ হলে কার্যসিদ্ধির বিনাশ হয়। উত্তর সংজ্ঞক স্বর উত্তর সংজ্ঞক ব্যঞ্জনে সংযুক্ত হলে উত্তরতম, উত্তরাধর ও অধর স্বরে সংযুক্ত হলে উত্তর ও অধর সংজ্ঞক হয়। অধর সংজ্ঞক স্বর দগ্ধ সংজ্ঞক ব্যঞ্জনে যুক্ত হলে অধরাধরতর সংজ্ঞক হয়। দগ্ধসংজ্ঞক স্বর দগ্ধ সংজ্ঞক ব্যঞ্জনে সংযুক্ত হলে দগ্ধতম সংজ্ঞক হয়।[১২] এই সংজ্ঞায় ফলাফল বার করা হয়েছে। জয় পরাজয়, লাভালাভ, জীবন মরণ আদির বিচারও করা হয়েছে। এই ছোট্ট গ্রন্থে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। এর মধ্যবর্তী ক, গ ও ত স্থানে য শ্রুতি ব্যবহৃত হয়েছে।

কর লক্ষণ—সামুদ্রিক শাস্ত্রের এটি একটী ছোট গ্রন্থ। এতে রেখার মহত্ব, স্ত্রী ও পুরুষের হাতের বিভিন্ন লক্ষণ, অঙ্গুলির মধ্যের অন্তরাল পর্বের ফল, মণিবন্ধ,

১২ অর্হচ্চূড়ামণিসার, গাথা ১-৮

বিদ্যারেখা, কুল, ধন, সম্মান, সম্বন্ধ, আয়ু, ধর্ম, ব্রত আদি রেখার বর্ণনা আছে। ভাই বোন সন্তান আদির দ্যোতক রেখার বর্ণনার পরে অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগে স্থিত যবের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিপাদন করা হয়েছে। যব-এর এই প্রকরণ নয়টী গাথায় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য গ্রন্থকার নিজেই সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন —

ইয় কর লক্খণমেয়ং সমাসও দংসিঅং জই জণস্স।
পুব্বায়রিএহিং ণরং পরিক্খিঊণং বয়ং দিজ্জা॥ ৬১

যতিদের জন্য সংক্ষেপে করলক্ষণ বর্ণন করা হয়েছে। এই লক্ষণ দ্বারা ব্রতগ্রহণকারীর পরীক্ষা করা উচিত। যখন শিষ্যের পূর্ণ যোগ্যতা থাকে, ব্রত নির্বাহ করতে পারে ও ব্রতী জীবনে খ্যাতি সম্পন্ন হতে পারে তবেই ব্রতে দীক্ষা দেওয়া উচিত।

এতে এই কথা স্পষ্ট হয় যে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য জনকল্যাণের সঙ্গে নবাগত শিষ্যের পরীক্ষা করা। এর প্রচার সম্ভবতঃ সাধু ও যতিদের মধ্যে সীমিত ছিল।

ঋষি পুত্রের নামও প্রথম শ্রেণীর জ্যোতির্বিদদের মধ্যে পরিগণিত। এঁকে গর্গের পুত্র বলা হয়। গর্গ মুনি জ্যোতিষের ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

জৈন আসীজ্জগদ্‌বন্দ্যো গর্গনামা মহামুনিঃ।
তেন স্বয়ং নির্ণীত যং সৎপাশাত্র কেবলী॥
এতজ্‌জ্ঞানং মহাজ্ঞানং জৈনর্ষিভিরুদাহৃতম্।
প্রকাশ্য শুদ্ধশীলায় কুলীনায় মহাত্মনা॥

সম্ভবতঃ এই গর্গের বংশে ঋষিপুত্র জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। এঁর নাম হতেই বোঝা যায় যে ইনি কোন ঋষির পুত্র ছিলেন অথবা কোন ঋষির আশীর্বাদে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষিপুত্রের মাত্র একটী নিমিত্ত শাস্ত্রই পাওয়া যায়। এঁর লিখিত এক সংহিতার নাম মদনরত্ন নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋষিপুত্রের উদ্ধরণ বৃহৎসংহিতার মহোৎপলী টীকায় পাওয়া যায়।

ঋষিপুত্রের সময় বরাহমিহিরের পূর্বে হওয়া উচিত। কারণ ঋষিপুত্রের প্রভাব বরাহ মিহিরের ওপর সুস্পষ্ট। এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করছি।

সসলোহিবণ্ণহোবরি সংকুণ ইতি হোই ণায়ব্বো।
সংগামং পুণ ঘোরং খগ্‌গং সূরো নিবেদঈ॥

—ঋষিপুত্র নিমিত্তশাস্ত্র

শশিরুধিরনিভে ভানৌ নভস্থলে ভবন্তি সংগ্রামাঃ।

—বরাহমিহির

নিজের নিমিত্তশাস্ত্রে পৃথিবীতে যা দেখা যায়,আকাশ যা দৃষ্টিগোচর হয় ও বিভিন্ন প্রকার শব্দ শ্রবণে যা প্রকটিত হয় এই তিন প্রকার নিমিত্ত দ্বারা ফলাফল নিরূপণ সুন্দর ভাবে করা হয়েছে। বর্ষাৎপাৎ, দেবোৎপাত, রাজোৎপাত উল্কোৎপাত, গন্ধর্বোৎপাত ইত্যাদি অনেক উৎপাৎ দ্বারা শুভাশুভ মীমাংসাও সুন্দরভাবে করা হয়েছে।

লগ্নশুদ্ধি বা লগ্নকুণ্ডিকা নামে হরিভদ্রের একটী গ্রন্থ পাওয়া যায়। হরিভদ্র দর্শন, কথা ও আগম সাহিত্যের প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। এঁর সময় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। ইনি ১৪৪০টী গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে মুনি জিন বিজয়জী ৮৮ খানা গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছেন। এঁর ২৬টী রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

লগ্নশুদ্ধি প্রাকৃত ভাষায় লেখা জ্যোতিষ গ্রন্থ। এতে লগ্নের ফল, দ্বাদশ ভাবের নাম, তা দিয়ে বিচারণীয় বিষয়, লগ্ন সম্বন্ধে গ্রহের স্বরূপ, নবাংশ, উচ্চাংশ আদি বিবৃত হয়েছে। জাতক বা হোরা শাস্ত্রের এই গ্রন্থ। উপযোগিতার দৃষ্টিতে এর মহত্ত্ব অনেক। গ্রহের বল ও লগ্নের সমস্ত প্রকারে শুদ্ধি পাপগ্রহের অভাব ও শুভ গ্রহের সদ্ভাব বর্ণিত হয়েছে।

। ক্রমশঃ

মহাবীর বাণী

শ্রীবিজয়সিংহ নাহার

॥ ১৩ ॥

কষায় সূত্র

১৬২। অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ ও মান এবং প্রবর্ধমান মায়া ও লোভ—এই চারিটি কুৎসিৎ কষায় পুনর্জন্মরূপ সংসার বৃক্ষের মূল সিঞ্চন করে।

১৬৩। যে মনুষ্য নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী সে পাপবৃদ্ধিকারী ক্রোধ মান, মায়া ও লোভ এই চারিটি দোষকে সর্বদার জন্য পরিত্যাগ করিবে।

১৬৪। ক্রোধ প্রীতির নাশ করে, মান বিনয়ের ; মায়া মিত্রতা নষ্ট করে এবং লোভ সমস্ত সদ্‌গুণ।

১৬৫। শান্তির দ্বারা ক্রোধ জয় কর, নম্রতার দ্বারা মান, সরলতা দ্বারা মায়া জয় কর ও সন্তোষের দ্বারা লোভ।

১৬৬। অনেক প্রকারের ও বহুমূল্য পদার্থে পরিপূর্ণ এই সমগ্র বিশ্বও যদি কাহাকেও দেওয়া হয় তাহা হইলেও সে সন্তুষ্ট হইবে না। হায়, মনুষ্যের তৃষ্ণা অপূরণীয়।

১৬৭। যেমন যেমন লাভ হয় তেমন তেমন লোভ বর্দ্ধিত হয়। দেখ, প্রথমে কেবল দুই মাসা স্বর্ণের আবশ্যকতা ছিল কিন্তু পরে তাহা কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রায়ও পূর্ণ হইতেছে না।

১৬৮। ক্রোধে মনুষ্য অধঃপতিত হয়, অভিমানে অধম গতি প্রাপ্ত করে, মায়াতে সদ্‌গতি নষ্ট হয় ও লোভে ইহ ও পরলোকে মহাভয় উৎপন্ন করে।

১৬৯। কৈলাস পর্বতের মত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বতও যদি নিকটে থাকে তবুও লোভী মনুষ্যের তৃপ্তির জন্য তাহা কিছুই নয়। কারণ তৃষ্ণা আকাশের মত অসীম।

১৭০। ধান্য, যবাদি বীজ, সুবর্ণ ও পশু পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীও লোভী মনুষ্যকে পরিতৃপ্ত করিতে অসমর্থ। ইহা জ্ঞাত হইয়া সংযম আচরণ করিবে।

১৭১। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারিটি অন্তরাত্মার ভয়ানক দোষ। যে অর্হৎ মহর্ষি ইহাদের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি স্বয়ং পাপ করেন না ও অন্যকে দিয়াও করান না।

॥ ১৪ ॥

কামসূত্র

১৭২। কামভোগ শল্যরূপ, বিষরূপ ও বিষধর সর্পের সমান। কামভোগে লালসাযুক্ত ব্যক্তি উহাদের প্রাপ্ত না হইয়াই অতৃপ্ত অবস্থায় একদিন দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

১৭৩। গীত বিলাপের মত, নাটক বিড়ম্বনা মাত্র, আভরণ ভার রূপ। অধিক কি সংসারের সমস্ত কামভোগ দুঃখবহ।

১৭৪। কামভোগ ক্ষণমাত্র সুখদায়ক কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য দুঃখ আনয়ন করে। উহাতে সুখ অল্প, দুঃখই অধিক। উহা মোক্ষসুখের ভয়ঙ্কর শত্রু ও অনর্থের খনি।

১৭৫। যেমন কিংপাক ফলের পরিণাম ভাল হয় না সেইরূপ ভোগের পরিণামও ভাল হয় না।

১৭৬। রূপ, রঙ ও রসের দৃষ্টিতে খাইবার সময় গোড়াতে কিংপাক ফল যেরূপ মধুর মনে হয় কিন্তু পরে তাহা প্রাণ বিনষ্ট করে সেইরূপ কামভোগও গোড়াতে মধুর মনে হয় কিন্তু পরে বিপাক সময়ে সর্বনাশ করিয়া দেয়।

১৭৭। ভোগী, ভোগাসক্ত কর্মমলে লিপ্ত হয়। অভোগী লিপ্ত হয় না। ভোগী সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, অভোগী সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

১৭৮। মৃগচর্ম, নগ্নত্ব, জটা, সংঘাটিকা (বৌদ্ধ ভিক্ষুর উত্তরীয় বস্ত্র) ও মুণ্ডন আদি কোন প্রকার ধর্মচিহ্ন দুঃশীল ভিক্ষুকে রক্ষা করিতে পারে না।

১৭৯। যে অবিবেকী মন বচন ও কায়া দ্বারা শরীর, বর্ণ ও রূপে আসক্ত থাকে সে নিজের জন্য দুঃখ উৎপন্ন করে।

১৮০। কাল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ধাবিত হইতেছে। জীবনের এক এক করিয়া সমস্ত রাত্রিই ব্যতীত হইতে চলিয়াছে। ফলস্বরূপ কামভোগও চিরস্থায়ী নয়। ভোগ বিলাসের সাধন রহিত মনুষ্যকে (অসমর্থতার জন্য) লোক সেইরূপে পরিত্যাগ করে যেরূপে ক্ষীণফল বৃক্ষকে পক্ষীরা পরিত্যাগ করে।

১৮১। মানব জীবন নশ্বর, তাহাতে নিজের আয়ু ত আরো পরিমিত। একমাত্র মোক্ষমার্গই অবিচল। এই কথা জ্ঞাত হইয়া কামভোগ হইতে নিবৃত্ত হও।

১৮২। হে মানব, মনুষ্য জীবন অত্যন্ত অল্প, ক্ষণভঙ্গুর, অতএব শীঘ্র পাপকর্ম হইতে নিজেকে বিমুক্ত কর। সংসারে আসক্ত ও কামভোগে মূর্চ্ছিত অসংযত মনুষ্য বারবার মোহপ্রাপ্ত হয়।

১৮৩। বোঝ, এইটুকু কেন বুঝিতে পারিতেছ না ? পরলোকে সম্যক বোধিপ্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে রাত্রি ব্যতীত হইয়াছে তাহা কখনো ফিরিয়া আসিবে না। মনুষ্য জীবন পুনরায় পাওয়াও সহজ নহে।

১৮৪। কামভোগ অনেক কষ্টে পরিত্যাগ করা যায়, অধীর ব্যক্তিত সহসা ইহাদের পরিত্যাগ করিতেই পারে না। কিন্তু যাঁহারা মহাব্রতের মত সুন্দর ব্রত পালনকারী সাধুপুরুষ তাঁহারা বণিক যেরূপ সমুদ্র অতিক্রম করে সেইরূপ দুস্তর ভোগ সমুদ্র অতিক্রম করেন।

[ক্রমশঃ

ভগবান আদিনাথের প্রতি

শ্রীপ্রদীপ চোপরা

তুমি
অনাদি ও অনন্তকাল
হতে
চলেছো ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দুর্গম পথ
করে পরিক্রমণ।

তোমার দিব্যদৃষ্টির স্পর্শে
দিব্য
হয়ে উঠে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান
আমাদের সকলের।

কাল চক্রে আবর্তিত হয়ে
মিলিত ও বিলীন হব আমরা
তোমার নাভিতে।

পূর্ণযাত্রা হবে পুনঃ তোমার আদি ও অন্ত নিয়ে

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

অশোক দত্ত তখন কৃত্রিম সলজ্জতা দেখিয়ে বলল, ভাই, প্রিয়দর্শনা অনেক দিন হতেই আমাকে অনুচিত কথা বলত। আমি এই ভেবে তা উপেক্ষা করেছিলাম যে নিজেই লজ্জিত হয়ে সে চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু কুলটার মত তার ভাষণ বন্ধ হল না। বলাও হয়েছে—স্ত্রীলোকেদের অসৎ আগ্রহ কত তীব্র! বন্ধু, আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। তখন ছলনাময়ী সেই নারী আমাকে রাক্ষসীর মত আটকে রাখল। কিন্তু হস্তী যেমন বন্ধন হতে মুক্ত হয় তেমনি অনেক চেষ্টার পর তার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেখান হতে পালিয়ে আসছি। আমি আসতে আসতে ভাবলাম, এই কুলটা আমার জীবনকাল পর্যন্ত আমায় পরিত্যাগ করবে না, তাই আমার আত্মহত্যাই করা উচিত। কিন্তু আত্মহত্যা করাও ত পাপ। কারণ এই কুলটা তখন যা বলবে তা এর বিপরীতই। এজন্য আমি সমস্ত কথা আমার বন্ধুকে কেন না বলি, যাতে সে তার ওপর বিশ্বাস করে নিজেকে বিনষ্ট না করে। অথবা এও ঠিক নয়। কারণ আমি যখন তার ইচ্ছা পূর্ণ করিনি তখন কেন তার দুঃশীলের কথা বলে তোমার ক্ষতে লবণ নিক্ষেপ করি? এরকম ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম তখন তুমি আমায় দেখলে। ভাই, এই আমার দুঃখের কারণ।

তার কথা সাগরচন্দ্রের এরূপ মনে হল যেন সে তীব্র হলাহল পান করল। সে তেমনি নিস্পন্দ হয়ে গেল যেমন নিবাত সমুদ্র স্থির হয়ে যায়। তারপর সে বলল, স্ত্রীলোকেরা এইরূপই। কারণ তিক্ত-মাটির তলার জল ত তিক্তই হয়। বন্ধু, তুমি আর দুঃখ কোরোনা, ভালো কাজে নিজেকে নিযুক্ত কর। সুস্থ হও ও তার কথা মনে করোনা। ভাই, সত্যি সে যেমনই হোক কিন্তু তার জন্য আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে যেন কোন মলিনতা না আসে।

সরল স্বভাব সাগরচন্দ্রের কথায় অধম অশোকদত্ত আনন্দিত হল। কারণ যারা কপট তারা অপরাধ করেও নিজের প্রশংসা করায়।

সেদিন হতে সাগরচন্দ্র প্রিয়দর্শনার প্রতি স্নেহ-রহিত হয়ে এভাবে বাস করতে লাগল যেমন আঙুল রোগাক্রান্ত হলেও মানুষ কেটে ফেলেনা। কারণ নিজ হাতে বোনা লতা যদি বন্ধ্যা হয় তবুও তাকে তুলে ফেলা যায় না।

প্রিয়দর্শনাও অশোদত্তের কথা পতিকে বলল না পাছে তাদের মধ্যে বন্ধু বিচ্ছেদ হয়।

সাগরচন্দ্র সংসারকে কারাতুল্য মনে করে নিজের সমস্ত ধন ঐশ্বর্য অনাথ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে তাদের কৃতার্থ করতে লাগল। এভাবে জীবন যাপন করে প্রিয়দর্শনা, সাগরচন্দ্র ও অশোকদত্ত আয়ু পূর্ণ হলে পরলোকে গমন করল।

সাগরচন্দ্র ও প্রিয়দর্শনা এই জম্বুদ্বীপের ভরতক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে গঙ্গা ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী ভূভাগে এই অবসর্পিণীর তৃতীয় অরে পল্যোপমের যখন এক অষ্টমাংশ বাকী তখন যুগল রূপে উৎপন্ন হল।

পাঁচ ভরত ও পাঁচ ঐরাবত ক্ষেত্রে সময়ের নির্ণায়ক বারো অরের এক কালচক্র হয়। এই কালচক্রের উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী এই দুই ভেদ।

অবসর্পিণী কাল ছ'ভাগ বা অরে বিভক্ত। যথা—

১) সুষমা সুষমা—এই অর ৪ কোটি × ৪ কোটি সাগরোপমের।

২) সুষমা—এই অর ৩ কোটি × ৩ কোটি সাগরোপমের।

৩) সুষমা দুষমা—এই অর ২ কোটি × ২ কোটি সাগরোপমের।

৪) দুষমা সুষমা—এই অর বিয়াল্লিশ হাজার বর্ষ কম ১ কোটি × ১ কোটি সাগরোপমের।

৫) দুষমা—এই অর একুশ হাজার বর্ষের.

৬) দুষমা দুষমা—এই অরও একুশ হাজার বর্ষের।

যেভাবে অবসর্পিণীর অর-র কথা বলা হল, সে প্রকারে উৎসর্পিণীরও প্রতি-লোমক্রমে ছয় অর হয়। (অর্থাৎ দুষমা দুষমা, দুষমা, দুষমা, সুষমা, সুষমা দুষমা, সুষমা, সুষমা সুষমা।) অবসর্পিণী উৎসর্পিণীর কাল সংখ্যা মোট ২০ কোটি × ২০ কোটি সাগরোপমের। একেই কালচক্র বলা হয়।

প্রথম অরে মানুষের আয়ু তিন পল্যোপম হয়, শরীর তিন ক্রোশ দীর্ঘ হয়। তারা চতুর্থ দিনে আহার গ্রহণ করে, সমচতস্র সংস্থান সম্পন্ন, সর্বসুলক্ষণ যুক্ত, বজ্রঋষভনারাচ-সংহনন বিশিষ্ট ও সর্বদা সুখী হয়। তারা ক্রোধ রহিত, মানরহিত, নিষ্কপট, নির্লোভী ও স্বভাবজনাই অধর্মপরিহারী হয়। উত্তর কুরুর মত সেই সময় অহোরাত্র তাদের ইচ্ছা পূরণকারী মদ্যাংগাদি এই প্রকার কল্পবৃক্ষ থাকে—

১) মদ্যাংগ নামক কল্পবৃক্ষ চাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ উত্তম মদ্য দেয়।

২) ভৃতাংগ নামক কল্পবৃক্ষ ভাণ্ডারের মত পাত্রাদি বাসন দেয়।

৩) তূর্যাংগ নামক কল্পবৃক্ষ তিন প্রকারের বাদ্য যন্ত্র দেয়।

৪-৫) দীপশিখা ও জ্যোতিশিখা নামক কল্পবৃক্ষ আলোকদান করে।

৬) চিত্রাংগ নামক কল্পবৃক্ষ বিচিত্র বর্ণের পুষ্পমাল্যাদি দেয়।

৭) চিত্ররস নামক কল্পবৃক্ষ পাচকের মত নানাবিধ খাদ্যাদি দেয়।

৮) মণ্যংগ নামক কল্পবৃক্ষ ঈপ্সিত অলঙ্কারাদি দেয়।

৯) গেহাকার নামক কল্পবৃক্ষ ইচ্ছামাত্র গন্ধর্বনগরীর মত উত্তম গৃহ দেয়।

১০) অনগ্ন নামক কল্পবৃক্ষ মনোমত বসন দেয়।

এদের মধ্যের প্রত্যেক কল্পবৃক্ষ নানাপ্রকার ঈপ্সিত বস্তু দান করে।

সেই সময় মাটি শর্করার চাইতেও অধিক স্বাদযুক্ত হয়। নদী আদির জল অমৃতের চাইতেও মিষ্ট হয়। সেই অরে ধীরে ধীরে আয়ু, সংহনন ও কল্পবৃক্ষের প্রভাব ক্রমশঃ কম হতে থাকে।

দ্বিতীয় অরে মানুষের আয়ু দুই পল্যোপম শরীর দুই ক্রোশ দীর্ঘ হয় ও তারা প্রতি তৃতীয় দিনে আহার গ্রহণ করে। সেই সময় কল্পবৃক্ষ কিছু কম প্রভাব সম্পন্ন, মাটি কম স্বাদযুক্ত ও জল কিছু কম মিষ্ট হয়। এই অরেও প্রথম অরের মত যেমন হাতীর শুঁড়ের ব্যাস ক্রমশঃ কম হয় সেরূপ প্রত্যেক বিষয় কম হতে থাকে।

তৃতীয় অরে মানুষ এক পল্যোপম আয়ুসম্পন্ন, এক ক্রোশ দীর্ঘ ও দ্বিতীয় দিনে ভোজনকারী হয়। এই অরেও পূর্ববর্তী অরের মত শরীর, আয়ু, মাটির স্বাদ ও কল্পবৃক্ষের প্রভাব ক্রমশঃ কম হতে থাকে।

চতুর্থ অর কল্পবৃক্ষ, মাটির স্বাদ ও জলের মিষ্টত্ব রহিত হয়। সেই সময় মানুষের আয়ু এক কোটি পূর্ব, ও দৈর্ঘ পাঁচশ ধনুক হয়।

পঞ্চম অরে মানুষের আয়ু একশ বছর ও দৈর্ঘ সাত হাত হয়।

ষষ্ঠ আরে মানুষের আয়ু মাত্র ষোল বছর ও দৈর্ঘ সাত হাত হয়।

দুষমা-দুষমা নামক অর হতে বিলোম ক্রমে অর্থাৎ অবসর্পিণীর বিপরীতভাবে ছয় অরে মানুষের আয়ু, দৈর্ঘাদি বর্দ্ধিত হয়।

সাগরচন্দ্র ও প্রিয়দর্শনা তৃতীয় অরের শেষভাগে উৎপন্ন হবার জন্য নয়শ ধনুক দৈর্ঘ সম্পন্ন ও পল্যোপমের এক দশমাংশ আয়ু বিশিষ্ট যুগল হল। তাদের শরীর বজ্র ঋষভনারাচ সংহনন বিশিষ্ট ও সমচতস্র সংস্থান যুক্ত হল। মেঘমালায় যেমন মেরুপর্বত শোভিত হয় ওই প্রকার জাতি সুবর্ণের কান্তিবিশিষ্ট যুগ্মধর্মী (সাগরচন্দ্রের জীব) প্রিয়ঙ্গুবর্ণা (রাইএর মত) স্ত্রীর দ্বারা শোভিত হল।

অশোকচন্দ্রও পূর্বজন্ম কৃত কপটের জন্য সেই স্থানে সাদা রঙ ও চার দাঁত নিয়ে দেবহস্তীর মত হাতী হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। একবার ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে সে তার পূর্বজন্মের মিত্র যুগলরূপে উৎপন্ন সাগরচন্দ্রকে দেখতে পেল।

বীজ হতে যেমন অঙ্কুর উদ্গত হয় সেইরূপ মিত্রদর্শন রূপ অমৃতে সিঞ্চিত সেই হস্তীর শরীরে স্নেহ অঙ্কুরিত হল। সে তখন তাকে শুঁড় দিয়ে আলিঙ্গন করল ও তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তুলে নিজের স্কন্ধে বসাল। একে অন্যকে দেখার

অভ্যাসের জন্য তাদের উভয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে কৃত কাজের মত পূর্বজন্মের স্মৃতি উদিত হল।

সেই সময় চার দাঁত বিশিষ্ট হস্তীর স্কন্ধস্থিত সাগরচন্দ্রকে অন্যান্য যুগলিকরা বিস্ফারিত চোখে ইন্দ্রের মত দেখতে লাগল। সে শংখ, কুন্দ ও চন্দ্রের মত বিমল হস্তীর উপর বসেছিল বলে তারা তাকে বিমলবাহন বলে অভিহিত করল। জাতিস্মরণ জ্ঞানে সমস্ত নীতিশাস্ত্র জ্ঞাত হওয়ায়, বিমল হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করায় ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যসম্পন্ন হওয়ায় সে সকলের অধিক সম্মাননীয় হল।

কিছু সময় অতীত হলে চরিত্রভ্রষ্ট যতিদের মত কল্পবৃক্ষের প্রভাব কম হতে লাগল। মদ্যাংগ কল্পবৃক্ষ অল্প ও বিরস মদ্য দিতে লাগল যেন তারা পূর্বের কল্পবৃক্ষ নয়, দুর্দৈব তাদের স্থানে যেন অন্য কল্পবৃক্ষ রোপণ করে দিয়েছে। ভৃতাংগ কল্পবৃক্ষ দিব কি দিব না এভাবে চিন্তা করতে করতে প্রার্থনা করার পরও দেরী করে পাত্র দিতে লাগল। তূর্যাংগ কল্পবৃক্ষ এভাবে সংগীত পরিবেশন করতে লাগল যেন তাদের জবরদস্তী ধরে এনে পারিশ্রমিক না দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপশিক্ষা ও জ্যোতিষ্ক কল্পবৃক্ষ বার বার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও পূর্বের মত আলোক দিল না—দিনের বেলায় যেমন দীপশিখার আলোক হয় সেরূপ আলোক দিতে লাগল। চিত্রাংগ কল্পবৃক্ষ অবিনয়ী ও আজ্ঞালংঘনকারী সেবকের মত ইচ্ছামত পুষ্পমাল্য দিতে লাগল। চিত্ররস বৃক্ষ দান দেবার ইচ্ছা যার নেই এরূপ সদাব্রতের মত চার প্রকার রসসম্পন্ন খাদ্য পূর্বের মত আর দিলনা। মণ্যংগ কল্পবৃক্ষ, পরে আর কোথায় পাব এই চিন্তায় পীড়িত হয়ে পূর্বের মত আর অলঙ্কার দিল না। কল্পনা শক্তিহীন কবি ভালো কবিতা যেমন ধীরে ধীরে রচনা করে গেহাকার কল্পবৃক্ষও সেরূপ গৃহ ধীরে ধীরে দিতে লাগল। গ্রহদ্বারা বাঁধিত মেঘ যেমন অল্প অল্প জল বর্ষণ করে সেরূপ অনগ্ন কল্পবৃক্ষ বস্ত্র দিতে কার্পণ্য করতে লাগল। সেই সময়ে কাল প্রভাবে যুগলীদেরও শরীরের অবয়বের মত কল্পবৃক্ষের ওপর মমতা হতে লাগল (অর্থাৎ তাকে আমার বলে মনে করতে লাগল)। এক যুগলিক যে কল্পবৃক্ষের আশ্রয় নিয়েছে সেই কল্পবৃক্ষে অন্য যুগলিক যদি এসে আশ্রয় নিল ত পূর্ববর্তী যুগলিক নিজেকে পরাভূত বলে মনে করতে লাগল। (অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে) পরস্পরার পরাভব সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে যুগলিকরা বিমলবাহনকে নিজের চেয়ে বেশী শক্তিশালী মনে করে তাঁকে তাদের প্রভু বা নেতা বলে স্বীকার করে নিল।

বিমল বাহন জাতিস্মরণ জ্ঞানে নীতিশাস্ত্র জ্ঞাত হওয়ায় তাদের মধ্যে কল্পবৃক্ষ এভাবে বিভাজিত করে দিলেন যেমন বৃদ্ধপুরুষ নিজ গোত্রে (পরিবারে) ধন বণ্টন করেন। যদি কেউ অন্যের কল্প বৃক্ষের ইচ্ছায় মর্যাদা ত্যাগ করত তবে তাদের দণ্ড দেবার জন্য তিনি 'হাকার' নীতির প্রয়োগ করতেন। সমুদ্র জল যেমন তটের

মর্যাদা লঙ্ঘন করে না, তেমনি—'হায় তুমি এরূপ করলে' এই বাক্য শুনে তারা আর মর্যাদা লঙ্ঘন করত না। তারা শারীরিক পীড়া সহ্য করতে পারত কিন্তু হায় তুমি এরূপ করলে এরূপ অপমানকর বাক্য সহ্য করতে পারত না। (অর্থাৎ এরূপ বাক্যকে অধিক দণ্ড বলে মনে করত।)

যখন বিমল বাহনের আয়ু কেবল ছ' মাসের বাকী রইল তখন তাঁর স্ত্রী চন্দ্রযশা এক যুগলের জন্ম দিলেন। সেই যুগল অসংখ্যপূর্ব আয়ু সম্পন্ন, প্রথম সংস্থান প্রথম সংহনন যুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও আটশ ধনুক দীর্ঘ হল। মাতা-পিতা তাদের নাম চক্ষুষ্মান ও চন্দ্রকান্তা দিলেন। এক সঙ্গে অঙ্কুরিত বৃক্ষ ও লতার মত তারা একসঙ্গে বৰ্দ্ধিত হতে লাগল।

ছ' মাস পর্যন্ত নিজ সন্তানদের পালন করে বিমল বাহন ও তাঁর স্ত্রী বার্দ্ধক্যে জীর্ণ বা রোগে পীড়িত না হয়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হলেন। বিমল বাহন সুবর্ণ কুমার দেবলোকে ও তাঁর স্ত্রী চন্দ্রযশা নাগকুমার দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। চন্দ্র অস্তমিত হলে চন্দ্রিকাও আর থাকে না।

সেখান হতে সেই হস্তীও আয়ু পূর্ণ হওয়ায় নাগকুমার দেবলোকে নাগকুমার হয়ে উৎপন্ন হল। কালের মাহাত্ম্যই এইরূপ।

নিজ পিতা বিমলবাহনের মত চক্ষুষ্মানও হাকার নীতিতে যুগলিকদের মর্যাদা রক্ষা করতে লাগলেন।

মৃত্যুসময় নিকটে এলে চক্ষুষ্মানেরও চন্দ্রকান্তা দ্বারা যশস্বী ও সুরূপা নামে যুগল পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হল। দ্বিতীয় কুলকরের মতই তাদের সংহনন ও সংস্থান ছিল। ওদের আয়ু অবশ্য কিছু কম ছিল। আয়ু ও বুদ্ধির মত তারা দুজনে বৰ্দ্ধিত হতে লাগল। তারা সাড়ে সাতশ ধনুক দীর্ঘ ছিল। তাই তারা যখন এক সঙ্গে বেড়ত তখন তোরণের স্তম্ভের মত তাদের মনে হত।

আয়ু শেষ হলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে চক্ষুষ্মান সুবর্ণকুমার ও চন্দ্রকান্তা নাগকুমাররদের মধ্যে উৎপন্ন হলেন।

যশস্বী কুলকর নিজের পিতার মত গোপ যেমন গাভীদের পালন করে তেমনি অবলীলায় যুগলদের পালন করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সময় লোকেরা 'হাকার' দণ্ডের এভাবে উল্লংঘন করতে লাগল যেমন মদমত্তহস্তী অংকুশের উপেক্ষা করে। তখন যশস্বী তাদের 'মাকার' (তুমি এরূপ করো না)দণ্ডে দণ্ডিত করতে লাগলেন। এক ওষুধে যদি ব্যাধি দূর না হয় তবে অন্য ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। মহামতি যশস্বী অল্প অপরাধ কারীকে হাকার নীতিতে, অধিক অপরাধকারীকে মাকার নীতিতে ও তারো অধিক অপরাধকারীকে দুই নীতিতে দণ্ড দিতে লাগলেন।

যশস্বী ও সুরূপার আয়ু যখন অল্প বাকি রইল তখন যেমন বিনয় ও বুদ্ধি এক

সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করে সেরূপভাবে তাঁদের এক যুগল পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করল। তাঁরা পুত্রের নাম অভিচন্দ্র রাখলেন কারণ সে চাঁদের মত উজ্জল বর্ণের ছিল ও কন্যার নাম প্রতিরূপা রাখলেন কারণ সে দেখতে প্রিয়ঙ্গুলতার মত কান্তি সম্পন্ন ছিল। তারা তাদের মাতা পিতার চাইতে কিছু কম আয়ু সম্পন্ন ও সাড়ে ছ'শ ধনুক দীর্ঘ ছিল। এক সঙ্গে মিলিত সমী ও বট গাছের মত তারা বর্দ্ধিত হতে লাগল। গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র প্রবাহের মিলিত জলের মত উভয়ে নিরন্তর শোভা দিতে লাগল।

আয়ু পূর্ণ হলে যশস্বী উদধিকুমার ও সুরূপা নাগকুমার ভুবনপতি দেব নিকায়ে উৎপন্ন হলেন।

অভিচন্দ্রও নিজের পিতার মত সেই দুই নীতির দ্বারা যুগলদের দণ্ড দিতে লাগলেন।

অন্তিম অবস্থায় প্রতিরূপা এক যুগলের এভাবে জন্ম দিলেন যেভাবে অনেক প্রাণীর প্রার্থনায় রাত্রি চন্দ্রমাকে জন্ম দেয়। মাতা পিতা পুত্রের নাম প্রসেনজিৎ রাখলেন ও কন্যা সকলের চোখের প্রিয় বলে তার নাম চক্ষুকান্তা রাখলেন। তারা দুজনে মাতা-পিতার চাইতে কম আয়ু সম্পন্ন, তমালবৃক্ষের মত শ্যামকান্তি ও বুদ্ধি ও উৎসাহের মত একত্র বর্দ্ধিত হতে লাগল। তাদের দৈর্ঘ ছিল ছ'শ ধনুক ও বিষুব কালে দিন ও রাত্রি যেমন সমান হয় সেইরূপ তারা সমান প্রভা সম্পন্ন ছিল।

মৃত্যুর পর অভিচন্দ্র উদধিকুমার ও প্রতিরূপা নাগকুমার লোকে উৎপন্ন হলেন।

প্রসেনজিৎ সমস্ত যুগলদের রাজা হলেন। কারণ প্রায়শঃই মহাত্মাদের পুত্র মহাত্মাই হয়।

কামার্ত ব্যক্তি যেমন লজ্জা ও মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে রকম সেই সময়ের যুগলেরা হাকার ও মাকার দণ্ড নীতির উপেক্ষা করতে লাগল। তখন প্রসেনজিৎ অনাচাররূপ মহাভূতকে ভয় পাওয়াতে মন্ত্রাক্ষরের মত তৃতীয় ধিক্কার (ধিক্ তুমি এরূপ করলে) নীতি গ্রহণ করলেন। মাহুত যেমন তিন অঙ্কুশে হাতীকে বশীভূত রাখে সেরূপ কুশল প্রয়োগী প্রসেনজিৎ সেই তিন নীতিতে (হাকার, মাকার ও ধিক্কার) যুগলদের দণ্ড দিয়ে সকলকে নিজের বশে রাখলেন।

কিছুকাল পরে যুগ্ম দম্পতীর আয়ু যখন সামান্য অবশেষ রইল তখন চক্ষুকান্তা স্ত্রী-পুরুষরূপ এক যুগলের জন্ম দিলেন। তাদের দৈর্ঘ সাড়ে পাঁচ শ' ধনুক ছিল এবং তারা বৃক্ষ ও ছায়ার মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে লাগল। সেই যুগল মরুদেব ও শ্রীকান্তা নামে লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করল। সুবর্ণতুল্য কান্তি সম্পন্ন মরুদেব নিজের প্রিয়ঙ্গুলতা তুল্য প্রিয়ার সঙ্গে নন্দনবনের বৃক্ষশ্রেণীতে কনকাচল (মেরু) যেমন শোভিত হয় সেইরূপ শোভিত হল।

আয়ু পূর্ণ হলে প্রসেনজিৎ দ্বীপকুমার ও চক্ষুকান্তা নাগকুমার দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন।

মরুদেব প্রসেনজিতের দণ্ডনীতিতে ইন্দ্র যেমন দেবতাদের দণ্ড দেন সেরূপ যুগলদের দণ্ড দিয়ে তাদের বশে রাখলেন।

আয়ু পূর্ণ হতে যখন অল্প সময় বাকী রইল তখন শ্রীকান্তা এক যুগলের জন্ম দিলেন। পুত্রের নাম নাভি ও কন্যার নাম মরুদেবা রাখা হল। পাঁচশ' পাঁচশ ধনুক বিশিষ্ট তারা ক্ষমা ও সংযমের মত একসঙ্গে বৰ্দ্ধিত হতে লাগল। মরুদেবা প্রিয়ঙ্গু-লতার মত ও নাভি সুবর্ণের মত কান্তিসম্পন্ন ছিল। এতে তাদের নিজের পিতার প্রতিবিম্ব বলে সকলের মনে হত। তাদের আয়ু নিজ মাতাপিতার অর্থাৎ মরুদেব ও শ্রীকান্তার আয়ুর কিছু কম পূর্বের ছিল।

মৃত্যুর পর মরুদেব দ্বীপকুমার ও শ্রীকান্তা নাগকুমার লোকে উৎপন্ন হলেন।

মরুদেবের পর রাজা নাভি যুগলদের সপ্তম কুলকর হলেন। তিনিও উপরোক্ত তিন নীতি দ্বারা যুগলদের দণ্ড দিতে লাগলেন।

তৃতীয় অরের যখন চুরাসী লক্ষ পূর্ব ও উনআশি পক্ষ (তিন বছর সাড়ে সাত মাস) বাকী তখন আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে চন্দ্রযোগে বজ্রনাভের (ধন শ্রেষ্ঠীর) জীব তেত্রিশ সাগরোপমের আয়ু পূর্ণ করে সর্বার্থসিদ্ধ বিমান হতে চ্যুত হয়ে হংস যেমন মান সরোবর হতে গঙ্গাতটে যায় সেভাবে কুলকর নাভীপত্নী মরুদেবীর গর্ভে প্রবেশ করল। সেই সময় মুহূর্তের জন্য প্রাণী মাত্রের দুঃখের উচ্ছেদ হল। এজন্য তিন লোকে সুখ ও উদ্যোতের প্রকাশ হল।

যে রাত্রে ভগবান চ্যুত হয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করলেন সেইরাত্রে প্রাসাদে প্রসুপ্তা মরুদেবী চোদ্দটী মহা স্বপ্ন দেখলেন।

প্রথম স্বপ্নে তিনি উজ্জ্বল স্কন্ধযুক্ত, দীর্ঘ ও সরল পুচ্ছ বিশিষ্ট, সোনার ঘণ্টিকা পরিহিত, বিদ্যুৎসহ শরতকালীন মেঘের মত বৃষভ দেখলেন।

দ্বিতীয় স্বপ্নে শ্বেতবর্ণ ক্রমশঃ উন্নত, নিরন্তর প্রবহমান মদধারায় রমণীয়, সঞ্চরমান কৈলাশ পর্বত তুল্য চারদন্ত যুক্ত হস্তী দেখলেন।

তৃতীয় স্বপ্নে পীতচক্ষু, দীর্ঘজিহবা, চপল কেশর যুক্ত, বীরের জয়ধ্বজার মত পুচ্ছ উল্লম্ফনকারী কেশরী দেখলেন।

চতুর্থ স্বপ্নে কমলবাসিনী, পদ্মাননা, দিগগজ কর্তৃক পূর্ণকুম্ভ দ্বারা অভিষিচ্য-মানা লক্ষ্মীদেবী দেখলেন।

পঞ্চম স্বপ্নে দেবদ্রুমের পুষ্পদ্বারা গ্রথিত, সরল ও ধনুর্দ্ধারীর আরোপিত ধনুর মত দীর্ঘ পুষ্প মাল্য দেখলেন।

ষষ্ঠ স্বপ্নে যেন নিজের মুখের প্রতিবিম্ব ও আনন্দের কারণরূপ ও কান্তি দ্বারা যা দিক সমূহ প্রকাশিত করেছে এরূপ চন্দ্রমণ্ডল দেখলেন।

সপ্তম স্বপ্নে রাত্রিকালেও দিবসের ভ্রম উৎপন্নকারী তমোনাশক ও প্রসারিত প্রভা সূর্য দেখলেন।

অষ্টম স্বপ্নে চপল কর্ণে যেমন হস্তী শোভা পায় সেরূপ ঘণ্টিকা পংক্তিতে সমৃদ্ধ ও আন্দোলিত পতাকা শোভিত মহাধ্বজ দেখলেন।

নবম স্বপ্নে বিকসিত পদ্মে যার মুখ আঁচিত করা হয়েছে এরূপ সমুদ্রমন্থনোত্থিত সুধাভাণ্ডের ন্যায় জলপূর্ণ সুবর্ণ কলশ দেখলেন।

দশম স্বপ্নে আদি অর্হতের স্তুতির জন্য ভ্রমরগুঞ্জিত কমল রূপ বহু মুখ ব্যাদনকারী কমল সরোবর দেখলেন।

একাদশ স্বপ্নে পৃথিবী ব্যাপ্ত শরৎকালীন অভ্র মালার মত উৎক্ষীপ্ত তরঙ্গে চিত্তকে আনন্দদানকারী ক্ষীর সমুদ্র দেখলেন।

দ্বাদশ স্ব যেন ভগবান দেব শরীরে সেখানে নিবাস করেছেন সেজন্য স্নেহবশতঃ আগত কান্তিময় দেব বিমান দেখলেন।

ত্রয়োদশ স্বপ্নে যেন কোন কারণে নক্ষত্র সমূহ স্তূপীকৃত করা হয়েছে এরূপ একত্রিত নির্মল কান্তি বিশিষ্ট রত্নপুঞ্জ দেখলেন।

চতুর্দশ স্বপ্নে ত্রিলোকব্যাপ্ত তৈজস পদার্থের একীকৃত দ্যুতির মত প্রকাশমান নির্ধূম অগ্নি মুখের ভেতর প্রবেশ করতে দেখলেন।

রাত্রিশেষে স্বপ্ন দর্শনের পর কমল বদনা মরুদেবী কমলিনীর মতই জাগ্রত হলেন। হৃদয়ে যেন আনন্দ ধারণ করতে পারছেন না এভাবে তিনি স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বিষয় কোমল অক্ষরে বিবৃত করে নাভিরাজকে শোনালেন। নাভিরাজ নিজের সরল স্বভাবের অনুযায়ী স্বপ্ন বিচার করে প্রত্যুত্তর দিলেন—তোমার উত্তম কুলকর পুত্র হবে।

[ক্রমশঃ

গ্রন্থ-সমালোচনা

বর্ধমান মহাবীর। শ্রীগণেশ লালওয়ানী। করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯। ভাদ্র, ১৩৮৭। পৃ. ২০২। পনর টাকা।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর যখন দূতিপলাশ চৈত্যে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি পার্শ্বাপত্য শ্রমণ গাঙ্গেয়র একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "গাঙ্গেয়, সকলেই সৎ উৎপন্ন হয়, অসৎ কেউ উৎপন্ন হয় না।" (আলোচ্য গ্রন্থ, উদ্ধৃতি) এমনিভাবে দেখা যাবে যুক্তি ও আদর্শের শ্রেষ্ঠতম পথে মহাবীরের সমগ্র জীবন ক্রমশঃ এক নিঃসীমতায় মিলিত হয়েছে যেখানে তাঁর উপলব্ধি ও ভাবনা শুভ্রতম তারকার মত সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই জীবনালেখ্য ভারতের প্রাচীন সভ্যতার এক মহত্তম যুগসন্ধিক্ষণকে প্রতি-ভাসিত করে এক অসাধারণ বৈচিত্র্যে ও এক সংকল্পসিদ্ধ সাধনার মহাকাব্যে। ক্লেশ ও সুখানুভূতির ওপারে তথা সকল নশ্বরতার ঊর্ধ্বে ব্যাপ্ত কেবলিত্বের গৌরব সভ্যতার এই লগ্নকে স্মরণীয় করে রেখেছে। শ্রীগণেশ লালওয়ানী লিখিত আলোচ্য গ্রন্থটিতে মহাবীরের জীবনগাথা পরিবেশিত হয়েছে ভাষার মাধুর্যে এবং বলতে দ্বিধা নেই, অনুভূতির দিব্য স্পর্শে ও হৃদয়লব্ধ প্রেরণায়। ইতিপূর্বে যখন 'শ্রমণ'-এ লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন যেন পুনর্বার প্রস্ফুটিত হয়েছিল স্বর্গ থেকে ঝরা ইতিহাসের এক পুষ্পমঞ্জরী। রত্নসদৃশ এই পুস্তকটি পাঠ করে বোঝা যায়, হৃদয়ের আন্তরিক উপলব্ধি সহজ বর্ণনাগুলিকেও কেমন এক অনাস্বাদিত সৌন্দর্য দিতে পারে, শোনাতে পারে, ইন্দ্রিয়াতীত লোকের বারতা। এখানে কেবলীর বাণী যেন দূর অতীতের আলো আর অন্ধকারের ওপারে এক আশ্চর্য প্রহরে গীত কোন স্বর্গবিহঙ্গের গান। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর জনপদের নরপাল জ্ঞাতক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ ও ক্ষত্রিয়ানী রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র বর্ধমান যাঁর আবির্ভাব, কেবল জ্ঞানলাভ ও নির্বাণ প্রাপ্তি নিগ্রন্থভাবনার এক অন্যতম বিষয়বস্তু। শ্রীলালওয়ানীর ভাষায়ঃ

''বর্ধমান তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, তিনি তীর্থঙ্কর।

যাঁরা কেবল-জ্ঞান লাভ করে নিজেরাই মুক্ত হন তাঁরা জিন, অর্হৎ, কেবলী, কিন্তু তীর্থঙ্কর নন্। যাঁরা নিজেরা মুক্ত হয়ে অন্যের মুক্তির পথ নিরূপণ করে দেন ও চতুর্বিধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা তীর্থঙ্কর।

জিন, অর্হৎ বা কেবলী অনেক হয়েছেন, কিন্তু তীর্থঙ্কর?

এই অবসর্পিণীতে মাত্র চাব্বিশটি। বর্ধমান সেই চাব্বিশ সংখ্যক তীর্থঙ্কর।"

এখানে অবসর্পিণীর অর্থ সময়চক্রের নিম্নগামিত্ব যা ক্রমে অনিবার্যরূপে উর্ধ্বমুখে (উৎসর্পিণী) ঘুরে আসবে।

তীর্থঙ্করদের আবির্ভাব সন্ধান দিয়েছে এক পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের। এখানে কর্মাণুর বিলুপ্তি শেষে সকল অনুভূতির সোপান পেরিয়ে, সকল জ্ঞানের আধার এক দেবায়তনের প্রাচীরগুলি উর্ধ্বমুখে একটি বিন্দুতে সম্মিলিত হয়েছে যেখানে প্রতিবোধ ও নির্বাণের সুবর্ণ কলস স্থাপিত। বর্ধমান প্রসঙ্গে অনেক কথাই আলোচিত হয়েছে বইটিতে। ত্রিশলার স্বপ্নদর্শন, চণ্ডকৌশিকের আচরণ, নৈমিত্তিক খেমিলের নৌকা পার করা, গোশালকের কাহিনী, ইন্দ্রভূতি গৌতমের তর্কযুদ্ধ ও আত্মনিবেদন, পথভ্রষ্ট নন্দীসেনের প্রত্যাবর্তন, রানী মৃগাবতীর উপাখ্যান, গুণশীল চৈত্যে পঞ্চাস্তিকায় রহস্যের অবতারণা ইত্যাদি গ্রন্থটিকে একাধারে তথ্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। বাংলায় রচিত বর্ধমান মহাবীরের এমন একটি বিস্তৃত জীবনকাহিনী বোধকরি এইটিই প্রথম। এ কাহিনীর অবসানে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে যেন এক দূর নক্ষত্রের না দেখা প্রভুর বেদনার অশ্রু।

—পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

নিগ্রর্ন্থ। কবিতার বই। শ্রীকন্হৈয়ালাল সেঠিয়া। অনুবাদ : শ্রীগণেশ লালওয়ানী। জৈন ভবন, কলিকাতা-৭। ভাদ্র ১৩৮৭। পৃ ৮৪। দশ টাকা।

নিগ্রর্ন্থ লোকভাবনার যে সব ঐশ্বর্য প্রাচীন সাহিত্যের গভীরে নিহিত আছে তাদের সৌন্দর্য ও গৌরব নিঃসংশয়ে অনন্য ও অপরিমেয়। সকল আস্রব ও পার্থিব বৃত্তের ওপারে যে সত্য শাশ্বত এবং একমাত্র নির্মোহ হৃদয়ে অনির্বাণ প্রদীপশিখার মত দীপ্যমান তারই স্থান হবে কেবলীর আরাধনায় মুক্তির অন্বেষণে যেখানে ভক্তজনের নির্মাল্য শোভিত। জৈনসাহিত্যের পুষ্পাঞ্জলির মধ্য দিয়ে এই সত্যের আংশিক উপলব্ধিও একটি জীবনের পরম প্রাপ্তিরূপে গণ্য হতে পারে। সুকবি শ্রীকন্হৈয়ালাল সেঠিয়া রচিত 'নিগ্রর্ন্থ' কাব্যগ্রন্থের যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে উপলব্ধিস্নাত এই সত্যেরই অনুরণন এবং অনেকান্ত দর্শনের মহত্ত্ব ও যুক্তিবাদ পাঠকমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে। এই বইটিতে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা মোট বিরাশী। হর্ষ ও বিমর্ষতাকে অতিক্রম করে গেছে কবিতাসমূহের অন্তর্লীন অনুভূতি। কবিতার এই কুসুমস্তবককে আজ বাংলার অনিলস্পর্শে ও মৌসুমীজাত বারিবিন্দুর রত্নশোভায় উপস্থিত করেছেন আরেক সাহিত্যিক ও কবি শ্রীগণেশ লালওয়ানী। অনূদিত কাব্যগ্রন্থে দূরত্ব ও অন্তরঙ্গতার যে অসাধারণ অভিব্যক্তি এবং ভাবনার যে বিস্তার লক্ষ্য করা যায় তার তুলনা নেই। এখানে মৌলিকতা প্রতিফলিত হয় ভাষার পটুত্বে, অন্তর্লীন ছন্দে এবং মহত্তম চিন্তাপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভায়।

শ্রীকনৃহেয়ালালের রচনায় এবং শ্রীলালওয়ানীর ভাবানুসরণে উন্মুক্ত হয়েছে পার্থিব বৃত্তে নিবদ্ধ জীবনের এক একটি বাতায়ন এবং নিবেদিত হয়েছে অনিবর্ট সত্যের প্রতি অপেক্ষমান হৃদয়ের অঞ্জলি।

"ভেঙে পুরানো অহংকার/গড়োনি/নূতন কোন আভরণ/
অস্বীকার করে/স্থাপিত মূল্য/
রচোনি/নূতন কোন মূল্যবোধ./
কেবল দিলে/রাগ-বিমুক্ত দৃষ্টি,/
হল/অনেকান্ত/সত্যের মুক্তি।"

অথবা

'প্রাণ নিজেই কেবল নিজের/তৃষাতৃপ্তির মাধ্যম,/
তত্ত্ব সকল নিরপেক্ষ,
অপেক্ষা/মনের মধুর বিভ্রম।"

সকল বেদনা ও বিশ্লেষণের মধ্যেও কবির মন যেন অবধি জ্ঞানেরও ওপারে কৈবলের যে সিন্ধুতীর আছে সেই চেতনায় বিশ্বাসী।

"ফোটে/রাতে বেলি,/ভোরে শতদল,/
নয়/অপেক্ষিত ফুটবার জন্য/আলো
আঁধার,/জাগে যেই ক্ষণে/চেতনা/
তাই সকাল।"

কবিতাগুলির নান্দনিক সৌন্দর্য এমন একটি উচ্চতা লাভ করেছে যা তুলনাহীন। এই গ্রন্থটির জন্য শ্রীকনৃহৈয়ালাল সেঠিয়া ও শ্রীগণেশ লালওয়ানী চিরকাল আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন পাবেন।

—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. VIII No. 10 Sraman February 1981
Registered with The Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮৭ ॥ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক

গণেশ লালওয়ানী

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি :

প্রকাশন স্থান		কলিকাতা
প্রকাশের কাল		মাসিক
মুদ্রকের নাম		গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা		পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
প্রকাশকের নাম	:	গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
সম্পাদকের নাম	:	গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
স্বত্বাধিকারীর নাম	:	জৈন ভবন
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

গণেশ লালওয়ানী
প্রকাশকের স্বাক্ষর

১৫. ৩. ৮১

সাহিত্য, কাহিনী-কিম্বদন্তী ও মেয়েলি ছড়াগানে সরাক সংস্কৃতি

শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী

মধ্যযুগে লেখা কিছু পাণ্ডুলিপিতে কয়েকজন সাহিত্য প্রেমিক সরাক সম্প্রদায়ের মানুষের নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধু নামে একটী গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটীর রচয়িতা শ্রীজগৎরাম রায়ের পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ রায়। এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে রাণীগঞ্জ, টি, ডি, বি, কলেজের অধ্যাপক ডা, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রয়েছে। তিনি এই গ্রন্থ নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন। এই গ্রন্থে রামদুলাল সরাকের নাম পাওয়া যায়। রামদুলাল সম্ভবতঃ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই শ্রীরাধাচরণ তন্তুবায় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন।

এই অঞ্চলের সরাকেরা সাহিত্য সংস্কৃতিতে যে বেশ কিছুটা উন্নত ছিল কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধুই তার প্রমাণ। এ ছাড়া শ্রীধরম সিং (সরাক) এর হস্তাক্ষরে শ্রীরূপ সনাতন সংবাদ ও উপাসনা নামক একটি ছোট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। পাণ্ডুলিপিটি সন ১১৯১ সালের ১৫ই ফাল্গুন শেষ হয়েছিল। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ শ্রীতত্বসার নিরূপণ নামক গ্রন্থের অংশ বিশেষও হতে পারে। গ্রন্থটির লেখক অকিঞ্চন দাস। ভনিতাংশে রয়েছে—

গোপিগণ জাগিঞা চাইল গুণরাসি।
অকিঞ্চণ দাস বলে হব গোপির দাসি।।

এই দুটি গ্রন্থ থেকে একটা মূল্যবান তথ্য আমরা পেতে পারি। সেটা হল মধ্যযুগে অর্থাৎ কৃষ্ণ লীলামৃত সিন্ধু রচনাব যুগে সরাকদের কোন পদবী ছিল না। তারা নিজেদের সরাক বলেই পরিচয় দিত বা নামের শেষে সরাক শব্দটাই লিখত। সম্ভবতঃ এই কারণেই রামদুলালের নাম রামদুলাল সরাক পাওয়া গিয়েছে। অপর দিকে ১১৯১ সালের পরবর্তী সময়ে সরাকদের সিং পদবী দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সরাকদের পদবীলাভের ঘটনা সম্ভবতঃ ১১৯১ বাংলা সালের আগেই ঘটেছিল। বলা বাহুল্য এই সময়টাই হল বাংলায় বর্গী আগমনের কাল।

সরাক সংস্কৃতিকে নিয়ে এই অঞ্চলে বেশ কিছু কাহিনী-কিম্বদন্তী ও মেয়েলি ছড়াগান শোনা যায়। সরাক প্রভাবিত অঞ্চল পাড়া থানার পাড়া নামক গ্রামটি অতীতের সরাক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এই গ্রামেরই পুকুরপাড়ে আছে প্রাচীন কালের

বিখ্যাত সরাকদের মন্দির। সম্ভবতঃ পুরুলিয়া জেলার সব চাইতে প্রাচীন মন্দির হল সরাক জৈনদের তৈরী এই কালো পাথরের মন্দিরটি। আগে মন্দির গায়ে মূল্যবান অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। কিম্বদন্তী আছে যে পাড়ার এই মন্দিরে নাকি রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনী নামে দুই রাক্ষসী বাস করত। সম্ভবতঃ এই রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনী যক্ষিনী ছিল। এই যক্ষিনীরা আবার প্রাচীন জৈন ধর্ম সাহিত্যের সঙ্গেও জড়িত। পশ্চিম বাংলার অন্যান্য স্থানেও রঙ্কিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়।

পাড়ার মন্দিরের এই রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনী প্রসঙ্গে বহু অপপ্রচার আছে। কথিত আছে যে এই দুই রাক্ষসীকে নাকি নর মাংস খেতে দেওয়া হত। এখানে নাকি একটি পাথরের তৈরী ঢেঁকি ছিল। এই ঢেঁকি দিয়ে নরমাংস কুটা হত। গ্রামের লোকেরা পালা করে রঙ্কিনীর মন্দিরে নরমাংস সরবরাহ করত। আর সেই কারণে এখানের মন্দিরে নরবলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।

এই কাহিনী নিশ্চয়ই আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষেরা যাতে জৈন মন্দিরে না যায় বা মন্দিরটি অবহেলায় অনাদরে ক্ষয় হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই হিন্দু সমাজ-পতিরা এই সব অপপ্রচার চালিয়েছিলন।

এই অঞ্চলের এক সরাক বালিকা বধূকে নিয়ে আর এক কাহিনী এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই বালিকা বধূর নাম ঝিঙ্গা বৌ।[১] অল্প বয়েস। ভাব হয়েছে এক বাগাল অর্থাৎ এক রাখাল বালকের সঙ্গে। বালিকা বধূ সময় সময় বাগাল বন্ধুর কাছে ছড়া কাটে আর হেঁয়ালিতে কথা বলে। তার ছড়ার ভাষায় থাকে বালিকা হৃদয়ের রহস্যময় ভালবাসা—

বাগাল বন্ধু, বাগাল বন্ধু,
ঘুরছ বনে বনে।
একটি গাছে একটি পাতা,
দেখেছ কোন খানে ?

একটি গাছে একটি পাতা অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা। তাই অবাক হয়ে বাগাল বন্ধু জবাব দিয়েছে—

ঝিঙ্গা বৌ, ও ঝিঙ্গাবৌ,
কেমন তোমার মতি।
সরাক জাতি কোন কালে,
খায়না ব্যাঙের ছাতি ॥

১ বিভিন্ন স্থানে এই লোক কাহিনীটির কিছু রূপান্তর দেখা যায়।

সুতরাং বাগাল বন্ধু কেন ব্যাঙের ছাতা আনতে যাবে ? ঝিঙ্গা বৌয়ের মনের কথা বুঝতে পারে বাগাল বন্ধু। সে তাই জানতে চায় ঝিঙ্গা বৌ আরও কিছু চায় কিনা। এবার ঝিঙ্গা বৌ বলেছে—

বাগাল বন্ধু বাগাল বন্ধু
যাবেরে অনেক দূর।
মনে করে আনবে বাগাল,
শতদল কমলের ফুল ॥

এই প্রেমিক বাগাল বন্ধুকে কৌশলে পাড়ার মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ঝিঙ্গা বৌ নিজের জীবনের বিনিময়ে বাগাল বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছিল। আর বাগাল বন্ধু সে দৃশ্য দেখে পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। যে স্থানে বাগাল বন্ধু পাষাণ হয়েছিল সেই স্থানটার নাম বাগালিয়া। বর্তমানে এই বাগালিয়া দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদরা ও পুরুলিয়ার মধ্যবর্তী একটি রেল ষ্টেশন।[২]

এ সব কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা আছে কিনা তা আমার জানা নেই। পাড়ার মন্দিরে কোন রাক্ষসী বাস করত এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। তবু বাগাল বন্ধুর কথা অনেকেই সত্য বলে স্বীকার করেন। অনেকের মতে বাগাল বন্ধু রাখাল বালক ছিল না সে ছিল বাগাল সাধু। যাই হোক, মেয়েলি ছড়া গানে সরাক মেয়েদের কথা আছে। সরাকেরা যে ব্যাঙের ছাতি খায়না সে কথা আরও একটি ছড়াতে বলা হয়েছে। এই অতি পরিচিত ছড়াটি হল—

উমুর ডুমুর পুড়ুং ছাতি।
তিন খায়না সরাক জাতি ॥

এই অঞ্চলের বেশ কিছু মেয়েলি ছড়া জাতীয় টুসু ও ভাদু গানেও সরাকদের কথা আছে। মধ্যযুগে কালুবীর নামে কোন এক দুর্দ্ধর্ষ হানাদার এই অঞ্চলের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে সরাকদেরও আক্রমণ করেছিল। ছড়াটাতে বলা হয়েছে,—

কালুবীর কালুবীর বিজয় আগমন,
সরাক পাড়াতেরে দিলেক দরশন।
সরাকদের একে একে মাথল ধরিয়া,
সরাকদের হাল জোয়ালটা রইল পড়িয়া ॥

২ এই প্রসঙ্গে আমার একটি লোক কাহিনী "বাগাল বন্ধু" নবান্ন ভারতী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৮১) প্রকাশিত হয়েছে।

চাষীদের হাল জোয়ালকে হরণ করার ক্ষমতা কারুর নেই কারণ—

ঈশ্বরে শিরিজিল
হাল জোয়াল গো
মহাদেব শিরিজিল গাই।

যাই হোক, এই কালুবীরকে অনেকে কালা পাহাড় বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালুবীরের নামের আড়ালে কোন অত্যাচারী পুরুষটি লুকিয়ে আছে তার সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ছড়াটিতে অত্যাচারের যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সরাকদের অতীত জীবনের সঙ্গে যেমন মিলে যায় তেমন অন্য সম্প্রদায়ের অতীত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না।

আর একটি ছড়াতে সরাকদের সুন্দরী বৌয়ের প্রসঙ্গে হিংসা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

সরাকদের চালে হেরে পাকা কুন্দুরী।
সরাকদের বৌ আসছে অতি সুন্দরী ॥
অতি হোক পাত হোক সব সইতে পারি।
নাক তুলে নাক তুলে কথা বলে সেই জ্বলনে মরি ॥

আগের ছড়াটির মত এই ছড়াটিতেও বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রসঙ্গে একই কথা বলা হয়। যাই হোক; সুন্দরী সরাক বৌদের সব সহ্য হয় কিন্তু তাদের নাক তুলে কথা বলাটা যেন অনেকের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

সরাকেরা প্রগতিশীল চাষী। চাষবাসে তারা দক্ষ। এ প্রসঙ্গে তাদের বেশ নাম ডাক আছে। চাষবাসের কথা উঠলেই তাই জেলার মানুষেরা সরাকদের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আজকাল যখন মানুষ দালানের ছাদের উপর ধান চাষ করছে তখন সরাকেরা নিজের ভাল জমিতেই হাল বাইতে অর্থাৎ লাঙল দিতে ভুল করছে।

এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ছড়ায় বলা হয়েছে—

কাশীপুরে দেখে আইলাম,
দালানে ধান রুয়েছে।
কোন সরাকে চাষ করেছে,
হাল বাইতে ভুলেছে ॥

সরাকেরা পাকা কৃষিজীবী বলে আগে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হত না। আগে সরাকবাড়িতে কেউ এলে সে না খেয়ে ফিরত না। অতিথি এলেই সরাক বৌয়েরা কল্যাণী মূর্তিতে খাবারের থালা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াত। খাওয়াবার সময় তারা জাতের বিচার করত না। এই কারণে অনেকেই বলে থাকেন,

সরাক পাড়া যাবি।
পেট পুরে ভাত খাবি ॥

সরাকদের বাড়িতে 'কাদালই' চালের ভাত যে একবার খেয়েছে সে তা কোনদিন ভুলতে পারবে না। সরাক বৌদের অন্নপূর্ণারূপা কল্যাণী মূর্তি এই অঞ্চলের গরীব দুঃখী মানুষেরা চিরদিন মনে রাখবে।

অপরদিকে যারা অপরকে খাইয়ে এত আনন্দ পায় তারা নিজেরা কিন্তু ভাল খায়না। সরাক মেয়েরা অতি সাধারণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করে। সময় সময় মেয়েদের গায়ে জামা পর্যন্ত থাকে না। তারা সকাল বেলায় পান্তা ভাত মেশান মুড়ি আর দুপুর বেলায় মোটা ভাত ছাড়া আর কিছুই খেতে পায় না। আগে রাতের বেলার খাবার বিকেল বেলাতেই খেয়ে নেবার রীতি ছিল। বর্তমানে অবশ্য এই রীতি আর নেই। রাতের বেলাতেও তারা এখন পেট পুরে ভাত খায়। ভাতের সঙ্গে থাকে পুঁই খাড়ির ঝোল। এই কথা মনে রেখেই অনেকে বলে থাকেন—

সরাকেরা খায় মুড়ি।
ভাতের উপর বিরির ডাল,
সঙ্গেতে পুই খাড়ি ॥

কথাটা একেবারে হাড়ে হাড়ে সত্য। এদের মেয়েরা খালি পুঁই খাড়ি চোষে। তাই সকলে একটা সন্তান প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ভোগে। ভাল খাবারের অভাবে মুখে ঘা হয়। চোখে কম দেখে। পুষ্টিকর খাবার না খাওয়াটাই যেন তাদের একটা স্বভাব। আগে ঘরে গাই গরু থাকত। দুধ-ঘি হত। ঘরে তরিতরকারির অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এসবের অভাব হয়েছে। অথচ পয়সা দিয়ে ভাল খাবার কিনে খাবার অভ্যাস এদের গড়ে উঠেনি। ফলে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। অথচ আর্থিক অবস্থা এদের গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য জাতের মেয়েদের চাইতে ভাল।

সরাক মেয়েদের লোক উৎসব গুলোর মধ্যে ভাদু উৎসব সব চাইতে বড়। তাদের কাছে যে সব প্রাচীন ভাদু গান পাওয়া গিয়েছে তাতে আছে প্রাচীন কালের মেয়েলি রীতি নীতি ও বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা। ভাদু গান যেহেতু সাময়িক প্রসঙ্গ ধরে রাখে তাই তাদের গানেও তাদের অতীত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। আগেকার দিনের সরাক মেয়েরা যে সব গয়না পরত তার মধ্যে ছিল হার, ঝুমকা, নথ, নথটানা, মল, বাজু প্রভৃতি। এই সব গয়নাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ছিল রূপোর গয়না। বিয়ের সময় কণেকে এই সব গয়না দেওয়া হত। তাদের কাছে পাওয়া একটি পুরানো দিনের ভাদু গানে বলা হয়েছে—

কি কি গহনা লিবে তোমরা,
বল এই ছাম্‌ড়া[৩] তলে।
হার লিব কান ঝুমকা লিব,
পা সাজাব মলে ॥
লত্‌ লিব লক্‌টানা লিব,
তায় লিব পত্‌না[৪] বসা,
হাতের বাজু বাজাই লিব,
মিটাব মনের আশা ॥

সরাকদের বিবাহের ছাঁদনা তলার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের কণ্ঠ থেকে পাওয়া একটি প্রাচীন ভাদু গানের অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি—

চার ধারে চার ঘিয়ের পাদ্দিম,[৫]
মাঝে লিখা আলপনা।
সাতটি ভাঁড়ে ধান দুর্বা গো,
লোক করে আনা গোনা ॥
কাঁঠাল পাতার দনা টিপে,
সাজাও মা গন্ধের থাল।
সব সাজালি থালে থালে,
কই সাজালি কলা ডাল ॥
আকন্দ ফুলের মালা গেঁথে,
দাও গো বরের গলাতে।
পরমা শাড়ি পরমা গহনা,
চল মা ছামড়া তলাতে ॥

অবশ্য এই সব বিবাহের বর্ণনা যে সরাক সমাজের একলার সে কথা বলা যায় না। গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথার সঙ্গে সরাকদের বিবাহ প্রথায় খুব বেশি অমিল নেই। তবে এই সব বিবাহের বর্ণনা গুলোতে এমন কিছু বিষয় নেই যা সরাকদের বাড়িতে দেখা যায় না। যেমন সরাকেরা মাছ মাংস খায় না। তাদের ভাদু গানের কোন অংশেই কোনরূপ মাছ মাংসের গন্ধ নেই।

৩ ছামড়া—ছাঁদনা।
৪ পত্‌না—প্রজাপতি।
৫ পদ্দিম—প্রদীপ।

সরাক মেয়েদের গানের দেবী ভাদু

আগে সরাকদের বিবাহের সময় কণের হাতে মেহেদি পাতা দিয়ে আল্পনা আঁকা হত। বর্তমানে এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আগে যে সরাকদের মধ্যে এই রীতিটা খুব প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের মুখ থেকে সংগ্রহ করা ভাদু গানে—

শিশুরও* হাতের আল্পনাটি,
দেখলে ছাতি যায় ফাইটে।

* শিশু—ছোট মেয়ে।

শিশু আমার কোলের ছিলা[৭] গো,
আজ কি শিশু পর হচ্ছে ॥

মেয়ের হাতের আল্পনাটি যেন বিবাহের একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ছাপ রূপে ধরা পড়ে। হাতের আল্পনা দেখেই সরাক মায়েরা মেয়ের বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। তাই আর ত মেয়েকে কাছে রাখা যাবে না। এবার মেয়ে পর হয়ে পরের ঘরে চলে যাবে।

পৌষ সংক্রান্তির পিঠে পরব পুরুলিয়ার সরাক বাড়িতে জমে ভাল। এদের পৌষ সংক্রান্তির গড় গড়ে পিঠেতেও রয়েছে লোক শিল্প কলার ছাপ। সরাক মেয়েরা পিঠে তৈরীতেও শিল্পী মনের পরিচয় দেয়। নানা ধরণের জ্যামিতিক আকারে পিঠে বানিয়ে এই পিঠে শিল্পকে তারা লোক সংস্কৃতির একটা অঙ্গ করে তুলেছে।
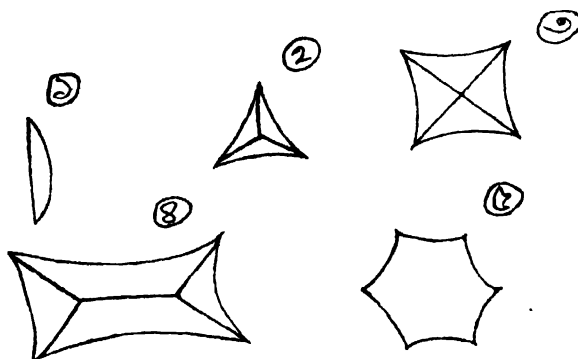
জ্যামিতিক আকারের গড়গড়ে পিঠে

(১) কোন পিঠেতে দুটো শৃঙ্গ থাকে। এগুলো হয় ঝিনুকের মত লম্বা। (২) কোন পিঠেতে তিনটে শৃঙ্গ থাকে। এ গুলো হয় সিঙ্গাড়ার মত ত্রিভুজাকার। (৩) আবার কোন পিঠেতে চারটা শৃঙ্গ থাকে। এ গুলো যেন এক একটি বর্গক্ষেত্র। (৪) চার শৃঙ্গ বিশিষ্ট আয়তাকার পিঠে গুলো একটু লম্বা হয়। (৫) যে সব পিঠেতে চার শৃঙ্গের বেশি থাকে সেগুলো প্রায় গোলাকার চক্রের মত দেখায়। কি জানি এই গোলাকার পিঠে গুলোর সঙ্গে ধর্মচক্রের কোন যোগ আছে কিনা। পৌষ সংক্রান্তিতে সারা বাংলাতেই পিঠে পরব হয়। কিন্তু এই পুলি পিঠের সঙ্গে সরাকদের গড়গড়ে পিঠের বেশি মিল নেই, যদিও এগুলোও এক জাতের পুলি পিঠে ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

৭ ছিলা—পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে ছিলা অর্থে মেয়ে ও ছেলে উভয়েই, এখানে মেয়ে।

বিভিন্ন আকারের গড়গড়ে পিঠে বানাচ্ছে
সরাক মেয়ে কবিতা

সরাকেরা পুর হিসেবে যে সব খাদ্য দ্রব্য পিঠেতে ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) দুধের চাঁছি,

(২) ফুল কপি, বাঁধা কপি ও আলুর তরকারি,

(৩) মুগ মটর ও অড়হরের ডাল,

(৪) পোস্ত বাঁটা,

(৫) তিল,
(৬) বেগুন পোড়া,
(৭) টোমাটোর চাটনি,
(৮) সেদ্ধ করা মিষ্টি আলু প্রভৃতি।

কোন পিঠেতে কি আছে তা বোঝাতে বিশেষ বিশেষ আকারের পিঠে বিশেষ বিশেষ পুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। চালের তৈরী গরু বা চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো ষাঁড় সরাকেরা সেদ্ধ করে খায় এমন কোন জনশ্রুতি এই অঞ্চলে কোথাও নেই। তবু কিছু কল্পনা প্রবণ পণ্ডিতদের কলমে এই উদ্ভট তথ্যটি স্থান লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামীর 'সমাজ চিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' নামক গ্রন্থে একটি উদ্ভট উদ্ধৃতি দেখা যায়। *Census of India*, **Part I** থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে "That they (Saraks) used a cow made of rice paste (which they afterwards boiled) during some ceremonial observance." (পৃঃ ৭৩৮) বলা বাহুল্য তথ্যটি এত বিভ্রান্তিকর যে সরাকেরা শুনেই চমকে উঠে। একটা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী জাতের উপর এই কলঙ্ক লেপন শুধু মাত্র অন্যায় নয়; এটা চরম গর্হিত কর্ম। যে সব গড় গড়ে পিঠেতে চারটা শৃঙ্গ থাকে সেগুলো দেখতে কতকটা লেজ মুণ্ডহীন গরুর মত। কিন্তু একে গরু বলা আর সারকদের পিঠে তৈরীর লোক শিল্পকে বুঝতে না পেরে ভুল ব্যাখ্যা করা একই কথা। এরূপ মন্তব্য সরাক জীবন সম্পর্কে আরো তাঁর অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়।

সরাকদের মধ্যে এমন কিছু প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যা অন্য সমাজে খুব একটা প্রচলিত নয়। সম্ভবতঃ সরাক পরিবারেই এই সব প্রবাদের জন্ম হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করার পর থেকেই সরাক সমাজে গোঁসাই প্রথা প্রচলিত হয়। গোঁসাই ঠাকুর হলেন পরিবারের গুরুদেব স্থানীয় ব্যক্তি। বছরে অন্ততঃ কয়েকটা দিন এই গুরুদেবেরা সরাক বাড়িতে এসে কাটিয়ে যান। এ ছাড়া বিবাহ ও শ্রাদ্ধ বাড়িতে এঁরা গাইবাছুর ধুতিচাদর প্রভৃতি দান হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। আবার অভাব পড়লেই এই গোঁসাই ঠাকুরেরা শিষ্য বাড়িতে এসে হানা দিয়ে থাকেন। কোন কাজ কর্ম ছাড়াই সময় সময় এই গুরুদেব স্থানীয় মানুষদের জন্য সরাকদের বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হয়। তাই অকারণে কিছু খরচ হলেই সরাকেরা বলে থাকেন—কোথাও কিছু নেই গোঁসাই এসেছেন। বাড়ি থেকে গোঁসাই তাড়ানোর একটি মজার ঘটনার কথা সরাক মেয়েদের কাছে শোনা যায়। বিষয়টা এখন লোক কথার পর্যায়ে উঠেছে।

কোন এক সরাক পরিবারে স্বামী স্ত্রী তাদের দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে বাস করত।

চাষী পরিবার। অভাবের সংসার। দিন আনে দিন ফুরোয়। সংসার চলে অতি কষ্টে। এর উপর আবার সময় সময় গোঁসাই ঠাকুর এসে সংসারের ভার বাড়ান। একবার এলে তিনি যেন আর নড়তে চান না।

সরাক বৌটি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে গোঁসাইকে তাড়াবার একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। স্বামীকে এ প্রসঙ্গে কিছুই সে বলল না। স্বামী তার পরম গোঁসাই ভক্ত। তাই গোঁসাইকে সোজা পথে তাড়ানো যাবে না। বাঁকা পথ ধরল গৃহ বধূটি। একদিন সে গোঁসাইয়ের চোখের সামনে তাদের বড় আকারের নোড়াটিতে তেল আর হলুদ মাখাতে লাগল। নোড়াতে কেউ তেল মাখায় না। ওটা দিয়ে বাটনা বাটা হয়। তাই গোঁসাই ঠাকুর জানতে চাইলেন,—ওটাতে তেল মাখাচ্ছ কেন? বৌটি চোখ মুছে বলল, আর বলবেন না ঠাকুর ও নাকি আজ রাতে এই নোড়া দিয়ে আপনাকে মেরে ফেলবে। রক্তের দাগ যাতে নোড়াতে না বসে তাই আমি নোড়াটাতে তেল আর হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি। আপনি যেন এ কথা কাউকে বলবেন না ঠাকুর। কথাটা শুনেই গোঁসাই ঠাকুর চমকে উঠলেন। ভাবলেন,—আর নয় বাবা, রাত হবার আগেই তা হলে পালিয়ে যাই। তাই কর্তাকে কিছু না বলে গোঁসাই ঠাকুর বাড়ি থেকে পালালেন।

এদিকে বৌটির স্বামী ঘরে এসে গোঁসাই ঠাকুরকে না দেখে তাঁর কথা জানতে চাইল। বৌটি বলল,—আর বল কেন, গোঁসাই ঠাকুর আমাদের নোড়াটা চেয়েছিলেন। উনি নাকি ওটাকে শিব বনাবেন। এই দেখ তেল হলুদ মাখিয়ে তিনি ঠাকুর বানিয়ে রেখেছেন।

—তুমি বুঝি নোড়াটা তাঁকে দিলে না? তাই বুঝি রাগ করে চলে গেলেন?

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বৌটি চুপ করে রইল।

বৌটির স্বামী তখন জানতে চাইল—গোঁসাই ঠাকুর কতক্ষণ গেলেন?

—এই মাত্র। জবাব দিল বৌটি।

সঙ্গে সঙ্গে বৌটির স্বামী নোড়াটি হাতে নিয়ে দৌড়ল। কিছু দূরে যেতে না যেতে গোঁসাই ঠাকুরকে দেখা গেল। সে তখন চীৎকার করে বলতে লাগল, দাঁড়ান গোঁসাই দাঁড়ান।

ওদিকে গোঁসাই ঠাকুর তাঁর শিষ্যকে নোড়া হাতে আসতে দেখে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন যে শিষ্য বুঝি নোড়া নিয়ে তাঁকে মারতেই ছুটে আসছে। তাই তিনি প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুট দিলেন। তাঁকে আর ধরা গেল না। বলা বাহুল্য গোঁসাই ঠাকুরের পাপদৃষ্টি বৌটির উপর পড়েছিল। তাই তাঁর অপরাধী মন এতটা ভয় পেয়েছিল। কিছু কিছু সরাক মেয়েদের কাছে "নোড়া নেন গোঁসাই" এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

আরও অনেক প্রবাদ, কথা ও কাহিনী সরাকদের প্রসঙ্গে এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তবে এইসব প্রবাদ অল্প বিস্তর অন্যান্য সমাজের মানুষের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। তবে এইটুকু বলা যায়—যে তাদের মধ্যে এমন অনেক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আছে যা সেখানকার অন্য সমাজে দেখা যায় না।

বিঃ দ্রঃ—সরাক মেয়েদের কণ্ঠ থেকে প্রচুর ভাদু গান সংগ্রহ করা হয়েছে। এইসব ভাদু গানের আলোচনা ভাদু গীতির ইতিকথা নাম দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে আকাশবাণীর মজদুর মণ্ডলীর প্রাক্তন পরিচালক শ্রীসত্যচরণ ঘোষের আসর পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৮৪, চৈত্র ১৩৮৪, পৌষ ১৩৮৫, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৬, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮৬, পৌষ ১৩৮৬ এবং অগ্রহায়ণ ১৩৮৭তে। আকাশবাণী কলকাতা থেকে ভাদু গানের একটি গীতি আলেখ্যও প্রচারিত হয়েছিল ১২-৯-৭৭ তারিখে রাত সাড়ে আটটায়। এতে সরাক মেয়েদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেছিল কবিতা মাজী।

মহাবীর বাণী

শ্রীবিজয়সিংহ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ১৫ ॥

অশরণ সূত্র

১৮৫। মূর্খ মনুষ্য ধন, পশু ও আত্মীয় স্বজনকে নিজের আশ্রয় স্থল বলিয়া মনে করে এবং ভাবে ইহারা আমার এবং আমি ইহাদের। কোনটিই আপত্তি কালে ত্রাণ করিতে বা আশ্রয় দিতে সমর্থ নয়।

১৮৬। জন্ম দুঃখ, জরা (বার্দ্ধক্য) দুঃখ, রোগ ও মৃত্যুও দুঃখ। হায়! এই সংসারই দুঃখরূপ। এই-ই কারণ কি এখানে যখনি দেখা যায় প্রত্যেক প্রাণী কষ্ট পাইতেছে।

১৮৭। এই শরীর অনিত্য, অশুচি হইতে উৎপন্ন, দুঃখ ও ক্লেশের আকর। জীবাত্মা ইহাতে কিছুকালের জন্য বাস করে, শেষে ত একদিন ইহাকে সহসা পরিত্যাগ করিয়াই যাইতে হয়।

১৮৮। স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই জীবিত কালের সঙ্গী। মৃত্যুর পর কেহই সঙ্গে যায় না।

১৮৯। অধীত বেদ রক্ষা করিতে পারে না, যে ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো হইয়াছে তাহারা অন্ধকার হইতে আরো অন্ধকারে লইয়া যায়। স্ত্রী পুত্রও রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। এই অবস্থায় কোন বিবেকী পুরুষ ইহাদের স্বীকার করিবে ?

১৯০। দ্বিপদ (দাসদাসী আদি), চতুষ্পদ (গৃহপালিত পশু), ক্ষেত্র, গৃহ, ধনধান্য, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া বিবশ প্রাণী নিজ কৃতকর্মের ফলে ভালো বা মন্দ গতি প্রাপ্ত হয়।

১৯১। সিংহ যেরূপ হরিণকে তুলিয়া লইয়া যায়, অন্তঃসময়ে মৃত্যুও সেরূপ মনুষ্যকে তুলিয়া লইয়া যায়। সেই সময় মাতা, পিতা, ভাই আদি কেহই তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করে না, পরলোকেও তাহার সঙ্গে যায় না।

১৯২। সংসারে যত প্রাণী আছে তাহারা সবাই নিজ কৃত কর্মের জন্যই দুঃখী হয়। ভাল বা মন্দ যেরূপ কর্মই হউক না কেন তাহার ফলভোগ ভিন্ন কখনো মুক্তি সম্ভব নয়।

১৯৩। এই শরীর জল বুদ্‌বুদের মত ক্ষণভঙ্গুর। আগে বা পরে একদিন ইহাকে

পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অতএব ইহার প্রতি আমার একটুও আসক্তি নাই।

১১৪। মানব শরীর অসার, আধি ব্যাধির আবাস ও জরা মরণ পীড়িত। অতএব আমি ইহার প্রতি ক্ষণমাত্রও প্রসন্ন নহি।

১১৫। মনুষ্যের জীবন, রূপ ও সৌন্দর্য বিদ্যুৎপ্রভার মত চঞ্চল। হে রাজন্, আশ্চর্য! তুমি ইহাতে মুগ্ধ। পরলোকের কথা কেন চিন্তা করিতেছ না?

১১৬। পাপী জীবের দুঃখ না আত্মীয় স্বজন, না বন্ধুবান্ধব, না পুত্র, না ভাই, কেহই ভাগ করিয়া লইতে পারে না। যখন দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে একেলাই তাহা ভোগ করিতে হয়। কারণ কর্ম নিজ কর্তার অনুসরণ করে, অন্য কাহারো নয়।

॥ ১৬ ॥

বাল সূত্র

১১৭। যে মূর্খ কামভোগের মোহ উৎপন্নকারী দোষে আসক্ত, হিত ও নিঃশ্রেয়সের বিচার শূন্য, সেই মন্দবুদ্ধি মূঢ়, মাছি যেরূপ শ্লেষ্মায় আবদ্ধ হয় সেরূপ সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে।

১১৮। যে কামভোগে আসক্ত সে গর্হিত হইতে গর্হিত পাপ কর্ম করিয়া ফেলে। সে মনে করে পরলোকত আমি দেখি নাই আর উপস্থিত কাম ভোগের আনন্দ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

১১৯। 'উপস্থিত কামভোগ আমার করায়ত্ত—পূর্ণতঃ স্বাধীন। ভবিষ্যতে পরলোকের সুখের নিশ্চয়তা কি?—পাই বা না পাই? আর ইহাও কে জানে পরলোক আছে বা নাই?

২০০। আমি ত সামান্য লোকের সঙ্গে থাকিব—অর্থাৎ তাহাদের যে দশা হইবে আমারো তাহাই হইবে—মূর্খরাই এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য বলিয়া থাকে এবং কামভোগে আসক্তির কারণ শেষে মহাকষ্ট পাইয়া থাকে।

২০১। বিষয়াসক্ত হওয়া মাত্র মূর্খ মনুষ্য ত্রস ও স্থাবর প্রাণীকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করে ও শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রাণীদের হিংসা করিতে থাকে।

২০২। মূর্খ মনুষ্য হিংসুক, মিথ্যাভাষী, কপট, পরনিন্দুক ও ধূর্ত হয়। সে মদ্য ও মাংসাহারেই নিজের শ্রেয় মনে করে।

২০৩। যে মনুষ্য নিজের বাক্য ও শরীরের মদে মদান্ধ, কাঞ্চন ও কামিনীতে আসক্ত, সে রাগ ও দ্বেষ উভয়ের দ্বারা উঁই পোকা যেমন মৃত্তিকা সঞ্চয় করে সেইরূপ কর্মমল সঞ্চয় করে।

২০৪। পাপ কর্মের ফল স্বরূপ মনুষ্য যখন অন্তিম সময়ে অসাধ্য রোগে পীড়িত হয় তখন সে খিন্নচিত্ত হইয়া মনে মনে পশ্চাত্তাপ করে ও পূর্ব কৃত নিজ পাপ-কর্ম স্মরণ করিতে করিতে পরলোকের বিভীষিকায় কাঁপিতে থাকে।

২০৫। যে মনুষ্য নিজ তুচ্ছ জীবনের জন্য নির্দয় হইয়া পাপ কর্ম করে সে মহা-ভয়ঙ্কর প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন তীব্র উত্তাপ যুক্ত তমিস্র নামক নরকে পতিত হয়।

২০৬। অনার্য মনুষ্য যখন কামভোগের জন্য ধর্ম পরিত্যাগ করে তখন সেই ভোগ-বিলাসে অসক্ত মূর্খ নিজের ভয়ংকর ভবিষ্যতের বিষয়ে জানে না।

২০৭। সর্বদা ভয়প্রাপ্ত তস্কর যেরূপ নিজ দুষ্কর্মের জন্য দুঃখ পায় সেইরূপ মূর্খ মনুষ্য নিজ দুরাচরণের জন্য দুঃখ পায় এবং সে অন্তকালেও সংবর ধর্মের আরাধনা করিতে সমর্থ হয় না।

২০৮। যে ভিক্ষু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও অত্যন্ত নিদ্রাশীল হয়, ভোজন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাকে 'পাপ শ্রমণ' বলা হয়।

২০৯। বৈরভাবাপন্ন মনুষ্য সর্বদা বৈরই করে সে বৈর করাতেই আনন্দ পায়। হিংসা কর্ম পাপ উৎপন্নকারী ও অন্তঃসময়ে দুঃখদায়ী।

২১০। যদি অজ্ঞানী মনুষ্য মাসাবধি ঘোর তপস্যাও করে ও পারণের দিন কেবল মাত্র কুশাগ্র গ্রহণ করে তবুও সে সৎপুরুষ উক্ত ধর্মাচরণকারী মনুষ্যের ষোল ভাগের এক ভাগ (পুণ্যও) প্রাপ্ত হয় না।

২১১। যে মনুষ্য নিজের জীবন অনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য এখানে সম্যগ্‌যোগ হইতে ভ্রষ্ট হয় সে কামভোগে আসক্ত হইয়া শেষে অসুর যোনিতে উৎপন্ন হয়।

২১২। সংসারে যত অবিদ্বান (মূর্খ) মনুষ্য আছে তাহারা সকলেই দুঃখভোগকারী। মূঢ় জীব সংসারে বারবার লুপ্ত হয় অর্থাৎ জন্মাইতে ও মরিতে থাকে।

২১৩। মূর্খ জীবের অকাম মৃত্যু সংসারে বার বার হইতে থাকে কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির সকাম মৃত্যু কেবল একবারই হয় অর্থাৎ সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না।

২১৪। মূর্খ মনুষ্যের মূর্খতা ত দেখো—সে ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম স্বীকার করে ও অধার্মিক হইয়া যায়। শেষে নরকগতি প্রাপ্ত হয়।

২১৫। সত্য ধর্ম অনুগামী ধীর পুরুষের ধৈর্য দেখো—সে অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মনিষ্ঠ হয় ও শেষে দেবলোকে উৎপন্ন হয়।

২১৬। বিদ্বান মুনি এভাবে বাল ও অবাল ভাবের তুলনাত্মক বিচার করিয়া বালভাব ত্যাগ করেন ও অবাল ভাবকেই স্বীকার করেন।

[ক্রমশঃ

জৈন জ্যোতিষ সাহিত্য

শ্রীনেমীচন্দ্র জৈন

[পূর্বানুবৃত্তি]

মহাবীরাচার্য—ইনি একজন ধুরন্ধর গণিতজ্ঞ। রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষের সময়ই এঁর সময়। তাই এঁর সময় ৮৫০ খৃষ্টাব্দ বলা হয়। ইনি জ্যোতিষ পটল ও গণিত সার সংগ্রহ নামক দু'খানি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। এ দুটী গণিত জ্যোতিষ বিষয়ক। এই গ্রন্থ দুটি হতে এঁর জ্ঞানের সহজেই পরিচয় পাওয়া যায়। গণিত সারের প্রারম্ভে গণিতের প্রশংসা করতে গিয়ে ইনি বলছেন যে গণিত ছাড়া সংসারের কোন শাস্ত্রের জ্ঞান সম্ভব নয়। কামশাস্ত্র, গন্ধর্ব শাস্ত্র, নাটক, সূপশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, ছন্দশাস্ত্র, অলঙ্কার, কাব্য, তর্ক, ব্যাকরণ, কলা প্রভৃতির যথার্থ জ্ঞান গণিত ছাড়া সম্ভব নয়। তাই গণিতের স্থান সকলের ওপর।

এই গ্রন্থে সংজ্ঞাধিকার, পরিকর্ম ব্যবহার, কলাসবর্ণ ব্যবহার, প্রকীর্ণ ব্যবহার, ত্রৈরাশিক ব্যবহার, মিশ্রক ব্যবহার, ক্ষেত্রগণিত ব্যবহার, খাত ব্যবহার এবং ছায়া ব্যবহার নামে অধ্যায় আছে। মিশ্রক ব্যবহারে সমকুট্টী করণ, বিষমকুট্টী করণ ও মিশ্রকুট্টী করণ আদি অনেক প্রকারের গণিত রয়েছে। পাটীগণিত ও রেখাগণিতের দৃষ্টিতে এতে অনেক বিশেষতা আছে। ক্ষেত্র ব্যবহার অধ্যায়ে আয়তের বর্গ ও বর্গকে বৃত্তে পরিণত করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। সমত্রিভুজ, বিষম ত্রিভুজ, সমকোণ চতুর্ভুজ, বিষমকোণ চতুর্ভুজ, বৃত্তক্ষেত্র, সূচী, ব্যাস, পঞ্চভুজক্ষেত্র এবং বহু ভুজক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল ও ঘনফল দেওয়া হয়েছে।

জ্যোতিষপটলে গ্রহর চারক্ষেত্র, সূর্যের মণ্ডল, নক্ষত্র ও তারকার সংস্থান, গতি, স্থিতি ও সংখ্যা আদি প্রতিপাদিত হয়েছে।

চন্দ্রসেন—ইনি কেবলজ্ঞান হোরা নামে একটী মহত্বপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটী কল্যাণ বর্মার পর রচিত হয়েছে মনে হয়। কারণ তার অধ্যায় বিভাগের সঙ্গে মিল আছে কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রচিত হওয়ার জন্য কর্ণাটক প্রদেশের জ্যোতিষের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। ইনি গ্রন্থের বিষয় স্পষ্ট করার জন্য মধ্যে মধ্যে কন্নড় ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। এই গ্রন্থ অনুমানতঃ চার হাজার শ্লোকে পূর্ণ হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে বলা হয়েছে—

হোরা নাম মহাবিদ্যা বক্তব্যংচ ভবদ্ধিতম্।
জ্যোতিজ্ঞানৈকসারং ভূষণং বুধপোষণম্॥

ইনি নিজের প্রশংসাও প্রচুর পরিমাণে করেছেন—

আগমঃ সদৃশো জৈনঃ চন্দ্রসেন সমো মুনিঃ।
কেবলী সদৃশী বিদ্যা দুর্লভা সচরাচরে॥

এই গ্রন্থে হেম প্রকরণ, দামা প্রকরণ, শিলা প্রকরণ, মৃত্তিকা প্রকরণ, বৃক্ষ প্রকরণ, কার্পাস-গুল্ম-বল্কল-তৃণ-রোম-চর্ম-পট প্রকরণ, সংখ্যা প্রকরণ, নষ্ট দ্রব্য প্রকরণ, নির্বাহ প্রকরণ, অপত্য প্রকরণ, লাভালাভ প্রকরণ, স্বর প্রকরণ, স্বপ্ন প্রকরণ, বাস্তু প্রকরণ, ভোজন প্রকরণ, দেহলোহ দীক্ষা প্রকরণ, অঞ্জন বিদ্যা প্রকরণ ও বিষবিদ্যা প্রকরণাদি রয়েছে। গ্রন্থটী আদ্যোপান্ত দেখলে বলা যায় যে এটী সংহিতা বিষয়ক, হোরা বিষয়ক নয়।

শ্রীধর—ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ বিদ্বান ছিলেন। এঁর সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ। ইনি কর্ণাটক প্রদেশের অধিবাসী। মাতার নাম অব্বোকা, পিতার নাম বলদেব শর্মা। ইনি বাল্যকালে পিতার নিকট সংস্কৃত ও কন্নড় সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। প্রথমে ইনি শৈব ছিলেন কিন্তু পরে জৈন ধর্মানুযায়ী হন। এঁর গণিত সার ও জ্যোতিজ্ঞান বিধি সংস্কৃত ভাষায় ও জাতক তিলক কন্নড় ভাষায় রচিত। গণিতসারে অভিন্নগুণক, ভাগহার, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ভিন্ন, সমচ্ছেদ, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি, ভাগানুবন্ধ, ভাগমাত্র জাতি, ত্রৈরাশিক, সপ্তরাশিক, নবরাশিক, ভাণ্ড প্রতি ভাণ্ড, মিশ্রক ব্যবহার, ভাব্যক ব্যবহার, একপত্রী করণ, সুবর্ণ গণিত, প্রক্ষেপক গণিত, সম ক্রয়-বিক্রয়, শ্রেণী ব্যবহার, ক্ষেত্র ব্যবহার, খাত ব্যবহার, চিতি-ব্যবহার, কাষ্ঠ ব্যবহার, রাশি ব্যবহার এবং ছায়া ব্যবহার আদি গণিতের নিরূপণ করা হয়েছে।

জ্যোতিজ্ঞানবিধি প্রারম্ভিক জ্যোতিষের গ্রন্থ। এতে ব্যবহারোপযোগী মুহূর্তও দেওয়া হয়েছে। গোড়ায় সম্বৎসরের নাম, নক্ষত্রের নাম, যোগকরণ নাম ও অনেক শুভাশুভত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে মাস শেষ, মাসাধিপতিশেষ, দিন শেষ ও দিনাধিপতি শেষ আদি গণিতানয়নের অদ্ভুত প্রক্রিয়া বলা হয়েছে।

জাতক তিলক কন্নড় ভাষায় লিখিত হোরা বা জাতক শাস্ত্র সম্বন্ধিত রচনা। এই গ্রন্থে লগ্ন, গ্রহ, গ্রহযোগ ও জন্মকুণ্ডলী সম্বন্ধিত ফলাদেশ নিরূপিত করা হয়েছে।

চন্দ্রোন্মীলন প্রশ্নও একটী মহত্বপূর্ণ প্রশ্ন শাস্ত্রমূলক রচনা। এই গ্রন্থের লেখকের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। গ্রন্থ দেখলে অবশ্যই মনে হয় যে এই প্রশ্নপ্রণালীর প্রচার তখন খুব ছিল। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের বর্ণকে সংযুক্ত, অসংযুক্ত, অভিহত, অনভিহত, অভিঘাতিত, অভিধূমিত, আলিংগিত ও দগ্ধ সংজ্ঞায় বিভক্ত করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রোন্মীলন বেশ বড় গ্রন্থ। একে ভিত্তি করে আরো কয়েকটী প্রশ্ন গ্রন্থ

লেখা হয়েছে। কেরলের প্রশ্ন সংগ্রহে চন্দ্রোন্মীলনের খণ্ডন করা হয়েছে। প্রোক্তং চন্দ্রোন্মীলনং শুক্লবস্ত্রৈস্তচ্চাশুদ্ধম্। এতে মনে হয় এই প্রণালী লোকপ্রিয় ছিল।

উত্তর মধ্যকালে ফলিত জ্যোতিষের খুব বিকাশ হয়। মুহূর্তজাতক, সংহিতা, প্রশ্ন সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অনেক মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়। এই যুগের সর্ব প্রথম ও প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী দুর্গদেব। দুর্গদেবের নামে এমনিতে অনেক রচনা পাওয়া যায়। তাঁর দুটী রচনা প্রমুখ : রিট্‌ঠসমুচ্চয় ও অর্দ্ধকাণ্ড। দুর্গদেবের সময় সন ১০৩২ বলা হয়। রিটঠসমুচ্চয়ের রচনা তিনি আপন গুরু সংযমদেবের বাক্যানুসারে করেন। গ্রন্থের এক জায়গায় সংযমদেবের গুরু সংযমসেন ও তাঁর গুরু মাধব চন্দ্র ছিলেন বলা হয়েছে। রিট্‌ঠসমুচ্চয় সৌরসেনী প্রাকৃতে ২৬১ গাথায় রচিত। এতে শকুন ও শুভাশুভ নিমিত্তর সঙ্কলন করা হয়েছে। লেখক রিষ্টকে পিণ্ডস্থ, পদস্থ ও রূপস্থ এই তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম শ্রেণীতে অঙ্গুল ভঙ্গ, নেত্র জ্যোতির হীনতা, রসজ্ঞানের ন্যূনতা, নেত্র হতে অবিরাম জলপাত, জিহ্বা না দেখতে পাওয়া বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সূর্য ও চন্দ্রকে অনেকরূপে দেখা, প্রজ্বলিত প্রদীপকে শীতল অনুভব করা, চন্দ্রকে ত্রিভঙ্গীরূপে দেখা, চন্দ্রলাঞ্ছন না দেখতে পাওয়া ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীতে নিজ ছায়া, পরছায়া ও ছায়া পুরুষের বর্ণনা আছে। প্রশ্নাক্ষর, শকুন ও স্বপ্ন আদির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অর্দ্ধকাণ্ডে তেজীমন্দীর গ্রহযোগ বিচার করা হয়েছে। এই গ্রন্থ ১৪৯টী প্রাকৃত গাথায় লেখা হয়েছে।

মল্লিসেন—সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষার ইনি প্রকাণ্ড বিদ্বান। এঁর পিতার নাম জিনসেন সূরি। দক্ষিণ ভারতের ধারবাড় জেলার অন্তর্গত গদগত লুকা স্থানের ইনি অধিবাসী ছিলেন। এঁর সময় ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ। এঁর লেখা আয় সদ্‌ভাব নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থ প্রারম্ভেই তিনি লিখছেন—

> সুগ্রীবাদি মুনীন্দ্রৈঃ রচিতং শাস্ত্রং যদ য়সদ্‌ভাবম্।
> তৎসম্প্রত্যার্থাভির্বিরচ্যতে মল্লিষেণেন ॥
> ধ্বজধূম্রসিংহমণ্ডল বৃষখরগজবায়সা ভবন্ত্যায়াঃ।
> জায়ন্তে তে বিদ্বাভাঃ কোত্তরগণনয়া চাষ্টৌ ॥

এই উদ্ধৃতিতে জানা যায় যে এঁর পূর্বেও সুগ্রীবাদি জৈন মুনিদের দ্বারা এই বিষয়ে আরো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যার সারাংশ নিয়ে আয় সদ্‌ভাব গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই কৃতিতে ১৯৫টী আর্যা ও অন্ত একটী গাথা এভাবে মোট ১৯৬ পদ্য রয়েছে। এতে ধ্বজা ধূম, সিংহ মণ্ডল, বৃষ, খর, গজ ও বায়স এই আট আর্যের স্বরূপ ও ফলাদেশ বর্ণিত হয়েছে।

ভট্টবোসরি—আয়জ্ঞান তিলক নামক গ্রন্থের রচয়িতা দিগম্বরাচার্য দামনন্দীর শিষ্য

ভট্টবোসরি। এটি প্রশ্ন শাস্ত্রের একটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতে ২৫ প্রকরণ ও ৪১৫ গাথা রয়েছে। গ্রন্থকর্তার নিজ বৃত্তিও রয়েছে। দামনন্দীর উল্লেখ শ্রবণ বেলগোলের শিলালেখ নম্বর ৫৫তে পাওয়া যায়। ইনি প্রভাচন্দ্রাচার্যের সতীর্থ বা গুরু ভাই ছিলেন। তাই এঁর সময়[১৩] বিক্রম সম্বৎ একাদশ শতাব্দী। ভট্টবোসরির সময়ও প্রায় এইরূপ।

এই গ্রন্থে ধ্বজা, ধূম, সিংহ, গজ, খর, শ্বান, বৃষ, ধ্বাংক্ষ এই আট আর্য দ্বারা প্রশ্নফলের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এতে কার্য অকার্য, হানি লাভ, জয় পরাজয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি আদির বিচার বিস্তার পূর্বক করা হয়েছে। প্রশ্ন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ মহত্বপূর্ণ।

উদয়প্রভদেব—এঁর গুরুর নাম বিজয়সেন সূরি। এঁর সময় খৃষ্টীয় ১২২০ বলা হয়। ইনি জ্যোতিষ বিষয়ক আরম্ভসিদ্ধি বা ব্যবহারচর্যা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ওপর ১৫১৪ বিক্রম সম্বতে রত্নশেখর সূরির শিষ্য হেমহংসগণি এক বিস্তৃত টীকা লেখেন। এই টীকায় ইনি মুহূর্ত সম্বন্ধীয় সাহিত্যের বিস্তৃত সংকলন করেছেন। লেখক গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থোক্ত অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নাম করণ এই প্রকার দিয়েছেন।

দৈবজ্ঞদীপকালিকাং ব্যবহারচর্যামারম্ভসিদ্ধিমুদয়প্রভদেবানাম্ শাস্তিক্রমেণ তিথিবারমযোগরাশিগোচর্ধকার্যাগমবাস্তুবিলগ্নভিঃ।

হেমহংস গণি ব্যবহারচর্যা নামের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে বলেছেন--

ব্যবহার শিষ্টজনসমাচারঃ শুভতিথিবারমাদিষু শুভকার্যকরণাদিরূপস্তস্যাচর্যা।

এই গ্রন্থ মুহূর্ত চিন্তামণির সমান উপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ। মুহূর্ত বিষয়ের জ্ঞান এই একটীমাত্র গ্রন্থ অধ্যয়নে করা যায়।

রাজাদিত্য—এঁর পিতার নাম শ্রীপতি, মায়ের নাম বসন্তা। এঁর জন্ম হয় কোণ্ডিমণ্ডলের যূবিনবাগ নামক স্থানে। এঁর অন্য নাম রাজবর্ম, ভাস্কর, বাচিরাজ। ইনি বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজার রাজসভায় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এঁর সময় ১১২০-র কাছাকাছি। ইনি কবি হবার সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও জ্যোতিষেরও সম্মান্য বিদ্বান ছিলেন। কর্ণাটক কবি চরিত গ্রন্থের লেখক বলেন যে ইনি কন্নড় সাহিত্যে গণিত গ্রন্থ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন। এঁর দ্বারা লিখিত ব্যবহার গণিত, ক্ষেত্রগণিত, ব্যবহার রত্ন, জৈন গণিত সূত্রটীকোদাহরণ ও লীলাবতী গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পদ্মপ্রভসূরি—নাগোরের তপগচ্ছীয় পট্টাবলী হতে জানা যায় যে ইনি বাদিদেব সূরির শিষ্য ছিলেন। ইনি ভুবনদীপক বা গ্রহভাব প্রকাশ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা

১৩ প্রশস্তি সংগ্রহ, ১ম ভাগ, সম্পাদক যুগোল কিশোর মুখ্তার, প্রস্তাবনা, পৃ. ৯৫-৯৬; পুরাতন বাক্যসূচি, প্রস্তাবনা, পৃ. ১০১-১০২।

করেন। এই গ্রন্থের ওপর সিংহ তিলক সূরি বিক্রম সম্বৎ ১৩৩৬-এ এক বিবৃতি লেখেন। জৈন সাহিত্য-নো ইতিহাস নামক গ্রন্থে লেখা হয়েছে ইনি এঁর গুরুর নাম বিবুধপ্রভ সূরি বলে অভিহিত করেছেন। ভুবনদীপকের রচনা সময় বিক্রম সম্বৎ ১২৯৪। এই গ্রন্থ ছোট হলেও মহত্বপূর্ণ। এতে ৩৬ দ্বার প্রকরণ আছে। রাশি অধিপতি, উচ্চনীচত্ব, মিত্র-শত্রু, রাহুর গৃহ, কেতুস্থান, গ্রহের স্বরূপ, দ্বাদশ ভাবের বিচারনীয় বিষয়, ইষ্টকাল জ্ঞান, লগ্ন সম্বন্ধীয় বিচার, বিনষ্ট গৃহ, রাজ যোগ বর্ণন, লাভালাভ বিচার, লগ্নাধিপতির স্থিতিফল, প্রশ্ন দ্বারা গর্ভ বিচার, প্রশ্ন দ্বারা প্রসব জ্ঞান, যমজ বিচার, মৃত্যুযোগ, চৌর্যজ্ঞান, দ্রেষ্কাণাদির ফল বিচার বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ১৭০ টী শ্লোক আছে। ভাষা সংস্কৃত।

নরচন্দ্র উপাধ্যায়—ইনি কাসদ্রহগচ্ছের সিংহসূরির শিষ্য। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে এঁর বেড়া জাতক বৃত্তি, প্রশ্ন শতক, প্রশ্ন চতুর্বিংশতিকা, জন্মসমুদ্রটীকা, লগ্ন বিচার ও জ্যোতিষ প্রকাশ পাওয়া যায়। নরচন্দ্র ১৩২৪ সম্বতের মাঘ শুক্লা ৮মী রবিবার বেড়াজাতক বৃত্তির রচনা ১০৫০ শ্লোকে করেন। জ্ঞানদীপিকা নামক গ্রন্থটিও এঁর রচিত বলা হয়। জ্যোতিষপ্রকাশ সংহিতাও জাতক সম্বন্ধীয় মহত্বপূর্ণ রচনা।

অট্ঠকবি বা অর্হদ্দাস—ইনি জৈন ব্রাহ্মণ। এঁর সময় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক। অর্হদ্দাসের পিতার নাম নাগকুমার। ইনি কন্নড় ভাষার প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন। কন্নড়ে ইনি অট্ঠমত নামক জ্যোতিষ বিষয়ক মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। শক সম্বতের চতুর্দশ শতাব্দীতে ভাস্কর নামক তন্ত্রকবি এই গ্রন্থের তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করেন। অট্ঠমতে বর্ষার চিহ্ন, আকস্মিক লক্ষণ, শকুন, বায়ুচক্র, গৃহপ্রবেশ, ভূকম্প, ভূজাতফল, উৎপাতলক্ষণ, পরিবেশলক্ষণ, ইন্দ্রধনু লক্ষণ, প্রথমগর্ভ লক্ষণ, দ্রোণ সংখ্যা, বিদ্যুৎ লক্ষণ, প্রতিসূর্য লক্ষণ, সম্বৎসর ফল, গ্রহ দ্বেষ, মেঘের নাম, কুলবর্ণ, ধ্বনি বিচার, দেশবৃষ্টি, মাসফল, রাহুচন্দ্র, ১৪ নক্ষত্রফল, সংক্রান্তি ফল আদি বিষয়ের নিরূপণ করা হয়েছে।

মহেন্দ্রসূরি—ইনি ভৃগুপুর[১৪] নিবাসী মদনসূরির শিষ্য ও ফিরোজসাহ তুঘলকের প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি নাড়ীবৃত্তের ধরাতলে গোলপৃষ্ঠস্থ সমস্ত বৃত্তের পরিণমন করে যন্ত্ররাজ নামক গ্রহগণিতের কার্যকরী গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর শিষ্য

১৪ অভূদ্‌ভৃগুপুরে বরে গণকচক্রচূড়ামণিঃ
কৃতী নৃপতিসংস্তুতো মদনসূরিনামা গুরুঃ
তদীয়পদশালিনা বিরচিতে সুযন্ত্রাগমে
মহেন্দ্রগুরুণোদিতাজনি বিচারণা যন্ত্রজা।
—যন্ত্ররাজ, অ. ৫ শ্লো. ৬৭।

মলয়েন্দু সূরী এর ওপর উদাহরণ সহ টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে পরমক্রান্তি ২৩ অংশ ৩৫ কলা বলা হয়েছে। এর রচনাকাল শক সম্বৎ ১২৯২। এতে গণিতাধ্যায়, যন্ত্রঘটনাধ্যায়, যন্ত্র রচনাধ্যায়, যন্ত্র শোধনাধ্যায় ও যন্ত্র বিচারাধ্যায় এই পাঁচ অধ্যায় আছে। ক্রমোৎক্রমজ্যানয়ন, ভুজকোটিজ্যার চাপ সাধন, ক্রান্তি সাধন, ধ্রুজ্যাংশু সাধন, ধ্রুজ্যাফলানয়ন, সৌম্য গণিতের বিভিন্ন গণিত সাধন, অক্ষাংশ হতে উন্নতাংশ সাধন, গ্রন্থের নক্ষত্র ধ্রুবাদি হতে অভীষ্ট বর্ষের ধ্রুবাদি সাধন, নক্ষত্রের দৃক্‌বর্ম সাধন, দ্বাদশ-রাশির বিভিন্ন বৃত্ত সম্বন্ধীয় গণিত সাধন ইষ্ট শঙ্কু হতে ছায়া করণ সাধন, যন্ত্র শোধন প্রকার ও তদনুসারে বিভিন্ন রাশিনক্ষত্রের গণিত সাধন, দ্বাদশ ভাব ও নব-গ্রহের স্পষ্টীকরণ গণিত এবং বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা সমস্ত গ্রহ সাধনের গণিত অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে পঞ্চাঙ্গ নির্মাণ করার বিধির নিরূপণ করা হয়েছে।

ভদ্রবাহুসংহিতা অষ্টাঙ্গ নিমিত্তের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর প্রথম ২৭ অধ্যায়ে নিমিত্ত ও সংহিতা বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়েছে। ৩০ অধ্যায়ে অরিষ্টের বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনা শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহুর বাক্যমতের আধারে করা হয়েছে। বিষয় নিরূপণ ও শৈলীর বিচারে এর রচনাকাল ৮।৯ শতকের পরবর্তী নয়। লোকোপযোগী হবার জন্য অবশ্য এতে সময়ে সময়ে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছে।

এই গ্রন্থে ব্যঞ্জন, অঙ্গ, স্বর, ভৌম, ছন্ন, অন্তরীক্ষ,লক্ষণ ও স্বপ্ন এই আঠ নিমিত্তের ফল নিরূপণ সহ বিবেচন করা হয়েছে। উল্কা, পরিবেশ, বিদ্যুৎ, অভ্র, সন্ধ্যা, মেঘ, বায়ু, প্রবর্ষণ, গন্ধর্বনগর, গর্ভলক্ষণ, যাত্রা, উৎপাত গ্রহচার, গ্রহযুদ্ধ, স্বপ্ন, মুহূর্ত, তিথি, করণ, শকুন, পাক, জ্যোতিষ, বাস্তু, ইন্দ্রসম্পদা, লক্ষণ, ব্যঞ্জন, চিহ্ন, লগ্ন, বিদ্যা, ঔষধ প্রভৃতি সমস্ত নিমিত্তের সমস্ত বলাবল, বিরোধ ও পরাজয় আদি বিষয়ের বিস্তার পূর্বক বিবেচন করা হয়েছে। নিমিত্তশাস্ত্রের এটি একটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতে বর্ষা, কৃষি, ধান্যভাব ও অনেক লোকোপযোগী বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কেবলজ্ঞান প্রশ্ন চূড়ামণির রচয়িতা সমন্তভদ্রের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দী। ইনি বিজয়পের পুত্র। বিজয়পের ভাই নেমিচন্দ্র প্রতিষ্ঠাতিলকের রচনা আনন্দ সম্বৎসরে চৈত্র মাসের পঞ্চমীতে করেন। তাই সমন্তভদ্রের সময় ত্রয়োদশ শতক। এই গ্রন্থে ধাতু, মূল, জীব, নষ্ট, মুষ্টি, লাভ, হানি, রোগ, মৃত্যু, ভোজন, শয়ন, শকুন, জন্ম, কর্ম, অস্ত্র, শস্য, বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সিদ্ধি, অসিদ্ধি আদি বিষয়ের নিরূপণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অ চ ট ত প য় শ অথবা আ এ ক চ ট প য শ এই অক্ষরের প্রথম বর্গ, আ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ষ এই অক্ষরের দ্বিতীয় বর্গ, ই ও গ জ ও দ ব ল স এই অক্ষরের তৃতীয় বর্গ, ঈ ঔ ঘ ঝ ভ ব হ ন অক্ষরের চতুর্থ বর্গ ও উ ঊ ণ ন ম অং অঃ এই অক্ষরের পঞ্চম বর্গ বলা হয়েছে। প্রশ্নকর্তার বাক্য বা প্রশ্নাক্ষর নিয়ে সংযুক্ত, অসংযুক্ত, অভিহিত, অনভিহিত ও অভিঘাতিত এই পঞ্চক দ্বারা ও আলিঙ্গিত,

অভিন্ন মিত ও দগ্ধ এই তিন ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা প্রশ্নের ফলাফল বিচার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মূক প্রশ্নের উত্তরও বার করা হয়েছে। প্রশ্ন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বইটী অত্যন্ত মূল্যবান।

হেমপ্রভ—এঁর গুরুর নাম ছিল দেবেন্দ্র সূরি। এঁর সময় চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগ। সম্বৎ ১৩০৫-এ ইনি ত্রৈলোক্য প্রকাশ রচনা করেন। এঁর দুইটী গ্রন্থ পাওয়া যায়—ত্রৈলোক্যপ্রকাশ ও মেঘমালা।[১৫]

ত্রৈলোক্যপ্রকাশ একটী মূল্যবান গ্রন্থ। এতে ১২৬০টী শ্লোক আছে। এই একটী গ্রন্থপাঠে ফলিত জ্যোতিষের ভালো জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রারম্ভে ১১০টী শ্লোকে লগ্নের নিরূপণ করা হয়েছে। এই প্রকরণে ভাবের অধিপতি গ্রহের ছয় প্রকারের বল, দৃষ্টিবিচার, শত্রুমিত্র, বক্রীমার্গী, উচ্চনীচ, ভাবের সংজ্ঞা, ভাবরাশি, গ্রহবল বিচার আদির আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকরণে যোগ বিশেষ—ধনী, সুখী, দরিদ্র, রাজ্যপ্রাপ্তি, সন্তান প্রাপ্তি, বিদ্যাপ্রাপ্তি আদির কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকরণে নিধিপ্রাপ্তি—গৃহ ও ক্ষেত্রে রাখা ধন ও সেই ধন নিষ্কাশন বিধি বলা হয়েছে। এই অংশটী বিশেষ মহত্বপূর্ণ। এত সরল ও সহজ ভাবে এই বিষয়ের নিরূপণ অন্যত্র নেই। চতুর্থ প্রকরণে ভোজন ও পঞ্চমে গ্রামপৃচ্ছা আছে। এই দুই প্রকরণে নামানুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকার যোগের প্রতিপাদন করা হয়েছে। ষষ্ঠ পুত্র প্রকরণ। এতে সন্তান প্রাপ্তির সময়, সন্তান সংখ্যা পুত্র বা কন্যা প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। সপ্তম প্রকরণে ষষ্ঠ প্রকরণের ভাবে বিভিন্ন প্রকারের রোগের আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম প্রকরণে সপ্তম প্রকরণের ভাবে দাম্পত্য সম্বন্ধ ও নবমে বিভিন্ন দৃষ্টিতে স্ত্রী-সুখের বিচার করা হয়েছে। দশম প্রকরণে স্ত্রীজাতক—নারীর দৃষ্টিতে ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে। একাদশে পরচক্র গমন, দ্বাদশে গমনাগমন, ত্রয়োদশে যুদ্ধ, চতুর্দশে সন্ধিবিগ্রহ, পঞ্চদশে বৃক্ষজ্ঞান, ষোড়শে গ্রহদোষ, গ্রহপীড়া, সপ্তদশে আয়ু, অষ্টাদশে প্রবহণ ও একোনবিংশে প্রব্রজ্যার আলোচনা করা হয়েছে। বিংশে রাজ্য বা পদপ্রাপ্তি, একবিংশে বৃষ্টি, দ্বাবিংশে অর্ঘকাণ্ড, ত্রয়োবিংশে স্ত্রীভাগ, চতুর্বিংশে নষ্ট বস্তু প্রাপ্তি এবং পঞ্চবিংশে গ্রহের উদয়াস্ত, সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ, মহর্ঘ, সমর্ঘ ও বিভিন্ন প্রকারের তেজী মন্দীর কথা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রশংসা নিজেই এভাবে করেছেন—

শ্রীমদ্দেবেন্দ্রসূরীণাং শিষ্যেণ জ্ঞানদর্পণঃ।
বিশ্বপ্রকাশকশ্চক্রে শ্রীহেমপ্রভসূরিণা॥[১৬]

১৫ জৈন গ্রন্থাবলী, পৃ ৩৫৬।
১৬ ত্রৈলোক্য প্রকাশ, শ্লো. ৪০০।

শ্রীদেবেন্দ্র সূরির শিষ্য শ্রীহেমপ্রভ বিশ্বপ্রকাশক ও জ্ঞান দর্পণ এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মেঘমালার শ্লোক সংখ্যা ১০০ বলা হয়েছে। অধ্যাপক এইচ. ডী. ভেলেঙ্কর জৈন গ্রন্থাবলীতে সেইরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

রত্নশেখর সূরি দিনশুদ্ধিদীপিকা নামে এক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন। এঁর সময় পঞ্চদশ শতক। গ্রন্থ শেষে এই প্রশস্তি গাথা পাওয়া যায়—

সিরিবয়রসেণগুরুপট্টনাহসিরিহেমতিলয়সূরীণং।

পায়পসায়া এসা রয়ণসিহরসূরিণা বিহিয়া ॥ ১৪৪

বজ্রসেন গুরুর পট্টধর শ্রীহেমতিলক সূরির প্রসাদে রত্নশেখর সূরি দিনশুদ্ধি রচনা করেন।

একে মুনিমণভবণপয়াসং' অর্থাৎ মুনিদের মন রূপী ভবন প্রকাশক বলা হয়েছে। এতে মোট ১৪৪ গাথা আছে। এই গ্রন্থে বারদ্বার, কালহোরা, বারপ্রারম্ভ, কুলিকাদি-যোগ, বর্জ্যপ্রহর, নন্দভদ্রাদি সংজ্ঞা, ক্রূরতিথি, বর্জ্যতিথি, দগ্ধাতিথি, করণ, ভদ্রাবিচার, নক্ষত্রদ্বার, রাশিদ্বার, লগ্নদ্বার, চন্দ্রঅবস্থা, শুভর বিয়োগ, কুমারযোগ, রাজযোগ, আনন্দাদি যোগ, অমৃত সিদ্ধি যোগ, উৎপাদ যোগ, লগ্ন বিচার, প্রয়ানকালীন শুভাশুভ বিচার, বাস্তুমুহূর্ত, ষড়ষ্টকাদি, রাশিকূট, নক্ষত্রযোনি বিচার, বিবিধ মুহূর্ত, নক্ষত্রদোষ বিচার, ছায়াসাধন ও তার দ্বারা ফলাদেশ ও বিভিন্নপ্রকার শকুনের বিবেচন করা হয়েছে। এই গ্রন্থ ব্যবহারোপযোগী।

চতুর্দশ শতকে ঠক্কর ফেরুর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি গণিতসার ও জোইসসার এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন। গণিত সারে পাটী গণিত ও পরিকর্মাষ্টক এর মীমাংসা করা হয়েছে। জোইসসারে নক্ষত্রের নামাবলী হতে গ্রহের বিভিন্ন যোগের সম্যক আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রন্থ ছাড়া হর্ষকীর্তি কৃত জন্মপত্র পদ্ধতি, জিন বল্লভকৃত স্বপ্ন সংহিতকা, জয় বিজয়কৃত শকুন দীপিকা, পুণ্যতিলককৃত গ্রহায়ুসাধন, গর্গমুনিকৃত পাসাবলী, সমুদ্র কবিকৃত সামুদ্রিক শাস্ত্র, মান সাগর কৃত মানসাগরী পদ্ধতি, জিনসেন কৃত নিমিত্ত দীপক আদি গ্রন্থও মহত্বপূর্ণ। জ্যোতিষসার, জ্যোতিষ সংগ্রহ, শকুন সংগ্রহ, শকুন দীপিকা, শকুন বিচার, জন্মপত্রী পদ্ধতি, গ্রহযোগ, গ্রহফল নামক এমন অনেক সংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া যায় যাদের লেখকের নামই পাওয়া যায় না।

অর্বাচীন কালেও অনেক ভালো জ্যোতির্বিদ হয়েছেন যাঁরা জ্যোতিষ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।[১৭] এখানে প্রমুখ লেখকদের তাঁদের গ্রন্থসহ পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

১৭ কেবলজ্ঞানপ্রশ্নচূড়ামণি, প্রস্তাবনা।

এ যুগের সকলের প্রমুখ হচ্ছেন মেঘবিজয় গণি। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন। এ'র সময় বিক্রম ১৩৩৭ সম্বতের কাছাকাছি। এ'র লিখিত মেঘ মহোদয় বা বর্ষপ্রবোধ, উদয় দীপিকা, রমল শাস্ত্র ও হস্ত সংজীবন মুখ্য। বর্ষ প্রবোধে ১৩ অধিকার ও ৩৫ প্রকরণ আছে। এতে উৎপাৎ প্রকরণ, কর্পূরচক্র, পদ্মিনীচক্র, মণ্ডল প্রকরণ, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ফল, মাসবায়ু বিচার, সম্বৎসর ফল, গ্রহের উদয়াস্ত ও বক্রী, অয়ণমাস পক্ষ বিচার, সংক্রান্তি ফল, বর্ষের রাজা, মন্ত্রী, ধান্যেশ, রসেশ আদির নিরূপণ, আয়ব্যয় বিচার, সর্বতোভদ্রচক্র এবং শকুন আদি বিষয়ের নিরূপণ করা হয়েছে। জ্যোতিষ বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য এই রচনা উপযোগী।

হস্তসংজীবনে তিন অধিকার রয়েছে। প্রথম দর্শনাধিকারে হস্ত রেখার প্রক্রিয়া। হস্তের রেখা দ্বারাই মাস, দিন, ঘণ্টা, পল আদির কথন ও তাহার দ্বারা লগ্নকুণ্ডলী তৈরী করা ও তার ফলাদেশ নিরূপণ করার কথা এখানে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় স্পর্শনাধিকারে হস্তরেখার স্পর্শে সমস্ত শুভাশুভফলের নিরূপণ করা হয়েছে। এই অধিকারে মূক প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রক্রিয়ার কথাও বলা হয়েছে। তৃতীয় বিমর্শনাধিকারে রেখার দ্বারা আয়ু, সন্তান, স্ত্রী, ভাগ্যোদয়, জীবনের প্রমুখ ঘটনা, সাংসারিক সুখ, বিদ্যাবুদ্ধি, রাজ্য সম্মান ও পদোন্নতির বিচার করা হয়েছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ মহত্বপূর্ণ ও পঠনীয়।

উভয়কুশল—এ'র সময় অষ্টাদশ শতকের পূর্বার্দ্ধ। ফলিত জ্যোতিষের ইনি মর্মজ্ঞ ছিলেন। ইনি বিবাহপটল ও চমৎকার চিন্তামণি টবা নামক দুটী গ্রন্থের রচনা করেন। মুহূর্ত ও জাতক উভয়ের ইনি পূর্ণ পণ্ডিত ছিলেন। চিন্তামণি টবায় দ্বাদশ ভাবানুসারে গ্রহের ফলাদেশ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বিবাহপটলে বিবাহের মুহূর্ত ও কুণ্ডলী বিচারের সুন্দর বর্ণনা আছে।

লব্ধচন্দ্রগণি—ইনি খরতর গচ্ছীয় কল্যাণ নিধানের শিষ্য। বিক্রমসম্বৎ ১৭৫১'র কার্তিক মাসে জন্মপত্রী পদ্ধতি নামক এক ব্যবহার উপযোগী জ্যোতিষ গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ইষ্টকাল, ভয়াত, ভভোগ, লগ্ন, নব গ্রহের স্পষ্টীকরণ, দ্বাদশ ভাব, তাৎকালিক চক্র, দশবল, বিংশোত্তরী দশা সাধন আদির আলোচনা করা হয়েছে।

বাঘজী মুনি—পার্শ্বচন্দ্র গচ্ছীয় শাখার মুনি। এ'র সময় বিক্রম ১৭৮৩ সম্বৎ। ইনি তিথি সারিণী নামক জ্যোতিষের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর অতিরিক্ত এ'র দু'তিনটী ফলিত জ্যোতিষের মুহূর্ত সম্পর্কিত গ্রন্থও পাওয়া যায়। এ'র সারণী গ্রন্থ মকরন্দ সারণীর মত সমান উপযোগী।

যশস্বত সাগর—এ'র অন্য নাম জসবংত সাগরও বলা হয়। ইনি জ্যোতিষ, ন্যায়, ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রের ধুরন্ধর বিদ্বান ছিলেন। ইনি গ্রহলাঘবের ওপর

বার্তিক নামে টীকা রচনা করেন। বিক্রম সম্বৎ ১৭৬২তে জন্মকুণ্ডলী সম্পর্কিত যশোরাজপদ্ধতি নামক ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে জন্মকুণ্ডলী রচনার নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। উত্তরার্দ্ধে জাতক পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষিপ্ত ফল বলা হয়েছে।

এর অতিরিক্ত বিনয় কুশল, হরি কুশল, মেঘরাজ, জিনপাল, জয়রত্ন, সূরচন্দ্র আদি অনেক জ্যোতিষীর জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। জৈন জ্যোতিষ সাহিত্যের বিকাশ আজও গবেষণা, টীকা এবং সংগ্রহ গ্রন্থরূপে হচ্ছে।[১৮] সংক্ষেপে অঙ্ক গণিত, বীজ গণিত, রেখাগণিত, ত্রিকোণমিতি, গণিত, প্রতিভা গণিত, পঞ্চাঙ্গ নির্মাণ গণিত, জন্মপত্র নির্মাণ গণিত আদি গণিত-জ্যোতিষ অঙ্গের সঙ্গে হোরাশাস্ত্র, সংহিতা,[১৯] মুহূর্ত, সামুদ্রিক শাস্ত্র, প্রশ্নশাস্ত্র, স্বপ্ন শাস্ত্র, নিমিত্তশাস্ত্র, রমল শাস্ত্র, পাসাকেবলী প্রভৃতি ফলিত অঙ্গের বিবেচন জৈন জ্যোতিষে করা হয়েছে। জৈন জ্যোতিষ সাহিত্যের এপর্যন্ত পাঁচশ গ্রন্থের নাম পাওয়া গেছে।[২০]

১৮ ভদ্রবাহু সংহিতা, প্রস্তাবনা।

১৯ জৈন জ্যোতিষ কী ব্যবহারিকতা, মহাবীর স্মৃতিগ্রন্থ, পৃ. ১৯৬-৯৭।

২০ ভারতীয় জ্যোতিষকা পোষক জৈন জ্যোতিষ, বর্ণী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ৪৭৮-৮৪।

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পুনরাবৃত্তি]

সেই সময় ইন্দ্রদেবের আসন কম্পিত হল যেন একথা বলতে চাইল দেবী যে কেবল উত্তম কুলকর পুত্র হবে এরূপ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলেন তা অনুচিত হয়েছে। আমাদের আসন কেন কম্পিত হল? এরূপ প্রশ্ন করে ইন্দ্ররা উপযোগ বলে তার কারণ অবগত হলেন। পূর্বকৃত সঙ্কেতানুসারে মিত্ররা যেমন একস্থানে একত্রিত হয় সেরূপভাবে তাঁরা একত্রিত হয়ে স্বপ্নের অর্থ বলবার জন্য ভগবানের মাতার নিকট এলেন। তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে বিনয়পূর্বক যেরূপ বৃত্তিকার সূত্রের অর্থ স্পষ্ট করে সেভাবে স্বপ্নের ফল বোঝাতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—

স্বামিনী, আপনি প্রথম স্বপ্নে যে বৃষভ দেখেছেন এতে আপনার পুত্র মোহরূপ কর্দমে আবদ্ধ ধর্মরূপ রথের উদ্ধার করতে সমর্থ হবেন। দেবী, আপনি যে হস্তী দর্শন করেছেন তার ফলে আপনার পুত্র মহান পুরুষদের গুরু ও মহান বলশালী হবেন। সিংহ দর্শনের জন্য আপনার পুত্র লোক মধ্যে সিংহের মত ধীর, নির্ভয়, বীর ও অস্খলিত পরাক্রম সম্পন্ন হবেন। দেবী, আপনি যে স্বপ্নে লক্ষ্মী দেখেছেন এতে আপনার পুত্র পুরুষোত্তম ও ত্রিলোকের সাম্রাজ্য লক্ষ্মীর অধিপতি হবেন। আপনি যে পুষ্পমালা দেখেছেন এতে আপনার পুত্র পুণ্যদর্শন হবেন ও সমস্ত লোক তাঁর আজ্ঞা মাল্যের মত ধারণ করবে। হে জগৎ জননী, আপনি স্বপ্নে যে চন্দ্র দেখেছেন এতে আপনার পুত্র মনোহর ও চক্ষুকে আনন্দদানকারী হবেন। আপনি যে সূর্য দেখেছেন এতে আপনার পুত্র মোহরূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করে বিশ্বকে আলোকিত করবেন। মহাধ্বজ দেখার জন্য আপনার পুত্র নিজের বংশে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ও ধর্মধ্বজ হবেন। হে দেবী, আপনি স্বপ্নে যে পূর্ণকুম্ভ দেখেছেন এতে আপনার পুত্র সমস্ত অতিশয়ের পূর্ণপাত্র অর্থাৎ অতিশয় সম্পন্ন হবেন। হে স্বামিনী, আপনি যে পদ্মসরোবর দেখেছেন এতে আপনার পুত্র সংসারারণ্যে পথভ্রষ্ট মানুষের সন্তাপ দূর করবেন। আপনি সমুদ্র দেখেছেন এতে আপনার পুত্র অজেয় হলেও সমস্তলোক তাঁর নিকট যাবে। হে দেবী, স্বপ্নে সংসারের অলভ্য যে বিমান দেখলেন এতে আপনার পুত্র বৈমানিক দেবতাদেরও সেব্য হবেন। আপনি যে কান্তিময় রত্নপুঞ্জ দেখলেন এতে আপনার পুত্র সমস্ত গুণরূপী রত্নের খনি তুল্য হবেন। আর আপনি যে প্রদীপ্ত অগ্নি দেখলেন এতে আপনার পুত্র তেজস্বীদেরও তেজ হরণকারী হবেন।

হে স্বামিনী, আপনি যে চোদ্দটী স্বপ্ন দেখলেন এতে এই সূচিত হচ্ছে যে আপনার পুত্র চতুর্দশ রাজলোকের স্বামী হবেন।

এভাবে সমস্ত ইন্দ্ররা স্বপ্নফল বর্ণন করে মরু দেবী মাতাকে প্রণাম করে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করলেন। স্বামিনী মরুদেবী স্বপ্নফলের ব্যাখ্যা দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে বর্ষার জলে সিঞ্চিত হয়ে মাটি যেমন প্রফুল্লিত হয় সেরূপ প্রফুল্লিত হলেন।

যেমন সূর্য দ্বারা মেঘমালা শোভিত হয়, মুক্তোর দ্বারা শুক্তি, সিংহর দ্বারা পর্বত-গুম্ফা সেরূপ মহাদেবী মরুদেবী সেই গর্ভ ধারণ করায় শোভিত হলেন। প্রিয়ঙ্গুর মত শ্যামবর্ণা হওয়া সত্বেও তিনি সেই গর্ভপ্রভাবে কাঞ্চন-বর্ণা হলেন, যেমন শরৎ ঋতুতে মেঘমালা কাঞ্চন বর্ণ হয়। জগৎপতি তাদের পয়ঃপান করবে বলে তাঁর পয়োধর সেই আনন্দে উন্নত ও পুষ্ট হল। ওঁর নেত্র বিশেষ ভাবে বিকসিত হল যেন ভগবানের মুখ দেখবার জন্য তারা আগে হতেই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। তাঁর নিতম্ব যদিও প্রথম হতেই বিস্তৃত ছিল তবুও বর্ষাকাল অতীত হলে নদীতট যেমন বিস্তৃত হয় তেমনি বিস্তৃত হল। ওঁর গতি প্রথম হতেই মন্থর ছিল কিন্তু এখন হস্তী মদোন্মত্ত হলে যেমন তার গতি মন্থর হয় সেরূপ মন্থর হল। গর্ভপ্রভাবে তাঁর লাবণ্যলক্ষ্মী, প্রভাতকালে বিদ্বানের বুদ্ধি যেমন বৰ্দ্ধিত হয় বা গ্রীষ্মকালে সমুদ্রবেলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। যদিও তিনি ত্রিলোকের সারভূত গর্ভ ধারণ করেছিলেন তবুও তাঁর কোন কষ্ট ছিল না, গর্ভবাসী অর্হৎদের প্রভাব এমনি-ই। পৃথিবীর অন্তরালে যেমন অঙ্কুর বৰ্দ্ধিত হয় মরুদেবীর উদরেও সেই প্রকার গুপ্ত রীতিতে সেই গর্ভ বৰ্দ্ধিত হতে লাগল। হিম মৃত্তিকায় (বরফ) শীতল জল যেমন আরো শীতল হয় সেরূপ সেই গর্ভের প্রভাবে স্বামিনী মরুদেবী আরো অধিক বিশ্ব বৎসলা হলেন। গর্ভে ভগবান অবতরিত হবার প্রভাবে নাভি রাজা যুগল ধর্মী লোকে নিজের পিতার চাইতেও অধিক মাননীয় হলেন। শরৎ ঋতুর যোগে চন্দ্র কিরণ যেমন অধিক প্রভা সম্পন্ন হয় সেরূপ কল্পবৃক্ষও অধিক প্রভাব সম্পন্ন হল। জগতে পশু ও মনুষ্যের মধ্যের বৈর শান্ত হয়ে গেল কারণ বর্ষা ঋতুর আবির্ভাবে সর্বত্র সন্তাপ শান্ত হয়ে যায়।

এভাবে নয় মাস সাড়ে আট দিন ব্যতীত হল। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর দিন অর্দ্ধরাত্রে যখন সমস্ত গ্রহ উচ্চস্থানে ও চন্দ্রের যোগ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে এল-তখন মরুদেবী সুখপূর্বক যুগল সন্তানের জন্ম দিলেন। সেই আনন্দ বার্তায় দিকসমূহ প্রসন্ন হল, স্বর্গবাসী দেবতাদের মত লোকে আনন্দে ক্রীড়া করতে লাগল। উপপাদ শয্যায় উৎপন্ন হওয়া দেবতাদের মত জরায়ু ও রুধির আদি কলঙ্ক রহিত ভগবান অধিক শোভান্বিত হলেন। সেই সময়ে লোক চক্ষুকে আশ্চর্যান্বিত করে অন্ধকারনাশী বিদ্যুৎ প্রকাশের মত এক প্রকাশ ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। অনুচরদের দ্বারা

দুন্দুভি নাদিত না হলেও মেঘমন্দ্রের মত গম্ভীর শব্দকারী দুন্দুভি আকাশে ধ্বনিত হতে লাগল তাতে মনে হল স্বর্গই যেন আনন্দে গর্জন করছে। সেই সময় যখন নারক জীবেরাও ক্ষণমাত্র সুখানুভব করল যা পূর্বে হয়নি তখন তির্যক মানুষ ও দেবতারা সুখানুভব করবে তা বলাই বাহুল্য। মন্দ মন্দ বাতাস ভৃত্যের মত মাটির ধুলো দূর করতে আরম্ভ করল। মেঘ বিতানের রচনা করে সুগন্ধিত বারি বর্ষণ করতে লাগল। এতে পৃথিবী উপ্ত বীজের মত উচ্ছ্বসিত হল।

সেই সময় আসন নড়ে উঠলে ভোগংকরা, ভোগবতী, সুভোগা, ভোগমালিনী, তোয়ধারা, বিচিত্রা, পুষ্পমালা ও অনিন্দিতা এই আট দিক্‌ কুমারীরা সেই মুহূর্তে অধোলোকে ভগবানের সূতিকা গৃহে এসে উপস্থিত হল। আদি তীর্থংকর ও তীর্থংকর মাতাকে প্রদক্ষিণা দিয়ে বলতে লাগল, হে জগন্মাতা, হে জগদীপকের জন্মদাত্রী দেবী, আমরা আপনাকে নমস্কার করছি। আমরা অধোলোকবাসিনী আঠ দিক্‌কুমারী অবধিজ্ঞানে পবিত্র তীর্থংকর জন্ম জ্ঞাত হয়ে ওঁর প্রভাবে ও'র মহিমা খ্যাপনের জন্য এখানে এসেছি। এতে আপনি ভয় পাবেন না। তারপর তারা ঈশান কোণে গিয়ে এক সূতিকাগৃহ নির্মাণ করল। তার মুখ পূর্ব দিকে ছিল ও তা একশ থামের উপর অবস্থিত ছিল। তারা সংবর্ত নামক বায়ু প্রবাহিত করে সূতিকাগৃহের চার দিক এক যোজন পর্যন্ত কংকর ও কর্দমশূন্য করল তারপর সংবর্ত বায়ুকে নিরুদ্ধ করে ভগবানকে প্রণিপাত জানিয়ে গান করতে করতে তাঁর পাশে এসে বসল।

এভাবে আসন কম্পিত হলে ভগবানের জন্ম অবগত হয়ে মেঘংকরা, মেঘবতী, সুমেধা, মেঘমালিনী, তোয়ধারা, বিচিত্রা, বারিষেণা ও বলাহিকা নামক মেরুপর্বত অধিবাসিনী আট ঊর্দ্ধলোকের দিক্‌কুমারী সেখানে এল ও জিনেশ্বর ও জিনেশ্বর মাতাকে নমস্কার করে তাঁদের স্তব করল। তারা ভাদ্র মাসের মত সেই সময় মেঘ সৃজন করল ও তা হতে সুগন্ধিত বারি বর্ষণ করে সূতিকাগৃহের চারদিকের এক যোজন পর্যন্ত ধুলো এভাবে নষ্ট করে দিল যেমন চন্দ্রিকা অন্ধকার বিনষ্ট করে দেয়। হাঁটু অবধি পাঁচ রঙা পুষ্পের বর্ষা করে ভূমিতল এভাবে সুশোভিত করল যেন সেখানে চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে। তারপর তারা তীর্থংকরের নির্মল গুণগান করতে করতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যথাস্থানে উপবেশন করল।

পূর্ব রুচকাদ্রি নিবাসিনী নন্দা, নন্দোত্তরা, আনন্দা, নন্দিবর্দ্ধনা, বিজয়া, বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী ও অপরাজিতা নামক আট দিক কুমারীও এমন বেগবান বিমানে বসে সেখানে এল যা মনের গতির স্পর্ধা করতে পারে। তারা ভগবান ও মরুদেবী মাতাকে নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হস্তে দর্পণ নিয়ে মাঙ্গলিক গীত গান করতে করতে পূর্ব দিকে স্থিত হল।

দক্ষিণ রুচকাদ্রি নিবাসিনী সমাহারা, সুপ্রদত্তা, সুপ্রবুদ্ধা যশোধরা, লক্ষ্মীবতী,

শেষবতী, চিত্রগুপ্তা ও বসুন্ধরা নামক আট দিককুমারী আনন্দই যেন তাদের চালিত করে নিয়ে এসেছে এভাবে আনন্দ করতে করতে সেখানে এল ও পূর্বাগত দিক কুমারীদের মত জিনেশ্বর ও তাঁর মাতাকে নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হাতে কলশ নিয়ে গান করতে করতে দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পশ্চিম রুচক পর্বতস্থিত ইলাদেবী, সুরাদেবী, পৃথ্বী, পদ্মাবতী, একনাসা, অনবমিকা, ভদ্রা ও অশোকা নামক আট দিককুমারী এত দ্রুত সেখানে এল যেন ভক্তিতে তারা একে অন্যকে পরাজিত করতে চাইছে। তারাও পূর্বের মত ভগবান ও তাঁর মাতাকে নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হাতে পাখা নিয়ে গান করতে করতে পশ্চিম দিকে অবস্থিত হল।

উত্তর রুচক পর্বত হতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, বারুণী, হাসা, সর্বপ্রভা, শ্রী ও হ্রী নামক আট দিক্‌কুমারী আভিযোগিক দেবতাদের সঙ্গে রথে এত দ্রুত গতিতে সেখানে এল যেন সেই রথ বাতাসের দ্বারা নির্মিত। তারপর তারা ভগবান ও তাঁর মাতাকে পূর্বাগতাদের মত নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হাতে চামর নিয়ে উত্তর দিকে স্থিত হল।

[ক্রমশঃ

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রমণ

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. VIII No. 11 Sraman March 1981

Registered with The Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73
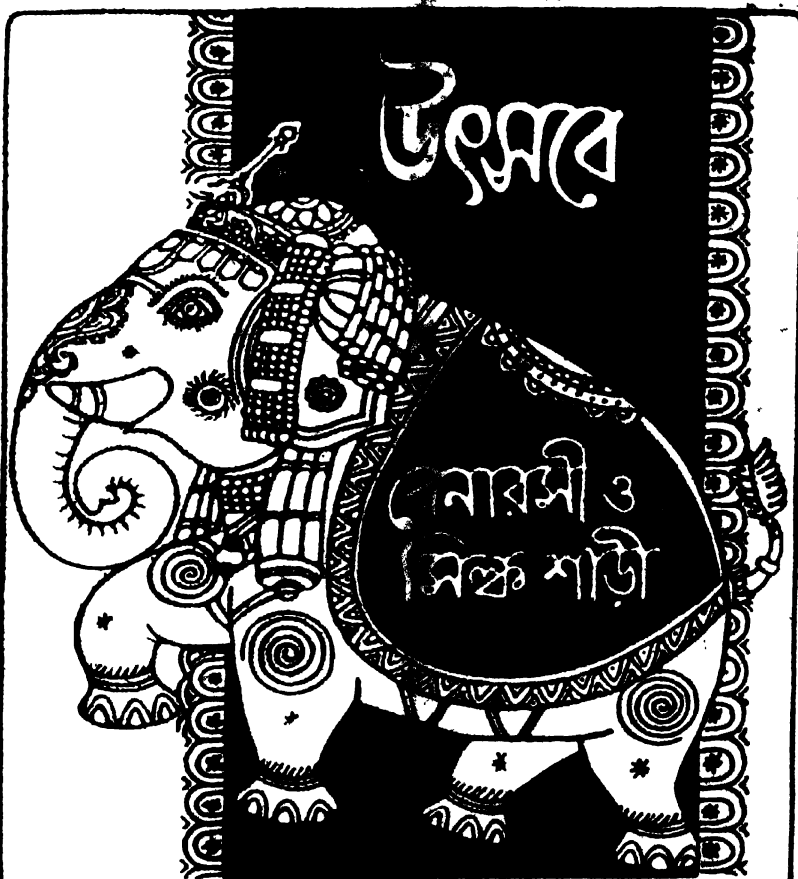
শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮৭ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
গণেশ লালওয়ানী
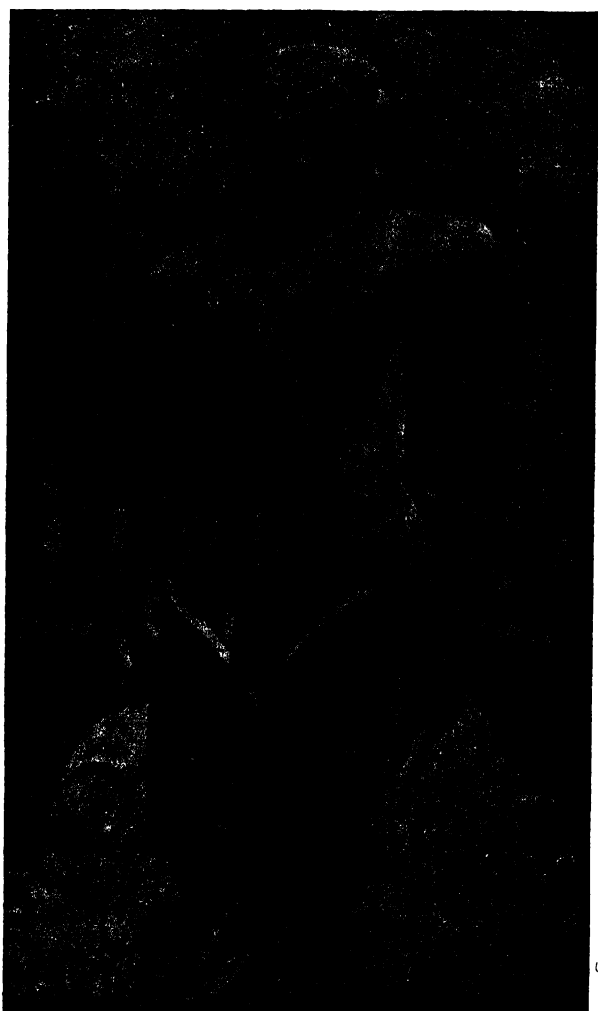
গোম্মটেশ্বর বাহুবলী

মহাতাপস গোম্মটেশ্বর বাহুবলী

ডা. ইউ. পি. শাহ্

৯৮৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত শ্রবণ বেলগোলের বিশালকায় বাহুবলীর (গোম্মটেশ্বর) মূর্তি পৃথিবীর এক বিস্ময়। সাধারণতঃ জৈনরা তীর্থংকর মূর্তির উপাসনা করেন, সর্বাধিক সম্মান দেন, জৈন মন্দিরের অন্য দেব দেবীরা তাঁদের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু তীর্থংকর না হয়েও বাহুবলী যিনি কঠোর তপস্যায় কেবল জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধ হন, তীর্থংকরের তুল্য সম্মান পান, ১ বিশেষ করে দিগম্বর জৈনদের মধ্যে। শ্রবণ বেলগোলের গোম্মটেশ্বর মূর্তির প্রতি বারো বছর ব্যবধানে মহামস্তকাভিষেক করা হয়। সেই সময় বহু ধর্মপ্রাণ জৈন সেখানে উপস্থিত হন। এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রবণ বেলগোলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর ভারতে অজ্ঞাত না হলেও, দক্ষিণ ভারতেই বাহুবলী মূর্তির উপাসনা বিশেষ জনপ্রিয়। শ্বেতাম্বরদের মধ্যে কল্পসূত্রে যেখানে ঋষভদেবের জীবনকথা বিবৃত হয়েছে সেখানে বাহুবলীর চিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়।

পাথরে, ধাতুতে বা চিত্রকলায় অঙ্কিত বাহুবলী মূর্তির কথা বলবার আগে গোড়ার দিকের জৈন সাহিত্যে যেখানে বাহুবলীর জীবন বৃত্ত বিবৃত হয়েছে তার আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে।

দেবী সুনন্দার গর্ভজাত বাহুবলী প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবের দ্বিতীয় পুত্র। বাহুবলীর বৈমাত্রেয় অগ্রজ ভরত যিনি চক্রবর্তী রাজা হন পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন ও বিনীতা হতে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। বহলী দেশের তক্ষশীলায় বাহুবলীর রাজধানী ছিল।২ দিগম্বর মতে বাহুবলীর রাজধানী ছিল পোদনস বা পোদনপুর।৩

গোড়ার দিকের দক্ষিণ ভারতের ত্রিতীর্থিক জৈন ধাতু মূর্তিতে মধ্যে পদ্মাসনে বসা জিনমূর্তি, একদিকে কায়োৎসর্গ স্থিত ছোট জিনমূর্তি, অন্যদিকে জিনমূর্তির স্থানে কায়োৎসর্গস্থিত বাহুবলী মূর্তি।

আবশ্যক নির্যুক্তি, ৩২২ এর ওপরের হরিভদ্রের আবশ্যক বৃত্তি, পৃ. ১৪৭ ও আবশ্যক চূর্ণি (আবশ্যক নির্যুক্তির একই গাথার ওপরের), পৃ. ১৮০'র মতে তক্ষশীলা বহলী বিষয়ে অবস্থিত ছিল।

জিনসেনের আদিপুরাণে (৩৫।২৭) একে পোদনস, রবিসেনের পদ্ম চরিতে (৪।৬৭, পৃ. ৬১) পোতনপুর ও জিনসেনের হরিবংশে (১১।৭৮, পৃ. ২১২) পোদন বলা হয়েছে। কন্নড়

বহু দেশ জয় করে ভরত তঁার নিরানব্বই ভ্রাতার আনুগত্য দাবী করেন। অষ্টানব্বই ভ্রাতা সংসার পরিত্যাগ করে শ্রমণ হয়ে যান কিন্তু বাহুবলী ভরতের আধিপত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। ভরত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাহুবলীর রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু রক্তক্ষয় নিবারণের জন্য উভয় ভ্রাতার মধ্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণীত হবে স্থির করা হয়। প্রথমে দৃষ্টি যুদ্ধ। উভয়ে উভয়ের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে থাকবেন। যঁার প্রথম পলক পড়বে তিনি পরাজিত হবেন। তারপর মুষ্টি যুদ্ধ। কিন্তু বাহুবলী উভয় প্রকার যুদ্ধে বিজয়ী হলেন। এতে ভীত হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ভরত তঁার চক্ররত্নের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু চক্র বাহুবলীকে আঘাত করল না। কারণ চক্র প্রয়োগকারীর আত্মীয়কে বধ করে না। বিজয় যখন নিশ্চিত সেই সময় বাহুবলী সংসারের নশ্বরতা ও রাজ্য ও চক্রবর্তীত্বের অসারতা উপলব্ধি করলেন। তাই ভরতকে মারবার জন্য তিনি যে মুষ্টি উত্তোলন করেছিলেন সেই মুষ্টি দিয়ে মাথার চুল উৎপাটিত করে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শ্রমণ হয়ে গেলেন। ভরত লজ্জায় ও অনুতাপে নত মস্তক হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। বাহুবলী সেইখানেই ধ্যান নিমগ্ন রইলেন।[৪] কায়োৎসর্গে স্থির থেকে তিনি শীতগ্রীষ্ম, জলবায়ু ও বিদ্যুতের প্রকোপ সমভাবে সহ্য করলেন। বন্য মোষ তঁার দেহের সঙ্গে তাদের দেহ ঘর্ষণ করল, হাতী তঁার হাত পা ধরে তঁাকে টানল, গাভীর দল নির্ভয়ে তঁার দেহ লেহন করল। হেমচন্দ্রের ভাষায়[৫] তিনি সম্পূর্ণভাবে লতাগুল্মে আবৃত হয়ে গেলেন। বর্ষার কাদা মাটিতে বসে যাওয়া তাঁর পায়ের কাছে অজস্র দর্ভ উৎপন্ন হল যাতে সরীসৃপ নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে লাগল ও কাক, চড়ুই

লেখকেরা এই ধারার অনুবর্তন করেছেন। দ্রষ্টব্য: কে. পি. জৈন, 'Podanapura and Taksasila', *Jain Antiquary*, Vol. III (Dec. 1937) পৃ. ৫৭ হতে। ওঁর যুক্তি তর্ক সম্মত নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে পউমচরিয়মে (৪।৩৮, পৃ. ৩৩) বাহুবলীর রাজধানী তক্ষশীলা বলা হয়েছে। শ্বেতাম্বর লেখকেরা এই ধারার অনুবর্তন করেছেন।

৪ বেশীর ভাগ গ্রন্থই বাহুবলী কোথায় ধ্যানস্থিত হয়েছিলেন তার উল্লেখ করে নি। দ্রষ্টব্য: পউমচরিয়ম, ৪।৫৪-৫৫, আবশ্যক নির্যুক্তি, গাথা ৩৪৯ ও গাথা ৩২-৩৪, এর ওপরের হরিভদ্রের আবশ্যক বৃত্তি, পৃ. ১৫১, আবশ্যক চূর্ণি, পৃ. ১৮০ হতে, আদিপুরাণ, ৩৬।১০৬-১০। হরিভদ্রের আবশ্যকবৃত্তি, পৃ. ১৫২ ও পউম চরিয়ম দৃষ্টে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে বা তারই নিকটে ধ্যানাবস্থিত হন। হেমচন্দ্রাচার্যও সেই কথা বলেন। আদিপুরাণে বাহুবলীর একক বিহারের কথা বলা হয়েছে। জিনসেন হরিবংশে (১১।৯৮-১০২. পৃ. ২১৪ হতে) বাহুবলী এক বছর কৈলাস পর্বতে তপস্যা করেছিলেন লিখেছেন।

৫ *Trisastisalakapurusacaritra*, Vol. I (ইংরেজী অনুবাদ, G. O. Series), পৃ. ৩২২-২৬।

আদি পাখীরা তাঁর লতাবৃত দেহে বাসা বাঁধল। সাপ তাঁর শরীর হতে বিলম্বিত হল। দেখে মনে হল যেন তাঁর হাজার হাত হয়েছে। পায়ের কাছের বল্মীক হতে বার হওয়া সাপ তাঁর পা নুপুরের মত বেষ্টন করল।

এক বছর এভাবে ব্যতীত হল কিন্তু অভিমানের (এক প্রকারের মোহনীয় কর্ম) জন্য তিনি কেবল-জ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। তাঁর পিতা ঋষভদেব তখন তাঁর কন্যা ব্রাহ্মী ও সুন্দরীকে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সম্বুদ্ধ করতে বললেন। তাঁর বোনেদের দ্বারা সম্বুদ্ধ হয়ে বাহুবলী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও অভিমান পরিত্যাগ করে কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।[৬]

গোড়ার দিকের দিগম্বর কিম্বদন্তীতে বোনেদের দ্বারা সম্বুদ্ধ হবার কথা নেই। সেখানে বলা হয়েছে মান ও সংক্লেশ যা বাহুবলীর কেবল-জ্ঞান লাভে বাধক হয়েছিল তা এক বছর পর ভরত যখন এসে তাঁকে বন্দনা করলেন তখন দূর হয়ে যায়।[৭] জিনসেনের আদি পুরাণে বাহুবলীর তপস্যার কাল বলা হয়েছে, বোনেদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবার কিম্বদন্তী থাকলে তিনি তার নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন।

বাহুবলীর এই কঠোর তপস্যা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়কেই তাঁর উপাসনা ও তাঁর ধ্যান নিরত লতাপরিবৃত কায়োৎসর্গ মূর্তি উপস্থাপিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৮] ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এ ধরণের কঠোর তপস্যার যে উদাহরণ পাওয়া যায় তা ঋষি বাল্মীকির যাঁর চারদিকে বল্মীক ও লতা উৎপন্ন হয়েছিল।

পণ্ডিত দলসুখ মালবানিয়া ভরত ও বাহুবলী কথানকের বিবর্তন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৯] তিনি লিখছেন: "জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি যা অঙ্গবাহ্য গ্রন্থ, ভরত ও বাহুবলীর কথানক দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত করছে। এইটাই মনে হয় এই কথানকের

---

৬ ব্রাহ্মী ও সুন্দরীর বাহুবলীর নিকটে গিয়ে তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠ (মান) হতে অবতরণের উপদেশ বসুদেব হিণ্ডী (লম্বক ৫, পৃ. ১৮৭-৮৮), হরিভদ্রের আবশ্যক বৃত্তিতে (পৃ ১৫২ হতে) উদ্ধৃত আবশ্যক ভাষ্য (গাথা ৩২-৩৭) ও আবশ্যক চূর্ণিতে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র ও পরবর্তী শ্বেতাম্বর লেখকেরা এর অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু পউম চরিয়মে (৪।৫৪-৫৫, এই মাত্র বলা হয়েছে যে তিনি তপোবনে কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। রবিসেন তাঁর পদ্ম চরিতে (৪।৬২-৯৮, পৃ. ৬২ থেকে) বিমল সূরীর পউম চরিয়মের অনুসরণ করেছেন। হরিবংশে বলা হয়েছে যে ভরত এসে যখন তাঁকে বন্দনা করেন তখন বাহুবলীর মান বিদুরিত হয়।

৭ আদিপুরাণ (ভারতীয় জ্ঞানপীঠ), ৩৬।১৮৫-৮৬, ভাগ ২, পৃ. ২১৭।

৮ হরিবংশ, ১১।৯৮-১০২, পৃ ২১৪, আদিপুরাণ, বসুদেব হিণ্ডী, আবশ্যক চূর্ণি, বাহুবলীর তপস্যার একই প্রকার বর্ণনা দেয়।

৯ *Sambodhi*, Vol 6. Nos 3-4 (1977-78), পৃ. ১-১১।

প্রাথমিক রূপ। কারণ এখানে ঋষভ ও ভরত পিতাপুত্র তার কোথাও উল্লেখ নেই। যদিও ব্রাহ্মী ও সুন্দরীকে ঋষভ সংঘের প্রমুখা আর্যিকা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা যে ঋষভের কন্যা সেকথা বলা হয়নি। একথা অবশ্যই বলা হয়েছে যে ঋষভ 'লেহাইও··· কলাও' শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মী ও সুন্দরীর নামোল্লেখ করা হয়নি। একথা বলা হয়েছে যে ঋষভ প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে তাঁর একশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাজিত করে দেন কিন্তু সেখানেও কারু নাম করা হয়নি। এই গ্রন্থে তাঁর পৌত্র মরীচির নাম কোথাও পাওয়া যায় না। ভরতের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ভরত ক্ষেত্রের উত্তরার্দ্ধে তিনি অবাড় চিলায় দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন কিন্তু সেখানে বাহুবলীর কথা কোথাও নেই। তাই মনে হয় পরবর্তীকালের লেখকেরা ঋষভের সঙ্গে ভরত, বাহুবলী, ব্রাহ্মী, সুন্দরী, মরীচি আদির সম্বন্ধ নিরূপিত করেছেন ও ঋষভ ও ভরতের কথানককে নূতন রূপ দান করেছেন।"

ভরত বাহুবলীর কথানক পউমচরিঅম্ ও আবশ্যক নির্যুক্তিতে এক রূপেই পাওয়া যায়।

বাহুবলীকে বর্তমান অবসর্পিণীর প্রথম কামদেবও বলা হয়। আদি পুরাণের গ্রন্থকারের মতে তাঁর রঙ ছিল সবুজ।[১০] হরিবংশে তাঁকে শ্যামমূর্তিঃ বলা হয়েছে ও তাঁর মরকতাচলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[১১]

গোম্মটেশ্বর বা গোমটেশ্বর নামে যে সব মূর্তি পাওয়া যায় তা বাহুবলীর। বাহুবলীকে ভুজবলী, দোরবলী, কুক্কুটেশ্বর আদি নামেও অভিহিত করা হয়।[১২] বাহুবলীর মূর্তি গোমটেশ্বর নামে কিভাবে পরিচিত হল তা বলা যায় না তবে শ্রমণ বেলগোলের বিশালকায় মূর্তিটি এই নামে সর্বপ্রথম পরিচিত হয়। কিন্তু গোড়ার দিকের কি দিগম্বর কি শ্বেতাম্বর জৈন সাহিত্যে বাহুবলীকে গোম্মট বা গোম্মটেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়নি। শ্রমণ বেলগোলের মূর্তি চামুণ্ড রায় কর্তৃক স্থাপিত হয়। ডাঃ এ. এন. উপাধ্যে বলেন চামুণ্ড রায়ের অন্য নাম ছিল গোম্মট। তাঁকে গোম্মটরায় বলা হত। তাই শ্রমণ বেলগোলের বাহুবলী মূর্তির গোম্মটেশ্বর নামের কারণ তিনি গোম্মট বা চামুণ্ড রায়ের ঈশ্বর। এম. গোবিন্দ পাই গোম্মটেশ্বর নামের যে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন তাও উল্লেখযোগ্য। বাহুবলী দেখতে অতি

১০ আদিপুরাণ, ৩৫, গাথা ৫৩।

১১ হরিবংশ, ১১।৭৬-১০২, পৃ ২১২ হতে।

১২ উপাধ্যে এ. এন., *Bharatiya Vidaya*, Vol. II. No. I, পৃ. ৪৮।

সুন্দর ছিলেন। জৈন কিম্বদন্তীতে তাঁকে কামদেবও বলা হয়েছে। পাইয়ের মতে কন্নড় ভাষায় গোম্মট অর্থ মন্মথ অর্থাৎ কামদেব।[১৩]

বাহুবলীর বিবরণ কল্পসূত্রে দেওয়া হয়নি। এর কারণ রূপে বলা যায় যে কল্পসূত্রে কেবল মাত্র জিন চরিত্রই বর্ণিত হয়েছে। জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি যা বিশদভাবে চক্রবর্তী ভরতের দিগ্বিজয়ের বিবরণ দিয়েছে তাও ভরত বাহুবলীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। এই ঘটনার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই আমরা আবশ্যক নির্যুক্তি গাথা ৩৪৯-এ ও ভাষ্য গাথা ৩২-৩৫এ। আরো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বসুদেব হিণ্ডীতে (খৃঃ পঞ্চম শতক)। বসুদেব হিণ্ডীর কাল আবশ্যক ভাষ্যের প্রায় সমসাময়িক। বিমল সূরির পউম চরিয়মের বিবরণ সংক্ষিপ্ত। এই গ্রন্থে বাহুবলীর অভিমান নষ্ট করার জন্য ব্রাহ্মী ও সুন্দরীর উল্লেখ না করায় বলা যায় এই বিবরণ পুরোপুরি শ্বেতাম্বর মতের অনুসরণ করেনি। পউম চরিয়মে এই মাত্র বলা হয়েছে যে বাহুবলী তপোবলে কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। রবিসেনের পদ্ম চরিতে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি।

আবশ্যক নির্যুক্তি গাথা ৩৩২ হতে[১৪] অন্য প্রসঙ্গে বাহুবলীর কথা বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঋষভদেব যখন তক্ষশীলায় যান তখন সন্ধ্যার পর তিনি নগরে প্রবেশ করেন। বাহুবলী পরদিন সকালে সপরিকরে তাঁর দর্শন ও বন্দনা করতে যাবেন স্থির করেন। কিন্তু ভগবান সেই রাত্রেই সেই স্থান পরিত্যাগ করে বহলিয়, অভমিল্ল, যোনক হয়ে বহলি যোনক পহলগদের নিকট ধর্ম প্ররূপণা করেন। তারপর তিনি অষ্টাপদে যান। তার কয়েক বছর পর বিনীতার নিকট পুরিমতালে আসেন। সেখানে তিনি কেবলজ্ঞান লাভ করেন।

পরদিন সকালে বাহুবলী যখন জানতে পারলেন যে ভগবান এসে চলে গেছেন তখন তিনি দুঃখিত হন। যেখানে ভগবান কায়োৎসর্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি সেখানে এসে সেই স্থানটীর পূজো করেন ও সেখানে এক ধর্মচক্র স্থাপিত করেন। বসুদেব হিণ্ডী বা পউম চরিয়মে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না তবে বৃহৎকল্প ভাষ্য, গাথা ৫৮২৪ এ এর উল্লেখ আছে।

---

১৩ পাই, এম. গোবিন্দ, 'শ্রীবাহুবলী কী মূর্তি গোম্মট ক্যোঁ কহলাতী হৈ' (হিন্দী), জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর, ভাগ ৪, সংখ্যা ২, পৃ. ১০২-১০৯। এই সমস্যার ওপর দ্রষ্টব্যঃ মিত্র, কে, পি, *Jaina Antiquary*, Vol. VI No 1. পৃ. ২৬-৩৪, শাস্ত্রী, এইচ. এ. শান্তি রাজা, জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর, ভাগ ৭ সংখ্যা ১, পৃঃ ৫১, উপাধ্যে, এ. এন., *I.H.Q.*, XVI No. 2, এম গোবিন্দ, *I. H. Q.*, XVI. No 2., পৃ. ২৭০-৮৬, আর. নরসিংহাচারিয়ার, *Epigraphia Carnatica*, Vol. VII (Reviseded), Introduction, পৃঃ ১৫-১৮।

১৪ আবশ্যক বৃত্তি, হরিভদ্র, পৃ. ১৪৪ হতে।

আগেই বলেছি দিগম্বর সম্প্রদায়ে বাহুবলী মূর্তির উপাসনা খুবই জনপ্রিয়। দাক্ষিণাত্যের তিনটী বৃহৎকায় মূর্তি ভারতীয় কলা রসিকদের সুপরিচিত। এদের মধ্যে যেটি সব চাইতে বড় তার উচ্চতা ৫´৬৬´´। কর্ণাটক রাজ্যের শ্রবণ বেলগোলে চামুণ্ডরায় কর্তৃক এটি আনুমানিক ৯৮১-৮৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।[১৫] দ্বিতীয়টীর উচ্চতা ৪১´৬´´। এটি কর্ণাটকের কারকলে[১৬] ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তৃতীয়টীর উচ্চতা ৩৫´। এটিও কর্ণাটকের বেণুরে[১৭] ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এদের আগের পাথরের ও পাহাড়ে খোদিত বাহুবলী মূর্তির কথা আমরা জানি। পরবর্তীকালের ব্রোঞ্জের ছোট বাহুবলী মূর্তিত প্রায় প্রত্যেক দিগম্বর মন্দিরেই পাওয়া যাবে।

ইলোরার বিভিন্ন গুহায় চারটী বাহুবলীর মূর্তি খৃষ্টীয় নবম শতক হতে উৎকীর্ণ হয়েছে। এখানকার একটী মূর্তিতে[১৮] বাহুবলীকে স্কন্ধে পতিত জটাসহ ধ্যান নিরত ও লতা পরিবৃত দেখানো হয়েছে। তাঁর দু'দিকে ব্রাহ্মী ও সুন্দরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণ পায়ের কাছে যুক্ত করে ভরত বসে রয়েছেন। বাহুবলীর মাথার ওপর দিব্য ছত্র, দুদিকে স্বর্গীয় বাদকদল ও গন্ধর্ব। প্রত্যক্ষতঃ এগুলিতে বাহুবলীর কেবল-জ্ঞান লাভ অঙ্কিত হয়েছে। ব্রাহ্মী ও সুন্দরীর উপস্থিতি এজন্য উল্লেখযোগ্য যে হরিবংশে, রবিসেনের পদ্মচরিতে বা জিনসেন ও গুণভদ্রের মহাপুরাণে তাঁদের উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মী ও সন্দরীর উল্লেখ শ্বেতাম্বর সাহিত্যেই পাওয়া যায় কিন্তু ইলোরার গুহা দিগম্বরদের দ্বারা খোদিত। ভরত যুক্তকরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তা গোড়ার দিকের দিগম্বর সাহিত্যের অনুরূপই। বাহুবলীর পায়ের নীচের পদ্মের সামনে যে হরিণ দেখানো হয়েছে তা লাঞ্ছন নয় বাহুবলীর কাছে মূক প্রাণীও যে নির্ভয় অবস্থান করতে পারে তা বোঝাবার জন্যই তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হরিণটী তাই বাহুবলীর তপস্যার শান্ত পরিবেশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৫ দ্রষ্টব্য শর্মা, এস. আর. 'Jaina Art in South India', *Jaina Antiquary* (Arrah, Dec. 1915) Vol I No. 3, পৃ. ৩৬ হতে, কুমার স্বামী, এ কে., *History of Indian and Indonesian Art*, পৃ. ১১৯. Krishna. M. H.. 'The Art of the Gommota Colossus', *All India Oriental Conference, 7th Report* পৃঃ ৬৯০ হতে ইত্যাদি।

১৬ কে. ভুজবলী শাস্ত্রী, 'কারকল কা গোম্মটেশ্বর' (হিন্দী). জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর, ভাগ ৫ সংখ্যা ২, পৃঃ ৯২ হতে।

১৭ এম. গোবিন্দ পাই, 'Venur and its Gommata Colossus', *Jaina Antiquary*, Vol. II No. 2., পৃঃ ৫২ থেকে।

১৮ শাহ, ইউ., পি., 'A Miniature Painting of Bahubali' *Prachya Pratibha*, Vol. III No 1., পৃঃ ১৫ থেকে। চিত্র ৩ (ইলোরা গুহা নং ৩২)

গোড়ার দিকের পাহাড়ে খোদিত বাহুবলীর এ ধরণের মূর্তি আরো পাওয়া যায়। এ ধরণের একটী মূর্তি বাদামীর জৈন গুহায় আছে, অন্যটী বৃহৎ পরিকরে খোদিত আইহোলের গুহায়। বাদামীর ১৯ মূর্তিতে স্বর্গীয় বাদকেরা অনুপস্থিত কিন্তু ব্রাহ্মী ও ভরতকে দেখানো হয়েছে। বাদামীর মূর্তিটী খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের এবং আইহোলের মূর্তির কিছু পরের।

দক্ষিণ ভারতে বাহুবলীর মূর্তি প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। তিন্নেভেলী জেলার কালুগুমালাইতে একটী গুহায় কিছু জৈন প্রতিমা উৎকীর্ণ আছে। এদের মধ্যের পার্শ্বনাথ প্রতিমা খৃষ্টীয় নবম শতকের বলা হয়। এই প্রতিমার সঙ্গেই ব্রাহ্মী ও সুন্দরীসহ বাহুবলীর একটী কায়োৎসর্গ ধ্যানস্থিত প্রতিমা উৎকীর্ণ আছে। এই বিষয়টী মদুরা জেলার কিলকুড়িতে, উত্তম মালাই গিরিগাত্রে ও তামিলনাড়ুর আন্নামালাইর সমনরকোইলের নিকটস্থ বৃহৎ প্রস্তরের গায়ে খোদিত হয়েছে।[২০] পরবর্তীকালের মহারাষ্ট্রস্থিত মাঙ্গী-তুঙ্গী ও আঙ্কাই-টাঙ্কাই গুহাতেও বাহুবলীর মূর্তি রয়েছে।

আইহোলের জৈন গুহায় নগ্ন বাহুবলী কায়োৎসর্গ মুদ্রার ধ্যানস্থিত রয়েছেন। তাঁর পায়ে ও হাতে লতা জড়িয়ে উঠেছে ও পায়ের কাছের বল্মীক হতে সাপ তাদের ফণা বার করছে। তাঁর পাশে রাজকন্যার পরিধানে মাথায় মুকুট ও গায়ে অলঙ্কার পরে ব্রাহ্মী ও সুন্দরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পেছনে বৃক্ষরাজি, মাথার ওপর উড়ন্ত গন্ধর্ব। বাহুবলী সদ্য কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ায় তারা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। মাথায় জটা সমান্তরালভাবে মাথার ওপর দিয়ে স্কন্ধে এসে পতিত হয়েছে। মুখ কিঞ্চিৎ ডিম্বাকৃতি ও পূর্ণ, চোখ আধখোলা, মূর্তিটি সুন্দরভাবে খোদিত বিশেষ করে পায়ের উপরিভাগ। স্কন্ধ গোলাকৃতি কিন্তু যেন একটা কাঠিন্য রয়েছে। এই কাঠিন্য ব্রাহ্মী ও সুন্দরীর মূর্তিতেও দেখা যায়।

উত্তর ভারতে বাহুবলীর মূর্তি তেমন সুপ্রাপ্য নয় যদিও মধ্যকালীন বাহুবলীর কিছু মূর্তি পুরুনো গোয়ালিয়র রাজ্য, দেবগড় ও খাজুরাহো হতে প্রাপ্ত হওয়া গেছে।

লেখক খাজুরাহের মন্দিরের কুলিকাস্থিত বাহুবলীর কায়োৎসর্গে দণ্ডায়মান

---

১৯ Rambach and Golish. *Golden Age of Indian Art*, Bombay, 1955. চিত্র ৩৪।

২০ দ্রষ্টব্যঃ শাহ, ইউ. পি. 'Bahubali, a Unique Bronze in the Museum', *Bulletin of the Prince of Wales Museum*, Bombay, 1953-54. No. 4, পৃ. ৩২ হতে।

একটী মূর্তি প্রকাশিত করেছেন।[২১] এই মূর্তিটি বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাহুবলী মূর্তির একটী ও এতে কিছু নূতনত্ব রয়েছে বলে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ এখানে বাহুবলীকে সিংহাসনে দণ্ডায়মান দেখান হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মী ও সুন্দরীর অতিরিক্ত দুপাশে দুটী পরিচারিকা দেখতে পাই। তৃতীয়তঃ, মাথার প্রভা মণ্ডলের দুপাশে দাঁড়িয়ে দুটী হাতী তাঁর অভিষেক করছে। মূর্তিটি আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর।

গুজরাতে দিগম্বর পরম্পরার বাহুবলী মূর্তি প্রায় দেখাই যায় না। এর কারণ পাটনে চালুক্য রাজসভায় বাদী দেবসূরীর নিকট দিগম্বর কুমুদচন্দ্রের পরাজয়ের পর ঐ রাজ্যে দিগম্বর সম্প্রদায় হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সৌরাষ্ট্রের প্রভাস পাটন[২২] হতে সুন্দর কিন্তু খণ্ডিত বাহুবলীর একটী প্রতিমা পাওয়া গেছে। পায়ের কাছের বল্মীক ও সাপ উল্লেখযোগ্য। মাথার কাছে একটী বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে যাতে ওপরিভাগ পূর্ণ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মী ও সুন্দরীকে এখানে দেখানো হয়নি। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের দিগম্বর মন্দিরে স্থিত পরবর্তীকালের বাহুবলীর ধাতু প্রতিমায় দুই বোনকে দেখানো হয়নি।

দেবগড়ে প্রাপ্ত বাহুবলীর একটী ছোট পাথরের মূর্তি দিল্লীর জৈন সংগ্রহে রয়েছে।[২৩]

পটনচেরি, অন্ধ্র প্রদেশে প্রাপ্ত বাহুবলীর একটী বৃহৎ কাল পাথরের মূর্তি হায়দ্রাবাদ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।[২৪] বাহুবলীর দুপার্শ্বোস্থিত দুই বোনের প্রতিমা জৈন সাধ্বী রূপে নয়, দুই সুন্দরী রাজকন্যা রূপে দেখানো হয়েছে। রচনার ভারসাম্য রক্ষার জন্য শিল্পী বাহুবলীর মাথার দুদিকে দীর্ঘ লতার বৃত্ত সৃজন করেছেন। বাহুবলী কেবল-জ্ঞান লাভ করেছেন বোঝাবার জন্য সম্ভবতঃ এই দুই বৃত্তের মধ্যে বিদ্যাধর অঙ্কিত করেছেন। চালুক্য যুগের এটি একটী সুন্দর কলাকৃতি এবং সম্ভবতঃ একাদশ শতকের।

আবুর বিমল বসহির সভামণ্ডপের মুখ্য অলিন্দের ছাদে ভরত ও বাহুবলীর সমগ্র কাহিনী ক্ষুদ্রাকৃতিতে অঙ্কিত হয়েছে যাতে বাহুবলীর তপস্যা ও কেবল-জ্ঞান প্রাপ্তিও দেখানো হয়েছে। মণ্ডপটী দ্বাদশ শতকের কুমারপালের মন্ত্রী দ্বারা নির্মিত।

২১ চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য শাহ, ইউ. পি. 'A Miniature Painting of Bahubali', *Prachya Pratibha*, Vol. III, No. 1, (January 1975), চিত্র ৫।

২২ ঐ, চিত্র ৪।

২৩ মারুতি নন্দন প্রসাদ তিউয়ারী *East and West* এর একটী সংখ্যায় 'Some more Images of Bahubali from North India.' প্রকাশিত করেছেন।

২৪ দ্রষ্টব্য *Prachya Pratibha*, চিত্র ২।

বাহ্‌বলীর সুন্দর একটি ধাতুমূর্তি শ্রবণ বেলগোলের মাঠের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বর্তমানে বম্বের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মূর্তিটি গোলাকার ও ২০″ দীর্ঘ। লতা তাঁর পা, জানু ও বাহ্‌ বেষ্টিত করে উঠে গেছে। চুল সমান্তরাল ভাবে পেছনের দিকে ওলটানো ও পীঠ ও কাঁধের ওপর ন্যস্ত। মুখ ঈষৎ ডিম্বাকৃতি কিন্তু পূর্ণ। কণ্ঠ সুদৃঢ় ভাবে ক্ষোদিত। বিশাল স্কন্ধ হতে পতিত দীর্ঘ বাহ্‌ শরীরের ছন্দে ছন্দিত। মূর্তিটির শিল্পচাতুর্য অনুপম। মূর্তিটি পুরুনো, সম্ভবতঃ ৮-৯ম শতাব্দীর।

শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের নিকটস্থ একটী কুলিকায় বাহ্‌বলীর একটী কায়োৎসর্গস্থিত মূর্তি অবস্থিত। তাঁর পা বেয়ে লতা উঠেছে ও ব্রাহ্মী ও সুন্দরী দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পীঠিকার লেখ অনুসারে এই মূর্তিটি ১৩৯১ বিক্রমাব্দ বা ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এটি ও আবুর বাহ্‌বলী মূর্তিটি বস্ত্র পরিহিত রূপে দেখানো হয়েছে। শ্বেতাম্বর মন্দিরে বাহ্‌বলী প্রতিমা প্রায় নাই বললেই চলে। কঠিন তপশ্চর্যার জন্য বাহ্‌বলীকে নগ্ন দেখাতে হবে অথচ উভয় সম্প্রদায়ের বৈমনস্যের জন্য শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় নগ্নমূর্তি উপাসনা করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বাহ্‌বলী মূর্তি প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহী হয়। শ্বেতাম্বরেরা নগ্ন তীর্থংকর মূর্তি স্থাপিত বা তার পূজো করেন না।

ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রেও (miniature paintings) বাহুবলী ও ভরতের কাহিনী খুব কমই চিত্রিত হয়েছে। ১৫২২ সম্বতে জৌনপুরে চিত্রিত কল্পসূত্র পৃ ৬০ এ অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। পুঁথিটি বর্তমানে বরোদার জ্ঞানমন্দিরে মুনি হংসবিজয় সংগ্রহে রক্ষিত। চিত্রটী জৈন কল্পদ্রুম ভাগ ১, চিত্র সংখ্যা ১৮১-তে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রটী চার ভাগে বিভক্ত। ওপরের প্রথম ভাগে ভরত ও বাহ্‌বলীর দৃষ্টিযুদ্ধ ও বাকযুদ্ধ দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে মুষ্টিযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধ। তৃতীয় ভাগের প্রথমাংশে ভরত বাহ্‌বলীর সামনে চক্রধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শেষাংশে বহ্‌বলীর মুকুট মাটিতে পতিত হচ্ছে। জৈন মান্যতায় চক্রবর্তীর চক্র স্বজনকে নিহত করে না। চতুর্থ বা শেষ ভাগে বস্ত্র পরিহিত বাহ্‌বলী ধ্যানাবস্থিত, তাঁর দুদিকে দুটী গাছ দেখানো হয়েছে। পায়ের কাছের বল্মীক হতে নির্গত সাপ তাঁর হাত বেষ্টন করেছে। পাখীরা তাঁর স্কন্ধে এসে বসেছে। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে দুই সাধ্বী ব্রাহ্মী ও সুন্দরী যুক্ত করে তাঁকে অভিমান পরিত্যাগ করতে বলছেন। এই চিত্রে বাহ্‌বলী ও ভরতকে সোনালী রঙে চিত্রিত করা হয়েছে।

তালপত্রের পুঁথির ওপরের একটি কাষ্ঠপট্টিকায় ভরত ও বাহ্‌বলীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও বাহ্‌বলীর প্রব্রজ্যা ও তপস্যা দেখানো হয়েছে। মোতীচন্দ্র এটি তাঁর *Jaina Miniature Paintings from Western India* গ্রন্থে প্রকাশিত করেছেন (চিত্র

১৯৯-২০০)। এখানে বাহুবলীকে বস্ত্র পরিহিত দেখানো হয়েছে কারণ পটিকাটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের এবং জৈসলমের জ্ঞান ভাণ্ডার হতে প্রাপ্ত। বর্তমানে এটি শ্রী হরিদাস সর্বালির সংগ্রহে রক্ষিত। তিনি এটি সরাভাই এম নবাবের নিকট ক্রয় করেন।

আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রে বাহুবলী পাওয়া যায় দেবসানা পাড়া ভাণ্ডারের কল্পসূত্রে। এটি বর্তমানে নূতনদিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে (নং ৭০ ৬৪)[২৫] রক্ষিত রয়েছে। এখানে বাহুবলীকে কায়োৎসর্গে ধ্যানস্থিত দেখানো হয়েছে। তাঁর হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্র পরিবৃত। হাতে অঙ্গদ ও বলয়। এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যায় যে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে করতে ধ্যান নিরত হন। এতে তাঁর মাথায় দীর্ঘ চুল হয়েছে দেখানো হয়েছে। সেখানে লতা পাতা পালক ও পাখী। এতে বোঝানো হয়েছে যে সেখানে পাখীরা বাসা বেঁধেছে। দীর্ঘ দাড়িতেও পাখী দেখিয়ে সে কথা বলা হয়েছে। বাহুবলীর দু'দিকে পায়ের কাছে পাখী পশু সাপ আদি চিত্রিত হয়েছে। পায়ের চারদিকে লতা।

বাহাবলীর মাথার দুদিকে দুজন চিত্রিত যাদের সাধ্বীর মত না দেখিয়ে জৈন সাধুর মত দেখায়। সেই দুজন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের কুক্ষীতে রজোহরণ। যেভাবে বস্ত্র পরিধান করে আছেন তাতে উভয়কে বিশেষ করে ডান দিকের ব্যক্তিকে জৈন সাধু বলেই মনে হবে। বাঁ দিকের ব্যক্তিকে সাধ্বী বলেও মনে করা যেতে পারে কারণ তার বক্ষদেশে বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়েছে। Norman Brown-এর *Miniature Paintings of Kalpra Sutra*-এ ১১৯নং চিত্রে অনুরূপ চিত্রণকে ব্রাহ্মী ও সুন্দরী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষীতে যখন ওপরের চিত্রটী বাহাবলীর তখন এদের সাধু না বলে সাধ্বী ব্রাহ্মী ও সুন্দরী বলাই উচিত। এই কল্পসূত্রটী আনুমানিক ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের।

২৫ শাহ, ইউ. পি. কর্তৃক প্রকাশিত, *Prachya Pratibha*, চিত্র ১।

মহাবীর বাণী

শ্রীবিজয়সিংহ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ১৭ ॥

পণ্ডিত সূত্র

২১৭। পণ্ডিত ব্যক্তির উচিৎ সংসার ভ্রমণের কারণরূপ দুষ্কর্ম পাশগুলির ভালো ভাবে বিচার করিয়া নিজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে সত্যের খোঁজ করা ও সমস্ত জীবে মৈত্রী ভাব রাখা।

২১৮। যে ব্যক্তি সুন্দর ও প্রিয় ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াও তাহাদের প্রতি বিমুখ হয় ও সর্ব প্রকার স্বাধীন ভোগ পরিত্যাগ করে তাহাকেই সত্য ত্যাগী বলা যায়।

২১৯। যে ব্যক্তি বাধ্য হইয়া বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার, স্ত্রী এবং শয্যাদির ভোগ করিতে পারে না সে সত্যকার ত্যাগী নয়।

২২০। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত মনুষ্যের মধ্যে থাকিয়াও সংসারের সমস্ত ছোট বড় প্রাণীকে আত্মবৎ দেখে, এই সংসারকে অশাশ্বত বলিয়া জানে ও সর্বদা অপ্রমত্তভাবে সংযমাচরণে রত থাকে, সেই ব্যক্তি মোক্ষপথের সত্য অধিকারী।

২২১। যে মমত্ববুদ্ধির পরিত্যাগ করে সে মমত্বের পরিত্যাগ করে। বাস্তবে সেই মুনিই সংসার ভয়ে ভীত যাহার কোনও প্রকার মমত্ব ভাব নাই।

২২২। কচ্ছপ যেরূপ বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিজের শরীরের ভিতর গুটাইয়া লয়, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও বিষয়ানুগামী ইন্দ্রিয়গুলিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে গুটাইয়া লন।

২২৩। যে ব্যক্তি প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ গাভী দান করে তাহার অপেক্ষা যে কিছুই দান করে না অথচ সংযমাচরণ করে তাহার সংযমাচরণ শ্রেষ্ঠ।

২২৪। জ্ঞানকে সর্বপ্রকারে নির্মল করিলে, অজ্ঞান ও মোহকে ত্যাগ করিলে ও রাগ ও দ্বেষ ক্ষয় করিলে একান্ত সুখস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২২৫। সদ্গুরু ও অনুভব সম্পন্ন বৃদ্ধের সেবা, মূর্খের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা, একাগ্রচিত্তে সৎ সাহিত্যের অভ্যাস ও তাহাদের গভীর অর্থ চিন্তা করা ও চিত্তে ধৃতিরূপ অটল শান্তি প্রাপ্ত করা ইহাই নিঃশ্রেয়সের পথ।

২২৬। সমাধিকামী তপস্বী শ্রমণ পরিমিত তথা শুদ্ধ আহার গ্রহণ করেন, নিপুণ

বুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী সঙ্গীর খোঁজ করেন ও ধ্যান করিবার যোগ্য একান্ত স্থানে বাস করেন।

২২৭। যদি নিজের সমান বা অধিক গুণ সম্পন্ন সঙ্গী না পাওয়া যায় তবে পাপ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কামভোগে সর্বদা অনাসক্ত থাকিয়া তিনি একেলাই বিচরণ করিবেন। ভুলিয়াও তিনি যেন দুরাচারীর সঙ্গ না করেন।

২২৮। সংসারে জন্মমৃত্যুর মহাদুঃখ দেখিয়া, সমস্ত প্রাণী সুখ ইচ্ছা করে' ইহা জানিয়া এবং অহিংসা মোক্ষমার্গ ইহা অবগত হইয়া সমভাবী বিদ্বান কখনো পাপকর্মে নিরত হন না।

২২৯। মূর্খ সাধক যতই কেন না চেষ্টা করুক, পাপকর্ম দ্বারা পাপকর্মের বিনাশ করিতে পারে না। তাঁহারাই বুদ্ধিমান যাঁহারা পাপকর্মের পরিত্যাগে পাপকর্মের বিনাশ করেন। তাই লোভ ও ভয় রহিত সর্বদা সন্তুষ্ট মেধাবী ব্যক্তি কোনও প্রকার পাপকর্ম করেন না।

আত্ম সূত্র

॥ ১৮ ॥

২৩০। নিজ আত্মাই নরকের বৈতরণী নদী ও কূট শাল্মলী বৃক্ষ। আবার নিজ আত্মাই স্বর্গের কামধেনু ও নন্দন বন।

২৩১। আত্মাই নিজ দুঃখ ও সুখের কর্তা ও ভোক্তা। সৎপথচারী আত্মা নিজের মিত্র ও অসৎপথচারী আত্মা নিজের শত্রু।

২৩২। নিজেই নিজেকে দমন করা উচিত। বাস্তবে নিজেকে নিজে দমন করাই কঠিন। নিজেকে নিজে দমনকারী ইহলোকে তথা পরলোকে সুখী হয়।

২৩৩। অন্যে আমাকে বধ বন্ধনাদি দ্বারা দমন করে ইহার চাইতে সংযম ও তপস্যা দ্বারা আমি নিজে নিজেকে দমন করি তাহা অনেক ভাল।

২৩৪। যে বীর দুর্জয় সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধার ওপর জয়লাভ করে সে যদি কেবলমাত্র নিজের আত্মার ওপর জয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সেইটাই হইবে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।

২৩৫। নিজ আত্মার সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিৎ। বাহিরের স্থূল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কি লাভ? আত্মা দ্বারা আত্মার ওপর বিজয়লাভকারীই বাস্তবে পূর্ণ সুখী হয়।

২৩৬। পাঁচ ইন্দ্রিয়, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ ও সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্জয় নিজের আত্মার ওপর জয়লাভ করা উচিৎ। এক আত্মাকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত জয় করা হয়।

২৩৭। শিরশ্ছেদকারী শত্রুও তত অনিষ্ট করে না যতটা দুরাচরণ রত নিজের আত্মা। দয়াহীন দুরাচরণকারীর নিজের দুরাচরণের প্রথমে জ্ঞান হয় না। কিন্তু যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সে নিজের দুরাচরণ স্মরণ করিতে করিতে পশ্চাত্তাপ করে।

২৩৮। যে সাধক এরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ী হয় কি আমি শরীর ছাড়িতে পারি কিন্তু নিজের ধর্ম শাসন ছাড়িতে পারি না, সুমেরু পর্বতকে যেমন ঘুর্ণিবাত্যা বিচলিত করিতে পারে না তাহাকেও তেমনি ইন্দ্রিয় সমূহ বিচলিত করিতে পারে না।

২৩৯। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে খুব ভালো ভাবে সমাহিত করিতে করিতে পাপ হইতে নিজ আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করা উচিৎ। পাপ হইতে অরক্ষিত আত্মা সংসার ভ্রমণ করে ও সুরক্ষিত আত্মা সংসারের সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হয়।

২৪০। শরীরকে নৌকা, জীবকে নাবিক ও সংসারকে সমুদ্র বলা হইয়াছে। এই সংসার সমুদ্রকে মহর্ষিরা অতিক্রম করেন।

২৪১। যে প্রব্রজিত হইয়াও প্রমাদের জন্য পঞ্চ মহাব্রতের উত্তমরূপে পালন করে না, নিজেকে নিগ্রহ করে না, কামভোগের রসে আসক্ত হইয়া পড়ে, সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন সমূলে নাশ করিতে পারে না।

[ক্রমশঃ

ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত্র

শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিদিশার রুচক পর্বত হতে চিত্রা, চিত্রকনকা, সতেরা ও সৌত্রামনী নামক চার দিক কুমারীও সেখানে এল। তারা পূর্বাগতাদের মত জিনেশ্বর ও জিনেশ্বর মাতাকে নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হাতে দীপ নিয়ে ঈশান আদি বিদিশায় গান করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রুচক দ্বীপ হতে রূপা, রূপাসিকা, সুরূপা ও রূপকাবতী নামক চার দিক কুমারীও সেই সময় সেখানে এল। তারা ভগবানের নাড়িনাল চার অঙ্গুল পরিমিত রেখে কাটল তারপর সেখানে গর্ত করে তা সেই গর্তে রাখল। হীরা ও রত্ন দিয়ে সেই গর্ত বুজে তার ওপর দুর্বাঘাসের আচ্ছাদন দিল। তারপর ভগবানের জন্মগৃহের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে লক্ষ্মীর নিবাসরূপ কদলী বৃক্ষের তিনটী গৃহ নির্মাণ করল। প্রত্যেক গৃহে নিজেদের বিমানের মত বিশাল ও সিংহাসন ভূষিত চতুষ্কোণ পীঠিকা নির্মাণ করল। পরে জিনেশ্বরকে হাতের অঞ্জলিতে নিয়ে ও জিনমাতাকে চতুরা দাসীর মত হাতের সহায়তা দিয়ে দক্ষিণ পীঠিকায় নিয়ে গেল। সেখানে সিংহাসনে বসিয়ে বৃদ্ধাসংবাহিকার মত সুগন্ধিত লক্ষপাক তেলে তাঁদের দেহ সংবাহিত করতে লাগল। তারপর তাদের দেহে উবটন যার সুগন্ধে সমস্তদিক সুগন্ধিত হয়েছিল লাগাল। তারপর পূর্বদিকের পীঠিকায় নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে ও নিজের মনের মত নির্মল সুবাসিত জলে উভয়কে স্নান করাল। কাষায় বস্ত্রে তাঁদের শরীর মুছিয়ে গোশীর্ষ চন্দন রসে চর্চিত করল ও উভয়কে দিব্য বস্ত্র ও বিদ্যুৎপ্রভ অলংকারাদি পরাল। তারপর তারা ভগবান ও তাঁর মাতাকে উত্তর পীঠিকায় নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসাল। সেখানে তারা আভিযোগিক দেবতাদের প্রেরণ করে ক্ষুদ্র হিমবন্ত পর্বত হতে গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠ আনাল। অরণীর দুই খণ্ড নিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করল ও হোম করার মত ছোট ছোট করা গোশীর্ষ চন্দনের কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে হবন করল। হবন শেষের ভস্মাবশেষ বস্ত্র খণ্ডে বেঁধে উভয়ের হাতে বেঁধে দিল। যদিও তীর্থংকর ও তীর্থংকর মাতা মহা মহিমাসম্পন্ন হন তবুও দিক কুমারীদের ভক্তিক্রম এরূপই ছিল। তারা ভগবানের কানের কাছে 'তুমি পর্বত তুল্য আয়ুষ্মান হও' এই বলে প্রস্তরের দুই গোলক মাটিতে ঠুকল। তারপর ভগবান ও তাঁর মাতাকে সূতিকাগৃহে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে মঙ্গল গান করতে লাগল।

তখন যেমন লগ্ন সময়ে সমস্ত বাদিত্র এক সঙ্গে বাদিত হয় সেই রকম শাশ্বত ঘণ্টা এক সঙ্গে বেজে উঠল এবং পর্বত শিখরের মত অচল ইন্দ্রাসন সহসা হৃদয় যেমন কম্পিত হয় কাঁপতে লাগল। তাতে সৌধর্মেন্দ্রর চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল, কপালে ভ্রূকুটির জন্য মুখ বিকটাকার রূপ পরিগ্রহ করল ও আন্তরিক ক্রোধের জ্বালার মত ওষ্ঠ স্পন্দিত হতে লাগল। যেন আসনকে স্থির করার জন্য তিনি এক পা তুললেন ও বললেন, আজ কে যমরাজকে আমন্ত্রণ করছে? তারপর বীরতারূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবার জন্য তিনি বায়ুতুল্য বজ্রকে তুলবার ইচ্ছা করলেন।

এভাবে সিংহের সমান ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকে দেখে যেন মানই মূর্তিমান দেহ ধারণ করে এসেছে এভাবে এসে তাঁর সেনাপতি বিনয়পূর্বক বললেন, প্রভু, আপনার যখন আমার মত অনুচর রয়েছে তখন আপনি নিজে কেন কোপ করছেন? হে জগৎপতি, আমায় আদেশ দিন আমি আপনার শত্রুকে বিনষ্ট করি।

তখন ইন্দ্র মনকে শান্ত করে অবধিজ্ঞান প্রয়োগে প্রথম তীর্থংকরের জন্ম হয়েছে অবগত হলেন। আনন্দের আবেশে মুহূর্তেই তাঁর ক্রোধাবেগ বিগলিত হল। বর্ষার জলে দাবানল নির্বাপিত হলে পর্বত যেমন শান্ত হয় তিনি সেরূপ শান্ত হয়ে গেলেন। আমায় ধিক্কার যে আমি এরূপ ভাবলাম। আমার দুষ্কৃত মিথ্যা হোক, এই বলে তিনি ইন্দ্রাসন ত্যাগ করলেন, সাত আট পদ অগ্র গমন করলেন তারপর শ্রদ্ধাঞ্জলি মস্তকে রাখলেন যাতে মনে হল তিনি যেন দ্বিতীয় রত্নমুকুট মস্তকে ধারণ করেছেন তারপর ভূমিতে হাঁটু ও মস্তক রেখে প্রভুকে নমস্কার করে রোমাঞ্চিত হয়ে এভাবে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন;

হে তীর্থনাথ, হে জগৎত্রাতা, হে কৃপারসসিন্ধু, হে নাভিনন্দন, আপনাকে নমস্কার। হে নাথ, নন্দন আদি উদ্যানে যেমন মেরুপর্বত শোভিত হয় তেমনি আপনি মতি, শ্রুত ও অবধিজ্ঞানে শোভা পাচ্ছেন। কারণ এ তিনটী আপনি জন্ম সময় হতেই প্রাপ্ত হয়েছেন। হে দেব, আজ এই ভরত ক্ষেত্র স্বর্গের অধিক অলঙ্কৃত হয়েছে কারণ তিন লোকের কিরীট রত্নের সমান আপনি তাকে আজ অলঙ্কৃত করেছেন। হে জগন্নাথ, আপনার জন্ম কল্যাণক মহোৎসব ধন্য। আজকার দিনটী সংসারে যতদিন আমি আছি ততদিন আপনার মতই বন্দনীয়। আজ আপনার জন্ম পর্বে নারক জীবরাও সুখ প্রাপ্ত হয়েছে। অর্হৎদের জন্ম কার সন্তাপকে না দূরে করে? এই জম্বুদ্বীপের ভরতক্ষেত্রে ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পত্তির মত ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বীজরূপ তাকে আপনি আপনার প্রভাবে পুনরায় অঙ্কুরিত করুন। ভগবন্, এখন আপনার চরণ আশ্রয় করে কেনা সংসার সাগর অতিক্রম করবে? কারণ নৌকোর সাহচর্যে লোহাও সমুদ্র অতিক্রম করে। আপনি ভরতক্ষেত্রে লোকের পুণ্যোদয়েই অবতরিত

হয়েছেন। এ যেন বৃক্ষহীন প্রদেশে কল্পবৃক্ষের উদ্গম, মরু প্রদেশে নদীর প্রবাহিত হওয়া।

প্রথম দেবলোকের ইন্দ্র এভাবে ভগবানের স্তুতি করে নিজের সেনাপতি নৈগমেষী নামক দেবতাকে বললেন, জম্বুদ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধে ভরতক্ষেত্রের মধ্য ভূভাগে নাভি কুলকরের ঘরে লক্ষ্মীর মত বৈভবসম্পন্না মেরু দেবীর গর্ভে প্রথম তীর্থংকরের জন্ম হয়েছে। তাঁর জন্ম স্নাত্রের জন্য সমস্ত দেবতাদের একত্রিত কর।

ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে এক যোজন বিস্তৃত ও অদ্ভুত ধ্বনিকারী সুঘোষ নামক ঘণ্টা তিনি তিন বার বাজালেন। এতে অন্য বিমানের ঘণ্টাও এভাবে বাজতে লাগল যেমন মুখ্য গীতকারের পেছনে অন্য গীতকারেরা গান করতে আরম্ভ করেন। সেই সব ঘণ্টার শব্দ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে এভাবে বর্দ্ধিত হল যেমন কুলবান পুত্রে কুলের বৃদ্ধি হয়। বত্রিস লক্ষ বিমানে ধ্বনিত হয়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনির অনুরণনে শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। দেবতারা প্রমাদগ্রস্ত ছিলেন তাই সেই শব্দ শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে তাঁরা ভাবতে লাগলেন এখন কি হবে? সজাগ দেবতাদের তখন সম্বোধিত করে সেনাপতি মেঘমন্দ্র স্বরে বললেন, দেবগণ, অনল্লঙ্ঘনীয় শাসন ইন্দ্র, দেবী আদি পরিবার সহিত তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধে, ভরতক্ষেত্রের মধ্যভাগে কুলকর নাভি রাজার কুলে আদি তীর্থংকরের জন্ম হয়েছে। তাঁর জন্ম কল্যাণক উৎসব পালনের জন্য আমার মত তোমরাও সেখানে যাবার জন্য শীঘ্র প্রস্তুত হও। কারণ এর মত উত্তম অবসর আর নেই।

সেনাপতির সেই কথা শুনে ভগবানের প্রতি ভক্তি বশতঃ কিছু দেবতা বাতাসের অভিমুখে মৃগ যেমন ধাবিত হয় তেমনি ধাবিত হলেন বা চুম্বক যেমন লোহা আকর্ষণ করে সেভাবে আকর্ষিত হয়ে চললেন। কিছু দেবতা ইন্দ্রের আদেশ বশতঃ চললেন। অন্য কিছু দেবতা দেবাঙ্গনাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নদীপ্রবাহে জলজন্তু যেমন ভেসে যায় সেভাবে ভেসে চললেন। কিছু দেবতা পবনের আকর্ষণে যেমন সুগন্ধ বিস্তৃত হয় সেভাবে মিত্র বান্ধবের আকর্ষণে চললেন। এভাবে সমস্ত দেবতা নিজেদের সুন্দর বিমানে বা অন্য বাহনে আকাশকে স্বর্গের মত সুশোভিত করে ইন্দ্রের নিকটে এলেন।

সেই সময় ইন্দ্র আভিযোগিক নামক দেবতাকে অসংভাব্য ও অপ্রতিম এক বিমান প্রস্তুত করবার আদেশ দিলেন। স্বামীর আদেশ পালনকারী সেই দেবতা সেই মুহূর্তেই ইচ্ছানুগামী এক বিমান প্রস্তুত করলেন। সেই বিমান সহস্র সহস্র রত্নস্তম্ভের কিরণ প্রবাহে আকাশকে পবিত্র করছিল। গবাক্ষ যেন তার নেত্র ছিল, বড় বড় ধ্বজা যেন তার হস্ত ছিল, বেদিকা তার দাঁত ছিল যা স্বর্ণকুম্ভের মত প্রতীত হচ্ছিল যাতে তা হাসছে বলে মনে হচ্ছিল। বিমান পাঁচশ যোজন উঁচু ছিল, একলক্ষ যোজন বিস্তৃত ছিল, সেই বিমানে উঠবার কান্তিতে তরঙ্গিত তিনটী সিঁড়ি ছিল।

তাদের হিমবন্ত পর্বতের গঙ্গা, সিন্ধু ও রোহিতাস্যা নদী বলে ভ্রম হচ্ছিল। সেই সিঁড়ির আগে বিবিধ বর্ণের রত্নের তোরণ ছিল। তাদের ইন্দ্র ধনুকের মত মনোহারী লাগছিল। সেই বিমানের মধ্যে আলিংগী মৃদঙ্গের মত বর্তুল ও সমতল কুট্টিম ছিল যা চন্দ্রমণ্ডল, দর্পণ বা উত্তম দীপিকার মত উজ্জ্বল ও প্রভাসম্পন্ন ছিল। সেই কুট্টিমে জড়িত রত্নময় শীলার কিরণজাল দেওয়ালে লাগানো চিত্রের ওপর এভাবে পতিত হচ্ছিল যেন তা যবনিকার রচনা করেছে। তার মধ্যে অপ্সরাদের মত পুত্তলিকা বিভূষিত প্রেক্ষা মণ্ডপ ছিল। সেই প্রেক্ষা মণ্ডপের মাঝখানে কমল কর্ণিকার মত সুন্দর মাণিক্যময়ী এক পীঠিকা ছিল। সেই পীঠিকা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে আঠ যোজন ও উচ্চতায় চার যোজন ছিল। তাকে ইন্দ্রের লক্ষ্মীর শয্যার মত মনে হচ্ছিল। তার ওপর এক সিংহাসন ছিল যা সমস্ত জ্যোতিষ্কের তেজপুঞ্জরূপ ছিল। সেই সিংহাসনের ওপর অপূর্ব সুন্দর বিচিত্র রত্নে খচিত ও স্বপ্রভায় আকাশ ব্যাপ্ত কারী এক বিজয় বস্ত্র দেদীপ্যমান ছিল। সেই বস্ত্রের মধ্যে হস্তীর কর্ণে যেরূপ বজ্রাঙ্কুশ থাকে সেরূপ বজ্রাঙ্কুশ ও লক্ষ্মীর হিন্দোলয়ে যেরূপ কুম্ভিক জাতিক মুক্তোমালা থাকে সেরূপ মুক্তোমালা ছিল। সেই মুক্তোমালার আশে পাশে গঙ্গার সৈকতের মত তার চাইতে অর্দ্ধ বিস্তার যুক্ত অর্দ্ধকুম্ভিক মুক্তোমালা শোভা পাচ্ছিল। সেই মুক্তোমালার স্পর্শ সুখ পাবার লোভে যেন পা উঠছে না এভাবে মৃদু মৃদু তাকে আন্দোলিত করে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই মুক্তোমালার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় বায়ু কর্ণসুখকর এক সুমিষ্ট ধ্বনি করছিল। তাতে মনে হচ্ছিল স্তুতি পাঠক যেন ইন্দ্রের নির্মল যশোগান করছে।

সেই সিংহাসনের বায়ব্য ও উত্তর দিকের মধ্যে ও উত্তর ও পূর্ব দিকের মধ্যে চৌরাসি হাজার সামানিক দেবতার ভদ্রাসন ছিল। সেই দেবতারা স্বর্গলক্ষ্মীর কিরীট রূপ ছিলেন। পূর্ব দিকে আঠ অগ্রমহিষীর আটটী আসন ছিল। তারা সহোদরের মত সমান আকার প্রকারে শোভা পাচ্ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের মধ্যে অভ্যন্তর সভার সভাসদের বারো হাজার সিংহাসন ছিল। দক্ষিণে মধ্যসভার চোদ্দ হাজার সভাসদের চোদ্দ হাজার সিংহাসন ছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যে বাহ্যপর্ষদের ষোল হাজার দেবতার ষোল হাজার সিংহাসন ছিল। পশ্চিম দিকে যেন একে অন্যের প্রতিবিম্ব এরূপ সাত হাজার সৈন্যের সাত সেনাপতি দেবতার সাতটী আসন ছিল। আর মেরু পর্বতের চারিদিকে যেমন নক্ষত্র শোভা পায় সেরকম শক্রের সিংহাসনের চারদিকে চৌরাসি হাজার আত্মরক্ষক দেবতার চৌরাসি হাজার আসন ছিল। এই প্রকার পরিপূর্ণ বিমানের রচনা করে আভিযোগিক দেবতারা ইন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। তখন ইন্দ্র সেই মুহূর্তে উত্তর বৈক্রিয়রূপ ধারণ করলেন। কারণ ইচ্ছার অনুরূপ রূপ ধারণ করা দেবতাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তারপর ইন্দ্র দিকলক্ষ্মীদের সমান আট পট্টমহিষী সহিত গন্ধর্ব ও নাট্য সৈনিকদের

কৌতুক দেখতে দেখতে সিংহাসনকে প্রদক্ষিণা দিয়ে পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়ে নিজের অভিমানের মত উচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। মাণিক্যের দেওয়ালে তাঁর প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় এরূপ মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন সহস্র কলেবর হয়েছেন। সৌধর্মেন্দ্র পূর্বাভিমুখী হয়ে নিজের আসনে উপবেশন করলেন তারপর যেন তাঁর অন্যরূপ এরূপ সামানিক দেব উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। তখন অন্যান্য দেবতারা দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজ নিজ আসনের উপরে বসলেন। কারণ স্বামীর সমীপে নিজ নিজ আসনের উল্লঙ্ঘন হয় না।

সিংহাসনে উপবিষ্ট শচীপতি ইন্দ্রের সম্মুখে দর্পণ আদি অষ্ট মাংগলিক ও মাথার উপরে চাঁদের মত উজ্জ্বল ছত্র, শোভা দিতে লাগল। দু'দিক হতে চামর এভাবে ব্যজিত হতে লাগল যেন তারা দুটি চলমান হংস। নির্ঝরে যেমন পর্বত শোভিত হয় সেরূপ ছোট ছোট পতাকা শোভিত এক হাজার যোজন উচ্চ ইন্দ্রধ্বজ বিমানের আগে শোভিত হচ্ছিল। সেই সময় কোটি কোটি সামানিক দেবতায় পরিবৃত ইন্দ্র এভাবে সুশোভিত হচ্ছিলেন যেমন নদীপ্রবাহে পরিবৃত সমুদ্র শোভিত হয়। অন্যান্য বিমানে পরিবৃত সেই বিমান এভাবে শোভা পাচ্ছিল যেমন অন্য চৈত্য পরিবৃত মূল চৈত্য শোভা পায়। বিমানদের সুন্দর মাণিক্যময় দেয়ালে একের অন্যতে প্রতিবিম্ব পড়ায় এরূপ মনে হচ্ছিল যে সমস্ত বিমান যেন একে অন্যের মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে।

চারণদের জয় জয় ধ্বনিতে, দুন্দুভি নাদে, গন্ধর্ব ও নাট্যবাহিনীর বাদিত্রে দিক সকল প্রতিধ্বনিত করে সেই বিমান ইন্দ্রের ইচ্ছায় সৌধর্মদেবলোকের মধ্য দিয়ে যেন আকাশকে বিদারিত করে চলতে আরম্ভ করল। সৌধর্মদেবলোকের উত্তর দিক হতে তীর্ধক গতিতে সেই বিমান নীচে নামতে আরম্ভ করল। বিমানটী এক লক্ষ যোজন বিস্তৃত হওয়ায় তাকে জম্বুদ্বীপের আচ্ছাদন বলে মনে হতে লাগল। সেই সময় দেবতারা একে অন্যকে এভাবে বলতে বলতে চলল—হে হস্তীবাহন, দূরে যাও, আমার সিংহ তোমার হস্তীকে সহ্য করবে না। হে অশ্বারোহী, তুমি একটু দূরে থাক কারণ আমার উষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। হে মৃগবাহন, তুমি নিকটে এসো না পাছে আমার ব্যাঘ্র তাকে আক্রমণ করে। হে সর্প বাহন, তুমি অন্যত্র যাও নচেৎ আমার বাহন গরুড় তাকে ভক্ষণ করে নিতে পারে। হে সৌম্য, আমার সম্মুখে এসে আমার গতি কেন রুদ্ধ করছ? আমার বিমান ও তোমার বিমানে কেন সংঘর্ষ ঘটাচ্ছ? হে ভদ্র, আমি পেছনে পড়ে গেছি। স্বর্গাধীপ তীব্র গতিতে চলে যাচ্ছেন তাই যদি আমার বিমান তোমার বিমানকে ধাক্কা দিয়ে থাকে ত রাগ করো না। পর্বের দিন সংকীর্ণই হয় অর্থাৎ সেদিন ভিড় হয়েই থাকে। এভাবে ইন্দ্রের অনুগামী সৌধর্ম দেবলোকের দেবতাদের মধ্যে উৎসুকতার জন্য কোলাহল হতে লাগল। সেই

সময় ইন্দ্রধ্বজ শোভিত বৃহৎ বিমান আকাশ হতে এভাবে নামতে লাগল যেমন সমুদ্র মধ্যে তরঙ্গ শিখর হতে নৌকো নামে। মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত স্বর্গকে যেন আনমিত করে, বৃক্ষের মধ্যে দিয়ে যেমন হস্তী যায় সেভাবে নক্ষত্র চক্রের মধ্য হয়ে আকাশ হতে নেমে সেই বিমান বায়ুবেগে অসংখ্য দ্বীপ সমুদ্র অতিক্রম করে নন্দীশ্বর দ্বীপে গিয়ে পৌঁছল। পণ্ডিত যেমন গ্রন্থ সংক্ষেপ করে সেরূপ ইন্দ্র সেই দ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধের মধ্যস্থিত রতিকর পর্বতের উপর সেই বিমানকে ছোট করলেন। তারপর আরো অনেক দ্বীপ ও সমুদ্র অতিক্রম করে বিমানটিকে আরো ছোট করতে করতে ইন্দ্র জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ ভরতার্দ্ধে আদি তীর্থংকরের জন্মস্থানে পৌঁছলেন। সূর্য যেমন মেরু পর্বতের প্রদক্ষিণা দেয় সেইরূপ ইন্দ্রও সেই বিমানে স্থিত হয়ে ভগবানের সূতিকাগৃহের প্রদক্ষিণা দিলেন তারপর ঘরের কোণে যেমন ধন রাখা হয় সেরূপ ঈশান কোণে সেই বিমান স্থাপিত করলেন।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি যেমন মান হতে অবতরণ করেন সেভাবে সেই বিমান হতে অবতরণ করে প্রভুর নিকটে এলেন। প্রভুকে দেখে দেবতাদের মধ্যে অগ্রণী শক্র প্রথমেই তাঁকে প্রণাম করলেন। কারণ স্বামীর দর্শন মাত্রে তাঁকে প্রণাম করা প্রথম উপহার দেওয়া। তারপর মাতা সহিত প্রভুর প্রদক্ষিণা দিয়ে তিনি পুনরায় প্রণাম করলেন। ভক্তিতে পুনরুক্তি দোষ কোথায়? দেবতারা যাঁর মস্তকাভিষেক করেছে এরূপ ইন্দ্র ভক্তির আতিশয্যে দুই হাতে শিশুকে মাথায় তুলে নিয়ে স্বামিনী মরুদেবীকে বললেন:

হে রত্নগর্ভা, জগৎ প্রকাশককে প্রকাশিত কারিণী, হে জগন্মাতা, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ধন্য। আপনি পুণ্যবতী। আপনার জন্ম সার্থক। আপনি উত্তমলক্ষণ যুক্তা ত্রিলোকের পুত্রবতী রমণীদের মধ্যে আপনি পবিত্র কারণ ধর্মোদ্ধার-কারীদের অগ্রণী, আচ্ছাদিত মোক্ষমার্গের প্রকাশক ভগবান আদি তীর্থংকরকে আপনি জন্ম দিয়েছেন। হে দেবী, আমি সৌধর্ম দেবলোকের ইন্দ্র আপনার পুত্র অর্হতের জন্মোৎসব করতে এসেছি। তাই আপনি আমায় ভয় পাবেন না।

তারপর ইন্দ্র অবস্বাপিনী নিদ্রায় মাতা মরুদেবীকে নিদ্রিত করলেন। ওঁর পাশে তাঁর পুত্রের এক প্রতিরূপ রাখলেন ও নিজে পাঁচ রূপ ধারণ করলেন। কারণ যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা অনেকরূপে প্রভুর ভক্তি করবার ইচ্ছা রাখেন। সেই পাঁচ রূপের এক রূপে ভগবানের নিকটে গিয়ে নম্র হয়ে প্রণাম করে তিনি বললেন, হে ভগবন্, আজ্ঞা দিন। এই বলে সেই কল্যাণকারী ভক্তিমান ইন্দ্র নিজের গোশীর্ষ চন্দন বিলেপিত দুই হাতে যেন মূর্তিমান কল্যাণকেই তিনি তুলছেন এভাবে ভুবনেশ্বর ভগবানকে তুললেন। একরূপে জগতের তাপ নাশকারী ছত্র সমান জগৎপতির মাথায় পিছনে দাঁড়িয়ে ছত্র ধারণ করলেন। স্বামীর দুই দিকে দুই বাহুর মত দুইরূপে সুন্দর চামর

ধারণ করলেন ও একরূপে মুখ্য দ্বারপালের মত বজ্রধারণ করে ভগবানের অগ্রভাগে অবস্থান করলেন। তারপর জয় জয় শব্দে আকাশ গুঞ্জিত করে দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আকাশের মত নির্মলমনা ইন্দ্র পাঁচরূপে আকাশপথে চলতে আরম্ভ করলেন। তৃষাতুর পথচারীর দৃষ্টি যেমন অমৃত সরোবরের ওপর পতিত হয় সেরূপ উৎসুক দেবতাদের দৃষ্টি ভগবানের অদ্ভুত রূপের ওপর পতিত হল। ভগবানের অদ্ভুত রূপ দেখবার জন্য অগ্রগামী দেবতারা তাদের চোখ পেছনে হোক চাইলেন। দুপাশে স্থিত দেবতারা স্বামী দর্শনে তৃপ্ত হয়নি এভাবে যেন স্তম্ভিত হয়েছে এরূপ তাঁদের চোখ অন্য দিকে ঘোরাতে পারলেন না। পেছনের দেবতারা ভগবানকে দেখবার জন্য আগে আসতে চাইলেন এজন্য তাঁরা তাঁদের স্বামী ও মিত্রকেও পেছনে ছেড়ে আগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানকে নিজের হৃদয়ের কাছে রেখে যেন হৃদয়ে করেই মেরু পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাণ্ডুক বনে দক্ষিণ চুলিকার ওপর নির্মলকান্তিসম্পন্ন অতিপাণ্ডুক বলা নামক শিলা খণ্ডে অর্হৎস্নাত্র যোগ্য সিংহাসনের ওপর পূর্বদিগাধিপতি ইন্দ্র সানন্দিত চিত্তে প্রভুকে কোলে নিয়ে বসলেন।

যে সময়ে সৌধর্মেন্দ্র মেরু পর্বতে এলেন সেই সময় মহাঘোষা ঘণ্টা নাদে ভগবৎ জন্ম অবগত হয়ে আটাস লক্ষ দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ত্রিশূলধারী বৃষভবাহন ঈশান কল্পাধিপতি ঈশানেন্দ্র আভিযোগিক দেবতাদের দ্বারা নির্মিত পুষ্পক বিমানে বসে দক্ষিণ দিকের পথে ঈশানকল্প হতে অবতরণ করে তীর্যকগতিতে নন্দীশ্বর দ্বীপে গিয়ে সেই দ্বীপের ঈশান কোণস্থিত রতিকর পর্বতে সৌধর্মেন্দ্রের মত নিজের বিমানকে ছোট করে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের নিকটে এলেন।

সনৎকুমার নামক ইন্দ্রও নিজের বার লক্ষ বিমানবাসী দেবতা সহ সুমন নামক বিমানে বসে সেখানে এলেন।

মহেন্দ্র নামক ইন্দ্র আট লক্ষ বিমানবাসী দেবতাসহ শ্রীবৎস নামক বিমানে বসে মনের মত শীঘ্র গতিতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মেন্দ্র নামক ইন্দ্র চার লক্ষ বিমানবাসী দেবতাসহ .নন্দ্যাবর্ত নামক বিমানে প্রভুর নিকটে এলেন।

লান্তক নামক ইন্দ্র পঞ্চাশ হাজার বিমানবাসী দেবতাসহ কামগব নামক বিমানে বসে জিনেশ্বরের নিকটে এলেন।

শুক্র নামক ইন্দ্র চল্লিশ হাজার বিমানবাসী দেবতাসহ পীতিগম নামক বিমানে মেরু শিখরে এলেন।

সহস্রার নামক ইন্দ্র ছহাজার বিমানবাসী দেবতা সহ মনোরম নামক বিমানে বসে জিনেশ্বরের নিকটে এলেন।

আনত-প্রাণত দেবলোকের ইন্দ্র চার শ' বিমানবাসী দেবতাসহ বিমল নামক বিমানে বসে এলেন।

আরণাচ্যুত দেবলোকের ইন্দ্র তিনশ বিমানবাসী দেবতার সঙ্গে অতি বেগবান সর্বতোভদ্র বিমানে বসে এলেন।

সেই সময় রত্নপ্রভা পৃথিবীর ভেতরে বাসকারী ভুবনপতি ও ব্যন্তর দেবতাদের ইন্দ্রের আসন কম্পিত হল। চমরচঞ্চা নামক নগরে সুধর্মা সভায় চমর নামক সিংহাসনে চমরাসুর বসেছিলেন। তিনি অবধিজ্ঞানে ভগবানের জন্ম অবগত হয়ে সমস্ত দেবতাদের সেকথা বিজ্ঞাপিত করার জন্য নিজের দ্রুম নামক সেনাপতিকে ওঘঘোষা নামক ঘণ্টা বাদিত করতে বললেন। তারপর তিনি চৌষট্টী হাজার সামানিক দেবতা, তেত্রীস ত্রায়স্ত্রিংশক দেবতা, চার লোকপাল, পাঁচ অগ্রমহিষী, আভ্যন্তর, মধ্য ও বাহ্য এই তিন সভার দেবতা, সাত প্রকার সৈন্য ও সাত সেনাপতি চারদিকের চৌষট্টি চৌষট্টি হাজার আত্মরক্ষক দেব ও অন্য উত্তম ঋদ্ধিসম্পন্ন অসুর কুমার দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আভিযোগিক দেবতাদের দ্বারা তৎকাল নির্মিত পাঁচশ যোজন উঁচু, বৃহৎ ধ্বজায় সুশোভিত ও পঞ্চাশ হাজার যোজন বিস্তৃত বিমানে বসে ভগবানের জন্মোৎসব করবার ইচ্ছায় বহির্গত হলেন। সেই চমরেন্দ্রও শক্রেন্দ্রের মত নিজের বিমানকে পথে ছোট করে স্বামীর আগমনে পবিত্র মেরুপর্বতের শিখরে এলেন।

বলিচঞ্চা নামক নগরের ইন্দ্র বলিও মহৌঘস্বরা নামক বৃহৎ ঘণ্টা বাদিত করালেন। ওঁর মহাদ্রুম নামক সেনাপতির আমন্ত্রণে আগত ষাঠ হাজার সামানিক দেবতা, তার চার গুণ অর্থাৎ ২৪০০০০ অঙ্গ রক্ষক দেবতা ও অন্য ত্রায়স্ত্রিংশক ইত্যাদি দেবতাসহ তিনি চমরেন্দ্রের মত অমন্দ আনন্দমন্দির রূপ মেরু পর্বত শিখরে এলেন।

নাগকুমারদের ধরণ নামক ইন্দ্র মেঘস্বরা নামক ঘণ্টা বাদিত করালেন। তাঁর ছ হাজার পদাতিক সেনার সেনাপতি ভদ্রসেনের কথায় আগত ছ'হাজার সামানিক দেবতা, তার চারগুণ অর্থাৎ ২৪০০০ আত্মরক্ষক দেবতা, নিজের ছয় পট্টদেবী ও অন্য নাগকুমার দেবতাসহ তিনি ইন্দ্রধ্বজে শোভিত পঁচিশ হাজার যোজন বিস্তৃত ও আড়াই শ যোজন উঁচু বিমানে বসে ভগবানের দর্শন করতে উৎসুক হয়ে ক্ষণমাত্রে মন্দারাচল পর্বত শিখরে এলেন।

ভূতানন্দ নামক নাগেন্দ্র মেঘস্বরা নামক ঘণ্টা বাদিত করালেন ও দক্ষ নামক সেনাপতি দ্বারা সামানিক দেবতা আদিকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনি আভিযোগিক দেবতাদের দ্বারা নির্মিত বিমানে সকলের সঙ্গে বসে তিন লোকের নাথে যে সনাথ হয়েছে এরূপ মেরু পর্বতে এলেন।

তারপর বিদ্যুৎকুমারদের ইন্দ্র হরি ও হরিসহ, সুবর্ণ কুমারদের ইন্দ্র বেণুদেব ও

বেণুদারী, অগ্নিকুমারদের ইন্দ্র অগ্নিশিখ ও অগ্নিমানব, বায়ুকুমারদের ইন্দ্র বেলম্ব ও প্রভঞ্জন, স্তনিতকুমারদের ইন্দ্র সুঘোষ ও মহাঘোষ, উদধিকুমারদের ইন্দ্র জলকান্ত ও জলপ্রভ, দ্বীপ কুমারদের ইন্দ্র পূর্ণ ও অবশিষ্ট ও দিক্‌কুমারদের ইন্দ্র অমিত ও অমিতবাহন এলেন।

ব্যন্তর দেবতাদের মধ্যে পিশাচদের ইন্দ্র কাল ও মহাকাল, ভূতদের সুরূপ ও প্রতিরূপ, যক্ষদের ইন্দ্র পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্র, রাক্ষসদের ইন্দ্র ভীম ও মহাভীম, কিন্নরদের ইন্দ্র কিন্নর ও কিম্পুরুষ, কিম্পুরুষদের ইন্দ্র সৎপুরুষ ও মহাপুরুষ, মহোরগদের ইন্দ্র অতিকায় ও মহাকায়, গন্ধর্বদের ইন্দ্র গীতরতি ও গীতযশাঃ, অপ্রজ্ঞপ্তি ও পঞ্চপ্রজ্ঞপ্তি আদি ব্যন্তরদের অন্য আট নিকায় (যাদের বাণ ব্যন্তর বলা হয়)-এর ষোল ইন্দ্র যাঁদের মধ্যে অপ্রজ্ঞপ্তির ইন্দ্র সন্নিহিত ও সমানক, পঞ্চপ্রজ্ঞপ্তির ইন্দ্র ধাতা ও বিধাতা, ঋষিবাদিতদের ইন্দ্র ঋষি ও ঋষিপালক, ভূতবাদিতদের ইন্দ্র ঈশ্বর ও মহেশ্বর, ক্রন্দিতদের ইন্দ্র সুবৎসক ও বিশালক, মহাক্রন্দিতদের ইন্দ্র হাস ও হাসরতি, কুষ্মাণ্ডকের ইন্দ্র শ্বেত ও মহাশ্বেত, পাবকদের ইন্দ্র পাবক ও পাবকপতি ও জ্যোতিষ্কদের সূর্য ও চন্দ্র এই দুই নামের অসংখ্য ইন্দ্র এভাবে মোট চৌষট্টি ইন্দ্র একসঙ্গে মেরু শিখরে এলেন।

তারপর অচ্যুতেন্দ্র জিনেশ্বরের জন্মোৎসবের উপকরণ আনবার জন্য অভিযোগিক দেবতাদের আদেশ দিলেন। তাঁরা তখন ঈশান দিকে গেলেন। সেখানে বৈক্রিয় সমুদ্‌ঘাতে মুহূর্ত মধ্যে উত্তম পুদ্‌গাল পরমাণু আকর্ষণ করে তাঁরা সুবর্ণের, রজতের, রত্নের, সুবর্ণ ও রজতের সুবর্ণ ও রত্নের, সুবর্ণ রজত ও রত্নের, রজত ও রত্নের ও ওইপ্রকার মৃত্তিকার এভাবে আট রকমের, প্রত্যেকের এক হাজার আট এক যোজন উঁচু (মোট ৮০৬৪) সুন্দর কলস নির্মাণ করলেন। কলসের সংখ্যার অনুপাতে আট প্রকার পদার্থের ঝারি, দর্পণ, রত্নকরণ্ডিকা, সুপ্রতিষ্ঠক, থালা, রাত্রিকা ও পুষ্পের ডালি— এসব প্রত্যেকের ৮০৬৪ করে ৫৬৪৪৮ বাসন ও কলস সহ ৬৪৫১২ যেন পূর্বেই তৈরী করা ছিল এভাবে শীঘ্র তৈরী করে সেখানে নিয়ে এলেন।

তারপর অভিযোগিক দেবতারা সেই কলস তুলে নিয়ে গেলেন ও তাদের ক্ষীর সমুদ্রের জলে বর্ষার জলের মত ভরে নিলেন ও সেখান হতে পুণ্ডরীক, উৎপল ও কোকনদ জাতীয় কমল তুলে নিয়ে এলেন যাতে ইন্দ্র সহজেই বুঝতে পারেন যে তাঁরা ক্ষীর সমুদ্রের জল নিয়ে এসেছেন। ভারী জলাশয় (কূপ, বাপী বা সরোবর) হতে জল ভরবার সময় যেভাবে কলস ওঠায় দেবতারাও সেই ভাবে কলস হাতে নিয়ে পুষ্করবর সমুদ্র তটে এলেন ও সেখান হতে পুষ্কর জাতির কমল তুললেন। তারপর তাঁরা মগধাদি তীর্থস্থলে গেলেন ও সেখান হতে জল ও মৃত্তিকা নিলেন যেন তাঁরা আরো অধিক কলস নির্মাণ করতে চাচ্ছেন। বস্তু ক্রয়কারী যেমন নমুনা নেয় সেরূপ তাঁরা গঙ্গা আদি মহানদীর জল নিলেন। ক্ষুদ্র হিমবন্ত পর্বত হতে সিদ্ধার্থের (সাদা সরষের)

ফুল শ্রেষ্ঠ সুগন্ধির বস্তু ও সমস্ত প্রকারের ওষধি নিলেন। ওই পর্বত হতে তাঁরা পদ্ম নামক সরোবর হতে নির্মল সুগন্ধিত ও পবিত্র জল ও কমল নিলেন। একই কাজের জন্য তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন এজন্য যেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রতিস্পর্দ্ধা করে দ্বিতীয় বর্ষধর পর্বত স্থিত সরোবর হতে পদ্ম আদি সংগ্রহ করলেন। সমস্ত ক্ষেত্র হতে, বৈতাঢ্য পর্বত হতে ও অন্য বিজয় হতে অতৃপ্ত দেবতারা প্রভুর প্রসাদের মত জল ও কমল নিলেন। বক্ষার নামক পর্বত হতে তাঁরা অন্য পবিত্র ও সুগন্ধিত বস্তু এভাবে গ্রহণ করলেন যেন তাঁদের জন্যই তা সেখানে রক্ষিত ছিল। আলস্যহীন সেই দেবতারা দেবকুরু ও উত্তরকুরুক্ষেত্রের তড়াগের জলে কলস এভাবে ভরলেন যেন শ্রেয় দ্বারা নিজেদের আত্মাকেই পূর্ণ করলেন। ভদ্রশাল, নন্দন ও পাণ্ডুক বন হতে তাঁরা গোশীর্ষ চন্দন আদি বস্তু সংগ্রহ করলেন। এভাবে গন্ধকার যেমন সমস্ত সুগন্ধিত দ্রব্য একত্রিত করে সেরূপ সুগন্ধিত দ্রব্য ও জল সংগ্রহ করে তারা সেই মুহূর্তেই মেরু পর্বতে এলেন।

তারপর দশ হাজার সামানিক দেবতা, চল্লিশ হাজার আত্মরক্ষক দেবতা, তেত্রিশ ত্রায়স্ত্রিংশক দেবতা, তিন সভার সমস্ত দেবতা, চার লোকপাল, সাত বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে আরণ ও অচ্যুত দেবলোকের ইন্দ্র পবিত্র হয়ে ভগবানকে স্নান করাবার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে অচ্যুতেন্দ্র উত্তরাসঙ্গ ধারণ করে নিঃসঙ্গ ভক্তিতে প্রস্ফুটিত পারিজাত আদি ফুল অঞ্জলিতে নিয়ে সুগন্ধিত ধূপের ধোঁয়ায় ধূপিত করে ত্রিলোক নাথের সম্মুখে রাখলেন। তখন দেবতারা ভগবানের নৈকট্যের জন্য আনন্দে যেন হাসছে এরূপ ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত সুগন্ধিত জলের কলস সেখানে এনে রাখলেন। সেই জলপূর্ণ কলসের শীর্ষে ভ্রমর গুঞ্জিত কমল ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন তারা ভগবানের প্রথম স্নাত্র মঙ্গল পাঠ করছে। কলসগুলো এরূপ মনে হচ্ছিল যেন তারা পাতাল-কলস ও প্রভুকে স্নান করাবার জন্যই যেন তাদের আনা হয়েছে। নিজের সামানিক দেবতা সহ অচ্যুতেন্দ্র সেই এক হাজার আট কলস এভাবে উত্তোলিত করলেন যেন তা তাঁর সম্পত্তির ফল। ঊর্দ্ধে উত্তোলিত বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগে স্থিত কলসগুলি মৃণাল যুক্ত কমলকলিকার ভ্রম উৎপন্ন করছিল। তারপর অচ্যুতেন্দ্র নিজের মস্তকের মত সেই কলসকে ঈষৎ আনমিত করে জগৎপতিকে স্নান করাতে আরম্ভ করলেন।

সেই সময় কিছু দেবতা গুহায় উত্থিত প্রতিধ্বনির দ্বারা মেরুপর্বতকে বাচাল করে আনক নামক মৃদঙ্গ বাদিত করতে আরম্ভ করলেন। ভক্তিতে তৎপর অন্য দেবতারা সাগর মন্থন কালীন ধ্বনির মত ধ্বনিকারী দুন্দুভী বাজাতে লাগলেন। তারপর অন্য দেবতা ভক্তিতে উন্মাদ হয়ে সাগর তরঙ্গে প্রতিহত পবনের মত আকুল ধ্বনিকারী ঝাঁঝ বাজাতে লাগলেন। কিছু দেবতা যেন ঊর্দ্ধলোকে জিনাদেশ বিস্তার করছে

এভাবে উচ্চ মুখসম্পন্ন ভেরী উচ্চ স্বরে বাজাতে লাগলেন। অন্য দেবতারা মেরু পর্বতের শিখরে আরূঢ় হয়ে গোপগণ যেমন শৃঙ্গ ধ্বনি করে সেরূপ উচ্চনিঃস্বনকারী কাহল নামক বাদ্য বাজাতে লাগলেন। কিছু দেবতা (ভগবানের জন্মাভিষেক) ঘোষণা করার জন্য দুষ্ট শিষ্যকে যেভাবে হাত দিয়ে পেটা হয় সেভাবে হাত দিয়ে মুরজ নামক বাদ্যকে পিটতে লাগলেন। কিছু দেবতা সেখানে আগত অসংখ্য সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাকে হরণ কারী সুবর্ণ ও রৌপ্যের ঝালর বাজাতে লাগলেন। অন্য কিছু দেবতা মুখে যেন অমৃতের গণ্ডুষ ভরা আছে এভাবে নিজেদের উন্নত মুখকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। এভাবে দেবতাদের দ্বারা বাদিত বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যের প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাদক না হয়েও এক বাদ্য হয়ে গেল।

চারণ মুনিরা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে জগন্নাথ, হে সিদ্ধগামী, হে কৃপাসাগর, হে ধর্ম প্রবর্তক, তোমার জয় হোক! তুমি সুখী হও!

অচ্যুতেন্দ্র ধ্রুবপদ, উৎসাহ, স্কন্ধক, গলিত ও বস্তুবদন নামক মনোহর গদ্য ও পদ্য দ্বারা ভগবানের স্তুতি করলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে নিজ পরিবারের দেবতা সহ ভুবনভর্তা (আদিনাথের) ওপর কলসে ভরা জল ঢালতে লাগলেন। ভগবানের মাথার ওপর জলধারা বর্ষণকারী কলশগুলি মেরু পর্বতের শিখরে বারি ধারা বর্ষণকারী মেঘের মত মনে হতে লাগল। ভগবানের মাথার দুদিকে আনত দেবতাদের কলশ মাণিক্য মুকুটের শোভা ধারণ করল। এক যোজন বিস্তৃত কলশমুখ হতে নির্গত জলধারা পর্বত কন্দর হতে নির্গত স্রোতস্বিনীর মত মনে হতে লাগল। প্রভুর মস্তকে আহত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া জলকণা ধর্মরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরের মত প্রতিভাত হল। প্রভুর শরীরে পতিত হতেই ক্ষীরোদধির সুন্দর জল বিস্তৃত হয়ে মাথার ওপর শ্বেত ছত্রের মত, ললাটে কান্তিমান ললাট ভূষণের মত, কর্ণের প্রান্ত দেশে বিশ্রান্ত নেত্রের কান্তির মত, গণ্ডদেশে কর্পূরের পত্রাবলীর মত, ওষ্ঠে স্মিত হাস্যের কান্তি কলাপের মত, কণ্ঠ ভাগে মুক্তা মাল্যের মত, স্কন্ধ দেশে গোশীর্ষ চন্দনের অনুলেপের মত, বাহু, হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ বস্ত্রের মত মনে হতে লাগল।

চাতক যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল গ্রহণ করে, সেই রকম কিছু দেবতা স্নানের সেই জল মাটিতে পড়তেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন, কিছু দেবতা মারবাড়ের অধিবাসীর মত এমন জল আর কোথায় পাব বলে সেই জল নিজের মাথায় ঢালতে লাগলেন। অন্য কিছু দেবতা গ্রীষ্মের উত্তাপে ব্যাকুল হস্তীর মত আনন্দিত মনে সেই জলে নিজের শরীর সিঞ্চন করতে লাগলেন। মেরু পর্বতের শিখরে দ্রুত প্রসারিত হয়ে সেই জলধারা চারিদিকে হাজার নির্ঝরের বিভ্রম উৎপন্ন করে ক্রমশঃ পাণ্ডুক, সৌমনস, নন্দন ও ভদ্রশাল উদ্যানে বিস্তৃত হয়ে মহতী নদীর রূপ ধারণ করল। স্নান করাতে করাতে কলসের মুখ নীচু হয়ে গেল তা দেখে

মনে হল তাদের স্নান করাবার জলরূপ সম্পত্তি কম হয়ে যাওয়াতে তারা যেন লজ্জিত হয়েছে। সেই সময় ইন্দ্রের আজ্ঞায় সঞ্চরমান আভিযোগিক দেবতারা খালি কলস অন্য পূর্ণ কলসের জলে পূর্ণ করতে লাগল। এক হাত হতে অন্য হাতে এভাবে অনেক হাতে যাবার জন্য সেই কলসদের বিত্তবানদের বালকদের মতো মনে হল। নাভিরাজপুত্রের নিকট রক্ষিত কলসের সারি আরোপিত স্বর্ণ কমলের মালার মত সুশোভিত হচ্ছিল। শূন্য কুম্ভে জল ঢালবার জন্য যে শব্দ উঠছিল তাতে মনে হচ্ছিল কুম্ভগুলি যেন প্রভুর স্তুতি করছে। দেবতারা সেই ভরা কলসে পুনরায় প্রভুর অভিষেক করতে লাগলেন যক্ষ যেমন চক্রবর্তীর নিধান-কলশ ভরে সেরূপ প্রভুর স্নান করানোতে খালি ইন্দ্রের কলশ দেবতারা ভরতে লাগলেন। বার বার খালি হতে হতে বার বার ভরে দিতে দিতে বার বার নিয়ে যেতে ও আসতে তাদের জল তোলার জন্য যন্ত্রারূঢ় কলসের মত মনে হতে লাগল। এভাবে অচ্যুতেন্দ্র এক কোটি কলশে প্রভুর স্নান করালেন ও নিজেকে পবিত্র করলেন। এও এক আশ্চর্য।

তারপর আরণ ও অচ্যুত দেবলোকের অধিপতি অচ্যুতেন্দ্র দিব্য গন্ধকাষায় বস্ত্রে প্রভুর শরীর মুছিয়ে দিলেন ও সেই সঙ্গে নিজের আত্মাকেও মুছলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আকাশের চক্রবাল সূর্যমণ্ডল স্পর্শে যেমন শোভিত হয় সেইরূপ গন্ধ কাষায়ী বস্ত্র প্রভুর শরীর স্পর্শ করে শোভিত হল। মুছবার পর ভগবানের শরীর স্বর্ণসারের সর্বস্বের মত স্বর্ণগিরির একভাগে নির্মিত এরূপ মনে হতে লাগল।

তারপর আভিযোগিক দেবতারা গোশীর্ষ চন্দন রসের কর্দম সুন্দর ও বিচিত্র পাত্রে পূর্ণ করে অচ্যুতেন্দ্রের নিকট রাখলেন। ইন্দ্র ভগবানের শরীরে সেই গোশীর্ষ চন্দন এভাবে লেপন করতে আরম্ভ করলেন যেভাবে চন্দ্রমা নিজের চন্দ্রিকায় মেরু শিখর লেপন করে। সেই সময় কিছু দেবতা পট্ট বস্ত্র ধারণ করে— যা হতে ধূপের ধূঁয়া উঠছে এরূপ ধূপদানি হাতে নিয়ে প্রভুর চারদিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। যাঁরা ধূপ দিচ্ছিলেন তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা স্নিগ্ধ ধূপের রেখায় মেরু পর্বতের মত দ্বিতীয় শ্যামবর্ণ চূলিকা নির্মাণ করছেন। যাঁরা প্রভুর ওপর সফেদ ছত্র ধারণ করেছিলেন তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা আকাশ রূপ সরোবর কমলময় করছেন। যাঁরা চামর দোলাচ্ছিলেন তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন প্রভুর দর্শনের জন্য নিজ আত্মীয় পরিজনদের ডাক দিচ্ছেন। যাঁরা কমর বন্ধ এঁটে অস্ত্র ধারণ করে প্রভুর চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের প্রভুর অঙ্গ রক্ষক বলে মনে হচ্ছিল। যাঁরা স্বর্ণ ও মাণিক্যের পাখা দিয়ে ভগবানকে বীজিত করছিলেন তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন আকাশে চমকিত বিদ্যুতের লীলা দেখাচ্ছেন। যাঁরা আনন্দে বিচিত্র বর্ণের দিব্য পুষ্পের বর্ষা করছিলেন তাঁদের বণিক বলে মনে হচ্ছিল। কিছু দেবতা অত্যন্ত সুগন্ধিত দ্রব্য চূর্ণ করে চারিদিকে নিক্ষেপ করেছিলেন যেন তাঁরা নিজের নিজের পাপ নিষ্কাশিত করে ফেলে

দিচ্ছেন। কিছু দেবতা স্বর্ণ উৎক্ষীপ্ত করেছিলেন যেন তাঁরা স্বামী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মেরু পর্বতের ঋদ্ধি বর্দ্ধিত করছেন। কিছু দেবতা মহার্ঘ রত্ন বৃষ্টি করছিলেন, সেই রত্ন আকাশ হতে নামা তারকার মত মনে হচ্ছিল। কিছু দেবতা নিজেদের সুমিষ্ট গলায় গন্ধর্বদের লজ্জিত করে নূতন গ্রামে (তার, মধ্য ও ষড়জ আদি স্বরে) ও রাগে ভগবানের গুণগান করছিলেন। কিছু দেবতা মণ্ডিত, ঘন ও ছিদ্রযুক্ত বাদ্য বাদিত করতে লাগলেন। কারণ ভগবানের ভক্তি নানাভাবে করা হয়। কিছু দেবতা নিজেদের চরণপাতে মেরু কম্পিত করে নৃত্য করছিলেন যেন তাঁরা মেরুকেই নৃত্যপর করে দিয়েছিলেন। কিছু দেবতা নিজ নিজ দেবীসহ নানাপ্রকারের হাবভাব প্রদর্শন করে উচ্চ ধরণের নাটক দেখাতে লাগলেন। কিছু দেবতা আকাশে উড়ছিলেন, তাঁদের গরুড় পক্ষীর মত মনে হচ্ছিল। কিছু ক্রীড়ায় কুক্কুটের মত মাটিতে উৎপতিত হচ্ছিলেন। কিছু দেবতা নটের মত সুন্দর চাল প্রদর্শিত করছিলেন। কিছু খুসীতে সিংহের মত সিংহনাদ করছিলেন, কিছু হস্তীর মত উচ্চ বৃংহতি নাদ করছিলেন, কিছু আনন্দে অশ্বের মত হ্রেষারব। কিছু রথ চক্রের শব্দের মত ঘর্ঘর শব্দ করছিলেন। কিছু বিদূষকের মত হাস্য উৎপন্নকারী চার প্রকারের শব্দ করছিলেন। বাঁদর যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বৃক্ষ শাখাকে আন্দোলিত করে সেইরূপ কিছু দেবতা লম্ফঝম্প দিয়ে মেরু শিখরকে আন্দোলিত করছিলেন। কিছু দেবতা নিজের হাত মাটিতে এভাবে ফেলছিলেন যেন তাঁরা সংগ্রামের প্রতিজ্ঞাকারী যোদ্ধা। কিছু বাজিতে জিতেছেন এভাবে চীৎকার করছিলেন, কিছু বাদ্যের মত ফোলা নিজ নিজ গাল বাজাচ্ছিলেন। কিছু নটের মত চিত্রবিচিত্র রূপ ধারণ করে লাফাচ্ছিলেন। কিছু রমনীরা যেরূপ গোলাকার হয়ে বাস করে সেরূপ গোলাকার হয়ে মনোহর নৃত্যের সঙ্গে সুমধুর গীত গাইছিলেন। কিছু অগ্নির মত প্রজ্বলিত হচ্ছিলেন। কিছু সূর্যের মত তাপ দান করছিলেন। কিছু মেঘের মত গর্জন করছিলেন। কিছু বিদ্যুতের মত চমকিত হচ্ছিলেন। কিছু পূর্ণ ভোজের পর বটুকের মত নিজেদের উদরের প্রদর্শন করছিলেন। প্রভুপ্রাপ্তির আনন্দকে কে গোপন করতে পারে? এভাবে দেবতারা যখন আনন্দ করছিলেন তখন অচ্যুতেন্দ্র প্রভুকে লেপন করলেন, পারিজাতাদি বিকসিত পুষ্পে ভক্তিভাবে প্রভুর পূজা করলেন ও সামান্য পিছনে সরে গিয়ে ভক্তিতে নম্র হয়ে শিষ্যের মত ভগবানের বন্দনা করলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

সূচীপত্র

অষ্টম বর্ষ ॥ অষ্টম খণ্ড

বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৭

কবিতা

গল্প

গ্রন্থ সমালোচনা

চিঠিপত্র

জীবনী

নাটক

প্রবন্ধ

মহাবীর-বাণী

স্তোত্র

চিত্র

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্ট্ডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।